ত্বিষাম্পতি দত্ত
বিশ্বপতি দত্ত
ছত্রপতি দত্ত
তীর্থপতি দত্ত
শুভপতি দত্ত
—কর কমলেষু



প্রথম প্রকাশ: রথযাত্রা, ১৩৫৪

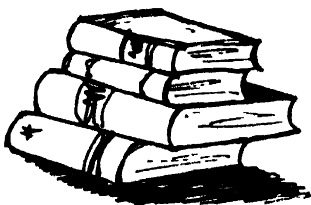
প্রকাশক: কল্যাণব্রত দত্ত ॥ তুলি-কলম ॥
১, কলেজ রো, কলকাতা—৯

প্রসেসিং: প্যাট প্রসেস

মুদ্রক: ডায়নামিক প্রিণ্টার্স
২৪এ, বাগমারী রোড, কলকাতা—৫৪

প্রচ্ছদ: কুমারঅজিত
অলঙ্করণ: রাজা দত্ত

সূচীপত্র



প্রকাশকের নিবেদন

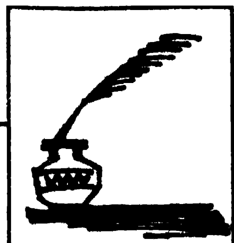
১৯৮৫-র জানুয়ারী মাসে বিশ্ববিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক আন্তন চেখভ (১৮৬০-১৯০৪)-র ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিপালিত হয়। -

সঙ্গত কারণেই লিও তলস্তয় ও ফিয়দর দস্তয়েভ্স্কির নামের সঙ্গেই চেখভের নামও অবশ্যই স্মরণীয়। চেখভ ঘৃণা করতেন অত্যাচার, মিথ্যাচার, "শক্তিমানের" আত্মতুষ্টি এবং "দুর্বলের" হীনতাকে ; তিনি আঘাত করেছেন সবরকম নীচতাকে। তিনি সবচাইতে বেশী মূল্য দিতেন সত্যকে, মানুষের মর্যাদাকে এবং নৈতিক সৌন্দর্যকে। ইউ. এস. এস. আর-এর এবং সমগ্র বিশ্বের মানুষদের মোট বিরানব্বইটি ভাষায় চেখভের রচনাবলী সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত হয়েছে সর্বমোট চোদ্দ কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ কপি।

পুস্তক-প্রকাশনার এই কিংবদন্তী সংখ্যার সঙ্গে এবার যুক্ত হল "তুলি-কলম"-এর সগর্ব নিবেদন বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত আন্তন চেখভের সমগ্র গল্প-সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ একটি অকিঞ্চিৎকর সংখ্যা। রামায়ণে বর্ণিত সমুদ্র-বন্ধনে ব্যবহৃত প্রতিটি শিলাখণ্ড যেমন এক মহৎ প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হবার গৌরবে সমুজ্জ্বল, তেমনই বাংলা ভাষায় রুশ সাহিত্য প্রকাশের মহৎ প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হবার এই সামান্য উদ্যোগও সহৃদয় সুধীজন ও রসিক পাঠকের সস্নেহ ও সহানুভূতিসিঞ্চিত সমাদর লাভ করবে এইটুকু আমাদের দীন প্রত্যাশা।

আন্তন চেখভ

ম্যাক্সিম গোর্কি



একবার কুচুক্-কয় গ্রামে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে তিনি আমাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানে তাঁর একটুকরো জমি ও একটা সাদা দোতলা বাড়ি ছিল। তিনি আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাঁর ''জমিদারি'' দেখিয়েছিলেন এবং সারাক্ষণ সোৎসাহে কথা বলেছিলেন ।

''আমার যদি অনেক টাকা থাকত তাহলে এখানে রুগ্ন গ্রাম্য শিক্ষকদের জন্য একটা স্বাস্থ্যনিবাস বানাতাম। বাড়িটাতে অনেক আলো থাকবে, বুঝলে, খুব আলো, আর জানালাগুলো হবে বেশ বড় এবং সিলিং হবে উঁচু। আমার ইচ্ছা, সেখানে থাকবে একটা চমৎকার গ্রন্থাগার, সব রকম বাদ্যযন্ত্র, একটা মধুমক্ষিকালয়, একটা সব্জি বাগান, একটা ফলের বাগান। কৃষিবিজ্ঞান, আবহবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থাও করা হবে—শিক্ষকদের সব কিছু জানা উচিত হে বৃদ্ধ, সব কিছু।''

হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন, কাশলেন, তেরছা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, আর তার সেই মিষ্টি, শান্ত হাসিটি হাসলেন যার আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য, যা মানুষকে বাধ্য করত তার প্রতিটি কথাকে তীক্ষ্ণতম মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করতে।

''আমার এই সব স্বপ্নের কথা শুনতে কি তোমার বিরক্তি বোধ হচ্ছে? এ সব কথা বলতে আমি ভালবাসি। রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে সৎ, কুশলী, সুশিক্ষিত শিক্ষকের যে কত প্রয়োজন তা যদি জানতে। রাশিয়াতে শিক্ষকদের জন্য বিশেষ রকমের পরিবেশ আমাদের সৃষ্টি করতেই হবে, আর সেটা যত শীঘ্র সম্ভব, কারণ আমরা বুঝি যে সাধারণ মানুষ যদি একটা সার্বিক শিক্ষা না পায় তাহলে আধ-পোড়া ইট দিয়ে তৈরী বাড়ির মত রাষ্ট্রটাই ভেঙে পড়বে। শিক্ষককে হতে হবে একজন অভিনেতা, একজন শিল্পী, নিজের কাজকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে, আর আমাদের শিক্ষকরা সাধারণ শ্রমজীবী, অর্ধশিক্ষিত মানুষ; আর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে তাঁরা গ্রামে যায় এত অনিচ্ছায় যেন তাঁরা নির্বাসনে যাচ্ছে। তাঁরা অনাহারক্লিষ্ট, পদদলিত, জীবিকার উপায়টি হারাবার নিত্য ভয়ের মধ্যে তাঁরা বেঁচে থাকে। শিক্ষকের হওয়া উচিত গ্রামের প্রধানতম ব্যক্তি, চাষীদের সব রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম, যাতে চাষীরা তাঁকে মনোযোগ ও সম্মানের যোগ্য শক্তিধর বলে মনে করে, যাতে কেউই ধমক দেবার...অথবা অসম্মান করার সাহস না পায়, যেটা আমাদের গ্রামাঞ্চলে সকলেই করে থাকে—গ্রামের পুলিশ, ধনী দোকানদার, পুরোহিত, বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোশক, প্রধান জন এবং

সেই কর্মচারিটি যাকে বলা হয় বিদ্যালয়-পরিদর্শক, অথচ যিনি ব্যস্ত থাকেন, শিক্ষার পরিবেশকে উন্নত করার কাজে নয়, কেবলমাত্র জেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পাঠানো ইস্তাহারকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার কাজে। মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব যাঁকে দেওয়া হয় তাঁকে বেতন হিসাবে অতি তুচ্ছ সামান্যমাত্র অর্থ দেওয়াটাতো এক হাস্যকর অবাস্তব কথা। এটা তো অসহ্য যে এমন একটি মানুষ ছিন্নবস্ত্র পরে ঘুরবে, স্যাঁৎসেঁতে ভাঙ্গা বিদ্যালয়-গৃহে শীতে কাঁপবে, যথেষ্ট হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থাহীন ঘরে স্টোভের ধোঁয়ায় বিষাক্ত হবে, সব সময় সর্দিতে ভুগবে, এবং ত্রিশ বছর বয়সেই কণ্ঠনালীপ্রদাহ, বাত, যক্ষ্মা প্রভৃতি নানা রোগের একটা ডিপো হয়ে উঠবে। এটা আমাদের লজ্জা। বছরে নয়-দশ মাস আমাদের শিক্ষকরা ঋষিদের মত জীবন যাপন করে—কথা বলার মত কেউ নেই, সঙ্গী নেই, বইপত্তর নেই, আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা নেই ; এই পরিবেশে থাকতে থাকতে তাঁরা নির্বোধে পরিণত হয়। আর যদি বা তাঁরা সাহস করে কাউকে আসতে বলেন, দেখা করতে বলেন, তাহলে সকলে মনে করে তাঁরা কর্তৃপক্ষবিরোধী—এই নির্বোধসুলভ কথাটা দিয়েই ধূর্ত লোকগুলি বোকা মানুষদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে, এ সবই বিরক্তিকর। একটি মহান ও ভয়ংকর গুরুত্বপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত একদল মানব সন্তানের প্রতি এক ধরনের উপহাস। আমি তোমাকে বলছি, একজন শিক্ষকের সঙ্গে দেখা হলে তাঁর কাছে আমি বড়ই অপ্রস্তুত বোধ করি—তাঁর ভীরু স্বভাব, তাঁর জীর্ণ পরিধান, সব কিছুর জন্য কেবলই মনে হয়, শিক্ষকটির এই দুর্দশার জন্য কোন না কোন ভাবে আমি নিজেই দায়ী—সত্যি, এ কথা আমার মনে হয়।''

এক মুহূর্ত থেমে দুই হাত সম্মুখে বাড়িয়ে তিনি নরম গলায় বলেন ঃ

''কী হাস্যকর, কদর্য দেশ আমাদের রাশিয়া!''

গভীর দুঃখের একটা ছায়া নেমে এল তাঁর দুই চোখে, অনেকগুলি সূক্ষ্ম বলিরেখায় আকীর্ণ হল তাঁর চোখের কোণগুলি, আর তাতে গভীরতর হল তাঁর দৃষ্টি। চারদিকে তাকিয়ে যেন নিজেকে নিজেই পরিহাস শুরু করে দিলেন।

''এই যে তুমি—একটা উদারনৈতিক, সংবাদপত্রের প্রধান প্রবন্ধে আমি তোমার কথাই লিখেছি।' এস, তোমার ধৈর্যের পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে একটু চা খাওয়াব।''

এ রকমটা তিনি প্রায়ই করতেন। এই কথা বলছেন স্নেহ, গাম্ভীর্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে, পরমুহূর্তেই নিজেকে নিয়ে, নিজের কথা নিয়েই হাসতে শুরু করলেন। আর সেই শান্ত, বিষণ্ণ হাসির অন্তরালে অনুভব করা যেত এমন একটি মানুষের সূক্ষ্ম সংশয়বাদ যিনি কথার মূল্য ও স্বপ্নের মূল্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তাঁর এই হাসির মধ্যে তাঁর আকর্ষণীয় বিনয় ও স্বতস্ফূর্ত ন্যায়নিষ্ঠাও প্রকাশ পেত।

নীরবে হাঁটতে হাঁটতে আমরা তার বাড়িতে ফিরে এলাম। দিনটা ছিল

উষ্ণ ও উজ্জ্বল ; সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মিতে ঝলমল-করা ঢেউয়ের শব্দ কানে আসছে। মাঠের মধ্যে একটা কুকুর মনের সুখে ডাকছে। চেখভ আমার হাতটা ধরে ধীরে ধীরে কথা বলতে লাগলেন। মাঝে মাঝেই কাশির দমকে তাঁর কথা বলা বিঘ্নিত হচ্ছিল।

'এটা খুবই লজ্জার, খুবই দুঃখের, কিন্তু এমন অনেক লোক আছে যারা কুকুরকেও ঈর্ষা করে...''

তারপরেই হাসতে হাসতে বললেন ঃ

''আজ আমি যা কিছু বলি সবই বুড়োদের মত শোনায়—আমি নিশ্চয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।''

বার বাব তাঁর মুখে শুনেছি ঃ

''শোন—এইমাত্র একজন শিক্ষক এসেছেন...তিনি অসুস্থ, তাঁর স্ত্রী আছেন—তাঁর জন্য তোমরা কিছুই করতে পাব নি, পেরেছ কি ?.. ''

অথবা ঃ

''শোন গোর্কি! একজন শিক্ষক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনি শয্যাশায়ী, রুগ্ন। তুমি কি তাঁকে দেখতে যাবে না ?''

অথবা ঃ

''একজন শিক্ষয়িত্রী বই পাঠাতে লিখেছেন...''

অনেক সময়ই তাঁর বাড়িতে এই ''শিক্ষক'' কে আমি দেখেছি—যথারীতি নিজের আনাড়িপনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন সেই শিক্ষকটি চেয়ারেব এক কোণায় বসে, ঘর্মাক্ত কলেবরে বাছা বাছা শব্দ প্রয়োগ করে, এবং যতদূর সম্ভব সহজভাবে ও ''শিক্ষিতমন্যতা''র সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করে; অথবা অতিমাত্রায় লাজুক মানুষের মত অতি-পরিচয়েব ভঙ্গীতে এবং লেখকের চোখে যাতে তার বোকামি ধরা না পড়ে সে চিন্তায় সম্পূর্ণভাবে মগ্ন থেকে আন্তন পাভ্‌লোভিচকে এমন সব প্রশ্ন করতে থাকে যেগুলি হয়তো সবেমাত্র তাঁর মাথায় এসেছে।

আন্তন পাভ্‌লোভিচ মনোযোগের সঙ্গে সেই বিদ্‌ঘুটে কথাগুলি শুনতেন, মৃদু হাসিতে তাঁর বিষণ্ন চোখ দুটিকে উজ্জ্বল করে তুলতেন, তাঁর কপালের রেখাগুলি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠত, এবং গভীর, শান্ত, চাপা গলায় তিনি নিজেও কথা বলতে শুরু করতেন, জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত এমন সব সরল, স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করতেন যাতে তাঁর সাক্ষাৎ-প্রার্থীটি সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তি বোধ করত, আর চটপটে হবার সচেতন চেষ্টা থেকে বিরত হবার ফলে আরও চটপটে, আরও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠত...

এই রকম একজন শিক্ষকের কথা মনে পড়ছে—লম্বা, ক্ষীণকায়, পাণ্ডুর, বিশুষ্ক মুখ, দীর্ঘ নাসিকা থুতনির কাছে এসে বেঁকে গেছে—আন্তন পাব্‌লোভিচের উল্টোদিকে বসে দুটি কালো চোখ তুলে তাঁর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে লোকটি গম্ভীর, অপ্রসন্ন গলায় অবিরাম বকে চলেছেন ঃ

"শিক্ষক-জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবনযাত্রার এই সব ছবি দেখে চারদিকের জগৎ সম্পর্কে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষীণতম সম্ভাবনাটুকুও বিলীন হয়ে গেছে। অবশ্য জগৎটা তো তার সম্পর্কে আমাদের নিজের নিজের ধারণা ছাড়া অন্য কিছু নয়।"

এইখানে তিনি দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় পদক্ষেপ করে বরফের উপর হেঁটে যাওয়া মাতালের মত বার বার পিছলে যেতে লাগলেন।

চেখভ শান্ত, সদয় গলায় বললেন, "বলুন তো আপনার জেলায় কোন্ শিক্ষক ছেলেমেয়েদের মারধোর করেন ?"

শিক্ষকটি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ক্ষোভের সঙ্গে দুই হাত নেড়ে বলে উঠলেন, "কি ? আমি ? কখনও না। তাদের মারধোর করেছি ?"

লোকটি তীব্র অসন্তোষের সঙ্গে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগলেন।

তাকে শান্ত করতে আন্তন পাব্‌লোভিচ হেসে বললেন, "আপনি উত্তেজিত হবেন না। আমি কি বলেছি যে সেই লোকটি আপনি ? কিন্তু আমার মনে আছে খবরের কাগজে পড়েছি আপনাদের জেলায় কে একজন স্কুলের ছেলেমেয়েদের মারধোর করেছেন..."

শিক্ষকটি আবার বসে পড়লেন ; মুখের ঘাম মুছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গম্ভীর স্বরে বলতে শুরু করলেন ঃ

"ঠিক বলেছেন। এ রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। লোকটি মাকারভ। আর এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এটা অদ্ভুত, কিন্তু বোধগম্য। সে বিবাহিত, চারটে ছেলেমেয়ে আছে, তাঁর স্ত্রী অসুস্থ, সে নিজেও ক্ষয়রোগী, তার বেতন বিশ রুব্‌ল্...আর স্কুলটা যেন একটা ভূগর্ভ-কক্ষ, শিক্ষকের জন্য মাত্র একটা ঘর। এই পরিস্থিতিতে একটা মানুষ তিলমাত্র দুর্ব্যবহারের জন্য স্বর্গের দেবদূতকে ঘুষি মারতে পারে, আর বিশ্বাস করুন, ছাত্ররাও কিন্তু দেবদূত নয় !"

...গৃহকর্তার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় শিক্ষকটি চেখভের ছোট, শুকনো চামড়া-সর্বস্ব হাতখানাকে নিজের দুই হাতের মধ্যে চেপে ধরলেন।

"আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসার সময় ভেবেছিলাম একজন উপরওয়ালার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি," তিনি বলতে লাগলেন, "তখন আমার পা কাঁপছিল, একটা তুর্কী মোরগের মত ফুলে উঠে স্থির করেছিলাম, আমিও যেন একজন দামী মানুষ সেটা আপনাকে বুঝিয়ে দেব। আর যাবার সময় মনে হচ্ছে এমন একটি সৎ ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে ছেড়ে যাচ্ছি যিনি সব কিছু বোঝেন ! সব কিছু বুঝতে পারা একটা মহৎ ব্যাপার ! আপনাকে ধন্যবাদ ! আমি চলে যাচ্ছি। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি একটি সৎ, মূল্যবান ধারণা ঃ মহৎ লোকরাই বেশী সরল হন, বেশী বোঝেন, যেসব ছোটমাপের মানুষের মধ্যে আমরা বাস করি তাদের তুলনায় তারাই আমাদের মত গরীব মানুষের অনেক বেশী কাছের মানুষ। বিদায়, আপনাকে কোন দিন ভুলব না।"

তার নাকটা কাঁপতে লাগল, দুটি ঠোঁটে ফুটে উঠল মৃদু হাসি।

অপ্রত্যাশিতভাবে সে বলল :

"খারাপ মানুষরাও দুর্ভাগা—তাদের কপালই মন্দ!"

লোকটি চলে গেলে আন্তন পাভ্লোভিচ তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন : "ছেলেটি বেশ। অবশ্য আর বেশী দিন সে শিক্ষকতা করতে পারবে না।"

"কেন পারবে না?"

"সকলে মিলে ওকে তাড়িয়ে দেবে...ওর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য।"

আমার তো মনে হয় আন্তন পাভ্লোভিচের সম্মুখে হাজির হলে প্রতিটি মানুষের অবচেতন মনে সরল হবার, আরও সত্যসন্ধ হবার, আরও নিজের মত হবার একটা বাসনা জাগে; এমন সুযোগ আমার অনেক হয়েছে যখন দেখেছি মানুষ কত সহজে পুঁথির বড় বড় কথা, কেতাদুরুস্ত বাকভঙ্গী, আর ইউরোপীয় সাজবার আগ্রহে রুশরা যে সব শস্তা চটকে নিজেদের সাজাতে ব্যস্ত, ঠিক যে ভাবে অসভ্য মানুষরা নিজেদের সাজায় ঝিনুক আর মাছের দাঁত দিয়ে, সব কিছুকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। মাছের দাঁত ও মোরগের পালক আন্তন পাভ্লোভিচ পছন্দ করতেন না; চেহারাটাকে মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলার জন্য মানুষ যে সমস্ত রুচিহীন জাঁকজমক, টুং-টাং, বিদেশী পোশাকে নিজেদের সাজায় সে সবই তাকে বিব্রত করে তুলত; আমি দেখেছি, যখনই কোন সেজেগুজে আসা লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে তখনই যে সব গুরুভার ও অপ্রয়োজনীয় সাজসজ্জা লোকটির সত্যিকারের মুখ ও জীবন্ত আত্মাকে বিকৃত করে তুলেছে তার হাত থেকে সেই সাক্ষাৎকারীকে মুক্ত করার একটা প্রবল প্রেরণা তার মধ্যে জেগে উঠেছে। সারাটা জীবন আন্তন পাভ্লোভিচ আত্মিক জীবন যাপন করেছেন, স্বীয় সত্তায় অবিচলিত থেকেছেন, অন্যে তার কাছে কি আশা করছে বা দাবী করছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। "বড় বড় বিষয় নিয়ে" আলোচনা তিনি পছন্দ করতেন না—অথচ সরলহৃদয় রুশরা তাতে পড়ই মজা পায়; তারা ভুলে যায় যে এটা স্ববিরোধী, বর্তমানে যার একজোড়া ভাল ট্রাউজারও জোটে না তার পক্ষে ভবিষ্যতের মখমলের পোশাক নিয়ে কথা বলাটা মোটেই সুবুদ্ধির পরিচয় নয়।

তিনি স্বয়ং ছিলেন শোভন সরলতার প্রতীক; তিনি ভালবাসতেন যা কিছু সরল, সত্য ও আন্তরিক; আর অন্যকেও সরল করে তোলার একটা নিজস্ব পদ্ধতি তার ছিল।

একদা তিনটি অতিমাত্রায় সজ্জিতা মহিলা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। রেশমী পেটিকোটের খস্-খস্ শব্দে এবং মাথার তেলের সুগন্ধে তার ঘরটাকে ভরে দিয়ে তারা গৃহকর্তার মুখোমুখি হয়ে সাড়ম্বরে আসন গ্রহণ করল এবং রাজনীতিতে গভীর আগ্রহের ভান করে তাকে প্রশ্নের পর

প্রশ্ন করতে লাগল।

"যুদ্ধটা কি ভাবে শেষ হবে বলে আপনি মনে করেন আন্তন পাভ্‌লোভিচ ?"

আন্তন পাভ্‌লোভিচ কাশলেন, একটু চিন্তা করলেন, তারপর নরম, গম্ভীর সদয় কণ্ঠে উত্তর দিলেন ঃ

"নিঃসন্দেহে শান্তিতে।"

"তা অবশ্যই। কিন্তু কে জিতবে ? গ্রীকরা না তুর্কীরা ?"

"আমার মনে হয় অধিকতর শক্তিশালী পক্ষই জয়লাভ করবে।"

মহিলারা এককণ্ঠে প্রশ্ন করল, "আপনি কোন্ পক্ষকে অধিকতর শক্তিশালী বলে মনে করেন ?"

"যে পক্ষ ভাল খায়, ভাল শিক্ষা পায়।"

"কী সরস জবাব, তাই না ?" একটি মহিলা চেঁচিয়ে বলল।

অন্য একজন প্রশ্ন করল, "আর আপনি কাদের পছন্দ করেন—গ্রীকদের না তুর্কীদের ?"

আন্তন চেখভ সদয় চোখে তার দিকে তাকালেন; নিজস্ব বিনম্র, সৌজন্যপূর্ণ হাসির সঙ্গে উত্তর দিলেন ঃ

"আমি ফলের আচার পছন্দ করি—আপনিও পছন্দ করেন কি ?"

"ওঃ, নিশ্চয়।" মহিলা সাগ্রহে জবাব দিল।

অপর একজন গম্ভীরভাবে তাতে সায় দিল, "কী চমৎকার স্বাদ তার।"

তিনজনেই ফলের আচারের আলোচনায় মেতে উঠল; বিষয়টিতে তাদের আশ্চর্য পাণ্ডিত্য ও জটিল জ্ঞানের পরিচয়ও দিল। তুর্কী ও গ্রীকদের কথা নিয়ে তারা কোনদিনই কোনরকম ভাবনা-চিন্তা করে নি, তাই সে বিষয় নিয়ে একটা গুরুতর আগ্রহের ভান করতে গিয়ে মাথার উপরে অকারণ চাপ সৃষ্টি করতে হল না বলে তারা বেশ খুশিই হল।

যাবার সময় তারা খুশি মনে আন্তন চেখভকে কথা দিয়ে গেল ঃ

"আমরা আপনাকে এক বাক্স ফলের আচার পাঠিয়ে দেব।"

তারা চলে গেলে আমি বললাম, "কথাবার্তাগুলো বেশ ভালই হল।"

আন্তন পাভ্‌লোভিচ মিষ্টি করে হাসলেন।

বললেন, "প্রত্যেকেরই তার নিজের ভাষায় কথা বলা উচিত।"

অন্য এক সময় একটি সুদর্শন তরুণ সহকারী সরকারী উকিলকে আমি তার ঘরে দেখেছিলাম। চেখভের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কোঁকড়া চুলে ভর্তি মাথাটাকে দুলিয়ে সে আত্মবিশ্বাসের সুরে কথা বলছিল ঃ

"আপনার "দুর্বৃত্ত" গল্পে আপনি আমাকে একটা অত্যন্ত সমস্যায় ফেলে দিয়েছেন। ডেনিস গ্রিগরিয়েভের মধ্যে আমি যদি স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের অস্তিত্ব দেখতে পাই তাহলে অসংকোচে ডেনিসকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়াই আমার কর্তব্য। কারণ সমাজের স্বার্থেই সেটা করা দরকার। কিন্তু সে অসভ্য,

তার কাজের অপরাধ সম্পর্কে কোন চেতনাই তার নেই, তার জন্য আমার দুঃখ হয়। আমি যদি মনে করি যে কোনরকম চিন্তা-ভাবনা না করেই সে কাজটা করেছে, আর তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করি, তাহলে সমাজের কাছে কেমন করে আমি এই প্রতিশ্রুতি দেব যে ডেনিস আবার বল্টু খুলবে না এবং ট্রেনটাকে লাইনচ্যুত করবে না? এটাই সমস্যা। এক্ষেত্রে কি করা হবে?"

সে থামল; চেয়ারে হেলান দিয়ে আন্তন চেখভের মুখের উপর স্থির সন্ধানী দৃষ্টি রাখল। তার পোশাক আনকোরা নতুন, তার বোতামগুলি আত্মবিশ্বাসে ও নির্বুদ্ধিতায় ঝলমল করছে, ঠিক যে রকম ঝলমল করছে এই উৎসাহী তরুণের সদ্যধোয়া তাজা মুখের দুটি চোখ।

আন্তন চেখভ গম্ভীর মুখে বললেন, "আমি যদি বিচারক হতাম তাহলে ডেনিসকে মুক্তি দিতাম।"

"কিসের ভিত্তিতে?"

"আমি তাকে বলতাম : 'তুমি এখনও সচেতন অপরাধী হয়ে ওঠ নি ডেনিস; তুমি চলে যাও, আর যা করছ তাই করতে থাক।'"

উকিল হেসে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই আগেকার গাম্ভীর্যে ফিরে গিয়ে বলে উঠল :

"না মাননীয় আন্তন পাভ্লোভিচ, যে সমস্যাটিকে আপনি তুলে ধরেছেন তার একমাত্র সমাধান হতে পারে সমাজ, জীবন ও সম্পত্তির স্বার্থে, আর সেগুলি রক্ষা করাই আমার কর্তব্য। ডেনিস অসভ্য, একথা সত্য, কিন্তু সে একজন অপরাধী সেটাও তো সত্য।"

আন্তন পাভ্লোভিচ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি গ্রামোফোন শুনতে ভালবাসেন?"

যুবকটি দ্রুত জবাব দিল, "হ্যাঁ, খুব ভালবাসি। এটা তো এক আশ্চর্য আবিষ্কার।"

"আর আমি গ্রামোফোন সহ্য করতেই পারি না," আন্তন পাভ্লোভিচ দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করলেন।

"কেন পারেন না?"

"দেখুন, এই যন্ত্রটা কথা বলে, গান গায়, কিন্তু কিছুই অনুভব করে না। ওটার ভিতর থেকে যত শব্দ বেরিয়ে আসে সবই বড় শূন্যগর্ভ আর প্রাণহীন। আর—আপনার কি ফটোগ্রাফির অভ্যাস আছে?"

উকিলটি ছিল ফটোগ্রাফির একজন অনুরাগী ভক্ত। সঙ্গে সঙ্গে সে সোৎসাহে ঐ বিষয়টি নিয়েই আলোচনায় মেতে উঠল; গ্রামোফোনের প্রতি আর তিলমাত্র আগ্রহও দেখাল না, যদিও সেই "আশ্চর্য" আবিষ্কারটির সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল ছিল আর চেখভ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সঠিকভাবেই সেটা ধরতে পেরেছিলেন। সেই আর একবার একটা ইউনিফর্মের নীচে আমি দেখতে পেয়েছিলাম একটি প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় মানুষকে যে জীবনের যাত্রাপথেও সত্যি সত্যি একটি তরুণই ছিল ঠিক যেমনটি থাকে একটি

কুকুরছানা যখন তাকে শিকারে নিয়ে যাওয়া হয়।

যুবকটি চলে গেলে আন্তন পাভ্‌লোভিচ বিষণ্ণ গলায় বললেন : "ন্যায়-বিচারের পিঠের এই সব ক্ষুদে ব্রণরাই তো মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা করে।"

একটু থেমে তিনি আবার বললেন । "উকিলরা সর্বদাই মাছ ধরতে ভালবাসে। বিশেষ করে যে মাছ চরে এসে পড়ে।"

সর্বক্ষেত্রে নীচতার মুখোশ খুলে দেবার কলা-কৌশলে তিনি ছিলেন সুদক্ষ। একমাত্র তিনিই এই বিদ্যায় পারদর্শী হতে পারেন জীবনের কাছে যার প্রত্যাশা অনেক বেশী, আর মানুষের মধ্যে সরলতা, সৌন্দর্য ও মিলনকে প্রত্যক্ষ করার বাসনা যার অন্তরে প্রবল। তিনি ছিলেন নীচতার একজন কঠোর ও নির্দয় বিচারক।

মানুষ যখন যুবক থাকে তখন নীচতাকে মজাদার ও তুচ্ছ বলে মনে হয়, কিন্তু ক্রমশ সেই নীচতা মানুষকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে, তার ধূসর কুয়াশা পায়ে-পায়ে তার মস্তিষ্কে ও রক্তে ঢুকে পড়ে বিষ বা কয়লার ধোঁয়ার মত; শেষ পর্যন্ত মানুষটি হয়ে ওঠে শুঁড়িখানার পুরনো নাম-ফলকের মত, মরচেয় খেয়ে-ফেলা—দেখে মনে হয় তার উপর কিছু লেখা আছে, কিন্তু সেটা যে কি তা বোঝা অসম্ভব।

একেবারে সূচনাতেই আন্তন চেখভ নীচতার ধূসর সমুদ্রের মধ্যে নীচতার করুণ গম্ভীর তামাসাগুলিকে ধরতে পারতেন। তার "হাসি"-র গল্পগুলিকে যত্ন করে পড়লেই বোঝা যায় কত নিষ্ঠুরতাকে চোখে দেখে সলাজ সংকোচের সঙ্গে তাকে লুকিয়ে রেখেছেন তার হাস্যকর বিবরণ ও পরিস্থিতির আড়ালে।

তার বিনয় ছিল একেবারে নির্ভেজাল; তিনি কখনই কাউকে উচ্চকণ্ঠে ও প্রকাশ্যে বলতে পারতেন না "আরও ভদ্র হতে কি পারেন না!" তিনি বৃথাই বিশ্বাস করতেন যে আরও ভদ্র হবার জরুরি প্রয়োজনটা তারা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারবে। যা কিছু নীচ, যা কিছু কলুষতাময় তাকেই তিনি ঘৃণা করতেন; আবার জীবনের নিকৃষ্ট দিনগুলির বর্ণনা দিতেন কবির মহৎ ভাষায়, একজন রসিক মানুষের হাসির মাধ্যমে; তার গল্পগুলির মসৃণ বহিরাবরণের তলে যে তিক্ত বিদ্রূপ ঝল্‌সে উঠত সেটা কদাচিৎ চোখে পড়ত।

শ্রদ্ধেয় পাঠকসাধারণ "আল্‌বিয়নের কন্যা" পড়ে হাসে; এই গল্পটির ভিতর দিয়ে জীবনে যে কিছুই পেল না, কাউকে পেল না এমন একটি অসহায় মানুষের প্রতি জনৈক ভুঁড়িভোজনসমৃদ্ধ জমিদারের যে তীব্র ঘৃণাকে প্রকাশ করা হয়েছে সেটা হয় তো তাদের চোখেই পড়ে না। চেখভের সমস্ত হাসির গল্পের ভিতর দিয়ে আমি তো শুনতে পাই একটি নিষ্কলুষ সত্যিকারের মানব হৃদয়ের শান্ত, গম্ভীর দীর্ঘশ্বাস, যে সব মানব সন্তান আত্মমর্যাদা রক্ষায়,

অক্ষম বিনা সংগ্রামে পশু-শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে, ক্রীতদাসের মত বেঁচে থাকে, যে বাঁধাকপির ঝোল তারা প্রত্যহ গলাধঃকরণ করে তাকে যথাসম্ভব রসাল করার প্রয়োজনীয়তার বাইরে আর কোন কিছুতেই যাদের বিশ্বাস নেই, শক্তিমান ও উদ্ধত মানুষের হাতে লাঞ্ছিত হবার ভয় ছাড়া আর কোন অনুভূতি যাদের নেই—তাদেরই প্রতি করুণার এক আশাহীন দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

জীবনের ছোটখাট জিনিসের শোচনীয় রূপটিকে চেখভের মত এত স্পষ্ট করে সহজাতভাবে আর কেউ কোন দিন বুঝতে পারে নি, মধ্যবিত্ত জীবনের বিশৃঙ্খল মলিনতার মধ্যে যা কিছু লজ্জাকর শোকাবহ তার এমন নিষ্ঠুর বিশ্বস্ত ছবি তার আগে অন্য কোন লেখক মানুষের সামনে তুলে ধরে নি।

নীচতাই ছিল তার শত্রু। সারা জীবন তিনি তার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করেছেন, তাকে ঘৃণা করেছেন, তীক্ষ্ণ, নিরপেক্ষ কলমে তাকেই চিত্রিত করেছেন, এমন কি সেখানেও নীচতার ছত্রাককে আবিষ্কার করেছেন যেখানে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল সব কিছুই বুঝি সেরা, অত্যন্ত সুবিধাজনক, এমন কি চমৎকার। আর সেই নীচতাই শেষ পর্যন্ত তার উপর একটা কুৎসিত খেলা খেলল যখন তার মৃতদেহকে—একজন কবির মৃতদেহকে মস্কো পাঠিয়ে দেওয়া হল একটা ঝিনুকবাহী মালগাড়িতে।

সেই পরিচ্ছন্ন সবুজ মালগাড়িটাকে আমার মনে হয় ক্লান্ত শত্রুর প্রতি নীচতার এক প্রশস্ত বিজয়ী দন্তবিকাশ; আর সংবাদপত্রের অসংখ্য স্মৃতি-চারণ—নিছক কপট শোকের প্রকাশ; তার অন্তরালে আমি অনুভব করি সেই নীচতারই এক শীতল, পচা নিঃশ্বাস যে তার শত্রুর মৃত্যুতে গোপনে আনন্দে নৃত্য করেছিল।

চেখভের গ্রন্থাবলী পড়লে মনে হয় এ যেন শেষ হেমন্তের একটি বিষণ্ণ দিন, যখন বাতাস থাকে স্বচ্ছ, পাতা-ঝরা গাছগুলি আকাশের পটভূমিকায় স্পষ্ট হয়ে দৃশ্যমান হয়, বাড়িগুলো সব একসঙ্গে গাদাগাদি করে থাকে, আর মানুষগুলি হয় নিষ্প্রভ ও বিষণ্ণ। সব কিছুই এত বিস্ময়কর, নিশ্চল, শক্তিহীন। দূর দিগন্ত নীলাভ হতে হতে ম্লান আকাশের সঙ্গে মিশে যায়, একটা ভয়ংকর ঠাণ্ডা বাতাস আধ-জমা কাদার উপর নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু লেখকের মনটা হেমন্তের সূর্য কিরণের মতই আলোকিত করে তোলে পায়ের তলার পথ, আঁকাবাঁকা রাজপথ, নোংরা, বাঁকাচোরা সব বাড়ি-ঘর যার মধ্যে সকরুণ ''ছোট'' লোকগুলো একঘেয়েমি ও অলসতার মধ্যে কোনক্রমে দিন গুজরান করে, তাদের বাসস্থানকে ভরে তোলে অর্থহীন, ঝিমধরা কলকোলাহলে। সেখানেই থাকে তার ''প্রিয়া'', ছোট্ট ধূসর ইঁদুরটির মত ভীরু একটি মিষ্টি, নরম নারী যে নির্বিচারে ভালবাসে ক্রীতদাসীর মত অনুগত হয়ে। তার গালে একটা ঘুষি মার, তবু সেই ভীরু ক্রীতদাসী সাহস করে কাঁদবেও না। তারই সমগোত্রীয় ''তিন বোন''-এর একজন ওলগা; সেও

ভালবাসে আর অকর্মা ভাইয়ের চরিত্রহীনা ইতর স্ত্রীর খেয়ালকে ধৈর্যের সঙ্গে মেনে চলে; তাকে ঘিরেই দুটি বোনের জীবন ধ্বংস হয়ে যায় আর সে কেবল কাঁদে, কিছুই করার ক্ষমতা তার নেই; অথচ এ ইতরতার প্রতিবাদ জানাবার মত একটি জীবন্ত শক্ত কথাও তার মনের মধ্যে গড়ে ওঠে না।

আর কাছে ''চেরীফুলের বাগান''-এর অশ্রুমতি রানেভ্স্কায়া ও বাগানের অন্য প্রাক্তন মালিকরা—ছোটদের মত স্বার্থপর আর বুড়োদের মত শ্লথগতি। অনেক আগেই তাদের মরে যাওয়া উচিত ছিল, অথচ আজও তারা প্যান-প্যান করে আর ঘ্যান-ঘ্যান করে, চারদিকে একবার তাকিয়েও দেখে না, কিছুই বোঝে না, সব পরগাছা বনে গেছে, নতুন করে জীবনের রসদ শুষে নিতে পারে না। অপদার্থ ছাত্র ত্রফিমভ পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বড় বড় কথা বলে আর ভারিয়াকে নিয়ে বোকা-বোকা ঠাট্টা-তামাসা করে সময় কাটিয়ে দেয়, অথচ সেই অলস লোকগুলোর ভালর জন্যই বেচারি ভারিয়া অবিরাম কাজ করে।

ভার্শিনিন (''তিন বোন'' গল্পের নায়ক) তিন শ' বছর পরের সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখে, কিন্তু একবারও চোখ মেলে দেখে না যে তার চারদিকেই সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, তার চোখের সামনেই বিরক্তি ও নির্বুদ্ধিতার বশে সোলিয়োনি প্রস্তুত হয়ে আছে দুর্ভাগা ব্যারন তুসেন্বাককে হত্যা করতে।

ভালবাসার কাছে নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও আলস্যের কাছে, পার্থিব সুখের প্রতি লোভের কাছে আত্মবিক্রয়কারী ক্রীতদাসদের এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা পাঠকের চোখের সম্মুখ দিয়ে চলে যায়। পদে পদে জীবনহানির অজ্ঞাত ভয়ে ভীত একদল ক্রীতদাস এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বাক্যহীন অভিযোগে বাতাসকে ভরে দিয়ে; এটা তারা বুঝতে পেরেছে যে বর্তমানে এখানে তাদের কোন ঠাঁই নেই।

কখনও বা একটা বন্দুকের শব্দ কানে আসে—সে মানুষটি আইভানভ বা ত্রেপ্লেভ; এটাই একমাত্র করণীয় এই সত্যটি হঠাৎই আবিষ্কার করে সে আত্মহননের পথটাই বেছে নিয়েছে।

তাদের মধ্যে অনেকেই দু'শ' বছর পরের এক গৌরবময় জীবনের মধুর স্বপ্ন দেখে, কিন্তু এই সরল প্রশ্নটি করার কথা কেউ ভাবে না । আমরা যদি স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কিছুই না করি তাহলে জীবনটাকে গৌরবে ভরে দেবে কে ?

এদিকে বীর্যহীন মানুষদের এই বিরক্তিকর, বিষণ্ণ শোভাযাত্রার সঙ্গে হাঁটতে থাকেন একজন মহান জ্ঞানী মানুষ; তার নিজের দেশের এই সব বিষণ্ণ মানুষের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে শান্ত অথচ গভীর তিরস্কারের সুরে তিনি কথা বলেন; তার মনে ও অন্তরে গভীর হতাশার দুঃখ; বিষণ্ণ হাসি হেসে এক আশ্চর্য আন্তরিকতার স্বরে তিনি বলে ওঠেন :

''ভদ্রমহোদগণ, কী এক বিরক্তিকর জীবন আপনাদের।''

পাঁচদিন ধরে জ্বরে ভুগছেন, অথচ বিশ্রামের ইচ্ছাটুকুও নেই। ধূসর বৃষ্টির ফোঁটা পৃথিবীর ধূলোকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। ইনো দুর্গের কামানের শব্দ অবিরাম গর্জন করছে। রাত্রে সন্ধানী আলোর দীর্ঘ জিহ্বা মেঘগুলোকে চেটে খাচ্ছে, এক ঘৃণাই দৃশ্য, কারণ সে দৃশ্য বার বার মনে করিয়ে দেয় একটা শয়তানী মহামারীর কথা—যার নাম যুদ্ধ।

আমি চেখভ পড়ি। তিনি যদি যুদ্ধের দশ বছর আগে মারা না যেতেন তাহলে যুদ্ধটাই হয় তো তাকে হত্যা করত, আর প্রথমেই মানুষের প্রতি বিদ্বেষের বিষ দিয়ে তার অন্তরকে বিষাক্ত করে তুলত। তার অন্ত্যেষ্টিকালীন দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল।

মস্কো যাকে "এত ভালবাসত" সেই লেখকের শবাধারটিকে নিয়ে আসা হল একটা সবুজ মালবাহী গাড়িতে তুলে; সেই গাড়ির দরজার উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল "ঝিনুক।" অল্প কিছু লোকের যে ছোট দলটা লেখককে দেখতে এসেছিল তার একটা অংশ মাঞ্চুরিয়া থেকে সদ্য আগত জেনারেল কেলারের শবাধারকে অনুগমন করল এবং অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, সামরিক ব্যাণ্ড বাজিয়ে চেখভকে কবরে নিয়ে যাচ্ছে কেন। যখন ভুলটা ধরা পড়ল তখন কিছু ফূর্তিবাজ লোক হাসি-ঠাট্টা শুরু করে দিল। চেখভের শবাধারকে অনুগমন করেছিল শ'খানেক লোক, তার বেশী নয়। আজও আমার স্মৃতিতে ভাসছে দু'জন আইনজীবী; নতুন বুটে আর মনোরম "টাই"-তে দু'জনই বিয়ের বরের সাজে সেজেছিল। তাদের পিছনে হাঁটিতে হাঁটিতে একজন—ভি. এ. মাক্লাকভকে বলতে শুনলাম কুকুরের বুদ্ধির গল্প, আর অপর জন—তাকে আমি চিনতাম না—গর্ব করে বলতে লাগল তার গ্রীষ্মকালীন ভবনের সুখ-সুবিধা এবং তার পরিবেশের সৌন্দর্যের কথা। আর লাল পোশাক-পরা জনৈক মহিলা লেসের রোদ-ঢাকনাটি তুলে ধরে শিংয়ের ফ্রেমের চশমা-চোখে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বলছিল ঃ

"আহা, তিনি কত প্রিয়, কত রসিক ছিলেন..."

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি অবিশ্বাস্য রকমের কাশছিল। দিনটা ছিল গরম ও ধূলোভরা। শোকযাত্রার পুরোভাগে ছিল বলিষ্ঠ সাদাঘোড়ার পিঠে সওয়ার এক বলিষ্ঠ পুলিশ অফিসার। এ সব এবং আরও অনেক কিছুই ছিল যা বিরক্তিকর কুরুচির পরিচায়ক এবং একজন মহৎ ও সূক্ষ্ম শিল্পীর স্মৃতির সঙ্গে একেবারেই বেমানান।

বৃদ্ধ এ. এস. সুভোরিনকে লেখা একটা চিঠিতে চেখভ লিখেছিলেন ঃ

"নীরস জীবন-সংগ্রামের চাইতে অধিক ভয়ংকর, অধিক কাব্যহীন আর কিছু নেই; সে সংগ্রাম জীবনের আনন্দকে নষ্ট করে, জীবন-বৈরাগ্যের সূচনা করে।"

প্রথম যৌবনকাল থেকে তাকে এই "জীবন-সংগ্রাম" চালাতে হয়েছে একটুকরো রুটি সংগ্রহের এক আনন্দহীন, বর্ণহীন প্রাত্যহিক তুচ্ছ প্রচেষ্টার

ভিতর দিয়ে—আর প্রয়োজনটা ছিল একটা বেশ বড় টুকরোর, অন্যের জন্য এবং নিজের জন্য। এই সব আনন্দহীন প্রচেষ্টাতেই তাকে ব্যয় করতে হয়েছে যৌবনের সব শক্তি-সামর্থ্য ; ভাবতে অবাক লাগে এর পরে কি করে নিজের রসিক মনটাকে তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন। খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য ক্লান্ত প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কোনরূপে তিনি জীবনকে দেখেন নি। অতি সাধারণ জীবনের একটি ঘন আবরণ তার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল জীবনের সব মহৎ নাটক ও ট্র্যাজিডিকে। আর তাই পরবর্তীকালে যখন অপরের জন্য রুটির ব্যবস্থা করার যন্ত্রণা আর তাকে ভোগ করতে হয় নি তখনই এই সব নাটকের সত্যের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলবার অবসর তিনি পেয়েছিলেন।

সংস্কৃতির ভিত্তি হিসাবে কাজের গুরুত্বকে চেখভ যতটা গভীরভাবে ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুভব করেছিলেন তেমনটি আর কারও মধ্যে আমি দেখি নি।

...তিনি বাড়ি-ঘর বানাতে ভালবাসতেন ; বাগান করতে, পৃথিবীকে সাজাতে ভালবাসতেন ; কাজের ভিতরকার কবিতাকে অনুভব করতেন। নিজের হাতে লাগানো ফলের গাছ ও লতাপাতার বেড়ে ওঠাকে কী গভীর যত্নের সঙ্গেই না তিনি লক্ষ্য করতেন। আউৎকাতে নিজের বাড়ি তৈরী করার সময় গণনাতীত চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও তিনি বলেছেন ঃ

"পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যদি তার নিজের জমিটুকুতে সাধ্যমত সব কিছু করে তাহলে পৃথিবীটা কত সুন্দর হয়ে উঠতে পারে।"

তার রোগ মাঝে মাঝেই তাকে চিত্তোন্মাদ, এমন কি মানবদ্বেষীও করে তুলত। সেই সব সময় খুবই সংকট দেখা দিত, তাকে সামাল দেওয়াই কঠিন হয়ে পড়ত।

একদিন সোফায় শুয়ে খুক্ খুক্ করে কাশতে কাশতে থার্মোমিটারটা নাড়তে নাড়তেই তিনি বললেন ঃ " মরার জন্যই বেঁচে থাকাটা মোটেই সুখের নয়, কিন্তু সময় হবার আগেই মরতে হবে এটা জানার পরেও বেঁচে থাকা তো সত্যি অর্থহীন বোকামি..."

অন্য একসময় খোলা জানালার পাশে বসে দূরের সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ তিনি বিরক্তির সুরে বললেন ঃ

"ভাল আবহাওয়ার আশায়, ভাল ফসলের আশায়, একটা সুন্দর প্রেমের আশায়, ধনী হবার অথবা পুলিশ-প্রধানের চাকরি পাবার আশায় বেঁচে থাকতে আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু আরও জ্ঞানী হবার আশা করতে কাউকে কোনদিন দেখলাম না। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করি ঃ একজন নতুন জার এলে অবস্থা ভাল হবে ; দু'শ' বছরের মধ্যে আরও ভাল হবে ; কিন্তু সেই ভাল দিনটা কাল আসুক সে চেষ্টা কেউ করে না। মোটামুটিভাবে, জীবনটা প্রতিদিনই জটিলতর হয়ে ওঠে এবং নিজের খেয়াল মতই চলে, আর মানুষ ক্রমাগত অধিকতর বোকা হতে হতে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় জীবন

থেকে ছিটকে পড়ে।''

একটু থেমে ভুরু কুঁচকে বললেন :

''ধর্মীয় শোভাযাত্রায় খঞ্জ ভিখারীদের মত।''

তিনি ডাক্তার ছিলেন, আর ডাক্তারের অসুখ তার রোগীদের অসুখের চাইতে বেশী খারাপ। রোগীরা কেবল সেটা বুঝতে পারে, কিন্তু একজন ডাক্তার সেটা বোঝে তো বটেই, উপরন্তু তার শরীরের উপর রোগের বিধ্বংসী ফলটাও তার ভালভাবেই জানা থাকে। এ সব ক্ষেত্রে জ্ঞানটাই মৃত্যুকে নিকটতর করে।

তিনি যখন হাসতেন তখন তার চোখ দুটি বড় সুন্দর দেখাত—কেমন একটা নারী-সুলভ শান্তভাব ফুটে উঠত, নরম ও কোমল। আর তাঁর হাসি, প্রায় নিঃশব্দ হাসির মধ্যে এমন কিছু ছিল যা মনকে টানত। নিজের হাসি তিনি নিজেই উপভোগ করতেন। সেরকম ''অপার্থিব'' হাসি হাসতে পারে এমন কাউকে আমি জানি না।

চেখভ সম্পর্কে অনেক কথা লেখা যেত, কিন্তু তার জন্য দরকার ঘনিষ্ঠ, সঠিক বর্ণনা, আর সেটাই আমাকে দিয়ে হবার নয়। তার সম্পর্কে ঠিক সেইভাবে লিখতে হবে যেমন করে তিনি ''তৃণভূমি'' লিখেছেন—একটা গন্ধমদির খোলা আকাশের গল্প, একান্তভাবেই একটি রুশ গল্প, বিষাদমগ্ন চিন্তার আকর। যে গল্প শুধু নিজের জন্যই লেখা হয়।

এ রকম লোককে স্মরণ রাখলে নিজেরই কল্যাণ হয়; এ যেন প্রফুল্লতার একটা আকস্মিক আবির্ভাব; এর থেকে নতুন করে জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

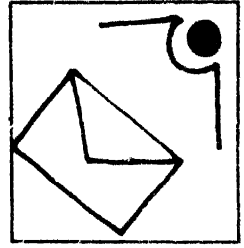
মানুষ পৃথিবীর অক্ষ-দণ্ড।

আপনি হয়তো প্রশ্ন করবেন, আর তার পাপ, তার ত্রুটিবিচ্যুতি?

আমাদের সহযাত্রী প্রাণীদের ভালবাসার জন্য আমরা সকলেই ক্ষুধার্ত আর যে মানুষ ক্ষুধার্ত তার মুখে আধপোড়া রুটিও মিষ্টি লাগে।

১৯১৪

পণ্ডিত প্রতিবেশীকে চিঠি



Letter to a Learned Neighbour

ব্লিনি-স্যেডেনির গ্রাম

প্রিয় প্রতিবেশী,

ম্যাক্সিম (আপনার পৈত্রিক নামটা ভুলে গেছি ; নিজগুণে ক্ষমা করবেন।) আমার এই অতিতুচ্ছ লিখিত বকবকানি দিয়ে আপনাকে বিরক্ত করার দুঃসাহসের জন্য একটি বুড়ো-হাবড়া বোকা মানুষকে ক্ষমা করবেন, মার্জনা করবেন। আজ পুরো এক বছর হয়ে গেল আমার মত একজন ক্ষুদ্র মানুষের প্রতিবেশীরূপে আমাদের জংলা গ্রামের এক কোণে আপনি দয়া করে একটি আস্তানা পেতেছিলেন ; অথচ এখনও পর্যন্ত আমি আপনাকে চিনি না, আর আপনিও আমার মত একটি তুচ্ছ ফড়িংকে চেনেন না। প্রিয়তম প্রতিবেশী, অনুমতি করুন যাতে আমার এই জরাজীর্ণ হস্তাক্ষরমাত্র সম্বল করে আপনার সমীপে আমার পরিচয় নিবেদন করতে পারি, মনে মনে আপনার পাণ্ডিত্যপূর্ণ হাতকে মর্দন করতে পারি, এবং সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে মুঝিক ও কৃষক অর্থাৎ সর্বহারা মানুষের বাসভূমি আমাদের এই অপদার্থ মহাদেশে আপনার আগমনের জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাতে পারি। দীর্ঘ দিন যাবৎ আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ খুঁজেছি, তার জন্য লালায়িতও ছিলাম, কারণ সভ্যতার মতই বিজ্ঞানও এক অর্থে আমাদের জননী ; আর সেই কারণেই যে সব ব্যক্তির নাম এবং পদমর্যাদা গৌরব, জয়মাল্য, করতালির ধ্বনি, নানা সম্মান, ফিতে এবং প্রশংসা-পত্রে ভূষিত হয়ে দৃশ্য ও অদৃশ্য এ জগতের সর্বত্র বজ্র ও বিদ্যুতের মতই সগর্জনে ঘোষিত হয়, তাদের আমি অন্তরের সঙ্গে পূজা করি। জ্যোতির্বিদ, কবি, দার্শনিক, অধ্যাপক, রসায়নবিদ এবং অন্য সব বিজ্ঞান সাধকদের আমি প্রগাঢ় ভালবাসি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আপনার কুশলী অবদানের জন্য অর্থাৎ ফসল ও ফলের জন্য আপনিও তো তাদেরই অন্যতম। লোকে বলে, বুদ্ধি খেলিয়ে পাইপ, থার্মোমিটার আর গাদা গাদা সচিত্র বিদেশী বইয়ের সাহায্য নিয়ে আপনি অনেক বই ছাপিয়েছেন। সম্প্রতি আমার এই হতভাগ্য দেশে আমারই জঞ্জাল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এসেছিলেন আমার প্রতিবেশী গেরসিমভ। স্বীয় স্বভাবসুলভ স্বধর্মপরবশতায় মানুষের আদি উৎস এবং পরিদৃশ্যমান জগতের অন্য নানা ঘটনা প্রসঙ্গে আপনার চিন্তাধারা এবং ধারণার বিরুদ্ধে তিনি অনেক নিন্দাবাদ করলেন, প্রচুর বিষোদ্গার করলেন।

এমন কি উঠে দাঁড়িয়ে আপনার যে মানসিক পরিমণ্ডল ও চিন্তা ভাবনার দিগন্ত অজস্র তারকায় খচিত এবং পাথরেও অক্ষরে ক্ষোদিত তার

বিরুদ্ধেও লম্বা-চওড়া বক্তৃতা করলেন। আপনার চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারে আমি গেরসিমভ-এর সঙ্গে একমত নই, কারণ বিধাতা পুরুষ মানব জাতিকে বিজ্ঞান দিয়েছেন যাতে সে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের অভ্যন্তর থেকে খননকার্যের সাহায্যে তুলতে পারে বহুমূল্যবান ধাতু, ধাতুপিণ্ড ও হীরক; আর আমি বেঁচে আছি, পুষ্টিলাভ করেছি একমাত্র বিজ্ঞানের জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি অকর্মণ্য বৃদ্ধের মত আমি যদি প্রকৃতির মূল পদার্থ সম্পর্কে আপনার কিছু কিছু ধারণার প্রতিবাদ করায় সাহসী হই, তাহলে, মহাশয়, প্রায় অদৃশ্য একটি তুচ্ছ ফড়িং মনে করে আমাকে ক্ষমা করবেন। গেরাসিমভ আমাকে বলেছেন, মানুষ এবং তার প্রথম জন্মের অবস্থা এবং মহাপ্লাবনপূর্ববর্তী কাল সম্পর্কে আপনার দেওয়া তথ্যাদি সঠিক নয়। আপনি বলেন মানুষ এসেছে "মার্মোসেট্স্কি", "ওরাং-উটাংস্কি", ও অনুরূপ জীবন-গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত বানর জাতি থেকে। বুড়ো মানুষ বলে আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত নই এবং এ নিয়ে আপনার সঙ্গে বিতর্কে বসতেও রাজী আছি। কারণ পৃথিবীর অধিশ্বর, জীবিত প্রাণীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কুশলী এই মানুষ যদি নির্বোধ, অসভ্য বানর জাতির বংশধর হত তাহলে তার একটা লেজ থাকত; তার কণ্ঠস্বর হত পশুর মত বর্বর। আমরা যদি বানরদের বংশ থেকে আসতাম তাহলে আজ জিপ্‌সিরাই আমাদের নিয়ে শহরে শহরে খেলা দেখিয়ে বেড়াত, আর আমরা জিপ্‌সির হুকুমে নেচে নেচে অন্যদের আনন্দের খোরাক যোগাতাম। আমাদের সারা শরীর কি লোমে ঢাকা তাহলে? আমরা কি পোশাক পরি না যা বানরদের নেই? প্রতি শুক্রবার "অভিজাত পরিষদ"-এর মার্শালের বাসভবনে যে দৃশ্য আমরা দেখি সেই রকম কোন স্ত্রীলোকের গায়ে তিলমাত্র বানরের গন্ধ থাকলেও আমরা কি তাকে ঘৃণার বদলে ভালবাসতাম না? আমাদের পূর্বপুরুষরা যদি বানরের বংশধরই হত তাহলে তো খৃস্টান গোরস্থানে তাদেব কবর দেওয়া হত না; দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমার প্র-পিতামহ আমব্রোসি, যিনি অনেক কাল আগে পোল্যাণ্ড রাজ্যে বাস কবতেন তাকে কবব দেওয়া হয়েছিল বানরদের মত নয়, ক্যাথলিক মঠাধ্যক্ষ যোয়াকিম স্‌জোস্তাক-এর ঠিক পাশে; সেই মঠাধ্যক্ষের নিজের হাতে লেখা নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া এবং অতিরিক্ত মধ্যপান সংক্রান্ত মন্তব্যগুলি আজও আমার ভাই আইভান (মেজর)-এর কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে। মঠাধ্যক্ষ ছিলেন ক্যাথলিক পুরোহিত। আপনার মত পণ্ডিতজনের ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করছি, অথর্ব বৃদ্ধের মতই আপনার সঙ্গে তর্ক করছি, এবং যে সব মোটাদাগের নিরেস ধারণাকে বিজ্ঞানী ও সভ্য মানুষরা মাথায় না রেখে পেটেই চালান করে দেন আমার সেই সব ধারণাকে আপনার উপর চাপিয়ে দিচ্ছি বলে এই আনপড় গণ্ডমূর্খকে মার্জনা করবেন।

বিজ্ঞানীরা যখন ভুল পথে চিন্তা করেন আমি তখন চুপ করে থাকতে পারি না, সহ্য করতেও পারি না, প্রতিবাদ না কবে থাকতে পারি না।

গেরসিমভ আমাকে জানিয়েছেন, আপনি চাঁদ সম্পর্কে, তার মানে মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে সেই বিষণ্ণ অন্ধকারের সময়ে আমাদেব জন্য আকাশপথের যে বস্তুটি সূর্যের স্থানটি গ্রহণ করে তার সম্পর্কে আপনি ভুল চিন্তা কবেন ; আপনি যখন বিদ্যুৎ-শক্তিকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চালান কবেন এবং অবাস্তব কল্পনার জাল বোনেন, তখনও আপনি ভুল চিন্তা করেন। বোকার মত এই সব কথা লিখছি বলে বুড়ো মানুষটার দিকে তাকিয়ে হাসবেন না। আপনি লিখেছেন মানুষ ও অন্য জীবরা চাঁদে বাস করে। এটা হতে পারে না, কারণ চাঁদে যদি মানুষ বাস করত তাহলে তাদের বাড়ি-ঘর ও ফসল-ভরা ক্ষেত দিয়ে চাঁদের সব জাদু ও মন-ভোলানো আলো তারা ঢেকে দিত। বৃষ্টি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না, কিন্তু বৃষ্টি তো ঝরে পড়ে নীচের দিকে পৃথিবীতেই, উপরের দিকে চাঁদে নয়। যে সব মানুষ চাঁদে বাস করে তারা তো নীচের পৃথিবীতেই এসে পড়ত, কিন্তু তা তো ঘটে না। মনুষ্যঅধ্যুষিত চাঁদ থেকে অনেক জঞ্জাল ও ময়লা জল আমাদের মহাদেশেব উপর এসে পড়ত। চাঁদ যদি কেবল রাতেই থাকে, আর দিনের বেলা অদৃশ্য হয়ে যায় তাহলে কি চাঁদে মানুষ বাস করতে পাবে? আবার সরকারও মানুষকে চাঁদে বাস করাব অনুমতি দিতে পারে না, কারণ দীর্ঘ দূরত্ব ও অগম্যতাব দরুণ তাদের পক্ষে কর ফাঁকি দেওয়া খুব সহজ হয়ে যাবে। আপনার একটু ভুল হয়েছে। গেরসিমভ আমাকে বলেছেন, আপনার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় আপনি নাকি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন যে আমাদের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্ক সূর্যের দেহে কালো কালো দাগ আছে। এটা হতে পারে না। কারণ এরকম কখনও হয় নি। মানুষেব পক্ষে যদি খোলা চোখে সূর্যের দিকে তাকানো অসম্ভবই হয় তাহলে সূর্যের গায়ের কালো দাগ আপনি দেখলেন কেমন করে? আর সে সব দাগ না থাকলেও যদি সূর্যের চলে যায়, তাহলে সে দাগ সে চাইবেই বা কেন? সেই আর্দ্র পদার্থটাই বা কি যা দিয়ে সেই সব দাগ সৃষ্টি হয়, অথচ জ্বলে ওঠে না? আপনার মতে তাহলে মাছরাও কি সূর্যে বাস করে? এ রকম একটা বাজে ঠাট্টার কথা বলেছি ব'লে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ভয়ংকরভাবে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত। যে রুব্‌ল্‌ উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান পরিচালক তাও আমার কাছে মূল্যহীন ; ভবিষ্যতের ডানা মেলে দিয়ে বিজ্ঞান আমার চোখ থেকে রুব্‌ল্‌কে মুছে ফেলেছে। প্রতিটি আবিষ্কার পিঠের ভিতরকার পেরেকের মতই আমাকে যন্ত্রণা দেয়। যদিও আমি একজন মূর্খ, সেকেলে জমিদার, তবু আমি কোন কাজের নই। আমি কেবল বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করি, নিজের হাতে নতুন নতুন আবিষ্কার করি, এবং নতুন নতুন চিন্তা দিয়ে, সারি সারি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দিয়ে আমার নির্বোধ মাথাটাকে আর বর্বর খুলিটাকে ভরে তুলি। জননী প্রকৃতি এমন একখানি পুঁথি যাকে অবশ্যই পড়তে হবে, অবশ্যই দেখতে হবে। নিজের মস্তিষ্ক দিয়েই আমি অনেক আবিষ্কার করেছি, এমন সব আবিষ্কার যা আজ পর্যন্ত অন্য কোন সংস্কারক এককভাবে করতে পারে নি। কোন রকম গর্ব না করেই আমি বলব,

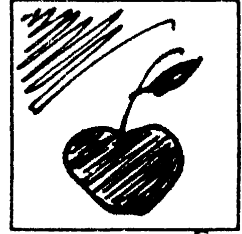
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিদ্যার্জনই হোক, আর বাবা-মার বা অভিভাবকের বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারেই হোক, কোন দিক থেকেই আমি পিছিয়ে নেই ; অথচ ওই বাবা-মা-অভিভাবকরাই অনেক সময় বিষয়-সম্পদ, বিলাস-ব্যসন এবং ক্রীতদাস ও বৈদ্যুতিক ঘন্টা সমেত সাত-তলা বাড়ি দিয়ে ছেলে-মেয়েদের উচ্ছন্নে দেয়। আমার এই দু' পেনি—আধ পেনি দামের মাথা দিয়ে আমি এ সব আবিষ্কার করেছি। আবিষ্কার করেছি, বছরে একদিন সকালে আমাদের আগুন ছড়ানো টুপি-পরা সূর্য অনেকখানি রং নিয়ে এক বিচিত্র সুন্দর খেলা দেখায়, যাতে সকলেই খুব মজা উপভোগ করে। দ্বিতীয় আবিষ্কার। শীতকালে কেন দিন ছোট হয় আর রাত বড় হয়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে হয় ঠিক তার উল্টো? শীতকালে দিন ছোট হয়, কারণ দৃশ্য-অদৃশ্য অন্য সব বস্তুর মত দিনগুলিও ঠাণ্ডায় সংকুচিত হয় এবং সূর্য অনেক আগে অস্ত যায় ; কিন্তু নানা রকম বাতি ও লণ্ঠন জ্বালাবার ফলে গরম হয়ে যায় বলে রাতগুলি প্রসারিত হয়। আরও আবিষ্কার করেছি, বসন্তকালে কুকুরও ভেড়ার মত ঘাস খায়, সতেজ ব্যক্তিদের পক্ষে কফি খাওয়া ক্ষতিকারক, কারণ তাতে মাথা ঘোরে, আর চোখের দৃষ্টি আবছা হয়ে যায়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ ছাড়া, আরও অনেক আবিষ্কার করেছি, কিন্তু তার কোন প্রশংসাপত্র আমার কাছে নেই। প্রিয় প্রতিবেশী, ঈশ্বরের দোহাই, আপনি একটিবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করুন। আমরা দু'জন একত্রে একটা কিছু আবিষ্কার করব, সাহিত্য নিয়ে মেতে থাকব, আমার মত এক হতভাগ্যকে আপনি শেখাবেন নানা রকমের হিসাবপত্র।

আমি সম্প্রতি এক ফরাসী বিজ্ঞানীর লেখায় পড়েছি, যদিও বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে সিংহের নাক-মুখ অনেকটা সিংহের মত, আসলে কিন্তু তা নয়। সে বিষয় নিয়েও আমরা কথা বলতে পারব। দয়া করে এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করুন। পারলে কালই আসুন। আমরা এখন ''লেন্ট'' উৎসব পালন করছি। আপনার জন্যও মাংস রান্না হবে। আমার মেয়ে নাতাশা আপনাকে জানাতে বলেছে, তার জন্য কয়েকটা ভাল বই আনবেন : সে এখন স্বাধীন ; আমাদের মধ্যে একমাত্র সেই বুদ্ধিমতী। আপনাকে জানিয়ে রাখি, আজকের তরুণ সমাজ নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে। তাদের ভাগ্য প্রসন্ন হোক। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমার ভাই আইভান (মেজর) এখানে আসছে ; চমৎকার লোক, কিন্তু—নিজেদের মধ্যে বলছি—একটু অমার্জিত, আর বিজ্ঞানের ধার ধারে না। আমার নায়েব ট্রফিম সন্ধ্যা ঠিক ৮টার সময় এই চিঠি আপনার হাতে পৌঁছে দেবে। সে যদি চিঠি দিতে দেরী করে তাহলে অধ্যাপকের মতই তার সঙ্গে কড়া ব্যবহার করবেন, কোন রকম বাজে কথায় কান দেবেন না। চিঠি দিতে দেরি হওয়া মানেই সে রাস্কেল নির্ঘাৎ কোন শুঁড়িখানায় ঢুকেছিল। প্রতিবেশীর বাড়িতে আসা-যাওয়ার প্রথাটা আমরা আবিষ্কার করি নি, আর আমাদের সঙ্গেই শেষও হয়ে যাবে না। অতএব আপনার যন্ত্রপাতি ও বইপত্র নিয়ে অবশ্যই আসবেন। আমিও যাব,

আপনার সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু আমি বড়ই লাজুক, আর অতটা সাহসও আমার নেই। আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে এ অপদার্থ লোকটিকে ক্ষমা করবেন।

আমি, আপনার অনুগত ভৃত্য, "ডন আর্মি"-র অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট ও অভিজাত পরিষদের সদস্য, আপনার প্রতিবেশী,

১৮৮০ ভাসিলি সেমি-বুলাতভ।



আপেলের জন্য

All Because of Appples

পণ্টাস ইউক্সিনাস (কৃষ্ণ সাগরের প্রাচীন গ্রীক নাম) এবং সোলোভকি-র (শ্বেত সাগরের সোলোভেটস্কি দ্বীপপুঞ্জ) মধ্যবর্তী কোন স্থানে অনেক কাল আগে বাস করত এক ছোট জমিদার। তার নাম ত্রাইফন সেমিওনোভিচ। তার উপাধিটা দীর্ঘ; অসংখ্য মানবিক গুণাবলীর অন্যতম গুণের অর্থবহ আড়ম্বরবহুল একটি লাতিন শব্দ থেকে সেটি এসেছে।

সে ৩০০০ ডেসিয়াতিন (১ ডেসিয়াতিন=২৭ একর) কালো জমির মালিক। তার মর্টগেজ-দেওয়া জমিদারী নীলামে উঠেছে। সে ব্যাপারে কথাবার্তা যখন শুরু হয়েছিল তখন ত্রাইফন সেমিওনোভিচের মাথায় কোন টাক ছিল না; সেই লেনদেনের ব্যাপারটা আজও চলছে; এবং ব্যাংকের বিশ্বাসপ্রবণতা ও ত্রাইফন সেমিওনোভিচের বাকচাতুর্যকে ধন্যবাদ, চলেছে বেশ খারাপের দিকেই। সেই ব্যাংকটি যে কোন দিন পটল তুলবে কারণ ত্রাইফন সেমিওনোভিচের মত লোকরা (তাদের সংখ্যা গণনাতীত) রুবল্ ধার চায় কিন্তু সুদ দেয় না, আর যদিও মাঝে মধ্যে সুদটা দে; তখনও প্রচণ্ড গোলমাল করে। এই জগৎটা যদি এই জগৎ না হত, আর প্রতিটি জিনিসকে তার সঠিক নামে ডাকা হত, তাহলে ত্রাইফন সেমিওনোভিচকে ঐ নামের বদলে অন্য নামে ডাকা হত; তাকে ডাকা হত ঘোড়া-গরুর নামে। খোলাখুলি বলতে গেলে, ত্রাইফন সেমিওনোভিচ একটি আস্ত পশু। তাকে ডেকেই আমি বলছি, সে নিজে এসে একথা স্বীকার করুক। এই ডাক যদি তার কানে পৌঁছায় (মাঝে মাঝে সে দি "ড্রাগন ফ্লাই" পত্রিকাটি পড়ে) তাহলে সম্ভবত সে রাগ করবে না, কারণ একজন সমঝদার মানুষ হিসাবে সে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হবে; হ্যাঁ আমি যে তার দীর্ঘ উপাধিটা ফাঁস করে দিই নি, এবং এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তার প্রথম নাম ও পৈত্রিক নামটাই উল্লেখ করেছি, তার জন্য উদারতাবশতঃ সে হয়তো আগামী হেমন্তকালে একডজন আন্তোনোভ্কা আপেলই আমাকে পাঠিয়ে দেবে। ত্রাইফন সেমিওনোভিচের সবগুলি গুণের তালিকা আমি দেব না; সেটা একটা দীর্ঘ

কাহিনী। হাত-পা সমেত গোটা ত্রাইফন সেমিওনোভিচের কথা লিখতে হলে আমাকে ঠিক ততটা সময় দিতে হবে যতটা সময় ইউজেন সুকে দিতে হয়েছে তার মোটা ও লম্বা "দি ওয়াণ্ডারিং জু" বইটা লিখতে। হুইস্ট খেলায় তার চিটিংবাজির কথা, অথবা ঋণের টাকা বা তার সুদের টাকা ফেরৎ না দেবার ব্যাপারে তার কৌশলের কথা, অথবা গির্জার পুরোহিত বা তার অনুচরের সম্পর্কে তার ঠাট্টা-মস্করার কথা, অথবা কেইন এবং আবেল-এর আমলের পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে গ্রামের পথ-ঘাট চষে বেড়ানোর কথা—সে সব কিছুই আমি বলব না ; আমি শুধু একটি ঘটনার উল্লেখ করব যাতে অল্প কথায় কৃষকদের সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাবে। এক শতাব্দীর ত্রি-চতুর্থাংশ কাল ধরে স্বীয় দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেই তো রচনা করেছে নিম্নলিখিত দাঁত-ভাঙা বাণী-স্তবকটিঃ Country bumpkins dump rumps and trumps chums.[(গ্রামের গোঁয়ার-গোবিন্দ চাষারা শিরদাঁড়ার হাড়গোড়ের জঞ্জাল ফেলে খড়ের গাদায়, আর অন্য বোকা লোকদের দেখে ভেঁপু বাজায়)।

একদা এক মনোরম প্রভাতে (সময়টা ছিল গ্রীষ্মের শেষ) ত্রাইফন সেমিওনোভিচ নিজের সবুজ বাগানের ছোট-বড় সাজানো পথ ধরে হাটছিল। কবি নামক ভদ্রজনরা যা দেখে অনুপ্রাণিত হন সেরকম সব কিছুই যেন অকৃপণ হাতে তার চার দিকে ছড়িয়ে রাখা ছিল ; মনে হচ্ছিল, তারা যেন গানে গানে বলছে ঃ এই বেলা গুছিয়ে নিন মশায়! হেমন্ত আসার আগেই যতটা পারেন ভোগ করে নিন!" কিন্তু এই ত্রাইফন সেমিওনোভিচ কিছুই ভোগ করছিল না, কারণ সে মোটেই কবি নয়, আর তাছাড়া, তাস খেলায় হেরে গেলে যেমন হয় সেই রকম "একটা শীতল নিদ্রালুতা তার আত্মাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।" ত্রাইফন সেমিওনোভিচের পিছনেই হাটছিল তার বিশ্বাসী ঠিকে চাকর কার্পুশ্‌কা। লোকটির বয়স ষাট বছরের উপর। পথের দুই দিকে চোখ রেখে সে হাটছিল। এই কার্পুশ্‌কার অনেক গুণ। স্বয়ং ত্রাইফন সেমিওনোভিচের চাইতে সে এক কাঠি সরেস। সে সুন্দর জুতো পালিশ করতে পারে, অবাঞ্ছিত কুকুরগুলোকে ফাঁসিতে লটকাতে পারে আরও সুন্দরভাবে, সকলের সব কিছু লুঠ করতে পারে ; এক কথায়, সে কর্তা-ভজাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ। কেরাণিকে অনুকরণ করে সারা গ্রামের লোকই তাকে "কর্তা-ভজা" বলে ডাকেন। এমন একটা দিন কদাচিৎ যায় যেদিন কৃষক এবং প্রতিবেশীরা কার্পুশ্‌কার নৈতিক জীবন ও অভ্যাস সম্পর্কে নালিশ জানায় না ; কিন্তু সে সব নালিশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়, কারণ ত্রাইফন সেমিওনোভিচের সংসারে কার্পুশ্‌কা অপরিহার্য। ত্রাইফন সেমিওনোভিচ যখন বেড়াতে বের হয় তখন বিশ্বস্ত কার্পুশ্‌কাকে সব সময় সঙ্গে নেয়। সেটাই তার পক্ষে নিরাপদ ও মজাদার। কার্পুশ্‌কার ঝুলিতে থাকে নানা রকমের হাসি কৌতুক, প্রবাদ-কথা, ও টুকরো টুকরো ঘটনার অফুরন্ত ভাণ্ডার ; আর সে কখনও চুপচাপ থাকতেও পারে না। সব সময়

বকবক করে ; একমাত্র কেউ মজাদার কিছু বললে তখন কান পেতে শোনে। পূর্ববর্ণিত সকালে সে মালিকের পিছন পিছন হাঁটছিল, আর তাকে বলছিল উচ্চ বিদ্যালয়ের দুটি ছাত্রের একটা দীর্ঘ গল্প। সাদা টুপিপরা ছাত্র দুটি ঘোড়ার পিঠে চেপে রাইফেল নিয়ে বাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কিছু শিকার করার জন্য বাগানে ঢোকার অনুমতি চাইল কার্পুশ্‌কার ; এমন কি একটা আধ রুবলের লোভও তাকে দেখাল ; কিন্তু সে তো ভালরকমই জানে কোন্ মনিবের চাকরি সে করে, তাই সে ক্ষোভের সঙ্গে আধ রুব্‌লটা প্রত্যাখ্যান করল এবং দুই কুকুর কাশ্‌তান ও সেরককে তাদের দিকে লেলিয়ে দিল। গল্পটা শেষ করে গ্রাম্য ডাক্তারটির কুৎসিত জীবন-যাত্রাকে নানা রং-চং লাগিয়ে বর্ণনা করতে শুরু করল—কিন্তু সেটা আর করা হল না, কারণ বাগানের ভিতর থেকে একটা শব্দ শুনতে পেয়ে কার্পুশ্‌কা মুখ বন্ধ করে কান খাড়া করল। সত্যি যে একটা কিছু সড়্ সড়্ শব্দ করছে এবং শব্দটা সন্দেহজনক সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সে মালিকের জামার কোণটা টেনে দিয়েই তীরগতিতে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গেল। ত্রাইফন সেমিওনোভিচও একটা তামাসার গন্ধ পেয়ে নড়েচড়ে উঠে বার্ধক্যজীর্ণ পা দুটিকে চালিয়ে কার্পুশ্‌কার পিছন পিছন ছুটে গেল। এবং ছুটে যাবার মত কিছু সত্যি সেখানে ছিল......

বাগানের শেষ প্রান্তে একটা বড় ঝাকড়া আপেল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একটি চাষী মেয়ে কি যেন চিবুচ্ছে, আর চওড়া কাঁধ একটি যুবক তার কাছেই হাঁটুর উপর উপুড় হয়ে বাতাসে মাটিতে পড়া আপেল কুড়োচ্ছে। সে কাঁচা আপেলগুলো ঝোপের ভিতর ছুঁড়ে দিচ্ছে, আর পাকাগুলোকে নিজের চওড়া রুক্ষ হাতের পাতায় রেখে আদর করে বাড়িয়ে ধরছে ডাল্‌সিনিয়ার (সার্ভান্টিসের "ডন কুইকজোট" গ্রন্থের নায়িকা) দিকে। নিশ্চয় ডাল্‌সিনিয়ার পেট খারাপ হবার ভয় ছিল না ; সে পরমানন্দে একের পর এক আপেল খেয়ে চলেছে একটানা, আর যুবকটিও হামাগুড়ি দিয়ে আপেল তুলতে তুলতে নিজের সব কাজকর্ম বেমালুম ভুলে গিয়ে ডাল্‌সিনিয়ার দিকেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

তাকে সাহস দিয়ে মেয়েটি ফিসফিসিয়ে বলল, "গাছ থেকে কয়েকটা পেড়ে দাও!"

"আমার ভয় করে।"

"কিসের ভয় তোমার? তুমি বাজী ধরতে পার, কর্তা-ভজাটা এখন শুঁড়িখানায়...."

যুবকটি উঠে দাঁড়াল। এক লাফে গাছ থেকে একটা আপেল ছিঁড়ে মেয়েটিকে দিল। কিন্তু সেকালের আদম ও ঈভের মতই এই আপেলই তাদের কাল হল। যে মুহূর্তে এক কামড় খেয়ে আপেলটা যুবকের হাতে দিল আর দু'জনেরই জিভে লাগল তার ঈষৎ অম্ল স্বাদ অমনি তাদের মুখ বিকৃত হয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠল।. .আপেলটা টক বলে নয়, ত্রাইফন সেমিওনোভিচের

কঠোর মুখ আর কার্পুশ্‌কার কুৎসিত মুখ দেখে ; দু'জনেই হিংস্র দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

ত্রাইফন সেমিওনোভিচ একটু এগিয়ে বলল, "কেমন আছ বাবারা! আপেল খাচ্ছ ? আমি তোমাদের কোন অসুবিধা ঘটাই নি তো ?"

যুবকটি টুপি খুলে মাথা নিচু করল। মেয়েটি দৃষ্টি দিল তার এপ্রনের দিকে। ত্রাইফন সেমিওনোভিচ যুবককে বলল, "আচ্ছা গ্রিগরি, তোমার শরীর কেমন আছে ? কেমন আছ বল বাবা।"

যুবকটি আমতা আমতা করে বলল, "মাত্র একটা, তাও ঝড়ে পড়েছিল।"

ত্রাইফন সেমিওনোভিচ এবার মেয়েটিকে শুধাল, "তোমার শরীর কেমন আছে মামণি ?"

মেয়েটি নিজেই এপ্রনের সূঁচি শিল্পই খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

"তোমার বিয়ে কি হয়ে গেছে ?

"এখনও হয় নি .. মাত্রই একটা মালিক। আমি শপথ করে বলছি।"

"ভাল, ভাল। বেশ করেছ, তুমি পড়তে পার ?"

"না... কিন্তু আমি শপথ করে বলছি, মাত্রই একটা, তাও ঝড়ে পড়া. ."

"কেমন করে পড়তে হয় তা জান না, কিন্তু কেমন করে চুরি করতে হয় সেটা জান। বেশ তো, যা করেছ তা করেছ, তাতে আর কি হয়েছে। কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না। তুমি কি অনেক দিন ধরেই চুরিটা চালিয়ে যাচ্ছ ?"

"তার মানে—আমি একটা চোর!"

এবার কার্পুশ্‌কা যুবককে বলল, "আর তোমার সুন্দরী মনের মানুষটি। তাকে অমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন ? তুমি কি তাকে ঠিকমত ভালবাস না ?"

ত্রাইফন সেমিওনোভিচ বলল, "চুপ কর্‌ কার্পুশকা ! আচ্ছা গ্রিগরি, এবার তাহলে একটা গল্প বানিয়ে বলে দাও।"

গ্রিগরি একটু কাশল, তারপর হাসল।

বলল, "আমি গল্প বানাতে জানি না। আর আপনার আপেল নিয়েই বা আমি কি করব ? দরকার হলে আমি কিনেই নিতে পারি।"

"তোমার অনেক টাকা আছে জেনে খুবই খুশি হলাম বাবা সোনা। অতএব একটা গল্প শুনিয়ে দাও। আমি শুনব, কার্পুশ্‌কা শুনবে, তোমার সুন্দরী কনেটিও শুনবে। এতে লজ্জার কি আছে, আরও একটু সাহসী হও! চোরের সাহস থাকা দরকার। ঠিক কথা বলি নি বন্ধু ?"

ত্রাইফন সেমিওনোভিচের ইতর দৃষ্টি যুবকটির উপর স্থিরনিবদ্ধ। যুবকটির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল।

কার্পুশ্‌কা হেঁড়ে গলায় বলল, "ওকে বরং গান গাইতে বলুন মালিক। ও বোকা কেমন করে গল্প বানাবে ?"

"থাম কার্পুশ্‌কা,আগে ও একটা গল্প বলুক। বল, লক্ষ্মী ছেলের মত বলে দাও।"

"আমি গল্প জানি না।"

"সত্যি জান না? কিন্তু চুরি করতে জান তো? অষ্টম অনুজ্ঞায় (Eighth Commandment) কি বলে?"

"আপনি এসব কি প্রশ্ন করছেন? আমি কি এসব জানি! ঈশ্বরেব দোহাই, আমরা মাত্র একটা আপেল খেয়েছি, আর তাও ঝড়ে পড়া..."

"একটা গল্প বল!"

কার্পুশ্‌কা বিচুটির গাছ তুলতে শুরু করল। সে গাছ দিয়ে কি হবে যুবক তা ভালই জানে। ত্রাইফন সেমিওনোভিচ তার শ্রেণীর অন্য সকলের মতই নিজের হাতে আইন তুলে নিতে অভ্যস্ত। চোরকে হয় চল্লিশ ঘণ্টার জন্য চোরকুঠুরিতে বন্দী করে রাখে, না হয় বিচুটির গাছ দিয়ে তাকে চাবকায়, নয় তো তাকে উলঙ্গ করে ছেড়ে দেয়... এটা কি আপনি নতুন শুনলেন? কিন্তু অনেক অঞ্চলে অনেকের কাছেই এটা খামারবাড়ির মালগাড়ির মতই একটা প্রচলিত পুরনো ঘটনা। গ্রিগরি বাঁকা চোখে বিচুটি গাছগুলির দিকে তাকাল, একটু কাশল এবং ঠিক গল্প বলা নয়, হড়বড় কি যেন বলতে শুরু করল। ঘেমে, কেশে, ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে কিছুক্ষণ পরে পরেই নাক ঝেড়ে সে বলতে শুরু করল, একসময়ে কস্‌কেসিস-এর (রুশ রূপকথার এক নিষ্ঠুর বৃদ্ধ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে রুশ বীররা সুন্দরীদের বিয়ে করত। ত্রাইফন সেমিওনোভিচ দাঁড়িয়ে সব কথা শুনল; গল্পকারের উপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি ফেরাল না।

গল্পের শেষের দিকে যুবকটি যখন সব কিছু তালগোল পাকিয়ে অর্থহীন প্রলাপ বকতে শুরু করল, তখন সে বলে উঠল, "যথেষ্ট হয়েছে। যথেষ্ট! তুমি একটা আশ্চর্য গল্প বলেছ, কিন্তু তোমার চুরিটা আরও ভাল।" তারপর মেয়েটির দিকে ফিরে বলল, "এবার সুন্দরী তুমি যীশুর প্রার্থনাটি আবৃত্তি কর।"

মেয়েটির মুখ লাল হয়ে উঠল। প্রায় দম বন্ধ করে অস্পষ্ট স্বরে "আমাদের পিতা" আবৃত্তি করল।

"আর অষ্টম অনুজ্ঞায় কি বলা হয়েছে?"

এবার যুবকটি বেপরোয়া হয়ে বলে উঠল, "আপনি কি ভেবেছেন যে আমরা অনেকগুলো নিয়েছি? আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আমার বুক চিরে দেখুন।"

"তোমরা দু'জনই যে অনুজ্ঞাগুলি জান না এটা ভাল কথা নয়। তোমাদের শেখাতে হবে। আচ্ছা সুন্দরী, এই যুবকই কি তোমাকে চুরি করতে শিখিয়েছে? ছোট্ট পরীটি আমার, তুমি কিছু বলছ না কেন? তোমার জবাব দেওয়া উচিত। কথা বল। বলবে না? মৌনই সম্মতির লক্ষণ। তাহলে সুন্দরী, তোমাকে চুরি করতে শিখিয়েছে বলে তোমার রূপবান সঙ্গীর গালে

চপেটাঘাত কর।"

"পারব না।"

"আস্তে করে একবার। বোকাদের তো উচিত শিক্ষা দিতেই হবে। চড় মার সোনা! মারবে না? ঠিক আছে। কার্পুশ্‌কা ও মাত্‌ভেইকে হুকুম করছি, তোমার গায়ে একটু বিছুটি ছুঁইয়ে দিক। তবু মারবে না?"

"পারব না।"

"কার্পুশ্‌কা এখানে এস!"

মেয়েটি ছুটে গিয়ে যুবকের মুখে এক চড় কসিয়ে দিল। দাঁতে দাঁত চেপে যুবকটি কেঁদে ফেলল।

"খুব ভাল মেরেছ সুন্দরী! এবার ওর চুল ধরে টান। চুল ধর। ধরবে না? কার্পুশ্‌কা, এখানে এস!"

মেয়েটি তার বাগদত্তর চুল ধরে টানল।

"ছেড়ে দিও না। তাহলে ও বেশী আঘাত পাবে। জোরে টান!"

মেয়েটি টানতে শুরু করল। কার্পুশ্‌কা খুশিতে আত্মহারা; হো-হো করে হাসতে লাগল; তার সারা শরীর কাঁপতে শুরু করল।

ত্রাইফন সেমিওনোভিচ্‌ বলল, "খুব হয়েছে। অন্যায়ের শাস্তি দিয়েছ বলে তোমাকে ধন্যবাদ সোনা।" ছেলেটির দিকে ফিরে বলল, "এবার তোমার তরুণীকে একটু শিক্ষা দাও সে তোমাকে শিক্ষা দিয়েছে, তুমিও তাকে শিক্ষা দাও"

"ঈশ্বরের দোহাই মালিক, এসব আপনি কি বলছেন?...ওকে কিসের জন্য মারব?"

"কিসের জন্য মানে? সে তোমাকে মারে নি? এবার তুমি তাকে মার; তাতে তার ভালই হবে। তুমি তা চাওনা? খুব খারাপ। কার্পুশ্‌কা, মাত্‌ভেইকে ডাক।"

ছেলেটি থুতু ফেলল, দাঁত মুখ খিঁচল, মেয়েটির চুলের মুঠি ধরে অন্যায়ের শাস্তি দিতে লাগল। সে যে কি করছে তা নিজেই বুঝতে পারছে না; আবেগের বশে ভুলেই গেল যে সে ত্রাইফন সেমিওনোভিচ্‌কে মারছে না, মারছে তারই প্রিয়তমাকে। মেয়েটি আর্তনাদ করতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে সে মেয়েটিকে মারল। ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে শেষ হত আমি জানি না; হঠাৎই ত্রাইফন সেমিওনোভিচের সুন্দরী মেয়ে সাশেংকা এক লাফে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

চেঁচিয়ে বলল, "বাপি চা খাবে এস।" তারপরেই বাবার খেয়ালিপনা দেখে হো-হো করে হাসতে লাগল।

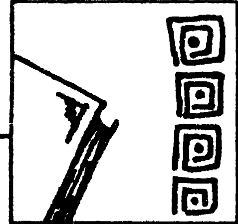
ত্রাইফন সেমিওনোভিচ বলল, "খুব হয়েছে। এবার তোমরা যেতে পার সোনারা। বিদায়। তোমাদের বিয়ের সময় আপেল পাঠিয়ে দেব।" প্রহারজর্জরিত যুগল মূর্তির সামনে সে মাথাটা নোয়াল।

ছেলে-মেয়ে দুটি পোশাকপত্র ঝেড়ে সেখান থেকে চলে গেল। ছেলেটি

গেল ডান দিকে, মেয়েটি বাঁ দিকে। আর কখনও দু'জনের দেখা হয় নি। আর সাশেংকা যদি সেখানে হাজির না হত তাহলে ছেলে-মেয়ে দুটিকে হয় তো বিছুটির স্বাদও পেতে হত।... বুড়ো বয়সে ত্রাইফন সেমিওনোভিচ এই ভাবেই মজা করে। আর তার পরিবারের লোকরাও এই ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। "নীচু শ্রেণীর অতিথি" বাড়িতে এলে তার মেয়েরা তাদের টুপির সঙ্গে পেঁয়াজ সেলাই করে দেয়; আর ঐ শ্রেণীরই মাতাল অতিথি এলে তাদের পিঠে চক দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লিখে দেয় "গাধা"। তার ছেলে অবসরপ্রাপ্ত, নিম্নপদস্থ কর্মচারি মিতিয়া বাপের উপরেও এক কাঠি বেশী: এক শীতকালে সে ও কার্পুশ্‌কা দ'জনে মিলে এক অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকের ফটকে আলকাতরা মাখিয়ে দিয়েছিল। এটা অতি গর্হিত কাজ; তার অপরাধ মিতিয়াকে একটা নেকড়ে-শাবক উপহার দিতে অস্বীকার করেছিল এবং অবসরপ্রাপ্ত নিম্নপদস্থ কর্মচারীটার দেওয়া আদা-রুটি ও মিষ্টি খাবার গ্রহণ করার ব্যাপারে মেয়েদের স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছিল।

তারপরেও কি ত্রাইফন সেমিওনোভিচকে ত্রাইফন সেমিওনোভিচ বলেই ডাকতে হবে!

১৮৮০



জমিদার বাড়ির গিন্নি

The Lady of the Manor

দুটো সুন্দর ভিয়াৎকা টাট্টু ঘোড়ায় টানা কালাশ গাড়িটা শুকনো, ধূলো-মাখা ঘাসের উপর দিয়ে চলেছে ম্যাক্সিম ঝুরকিনের কাঠের বাড়িটার দিকে। গাড়িতে বসে আছে জমিদার-গিন্নি এলেনা ইগোরভ্‌না স্ত্রেল্‌কোভা, এবং তার ম্যানেজার ফেলিক্স আদামোভিচ রেজেউইকি। এক লাফে কালাশ থেকে নেমে ম্যানেজার বাড়িতে ঢুকে তর্জনী দিয়ে জানালার কাঁচে টোকা মারল। ভিতরে একটা আলো জ্বলে উঠল।

"কে ওখানে?" একটি বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। জানালায় দেখা দিল ম্যাক্সিমের স্ত্রীর মুখ।

মহিলা বলল, "একটু বাইরে এস তো বুড়িমা।"

একটু পরেই ম্যাক্সিম ও তার স্ত্রী বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ফটকে দাঁড়িয়েই তারা নিঃশব্দে অভিবাদন জানাল, প্রথমে জমিদার-গিন্নিকে, তারপর তার ম্যানেজারকে।

এলেনা ইগোরভ্‌না বৃদ্ধকে বলল, "দয়া করে আমাকে বল তো এসবের মানে কি?"

"এসব বলতে?"

''তুমি কি বলতে চাও তুমি জান না? স্তেপান বাড়ি আছে?''

''না। সে কলে গেছে।''

''সে কি চায়? লোকটাকে আমি মোটেই বুঝতে পারি না। কেন সে আমাকে ছেড়ে দিল?''

''তা আমরা জানি না কর্ত্রী। কেমন করে জানব।''

''সে খুব খারাপ কাজ করেছে। সে চলে আসায় আমার কোন কোচোয়ান নেই। তাকে বহুৎ ধন্যবাদ। ফেলিক্স আদামোভিচ নিজেই ঘোড়া জুতছে, নিজেই গাড়ি চালাচ্ছে! কী ভয়ংকর নষ্টামি। দয়া করে বুঝতে চেষ্টা কর, এটা সত্যি তার নষ্টামি। সে কি বোঝে না যে তাকে যথেষ্ট মাইনে দেওয়া হচ্ছে।''

ম্যানেজার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল। তার দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বৃদ্ধ জবাব দিল, ''যিশু খৃস্টই জানেন! সে কখনও আমাদের কাছে কিছু বলে না; আমরা তো তার মনেব কথা বুঝতে পারি না। 'আমি ছেড়ে দিচ্ছি', শুধু এই কথাটাই সে বলেছে! এটা তাব নিজস্ব সিদ্ধান্ত। মনে হয়, তার ধাবণা সে যথেষ্ট মাইনে পাচ্ছিল না।''

জানালা দিয়ে তাকিয়ে ফেলিক্স আদামোভিচ বলল, ''দেবমূর্তির নীচে বেঞ্চেব তলায় কে শুয়ে আছে?''

''ও তো সেমিয়ন স্যার। স্তেপান বাড়িতে নেই।''

একটা সিগারেট ধরিয়ে জমিদার-গিন্নি বলল, ''তার আস্পর্ধা তো কম নয়। মঁসিয় রেজেউইকি, সে কত মাইনে পাচ্ছিল?''

''মাসে দশ রুব্‌ল্‌।''

''সে যদি বলত দশ রুব্‌লে তার পোষাচ্ছে না তাহলে আমি তাকে পনেরো দিতাম। একটা কথাও না বলে সে চলে গেল। এটা কি ভাল করেছে? এটা কি বিবেকসম্মত?''

''কিন্তু আমি তো বরাবরই বলছি, এই সব লোকের বাজে কথায় কান দেওয়াই উচিত নয়।'' প্রতিটি শব্দাংশকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে এবং উনশেষ শব্দাংশের উপর বিশেষ জোর না দেবার চেষ্টা করার পোলিশ রীতিতে ফেলিক্স আদামোভিচ কথাগুলি বলল। ''আপনিই এই সব আল্‌সে লোকগুলোর মাথা খেয়েছেন। একবারে পুরো মাইনেটা কখনও তাদের দেওয়া উচিত না। তাতে কি লাভ? তার পরেও আপনি মাইনেটা বাড়াতে চাইছেন? সে এমনিতেই ফিরে আসবে। আমাদের শর্তে রাজী হয়েছিল বলেই তাকে কাজে নেওয়া হয়েছিল। তাকে বলে দিও''—এবার ম্যাক্সিমের দিকে মুখ ফিরিয়ে পোল ভদ্রলোক বলল,—''তাকে বলে দিও সে একটা শুয়োর—ব্যস্‌।''

''ঠিক বলেছ।''

''শুনছ চাষী? তাকে আমরা ভাড়া করেছি, অতএব তাকে কাজ করতে হবে, যখন খুশি কেটে পড়া চলবে না। শয়তান! কালও না আসার দুঃসাহস

যেন তার না হয়। অবাধ্য হবার মজা তাকে বুঝিয়ে দেব। আর তুমিও মজাটা টের পাবে। শুনছ তো বুড়ি?''

''ঠিক বলেছ.....।''

''তুমিও বুঝতে পারবে। আমার আপিসে যেয়ো না বুড়ো কুত্তা। তোমার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক? তোমরা কি মানুষ? মাথায় গাট্টা মারলে, খারাপ ব্যবহার করলে তবে তোমরা বোঝ। ভাল চায় তো কাল যেন সে কাজে যায়।''

''তাকে বলব। কেন বলব না? মুখের কথা তো বলতেই পারি...''

এলেনা ইগোরভ্‌না বলল, ''তাকে বলে দিও, মাইনে বাড়িয়ে দেব। কোচোয়ান ছাড়া তো আমার চলবে না। আর একজন জোগাড় করে নিই, তারপব ইচ্ছা হলে সে যেন কাজ ছেড়ে দেয়। তাকে বলো, কাল যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। আরও বলে দিও, তার এই অশিষ্ট আচরণে আমি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছি। তুমিও বলে দিও বুড়িমা। আশা করি কাল সে যাবে; আমাকে যেন আবার লোক পাঠাতে না হয়। এই যে বুড়িমা, এটা তোমার জন্যহ এনেছি গো। এই সব খেড়ে ছেলেদের সামলানো বড়ই শক্ত, তাই না? এটা নাও গো।''

মহিলাটি পকেট থেকে সুন্দর সিগারেট-কেস তুলে সিগারেটের তলা থেকে একটা ব্যাংকনোট বের করে বুড়ির হাতে দিল।

তাবপর বলল, ''সে যদি না যায় তাহলে আমাদের ঝগড়াই করতে হবে, আর সেটা হবে অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমি আশা করি....তুমি তাকে বুঝিয়ে বলো। এবার চল ফেলিক্স আদামোভিচ! বিদায়।''

আদামোভিচ লাফ দিয়ে কালাশে চড়ে বসল। হাতে লাগাম তুলে নিল। গাড়িটা নরম রাস্তায় চলতে শুরু করল।

''উনি তোমাকে কত দিলেন?'' বুড়ো জিজ্ঞাসা করল।

''এক রুব্‌ল্‌।''

''ওটা আমাদের কাছেই থাক।''

নোটটা নিয়ে দুই হাতে পরিস্কার করে সযত্নে ভাঁজ করে বুড়ো নোটটা পকেটে রাখল।

তারপর ঘরের ভিতর ঢুকে বলল, ''উনি চলে গেছেন স্তেপান। আমি ওদের বলে দিয়েছি তুমি কলে গেছ। তিনিও আমার কথা বিশ্বাস করলেন। সত্যি বলছি।''

কালাশ গাড়িটা দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই স্তেপান জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। তার পাণ্ডুর দেহটা থর্ থর্ করে কাঁপছে। সেই অবস্থায় প্রায় অর্ধেকটা শরীর জানালা দিয়ে বের করে দূরের ঘনায়মান অন্ধকারে ঢাকা বাগানটার দিকে ঘুষি ছুঁড়তে লাগল। বাগানটা জমিদারবাড়ির। বিড়বিড় করে কি যেন বলতে বলতে সে দু'বার সেই দিকে ঘুষি চালিয়ে শরীরটাকে আবার ঘরের ভিতরে নিয়ে সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে দিল।

জমিদার-গিন্নির গাড়িটা চলে যাবার আধ ঘন্টা পরে ঝুরকিনের বাড়িতে নৈশভোজের আসর বসল। রান্নাঘরে স্টোভের ঠিক পাশে একটা নোংরা টেবিলে বসল ঝুরকিন ও তার বৌ। তাদের ঠিক উল্টো দিকে বসল ম্যাক্সিমের বড় ছেলে সেমিয়ন; মদে-ভেজা লাল মুখ, বসন্তের দাগে ভর্তি লম্বা নাক, আর তৈলাক্ত দুটো চোখ। সেমিয়নের মুখটা তার বাবার মতই; তবে তার মাথার চুল সাদা নয়, টাকও পড়ে নি, আর চোখ দুটিও বাবার মতই ভবঘুরেমি আর ধূর্তামিতে ভরা নয়। সেমিয়নের পাশেই বসেছে ম্যাক্সিমের দ্বিতীয় ছেলে স্তেপান। স্তেপান কিছুই খাচ্ছে না, চুলভর্তি মাথাটাকে হাতের উপরে রেখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঝুলে-ভর্তি সিলিংয়ের দিকে, আর একমনে কি যেন ভাবছে। খাবার পরিবেশন করছে স্তেপানের বৌ মারিয়া। সকলে নিঃশব্দে বাঁধাকপির ঝোল খাচ্ছে।

ঝোল খাওয়া শেষ হলে ম্যাক্সিম বলল, "টেবিলটা পরিষ্কার করে ফেল।" মারিয়া টেবিল থেকে শূন্য বাটিটা তুলে নিল; কিন্তু স্টোভটা খুব কাছে হলেও বাটিটা নিয়ে সে পর্যন্ত যেতে পারল না। মূর্ছিত হয়ে বেঞ্চের উপর পড়ে গেল। বাটিটা তার হাত থেকে হাঁটুর উপর পড়ে মেঝেতে গড়াতে লাগল। নাকে-কান্নার মত একটা শব্দ শোনা গেল।

"আরে, কে কাঁদছে?" ম্যাক্সিম জিজ্ঞাসা করল।

মারিয়া আরও জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দুই মিনিট কেটে গেল। বুড়ি উঠে যবের পরিজ পরিবেশন করল। স্তেপান গলা খাঁকারি দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বলে উঠল, "চুপ কর।"

মারিয়া তবু কাঁদতে লাগল।

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে সেমিয়ন বলে উঠল, "মেয়েদের চ্যাঁচানি আমি সহ্য করতে পারি না। ও তো কেঁদে পাড়া মাথায় করছে। কিন্তু কেন করছে তা ও নিজেই জানে না। মেয়েদের রকমই এই। ছিচকাঁদুনি, যদি কাঁদতেই হয় তো বাইরে উঠোনে গিয়ে কাঁদ গে।"

ম্যাক্সিম বলল, "মেয়েদের অশ্রু তো জলের ফোঁটামাত্র। কাঁদতে তো আর পয়সা লাগে না, ওটা বিনা পয়সাতেই হয়। তুমি নাকে কাঁদছ কেন? এবার ক্ষান্ত দাও। তোমার স্তেপানকে কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। তুমি একেবারে গোল্লায় গেছ। আস্তে। নিজের পরিজে মন দাও।"

মারিয়ার উপর ঝুঁকে স্তেপান তার কনুইতে আস্তে খোঁচা দিল।

"এসব কি হচ্ছে? চুপ কর। যা বলা হচ্ছে তাই কর। আঃ, কী পাজী মেয়ে।"

যে বেঞ্চের উপর মারিয়া শুয়ে ছিল স্তেপান হাতটা তুলে তার উপর একটি ঘুষি মারল। একটা চকচকে জলের ফোঁটা তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। মুখের উপর থেকে জলের ফোঁটা মুছে ফেলে টেবিলে বসে স্তেপান পরিজ খেতে লাগল। মারিয়া উঠে দাঁড়াল; ঘ্যানঘ্যান করতে করতে অন্য

সকলের থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে গিয়ে স্টোভের পিছনে বসল। সকলেরই পরিজ খাওয়া শেষ হয়ে গেল।

বুড়ো চেঁচিয়ে বলল, ''মারিয়া, 'কাবাস' নিয়ে এস। দেখ মেয়ে, নিজের কাজটা ঠিকমত কর। যে রকম নাকে-কান্না কাঁদছ তাতে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। তুমি তো খুকিটি নও।''

অশ্রুসিক্ত, বিবর্ণ মুখে মারিয়া বেরিয়ে গেল, এবং কারও দিকে না তাকিয়ে পানীয় এনে বুড়োকেই দিল। সে পানীয় একে একে সকলের কাছে ঘুরে গেল। সেমিয়ন পানপাত্রটিকে দুই হাতে ধরে চুমুক দিয়েই চাপা হাসি হাসতে লাগল।

''তুমি হাসছ কেন?''

''ও কিছু নয়। খারাপ কিছুও নয়। একটা হাসির কথা মনে পড়ে গেল।''

মাথাটা পিছনে হেলিয়ে মস্ত বড় মুখটা হা করে সেমিয়ন হো-হো করে হেসে উঠল।

স্তেপানের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ''মহিলা কি এখানে এসেছিলেন? অ্যাঁ? কি বললেন তিনি? অ্যাঁ হা, হা।''

স্তেপান চোখ তুলে সেমিয়নের দিকে তাকাল। তার মুখ লাল হয়ে উঠল।

বুড়ো বলল, ''তিনি ওকে পনেরো রুবল্ করে দেবেন।''

''আচ্ছা, আচ্ছা। ও রাজী হলে তিনি তো একশ' রুব্‌ল দিতেও রাজী হবেন। ঈশ্বর আমাকে মেরে ফেললেও সেই মহিলা ওকে তাই দেবেন।''

সেমিয়ন চোখ টিপে আড়মোড়া ভাঙল।

তারপর বলতে লাগল, ''আহারে, আমার যদি এরকম একটা মেয়েমানুষ থাকত। আমি তাকে চুষে একেবারে ছিব্‌ড়ে করে দিতাম। তাব সব রস আমি শুষে নিতাম। উম্-উম্।''

স্তেপানের কাঁধে থাপ্পর মেরে সেমিয়ন অট্টহাসি হাসতে লাগল।

''ঠিক তাই করতাম স্যাঙাৎ। তুমি বড় বেশী লাজুক। আমাদের লজ্জা কবার কি আছে। তুমি বোকা স্তেপান। আঃ! কী বোকা তুমি?''

''ও যে বোকা তা আমরা সকলেই জানি,'' তাব বাবা বলল।

আবার সেই ঘ্যানঘ্যান কান্না।

''মেয়েটা আবার কাঁদতে শুরু করল। মনে হয়, ওর ঈর্ষা হচ্ছে, ওর মনে আঘাত লেগেছে। মেয়েদেব নাকে-কান্না আমি পছন্দ করি না। ওটা যেন আমার পেটে ছুরি মারার মত মনে হয়। হায়, মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ! বিধাতা কেন তোমাদের সৃষ্টি করেছিলেন? কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে? মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, নৈশ ভোজনের জন্য ধন্যবাদ। এবার আমরা এক ফোঁটা ভদ্‌কা পান করে মধুর সব স্বপ্ন দেখব। আমি বাজী ধরে বলতে পারি, তোমার সেই কর্ত্রীঠাকরুণের কাছে ভদকার সাগর আছে। তুমি

যত খুশি পান করতে পার।"

"তুমি একটি পচা শুয়োর সেমিয়ন।"

এই কথা বলে স্তেপান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল; তারপর তুই হাতে একটা কম্বল তুলে নিয়ে বাইরের উঠোনে চলে গেল। সেমিয়ন তার পিছু নিল।

বাইরে সব কিছু নিঃঝুম। ধীরে নেমে আসছে রাশিয়ার গ্রীষ্মকালের রাত। দূরের পাহাড় শ্রেণীর ওপারে চাঁদ উঠছে। ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের রূপোলি কোণগুলি চাঁদের দিকে ভেসে চলেছে। দিগন্তের শ্বেত উদ্ভাসে একটা মনোরম হাল্কা সবুজের আভা ছড়িয়ে পড়েছে। তারার ঝিকিমিকি অস্পষ্ট চোখে পড়ছে; মনে হচ্ছে তারা বুঝি চাঁদের ভয়ে নিজেদের ক্ষীণ রশ্মিগুলোকে লুকিয়ে ফেলেছে। চারদিক থেকে নদীর একটা নৈশ শীতলতা এসে চিবুকে লাগছে। ফাদার গ্রিগরির বাড়ির বড় ঘড়িটা ঢং ঢং করে ন'টা বাজিয়ে গ্রামের সব্বাইকে শুনিয়ে দিল। পানশালার ইহুদি মালিক সবগুলি জানালা সশব্দে বন্ধ করে দরজার মাথায় একটা কালিমাখা লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিল। কি রাস্তায়, কি উঠোনে কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই। ঘাসের উপর কম্বল বিছিয়ে স্তেপান বুকের উপর ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে কনুইয়ের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। সেমিয়ন বসল তার পায়ের কাছে।

"হুম...হ্যাঁ," সে বলল।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে সেমিয়ন আরাম করে বসল, ছোট পাইপটা ধরাল, তারপর আলাপ শুরু করল।

"আজ এফিমের দোকানে গিয়েছিলাম। বীয়ার খেলাম। তিন বোতল। সিগারেট চাই স্তেপান?"

"না।"

"তামাকটা ভাল। এ সময় এক কাপ চা হলে বড় ভাল হত। তুমি কি কর্ত্রীর বাড়িতে চা খেয়েছ? চা-টা ভাল ছিল? খুবই ভাল হবারই তো কথা, নয় কি? বাজী ধরে বলতে পারি, সে চা এক পাউণ্ডের দাম পাঁচ রুবল্ হবেই; কিন্তু এমন একটা ব্র্যাণ্ডের চা আছে যার এক পাউণ্ডের দাম একশ' রুবল্। সত্যি আছে, ঈশ্বরের দিব্যি। সে চা আমি খাই নি, কিন্তু খবর রাখি। যখন শহরে একটা দোকানে কাজ করতাম তখন দেখেছি এক মহিলা খেয়েছিলেন। তার গন্ধটাই কত দামী। আমি শুঁকেছিলাম। কাল কি আমরা কর্ত্রীঠাকরুণের কাছে যাব?"

"ও সব ছাড় তো।"

"আমার উপর এমন ক্ষেপে গেলে কেন বল তো ? আমি তো তোমার সঙ্গে ঝগড়া করছি না। একটু আলোচনা করছি মাত্র। ক্ষেপে যাওয়ার কোন মানে হয় না। কিন্তু তুমি যাবে না কেন বোকারাম? আমি তো এটা বুঝতেই পারছি না। প্রচুর টাকা, ভাল খাবার, আশ মিটিয়ে মদ খাওয়া...ইচ্ছে করলে তুমি তো তার সিগারেটও টানতে পার, তার ভাল চা খেতে পার।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সেমিয়ন আবার বলতে শুরু করল।

"আর তিনি তো সুন্দরী। কোন বুড়ির সঙ্গে ঝুলে পড়াটা বাজে ব্যাপার, কিন্তু তার সঙ্গে জমে যাওয়া—সে তো সুখের কথা।" সেমিয়ন থুতু ফেলে চুপ করল। "আগুন! সত্যি আগুন! গলাখানা কী। যেমন ধপ্‌ধপে সাদা, তেমনই গোলগাল।..."

হঠাৎ সেমিয়নের দিকে ঘুরে স্তেপান বলে উঠল, "আর তাতে যদি আত্মাকে পাপে স্পর্শ করে তাহলে?"

"পাপ? কিসের পাপ? গরীব মানুষের পাপ বলে কিছু নেই।"

"গরীব মানুসকেও নরকে পচতে হয় যদি—তুমি কি বলতে চাও আমি গরীব? আমি গরীব নই।"

"কিন্তু এতে পাপেব কি আছে? তুমি তো তার পিছনে ছুটছ না, তিনিই তোমার পিছনে ছুটছেন। তুমি তো এক ভয়ার্ত বিড়াল।"

"তুমি একটা পচা ডিম; আর কথাও বলছ পচা ডিমের মতই..."

"আর তুমি একটা বোকারাম।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেমিয়ন বলল, "বোকা! নিজেব ভাল-মন্দটাও বোঝ না! বুঝতে পাব না। তোমার নিজেব দবকার না থাকলেও অনেক টাকা তোমার থাকা দরকার।"

"টাকার দরকার আমার আছে, কিন্তু অন্যের টাকা নয়।"

"তোমাকে তো চুরি করতে হচ্ছে না। তিনি নিজেই তোমাকে দেবেন নিজের হাতে। কিন্তু তুমি তো বোকা, তোমাকে এসব বলে কি হবে। বৃথাই আমাব সময় নষ্ট করা..."

সেমিয়ন উঠে দাঁড়াল; আড়মোড়া ভাঙল।

"একদিন এজন্য তোমাকে অনুতাপ করতে হবে। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে যাবে। এরপরে তোমার সঙ্গে আমি কোন যোগাযোগই রাখতে চাই না। তুমি আমাব ভাই নও...তুমি গোল্লায় যাও...তোমার ওই হদ্দ বোকা গাইটাকে নিয়েই ঘর করগে..."

"তার মানে মারিয়া একটা গরু?"

"গরুই তো।"

"হুঁ! সে গরুর ক্ষুর ধোয়ার যোগ্যতাও তোমার নেই। ভাগো হিয়াসে!"

"তুমি তাতে ভাল থাকবে, আর...আমরাও ভাল থাকব। বোকারাম!"

"ভাগো!"

"যাচ্ছি।...তোমার একটা বড় ধাক্কা খাওয়া দরকার।"

সেমিয়ন মুখ ঘুরিয়ে শিস দিতে দিতে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে ঘাসের খস্ খস্ শব্দ শুনে স্তেপান মাথা তুলল। মারিয়া আসছে। সে এগিয়ে এসে তার পাশেই শুয়ে পড়ল।

ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "তুমি যেও না স্তেপান। যেও না প্রিয়তম। তিনি তোমাকে শেষ করে ফেলবেন। ওই পোলটাকে নিয়ে তার শানাচ্ছে না।

তোমাকেও তার চাই। তার কাছে যেও না স্তেপান।''

''নাক গলানো বন্ধ কর।''

বৃষ্টির গরম ফোঁটার মত মারিয়ার চোখের জল ঝরে পড়ল স্তেপানের মুখে।

''আমার সর্বনাশ করো না স্তেপান। পাপের ছোঁয়ায় তোমার আত্মার সর্বনাশ করো না। শুধু আমাকেই ভালবাস, অন্য কারও কাছে যেও না। ঈশ্বর তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন, এতএব তুমি আমার কাছেই থাক। আমার বাপ-মা নেই...আমার কেবল তুমিই আছ।''

''আমাকে একা থাকতে দাও। আঃ—কী আপদ। বলেছি তো, আমি যাব না।''

''এই তো চাই...যেও না লক্ষ্মীটি। স্তেপান, আমি গর্ভবতী...অচিরেই সন্তান হবে ..আমাদের ছেড়ে যেও না, ছেড়ে গেলে ঈশ্বর তোমাকে শাস্তি দেবেন। তোমার বাবা আর সেমিয়ন চেষ্টা করছে যাতে তুমি তার কাছে যাও; কিন্তু তুমি যাবে না...তাদের কথায় কান দিও না। তারা সব পশু, মানুষ নয়।''

''ঘুমতে যাও।''

''আমার ঘুম পাচ্ছে স্তেপান, আমার ঘুম পাচ্ছে।''

''মারিয়া।'' ম্যাক্সিমের গলা শোনা গেল। ''তুমি কোথায়? তোমার মা ডাকছে।''

মারিয়া লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মাথার চুল ঠিক করে ছুটে ভিতরে চলে গেল। ম্যাক্সিম ধীর পায়ে হেঁটে স্তেপানের কাছে এল। সে গায়ের পোশাক ছেড়ে ফেলেছে। তলবাসে তাকে একটা মৃতদেহের মত দেখাচ্ছে। চাঁদের আলো তার টাক মাথায় খেলা করছে, তার জিপ্‌সি চোখের তারায় চিকচিক করছে।

ম্যাক্সিম শুধাল, ''কর্ত্রীর কাছে তুমি কাল যাচ্ছ, না তার পর দিন?''

স্তেপান কোন জবাব দিল না।

''যদি যাও তো কালই যাও, আর সকাল-সকাল। নিশ্চিত জেন, ঘোড়াগুলোর দেখ্‌ভাল করা হয় নি। আর—তিনি কথা দিয়েছেন পনেরো দেবেন। সে কথা ভুলে যেও না। দশে রাজী হয়ো না।''

''আমি তো যাচ্ছিই না,'' স্তেপান বলল।

''কারণ কি?''

''কারণ—আমি যেতে চাই না।''

''কেন চাও না?''

''কেন তা তুমি জান।''

''বটে। দেখ স্তেপান, এই বুড়ো বয়সে আমি তোমাকে ধোলাই দেব তাই কি তুমি চাও?''

''বেশ তো ধোলাই দিয়ে তাড়িয়ে দাও।''

''বাপ-মার মুখের উপর এরকম কথা বলতে পারলে তুমি? কার সঙ্গে কথা বলছ তা জান? তাকিয়ে দেখ। তোমার ঠোঁটের দুধ এখনও শুকোয় নি, আর তুমি তোমার বাবার মুখের উপর কথা বলছ।''

''আমি যাব না—বাস্। তোমরা গির্জায় যাও, কিন্তু পাপ করতে ভয় পাও না।''

''আমি চাই তোমার নিজের বাড়ি হোক, বেহদ্দ বোকা কোথাকার। আমাদের তো একটা নতুন বাড়ি করা দরকার, না কি? তুমি কি মনে কর? কাঠের জন্য আমরা কার কাছে যাব? অবশ্যই স্তেপ্‌কোভার কাছে। টাকা ধার চাইব কার কাছে। তাঁর কাছে, না অন্য কারও কাছে? তিনি আমাদের কাঠ দেবেন, তিনিই আমাদের টাকাও দেবেন। তিনি আমাদের উপহার দেবেন।''

''উপহার তিনি অন্য কাউকে দিন। আমার দরকার নেই।''

''আমি তোমাকে ধোলাই দেব।''

''তাই দাও। ধোলাই দাও।''

ম্যাক্সিম হেসে হাতটা বাড়াল। তার হাতে একটা চাবুক।

''আমি তোমাকে চাবুক মারব স্তেপান।''

স্তেপান পাশ ফিরল। এমন ভাব দেখাল, যেন তার ঘুম পেয়েছে।

''তাহলে তুমি যাবে না? সত্যি সত্যি যাবে না?''

''সত্যি সত্যি যাব না। যদি যাই, তো ঈশ্বর যেন আমার মৃত্যু দেন।''

ম্যাক্সিম হাতটা তুলল, আর স্তেপানের ঘাড়ে ও গালে পড়ল চাবুকের আঘাত। ক্ষেপা মানুষের মত সে লাফিয়ে উঠল।

চীৎকার করে বলল, ''মেরো না বাবা, আমাকে মেরো না। শুনছ? আমাকে মেরো না।''

''আচ্ছা?''

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ম্যাক্সিম আবার স্তেপানকে চাবুক মারল। পড়ল তৃতীয় আঘাত।

''বাপ কিছু বললে তা মানতে শেখ। অকর্মার ধাড়ি। তোমাকে যেতে হবেই।''

''চাবুক থামাও, শুনতে পাচ্ছ? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?''

চীৎকার করতে করতে স্তেপান কম্বলের উপর এলিয়ে পড়ল।

''ঠিক আছে। আমি যাব। কেবল মনে রেখো। তুমি সুখী হবে না। নিজেকেই নিজে অভিশাপ দেবে।''

''ঠিক আছে। নিজের জন্যই যাও, আমার জন্য নয়। আমার নতুন বাড়ির দরকার নেই, তোমার আছে। বলেছিলাম তোমাকে পেটাব, পিটিয়েছি।''

''যাব...আমি যাব। কেবল...কেবল ওই চাবুকটাকে মনে রেখো।''

''ঠিক আছে। যতই চেষ্টা কর, আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না।

যাও।''

''ঠিক আছে...আমি যাব...''

চেঁচামিচি থামিয়ে স্তেপান উপুড় হয়ে শুয়ে মৃদুস্বরে কাঁদতে লাগল।

''তাকিয়ে দেখ। কেমন অঝোরে কাঁদছে। গলা ছেড়ে কাঁদ। কাল যেও, আর খুব সকালে। এক মাসের মাইনে আগাম নিও। আর যে চারদিন কাজ করেছ তার প্রাপ্যটাও বুঝে নিও। তোমার ঘোটকীর জন্য একটা মাথার ওড়না কিনে দেব। আর ঐ চাবুক নিয়ে মাথা খারাপ করো না। আমি তোমার বাবা...ইচ্ছা হলে আমি তোমাকে মারব; ইচ্ছা হলে তোমাকে দয়া দেখাব। তাহলে সব মিটে গেল। এখন ঘুমতে যাও।''

দাঁড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে ম্যাক্সিম বাড়ি ফিরে গেল। স্তেপানের মনে হল ম্যাক্সিম বলছে, ''ওকে ধোলাই দিয়েছি।'' আরও শুনল, সেমিয়ন হাসছে।

ফাদার গ্রিগরির বাড়িতে বেসুরো পিয়ানোটা করুণ সুরে বাজতে শুরু করল; পুরোহিতের মেয়ে সাধারণত আটটার পরে গলা সাধে। বিচিত্র, নরম স্বর-লহরী সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। স্তেপান বিছানা থেকে উঠে বেড়া ডিঙিয়ে রাস্তায় নামল। নদীর দিকে গেল। নদীটা পারার মত ঝলমল করছে; চাঁদ ও তারায় ভর্তি আকাশের প্রতিচ্ছবি তার বুকে। সর্বত্র কবরের নিস্তব্ধতা। সব নিশ্চল, কেবল মাঝে মাঝে একটা ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডাকছে... নদীর তীরে একেবারে জলের উপর বসে স্তেপান তার মাথাটা রাখল হাতের মুঠোর উপর। একের পর এক নানা গম্ভীর চিন্তা তার মাথার মধ্যে নড়াচড়া করতে লাগল।

নদীর অপর তীরে জমিদার-বাড়ির বাগানের চারদিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ পপলার গাছের সারি। জমিদার-গিন্নির জানালা দিয়ে একটা আলো এসে পড়েছে গাছের ফাঁক দিয়ে। গিন্নিঠাকরুণ এখনও জেগে আছে। সোয়ালো পাখিরা যতক্ষণ না নদীর উপর দিয়ে উড়তে শুরু করল ততক্ষণ পর্যন্ত স্তেপান নদীর তীরে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল। তারপর যখন চাঁদের পরিবর্তে নবোদিত সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ল নদীর উপর তখন সে উঠে দাঁড়াল। হাত মুখ ধুয়ে পূর্বমুখী হয়ে প্রার্থনা করে স্থিরপদক্ষেপে নদীর তীর ধরে দ্রুত হাঁটিতে লাগল খালের দিকে। খালের অল্প জল পার হয়ে সে এগিয়ে চলল জমিদার-বাড়ির প্রাঙ্গণ অভিমুখে...

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই এলেনা ইগোরভনা শুধাল, ''স্তেপান এসেছে?''

''এসেছে।'' দাসী জবাব দিল।

স্ত্রেলকভা হাসল।

''আঃ।...ভাল। এখন সে কোথায়?''

''আস্তাবলে।''

গিন্নিঠাকরুণ এক লাফে বিছানা থেকে উঠে পড়ল, দ্রুত প্রসাধন সেরে খাবার ঘরে ঢুকল কফির জন্য।

স্ত্রেল্‌কভা এখনও দেখতে যুবতীসদৃশা, বয়সের তুলনায় তাকে ছোট দেখায়। কেবল তার চোখ দুটি বলে দেয় যে নারী-জীবনের বড় অংশটাকেই সে পার হয়ে এসেছে; তার বয়স এখন ত্রিশের বেশী। চোখ দুটি বাদামী, গভীর, মায়াবিনী; দৃষ্টি পুরুষালী, নারীসুলভ নয়। সে সুন্দরী নয়; কিন্তু মনোহারিণী। মুখটা ভরন্ত, অমায়িক, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। আর তার গলা (সে-কথা তো সেমিয়ন আগেই বলেছে) ও বক্ষদেশ এক কথায় চমৎকার। সেমিয়ন যদি সুন্দর হাত ও পায়ের মর্যাদা বুঝত তাহলে হয় তো স্ত্রেল্‌কভার হাত-পায়ের কথা বলতে ভুলে যেত না। তার পরনে ছিল গ্রীষ্মের সাদাসিদে হাল্কা পোশাক। তার চুল বাঁধার ভঙ্গী মোটেই আধুনিক নয়। স্ত্রেল্‌কভা অলস প্রকৃতির; তাই প্রসাধনে সময় ব্যয় করা পছন্দ করে না। যে সম্পত্তি তার খাওয়া-পরা জোগায় তার মালিক আসলে তার অবিবাহিত বড় ভাই। সে থাকে পিটার্সবার্গে; নিজের সম্পত্তির কথা সে কদাচিৎ ভেবে থাকে। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকেই স্ত্রেল্‌কভা ওই সম্পত্তির ভরসায় বেঁচে আছে। তার স্বামী কর্নেল স্ত্রেল্‌কভ অতি সজ্জন। সেও পিটার্সবার্গেই থাকে। স্ত্রেল্‌কভার বড় ভাই তার সম্পত্তি নিয়ে তার চাইতেও অল্প ভাবনা-চিন্তা করে। স্বামীর সঙ্গে এক বছরেরও কম সময় বসবাসের পরেই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। বিয়ের বিংশতি দিবসেই সে তার স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা হারিয়েছিল।

কফি খেতে বসেই স্ত্রেল্‌কভা স্তেপানকে ডেকে পাঠাল। সে এসে দরজায় দাঁড়াল। তার মুখটা ম্লান, চুল এলোমেলো, চোখে খাঁচায় বন্দী নেকড়ের শয়তানী দৃষ্টি। গিন্নিঠাকরুণ তার দিকে তাকিয়ে ঈষৎ লাল হয়ে উঠল।

নিজের জন্য কিছুটা কফি ঢেলে নিয়ে সে বলল, "দয়া করে আমাকে বলবে কি, এ তোমার কেমন চাতুরি? কেন তুমি চলে গিয়েছিলে? চারদিন থেকেই তুমি পালিয়েছ। না বলেই চলে গিয়েছিলে। আমাকে বলা উচিত ছিল।"

স্তেপান বিড়বিড় করে বলল, "কিন্তু আমি তো বলেছিলাম।"

"কাকে বলেছিলে?"

"ফেলিক্স আচামিচকে।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে স্ত্রেল্‌কভা শুধাল, "তুমি কি রাগ করেছিলে স্তেপান? জবাব দাও। আমি জানতে চাইছি। তুমি কি রাগ করেছিলে?"

"আপনি যদি ওটা না বলতেন তাহলে আমি যেতাম না। আমি এখানে এসেছি ঘোড়ার দেখ-ভাল করতে, অন্য কারও..."

"থাক সে কথা...তুমি আমাকে ভুল বুঝেছিলে, বাস। তোমার রাগ করা উচিত নয়। আমি তো বিশেষ কিছু বলি না। আর যদিও আমি এমন

কিছু বলে থাকি যেটা তোমার কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছে, তাহলে তুমি ....তাহলে তুমি....যাই বল না কেন, আমি...আমি যা পছন্দ করি তা বলার অধিকার আমার আছে। আমি...আমি তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছি। আশা করি এবার আর তোমার ও আমার মধ্যে কোনরকম ভুল বোঝাবুঝি থাকবে না।"

স্তেপান যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

তাকে থামিয়ে স্ত্রেল্‌কভা বলল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও। এখনও আমার সব কথা বলা হয় নি। দেখ স্তেপান, কোচোয়ানের একটা নতুন পোশাক আমার কাছে আছে। তুমি এটা নিয়ে পর। তুমি যেটা পরে আছ সেটা দেখতে বড় বিশ্রী। আমার পোশাকটা সুন্দর, ফিয়োডরকে দিয়ে সেটা পাঠিয়ে দেব।"

"ঠিক আছে ম্যা'ম।"

"এ কী মুখ। তুমি এখনও মুখ গোমড়া করে আছ? তুমি কি সত্যি এত বেশী আঘাত পেয়েছ? সে যাই হোক, যথেষ্ট হয়েছে...আমি কিছু মনে করে বলি নি....এখানে তুমি ভাল থাকবে...সব কিছু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। রাগ করো না...তুমি রাগ কর নি, তাই না?"

"আমাদের কি রাগ করতে দেওয়া হয়?"

স্তেপান হাত নেড়ে চোখ পিটপিট করে ঘুরে দাঁড়াল।

"ব্যাপার কি স্তেপান?"

"কিছু না। আমরা কি আর রাগ করতে পারি? ওটা তো আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।"

গিন্নিঠাকরুণ উঠে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি বিব্রত। স্তেপানের কাছে এগিয়ে বলল, "স্তেপান, তুমি...তুমি কাঁদছ?"

গিন্নিঠাকরুণ স্তেপানের আস্তিনে হাত রাখল।

"ব্যাপার কি স্তেপান? ব্যাপার কি? আমাকে বল। বলবে না? কেন তুমি এতটা মুসড়ে পড়েছ?"

গিন্নিঠাকরুণের দুই চোখ জলে ভরে উঠল।

"এস, আমাকে বল।"

স্তেপান হাত নেড়ে, চোখ পিটপিট করে তাকাল। তারপর চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

অস্পষ্ট গলায় বলতে লাগল, "ম্যা'ম আমি আপনাকে ভালবাসব—আপনি যা চাইবেন তাই করব। আমি রাজী। কেবল ওই সব শয়তানকে কিচ্ছু দেবেন না, একটুকরো কাঠও নয়। আমি সব কিছুতেই রাজী আছি। আমার আত্মাকে শয়তানের হাতে বেঁচে দেব। কেবল ওদের কিছুই দেবেন না।"

"ওদের বলতে তুমি কাদের বোঝাতে চাইছ?"

"আমার বাবা ও আমার ভাই। এমন কি একটুকরো কাঠও নয়। শয়তানের দল। নিজেদের বিদ্বেষ-বিষেই ওরা মরুক।"

গিন্নিঠাকরুণ মৃদু হাসল ; চোখ মুছল ; তারপর হো-হো করে হেসে উঠল।

বলল, "খুব ভাল। এবার যাও। তোমার পোশাক যথাসময়ে পাঠিয়ে দেব।"

স্তেপান বেরিয়ে গেল।

তার দিকে চোখ রেখে, তার প্রশস্ত কাঁধ দেখে মুগ্ধ হয়ে গিন্নিঠাকরুণ ভাবল, "ও বোকা বলেই এত ভাল। সব কথা খুলে বলার হাত থেকে ও আমাকে বাঁচিয়েছে...ওই প্রথম 'ভালবাসা'র কথা বলেছে।"

আসন্ন সন্ধ্যায় অস্তগামী সূর্য যখন রাঙা আলোয় ভরে দিয়েছে আকাশ, আর সোনালী আলো ছড়িয়েছে সারা ভুবন জুড়ে, তখন স্লেল্‌কভার ঘোড়া পাগলের মত জোর কদমে ছুটে চলেছে অন্তহীন তৃণভূমির উপর দিয়ে গ্রাম থেকে দূর দিগন্তের দিকে। কালাশটা লাফাচ্ছে একটা বলের মত, আর চলতে চলতে যে সব 'রাই'য়ের ভারী, পাকা ডাঁটা পথের উপর হেলে পড়েছে সেগুলিকে নির্দয়ভাবে ছিন্নভিন্ন কর দিচ্ছে। উপরের বাক্সে বসে স্তেপান ঘোড়াগুলোর পিঠে চাবুক চালাচ্ছে বেপরোয়াভাবে ; মনে হচ্ছে সে বুঝি ঘোড়ার লাগামকে হাজার টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। তার পরিধানে একটা রুচিপূর্ণ পোশাক। দেখলেই বোঝা যায়, সে পোশাক বানাতে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। দামী ভেলভেট ও লাল কাপড় তার লম্বা ও চওড়া শক্ত দেহের উপর বেশ এঁটে বসেছে। একটা পদকের মালা ঝুলছে তার বুকে। বুট জোড়া আসল মোম দিয়ে মাজা। ময়ূরের পালক গোঁজা কোচোয়ানের টুপিটা তাব সুন্দর কোঁকড়া চুলের উপর আল্‌তো করে বসানো। তার মুখে ফুটে উঠেছে বিষণ্ণ আত্মসমর্পণের ভঙ্গী, আবার সেই সঙ্গে একটা প্রচণ্ড আক্রোশ যার শিকার হয়েছে ঘোড়া দুটো। গিন্নিঠাকরুণ আলস্যভরে গাড়ির ভিতর হেলান দিয়ে প্রশস্ত বুকটা ভরে তাজা বাতাস নিচ্ছে। যুবতীসুলভ লালের ছোপ লেগেছে তার গালে।...জীবনটাকে সে সচেতনভাবে ভোগ করছে।

অনবরত চীৎকার করে বলছে, "এই তো চাই স্তেপান। এই তো চাই। ওকে এমন ভাবেই চালাও। আরও জোরে। বাতাসের বেগে।"

চাকার নীচে যদি কোন পাথর পড়ত তাহলে স্ফুলিঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ত চতুর্দিকে। গ্রামটা দূর থেকে আরো দূরে সরে যাচ্ছে।...বাড়িগুলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। জমিদারীর গোলাবাড়িগুলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।...অচিরেই ঘন্টা-ঘরটাও আর দেখা যাবে না।...শেষ পর্যন্ত গ্রামটাই একটা ধোঁয়াটে রেখায় পরিণত হল ; সুদূরে বিলীন হয়ে গেল। স্তেপান তখনও ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। যে পাপকে তার এত ভয় তার থেকে যত দূরে সম্ভব সে চলে যেতে চায়। কিন্তু পাপ তো এখন তার পিছনে গাড়িতে বসে আছে। তার খপ্পর থেকে পালিয়ে যাওয়া স্তেপানের কপালে নেই। সেই সন্ধ্যায় তার আত্মাকে বেঁচে দেওয়ার সাক্ষী হয়ে রইল বিস্তীর্ণ তৃণভূমি ও আকাশ।

দশটার পরে ঘোড়াগুলি আবার জোর কদমে ফিরে গেল। একটা ঘোড়া খোঁড়াচ্ছে, আর অন্য ঘোড়াটা ফেনায় ঢেকে গেছে। গিন্নিঠাকরুণ গাড়ির এক কোণে বসে ,আধবোঁজা চোখে কোট গায়ে চাপিয়েও কাঁপছে। তার ঠোঁটে আত্মতৃপ্তির হাসি। শ্বাসপ্রশ্বাস কত সহজ, কত শান্ত। স্তেপান এমনভাবে গাড়ি চালাচ্ছে যেন তার মৃত্যু আসন্ন। তার মাথাটা ফাঁকা, মেঘাচ্ছন্ন। দুঃখ তার হৃৎপিণ্ডটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

প্রতিদিন নতুন নতুন ঘোড়া বের করা হয় আস্তাবল থেকে। স্তেপান সেই ঘোড়া কালাশে যুতে বাগানের ফটকে নিয়ে যায়। গিন্নিঠাকরুণ হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে গাড়িতে ওঠে ; তারপব শুরু হয় পাগলের মত ছোটা। একদিনের জন্যও সে যাত্রার বিরতি ঘটে না। স্তেপানের দুর্ভাগ্য, একটা সন্ধ্যায়ও বৃষ্টি নামে না, আর তাই গাড়ি ছোটানোও বন্ধ থাকে না।

একদিন তেমনই এক ভ্রমণের শেষে স্তেপান তৃণভূমি থেকে ফিরে উঠোন পেরিয়ে চলে গেল নদীর ধারে। যথারীতি তার মাথা কুয়াসায় ভরা ; চিন্তার লেশমাত্র নেই ; আছে শুধু বুকের মধ্যে একটা ভয়ংকর দুঃখ। সুন্দর, শান্ত রাত। একটা মৃদু গন্ধ বাতাসে ভেসে এসে তার মুখের উপর খেলা করতে লাগল। স্তেপানের মনে পড়ল তার গ্রামের কথা ; নদীর ওপারে তার চোখের সামনে সেই গ্রামে এখন অন্ধকার নেমে এসেছে। মনে পড়ল তার বাড়ি, পিছনের বাগান, তার ঘোড়া, সেই বেঞ্চিটা যার উপর মারিয়াকে নিয়ে সে ঘুমত, কত সুখে ছিল....একটা অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করতে লাগল সে।

স্তেপান। একটা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

স্তেপান ঘুরে তাকাল। মারিয়া তার দিকেই এগিয়ে আসছে ; এইমাত্র সে নদীটা পার হয়েছে ; জুতোজোড়া তখনও তার হাতে।

''তুমি কেন গেলে স্তেপান ?''

তার দিকে একবার তাকিয়ে স্তেপান মুখ ফেরাল।

''স্তেপান, কেন তুমি আমাকে একা ফেলে যাচ্ছ ? আমার যে আর কেউ নেই।''

''চলে যাও।''

''জেনে রাখ স্তেপান, ঈশ্বর তোমাকে দণ্ড দেবেন। একমাত্র তোমাকেই তিনি দণ্ড দেবেন। তোমাকে পাঠাবেন এক ভয়ঙ্কর মৃত্যুর মুখে তাও পাপ-স্খালনের সুযোগ না দিয়ে। আমার কথাগুলি শোন। ট্রফিমখুড়ো এক সৈনিকের স্ত্রীর সঙ্গে বাস করত, মনে আছে ? সে কিভাবে মরেছিল ? ঈশ্বর না করুন।''

''কিসের জন্য তুমি আমাকে জ্বালাতন করছ ?''

স্তেপান দু'পা এগিয়ে গেল। মারিয়া দুই হাত দিয়ে তার কাফ্‌তান টেনে ধরল।

''আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী স্তেপান। এভাবে তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পার না।''

মারিয়া কাঁদতে লাগল।

''প্রিয়তম! আমি তোমার পা ধুয়ে সেই জল খাব চল আমরা বাড়ি যাই।''

নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য স্তেপান মারিয়াকে ঘুষি মারল। ঘুষিটা তার পেটে লাগল। মারিয়া ঢোঁক গিলে পেট চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল।

''ও-ওঃ।'' বলে আর্তনাদ করে উঠল।

স্তেপান চোখ পিট-পিট করে নিজের কপালে নিজেই ঘুষি মারল। তারপর পিছন ফিরে না তাকিয়ে উঠোনের দিকে হাঁটতে শুরু কবল।

আস্তাবলে নিজের জায়গায় পৌঁছে একটা বেঞ্চির উপর শুয়ে পড়ল। তারপর বালিশটা মাথার উপর রেখে নিজের হাতটাকে কামড়াতে লাগল।

এদিকে গিন্নিঠাকরুণ তার শোবার ঘরে বসে ভাবছে, আগামী কাল সন্ধ্যায় আবহাওয়াটা পরিষ্কার থাকবে কি না। হাতের তাস বলে দিল, আবহাওয়া ভালই থাকবে।

খুব সকালে জনৈক প্রতিবেশীব সঙ্গে দেখা করে রেজেউইহকি গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিল। এখনও সূর্য ওঠে নি। ভোর প্রায় চারটে বাজে, তাব বেশী নয়।

মাথাব ভিতরটা ভোঁ-ভোঁ করছে। ঈষৎ হেলে-দুলে সে ঘোড়া চালাচ্ছিল। তার যাবার অর্ধেকটা পথ বনের ভিতর দিয়ে।

যে জমিদারীর সে ম্যানেজার তার কাছাকাছি পৌঁছে সে ভাবল, ''ওটা কি হচ্ছে। গাছ কাটার শব্দ তো নয়।''

বনের একটা ঝোপের ভিতর থেকে ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ ও ডাল ভাঙার ফট-ফট শব্দ তার কানে এল। কান খাড়া করে কি যেন ভাবল, একটা খিস্তি করল, তারপর ড্রস্কি থেকে নেমে ঝোপেব ভিতবে চলে গেল। সেমিয়ন ঝুরকিন মাটিতে বসে কুড়ুল দিয়ে গাছের কাঁচা ডাল কাটছে। তার পাশেই পড়ে আছে তিনটে কেটে-ফেলা এল্ডার গাছ। একটা লম্বা মালগাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া ঘোড়াটা একপাশে দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছে। ফেলিক্স আদামোভিচ সেমিয়নকে দেখতে পেল। একমুহূর্তে তার ক্লান্তি ও ঝিমুনি কেটে গেল। রাগে মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে ছুটে সেমিয়নেব কাছে গেল।

চীৎকার করে বলল, ''এখানে কি করছ হে?''

প্রতিধ্বনি হল, ''এখানে কি করছ হে?''

সেমিয়ন কিন্তু কোন জবাব দিল না। পাইপ ধরিয়ে নিজের কাজ করতে লাগল।

''পাজী-বদমাস, কী কবছ তুমি? আমি তোমাকে বলছি।''

''তুমি কি চোখে দেখ না? তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে?''

''কি—কি? কি বললে? কথাটা আবার বল।''

''বললাম—নিজেব পথ দেখ।''

"কি ? কি ? কি ?"

"পথ দেখ। চেঁচিয়ে কোন লাভ হবে না"

আদামোভিচের মুখ লাল হয়ে গেল। সে ঘাড় ঝাঁকাতে লাগল।

"এ সবের অর্থ কি ? এত সাহস তোমার হল কি করে ?"

"কারণ আমার সাহস আছে, তাই হল। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কি ? আমি ভয় পাবার ছেলে নই। তোমার মত লোক অনেক দেখেছি।"

"তুমি গাছ কেটেছ কেন ? বনটা তো তোমার নয়। তোমার কি ?"

"এটা তো তোমারও নয়।"

আদামোভিচ চাবুকটা তুলল, কিন্তু সেমিয়নকে মারল না, কারণ সে ইসারায় কুড়ুলটা দেখিয়ে দিল।

"তুমি জান এ বনটা কার ?"

"জানি মশায়। এটা শ্রেলকভার বন, আর তার সঙ্গে কথা বলতেই আমি যাচ্ছি। বনটা তার, তাই তার কাছেই জবাবদিহি করব। কিন্তু তুমি কে ? একটা ফেউ। একটা চাকর। তোমাকে আমি চিনি না। পথের ভবঘুরে। তুমি তোমার পথ দেখ। জলদি।"

কুড়ুলের উপর পাইপটা ঠুকতে ঠুকতে সেমিয়ন বিদ্বেষের হাসি হাসতে লাগল।

ম্যানেজার ছুটে গিয়ে ড্রস্কিতে উঠল ; ঘোড়ার পিছনে চাবুক মেরে যেন তীরবেগে উড়ে গিয়ে গ্রামে পৌঁছল। সেখান থেকে কিছু সাক্ষীসাবুদ জোগাড় করে জোর কদমে ঘটনাস্থলে ফিরে গেল। সাক্ষীরা গিয়ে দেখল, সেমিয়ন নিজের কাজই করছে। মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা জমে উঠল। প্রধান এল, উপ-প্রধান এল, আর এল 'সংস্ক'রা। কয়েক প্রস্থ দলিল লেখা হল। রেজেউহ্‌কি স্বাক্ষর করল। সেমিয়নকে দিয়েও স্বাক্ষর করানো হল, কিন্তু সে কেবলই হাসতে লাগল...

সান্ধ্য ভোজনের আগে সেমিয়ন গিন্নিঠাকরুণের সঙ্গে দেখা করল। গাছ কাটার খবরটা সে আগেই পেয়েছিল। কোনরকম অভিবাদন না করেই সে বলতে শুরু করল—জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে, পোল ভদ্রলোক লোককে মারধর করছে, সে মাত্র তিনটে ছোট গাছ কেটেছে, ইত্যাদি।

গিন্নিঠাকরুণ রেগে বলল, "অন্যের গাছ কাটার সাহস তুমি পেলে কি করে ?"

উত্তরে গিন্নিঠাকরুণের মেজাজের প্রশংসা করে, আর পোলকে কোণঠাসা করার চেষ্টায় সেমিয়ন ক্ষোভের সঙ্গে বলল, "তার যন্ত্রণায় আমাদের জীবন বের হবার জোগাড় হয়েছে। তাছাড়া আর কোন কাজ সে করে না। আপনি যা কিছু বলেন, তার উপরেই সে হাত চালায়। সেটা কি ঠিক ? সব সময় সে আপনার মুখের উপর কথা বলে। এটা তো হতে দেওয়া উচিত নয়। যাই হই না কেন, আমরাও তো মানুষ।"

"কিন্তু আমি বলছি কোন্ সাহসে তুমি আমার গাছ কাটলে ? তুমি

মহাপাজী।''

''এ সব মিথ্যা কথা ম্যা'ম। কথাটা ঠিক, সত্যি আমি...গাছ কেটেছি...আমি তো দোষ স্বীকার করছি। কিন্তু সে কেন লোককে মারধর করে ?''

গিন্নিঠাকরুণের রক্ত গরম হয়ে উঠল। সে ভুলে গেল যে সেমিয়ন পুরোহিতের বড় ভাই, ভুলে গেল নিজের সভ্যতা-ভব্যতা, পৃথিবীর আর সব কিছুই ভুলে গেল, হঠাৎ সেমিয়নের মুখে একটা চড় মারল।

চীৎকার করে বলে উঠল, ''এই মুহূর্তে তোমার কুৎসিত চাষীর মুখ নিয়ে এখান থেকে সরে পড়। বেরিয়ে যাও। এই মুহূর্তে।''

সেমিয়ন কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কোন অবস্থাতেই ঘটনার এই রকম পরিবর্তন সে আশা করতে পারে নি।

''বিদায় ম্যা'ম।'' বলে সে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। ''আমি কি করতে পারি ? আমি কি করতে পারি ?''

বিড়বিড় করতে করতে সেমিয়ন বেরিয়ে গেল। এমন কি উঠোনে নেমে আসার সময় সে টুপিটা মাথায় দিতেও ভুলে গেল।

দুই ঘণ্টা পরে ম্যাক্সিম এল গিন্নিঠাকরুনের সঙ্গে দেখা করতে। তার মুখ বিমর্ষ, দুটি চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন। তাকে দেখেই বোঝা যায়, দুর্বিনীত কিছু বলতে বা করতেই সে এসেছে।

''তুমি কি চাও ?'' গিন্নিঠাকরুণ শুধাল।

''কেমন আছেন ম্যা'ম। আপনার কাছে প্রার্থনা জানাতেই আমি এখানে এসেছি। আমার কিছু কাঠের দরকার ম্যা'ম। স্তেপানের জন্য একটা বাড়ি তৈরী করতে চাই। কিন্তু কাঠের বড় অভাব। আপনি যদি খানকয় তক্তা

''বেশ তো, দেব।''

ম্যাক্সিমের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

''আমাদের একটা বাড়ি করা দরকার। কিন্তু কাঠ নেই। এটা খুব খারাপ। হি-হি। কয়েকটা বোর্ড, কিছু তক্তা...সেমিয়ন আপনার কাছে ধৃষ্টতা দেখিয়েছে...তার উপর রাগ করবেন না ম্যা'ম। ছেলেটা বোকা। নির্বুদ্ধিতা এখনও যায় নি। কিছুই বোঝে না। যেমন হয় আর কি। আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে আমরা এসে কাঠ নিয়ে যেতে পারি ম্যা'ম।''

''তোমরা আসতে পার।''

''তাহলে দয়া করে ফেলিক্স আদামিচকে কথাটা বলে দেবেন। ঈশ্বর আপনাকে সুস্বাস্থ্য দান করুন। এবার স্তেপানের একটা বাড়ি হবে।''

''আমি কিন্তু দাম একটু বেশী নিই কুরকিন। তুমি ভাল করেই জান, আমি কাঠ বিক্রি করি না। আমার নিজেরই কাঠের দরকার। আর যদি বিক্রি করি তো বেশী দামেই বিক্রি করি।''

ম্যাক্সিমের মুখ নত হল।

"তার মানে?"

"প্রথমত, নগদ টাকা চাই, আর দ্বিতীয়ত..."

"টাকা দিয়ে কাঠ আমি চাই না।"

"তাহলে কি ভাবে চাও?"

"কি ভাবে তাও আপনি জানেন...নিজেই জানেন। আজকালকার দিনে চাষীদের হাতে টাকা কোথায়? একটা কোপেক, তাও থাকে না।"

"কিছু না পেলে আমি তোমাকে কাঠ দেব না।"

ম্যাক্সিমের মুঠোর মধ্যে তার টুপিটা চূর্ণ হয়ে গেল। সে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু চুপ করে থেকে বলল, "আপনি কি সত্যি তাই বলতে চান?"

"হ্যা, তাই বলতে চাই। তোমার আর কিছু বলার আছে?"

"কি আর বলব? আপনি যখন কাঠ দেবেন না, তখন আর আপনার সঙ্গে কথা বলে কি হবে? বিদায়। তবে কাঠ না দিয়ে আপনি ভুল করলেন। পরে আপনাকে পরিতাপ করতে হবে। আমার কিছু যায়-আসে না, কিন্তু আপনি পরিতাপ করবেন। স্তেপান কি আস্তাবলে আছে?"

"জানি না।"

ম্যাক্সিম অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে গিন্নিঠাকরুণের দিকে তাকাল, একটু কাশল, তারপর বেরিয়ে গেল। তখন সে রাগে থর্‌থর্ করে কাঁপছে।

"তুমি এত বড় ঠকবাজ!" এই কথা ভাবতে ভাবতে সে আস্তাবলের দিকে চলল। স্তেপান তখন একটা বেঞ্চে বসে আলস্যভাবে সামনের ঘোড়াটাকে ডলাই-মলাই করছিল। ম্যাক্সিম আস্তাবলের ভিতরে ঢুকল না, দরজায়ই দাঁড়িয়ে পড়ল।

ডাকল, "স্তেপান।"

স্তেপান সাড়া দিল না; বাবার দিকে তাকালও না। ঘোড়াটা পিছু হটল।

"বাড়ি ফেরার জন্য তৈরী হও।" ম্যাক্সিম বলল।

"বাড়ি ফেরার আব ইচ্ছা নেই।"

"আমাকে একথা বলতে পারলে?"

"যখন বলেছি তখনই বোঝা গেল যে বলতে পারি।"

"আমি তোমাকে হুকুম করছি।"

লাফ দিয়ে উঠে স্তেপান ম্যাক্সিমের মুখের উপর আস্তাবলের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সন্ধ্যায় একটি ছোট ছেলে গ্রাম থেকে ছুটে এসে স্তেপানকে বলল, ম্যাক্সিম মারিয়াকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে; এখন কোথায় সে রাতটা কাটাবে তাও মারিয়া জানে না।

ছোট ছেলেটি বলল, "সে এখন গির্জায় বসে কাঁদছে, আর লোকজন সব তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তোমাকে গালমন্দ করছে।"

পরদিন ভোরে স্তেপান তার পুরনো পোশাকটা পরে পায়ে হেঁটে গ্রামের

দিকে যাত্রা করল। জমিদার-বাড়িতে সবাই ঘুমে অচেতন। গির্জায় প্রভাতী প্রার্থনার ঘন্টা বাজছে। রবিবারের সকালটা আলোয় উজ্জ্বল, আনন্দমুখর। আহা, বাঁচতে চাই, সুখী হতে চাই। গির্জা পার হয়ে স্তেপান বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ঘন্টা-ঘরটার দিকে তাকাল. তারপর শুঁড়িখানার পথ ধরল। দুর্ভাগ্য এই যে শুঁড়িখানাটা গির্জারও আগে খুলে যায়। সে যখন ভিতরে ঢুকল তখন কাউন্টারে মাতালদের ভিড় জমে গেছে।

''ভদ্‌কা।'' স্তেপান মুখ খুলল। তারা কিছুটা ঢেলে দিল। সেটা শেষ করে সে বসে পড়ল। আরও কিছুটা মুখে ঢালল। স্তেপান মদের নেশায় অন্যদেরও মদ বিলি করতে লাগল। একটা হৈ-হুল্লোড় শুরু হয়ে গেল।

সিদোর শুধাল, ''স্রেল্‌কভার কাছে তুমি বুঝি ভাল মাইনে পাও ?''

''যতটা পাওয়া উচিত। মাথামোটা! এখন মদ গেলো।''

''ভাল কথা। এটা ছুটির দিনের কল্যাণে। এটা রবিবারের কল্যাণে। কিন্তু তুমি ?''

''আমি...আমিও গিলছি....''

''আরও ভাল। সবই মনের মত, সবই খুশির কথা স্তেপান ম্যাক্সিমিচ। ঠিক আছে...আমি কি জানতে পারি তুমি দশ রুব্‌ল্ পাও কিনা ?''

''হা, হা। একজন মনিবের কি দশ রুবলে চলে? সে পায় একশ' রুবল।''

স্তেপান চোখ তুলে বক্তার দিকে তাকাল। চিনতে পারল তার বড় ভাই সেমিয়ন কোণের বেঞ্চে বসে মদ খাচ্ছে। তার পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে কেরাণি মানাফুলভের নেশায় ঢুলুঢুলু মুখ। সে কুৎসিতভাবে হাসছে।

টুপি খুলে সেমিয়ন বলল, ''জানতে পারি কি মশায়, গিন্নিঠাকরুণ কি ভাল ঘোড়া জোটাতে পেরেছে ? তুমি কি তাদের পছন্দ কর ?''

স্তেপান নিঃশব্দে আরও খানিকটা ভদ্‌কা ঢেলে নীরবেই পান করতে লাগল।

সেমিয়ন বলেই চলল, ''তারা নিশ্চয়ই খুব ভাল। তবে বড়ই দুঃখের কথা যে কোন কোচোয়ান নেই। কোচোয়ান না থাকলে মজা হয় না।''

মানাফুলভ স্তেপানের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার মাথাটা নেড়ে দিল।

বলে উঠল, ''তুমি...তুমি একটা শুয়োর। তুমি কি বোঝ না যে এটা পাপ, ভাল মানুষ! পাপও বোঝে না। আর ধর্মশাস্ত্রে কি লেখা আছে অ্যাঁ ?''

''ভাগো এখান থেকে। বোকারাম।''

''আমি বোকা আর তুমি চালাক। তা বটে। তুমি কোচোয়ান, কিন্তু ঘোড়া চালাও না। হি-হি। তিনি কি তোমাকে কফি খাওয়ান ?''

স্তেপান লাফিয়ে উঠে মানাফুলভের মস্ত মাথাটায় মারল বোতলের এক আঘাত। মানাফুলভ টলতে টলতেই বলতে লাগল ।

''ভালবাসা! সেটা কি বস্তু হে...উম্-উম্! ...কী দুঃখ যে তুমি বিয়েটা

করতে পারলে না। তাহলে তো মনিব বনে যেতে। আরে, ও তো এক আশ্চর্য মনিব হতে পারত হে ছোকরারা! খুব কঠিন মনিব, খুব অভিজ্ঞ!"

সকলে হো-হো করে হেসে উঠল। স্তেপান ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই একই মাথায় আবার বোতলের আঘাত হানল। এবার মানাফুলভ টলতে টলতে মাটিতে পড়ে গেল।

ভাইয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে সেমিয়ন গর্জন করে বলল, "কিসের জন্য ওকে মারছ? আগে বিয়েটা করো, তারপর লড়াই করো। আচ্ছা ছোকরারা, ও কিসের জন্য লড়াই করছে? বরং তোমাকেই শুধাই, কিসের জন্য তুমি লড়াই করছ?"

দুই চোখ কুঁচকে সেমিয়ন স্তেপানের কলারটা চেপে ধরে তার পেটে একটা ঘুষি মারল। মানাফুলভ উঠে দাঁড়িয়ে স্তেপানের চোখের সামনে লম্বা লম্বা আঙুলগুলো নাচাতে লাগল।

"ছেলেরা! কী যুদ্ধ! ঈশ্বরের দোহাই, কী যুদ্ধ! সবাই জুটে যাও!"

শুঁড়িখানাটা হট্টগোলে ভরে উঠল। কথা আর হাসি মিলেমিশে একাকার।

শুঁড়িখানার দরজার সামনে হট্টগোল বেঁধে গেল। মানাফুলভের কলারটা চেপে ধরে স্তেপান তাকে দরজা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। চিঁচিঁ করতে করতে কেরাণিটি সিঁড়ি দিয়ে একটা বলের মত গড়াতে লাগল। জনতা আরও জোরে হো-হো করে হেসে উঠল। শুঁড়িখানাটা লোকজনে ভর্তি। এটা সিদোরের কোন ব্যাপারই নয়, তবু সেও জমে গেল; কিছু না জেনেই দুম্ করে স্তেপানের পিঠে একটা কিল মারল। স্তেপান সেমিয়নের গলাটা চেপে ধরে তাকে দরজা দিয়ে ছুঁড়ে দিল। দরজার থামে সেমিয়নের মাথাটা ঠুকে গেল। সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে ছুটতে ধূলোর উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গল। তার ভাইটি ছুটে গিয়ে তার পেটের উপর নাচতে শুরু করল। একবার লাফিয়ে উঠছে, একবার নামছে—পাগলের মত নাচছে, মনের সুখে নাচছে। অনেকক্ষণ ধরে চলল এই লাফালাফি-দাপাদাপি।

কাজের লোকরা ঘন্টা বাজাতে শুরু করল। স্তেপান চারদিকে তাকাল। হাস্যমুখর একগাদা মুখ তাকে ঘিরে ধরেছে। প্রত্যেকেই অন্য সকলের চাইতে বেশী মাতাল, অধিক খোশমেজাজী। একগাদা কুৎসিত মুখ। ছিন্নবস্ত্র, রক্তাক্তদেহ সেমিয়ন ঘুষি পাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। শয়তানী ভঙ্গী তার মুখে। মানাফুলভ ধূলোয় গড়াগড়ি দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ধূলোয়-রক্তে তার দুই চোখ আটকে গেছে। এক ভয়ংকর হল্লোড় চলেছে তার চারপাশে।

স্তেপান চমকে উঠল। তার মুখ সাদা হয়ে গেল। সে পাগলের মত দৌড় দিল। বাকি সকলে ছুটল তার পিছনে।

'ওকে থামাও। ওকে থামাও। ওকে থামাও।" সকলে চীৎকার করে উঠল "ওকে ধর। ও খুনী।"

স্তেপান ভীষণ ভয় পেল। ভাবল, ধরতে পারলে ওরা তাকে খুন

করবে। সে জোরে ছুটতে লাগল। আরও জোরে।

"ওকে পাকড়াও। ওকে ধর।"

বুঝতে না পেরে তার বাবার বাড়িতেই ঢুকে পড়ল। হাট হয়ে খোলা ফটকটা বাতাসে দুলছে। সে ছুটে উঠোনে ঢুকল।

ফটক থেকে তিনি পা দূরে কাঠের টুকরো ও করাত-গুঁড়োর স্তূপের উপরে বসেছিল মারিয়া। দু পা মুড়ে, দুই হাতকে অসহায়ভাবে সামনের দিকে বাড়িয়ে সে একদৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল। মারিয়াকে দেখেই হঠাৎ একটা চমৎকার মতলব স্তেপানের উত্তেজিত, উদভ্রান্ত মনের মধ্যে ঝলসে উঠল।

ওই মৃত্যু-পাণ্ডুর, পদদলিত, গভীর ভালবাসার পাত্রী নারীটিকে নিয়ে সে এখান থেকে পালিয়ে যাবে, যতদূরে সম্ভব দূরে চলে যাবে। এই সব রাক্ষসদের কাছ থেকে যত দূরে সম্ভব ছুটে যাবে—যেমন কুবান-এ চলে যাবে। আর কুবান কত সুন্দর দেশ। পিওতর খুড়োর চিঠিগুলো যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহলে কুবান-এর তৃণভূমিতে কী আশ্চর্য স্বাধীনতাই না বিরাজ করে। সেখানকার জীবন আরো খোলামেলা, গ্রীষ্মকাল দীর্ঘতর, মানুষের মনের জোর আরও বেশী। সে ও মারিয়া প্রথমে মজুরের কাজ করবে, তারপর নিজেদের একখণ্ড জমিতে কাজ করবে। সেখানে থাকবে না কোন টাক-মাথা, জিপসি-চোখওয়ালা ম্যাক্সিম, থাকবে না সেমিয়ন ও তার নোংরামি এবং মাতালের বোকা-বোকা হাসি।

তার জিহ্বা আর কোন কথা উচ্চারণ করতে পারছে না বুঝেও বলতে লাগল, "কুবানে যাব, কুবানে....প্রিয়তর খুড়ো...তাকে জান। সে চিঠি লিখত..."

কিন্তু সব বৃথা আশা। কুবান বাতাসে মিলিয়ে গেল।...মিনতিভরা চোখ তুলে মারিয়া তাকল তার এলোমেলো, লম্বা চুলে ঢাকা ফ্যাকাসে, পাগলাটে মুখের দিকে। মারিয়া উঠে দাঁড়াল। তার ঠোঁট কাঁপছে।

মারিয়া আর্তনাদ করে উঠল, "তুমি এসেছ পাজী, শয়তান। তুমি? শুঁড়িখানায় তারা তো তোমার মুখ কেটে ঝামা ঘসে দিয়েছে। দেয় নি? তুমি আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছ। তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে। এর ফল তুমি নরকে গিয়ে ভোগ করবে। আমাকে অসহায়, একা পেয়ে তুমি আমাকে খুন করেছ।"

"থাম।"

"জানোয়ারের দল! একটি খৃস্টানের আত্মার জন্য তোমাদের করুণা হয় না? তোমরা আমাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছ; তোমরা তো জানোয়ার।...স্তেপান, তুমি খুনী। ঈশ্বরজননী তোমাকে শাস্তি দেবেন। অপেক্ষা করে থাক। তোমরা কিছুতেই রেহাই পাবে না। তুমি কি মনে কর, কেবল আমি কষ্ট পাচ্ছি? দেখ, তা ভেব না।.. তুমিও কষ্ট ভোগ করবে।

স্তেপান চোখ পিটপিট করে দুলতে লাগল।

"থাম। খৃস্টের দোহাই।"

"মাতাল। কার পয়সায় তুমি মদ খাও তা আমি জানি শূয়োর। আনন্দের জন্য মদ খাও? তুমি খুশি-খুশি বোধ করছ?"

"থাম মারিয়া। চলে এস..."

"কিসের জন্য তুমি এখানে এসেছ? কি চাও? তুমি কি হৈ-চৈ করতে এসেছ? সে সবের কি দরকার, তুমি তো সবই জান। সারা গ্রাম জানে বাজী ধরে বলছি, সারা দিন ধরে সকলে তোমাকে বিদ্রূপ করছে, তুমি শয়তান...."

স্তেপান মাটিতে লাথি মারল, তার পা কাঁপতে লাগল, চোখ দুটো চিকচিক করে উঠল, স্খলিত পায়ে এগিয়ে গিয়ে কনুই দিয়ে মারিয়াকে একটা খোঁচা মারল।

"বললাম না, চুপ কর। আমার পিছনে লেগো না।"

"আমার যা ইচ্ছা তাই বলব। তুমি আমাকে মারবে? ঠিক আছে, মার...আমাকে মার। আমার তো কেউ নেই। মারতে মারতে আমাকে মেরেই ফেল। তাতে আমার কি যায় আসে? কি স্নেহ-ভালবাসা আমি আশা করতে পারি? আমাকে মার, মেরে ফেল, তুমি জানোয়ার। আমাকে দিয়ে তোমার কি কাজ হবে? তুমি তো এক গিন্নিকে পেয়েছ ধনী সুন্দরী...আমি তো তুচ্ছ, সে অভিজাত। জানোয়ার, আমাকে মারছ না কেন?"

স্তেপান হাতের মুঠিটাকে পিছনে ঘুরিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘুষি মারল মারিয়ার রোষবিকৃত মুখের উপর। মাতালের হাতের সে আঘাত লাগল তার কপালের পাশে। মারিয়া টলতে টলতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল; তার মুখে একটি শব্দও উচ্চারিত হল না। সে যখন পড়ে যাচ্ছিল তখন স্তেপান আবার তার বুকে আঘাত করল।

স্বামী ঝুঁকে দাঁড়াল তার স্ত্রীর আতপ্ত মৃতদেহের উপর; বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে তার মুখের দিকে তাকাল; যন্ত্রণা তাকে বিধ্বস্ত করল; কিছুই না বুঝে সে বসে পড়ল স্ত্রীর দেহের পাশে।

সূর্য উঠেছে। তার উজ্জ্বল কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে বাড়ি-ঘরের মাথায়। গরম বাতাস বইছে। একে একে লোকজন এসে জড় হল স্তেপান ও মারিয়াকে ঘিরে: তখন এক গুরুভার যন্ত্রণা যেন তপ্ত বাতাসের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারা দেখল; দেখে বুঝতে পারল যে একটা খুন হয়েছে, কিন্তু নিজেদের চোখকে তারা বিশ্বাস করতে পারছে না। অস্পষ্ট দৃষ্টিতে স্তেপান সমবেত জনতার মুখগুলোকে ভাল করে দেখতে চেষ্টা করল, দাঁতে দাঁত লাগিয়ে কড়মড় করে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে লাগল। কেউ এগিয়ে গিয়ে তার হাত দুটো বাঁধল না। ম্যাক্সিম, সেমিয়ন ও মানাফুলভ ভিড়ের মধ্যেই পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল।

মৃত্যুপাণ্ডুর মুখে তারা শুধাল, "কিসের জন্য ও স্ত্রীকে মেরে ফেলল?"

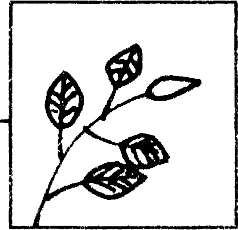
মা আর্তনাদ করতে করতে ঘুরছে।

খবরটা জমিদার বাড়ির গিন্নিঠাকরুণকে জানানো হল। সে হাঁপাতে শুরু করল, "স্মেলিং সল্ট" হাতে নিল, কিন্তু মূর্ছা গেল না।

ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "কী ভয়ংকর লোক এরা। আঃ কী সব মানুষ। অপদার্থ সব। ঠিক আছে, আমিও তাদের দেখে নেব। এবার তারা টের পাবে আমি কেমন চিড়িয়া।"

রেজেউহকি তাকে সান্ত্বনা দিতে গেল। বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে শান্ত করে তার খেয়ালী মনিব যে আসন থেকে তাকে সরিয়ে দিয়েছিল স্তেপানের জন্য, সেই পুরনো আসনটি আবার দখল করে নিল। আসনটি ছিল লাভজনক, আরামের এবং অত্যন্ত সুবিধাজনক। বছরে দশবার তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়, আবার দশবারই তাকে ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়। আর মাইনেটাও বেশ ভাল।

১৮৮২



বিলম্বিত মুকুল

Late Blossoms

এন. আই. করোবভ-কে

॥ ১ ॥

ঘটনাটা ঘটেছিল হেমন্তকালের এক বিবর্ণ অপরাহ্নে প্রিক্‌লোনস্কি রাজবাড়িতে।

তরুণ প্রিন্সের কক্ষে দাঁড়িয়ে রাণী ও তার মেয়ে মারুস্যা হাত কচলে-কচলে মিনতি জানাচ্ছিল। তারা মিনতি জানাচ্ছিল ঠিক যেভাবে কেবল দুঃখী, ক্রন্দনরতা মেয়েরাই প্রভু খৃস্টের নামে, নিজেদের সম্মানের নামে, পিতৃপুরুষের নামে মিনতি জানিয়ে থাকে।

রাজমাতা প্রিন্স ইগরের সম্মুখে নিশ্চল দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

প্রতিটি কথায় মারুস্যাকে বাধা দিয়ে রাজমাতা চোখের জল আর কথার তোড়ের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠুর, কুটূক্তিপূর্ণ ভর্ৎসনা, প্রিয়-বচন ও অনুরোধ-বাণী দিয়ে প্রিন্সকে একেবারে ভাসিয়ে দিচ্ছিল। তার মুখে হাজারবার উচ্চারিত হচ্ছিল বণিক ফুরভের নাম যে তাদের হ্যাণ্ডনোটকে অস্বীকার করেছিল, এবং তাদের স্বর্গত পিতার নাম যার কংকাল এখন কবরে শুয়েও নড়েচড়ে পাশ ফিরছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন কি ডাক্তার তপর্কভের নামও।

ডাক্তার তপর্কভ প্রিকোলনস্কি বংশের গলার কাঁটা। তার বাবা ছিল চিরদাসমজুর ঃ সেংকা স্বর্গত প্রিন্সের খাস-খানসামা। তার মামা নিকিফর সেদিন পর্যন্তও ছিল প্রিন্স ইগরের খাস-খানসামা। প্রিন্সের ছবি, কাঁটা, জুতো

দাঁতগুলো ঠিক মত পরিষ্কার না করার জন্য শৈশবে ডাক্তার তপর্কভ নিজেও মাথায় অনেক গাট্টা খেয়েছে। আর আজ—এটা কি অর্থহীন নয়!—সে একজন তরুণ, মেধাবী ডাক্তার, বাস করে ভদ্রলোকের মত একটা বিশাল বড় বাড়িতে, আর দুই ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে, বুঝিবা প্রিক্লোনস্কিদের শিক্ষা জানাতেই, কারণ তারা আজ পায়ে হেঁটে চলে আর একটা গাড়ি ভাড়া করার আগে হাজারবার দরকষাকষি করে।

কাঁদিতে কাঁদিতে চোখের জল না মুছেই রাজমাতা বলল, "সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে, সকলেই তাকে ভালবাসে, সে ধনী, সুদর্শন, সর্বত্র স্বাগত....তোমার আগেকার চাকর নিকিফরের ভাগ্নে! একথা বলতে লজ্জা হয়। আর এর কারণ কি? কারণ সে ভাল ব্যবহার করে, মদ খেয়ে হুল্লোর করে না, খারাপ লোকের সঙ্গে মেশে না—সে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করে—আর তুমি? হা ঈশ্বর।"

প্রিন্সেস মারুস্যার বয়স প্রায় বিশ বছর, ইংরেজী উপন্যাসের নায়িকার মত সুন্দরী, আশ্চর্য সুন্দর রেশমের মত চুল, দক্ষিণ আকাশের মত নীল বড় বড় বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। সেই মায়ের মতই জোবালো ভাষায় বড় ভাই ইগরের কাছে মিনতি জানাচ্ছিল।

মার কথার পাশাপাশিই সেও কথা বলছিল। বড় ভাইয়ের বাসী মদের গন্ধেভরা খোঁচা-খোঁচা দাঁড়িতে চুমু খাচ্ছিল, মাথার চুলে ও গালে হাত বুলোচ্ছিল, ভীত কুকুর-বাচ্চার মত জড়িয়ে ধরে আদর করছিল। নরম নরম কথা ছাড়া আর কিছুই বলে নি। বড় ভাইয়ের প্রতি বকুনির মত শোনায় এমন কোন শাসকের কথা বলার মত বয়সই তার হয় নি। বড় ভাইকে সে বড় ভালবাসে। তার মতে তার দুশ্চরিত্র দাদা প্রিন্স ইগর একজন অবসরপ্রাপ্ত হুজার; সে পরম সত্যের প্রতীক, শ্রেষ্ঠ গুণের আধার। তার স্থির বিশ্বাস, অবিচল বিশ্বাস, এই পাপাশয় মাতালের বুকের মধ্যে যে হৃদয় আছে তা যে কোন পরীর কাছেও ঈর্ষার বস্তু। তার মধ্যে সে দেখতে পায় এক পরাজিত নায়ককে, যাকে সকলেই ভুল বুঝেছে, কেউই চিনতে পারে নি। তার এই উচ্ছৃংখল সুরাসক্তিকে সে প্রবল উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই ক্ষমা করে থাকে তার চাইতেও বেশী। বহুদিন আগেই ইগর তাকে নিশ্চিতভাবে বুঝিয়েছে যে, মনের দুঃখেই সে মদ খায়; যে ব্যর্থ ভালবাসা তার অন্তরকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে তাকে ভুলতেই সে মদ ও ভদ্কায় ডুবে থাকে; নিজের হুজারসুলভ মন থেকে তার আশ্চর্য মূর্তিটাকে মুছে ফেলার চেষ্টাতেই সে এই সব সাধারণ পানীয়ের আশ্রয় নিয়েছে। কোন্ মারুস্যা, কোন্ নারী ভালবাসাকে হাজারবার শ্রদ্ধার ও ক্ষমার যোগ্য বলে মনে করে না?

তাকে জড়িয়ে ধরে, তার সুরাস্ফীত, রক্তিম-নাসিকা মুখে চুমু খেয়ে মারুস্যা বলল, "তুমি দুঃখে মদ খাও সে-কথা সত্য কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে সে দুঃখকে তুমি ভুলে যাও। সব দুঃখী লোকরাই কি মদ খায়? ধৈর্য ধর, শক্তিমান হও যুদ্ধ কর। বীর হও। তোমার মত মন যার, তোমার মত

সৎ ও প্রেমপ্রবণ যার আত্মা, ভাগ্যের আঘাতকে . অবশ্যই সহ্য করতে পারবে। হায়রে, তোমার মত সব ব্যর্থ মানুষরাই [illegible]

তারপরই মারুস্যা (পাঠক, তাকে ক্ষমা করুন) দুর্গেনেভের কদিন-চরিত্রটির উল্লেখ করে ইগরকে সেটা ব্যাখ্যা করে শোনাতে লাগল।

প্রিন্স ইগর বিছানায় শুয়ে দুটি ছোট লাল চোখ মেলে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইল। তার মাথার ভিতরটা ভোঁ ভোঁ করছে। পেটের ভিতরটা কি রকম যেন ভরা-ভরা লাগছে। সবেমাত্র নৈশ ভোজনের পরে এক বোতল লাল মদ খেয়েছে, আর এখন একটা তিন কোপেক দামের চুরুট টানতে টানতে চুপচাপ শুয়ে আছে। তার মেঘে-ঢাকা মস্তিষ্কের আর রুগ্ন, ছোট মনের মধ্যে সবরকম ভাবাবেগ ও চিন্তা-ভাবনা এসে ভিড় করেছে। ক্রন্দনরতা মা ও বোনের জন্য তার দুঃখ হচ্ছে, তবু সে খুবই চাইছে যে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে যাক; তার নিদ্রায় তারা ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। তার কাছে এসে বক্তৃতা করার জন্য সে খুব রেগে গেছে, আবার বিবেকের একটি ক্ষীণ দংশনও (যদিও খুবই ক্ষীণ) তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। সে নির্বোধ, কিন্তু এতটা নির্বোধ নয় যে প্রিক্লোনস্কি-বংশের বাড়িটা যে তার জন্যই ধ্বংস হতে বসেছে সেটুকুও বুঝতে পারে না।

রাজমাতা ও মারুস্যা অনেক, অনেক সময় ধরে তাকে বোঝাল। বসবার ঘরে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটি মহিলা অতিথিও এসেছে, তবু তারা বলেই চলেছে, বলেই চলেছে। শেষ পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থেকেও ঘুমতে না পেরে বিরক্ত হয়ে প্রিন্স এমনভাবে হাত-পা টান-টান করল যে তার হাড়গুলো মট মট্ করে উঠল। তারপর সে বলল :

"ঠিক আছে। আমি নিজেকে শোধরাতে চেষ্টা করব।"

"একজন সম্ভ্রান্ত মানুষ হিসাবে কথা দিচ্ছ ?"

"কথা যদি না রাখি তাহলে ঈশ্বর যেন আমাকে শাস্তি দেন।"

তার মা ও বোন তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আবার তাকে দিয়ে ঈশ্বরের নামে ও নিজের সম্মানের নামে শপথ করিয়ে নিল। ইগর পুনরায় নিজের সম্মানের নামে শপথ করল; আর বলল, সে যদি তার উচ্ছৃংখল জীবনযাত্রাকে পরিত্যাগ না করে তাহলে সেই মুহূর্তেই যেন তার মৃত্যু ঘটে। রাজমাতার কথামত সে দেবমূর্তিকে চুম্বন করল। তারপর তিনবার ক্রুশ চিহ্ন আঁকল। এক কথায়, আন্তরিকভাবেই শপথটা নিল।

"তোমার উপর আমাদের বিশ্বাস আছে।" এই কথা বলে রাজমাতা ও মারুস্যা ছুটে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করল। তারা সত্যি তার কথায় বিশ্বাস করল। সত্য বাক্য, প্রভুর কাছে আন্তরিক আবেদন, দেবমূর্তিকে চুম্বন—এ সব সম্মিলিত হলে যা হয় তাকে কি কেউ অবিশ্বাস করতে পারে? তার উপর, যেখানে ভালবাসা আছে, সেখানেই তো থাকে সীমাহীন বিশ্বাস। দুটি নারী যেন জীবন ফিরে পেল; জেরুজালেম-উদ্ধারের উৎসব পালনে রত ইহুদিদের মত উজ্জ্বল মুখে দু'জনেই বেরিয়ে গেল ইগর-উদ্ধারে সফল হয়ে

উৎসব করতে। অতিথির সঙ্গে দেখা করে এক কোণে বসে তারা চাপা স্বরে আলোচনা করতে লাগল, কেমন করে ইগর নিজেকে সংশোধন করবে, —একটা নতুন জীবন শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত তারা সাব্যস্ত করল, সে অনেক দূর পর্যন্ত যাবে, অচিরেই সে সব অবস্থার সামাল দেবে, নিদারুণ দারিদ্র্য তাদের আর সহ্য করতে হবে না—পার হতে হবে না সেই "রুবিকন" সর্বহারাদের যা অবশ্যই পার হতে হয়। তারা এ সিদ্ধান্তও করল যে, ইগর নিশ্চয়ই কোন ধনবতী সুন্দরী নারীকে বিয়ে করবে। সে এত সুদর্শন, কর্মকুশল ও বিখ্যাত যে তাকে ভালবাসবে না এমন স্ত্রীলোক খুঁজে পাওয়াই শক্ত। অবশেষে, রাজমাতা পূর্বপুরুষদের জীবন-কাহিনী বলতে লাগল, যাতে ইগর অচিরেই তাঁদের পদাংক অনুসরণ করতে পারে। ঠাকুরদা প্রিক্‌লন্‌স্কি ছিলেন রাষ্ট্রদূত; ইউরোপের সবগুলি ভাষা তিনি বলতে পারতেন। তার স্বামী ছিলেন এক বিখ্যাত সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডিং অফিসার। আর তার ছেলে হবে...হবে...কি হবে?

তরুণী প্রিন্সেসই সেটা স্থির করে দিল, "সে কি হবে সেটা তো দেখতেই পাবে। নিজের চোখেই দেখবে।"

বিছানায় শুয়ে অনেক সময় পর্যন্ত তারা মধুর ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তারা অনেক সুখের স্বপ্ন দেখল। সে স্বপ্ন এতই মধুর যে ঘুমের মধ্যেই তারা সুখের হাসি হাসল। ঠিক পরের দিনই আবার যে আতংকের মধ্যে তাদের কাটাতে হবে, হয়তো এই সুখের স্বপ্ন দেখিয়ে ভাগ্য তারই ক্ষতিপূরণ করে দিল। ভাগ্য সব সময়ই কৃপণ হয় না; কখনও কখনও সে আগাম পাওনা মিটিয়ে দেয়।

ভোর প্রায় তিনটের সময় ঠিক যখন রাজমাতা স্বপ্ন দেখছিল তার আদরের দুলাল সেনাপতির পোশাকে ঝলমল করছে, আর মারুস্যা স্বপ্ন দেখছিল বড় ভাইয়ের সদ্যসমাপ্ত চমৎকার বক্তৃতা শুনে সে নিজেই তার প্রশংসা করছে ঠিক তখনই একটা সাধারণ ছ্যাকরা গাড়ি প্রিক্‌লন্‌স্কিদের বাড়িতে ঢুকল। তাতে বসেছিল শ্যাতো দ ফ্লা রেস্তোরাঁর পরিচালক, আর সে দুই হাত দিয়ে ধরে ছিল প্রিন্স ইগরের মহান দেহ —মদে একেবারে চুর। ইগর তখন সম্পূর্ণ অচেতন। পরিচালকের দুই হাতের উপর থেকে সে ঝুলছিল ঠিক যে ভাবে একটা সদ্য গলা-কাটা হাঁসকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় রান্না-ঘরে। কোচোয়ান গড়ির বাক্স থেকে লাফ দিয়ে নেমে ফটকের ঘন্টাটা বাজাল। নিকিফর ও রাঁধুনি বেরিয়ে এসে কোচোয়ানকে ভাড়া মিটিয়ে দিল এবং বেহুঁশ দেহটাকে দোতলায় বয়ে নিয়ে গেল। বুড়ো নিকিফর এতে বিস্মিত হল না, আতংকিতও হল না; স্বাভাবিক অভ্যস্ত হাতেই নিশ্চল দেহটা থেকে পোশাক খুলে ফেলল; তাকে পালকের বিছানায় শুইয়ে একটা কম্বলে ঢেকে দিল। চাকর-বাকররা একটা কথাও বলল না। মনিবকে এই ভাবে বয়ে নিয়ে যাওয়া, পোশাক ছাড়ানো, কম্বলে ঢেকে দেওয়া—এ সব দেখতে তারা দীর্ঘদিন ধরে অভ্যস্ত; কাজেই তারা এতটুকু বিস্মিত বা

আতঙ্কিত হল না। মাতাল ইগর তাদের চোখে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আতংকিত হবার সময় এল পরদিন সকালে।

পরদিন বেলা এগারোটা। রাজমাতা ও মারুস্যা কফিপানে ব্যস্ত। খাবার ঘরে ঢুকে নিকিফর মহামান্যদের জানাল, প্রিন্স ইগরের ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না।

নিকিফর বলল, "মনে হচ্ছে উনি মরণাপন্ন। দয়া করে দেখবেন চলুন।"

রাজমাতা ও মারুস্যার মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। রাজমাতার মুখের গ্রাস পড়ে গেল। মারুস্যার কফির কাপটা উল্টে গেল ; দুই হাতে বুক চেপে ধরল ; আঘাতে ও আতংকে তার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করতে লাগল।

নিকিফর কাঁপা গলায় বলল, "সকাল তিনটের সময় হিজ হাইনেস খোলা মেজাজে ফিরে এলেন, কিন্তু এখন—প্রভুই জানেন কি হয়েছে—তিনি এপাশ-ওপাশ করছেন আর গোঙাচ্ছেন"

রাজমাতা ও মারুস্যা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ছুটে গেল ইগরের শোবার ঘরে। ফ্লানেলের একটা ভারী কম্বলের নীচে ইগর শুয়ে আছে। বিবর্ণ সবুজ মুখ, এলোমেলো চেহারা, চোখ দুটো ভয়ংকর রকমের বসে গেছে ; নিঃশ্বাস নিচ্ছে নাক ডাকিয়ে, অনবরত হাত-পা ছুঁড়ছে আর কাঁপছে। মাথা ও হাত এক মুহূর্তের জন্যও স্থির নেই। বুকের ভিতর থেকে একটা গোঙানির শব্দ উঠছে। কিসের একটা লাল দলা—রক্তের বলেই মনে হয়—গোঁফের নীচে ঝুলে আছে। মারস্যা যদি তার মুখের উপর ঝুঁকে দাঁড়াত তাহলে দেখতে পেত তার উপরের ঠোঁটে একটা ছোট ক্ষত, আর উপরের পাটির দুটো দাঁত নেই। তার সারা শরীর থেকে গরম ভাঁপ আর মদের গন্ধ বের হচ্ছে।

রাজমাতা মারুস্যা মেঝেতে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

নিজের মাথাটা চেপে ধরে মারুস্যা বলল, "তার মৃত্যুর সব দোষ আমাদের। গতকাল আমরা তাকে বকে বকে বেহাল করে ফেলেছি, আর...এতটা সে সহ্য করতে পারে নি। তার মনটা বড় নরম। এটা আমাদের দোষ মামন।"

নিজেদের দোষ স্বীকার করতে গিয়ে তারা দু'জনেই চোখ বড় বড় করে কাঁপতে কাঁপতে পর-স্পরকে জড়িয়ে ধরল। লোকে যখন দেখে যে একটা ভয়ংকর ঘর্-ঘর্ শব্দ করে মাথার উপরকাব ছাদটা ভেঙে পড়ছে, আর তার নীচে চাপা পড়ে তারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে একমাত্র তখনই মানুষ এইভাবে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে।

রাঁধুনিটি বুদ্ধি করে ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিল। ডাক্তার এল। আইভান এডল্‌ফোভিচ ছোটখাট মানুষ ; মাথাজোড়া বিরাট টাক, শুয়োরের মত বোকা-বোকা চোখ, আর বাটির মত ভুঁড়ি। দু'জনই তাকে সাদর অভ্যর্থনা

জানাল, যেন তাদের বাবা এসেছে। ডাক্তার ইগরের শোবার ঘরের বাতাস শুঁকল, তার নাড়ি দেখল, আর একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে ভুরু কুঁচকাল।

রাজমাতাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, ''আপনি কিছু চিন্তা করবেন না ইয়োর হাইনেস। আমি ঠিক বুঝি না, তবে আমার মতে আপনার ছেলে যে খুবই—কি বলে— বিপন্ন দেখে তো তা মনে হয় না…এটা কিছুই না।''

কিন্তু মারুস্যাকে ডাক্তার সম্পূর্ণ অন্য কথা বলল।

''আমি ঠিক বুঝি না, কিন্তু আমার মতে…কি জান প্রিন্সেস, সকলেরই তো একটা মতামত থাকতে পারে.. আমার মতে প্রিন্সেস সব কিছুই নির্ভর করছে….বলতে গেলে সবই নির্ভর করছে চরম সংকট-কালের উপর।''

''ওর কি খুবই বিপদ?'' মারুস্যা শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল।''

আইভান এডলফোভিচ ভুরু কুঁচকে প্রমাণ করতে চাইল যে তার প্রত্যেকটি মতামতই…তার হাতে একটা দশ-রুবলের নোট দেওয়া হল। সে ধন্যবাদ জানাল, কি রকম যেন বিব্রত হল, গলা খাঁকারি দিল, তারপর চলে গেল।

কিছুটা সামলে ওঠার পরে রাজমাতা ও মারুস্যা স্থির করল, একজন স্পেশালিষ্টকে ডাকা হোক। স্পেশালিষ্ট বহু ব্যয়সাপেক্ষ, কিন্তু…তার আর কি করা যাবে? প্রিয়জনের জীবন অর্থের চাইতে মুল্যবান। রাঁধুনি ছুটল তপর্কভের বাড়ি। বলাই বাহুল্য, তাকে বাড়িতে পেল না, একটা চিঠি লিখে আসা হল। সে ডাকে তপর্কভ দ্রুত সাড়া দিল না। তারা ভগ্নহৃদয় ক্রমবর্ধমান শংকার মধ্যে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করে রইল একটা দিন, তারপর একটা রাত। পরদিন সকালে… ইতিমধ্যে আর একজন ডাক্তারকে ডেকে আনতেও চেয়েছিল এবং স্থির করেছিল, তপর্কভ এলে তাকে একটা আনপড় হাতুড়ে ডাক্তার বলবে এবং তার মুখের উপরেই বলে দেবে… ভবিষ্যতে সে যেন অন্য কাউকে এভাবে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিয়ে না রাখে। নিজেদের যত দুঃখই হোক, তবু এতে প্রিক্লোন্স্কি-বাড়ির অন্য সকলেই অত্যন্ত মর্মাহত হল। শেষ পর্যন্ত পরদিন বেলা দুটোর সময় একটা কালাশ এসে দাঁড়াল গাড়িবারান্দার নীচে। নিকিফর ছুটে দরজার কাছে গেল এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সসম্মানে ভাগ্নের কাঁধ থেকে কোটটা খুলে নিল। তপর্কভ একটু কেশে নিজের আগমন ঘোষণা করল এবং কাউকে অভিবাদন না করে রোগীর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। হল, বসবার ঘর ও খাবার ঘরের ভিতর দিয়ে সে হেঁটে গেল সেনাপতির মত জমকালো ভঙ্গিতে, তার চকচকে জুতোর মশ্‌মশ্‌ আওয়াজ সারা বাড়ির লোক শুনতে পেল। সে কিন্তু কারও দিকে তাকাল না। তার চেহারা রাজকীয়, জমকালো, দেখার মত, অত্যন্ত সুঠাম, যেন হাতির দাঁত থেকে কেটে তোলা। অতীব গম্ভীর মুখে সোনার ফ্রেমের চশমা তার গর্বোন্নত ভঙ্গীকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। সাধারণ ঘরে তার জন্ম, কিন্তু বলিষ্ঠ মাংসপেশী ছাড়া তার মধ্যে সাধারণ বলে আর কিছুই নেই। দেখতে সে পুরোপুরি অভিজাত। তার মুখ

গোলাপী ও সুদর্শন; তার রোগিনীদের কথা বিশ্বাস করলে তাকে সুপুরুষই বলতে হবে। তার গলা যে কোন নারীর মতই সাদা। তার চুল রেশমের মত নরম, কিন্তু দুঃখের কথা যে সে চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। তপর্কভ যদি তার চেহারা নিয়ে ভাবত তাহলে মাথার চুল না ছেঁটে কলার পর্যন্ত নামিয়ে দিত। তার মুখ সুন্দর, কিন্তু এতই শুকনো আর গম্ভীর যে মনোহারী দেখায় না; গম্ভীর আর নির্বিকার বলে প্রতিদিন সারাদিন কাজের পরিশ্রমের ফলে তার মুখটা অতিশয় ক্লান্ত দেখায়।

মারুস্যা তপর্কভের সঙ্গে দেখা করতে গেল এবং হাত কচলাতে কচলাতে তাকে মিনতি শুরু করল। আগে কখনও সে কাউকে মিনতি করে নি।

বড় বড় চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওকে বাঁচাও ডাক্তার। তোমাকে মিনতি করছি। তুমি আমাদের একমাত্র আশা।"

তপর্কভ মারুস্যার পাশ দিয়ে হেঁটে ইগরের কাছে গেল।

রোগীর ঘরে ঢুকে হুকুমের ভঙ্গীতে বলল, "ঘুলঘুলিগুলো খুলে দাও। ওগুলো খোলা হয় নি কেন? নিঃশ্বাস নেবে কেমন করে?"

রাজমাতা, মারুস্যা ও নিকিফর জানালা ও স্টোভের দিকে ছুটে গেল। জানালায় ডবল ফ্রেম লাগানো, তাতে কোন ঘুলঘুলি ছিল না। স্টোভটাও জ্বালানো হয় নি।

প্রিন্সেস ভয়ে ভয়ে বলল, "এ বাড়িতে কোন ঘুলঘুলি নেই।"

"আশ্চর্য। হুম্...এই পরিবেশে আমাকে চিকিৎসা করতে হবে? আমি পারব না।"

গলাটা আরও একটু চড়িয়ে তপর্কভ বলল।

"ওকে হলে নিয়ে যাও। ওটা এত গুমোট নয়। চাকরদের ডাক।"

নিকিফর ছুটে বিছানার মাথার কাছে গেল। বাড়িতে নিকিফর, রাঁধুনি, ও আধকানা সহচরী ছাড়া আর কোন পরিচারক না থাকায় রাজমাতা লজ্জায় লাল হয়ে নিজেই বিছানার একটা কোণ ধরল। মারুস্যাও খাটে হাত লাগিয়ে যথাসাধ্য টানতে লাগল। বিছানাটা তুলতে থুত্থুরে বুড়ো ও দুটি স্ত্রীলোকের হাঁপ ধরে গেল, নিজ নিজ শক্তির উপর বিশ্বাসের অভাবের দরুণ তাদের পা টলতে লাগল, ভয় হল বুঝিবা বিছানাটা ফেলেই দেবে। যাই হোক, সেইভাবেই বিছানাটাকে ঘর থেকে বের করা হল। রাজমাতার পোশাক কাঁধের কাছে ছিঁড়ে গেল, সে পেটে ব্যথা অনুভব করল। মারুস্যার চোখের সামনে সব কিছু যেন ভাসতে লাগল; দুই হাতে ভয়ংকর ব্যথা করতে লাগল—ইগর কি এত ভারী। আর "ডক্টর অব মেডিসিন" তপর্কভ! সে প্রভুত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীতে বিছানার পিছন পিছন হেঁটে চলল; বাজে কাজে সময় নষ্ট হচ্ছে বলে রাগে ভুরু কোঁচকাতে লাগল। মহিলাদের সাহায্য করতে একটা আঙুলও তুলল না। কী জানোয়ার!

বড় পিয়ানোটার পাশে বিছানাটা নামানো হল। তপর্কভ কম্বলটা তুলে

ফেলল ; রাজমাতাকে প্রশ্ন করতে করতেই ইগরের পোশাক খুলে ফেলল। এক সেকেণ্ডের মধ্যে তার শার্টটাও এক টানে খুলে ফেলল।

"দয়া করে সংক্ষেপ করুন। রোগীর সঙ্গে এ সবের কোন সম্পর্ক নেই।" রাজমাতার কথাগুলি শুনতে শুনতেই তপর্কভ বকুনি লাগাল। "অন্য সকলেই ঘর থেকে চলে যেতে পারে।"

একটা ছোট হাতুড়ি দিয়ে সে ইগরের বুকটা ঠুকল ; রোগীকে উপুড় করে শুইয়ে আবার ঠুকল ; বড় বড় করে শ্বাস টানতে টানতে কান পেতে হাতুড়ির শব্দ শুনল (হাতুড়ির শব্দ শোনার সময় ডাক্তাররা সর্বদাই জোরে শ্বাস টানে) ; তারপর রোগ নির্ণয় হল ঃ মদের জ্বর।

"একটা জ্বর-শার্ট গায়ে রাখলে কোন ক্ষতি করবে না।" প্রতিটি শব্দের উপর জোর দিয়ে সে কথাগুলি বলল।

আরও কিছু পরামর্শ দিয়ে ব্যবস্থা-পত্রটি লিখেই সে দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। লেখার সময় অন্য সব কথার মধ্যে ইগরের পদবীটাও জানতে চাইল।

"প্রিন্স প্রিক্‌লনস্কি", রাজমাতা বলল।

"প্রিক্‌লনস্কি ?" তপর্কভ পুনরাবৃত্তি করল।

রাজমাতা মনে মনে বল্‌ল, "তোমার পুরনো জমিদারের নামটা তুমি কত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছ।"

নিজের চিন্তাতেই রাজমাতা "মনিব" কথাটা ব্যবহার করতে পারল না ; প্রাক্তন চিরদাসের চেহারাটা বড় বেশী প্রভুত্বব্যঞ্জক।

তার সঙ্গে পাশের ঘর পর্যন্ত গিয়ে রাজমাতা ভগ্নহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করল ঃ

"ডাক্তার, ওর কি কোন বিপদ ঘটতে পারে ?"

"আমি তো মনে করি না।"

"ও কি সেরে উঠবে ? তোমার কি মনে হয় ?"

"আমি তো তাই মনে করি", ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিয়ে দায়সারাভাবে মাথাটা নেড়ে ডাক্তার সিঁড়ি ভেঙে তার গাড়ির কাছে চলে গেল ; ঘোড়া দুটিও তার নিজের মতই রাজকীয় ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক।

ডাক্তার চলে গেলে চব্বিশ ঘন্টাব্যাপী উৎকণ্ঠার পরে রাজমাতা ও মারুস্যা প্রথম খোলা মনে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তপর্কভ তাদের আশা দিয়েছে।

মনে মনে পৃথিবীর সব ডাক্তারকে আশীর্বাদ করে রাজমাতা বলল, "সে কত বিবেচক, কত সুন্দর।" সন্তান সুস্থ হলেই মায়েরা ওষুধে বিশ্বাস করে।

নিকিফর মন্তব্য করল, "একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক।" অথচ দীর্ঘকাল ধরে কেবলমাত্র ইগরের মাতাল ইয়ার ছাড়া আর কোন ভদ্রলোককে সে মনিবের বাড়িতে দেখে নি। ছোটখাট বুড়ো মানুষটা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে এই বিশিষ্ট ভদ্রলোকটি সেই নোংরা কোল্‌কা ছাড়া অপর কেউ নয় যাকে সে অনেক, অনেক দিন আগে জলের গাড়ির নীচ থেকে ঠ্যাং ধরে টেনে বের

করে পিটিয়েছিল।

তার ভাগ্যেটিই যে সেই ডাক্তার এ কথা রাজমাতা আগে তাকে বলে নি।

সেদিন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পরে দুঃখে ও পরিশ্রমে কাতর মারুস্যার হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা লেগে গেল; ফলে সে বিছানা নিল। ঠাণ্ডা লাগার পরে প্রবল জ্বর এল। বুকের পাশে ব্যথা। সারারাত সে ভুল বকল, আর আর্তনাদ করল।

''আমি মরে যাচ্ছি মামন।''

আর সকাল ন'টার পরে এসে তপর্কভকে একজনের পরিবর্তে দুই রোগীর চিকিৎসা করতে হল । প্রিন্স ইগর ও মারুস্যা। মারুস্যার রোগ নির্ণিত হল ফুসফুসের প্রদাহ।

প্রিক্লনস্কিদের বাড়িতে মৃত্যুর গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। অদৃশ্য অথচ ভয়ংকর গন্ধটা দুটো শয্যার উপর ঘুরতে লাগল; ভয় হতে লাগল; যেকোন মুহূর্তে সে বৃদ্ধা রাজমাতার সন্তানদের ছিনিয়ে নিতে পারে। গভীর হতাশায় সে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল।

তপর্কভ তাকে বলল, ''আমি জানি না, জানতে পারি না, আমি ভবিষ্যদ্বক্তা নই। কয়েক দিনের মধ্যেই সব বোঝা যাবে।''

ডাক্তারের সেই নিরস, নিরাসক্ত কথাগুলি দুঃখিনী বৃদ্ধ মহিলাটির অন্তরকে কেটে ফালা-ফালা করে দিল। কথাগুলির মধ্যে যদি একটাও আশার বাণী থাকত। তার দুঃখের মাত্রা আরও বেড়ে গেল যখন তপর্কভ রোগীদের জন্য কোন ব্যবস্থা-পত্র লিখল না। কেবল শরীরে মৃদু আঘাত, হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি-বিকার, আর তিরস্কারই করে চলল, কারণ ঘরের বাতাসটা তাজা ছিল না। আর সেঁকটা দেওয়া হয়েছিল ভুল জায়গায় ও ভুল সময়ে। এই সব নতুন নতুন ব্যবস্থাকে বৃদ্ধ মহিলাটি বাজে বুজরুকি বলেই মনে করে। পৃথিবীর অন্য সবকিছু ভুলে গিয়ে দিনে রাতে সারাক্ষণ সে এক বিছানা থেকে আর এক বিছানায় ছুটাছুটি করল, মানত করল, আর প্রার্থনা করল।

তার ধারণামতে জ্বর ও ফুসফুসের প্রদাহ মারাত্মক রোগ। তার উপর যখন মারুস্যার থুথুর সঙ্গে রক্ত উঠে এল তখন সে ধরেই নিল তার মেয়ের ''ক্ষয়-রোগ'' হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে মূর্ছা গেল।

সাত দিনের দিন মেয়ে যেন হাসতে হাসতে উঠে বসে বলল, ''আমি ভাল হয়ে গেছি,'' তখন তার সে কী আনন্দ।

সাত দিনের দিন ইগরও ভাল হয়ে উঠল। তপর্কভ বাড়িতে এলে রাজমাতা যেন ঈশ্বরকে হাতের কাছে পেল। আনন্দে হাসতে হাসতে ও কাঁদতে কাঁদতে সে ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলল ঃ

''আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ ডাক্তার। তুমি আমার সন্তানদের বাঁচিয়েছ। তোমাকে ধন্যবাদ।''

''সে কি!''

''তোমার কাছে আমার অনেক ঋণ। তুমি আমার ছেলেমেয়েকে বাঁচিয়ে

তুলেছ।"

"ওঃ...সাত দিনে। ...মি তো পঞ্চম দিনেই এটা আশা করেছিলাম। অবশ্য, ওটা একই কথা। ...সকালে ও সন্ধ্যায় এই চূর্ণটা খাওয়াবেন। সেঁকটা চালিয়ে যাবেন। ভারী ক... ...র পরিবর্তে একটা পাতলা কম্বল দিতে পারেন। ছেলেকে টক পানীয় ... ...আজ সন্ধ্যায় আমি আসব।"

একটু মাথা নুইয়ে ... ...টি ... পা ফেলে সেনাপতির ভঙ্গীতে হেঁটে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে...

॥ ২ ॥

দিনটি পরিষ্কার, ...কুয়াশাঢাকা; হেমন্তকালের এমন দিনেই ঠাণ্ডা, স্যাঁৎসেঁতে, ...স্বেচ্ছায় পায়ে পরতে ইচ্ছা করে। বাতাস এতই স্বচ্ছ যে সব ... ...গির্জাঘরের চূড়ায় বসেথাকা দাঁড়কাকের ঠোঁটটাও দেখা যায়। ... ...স হেমন্তের সুবাস। বাইরে বের হলেই দুই গালে দেখা দেয় পাকা ...আপেলের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আভা। পায়ের নীচেকার হলুদ পাতাগুলি ...রের আলোয় সোনালী রুবলের মত ঝলমল্ করে। শান্ত প্রকৃতি নিঃশব্দে ঘুমিয়ে আছে। বাতাস বইছে না। একটা শব্দও শোনা যাচ্ছে না। বসন্ত ... গ্রীষ্মে ক্লান্ত প্রকৃতি বুঝি সূর্যের আলোয় আরাম উপভোগ করছে, আর ...ই পরম প্রশান্তির মধ্যে সকলেরই শান্তিতে থাকার সাধ জেগেছে।

এই রকমই একটা দিনে মাকস্যা ও ইগর জানালায় বসে তপর্কভের শেষ বারের মত আসার অপেক্ষা করছিল। আতপ্ত, আরামদায়ক সূর্যের আলো জানালা দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে কার্পেট, চেয়ার ও বড় পিয়ানোটার উপর। সব কিছুই আলোয় উজ্জ্বল। জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে মাকস্যা ও ইগর রোগ-নিরাময়ের আনন্দ উপভোগ করছিল। সদ্য রোগমুক্ত মানুষ, বিশেষত তারা যদি যুবক ...হয় সর্বদাই খুশি। তারা যে ভাবে স্বাস্থ্যকে অনুভব করে, বুঝতে ... সাধারণ স্বাস্থ্যবান মানুষ তা পারে না। স্বাস্থ্যই মুক্তি, আর একমাত্র মুক্ত ক্রীতদাস ভিন্ন আর কেই বা মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করতে পারে? মাকস্যা ...টি মুহূর্ত মুক্ত চিরদাসের অনুভূতিতে ভরা। কী যে আশ্চর্য ভাল তাদের লাগছে। তারা চায় শ্বাস টানতে, জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে, চলতে ফিরতে—এক কথায়, তারা চায় বাঁচতে—আর প্রতিটি মুহূর্তেই তাদের ...বাসনা পূর্ণ হচ্ছে। হাত চিঠি স্বীকারে ফুরভের আপত্তি, বাজে গুজব, ...র আচরণ—সব কিছু তারা ভুলে গেছে। ভোলে নি কেবল সুখপ্রদ ও শান্তি... জিনিসগুলি। ...চমৎকার আবহাওয়া, আসন্ন বলনাচ, তাদের সঙ্গ... ...এবং ডাক্তারকে। মাকস্যা হেসে হেসে অবিরাম কথা বলছে। তাদের ... ...র প্রধান বিষয় ডাক্তার; যে কোন মুহূর্তে তাকেই তারা আশা করছে।

মাকস্যা বলছে, ... মানুষ, সর্বশক্তিমান মানুষ। কী সর্বশক্তিধর তার চিকিৎসা। ভেবে দে... ...ডাক্তার, প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে জয় করা

কী বিরাট অবদান।''

প্রতিটি আড়ম্বরপূর্ণ অথচ আন্তরিকভাবে উচ্চারিত কথার সঙ্গে সঙ্গে হাত নেড়ে ও চোখ বড় বড় করে খুশির উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক্যরে মাকস্যা অনবরত বকে যেতে লাগল।

ইগরও চোখ মিটমিট করে এবং বোনের কথার প্রতিধ্বনি করে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কথাগুলি শুনে গেল। সে নিজেও তপর্কভের গম্ভীর মুখকে শ্রদ্ধা করে; সেও নিশ্চিত জানে যে একমাত্র এই ডাক্তারের চেষ্টাতেই সে সেরে উঠেছে। মামনও পাশে বসে ছেলেমেয়েদের এই আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ভাগীদার হচ্ছিল।

সে যে তপর্কভের রোগ-নিরাময় ক্ষমতাকেই পছন্দ করে তা নয়, তার মুখের গাম্ভীর্যকেও তার পছন্দ।

যে কারণেই হোক, বয়স্ক মানুষরা গম্ভীর ভাবটাকেই খুব পছন্দ করে।

মেয়ের দিকে ভীরু চোখে তাকিয়ে প্রিন্সেস বলল, ''কেবল একটাই দুঃখের কথা যে সে এমন নীচু বংশের সন্তান। আর তার ব্যবসাটাও সে রকম...পরিচ্ছন্ন নয়। সর্বদাই যেখানে-সেখানে ছুটে বেড়ানো। ফুঃ।''

মাকস্যার মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল। সে মার কাছ থেকে বেশ দূরে অন্য একটা চেয়ারে সরে বসল। ইগরও বিরক্ত হল।

উঁচু শ্রেণীর এই দাম্ভিকতা সে সহ্য করতে পারে না।

দারিদ্র্য এক নির্মম শিক্ষক। একাধিক ক্ষেত্রে তার চাইতে অধিক ধনী লোকের আত্মম্ভরিতা তাকে সহ্য করতে হয়েছে।

অবজ্ঞাভরে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে সে বলে উঠল, ''মামন, আজকালকার দিনে যার কাঁধের উপর একটা মাথা আছে এবং ব্রিচেসের পকেটটা যার বড় সেই ভাল বংশের মানুষ; আর যার মাথার বদলে আছে একটা পাছা, আর পকেটের বদলে আছে সাবানের ফেনা সেই অপদার্থ। বুঝলে!''

অবশ্য এই কথাগুলি ইগর অন্যের কাছ থেকে ধার করে বলল। দু'মাস আগে বিলিয়ার্ড খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মশাস্ত্রের এক ছাত্রের মুখে সে ঠিক এই কথাগুলিই শুনেছিল।

ইগর আরও বলল, ''তার মাথা ও পকেটের সঙ্গে আমার রাজপদ বিনিময় করতে আমি আনন্দে রাজী আছি।''

মাকস্যা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে দাদার দিকে তাকাল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলল, ''তোমাকে আমি অনেক কথা বলতে পারতাম মামন, কিন্তু তুমি সে সব বুঝতে পারবে না। সেটাই তো আসল দুঃখ।''

লুপ্ত মূল্যবোধের প্রতি চিরদাসসুলভ আনুগত্যে আবদ্ধ রাজমাতা হতভম্ব হয়ে নিজেকে সমর্থন করতে বলল, ''ভাল কথা, আমি পিটার্সবার্গে এক ডাক্তারকে চিনতাম; তিনি একজন ব্যারন। হ্যাঁ, হ্যাঁ...আর বিদেশেও ছিলেন।...কথাটা সত্যি।...শিক্ষাটাই বড় কথা। হ্যাঁ...।''

তপর্কভ এল বিকেলে। প্রথম দিনের মত সেই একই ভাবে—গম্ভীর ভঙ্গীতে, কারও দিকে না তাকিয়ে।

টুপিটা নামিয়ে রেখে ইগবকে বলল, "মদ খাবে না, বাড়াবাড়ি করবে না। নিজের যকৃতের উপর নজর রাখবে। ওটা বেশ বড় হয়ে গেছে। এই স্ফিতি সম্পূর্ণরূপে মদ্যপানেরই ফল। নির্দেশ মত জলে মিশিয়ে খাবে।"

মারুস্যার দিকে ঘুরে তাকেও কিছু দরকারী নির্দেশ দিল।

মারুস্যা মনোযোগ দিয়ে তার কথাগুলি শুনল। পণ্ডিত মানুষটির চোখের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন একটা রোমহর্ষক রূপকথা দেখছে।

"ঠিক আছে ? সব বুঝেছ তো ?" তপর্কভ প্রশ্ন করল।

"বুঝেছি।"

ডাক্তার ঠিক চাব মিনিট থাকল। গলা খাঁকারি দিয়ে টুপিটা হাতে নিল, আর মাথাটা একটু নাড়ল। মারুস্যা ও ইগরের চোখ তাদের মায়ের উপর নিবদ্ধ। এমন কি মারুস্যাব মুখে একটা লালের ছোপ লাগল।

লজ্জায় লাল হয়ে পাতিহাঁসেব হত হেলে-দুলে রাজমাতা ডাক্তারের কাছে এগিযে গিয়ে আনাড়ির মত ডাক্তারের সাদা মুঠোর মধ্যে হাতটা রাখল।

বলল, "আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।"

ইগর ও মারুস্যা চোখ নামিয়ে নিল। হাতটা চোখের সামনে তুলে ধরে তপর্কভ দেখতে পেল কিছু পাকানো টাকা। কোনরকম বিব্রত বোধ না করে এবং দৃষ্টিকে নত না করে ডাক্তার জিভ দিয়ে আঙুল ভিজিয়ে ব্যাংকনোটগুলি গুণতে লাগল। গুণে দেখল পঁচিশখানা রুবল্-নোট। আগের দিন নিকিফব যে রাজমাতার ব্রেস্লেট ও ইয়ারিং নিয়ে দ্রুত পায়ে কোথাও গিয়েছিল সেটা তাহলে অকারণে নয়। তপর্কভের মুখের উপরে একটা উজ্জ্বল মেঘ ভেসে এল—সাধুসন্তের ছবিতে যে রকম জ্যোতির্মণ্ডল দেখা যায় ঠিক সেই রকম। ঈষৎ হাসিতে তার মুখটা একটু বেঁকে গেল। টাকাগুলো গুণে পকেটে রেখে আর একবার মাথাটা নেড়ে সে দরজার দিকে পা বাড়াল।

রাজমাতা, মারুস্যা ও ইগব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডাক্তারেব পিঠের দিকে। তিনজনই এক সঙ্গে অনুভব করল, তাদের অন্তরটা সংকুচিত হয়ে আসছে। একটা আতপ্ত অনুভূতিতে তাদের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল । এই মানুষটি চলে যাচ্ছে ; সে আর কোন দিন ফিরে আসবে না ; কিন্তু ইতিমধ্যেই তারা তার পরিমিত পদক্ষেপে, তার কাটা-কাটা কথা ও তার গম্ভীর মুখ দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। রাজমাতার মনে একটা ছোট ধারণা ঝিলিক দিয়ে উঠল। হঠাৎই এই কাঠের মত মানুষটিকে দয়া দেখাবার বাসনা জাগল তার মনে।

ভাবল, "ও তো বাপ-মা হারা একটি গরীব মানুষ। পৃথিবীতে একেবারে একা।"

এক বৃদ্ধার নরম গলায় সে ডাকল "ডাক্তার।"

ডাক্তার ফিরে তাকাল।

"কি ব্যাপার?"

"তুমি কি আমাদের সঙ্গে এক পেয়ালা কফি খাবে? আমরা তাহলে খুশি হব।"

ভুরু কুঁচকে তপর্কভ পকেট থেকে ঘড়িটা বের করল। সেইদিকে তাকিয়ে মুহূর্তকাল চিন্তা করে বলল, "একটু চা খাব।"

"দয়া করে এখানে বস।"

টুপিটা পাশে রেখে তপর্কভ বসল। একটা নকল মানুষের মত খাড়া হয়ে সে বসল হাঁটুদুটো ভেঙে আর ঘাড় ও গলাকে খাড়া রেখে। রাজমাতা ও মারুস্যা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মারুস্যার চোখ দুটো চিন্তায় গোল হয়ে গেল, যেন তার সামনে দেখা দিয়েছে একটা সমাধানের অতীত সমস্যা। পুরনো বাদামী ফ্রক-কোট ও হাত-মোজা পরে নিকিফর সবগুলি ঘরে ছুটাছুটি শুরু করে দিল। সারা বাড়ি ভরে উঠল পেয়ালা-পিরিচের খট্‌খট্ আর চা-চামচের ঠন্‌ঠন শব্দে। গোপনে, রহস্যজনকভাবে মুহূর্তের জন্য ইগরকে ঘর থেকে বাইরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল।

তপর্কভ চায়ের জন্য দশ মিনিট অপেক্ষা করল। বসে বসে বড় পিয়ানোর পাদানির দিকে তাকিয়ে রইল, হাত-পা নাড়ল না, একটা শব্দ করল না। শেষ পর্যন্ত ড্রইংরুমের দরজাটা খুলল। একটা বড় ট্রে নিয়ে নিকিফর দেখা দিল হাসি মুখে। ট্রের উপর রূপোর গ্লাসদানিতে দুটো গ্লাস; একটা ডাক্তারের জন্য, অপরটা ইগরের। গ্লাসকে ঘিরে বেশ সুন্দরভাবে সাজানো টাটকা ভাজা সরের জগ, একজোড়া চিমটেসহ চিনি, কাঁটাসমেত লেবুর চাকতি ও বিস্কুট।

নিকিফরের পিছনে এল ইগর, তার মুখটা ভারিক্কি চালের দরুণ কেমন যেন বোকা-বোকা দেখাচ্ছে।

তাদের পিছনে ঘরে ঢুকল রাজমাতা; তার ভুরুতে ঘাম জমে উঠেছে। আর ঢুকল গোল-চোখ মারুস্যা।

রাজমাতা তপর্কভকে বলল, "হাত লাগাও।"

একটা গ্লাস তুলে নিয়ে ইগর সতর্কভাবে চুমুক দিতে লাগল। তপর্কভও নিজের গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিল। রাজমাতা ও মারুস্যা একটু দূরে বসে ডাক্তারকেই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

রাজমাতা শুধাল, "তোমার পছন্দমত মিষ্টি হয়েছে তো?"

"না, যথেষ্ট মিষ্টি হয়েছে।"

তারপর সকলেই চুপচাপ। সেই অদ্ভুত নীরবতায় সকলেই বিব্রত বোধ করল; কারও মুখেই আর কথা জোগাল না। ডাক্তারও নীরবে চা খেতে লাগল। দেখে মনে হল, তার চারদিকের মানুষগুলি সম্পর্কে সে মোটেই সজাগ নয়; একমাত্র নিজের চা ভিন্ন অন্য কোন কিছুই তার চোখে পড়ছে না।

রাজমাতা ও মারুস্যা দু'জনেই এই কুশলী লোকটির সঙ্গে কথা বলতে ভীষণ আগ্রহী; কিন্তু পাছে নিজেদের বোকা-বোকা মনে হয় তাই কোথায় কথা শুরু করবে সেটাই বুঝতে পারছে না। ইগর বার বার ডাক্তারের দিকে তাকাচ্ছে, তার চোখ দেখে মনে হচ্ছে সে কিছু বলতে চায়। কিন্তু কিছুতেই মনস্থির করতে পারছে না। সর্বত্র কবরের নিঃস্তব্ধতা; মাঝে মাঝে সেটা বিঘ্নিত হচ্ছে খাবার গেলার শব্দে। তপর্কভ বেশ জোরে শব্দ করেই খাচ্ছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সে মোটেই লজ্জা করছে না; ইচ্ছামতই পান-ভোজন করছে। খেতে খেতে তার গলায় ''গ্নাগ গ্নাগ'' শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, তার গল-নালী দিয়ে মুখের গ্রাস নেমে যাচ্ছে একটা গভীর গর্তের মধ্যে। নিকিফরও মাঝে মাঝেই নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিচ্ছে; বার বার সে নিজের ঠোঁট চাটছে আর মুচমুচ্ করে চিবনোর শব্দ করছে।

ইগর হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, ''লোকে যে বলে ধূমপান ক্ষতিকর সেটা কি ঠিক?''

''তামাকের উপক্ষার নিকোটিন দেহযন্ত্রের উপর তীব্র বিষের মত কাজ করে। প্রতিটি সিগারেটের সঙ্গে যে বিষ দেহযন্ত্রে ঢোকে সেটা পরিমাণে তুচ্ছ হলেও সেটার শোধন সময়সাপেক্ষ। বিষের পরিমাণও তার শক্তি এবং দেহযন্ত্রে তার শোষিত হবার সময়-কালের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে বিপরীৎ হারে।''

রাজমাতা ও মারুস্যার মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় হল। কী চালাক মানুষ। ইগর চোখ মিট্‌মিট্ করতে লাগল; তার মাছের মত মুখটা গোমড়া হয়ে উঠল। বেচারি ডাক্তারের কথাগুলি বুঝতেই পারল না।

আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিতে সে বলল, ''আমাদের রেজিমেন্টে একজন অফিসার ছিলেন। নাম কোশেচ্‌কিন। চমৎকার মানুষ। একেবারে আপনার মত। হুবহু। যেন দুটি জলের ফোঁটা। তিনি কি আপনার কোন আত্মীয়—কি বলেন?''

কোন জবাব না দিয়ে ডাক্তার সশব্দে একটা ঢেঁকুর তুলল, ঠোঁটের কোণ দুটো একটু বাঁকাল, তাতে ফুটে উঠল অবজ্ঞার হাসি। স্পষ্টতই সে ইগরকে ঘৃণা করে।

মারুস্যা শুধাল, ''বলুন তো ডাক্তার, আমি কি সম্পূর্ণ সেরে উঠেছি? আমি কি সম্পূর্ণ নিরাময়টা ধরে নিতে পারি?''

''আমি তো তাই মনে করি। পূর্ণ নিরাময়ই আশা করছি, কারণ...''

তার পরেই মাথাটা খাড়া করে মারুস্যার দিকে সরাসরি তাকিয়ে ডাক্তার শুরু করে দিল ফুসফুসের প্রদাহের ফলাফলের বিস্তারিত বিবরণ। প্রতিটি শব্দকে স্পষ্টভবে উচ্চারণ করে, কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামা না করে সে সহজভাবে বলতে লাগল। স্বেচ্ছায় এমন কি খুশি মনেই সকলে মনোযোগসহকারে তার কথাগুলি শুনতে লাগল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই নিরস মানুষটি জনপ্রিয়তার ধার ধারে না, শ্রোতার মানসিকতার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়াটাকেও

দরকারী বলে মনে করে না। তবে পুরো বক্তৃতাটায় ডাক্তারী শব্দের ছড়াছড়ি ঘটায় একটা পংক্তিও শ্রোতারা বুঝতে পারল না। অবশ্য তা সত্ত্বেও শ্রোতারা হা করে বসে পণ্ডিত মানুষটির দিকে সসম্ভ্রমে তাকিয়ে রইল। মারুস্যা একবারও তার দিক থেকে চোখ ফেরাল না, প্রতিটি কথাই কান পেতে শুনল। সে তাকে দেখছে, আর যে সব মুখ প্রত্যহ দেখে তার সঙ্গে ডাক্তারের মুখের তুলনা করছে।

তার যে সব পাণিপ্রার্থী, ইগরের যে সব বন্ধু প্রতিদিন এসে তাকে বিরক্ত করে তাদের সুরাস্ফীত একঘেয়ে চোখমুখের তুলনায় এই মানুষটির শিক্ষিত ক্লান্ত চোখমুখের কত তফাৎ। সেই সব সুরাসক্ত, ভ্রষ্টচরিত্র মানুষদের মুখ থেকে সে, মারুস্যা, কোনদিন একটা সদয় বা শোভন শব্দ পর্যন্ত শোনে নি তারা কেউই তো এই উদাসীন, নিরাসক্ত, উদ্ধত, অথচ বুদ্ধিমান মানুষটির জুতো চাটারও যোগ্য নয়।

তার দৃষ্টি, তার কণ্ঠস্বর, তার কথা—সব কিছুতেই শিহরিত মারুস্যা ভাবল, কী চমৎকার মুখখানি। কী তার মন আর কী জ্ঞান। জর্জেস কেন একজন সমর বিভাগের লোক হল? তার তো একজন শিক্ষিত লোক হওয়াই উচিত ছিল।'

অনুরাগভরা চোখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে ইগর ভাবল:

সে যখন ভাল ভাল কথা বলছে তখন বুঝতে হবে সে আমাদেরও বুদ্ধিমান বলেই মনে করে। এটা ভালই হয়েছে যে সমাজের কাছে আমরা একটা সঠিক মূর্তি তুলে ধরতে পেরেছি। অবশ্য কোশোর্চাকিন সম্পর্কে মিথ্যা বলাটা আমার দিক থেকে খুবই বোকামি হয়েছে।'

ডাক্তারের বক্তৃতা শেষ হলে তার শ্রোতারা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল, মনে হল, তারা বুঝি একটা গৌরবের কাজ করে ফেলেছে।

সব কিছু জানতে পারা কত ভাল।" রাজমাতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মারুস্যা উঠে দাঁড়াল। বুঝিবা ডাক্তারকে তার বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ জানাবার জন্যই পিয়ানোতে বসে চাবি টানল। তার বড় ইচ্ছা ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তাটি যাতে চালিয়ে যায়। আরও গভীরভাবে, আরও আবেগের সঙ্গে তার সঙ্গে মেশে, আর সঙ্গীত তো সব ক্ষেত্রেই আলোচনার সুযোগ করে দেয়। এই কুশলী, সমঝদার লোকটির সামনে নিজের প্রতিভাকে মেলে ধরার বাসনাও তার মনে প্রবল।

আলস্যভরে হেসে হেসে দুই হাত তুলে রাজমাতা বলল, "এটা চোপিন থেকে নেওয়া। চমৎকার সুরটি। আর এ কথা গর্ব করেই বলতে পারি ডাক্তার যে, ও একটি চমৎকার গাইয়ে। আমার ছাত্রী এককালে আমিও সুকণ্ঠী ছিলাম। আর এখন তুমি তো তাকে জানই?"

রাজমাতা একজন বিখ্যাত রুশ গায়িকার নাম বলল।

"সে আমার কাছে ঋণী হ্যাঁ. আমি তাকে শিখিয়েছি। মেয়েটি বড় সুন্দর ছিল। আমার স্বর্গত স্বামীর দূরসম্পর্কের আত্মীয়া। তুমি সঙ্গীত

ভালবাস? কিন্তু একথা বলছিই বা কেন? সঙ্গীত কে না ভালবাসে?''

ওয়াল্টজের একটা সেরা অংশ বাজাতে বাজাতে মারুস্যা গ্রীবা হেলিয়ে সহাস্যে তাকাল। সে দেখতে পেল, তার বাজনাব প্রভাবেও ডাক্তারের মুখ আগের মতই নির্বিকার ও নিরস। সে তাড়াতাড়ি চা খাওয়া শেষ করতেই ব্যস্ত।

''আমি এই বাজনাটাব প্রেমে পড়েছি'', মাকস্যা বলল।

ডাক্তার বলল, ''তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আর শুনতে চাই না।''

শেষ গ্রাসটা মুখে দিয়ে সে উঠে পড়ল; বাজনার শেষ অংশটা শুনবার তিলমাত্র বাসনা প্রকাশ না করেই টুপিটা নেবার জন্য হাত বাড়াল। বাজমাতাও উঠে দাঁড়াল। মাকস্যা ক্ষুব্ধ হয়ে পিয়ানোর ডালাটা বন্ধ করে দিল।

দুই চোখে ভ্রূকুটি করে রাজমাতা বলল, ''এরই মধ্যে উঠে পড়লে? তোমার কি আর কিছুই চাই না? ডাক্তার, আমি আশা করি...এখন কি কবতে হবে তা তো তুমি জানই। যে কোন সন্ধ্যায়ই হতে পারে। আমাদের ভুলে যেয়ো না।

ডাক্তার দু'বাব মাথা নাড়ল। অদ্ভুতভাবে রাজমাতার প্রসারিত হাতটাতে চাপ দিয়ে নিঃশব্দে লোমেব কোটটার দিকে এগিয়ে গেল।

সে বেবিয়ে গেলে রাজমাতা বলে উঠল, ''বরফ! কাঠ! কী সাংঘাতিক! অনড়-গলা লোকটা হাসতেও পারে না। মারি! কেন তুমি ওর জন্য বাজাতে গেলে? দেখে মনে হল, ও যেন চায়ের জন্যই বসে ছিল। চা গিলেই চলে গেল।''

''কিন্তু লোকটি কী বুদ্ধিমান মামন। খুব বুদ্ধিমান। এখানে ও কার সঙ্গে কথা বলবে? আমি তো অশিক্ষিত। জর্জেস আপনভোলা, কখনই কোন কথা বলে না। আমরা কি বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা চালাতে পাবি? না!''

জগ থেকে সরটা খেয়ে ইগর বলল, ''তোমাদের কাছে ও তো ছোটলোক। তোমাদের চোখে ও তো নিকিফরের ভাগ্নে। আসলে কী সুন্দর মানুষ। বুদ্ধিমান, উদাসীন, আপনভোলা।...আর কী সুন্দর কথা বলতে পারে! এ আবাব কেমন ধারা ছোটলোক? আর কী একখানা গাড়ি! দেখ। একেবারে বড়লোকী!''

তিনজনই জানালা দিয়ে নীচে তাকাল। ভালুকের চামড়ার বড় কোটটা গায়ে দিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিটি তার কালাশে নিজের আসনে বসেছে। রাজমাতা ঈর্ষায় লাল হয়ে উঠল; ঈগর অর্থপূর্ণ ভঙ্গী কর শিস দিতে লাগল। মারুস্যা কালাশটা দেখতে পেল না। সেটা দেখার সময় তাব ছিল না। সে দেখছিল ডাক্তারকে। তার উপর ডাক্তারের প্রভাবটা বড় বেশী করেই পড়েছে। নতুন কিছু কাকে না বিচলিত করে?

কিন্তু মারুস্যার কাছে তপর্কভ বড় বেশী নতুন..

শুরু হল প্রথম বরফপাত, তারপর দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয়, আর জমাট শিশির, বরফের ঝড় ও টুকরো-টুকরো বরফ নিয়ে নামল শীত। আমি শীতকাল পছন্দ করি না। যারা বলে পছন্দ করে তাদেরও আমি বিশ্বাস করি না। বাইরেটা ঠাণ্ডা, ভিতরটা ধোঁয়াটে, আর গ্যালোশগুলো স্যাঁৎসেঁতে। এই সে শাশুড়ির মত কঠোর। এই সে বুড়ী দাসীর মত ঝগড়াটে, চাঁদের আলোর জাদুকরী রাত, ত্রয়কা শিকার, গান-বাজনা। আর বলনাচ থাকা সত্ত্বেও শীতকালটা অচিরেই ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে, একটানা দীর্ঘ দিন শীত থাকার ফলে কত আশ্রয়হীন ক্ষয়-রোগীর জীবনকে বিষময় করে তোলে।

প্রিকলোন্স্কির রাজবাড়ির জীবনযাত্রা নিজের পথেই চলতে লাগল। ইগর ও মাকস্যা পুরোপুরি সেরে উঠেছে। এমন কি তাদের মাও আর তাদের অসুস্থ বলে মনে করে না। এদিকে তাদের অবস্থার উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। দিনের পর দিন অবস্থা খারাপ হয়ে চলেছে। টাকাপয়সায় ক্রমেই টান পড়ছে। রাজমাতার সব মূল্যবান জিনিসপত্র—যা কিছু ঐ পরিবারের ছিল, আর যা কিছু কেনা হয়েছিল—সবই সে বন্ধক রেখেছে, বার বার বন্ধক রেখেছে। নিকিফরকে ধারে জিনিস কিনতে পাঠানো হলে সেখানেও সে সব কথা ফাঁস করে দিয়ে বলেছে, মনিবের কাছে তারই তিন শ' রুবল্ পাওনা বাকি আছে, সেটাই সে আজ পর্যন্ত পায় নি। রাঁধুনিও সেই একই কথা বলেছে। তবুও করুণাপরবশ হয়ে দোকানী তাকে একজোড়া পুরনো বুট উপহার দিয়েছে। ফ্রুভ রেজায় চাপাচাপি শুরু করেছে। সে আর বিলম্ব করতে রাজী নয়। বরং সে যখন হ্যাণ্ডনোট নিতে আপত্তি জানায় তখন রাজমাতা তাকে অপেক্ষা করতে বলায় সে তাকে দুইচার কথা শুনিয়ে দিয়েছে। অন্য পাওনাদাররাও সেই পথই ধরেছে। প্রতিদিন সকালে রাজমাতাকে নোটারি, আদালতের পেয়াদা ও পাওনাদারদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দেউলে হবার অবস্থা আসন্নপ্রায়।

আগের মতই রাজমাতার বালিশ কখনও শুকনো থাকে না। সারাদিন নিজেকে সে সংযত করে রাখে, কিন্তু রাত হলে চোখের জল আর বাঁধ মানে না। সারারাত সে চোখের জল ফেলে। এই অবিরাম কান্নার কারণ খুঁজতে বেশীদূর যেতে হবে না। কারণগুলি তার নাকের ডগায়ই রয়েছে, বুঝতে অসুবিধা হবার কথাও নয়। দারিদ্র্য ও আত্মমর্যাদা তাকে প্রতিটি মুহূর্তে অপমান করে আর সে কাজ কারা করে? যত সব তুচ্ছ অতি সাধারণ মানুষ, নানা ধরনের ফরাভর দল, রাঁধুনিরা, সাধারণ ব্যবসায়ীরা। যা কিছু ভাল জিনিস ছিল সব বাঁধা পড়েছে, সে সব জিনিস হাতছাড়া করতে তার অন্তর ছিন্নভিন্ন হয়েছে। ইগর আগের মতই উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করছে। মাকস্যার কোন ভাল বর এখনও জোটে নি। তার কান্নার কি যথেষ্ট কারণ ছিল না? ভবিষ্যৎ কুয়াসাচ্ছন্ন, কিন্তু সেই কুয়াসার ভিতর দিয়েও রাজমাতার চোখের সামনে ভেসে ওঠে অশুভ প্রেতচ্ছবি। ভবিষ্যতেও কোন আশা নেই। আশা করার কিছুই নেই, কিন্তু ভয় করবার

টাকা-পয়সা প্রতিনিয়তই হ্রাস পাচ্ছে। ইগর আরও বেশী করে মদের স্রোতে ভাসছে, বুঝি ইচ্ছা করেই ভাসছে—অসুস্থ থাকার জন্য যে ক'টা দিন নষ্ট হয়েছে তাকেও পুষিয়ে নিচ্ছে। নিজের টাকা তো মদে উড়িয়ে দিচ্ছেই, অন্যের টাকাকেও রেহাই দিচ্ছে না। স্বীয় দুশ্চরিত্রের ব্যাপারে সে যেন নিষ্ঠুর রকমের দুঃসাহসী ও নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে। সামান্যতম পরিচিত মানুষের কাছে ভিক্ষা করে টাকা নিতেও তার সম্মানে বাধে না। পকেটে একটা কোপেক না নিয়েও তাসের আড্ডায় বসে জুয়া খেলাটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। অন্যের পয়সায় খানাপিনা করা, ট্যাক্সি হাঁকিয়ে পরে ট্যাক্সিওয়ালাকে টাকা না দেওয়া তার কাছে কোন পাপই নয়। তার পরিবর্তন কিছুই হয় নি। আগে তাকে নিয়ে কেউ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে সে মেজাজ হারিয়ে ফেলত, আর এখন কেউ তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলে সে সামান্য বিচলিত হয় মাত্র।

একমাত্র মাকস্যার পরিবর্তন হয়েছে। একটা নতুন কিছু ঘটেছে আর সেটা তার পক্ষে ভয়ংকর। দাদা সম্পর্কে মিথ্যা আশাগুলিও সে হারাতে বসেছে। হঠাৎ সে তাকে দেখতে শুরু করেছে একজন অপরিচিত, দুর্বোঝা মানুষ রূপে হয়তো বা তার চাইতেও খারাপ ভাবে। এখন আর তার প্রেমের কথা সে বিশ্বাস করে না। কী ভয়ঙ্কর উপলব্ধি! ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানালায় বসে উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে সে কল্পনায় তার বড় ভাইয়ের মুখখানি আঁকত আর সেখানে এমন একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু দেখাতে চেষ্টা করত যা কোনদিন মুছে যাবে না, কিন্তু আজ সেই বিবর্ণ মুখে একটি পাপী মানুষের ছবি ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পায় না। একটা অকর্মণ্য লোক। নিজের মনের চোখে সে আরো দেখতে পায় বড় ভাইয়ের বন্ধুবান্ধব, [illegible] সান্ত্বনাবাক্য শোনানো বুড়োবুড়ি, নিজের পার্শিপার্শীর [illegible] তার মায়ের অশ্রুসিক্ত বেদনাদীর্ণ মুখ—আর দুঃখ তার মাথায় অনবরতে [illegible] চাপ ধারে। এই সব তুচ্ছ মানুষ যারা ছিল তার আত্মীয়স্বজন, যাদের সে [illegible]. তারা বড় নীচ, বিবর্ণ, [illegible], বিতর্ককর ও অলস।

দুঃখ তার অন্তরাত্মা সংজ্ঞাকে চেপে ধরল আর একটিমাত্র অকল্পনাতীত প্রথাবিবদ্ধ বাসনাকে সে রুদ্ধশ্বাসে আঁকড়ে ধরল। অনেক সময় সে মনেপ্রাণে চেয়েছে এখান থেকে চলে যেতে। কিন্তু কোথায় যাবে? স্বভাবতই এমন কোথাও যেখানে এমন মানুষ আছে যারা দারিদ্র্যের ভয়ে কাঁপে না, যারা অকর্মণ্য নয় বরং কর্মঠ, যারা নির্বোধ বুদ্ধির দল এবং মদ্যপ, দুর্বল মানুষদের সঙ্গে গল্পগুজব করেই সারাটা দিন কাটায় না। আর একটি মাত্র শোভন ও যুক্তিপূর্ণ মুখ মারস্যার কল্পনায় বড় হয়ে ফুটে ওঠে। সে মুখে লেখা আছে বুদ্ধি জ্ঞানের ভাণ্ডার, আর ক্লান্তি। সে মুখ কোনদিন ভোলা যায় না। সে মুখ মাকস্যা প্রতিদিন দেখে দেখে এক মধুরতম পরিবেশে, অর্থাৎ সে মুখের মালিক যখন কর্মরত থাকে, অথবা যখন তাকে কর্মরত বলে মনে

হয়।

ভালুকচামড়ার কম্বলে গা ঢেকে এবং মোটা কোচোয়ান সঙ্গে নিয়ে নিজের বিলাসবহুল স্লেজে চেপে ডাক্তার ৎপেকভ প্রতিদিন প্রিকলনস্কিদের বাড়ির পাশ দিয়ে দ্রুত বেগে চলে যায়। তার অনেক রোগী। ভোর থেকে অনেক রাত পর্যন্ত রোগী দেখে দেখে একমাত্র সেই সে শহরের সব বড় রাস্তা ও গলিতে গাড়ি নিয়ে ছুটতে পারে। সে এমনভাবে স্লেজের ভিতর বসে যেন হাতলচেয়ারে বসেছে, মাথা ও কাঁধ একেবারে সোজা করে, কোনদিকে না তাকিয়ে। ভালুকচামড়ার কোটের উঁচু কলারের আড়ালে সাদা, মসৃণ ভুরু আর সোনালী ফ্রেমের চশমা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না কিন্তু মারুস্যার কাছে সেটুকুই যথেষ্ট। তার মনে হত, মানুষের উপকারী এই মানুষটির দুই চোখের চশমার ভিতর দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে শীতল, গর্বিত, অবজ্ঞার রশ্মিরেখা।

সে মনে মনে ভাবত, "ঘৃণা করার অধিকার এই মানুষটির আছে। সে জ্ঞানী। কিন্তু কী জমকালো স্লেজ, কী আশ্চর্য দুটি ঘোড়া! আর সে নাকি ছিল এক চিরদাস। খানসামা হয়ে জন্ম নিয়ে তার মত এক অনন্য ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে কী মনের জোরই না দরকার।"

কেবল মারুস্যাই ডাক্তারের কথা ভাবে। আর সকলেই তাকে ভুলতে শুরু করেছে, এবং হয়তো অচিরেই তাকে সম্পূর্ণ ভুলেই যেত যদি না সে নিজে তার অস্তিত্বকে স্মরণ করিয়ে দিত। আর কি বেদনার মধ্য দিয়েই যে কাজটা সে করল।

খৃস্টজন্মোৎসবের দ্বিতীয় দিন দুপুরে প্রিকলনস্কি পরিবারের সকলেই তখন বাড়ি ছিল—বাড়ির ঘন্টাটা ভয়ে ভয়ে বেজে উঠল। নিকিফর হলের দরজাটা খুলে দিল।

হল থেকে একটা কাঁপা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "রাজমাতা কি বাড়ি আছেন?" উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই একটি ছোটখাটো বুড়ি ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়ল। "আপনি কেমন আছেন মহামান্যা রাজমাতা? আমার ত্রাণকর্ত্রী! আপনি কেমন আছেন?"

উৎসুক দৃষ্টিতে নবাগতার দিকে তাকিয়ে রাজপুত্র শুধাল, "তোমার কি চাই?" ইগর নিজের মুঠিতে থুথু ছিটোল। তার মনে হল, বুড়ির মাথাটা দেখতে একটা ছোট পাকা খরমুজের মত। আর তার বেঁটাটা উঠে আছে উপরের দিকে।

"আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না তো? সত্যি কি আমার কথা আপনার মনে নেই? আপনি কি প্রোখরভনাকে ভুলে গেছেন? সেই তো আপনার শিশুপুত্রটিকে খালাস করেছিল।"

বুড়ি কোনরকমে ইগরের কাছে গিয়ে তার বুকে ও হাতে চুমু খেতে লাগল।

হাতটা জ্যাকেটে মুছে ইগর সক্রোধে বলে উঠল, "বুড়ো শয়তান

নিকিফর কি করে যে এইসব বুড়িকে বাড়িতে ঢুকতে দেয় তা তো আমি বুঝতে পারি না।''

রাজমাতা আবার শুধাল, ''তুমি কি চাও?''

একটা হাতল-চেয়ারে ভাল করে বসে একটা পেঁচানো লম্বা ভূমিকার পরে নবাগতা জানাল, রাজমাতা কি যেন বিক্রি করবেন জেনে সে একজন ক্রেতাকে নিয়ে এসেছে। মারুস্যার মুখটা লাল হয়ে উঠল। ইগর চাপা হাসি হেসে কৌতূহলবশত বুড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

রাজমাতা বলল, ''আশ্চর্য! তুমি তাহলে ঘটকালি করতে এসেছ, তাই কি? অভিনন্দন মারি। তা প্রার্থীটি কে? সেটা বলবে কি?''

বুড়ি সাঁই-সাঁই শব্দ করতে করতে বুকের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে লাল সুতী কাপড়ের একটা রুমাল টেনে বের করল। তার গিঁট খুলে রুমালটা ঝেড়ে একটা ফটোগ্রাফ ও একটা অঙ্গুলিত্রাণ টেবিলের উপর ঢেলে দিল।

সকলেরই নাক কুঁচকে উঠল। লাল রুমাল ও হলুদ ফুল থেকে তামাকের গন্ধ আসছে।

রাজমাতা ফটোখানা তুলে নিয়ে চোখের সামনে ধরল।

ঘটকী ছবির উপর মন্তব্য করে বলল, ''দেখতে খুব সুন্দর রাজমাতা। ধনী, সম্ভ্রান্ত. ..আশ্চর্য মানুষ। ধীর, স্থির...।''

রাজমাতা একটু লাল হয়ে ফটোগ্রাফটা মারুস্যার হাতে দিতেই সে কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেল।

রাজমাতা বলল, ''আশ্চর্য! ডাক্তারের যদি এটাই মনে ছিল তাহলে আমি তো মনে করি সে নিজেই প্রস্তাবটা ...এ ব্যাপারে অন্যের যোগাযোগ করার তো কোন দরকার ছিল না। শিক্ষিত মানুষ, আর এখন.. সেই কি তোমাকে পাঠিয়েছে? নিজেই?''

মারুস্যা হঠাৎ কেঁদে উঠল। ফটোগ্রাফটা হাতে চেপে ধরে হঠাৎই ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

রাজমাতা বলতে লাগল, "আশ্চর্য! বিস্ময়কর!...তোমাকে কি বলব সেটাই তো বুঝতে পারছি না। ডাক্তারের কাছে এটা কখনই আশা করি নি, সে তোমাকে আবার কষ্ট দিতে গেল কেন? নিজেই তো এখানে আসতে পারত...আমি একটু অসন্তুষ্টই হয়েছি... সে আমাদের কি মনে করে? আমরা তো ব্যবসা ফেঁদে বসি নি...এমন কি আজকাল তো ব্যবসায়ীরাও অন্য রকম জীবন যাপন করছে।''

বুড়ির মাথার দিকে অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে ইগর আর্তকণ্ঠে বলল, ''কী সব লোক!''

অবসরপ্রাপ্ত হুজারের ইচ্ছা হচ্ছিল বুড়ির ছোট মাথাটায় একটা ঘুষি মারে, অন্তত একবার। বুড়িকে তার ভাল লাগে নি, ঠিক যেমন একটা বড় কুকুর একটা বিড়ালকে অপছন্দ করে। তাছাড়া, খরমুজের মত মাথা দেখলেই তার হাতটা নিস্‌পিস্‌ করতে থাকে।

ঘটকী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "দেখুন রাজমাতা, তার রাজকীয় মর্যাদা না থাকতে পারে, তবু আমি বলতে পারি রাজমাতা...আপনি আমাদের হিতসাধক! ওহো, পাপ, পাপ! সে যদি সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষ নাই হয়, তাতে কি হল? সবরকম শিক্ষা তার আছে, সে ধনী, প্রভু তাকে সর্বপ্রকার সৎ গুণ দিয়েছেন। আপনি যদি চান যে সে আপনার কাছে আসুক, তাহলে অবশ্যই আসবে।...সে দেখা করবে। কেন করবে না? সে তো দেখা কবতেই পারে।"

তারপর রাজমাতার কাঁধে হাত রেখে তাকে আবও কাছে এনে বুড়ি কানে কানে বলল :

"সে ষাট হাজার চাইছে।...আপনার আর কি বলার আছে? বৌ তো বৌই, আর টাকা তো টাকাই। সে সব তো আপনিও বোঝেন" সে বলছে, "টাকা ছাড়া বৌ আমি নেব না, কারণ তাকে তো সব রকম আরামে-আয়েসে রাখতে হবে।... নিজের মূলধন তো তারই নিয়ে আসা উচিত...।"

রাজমাতার মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। ভারী পোশাকটা খচ্‌মচ্‌ করে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

বলল, "দয়া করে ডাক্তারকে জানিয়ে দিও, আমরা খুবই বিস্মিত হয়েছি।... আমাদের অপমান করা হয়েছে...আমরা অসন্তুষ্ট হয়েছি। এ রকম আচরণ বিস্ময়কর। তোমাকে আর বেশী কি বলব?...জর্জেস, তুমি কোন কথাই বলছ না কেন? ওকে চলে যেতে দাও। আমরা যে কেউ ধৈর্য হারিয়ে ফেলতে পারি।"

ঘট্‌কী চলে যাবার পরে রাজমাতা দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে মাটিতে বসে দুঃখ করতে লাগল।

"আমরা আর কত নীচে নামব? হা ঈশ্বর! একটা হাতুড়ে ডাক্তার, একেবারে বাজে, কালকের খানসামা, সেও বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। সম্ভ্রান্ত লোক! ফুঃ! সম্ভ্রান্তই বটে! সেও ঘট্‌কী পাঠিয়েছে। আজ যদি তোমার বাবা এখানে থাকত! সে কখনও এটা ঘটতে দিত না। একটা ঘৃণিত নির্বোধ! একটা শূয়োরের বাচ্চা!"

আসলে রাজমাতার আসল অসম্মান একটা ছোট লোক তার মেয়ের পাণি-প্রার্থনা করছে বলে নয়, মেয়ের বাবদ সে চেয়েছে ষাট হাজার টাকা আর সেটা তার নেই বলে। তার দারিদ্র্যের প্রতি তিলমাত্র কটাক্ষও তার মনকে আহত করে। অনেক রাত পর্যন্ত সে ফুঁপিয়ে কাঁদল। রাতে দু'বার জেগে উঠে আরও কাঁদল।

ঘটকীর আগমনের প্রভাব সকলের চাইতে বেশী পড়ল মারুস্যার উপর। বেচারির প্রবল জ্বর এল। হাত-পা কাঁপতে লাগল। শয্যা নিল। পুড়ে-যাওয়া মাথার উপরে বালিশ চাপা দিয়ে সাধ্যমত একটি প্রশ্নেরই জবাব খুঁজতে লাগল :

"এও কি হতে পারে?"

তার মাথাটা ঘুরে গেল। এ-প্রশ্নের উত্তর কি হবে মারুস্যা তা জানে না। এই প্রশ্নের মধ্যে আছে তার বিস্ময়, তার বিভ্রান্তি, এমন একটা গোপন আনন্দ যা নিজের কাছে স্বীকার করতেই সে লজ্জা বোধ করে, যা সে নিজের কাছ থেকেই লুকিয়ে রাখতে চায়।

''এও কি হতে পারে? সে? তপর্কভ? এ যে অসম্ভব! নিশ্চয় কোথাও একটা ভুল হয়েছে। বুড়িটাই ভুল করেছে। বুড়িটা ভুল করেছে।''

অথচ একই সঙ্গে একটা মধুরতম, বহু-আকাঙ্ক্ষিত, জাদুকরী স্বপ্ন তার মাথার মধ্যে নড়তে শুরু করেছে— যে স্বপ্নে হৃদয় কাঁপে, মাথায় জ্বালা ধরে, সমস্ত সত্তা এক অবর্ণনীয় উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়। তপর্কভ তাকেই স্ত্রী করতে চায়, আর কত রাজকীয়, কত সুন্দর কত কুশলী সে। মানুষের সেবায় সে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে, আর.. কী চমৎকার একটা স্লেজগাড়ি চড়ে সে বাড়ায়।

''এ কি হতে পারে?''

মারুস্যা সন্ধ্যা নাগাদই মনস্থির করে ফেলল। ''আমি তাকে ভালবাসব! আহা, আমি সম্মতি দিচ্ছি। সর্বপ্রকার সংস্কার থেকে আমি মুক্ত। পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত আমি সেই চিরদাসকে অনুসরণ করব। মা যদি তার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলে-তাহলে আমি মাকেই ত্যাগ করব। আমি রাজী।''

অন্য সব আজেবাজে, তুচ্ছ প্রশ্ন নিয়ে সে মাথা ঘামাবে না। অত সময় তার নেই। যেমন, এ ব্যাপারে ঘটকীর কি করার ছিল? কেন এবং কখন ডাক্তার তার প্রেমে পড়েছে? এ সব প্রশ্ন দিয়ে তার কি হবে? সে আহ্বত, বিস্মিত....সুখী....এরপর আর কি চাই।

যে সোনার চশমার ভিতর দিয়ে দুটি বুদ্ধিদীপ্ত, নির্ভরযোগ্য, ক্লান্ত চোখে সে তাকায় সে চশমাশোভিত মুখখানি কল্পনায় আঁকবার চেষ্টা করে সে ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল, ''আমি রাজী। সে আসুক। আমি রাজী।''

যে সুখের জ্বালায় সে জ্বলছে সমস্ত সত্তা দিয়ে তাকে উপলব্ধি করে মারুস্যা যখন নিজের বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করছে, তখন ঘটকী বুড়ি ব্যবসায়ীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে উদার হাতে ডাক্তারের ফটোগ্রাফ বিলি করে চলেছে। তপর্কভ তাকে বিশেষ করে প্রিক্লোনস্কিদের বাড়িতে পাঠায় নি। সে তাকে নিজের খুশিমত সর্বত্রই যেতে বলেছে; বিয়ের ব্যাপারে সে নিরাসক্ত। তবে বিয়েকে সে একটা দরকারী কাজ বলে মনে করে। ঘটকী কোথায় গেল না গেল, তার কাছে সবই সমান।...তার প্রয়োজন ষাট হাজার। ষাট হাজার, তার কম নয়। যে বাড়িটা সে কিনতে চায় তার দাম অন্তত এতটা হবেই। এত টাকা কোথাও ধার পাওয়া যাবে না। দামটা পরে দিতে চাইলেও বিক্রেতা রাজী হবে না। একটিমাত্র পথই খোলা আছে : টাকা নিয়ে বিয়ে করা। প্রজাপতির বন্ধনে নিজেকে বাঁধার ব্যাপারে মারুস্যা কোন রকম বিবেচ্য বিষয়ই নয়।

মাঝরাতে ইগর নিঃশব্দে মারুস্যার শোবার ঘরে ঢুকল। মারুস্যা এর

মধ্যেই পোশাক খুলে ঘুমিয়ে পড়ার উদ্যোগ করছিল। আকস্মিক সুখের তাড়নায় ক্লান্ত দেহে সে তার অন্তরকে শান্ত করতে চাইছে, তার মনে হচ্ছে, তার হৃৎপিণ্ডটা এতই জোরে চলছে যে সারা বাড়িটাই সে-শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ইগরের মুখের প্রতিটি বলিরেখায় লুকিয়ে আছে হাজার গোপন কথা। রহস্যজনকভাবে গলাটা পরিষ্কার করে সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মারুস্যার দিকে তাকাল। যেন একটা ভয়ঙ্কর রকম গুরুত্বপূর্ণ গোপন কথা বলতে চায় এমন ভাবে সে মারুস্যার পায়ের কাছে বসে তার কানের কাছে মুখটা নামাল।

নরম গলায় বলতে শুরু করল, "তোমাকে যা বলতে চাই তা কি তুমি জান মারুস্যা? আমি খোলাখুলিই বলব। আমার মত হল কারণ আর যাই হোক, আমি তোমার সুখটা চাই। তাকে বিয়ে কর তপর্কভকে বিয়ে কর। এ নিয়ে কোনরকম হৈচৈ করো না তাকে বিয়ে করে ফেল বাস, তাহলেই হল। সব দিক থেকে সে একটা মানুষের মত মানুষ তাছাড়া, সে ধনী। ছোট ঘরে জন্মেছে তো কি হয়েছে। গুলি মার ও সব কথায়?"

মারুস্যা আরও শক্ত করে চোখ বন্ধ করল। সে লজ্জা পেল। সেই সঙ্গে দাদাও যে তপর্কভের প্রতি সহানুভূতিশীল তা জেনে তার ভালও লাগল।

"আর যাই হোক সে ধনী। তোমাকে অন্তত ক্ষুধার্ত থাকতে হবে না। আর কোন প্রিন্স বা কাউন্টের অপেক্ষায় বসে থাকলে তোমাকে না খেয়ে মরতে হতে পারে। তুমি তো জান, একটা কোপেকও আমাদের নেই। সব গেছে। কোষাগার শূন্য। ঘুমালে নাকি? নীরবতা কি সম্মতির লক্ষণ?"

মারুস্যা হাসল। ইগর হো-হো করে হেসে উঠে জীবনে এই প্রথম বোনের হাতটা চেপে ধরে তাতে চুমো খেল।

"তাকে বিয়ে কর। সে একজন শিক্ষিত লোক। আর সেটা আমাদের পক্ষেও ভাল হবে। বৃদ্ধ মহিলার প্যানপ্যানানীও বন্ধ হবে।"

ইগর দিবাস্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেল। কিছুক্ষণ স্বপ্ন দেখার পরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল:

"কেবল একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। খামকা সে ঘটকীকে পাঠাতে গেল কেন? সে নিজেই এলো না কেন? এখানে কি একটা যেন ঠিক হয় নি।.. ঘটকী পাঠাবার মত মানুষ তো সে নয়।"

মারুস্যা ভাবল, "সে কথা সত্যি। কি যেন একটা গোলমাল হয়েছে। ঘটকী পাঠানোটা বোকামিই হয়েছে। এর অর্থ কি?"

ইগরের বুদ্ধির খুব ধার নেই, তবু হঠাৎই একটা ব্যাখ্যা তার মনে জাগল:

"হয়তো অকারণে দেরী করার মত সময় তার হাতে নেই। সারা দিন সে ব্যস্ত থাকে। গরম জল-ঢালা বিড়ালের মত টৈটৈ করে রোগী দেখে বেড়ায়।"

মারুস্যা কিছুটা ঠাণ্ডা হল। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে ইগর বলল:

"আরও একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না: তার হুকুমে সেই

বুড়িটা বলেছে যে, বিয়ের পণ ষাট হাজারের কম হলে চলবে না। তুমিও তো সেটা শুনেছ ? সে নাকি বলেছে, 'অন্যথায় কোন কাজই হবে না'।''

মাকস্যা হঠাৎ চোখ খুলল , তার সাবা শরীর কাঁপতে লাগল ; দ্রুত উঠে বসল, কম্বলটা গলায় জড়াতেও ভুলে গেল। তার চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক ; গাল আগুন-লাল।

ইগবেব হাত ধবে টানতে টানতে বলল, ''বুড়িটা একথা বলেছে ? তাকে বলে দিও, এটা মিথ্যা কথা। তার মত লোক একথা বলতেই পারে না। সে আব...টাকা ? হাঃ, হাঃ। এ রকম হীন সন্দেহ একমাত্র তারাই কবতে পাবে যাবা জানে না সে কত অহঙ্কারী, কত সৎ, কত নিঃস্বার্থ। হ্যাঁ। সে এক পবম আশ্চর্য মানুষ। কেউ তাকে বুঝতে চায় না।''

ইগব বলল, ''আমিও তাই মনে কবি। বুড়িটা মিথ্যা বলেছে। হয়তো সে নিজেকে তার অনুগ্রহভাজন করে তুলতে চেয়েছে। সব ব্যবসায়ীদের সঙ্গেই ঐ রকম ব্যবহার করা তাব অভ্যাস।''

মাকস্যা মাথা নেড়ে কম্বলেব নীচে ডুব দিল। ইগর উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল।

বলল, ''মা কেঁদে কেঁদে নিজের বুকটাকে হাল্কা করছে। কিন্তু তার কথা আমবা শুনব না। তাহলে ? তুমি সম্মত ? চমৎকার। মিসেস ডাক্তার...হাঃ, হাঃ ! মিসেস ডাক্তার !''

মারুস্যার পায়ের পাতায় হাত বুলিয়ে খুশি মনে ইগর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে নিজেব মনেই আসন্ন বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিতদের একটা দীর্ঘ তালিকা তৈরী কবে ফেলল। ঝিমুতে ঝিমুতেই ভাবতে লাগল, ''শ্যাম্পেন আনাতে হবে আবল্ট্রখভ-এর কাছ থেকে, হর্স দু' উভার্স কর্চাতভের কাছ থেকে।... সব সময় তার কাছে তাজা ক্যাভিয়ার পাওয়া যায়। হ্যাঁ, আব চিংড়ি..''

পরদিন মারুস্যা সাধারণ কিন্তু সুন্দর সাজগোজ করে জানালায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল। বেলা এগারোটায় তপর্কভ বাড়ির পাশ দিয়ে দ্রুতবেগে চলে গেল। কিন্তু গাড়ি থামিয়ে বাড়িতে ঢুকল না। ডিনারের পরে আবারও দুই কালো ঘোড়ার পিছনে বসে দ্রুতগতিতে জানালাটা পার হয়ে গেল, কিন্তু সে থামল না। এমন কি জানালার দিকে একবার তাকালও না। চুলে গোলাপী ফিতে বেঁধে মারুস্যা জানালার ধারেই বসে ছিল।

মারুস্যা ভাবল, ''তার সময় নেই। রবিবারেই আসবে।''

কিন্তু রবিবারেও সে এল না। এক মাস, দু' মাস, তিনি মাসেও সে এল না।. . বলাই বাহুল্য, সে প্রিক্লনস্কিদের কথাই ভাবে নি। অপেক্ষা করে করে মারুস্যার ওজন কমে গেল...হাজার রকমের যন্ত্রণা তাকে চেপে ধরল।

সে অবাক হয়ে ভাবে, ''কেন সে আসে না ? কেন ? ওহো...আমি জানি। সে অসন্তুষ্ট হয়েছে, কারণ...কেন সে অসন্তুষ্ট হল ? কারণ মামন ঘটকীর প্রতি বড়ই দুর্ব্যবহার করেছিল। আর তাই সে ভেবেছে, আমি তাকে

ভালবাসতে পারি না।''

তো-তো করে ইগর বলে উঠল, ''শু-যো-র'' ইতিমধ্যেই সে আবল্‌টুখভের কাছে দশবার গেছে, এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, সেরা জাতের শ্যাম্পেনের অর্ডার সে নিতে পারবে কি না।

মার্চের শেষদিকে ইস্টার পর্বের পরে মাকস্যা অপেক্ষা করা ছেড়ে দিল।

একদিন ইগর মাকস্যার শোবার ঘরে ঢুকে বিশ্রী হাসি হেসে জানিয়ে দিল, তার ''পাণি-প্রার্থী''-টি এক ব্যবসায়ীর মেয়েকে বিয়ে করেছে।

''অভিনন্দন, হাঃ-হাঃ হাঃ।''

সংবাদটি আমার ছোট্ট নায়িকার উপর বড়ই নিষ্ঠুর প্রভাব ফেলল। তার মন একেবারেই ভেঙে গেল, কেবল একটা দিনের জন্য নয়, গোটা মাসের জন্য সে হয়ে উঠল অনপনেয় দুঃখ হতাশার প্রতিমূর্তি। চুল থেকে গোলাপী ফিতেটা খুলে ফেলল। জীবনের প্রতি হয়ে উঠল বিতৃষ্ণ। কিন্তু ভালবাসা কি সংস্কারে আচ্ছন্ন ও অন্যায় হতে পারে। তখনও মাকস্যা ডাক্তারের আচরণের স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে পায়। বৃথাই সেই সব উপন্যাস সে প্রাণভরে পড়ে নি যেখানে মানুষ বিয়ে করে কেবল যাকে ভালবাসে তাকে কষ্ট দিতে, জ্বালাতে, আঘাত করতে।

মাকস্যা ভাবে, ''সেই মূর্খ নারীকে সে বিয়ে করছে বিদ্বেষের বশে। আহা, তার বিয়ের ঘটকালীকে কঠোর আঘাত করে কী অন্যায় করেছি। তার মত লোক অপমানকে ভোলে না।''

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল লালিমা তার গাল থেকে মুছে গেল, ঠোঁট দুটি হাসি ভুলে গেল, তার মন আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে না। মাকস্যা অসাড় হয়ে গেল। সে বুঝল তপর্কভের সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের উদ্দেশ্যও হারিয়ে গেছে। এখন তার কপালে যদি মূর্খ খোসামুদে ও ভ্রষ্টচরিত্র মানুষ ছাড়া আর কিছুই না রইল, তাহলে জীবনের কাছে সে আর কি চাইবে? তার মন ভেঙে পড়ল। কোন কিছু ভাল করে দেখে না, কিছুতে মনোযোগ দেয় না। কান পেতে কিছু শোনেও না, তরুণী ও বৃদ্ধা নির্বিশেষে আমাদের মেয়েরা এই পরিস্থিতিতে চিরকাল যা করে থাকে, সে সেইভাবে বয়ে বেড়াতে লাগল এক ক্লান্তিকর, বিবর্ণ অস্তিত্বের বোঝা। পাণিপ্রার্থীর দল, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবী—কারও দিকে তার নজর নেই। পরিবারের দুস্থ অবস্থাকে সে দেখে নিরাসক্ত উদাসীন দৃষ্টিতে। যখন ব্যাংক থেকে প্রিকলনস্কি রাজবংশের বাড়িঘর, তাদের বড় আদরের ঐতিহাসিক নিদর্শন ও অস্থাবর সম্পত্তি সব বিক্রি করে দিল, আর তাকে চলে যেতে হল অতি সাধারণ, সস্তা ও মধ্যবিত্ত রুচির একটা নতুন বাড়িতে, তখনও সে একবার ফিরেও তাকাল না। সেদিনও দীর্ঘস্থায়ী গভীর ঘুম ঘুমাল, স্বপ্নও দেখল। তখন সে তপর্কভকে স্বপ্নে দেখল নানা রূপে—স্লেজ গাড়িতে, লোমের কোটে, কোট ছাড়া, কখনো বসে, কখনও বিশিষ্ট ভঙ্গীতে হেঁটে। তার সারা জীবনটাই ঘুমে ডুবে গেল।

কিন্তু ভেঙে পড়ল বজ্র, দুটি নীল চোখ থেকে ঘুমও বিদায় নিল।

পবিবাবেব ধ্বংসকে সহ্য কবতে না পেরে নতুন বাড়িতে বাজমাতা অসুস্থ হয়ে পড়ল, শুধু আশীর্বাদ ও কয়েকটা পোশাক ছাড়া ছেলেমেয়েদের জন্য আব কিছুই না বেখে একদিন সে মাবাও গেল। মায়েব মৃত্যু মারুস্যার কাছে একটা আঘাত নিয়ে ফিবে এল। সব স্বপ্ন দুঃখেব মধ্যে বিলীন হয়ে গেল।

|| ৩ ||

হেমন্ত এল, গত বছবেব মতই স্যাঁৎসেঁতে ও কর্দমাক্ত।

বাইবে ধূসব, অশ্রুসজল সকাল। যেন কাদামাখানো গাঢ় ধূসব মেঘগুলি দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত আকাশটাকে ঢেকে দিযেছে। নিশ্চল মেঘ যেন মনেব উপব চেপে বসেছে। মনে হয সূর্যও বুঝি নেই, সাবা সপ্তাহে একটি বাবও সে পৃথিবীব দিকে তাকায নি—পাছে খিকখিকে কাদায তাব বশ্মিগুলো নোংবা হয়ে যায সেই ভযেই বুঝি।

জলেব ফোঁটাগুলি সশব্দে আছড়ে জানালাব উপবে, বাতাসে কেঁদে ফিবছে চিমনিগুলোব মধ্যে আব প্রভুহাবা কুকুবেব মত চীৎকার কবছে। এমন একটা মুখও দেখা যায় না যাব উপবে অসহায বিবক্তিব ছাপ ফুটে ওঠে নি।

কিন্তু সেদিন সকালে মাকস্যাব মুখে যে দুঃখ জমেছে তাব তুলনায অতি বড় অসহায বিবক্তিও বুঝি ভাল। পাতলা কাঁদাব ভিতব দিয়ে হেঁটে আমাব গল্পেব নাযিকা চলেছে ডাক্তাব তপর্কভেব কাছে। কেন সে তাকে দেখতে যাচ্ছে?

"আমি চিকিৎসাব জন্য যাচ্ছি," সে ভাবল।

কিন্তু পাঠক, তার কথাও বিশ্বাস কববেন না।

তাব মুখে লেখা আছে সংঘাতেব চিহ্ন।

তপকর্ভেব বাড়িতে পৌঁছে সে ভযে ভযে, হতাশ হৃদযে ঘন্টায টান দিল। এক মুহূর্ত পবে দবজাব ওপাশে শব্দ শুনতে পেল। তাব মনে হল, পা দুটো যেন ববফ হযে জমাট বেঁধে গেছে। খট কবে একটা চাবিব শব্দ হল। মাকস্যা দেখল, তাব সাম[illegible] একটি সুদর্শনা চাকবানিব মুখ।

"ডাক্তাব বাড়ি [illegible]?"

"আজ দেখা হবে [illegible], কাল।" মেযেটি জবাব দিল। বাইবেব ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপতে কাঁপ[illegible] সে এক পা পিছিযে গেল। মাকস্যাব মুখেব উপব দবজা বন্ধ হযে গেল এবটু কাঁপল, তাবপব সশব্দে তালা পড়ে গেল।

মাকস্যা অপ্রস্তুত হযে ব[illegible]ড়ি ফিবে গেল। সেখানে বিনা পযসায এমন একটা ছবি দেখ[illegible] পেল [illegible] দেখে সে ক্লান্ত হযে পাড়ছে। আব দৃশ্যটা কিছু বাজকীযও নয।

ছোট্ট ড্রযিংরুমে ন[illegible] [illegible]চকে ছিটকাপড়ে ঢাকা সেটিব উপব বসে আছে প্রিন্স ইগব। সে ব[illegible] [illegible] তুর্কী কাযদায। তাব পাশেই মেঝেতে বসে আছে তাব [illegible] [illegible]বমা আইভানভনা। তাবা '[illegible]' খেলছে আব মদ খাচ্ছে। [illegible] ঢকঢক কবে বিযাব গিলছে, আব [illegible]

''ডালসিনিয়া'' মদিরায় চুমুক দিচ্ছে। খেলায় যে জিতবে সে বিজিতের নাকে একটা আঘাত করে দুটো দশ কোপেকের নোট দাবী করতে পারবে। খেলার মহিলা অংশীদার হিসাবে কালেরিনা আইভান্‌ভনাকে একটা ছোট সুবিধা দেওয়া হয়েছে ; দুটো মুদ্রার বদলে সে একটা চুমো দিয়েই পাওনা মিটিয়ে দিতে পারবে। এই খেলায় দু'জনেই অবর্ণনীয় সুখ পাচ্ছে। তারা হেসে গড়িয়ে পড়ছে, একে অপরকে খোঁচা মারছে, আর মাঝে মাঝেই লাফিয়ে উঠে একজন অপরজনকে ঘরময় তাড়া করছে। ইগর জিতলেই বালকের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে।

কালেরিনা আইভান্‌ভনা যখন নকল অনিচ্ছার সঙ্গে হারের পাওনাটা মিটিয়ে দিচ্ছে তখন ইগরের কী শিহরণ!

কালেরিনা আইভান্‌ভনা ঢ্যাঙা, চামড়াসর্বস্ব, পিঙ্গলা রমণী, ভয়ংকর রকমের কালো ভুরু ও গলদা চিংড়ির মত বেরিয়ে-আসে চোখ। প্রতিদিনই সে ইগরের সঙ্গে দেখা করতে আসে। প্রিক্‌লন্‌স্কিদের বাড়িতে আসে সকাল ন'টায়, তাদের সঙ্গে চা খায়, ডিনার খায়, রাতের খাবার খায়, তারপর মধ্যরাতের পরে চলে যায়। ইগর বোনকে বলেছে কালেরিনা আইভান্‌ভনা একজন গায়িকা, সে খুব সম্মানিত মহিলা, ইত্যাদি।

ইগর বোনকে বোঝাতে চেয়েছে, ''তার সঙ্গে একবার কথা বলে দেখ। সে ভীষণ চালাক-চতুর।''

আমার মতে, নিকিফর যখন কালেরিনা আইভান্‌ভনাকে বলে একটা নোংরা মেয়েমানুষ আর তাকে ডাকে ''কাভালেরিয়া'' আইভান্‌ভনা বলে তখন তার কথাগুলিই আসল সত্যের কাছাকাছি যায়। সে মেয়েটিকে সারা অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। তাকে সেবা করতে হয় বলে বিরক্ত হয়। অনুরক্ত বৃদ্ধ চাকরটির সহজাত প্রবৃত্তিই তাকে বলে দেয় যে তার প্রভুদের কাছে আসার কোন অধিকার এই মেয়েটির নেই। কালেরিয়া আইভান্‌ভনা দুষ্টু ও বোকা, কিন্তু রাতে ভরপেট খেয়ে, পকেটে জিতের কড়ি ভরে এবং তাকে ছাড়া তাদের চলবে না এই আশ্বাস নিয়ে প্রিক্‌লন্‌স্কিদের বাড়ি থেকে যেতে তার কোন বাধা হয় না। এক ইঙ্গি দিলে সে সবটাই নিতে জানে।

বাবার মৃত্যুর পর থেকে মারুস্যা যে পেনসন পায় তাতেই তার খরচপত্র চলে যায়। টাকাটা একজন সেনাপতির স্বাভাবিক পেনসনের চাইতেও বেশী। ইগরের যদি এত সব খামখেয়াল না থাকত তাহলে মোটামুটি বেঁচে থাকার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট হত।

কাজ-কর্মের ব্যাপারে সে যেমন অনিচ্ছুক, তেমনই অপারগ। আবার সে যে গরীব সে-কথাও বিশ্বাস করতে চায় না। সে যাতে অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় এবং খামখেয়ালীপনাকে কিছুটা কমিয়ে চলে সে কথা বলতে গেলেই ইগর রাগে জ্বলে ওঠে।

মারুস্যাকে সে প্রায়ই বলে, ''কালেরিয়া আইভান্‌ভনা বাদুরের মাংস পছন্দ করে না। তার জন্য মুরগীর রোস্ট করা চাই। তুমি সব গোলমাল

করে ফেল। সংসার চালাবার দায়িত্ব নিয়েছ, অথচ কি করে সেটা করতে হয় তা জান না। কাল যেন ঐ বাজে বাদুরের মাংস না থাকে। মহিলাকে কি না খাইয়ে মেরে ফেলব!''

মারুস্যা মৃদু প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু ঝামেলা এড়াবার জন্য মুরগী কিনে আনে।

ইগর হয়তো একদিন চেঁচিয়ে বলে ওঠে, ''আজ রোস্ট হয় নি কেন?''

''কারণ কাল আমরা মুরগী খেয়েছি,'' মারুস্যা জবাব দিল।

পারিবারিক গণিতের ব্যাপারটা ইগর জানত না, আর জানতে চাইতও না। ডিনারের সময় সে প্রতিদিন নিজের জন্য বিয়ার আর কালেরিয়া আইভান্‌ভনার জন্য মদের তাগিদ দিতে লাগল।

কাধ ঝাঁকিয়ে এবং মানুষের বোকামিতে বিস্ময় প্রকাশ করে সে মারুস্যাকে বলত, ''মদ ছাড়া কি যথাযথ ডিনার তুমি পরিবেশন করতে পার? নিকিফর! মদ নিয়ে এস। এটা দেখা তোমার কাজ। তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত মারুস্যা। সংসারটা চালানো তো আমার কাজ নয়। আমার ধৈর্যের সীমা পরীক্ষা করতে তুমি নিশ্চয় খুব মজা পাও।''

সে একটা অসংযত বিলাসী। অথচ কালেরিয়া আইভান্‌ভনাও সব সময় তাকে নীতিগতভাবে সমর্থন করে।

ডিনারের জন্য টেবিল পাতা হলেই সে জিজ্ঞাসা করে, ''প্রিন্সের জন্য কিছুটা মদ আছে তো? আর বিয়ারই বা কোথায়? খানিকটা বিয়ার তো চাই। প্রিন্সেস, বিয়ার আনতে একটা লোক পাঠাও। তোমার কাছে কি খুচরো আছে?''

কিছু খুচরো আছে এই কথা বলে প্রিন্সেস তার কাছে যা ছিল সবটাই দিয়ে দেয়। ইগর ও কালেরিয়া খানাপিনা করে, অথচ কখনও লক্ষ্য করে না যে মারুস্যার ঘড়ি, আংটি, ইয়ারিং, প্রতিটি জিনিস দফায় দফায় উধাও হয়ে যাচ্ছে বন্ধকের দরুণ, অথবা তার দামী গাউনগুলি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে পুরনো জিনিসের দোকানীদের কাছে।

মারুস্যা যখন পরদিনের ডিনারের জন্য নিকিফরের কাছ থেকে টাকা ধার করে তখন সে বুড়ো যতই খিটিমিটি করুক তারা সেটা চোখেও দেখে না, কানেও শোনে না। এই নীচ ও ভোঁতা বুদ্ধির জীব দুটির সে সব দেখাশোনার সময়ই নেই।

পরদিন ন'টার পরে মারুস্যা আবার তপর্কভের বাড়ি গেল। সেই একই পরিচারিকা দরজা খুলল। প্রিন্সেসকে বাইরের ঘরে নিয়ে তার কোট খুলতে সাহায্য করে মেয়েটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল:

''আপনি তো জানেন, তাই না মিস? রোগী দেখতে ডাক্তার পাঁচ রুবলের কম নেন না। সেটা আপনার জানা দরকার।''

''ও আমাকে একথা বলছে কেন?'' মারুস্যা অবাক হয়ে ভাবল। ''কী আস্পর্ধা! বেচারি হয়তো জানেও না যে তার চাকরানিটি এতদূর উদ্ধত।''

সেই সঙ্গে মাকস্যার মনটাও দমে গেল। তার পকেটে মাত্র তিন কবল আছে, কিন্তু তুচ্ছ দুটো কবলের জন্য সে তো এখান থেকে চলে যেতে পারে না।

বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে মাকস্যা ওয়েটিং রুমে ঢুকল। সেখানে তখন অনেক রোগীর ভিড়। বলা বাহুল্য, চিকিৎসায় আগ্রহী অধিকাংশই স্ত্রীলোক। ঘরের সবগুলি আসন দখল করে দলে দলে ভাগ হয়ে তারা গল্প-গুজব করছে। আলোচনা চলছে উচ্চকণ্ঠে আর তার বিষয়বস্তু বিবিধ আবহাওয়া, রোগ-শোক, ডাক্তার, ছেলেমেয়ে। সকলেই কথা বলছে জোর গলায় আর এমনভাবে হাসছে যেন যার যার বাড়িতেই বসে আছে। কেউ বা বসে বসে ঢুলছে, বা কাপড়ে ফুল তুলছে। ঘরে সাদাসিদে ও খারাপ পোশাকের মানুষ একটিও নেই। তপর্কভ রোগী দেখছে পাশের ঘরে। রোগীরা পর পর গিয়ে তাকে দেখাচ্ছে। তারা যাচ্ছে বিবর্ণ, গম্ভীর মুখে ঈষৎ কাঁপতে কাঁপতে, বেরিয়ে আসছে রক্তাভ মুখে, ঘামে ভিজে, দেখে মনে হয় যেন অনেক দিনের দুঃসহ বোঝার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে এখন তারা সুখী হতে পেরেছে। প্রতিটি রোগীর জন্য তপর্কভ দশ মিনিটের বেশী সময় দেয় না। স্পষ্টই বোঝা যায়, রোগটা গুরুতর কিছু নয়।

অন্য চিন্তায় ডুবে না থাকলে মাকস্যাও হয়তো ভাবত একেবারেই হাতুড়ে ব্যাপারের মত মনে হচ্ছে।"

সকলের শেষে সে ডাক্তারের ঘরে ঢুকল। মলাটে জার্মান ও ফরাসী ভাষায় নাম লেখা বইতে ঘরটা ভর্তি। ঘরে ঢোকার সময় সে কাঁপতে লাগল ঠাণ্ডা জলে চুবানো মুরগীর বাচ্চার মত। ডেস্কের উপর বাঁ হাতটা রেখে ডাক্তার দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের মাঝখানে।

"সে কী সুন্দর দেখতে!" এই চিন্তাটাই রোগীর মনে প্রথম ঝিলিক দিয়ে উঠল।

তপর্কভ ইচ্ছা করে কোনরকম ভঙ্গী দেখায় না। কিন্তু সে যে ভঙ্গীই দেখাক না কেন সেটাই তাকে বেশ মানিয়ে যায়। যে ভঙ্গিমায় মাকস্যা তাকে দেখতে পেল তাতে তার মনে পড়ে গেল সেই সব রাজকীয় নিদর্শনগুলির কথা যা দেখে শিল্পীরা বড় বড় সামরিক নেতাদের ছবি আঁকে। ডেস্কের উপর রাখা হাতের চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে মহিলা রোগীদের কাছ থেকে সদ্য পাওয়া দিশ ও পাঁচ রুবলের নোটগুলি। তাছাড়াও টেবিলের উপর পর পর সাজানো রয়েছে যন্ত্রপাতি, নল ও অন্য জিনিসপত্র। মাকস্যার কাছে সে সবই অত্যন্ত দুর্বোধ্য, অত্যন্ত "বৈজ্ঞানিক"। সব কিছু মিলিয়ে ঘরের গাম্ভীর্য যেন অনেক বেড়ে গেছে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মাকস্যা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তপর্কভ হাত বাড়িয়ে হাতল-চেয়ারটা দেখিয়ে দিল। আমার নায়িকা শান্ত পায়ে এগিয়ে এসে তাতে বসল। তপর্কভ গম্ভীর ভঙ্গিতে উঠে রোগীর মুখোমুখি অপর একটা চেয়ারে বসল। তার স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ হল মাকস্যার মুখের উপর।

মারুস্যা ভাবল, ''সে আমাকে চিনতে পারে নি। তা না হলে সে এ ভাবে চুপ করে থাকত না...হা ঈশ্বর, সে কিছু বলছে না কেন? আমি কেমন করে কথা আরম্ভ করি?''

''তারপর?'' তপর্কভ কথা বলল।

''একটা কাশি'', ফিসফিস করে কথাগুলি বলে নিজের কথার সমর্থনে মারুস্যা একটু কাশল।

''কতদিন?''

''এই দু' মাস...রাতে বাড়ে।''

''হুম..জ্বর?''

''না, জ্বর আসে বলে মনে হয় না...''

''আগে কি আপনার চিকিৎসা করেছি? তখন কি হয়েছিল?''

''ফুসফুসের প্রদাহ।''

''হুম...হ্যাঁ, মনে পড়েছে আপনি প্রিকলনস্কি, তাই তো?''

''হ্যাঁ...তখন আমার বড় ভাইও অসুস্থ ছিল।''

''এই চূর্ণটা খাবেন শোবার আগে...ঠাণ্ডা লাগাবেন না...''

তপর্কভ দ্রুতহাতে একটা ব্যবস্থাপত্র লিখে আগেকার ভঙ্গীতেই দাঁড়াল। মারুস্যাও উঠে দাঁড়াল।

''আর কিছু নয়?''

''কিছু না।''

তপর্কভ কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। তার দিকে এবং দরজার দিকে—দু'দিকেই ডাক্তারের দৃষ্টি। নষ্ট করার মত সময় তার হাতে নেই, মারুস্যার বেরিয়ে যাবার অপেক্ষাতেই সে আছে। কিন্তু মারুস্যা তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েই রইল। ডাক্তার তাকে কিছু বলুক—সেজন্যই সে অপেক্ষা করছে। কী সুন্দর দেখতে সে! নিঃশব্দে একটা মিনিট কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত মারুস্যা নড়ে উঠল, ডাক্তারের ঠোঁটে ঈষৎ হাই লক্ষ্য করে তিন-রুবলের নোটটা তার হাতে দিয়ে দরজার দিকে মুখ ফেরাল। ডেস্কের উপর টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে ডাক্তার দরজাটা বন্ধ করে দিল।

বাড়ি ফেরার পথে মারুস্যা নিজের উপরেই ক্ষেপে গেল।

''আমি কেন তার সঙ্গে কথা বললাম না? কেন? আমি একটা ভীরু, সত্যিই তাই। সবটাই কেমন যেন বোকামি হল...অকারণেই তাকে বিরক্ত করলাম। ওই নোংরা টাকাটাই বা তাকে দিতে গেলাম কেন? অর্থই যত অনর্থ ঘটায়...ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। লোকটাকে আমি আঘাত দিলাম। ভেবে-চিন্তে তো দিতে হয়। কিছু বললাম না কেন? তাহলে তো সেও ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলত। ঘটকী কেন এসেছিল সেটাও পরিষ্কার হয়ে যেত...''

বাড়িতে পৌঁছেই মারুস্যা বিছানায় শুয়ে বালিশ দিয়ে মাথাটা ঢেকে দিল। বিচলিত বোধ করলেই সে এ কাজটা করে। কিন্তু নিজেকে শান্ত করার

সুযোগ সে পেল না। ইগর তার ঘরে ঢুকে বুটের খস্‌খস, মচ্‌মচ্‌ শব্দ করে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

তার মুখে একটা চাপা ভাব।

"তোমার কি হয়েছে?" মারুস্যা শুধাল।

"মানে...আমি ভেবে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। তোমাকে বিরক্ত করতে চাই নি। তোমাকে কিছু বলতে চাই। খুব ভাল খবর। কালেরিয়া আইভান্‌ভনা আমাদের সঙ্গে থাকতে চায়। তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।"

"একেবারে অসম্ভব। একথা কি তাকে বলা যায়!"

"অসম্ভব কেন? সে খুব ভাল মেয়ে। সংসারের কাজে তোমাকে সাহায্য করবে। ওকে কোণের ঘরটায় থাকতে দেব।"

"কোণের ঘরে মা মারা গেছে। এটা অসম্ভব।"

মারুস্যা এমনভাবে কেঁপে উঠল যেন তাকে ছুরি মারা হয়েছে। তার গালে লালের ছোপ পড়ল।

"এটা অসম্ভব। জর্জেস. তুমি যদি আমাকে ওই মেয়েটার সঙ্গে থাকতে বল তাহলে আমাকে খুন করা হবে। প্রিয় জর্জেস, ঐ কাজ করো না। দোহাই তোমার।"

"কিন্তু কিসের জন্য তুমি তাকে পছন্দ কর না? আমি তো বুঝি না। সে তো ভাল মেয়ে...বুদ্ধিমতী, হাসিখুশি।"

"আমি তাকে পছন্দ করি না।"

"বেশ তো, আমি করি। ওই মেয়েটাকে আমি ভালবাসি। আমি চাই সে আমার সঙ্গে থাকুক।"

মারুস্যা কেঁদে ফেলল।...তার ফ্যাঁকাসে মুখটা হতাশায় বিকৃত হয়ে উঠল।

"সে এখানে এলে আমি মরে যাব।"

চাপা শিস দিতে দিতে একটু হেঁটে ইগর মারুস্যার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এক মিনিট পরেই ফিরে এল।

"এক রুব্‌ল্‌ ধার দাও", সে বলল।

মারুস্যা তাই দিল। ইগরের দুঃখকে সে লাঘব করতে চায়। তার মতে, ইগরের মনের মধ্যে একটা ভীষণ সংঘাত চলেছে; কর্তব্যবোধের সঙ্গে কালেরিয়ার প্রতি ভালবাসার সংঘাত।

সেই সন্ধ্যায় কালেরিয়া মারুস্যার কাছে এল।

তাকে জড়িয়ে ধরে কালেরিয়া বলল, "কেন তুমি আমাকে পছন্দ কর না? তুমি তো জান, আমি বড় দুঃখী।"

তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে মারুস্যা বলল:

"এমন কিছু নেই যার জন্য আমি তোমাকে ভালবাসতে পারি!"

এই উক্তিটির জন্য তাকে বড় বেশী দাম দিতে হল। যে ঘরে মা মারা

গিয়েছে এক সপ্তাহ পরে সেই ঘরে ঢুকে কালেরিয়ার প্রথম ও প্রধান কাজই হল সেই পংক্তিটির জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ। প্রতিহিংসার কঠোরতম পথটাই সে বেছে নিল।

প্রতিদিন ডিনারের সময় সে প্রিন্সেসকে প্রশ্ন করে, "তুমি এ রকম চাল দেখাও কেন? অন্য যারা তোমার মতই গরীব তাদের কাছে চাল দেখানো তোমার উচিত নয়, ভাল মানুষদের আরও শ্রদ্ধা করাই তোমার উচিত। যদি জানতাম তোমরা এত গরীব তাহলে আমি কখনই তোমাদের সঙ্গে থাকতে আসতাম না। তোমার ভাইয়ের জন্য আমি কেন অধঃপাতে যাব?" সে একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

মারুস্যার দারিদ্র্যের প্রতি অনুযোগ, বক্রোক্তি ও মৃদু হাসির শেষ অট্টহাসিতে। সে অট্টহাসিতে ইগর কিছু মনে করে না। কালেরিয়ার কাছে নিজেকে ঋণী মনে করে সে নীচু হয়েই থাকে। বিলিয়ার্ড-মিস্ত্রির বৌ, ইগরের রক্ষিতা এই মেয়েটার অর্থহীন অট্টহাসিতে মারুস্যার জীবন বিষময় হয়ে ওঠে।

সারা সন্ধ্যাটা রান্না ঘরে বসে অসহায়, দুর্বল, অস্থিরচিত্ত মারুস্যা নিকিফরের প্রশস্ত হাতের তালুর উপর চোখের জল ফেলে। নিকিফরও তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে কপট কান্না কাঁদে, এবং অতীত দিনের স্মৃতি-চারণা করে মারুস্যার ক্ষতকে আরো দগদগে করে তোলে।

সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "ঈশ্বর ওদের শাস্তি দেবেন। তুমি কেঁদো না।"

শীতকালে মারুস্যা আবার তপর্কভের কাছে গেল।

পড়ার ঘরে ঢুকে দেখল, সে একটা চেয়ারে বসে আছে; আগেকার মতই সুন্দর ও মহিমান্বিত। এবার তার মুখটা বড়ই ক্লান্ত। নিদ্রাবিহীন মানুষের মত চোখ পিটপিট করছে। মারুস্যার দিকে না তাকিয়েই সামনের হাতল-চেয়ারটা দেখিয়ে দিল। মারুস্যা বসল।

তপর্কভের দিকে তাকিয়ে মারুস্যা ভাবল, "তার মুখে দুঃখের ছায়া। ব্যবসায়ীর মেয়েকে নিয়ে নিশ্চয় সে খুব অসুখী।"

দু'জনই চুপ। আহা, কত আনন্দের সঙ্গে নিজের জীবনের কাহিনী মারুস্যা তাকে শোনাতে পারত। ফরাসী ও জার্মান ভাষায় নামাঙ্কিত বইগুলোতে যা সে পায় নি সেই কথাগুলি সে তাকে শেখাতে পারত।

"একটু কাশি আছে," মারুস্যা চুপিচুপি বলল, এবং নিজের কথার সমর্থনে দ্বিতীয়বার কাশল।

ডাক্তার দ্রুত তার দিকে তাকাল।

"হুম... জ্বর?"

"হ্যাঁ, সন্ধ্যায়।"

"রাতে ঘাম হয়?"

"হ্যাঁ।"

"পোশাক খুলুন।"

"কি বলতে চান?"

তপর্কভ অধৈর্য হয়ে তার বুকটা দেখাল। লজ্জায় লাল হয়ে মারুস্যা ধীরে ধীরে বুকের বোতামগুলো খুলল।

"পোশাকটা ছেড়ে ফেলুন। দয়া করে তাড়াতাড়ি করুন।" একটা ছোট হাতুড়ি তুলে নিয়ে তপর্কভ বলল।

মারুস্যা আস্তিন থেকে একটা হাত বের করল। দ্রুত তার কাছে এগিয়ে তপর্কভ অভ্যস্ত হাতে চোখের নিমেষে তার পোশাকটাকে কোমর পর্যন্ত টেনে নামাল।

"শার্টের বোতামগুলো খুলুন।" বলেই ডাক্তার মারুস্যার জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই শার্টের গলার বোতামটা খুলে রোগীকে সন্ত্রস্ত করে হাতুড়ি দিয়ে তার সাদা অস্থিসার বুকের উপর ঠুকতে লাগল।

"হাত দুটো নীচু করে রাখুন...বাধা দেবেন না। আমি আপনাকে খেয়ে ফেলছি না", তপর্কভ বিড়বিড় করে বলে। মারুস্যা লজ্জা পেল; তার মন বলল, পৃথিবী যদি সেই মুহূর্তেই তাকে গিলে খেয়ে ফেলত!

ঠুকতে ঠুকতে ডাক্তার কান পেতে শুনল। বাঁ'দিকের ফুসফুসের উপরের দিককার আওয়াজটা বড়বেশী অস্পষ্ট। স্পষ্ট শুনতে পেল চটপট আওয়াজ ও নিঃশ্বাসের কর্কশ শব্দ।

"পোশাকটা পরে নিন।" কথাটা বলেই তপর্কভ পর পর প্রশ্ন করতে লাগল ঃ তাদের থাকার ব্যবস্থা ভাল কিনা, জীবনযাত্রা নিয়মিত কিনা, ইত্যাদি।

এক প্রস্থ বক্তৃতা শুনিয়ে তারপর ডাক্তার বলল, "আপনাকে সামারা যেতেই হবে। সেখানে "ক্যুমিস" (ঘোড়ার দুধের দৈ) খাবেন। আমার কাজ শেষ। আপনি যেতে পারেন।"

মারুস্যা কোন রকমে বোতামগুলি লাগাল, আনাড়ির মত তার হাতে পাঁচ রুবল্ গুঁজে দিল, তারপর মুহূর্তকাল সেখানে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাড়ি ফেরার পথে সে ভাবল, "পুরো আধা ঘন্টা সময় সে আমাকে আটকে রাখল, অথচ একটা কথা আমি বললাম না। একটা কথাও না। কেন তার সঙ্গে আলাপ করলাম না?"

হাঁটিতে হাঁটিতে সে সামারার বদলে ডাক্তার তপর্কভের কথাই ভাবতে লাগল। সামারা গিয়ে তার কি হবে? একথা সত্যি যে সেখানে কালেরিয়া আইভানভ্না নেই, কিন্তু তপর্কভও তো নেই।

সামারার কথা থাক। ক্রুদ্ধ অথচ উল্লসিত হৃদয়ে সে হাঁটিতে লাগল; ডাক্তার স্বীকার করেছে যে সে অসুস্থ; এখন কোনরকম বাহানা ছাড়াই সে ডাক্তারের কাছে যেতে পারবে, যতবার খুশি, এমন কি প্রতি সপ্তাহে একবার করে। তার রোগী দেখার ঘরটা কত সুন্দর ও আরামপ্রদ। ঘরের পিছন দিককার কোচটা তো বিশেষ সুন্দর। তার ইচ্ছা সেখানে বসে নানা বিষয়

নিয়ে কথা বলবে, অভিযোগ জানাবে, রোগীদের কাছ থেকে এত বেশী টাকা না নেওয়ার পরামর্শ দেবে। অবশ্য ধনীদের কাছ থেকে বেশী নিতে পারে, নেওয়া উচিত, কিন্তু গরীবদের বেলায় রেয়াৎ দেওয়া উচিত।

মারুস্যা ভাবল, "সে জীবনকে বোঝে না; ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য ধরতে পারে না। আমি তাকে শিখিয়ে দেব।"

এবারও ঠিক সেই সময় বাড়িতে তার জন্য একটা বিনা পয়সার প্রদর্শনী অপেক্ষা করছিল। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে ইগর একটা সেটিতে শুয়ে আছে। সে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, দিব্যি করছে, আর জ্বরগ্রস্তের মত কাঁপছে। তার মাতাল মুখ বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়ছে।

সে আর্তনাদ করে উঠল, "কালেরিয়া চলে গেছে। দু'দিন সে বাড়িতে নেই। সে খুব রেগে গেছে।"

কিন্তু অকারণেই ইগর চেঁচামেচিটা করল। সেই সন্ধ্যায়ই কালেরিয়া এল, তাকে ক্ষমা করল, তাকে নিয়ে একটা ক্লাবে গেল।

ইগবেব ভ্রষ্টাচার চরমে উঠল। মারুস্যার পেনসন তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, সে "কাজ" করতে শুরু করল। চাকরদের কাছ থেকে টাকা ধার করে, তাস খেলায় জোচ্চুরি করে, মারুস্যার টাকা ও জিনিসপত্র চুরি করে। একদিন পাশাপাশি হাঁটিতে হাঁটিতে ইগর মারুস্যার পকেট থেকে দুই রুব্‌ল্ তুলে নিল; টাকাটা মারুস্যা বাঁচিয়েছিল নিজের একজোড়া জুতো কিনবে বলে। এক রুব্‌ল্ নিজের জন্য রেখে অপর রুব্‌ল্ দিয়ে ইগর কালেরিয়ার জন্য ন্যাসপাতি কিনল। পরিচিত জনরা ইগরকে ত্যাগ করেছে। আগে যারা প্রিক্‌লনস্কি-বাড়িতে আসত, তারা সকলেই এমন কি মারুস্যার বন্ধুরাও আজকাল তার মুখের উপর তাকে বলে "জুয়াচোরদের রাজা।" এমন কি শাতো দ ফ্লু-ব "মেয়েরা"ও তাকে অবিশ্বাসের চোখে দেখে; ইদানিং সে যখন কোন সদ্য পরিচিতের কাছ থেকে টাকা ধার করে তাদের নৈশভোজে আমন্ত্রণ করে তখন তারা হাসে।

এই চূড়ান্ত ভ্রষ্টাচার মারুস্যা নিজের চোখে দেখে, বোঝেও।

কালেরিয়ার কঠোর আচরণও ধাপে ধাপে বেড়ে চলেছে।

মারুস্যা একদিন তাকে বলল, "দয়া করে এভাবে আমার পোশাক-আশাক ওলোট-পালোট করো না।"

কালেরিয়া জবাব দিল, "এতে তোমার জিনিসপত্রের কোন ক্ষতি হবে না; আর তুমি যদি ভেবে থাক যে আমি চোর তাহলে আমি চলে যাব।"

আর ইগর বোনকে শাপ-শাপান্ত করে সাতটা দিন কালেরিয়ার পায়ের কাছে পড়ে রইল, তাকে মিনতি জানাল সে যেন চলে না যায়।

এ রকম জীবন দীর্ঘকাল চলতে পারে না। প্রতিটি গল্পেরই সমাপ্তি আছে; এই ছোট উপন্যাসটিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

"শ্রোভটাইড" উৎসব এসে পড়ল; আর সঙ্গে এল সেই দিন যারা বসন্তের অগ্রদূত। দিনগুলো দীর্ঘতর হচ্ছে, বাড়ির ছাদ থেকে ফোঁটা ফোঁটা

জল গড়িয়ে পড়ছে, বাতাসে ভেসে আসছে তরতাজা ভাব, আর সেই বাতাসে শ্বাস টানলেই পাওয়া যাচ্ছে বসন্তের আভাষ।

সেই সময় এক সন্ধ্যায় নিকিফর বসেছিল মাকস্যার বিছানার পাশে। ইগর ও কালেরিয়া বাড়ি ছিল না।

"আমি আগুনের উপর বসে আছে নিকিফর," মাকস্যা বলল।

নিকিফর নাকে কেঁদে অতীতের স্মৃতি মন্থন করে তার ক্ষতে নতুন করে ছুরি বসাল। সে বলতে লাগল তার বাবা-মার কথা, তাদের আগেকার জীবনের কথা।... যে সব বনে স্বর্গত মালিক শিকারে যেতেন, যে সব মাঠে সে লাফিয়ে লাফিয়ে খরগোসদের তাড়া করত, তারই বর্ণনা করতে লাগল। আর বলল, সেবাস্তোপোলের কথা। প্রিন্স সেখানেই আহত হয়েছিল। নিকিফর অনেক গল্প বলল। মারুস্যার সব চাইতে ভাল লাগল সেই জমিদারির গল্প যেটা দেনার দায়ে পাঁচ বছর আগেই বিক্রি হয়ে গেছে।

"ছাদে উঠে যাও।...সবে বসন্তের শুরু। কি আর বলব। ভগবানের জগৎ থেকে তুমি চোখ ফেরাতেই পারবে না। অরণ্য তখনও কালো, তা থেকে ভেসে আসত কত আনন্দ। আর সেই আশ্চর্য সুন্দর গভীর ছোট নদীটা। তোমার মা যখন ছোট ছিল তখন ছিপ-সুতো নিয়ে সেও মাছ ধরতে যেত। কখনও বা সারা দিন জলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকত। খোলা বাতাসে থাকতে সে খুব ভালবাসত...প্রকৃতি।"

কথা বলতে বলতে নিকিফরের গলা ভেঙে গেল। মাকস্যা কান পেতে শুনল, তাকে উঠতেই দিল না। আশ্রিত বুড়ো মানুষটি তার বাবা, তার মা ও জমিদারী সম্পর্কে যা কিছু বলছে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে যেন সে সব কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। সে কান পেতে শুনল, তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তার মনে জাগল বেঁচে থাকার, সুখী হবার, তার মার মত নদীতে মাছ ধরার বাসনা। সেই নদীটা আজও আছে, নদীর ওপারে আছে মাঠ, আর সে সব কিছুর উপর ঝিলমিল করছে একটি শান্ত, আতপ্ত সূর্য।....বেঁচে থাকাটা কত ভাল।

তার শুকনো হাতে চাপ দিয়ে মারুস্যা বলল, "নিকিফর, সোনা, কাল আমাকে পাঁচ রুব্‌ল্ ধার দিও। এই শেষবার। দিতে পারবে তো?"

"পারব মিস। আমার পাঁচ রুব্‌ল্‌ই আছে। সেগুলি তুমি নাও, আমরাও দেখব ঈশ্বর আমাদের কি পাঠায়।"

"আমি তোমাকে ফেরৎ দেব সোনা। তুমি আমাকে ধার দেবে।"

সকালে মারুস্যা সেরা পোশাকটি পরল, গোলাপী ফিতে দিয়ে চুল বাঁধল, তারপর তপর্কভের সঙ্গে দেখা করতে গেল। বাড়ি থেকে বের হবার আগে দশবার আয়নায় নিজেকে দেখল। তপর্কভের বাইরের ঘরে একটি নতুন পরিচারিকা তাকে স্বাগত জানাল।

মারুস্যার কোটটা খুলতে খুলতে নতুন পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি জানেন যে রোগী দেখতে ডাক্তার পাঁচ রুবলের কম নেন না?"

এবার ওয়েটিং রুমে স্বাভাবিকের চাইতেও বেশী রোগী ছিল। সবগুলি আসন পরিপূর্ণ। একজন তো বড় পিয়ানোটার উপরেই বসে ছিল। রোগী দেখা শুরু হল দশটায়। বারোটায় একটা অস্ত্রোপচারের জন্য বিরতি ঘটিয়ে আবার রোগী দেখা শুরু হল দুটোয়। চারটের আগে মারুস্যার ডাক পড়ল না।

পেটে চা পড়ে নি, অপেক্ষা করে করে আর জ্বরে ও উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে কোনরকমে সে ডাক্তারের বিপরীৎ দিকে চেয়ারটায় বসে পড়ল। তার মাথাটা যেন ফাঁকা লাগছে, মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখে ঝাপসা দেখছে। যেন একটা কুয়াসার ভিতর দিয়ে তার চোখে ধরা পড়ছে কেবল ডাক্তারের মাথা, হাত, ও তার হাতুড়ি।

ডাক্তার শুধাল, "আপনি সামারা গিয়েছিলেন? কেন যান নি?"

মারুস্যা কোন জবাব দিল না। ডাক্তার তার বুকটা ঠুকল, কান পেতে শুনল। বাঁদিকের বোবা আওয়াজটা গোটা ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়েছে। দক্ষিণ ফুসফুসের উপরের দিকের আওয়াজটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

"আপনার সামারা যাবার দরকার নেই। যাবেন না", তপর্কভ বলল।

কুয়াসার ভিতর দিয়ে তার শুকনো গম্ভীর মুখের উপর মারুস্যা যেন দেখতে পেল অনুকম্পার মত একটা কিছু।

সে চুপি চুপি বলল, "আমি যাব না।"

"আপনার বাবা-মাকে বলবেন, আপনাকে যেন খোলা বাতাসে যেতে না দেন। কঠিন, দুষ্পাচ্য খাবার খাবেন না।"

তপর্কভ তাকে অনেক পরামর্শ দিতে শুরু করল। আবার একটা বক্তৃতা ফেঁদে বসল।

মারুস্যা সেখানেই বসে থাকল। একটা কথাও তার কানে গেল না। কুয়াসার ভিতর দিয়ে কেবল তার ঠোঁট নাড়াটাই সে দেখতে পেল। তার মনে হল, ডাক্তার বড় বেশীক্ষণ কথা বলছে। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার কথা থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার চলে যাবার অপেক্ষায় চশমার ভিতর দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

মারুস্যা উঠল না। সুন্দর হাতল-চেয়ারটায় বসে থাকতে তার ভালই লাগছে। বাড়িতে কালেরিয়ার কাছে ফিরে যেতে ভয় করছে।

ডাক্তার বলল, "আমার কাজ হয়ে গেছে। আপনি যেতে পারেন।"

মারুস্যা মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল।

মুখ দেখে মন বোঝার বিদ্যা যদি ডাক্তারের জানা থাকত তাহলে সে পড়তে পারত ওই দুটি চোখে লেখা আছে "আমাকে তাড়িয়ে দিও না।"

তার দুই চোখ বেয়ে জল পড়ছে; হাতটা অসহায়ভাবে ঝুলে পড়েছে চেয়ারের পাশে।

সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "আমি তোমাকে ভালবাসি ডাক্তার।"

ভিতরে একটা ভয়ংকর আগুন জ্বলে ওঠায় মারুস্যার মুখ ও গলা লাল

হয়ে উঠল।

''আমি তোমাকে ভালবাসি।'' দ্বিতীয়বার কথাটা বলে সে দু'বার মাথা নাড়ল ; অসহায়ভাবে সামনে ঝুঁকে পড়ায় তার ভুরু ডেস্ককে স্পর্শ করল।

আর ডাক্তার? রোগী দেখতে বসে এই প্রথম সে লজ্জাবোধ করল। ধোলাই খাবার পূর্ব মুহূর্তের ছোট ছেলেটির মত চোখ পিট্‌পিট করতে লাগল। আগে কখনো কোন রোগীনীর মুখ থেকে এ রকম কথা এ ভাবে বলতে সে শোনে নি। এককভাবে কোন নারীর মুখ থেকেও নয়। সে কি ভুল শুনেছে?

তার অন্তরটা মোচড় দিয়ে উঠল। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। অত্যন্ত বিব্রত হয়ে সে কাশতে শুরু করল।

''নিকোলাই।'' পাশের ঘর থেকে কে যেন ডাকল। আধখোলা দরজায় তার ব্যবসায়ী বৌর গোলাপী গাল দুটো দেখা গেল।

সুযোগ বুঝে ডাক্তার দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল। এই হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতি থেকে ছাড়া পাবার এই সুযোগ সে হাতছাড়া করল না।

দশ মিনিট পরে রোগী দেখার ঘরে ফিরে এসে দেখল, মারুস্যা কোচের উপরে টান টান হয়ে পড়ে আছে। মুখটা উপরে রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, একগুছি চুল সমেত একটা হাত ঝুলে আছে। সে তখন অচেতন। তপর্কভেব মুখ লাল, বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দ। ধীরে ধীরে মারুস্যাব কাছে গিয়ে তাকে ভালভাবে শুইয়ে দিল। একটা হুক খুলতে না পেরে পোশাকটা ছিঁড়ে ফেলল। জামাব নানান ভাঁজ ও ফাঁক-ফোকর থেকে তার ব্যবস্থা-পত্র, ভিজিটিং-কার্ড ও ফটোগ্রাফ কোচের উপর ঝরে পড়ল।

ডাক্তার তার মুখে জলের ঝাপ্টা দিল। মারুস্যা চোখ মেলে একটা কনুইতে ভর দিয়ে উঠে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল। তার মনে তখন একটাই প্রশ্ন : ''আমি কোথায়?''

ডাক্তারকে চিনতে পেরে আর্তস্বরে বলল, ''আমি তোমাকে ভালবাসি।''

ভালবাসায় ও মিনতি ভরা তার দুটি চোখ ডাক্তারের মুখের উপর নিবদ্ধ। তাকে দেখাচ্ছে একটি আহত ছোট প্রাণীর মত।

কিছুই বুঝতে না পেরে ডাক্তার শুধাল, ''আমি কি করতে পারি?'' সে এমন স্বরে কথা বলল যা মারুস্যা চেনে না—কাটা-কাটা নয়, নরম প্রায় সদয়।

তার কনুইটা সরে গেল, মাথাটা কোচের উপব ঢলে পড়ল, কিন্তু চোখদুটি তখনও ডাক্তারের দিকেই তাকিয়ে...

মারুস্যার চোখেব মিনতির ভাষা বুঝতে পেরে ডাক্তার সম্মুখেই দাঁড়িয়ে রইল। স্পষ্ট বুঝতে পারল, এক মহাসংকটে সে পড়েছে। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে, জ্বরাগ্রস্ত মাথার ভিতরে অননুভূত অপরিচিত কী যেন ঘটে চলেছে। কোথা থেকে মনে আসছে এত কথা? ভালবাসায় ও মিনতিতে ভরা ঐ দুটি চোখই কি তাদের ডেকে আনছে?

সেই ছেলেবেলাব কথা মনে পড়ল যখন সে মনিবের বাড়িতে সামোভার

মাজত। সামোভাব ও কানের কড়ার পরেই চোখের সামনে যেন ঝিলিক দিল ভারী কোটপরা আশ্রয়দাতা ও আশ্রয়দাত্রীরা আর সেই ডিভিনিটি স্কুল যেখানে তাকে পাঠানো হয়েছিল তার ''সুকণ্ঠের'' জন্য। ডিভিনিটি স্কুলের ঠেঙানি ও বালিমাখা গমের পরিজের পরেই দেখা দিল বড় বিদ্যালয়টি যেখানে লাতিন, ক্ষুধা, স্বপ্ন, পড়াশুনা, ও বারসারের মেয়ের সঙ্গে প্রেম। মনে পড়ল, আশ্রয়দাতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে পালিয়ে গিয়েছিল বড় বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদালয়ে। তখন পকেটে একটা পয়সা ছিল না, পায়ের বুটজোড়া জীর্ণ শতচ্ছিন্ন। কী জাদু যে ছিল সেই পলায়নে। বিশ্ববিদ্যালয়েও কাজের জন্য সেই একই ক্ষুধা ও শীত...কী কঠিন পথ।

শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল, মাথাব ঘাম পায়ে ফেলে নিজের পথ কেটে উপরে উঠল, পৌঁছে গেল একেবারে মাথায়...আর এখন? নিজের কাজ সে খুবই ভাল জেনেছে, অনেক পড়াশুনা করেছে, কঠোর পরিশ্রম করেছে, দিন-রাত কাজ করেছে।

তপর্কভ তির্যক দৃষ্টিতে ডেস্কের উপর পড়ে-থাকা দশ পাঁচ রুবলের নোটগুলোর দিকে তাকাল, যে মহিলারা এইমাত্র এই সব টাকা দিয়েছে তাদেব কথা মনে পড়ল, আর লজ্জায় সে লাল হযে উঠল। এই কঠিন পথ সে পার হয়ে এসেছে শুধুই কি পাঁচ রুবলের নোট আর মহিলাদের জন্য? হ্যাঁ, কেবল তাদের জন্যই...

স্মৃতির ভারে তার সমুন্নত দেহ নুয়ে পড়ল, তার গর্বোদ্ধত ভঙ্গী উধাও হযে গেল, মসৃণ মুখে ফুটে উঠল কুঞ্চন-রেখা।

মারুস্যার চোখের দিকে তাকিয়ে সে আবার চুপিচুপি বলল. ''আমি কি করতে পারি?''

ওই দুটি চোখ তাকে লজ্জায় ঢেকে দিল।

চোখ দুটি হয় তো প্রশ্ন করছিল. এতকাল সে কি করেছে, আব সারা ডাক্তারী জীবনে সে কি পেয়েছে?

পাঁচ রুবল্ ও দশ রুবলের নোট, আর কিছুই না। তার জন্যই তাকে বলি দিতে হয়েছে লেখাপড়া, জীবন ও মনের শান্তি। রুব্‌ল্ তাকে দিয়েছে রাজার মত বাড়ি. মনোরম খাদ্য, ঘোড়া, সবকিছু—এক কথায় যাকে বলে আরাম।

তপর্কভের মনে পড়ে গেল তার বড় বিদ্যালয়ের ''আদর্শ'', তার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন আর সহসা সব কিছুই তার কাছে মনে হল এক দুর্নিবার্য নোংরামি—ঐ সব হাতল-চেয়ার, দামী ভেলভেটে মোড়া কোচ, দেয়াল-জোড়া কার্পেট-ঢাকা মেঝে, ঐসব মোমবাতি-দান, আর তিন শ' রুব্‌ল্ দামের ঘড়ি।

তীরবেগে ছুটে গিয়ে যে নোংরার মধ্যে মারুস্যা শুয়েছিল সেখান থেকে তাকে তুলে নিল, তার দেহটাকে তুলে নিল সোফা থেকে...

''এখানে শুয়ে থেকো না।'' বলে সে কোচ থেকে ঘুরে দাঁড়াল।

আর বুঝি বা কৃতজ্ঞতাবশে এক ঢাল আশ্চর্য সুন্দর সোনালী চুল তার

বুকের উপর ছড়িয়ে পড়ল। আব একজনের দুটি চোখ তাব সোনালী ফ্রেমেব চশমায় ঝিকমিক করতে লাগল। আর সে কী চোখ! তার ইচ্ছা হল, আঙুল দিয়ে চোখ দুটোকে ছোঁয়।

''আমাকে একটু চা দাও।'' মারুস্যা ফিসফিসিযে বলল।

*   *   *   *

পবদিন তাকে সঙ্গে নিয়ে তপর্কভ বেলের একটা প্রথম শ্রেণীব কামরায় বসেছিল। মারুস্যাকে সে দক্ষিণ ফ্রান্সে নিয়ে চলেছে। আশ্চর্য মানুষ! সে জানে, নিরাময়ের কোন আশা নেই। সে জানে, এটা নিয়তিব মতই অমোঘ। তবু সে তাকে নিয়ে যাচ্ছে। সারা পথ সে হাতুড়ি ঠুকল, কান পেতে শুনল, আর প্রশ্ন করে চলল। নিজের জ্ঞানকে সে বিশ্বাস করতে চায় না, তাব বুকের ভিতর থেকে ক্ষীণতম আশার শব্দটি শোনার জন্য সমস্ত শক্তি দিয়ে সে হাতুড়ি ঠুকছে আর কান পেতে শুনছে।

কাল পর্যন্তও যে-টাকা সে এত পরিশ্রম কব জমিয়েছে সেই টাকা আজ সে দরাজ হাতে খরচ করছে যাত্রাপথে।

মেয়েটির একটা ফুসফুসের সেই অভিশপ্ত শব্দটা না শোনার জন্য আজ সে সব কিছু দিতে প্রস্তুত। আজ দু'জনেরই বাঁচাব কত সাধ। তাদের জন্যই আজ সূর্য উঠেছে, এ দিনটার জন্যই তারা অপেক্ষা কবে ছিল। কিন্তু সূর্য অন্ধকারের হাত থেকে তাদের বাঁচাতে পারল না। শেষ হেমন্তে তো ফুল ফোটে না।

দক্ষিণ ফ্রান্সে তিনটে দিন কাটাবার আগেই প্রিন্সেস মারুস্যা মারা গেল।

ফ্রান্স থেকে ফিরে তপর্কভ তার আগের জীবনেই ফিবে গেল। আগের মতই সে ধনী মহিলাদের চিকিৎসা করে, আর পাঁচ রুবলের নোট জমায়। কিন্তু তার মধ্যে একটা লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। কোন নারীর সঙ্গে কথা বলতে হলে সে এক পাশ দিয়ে শূন্যে তাকায়। যে কারণেই হোক, কোন নারীর মুখের দিকে তাকাতে সে ভয় পায়...

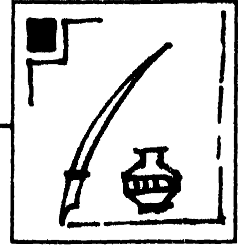
ইগব বেঁচে আছে, ভাল আছে। কালেরিয়াকে ছেড়ে এখন সে তপর্কভের বাড়িতেই থাকে। ডাক্তার তাকেও ঠাঁই দিয়েছে, তাকে খুব ভালবাসে। ইগরের চিবুক তাকে মনে করিয়ে দেয় মারুস্যার চিবুক। আর শুধু তারই জন্য নিজের পাঁচ রুবলের নোটগুলি সে ইগবকে দেয মদ খেয়ে উড়িয়ে দিতে।

ইগর খুব খুশি।

১৮৮২

নিরুপায় প্রতারক

Cheats Perforce



নববর্ষের টুকিটাকি

জাখর কুজ্‌মিস্‌ দ্যাদেচ্‌কিন একটা পার্টি দিচ্ছে। সকলে নববর্ষকে স্বাগত জানাচ্ছে, আর জন্মদিনে অভিনন্দন জানাচ্ছে তার স্ত্রী মেলানিয়া তিখোনভ্‌নাকে।

অনেক অতিথি সমাগত। সকলেই সম্মানিত, সম্পন্ন, ধীর, স্থির ও গম্ভীর। একটাও বাজে লোক নেই। সবগুলি মুখই অমায়িকতায় ও ব্যক্তিগত মর্যাদায় উজ্জ্বল। দু'জন বসেছে ওয়েল-ক্লথমোড়া বড় সেটিতে : জমিদার গুসেভ, আব দোকানী রাজমাখালভ, যার কাছ থেকে দ্যাদেচ্‌কিনরা ধারে জিনিস কেনে। সকলেই পাণি-প্রার্থী মেয়েদের সম্পর্কে কথাবার্তা বলছে।

গুসেভ বলল, ''আজকাল অমদ্যপ, কঠোর পরিশ্রমী ছেলে পাওয়া সহজ নয়...মোটেই সহজ নয়।''

''পরিবারটাই আসল কথা। শৃংখলা, আলেক্সি ভ্যাচিলিভিচ। শৃংখলা না থাকলে...সে পরিবার...পরিবারই নয়....''

''পরিবারে যদি শৃংখলা না থাকে, তাহলে...ঠিক কথা...জগৎ জুড়ে যা বোকামি চলছে...ওহে....

তাদের পাশেই চেয়ারে বসে তিনটি মহিলা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাদের দিকেই তাকিয়েছিল! বক্তাদের ''জ্ঞানের বহর দেখে তাদের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। গুরি মার্কোভিচ এক কোণে দাঁড়িয়ে বিগ্রহগুলি দেখছে। গৃহকর্তার শোবার ঘর থেকে গোলমালের শব্দ আসছে। তরুণী ও ভদ্রজনরা সেখানে 'লোত্তো' খেলছে। বাজী এক কোপেক। টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে সাত বছরের কলিয়া কাঁদছে। সেও 'লোত্তো' খেলতে চায়, কিন্তু ওরা খেলতে দেবে না। সে খুব ছোট, আর তার কাছে কোপেক নেই, এটা কি তার দোষ?

সকলে উপদেশ দিল, ''ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ থামাতো বোকা! কেন কাঁদছিস্‌ বল্‌ তো? মাম্‌ এসে ঠ্যাঙানি দিলে ভাল হবে?''

রান্না-ঘর থেকে মামের গলা শোনা গেল, ''কে কাঁদছে? কলিয়া? চাবুক বুঝি কম পড়েছে, পাজি কোথাকার। বারবারা গুরিএভ্‌না, ওর কানটা মুলে দাও তো।''

গোলাপী পোশাক পরা দুটি যুবতী বসেছে বিবর্ণ সুতীব চাদবে ঢাকা গৃহকর্তার বিছানায়। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কোপাইস্কি নামক বছব তেইশের একটি যুবক। সে জীবনবীমা কোম্পানিতে কাজ করে। সামনে

থেকে তাকে অনেকটা বিড়ালের মত দেখায়। সে মেয়ে দুটিকে বোঝানোর চেষ্টা করছে।

আঙুল দিয়ে উঁচু শক্ত কলারটা ঢিল করতে করতে সে ভারিক্কী চালে বলছে, আমার বিয়ে করার ইচ্ছা নেই। নারী মানুষের মনের একটি উজ্জ্বল বিন্দু, কিন্তু সে মানুষকে ধ্বংসও করতে পারে। অতীব অশুভ প্রাণী।''

''আর পুরুষ? পুরুষ তো ভালবাসতেই পারে না। কেবল ফস্টিনস্টি করে বেড়ায়।''

''তুমি কী সরল। আমি দুঃখবাদী নই, সন্দেহবাদীও নই, তবু আমার ধারণা, মনের ব্যাপারে পুরুষ মানুষের আসন সর্বদাই শীর্ষে।''

দ্যাদেচ্কিন স্বয়ং তার প্রথম সন্তান গ্রিসা খাঁচায় বন্দী নেকড়ের মত ঘরের এ-কোণে ও-কোণে হেঁটে বেড়াচ্ছে: ডিনারের সময় তারা ভরপেট গিলেছে, আর এখনও সেটা চালিয়ে যেতে চাইছে।...

দ্যাদেচ্কিন রান্না ঘরে ঢুকল। তার স্ত্রী গুঁড়ো চিনি দিয়ে মটর ভাজছে।

দ্যাদেচ্কিন বলল, ''মেলানিয়া 'হর্স দুভা'টা পরিবেশন কর না। অতিথিরা পছন্দ করবে...''

''তাদের অপেক্ষা করতে হবে। তুমি খালি খাবে আর মদ গিলবে, আর মাঝ রাতে এসে বলবে পরিবেশন কর? তোমার মরণ হয় না? চলে যাও। আমাব ছায়া মাড়িও না।''

''শুধু এক চিমটি মেলানিয়া...তাতে তোমার কম পড়বে না। আমরা পেতে পারি কি?''

''তোমরা এক আপদ। আমি বলছি, চলে যাও। গিয়ে তোমার অতিথিদের কাছে বস গে। রান্নাঘরে ঘুর-ঘুর করছ কিসের জন্য?''

দ্যাদেচ্কিন গভীর নিঃশ্বাস ফেলে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘড়ির দিকে তাকাল। ঘড়ির কাঁটা বলছে, এগারোটা বেজে আট মিনিট। বহুবাঞ্ছিত মুহূর্তটি আসতে আরও বাহান্ন মিনিট। ভয়াবহ। ভাল পানীয়ের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকা সব চাইতে শক্ত। পানীয়ের জন্য পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার তুলনায় শীতের মধ্যে ট্রেন ধরার জন্য পাঁচ ঘন্টা অপেক্ষা করাও ভাল। একান্ত অনিচ্ছায় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দ্যাদেচ্কিন আরো কিছুক্ষণ পায়চারি করে বড় কাঁটাটাকে আরো পাঁচ মিনিট এগিয়ে দিল। আর গ্রিশা? গ্রিশাকে যদি এখনই মদ না দেওয়া হয় তাহলে সে শুঁড়িখানায় গিয়ে সেখানেই মদ খেতে বসবে। দুঃখে মরে যাবার ছেলে সে নয়...

সে বলল, ''মাম্, মদ দিচ্ছ না বলে অতিথিরা বিরক্ত হচ্ছে। তুমি কি তাদের না খাইয়ে মারবে। তুমি তাদের একটুখানি তো দিতে পার।''

''একটু অপেক্ষা কর। বেশী দেরি হবে না। খুব তাড়াতাড়ি। রান্নাঘরে এসে খিচ্খিচ্ করো না।''

গ্রিশা সশব্দে দরজা বন্ধ করে ঘড়ি দেখতে গেল। এই একশ' বার ঘড়ি দেখা হল। বড় কাঁটাটা নিষ্ঠুর! এখনও যেখানে ছিল প্রায় সেখানেই আছে।

নিজেকে সান্ত্বনা দিতে গ্রিশা বলল, "ঘড়িটা ধীরে চলছে।" বড় কাঁটাটাকে সে সাত মিনিট এগিয়ে দিল।

ঘড়ির পাশ দিয়ে দৌড়ে যেতে যেতে কলিয়া ঘড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে সময় গুণতে শুরু করল। সকলে যখন "হুররে।" বলে চেঁচিয়ে ওঠে সেই মুহূর্তটাকে সে ভাল করে দেখতে চায়। ঘড়িটার অচল অবস্থা তাকে বড় কষ্ট দেয়। একটা চেয়ারের উপর উঠে সে ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাল এবং অনন্তকাল থেকে আরও পাঁচ মিনিট চুরি করল।

একটি যুবতী কোপাইস্কিকে বলল, "যাও তো, ঘড়িটা দেখে এস। আমার আর ধৈর্য মানছে না। আর যাই হোক, আজ নববর্ষ। নতুন সুখ।"

দুটো গোড়ালি একসঙ্গে ঘষতে ঘষতে কোপাইস্কি ঘড়িটার দিকে ছুটে গেল।

কাঁটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "এটাকে শয়তানে পেয়েছে। এখনও যে অনেক সময় বাকি। এতক্ষণে একটা ঘোড়া খেয়ে শেষ করতে পারি। ...ওরা যখন "হুররে" বলে চেঁচাবে তখন আমি কলিয়াকে চুমো খাবই।"

ঘড়ির কাছ থেকে কিছুটা গিয়ে কোপাইস্কি থামল, একমুহূর্ত চিন্তা করে ঘুরে দাঁড়াল, এবং নববর্ষের আগমনকে ছয় মিনিট এগিয়ে দিল। দ্যাদেচ্‌কিন দুই গ্লাস জল খেল, কিন্তু তার আত্মা জ্বলে যাচ্ছে। সে হাঁটতে লাগল এদিক-ওদিক, ওদিক-এদিক।...মাঝে মাঝে তার স্ত্রী রান্নাঘর থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়। জানালার তাকের উপরকার বোতলগুলো কী যন্ত্রণাদায়ক। সে কি করতে পারে? সে আর সইতে পারে না। আরও একবার সে শেষ চেষ্টাটা করে। ঘড়িটা তার হেপাজতে। সে নার্সারিতে ঢোকে। ঘড়িটা সেখানে ঝোলানো থাকে। কিন্তু সেখানে যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল সেটা তার পিতৃ হৃদয়ের পক্ষে গ্রহণীয় নয়ঃ ঘড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গ্রিশা মিনিটের কাঁটাটা ঘুরিয়ে দিচ্ছে।

"তুমি...তুমি...কি করছ তুমি? অ্যাঁ? কাঁটাটা ঘোরালে কেন? বোকা কোথাকার। অ্যাঁ? কেন? অ্যাঁ?"

দ্যাদেচ্‌কিন কাশল, একটু নড়াচড়া কবল, ভীষণ রকম বকাবকি করে হাত নাড়তে লাগল।

"কিসের জন্য? আরে...ঘুরিয়েছ, বেশ করেছ। এবার সরে পড়।" ছেলেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে নিজেই ঘড়ির কাঁটা আরও এগিয়ে দিল।

নববর্ষের আর এগারো মিনিট বাকি। বাবা ও গ্রিশা ঘরে ঢুকে টেবিল পাততে শুরু করে দিল।

দ্যাদেচ্‌কিন চেঁচিয়ে ডাকল, "মেলানিয়া। নববর্ষ যে এসে গেল।"

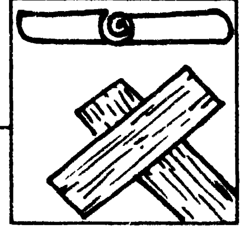
মেলানিয়া তিখোনভ্‌না ছুটে বের হয়ে স্বামীর ঘোষণাটা যাচাই করতে গেল। অনেকক্ষণ ধরে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। স্বামী মিথ্যা বলে নি।

"এখন আমি কি করি?" সে চুপি চুপি বলতে লাগল। "মাংসের মটরটাই তো এখনও তৈরী হয় নি। হুম। মাথা কাটা যাবে। এ অবস্থায় এটা পাতে দেব কেমন করে?"

এক মুহূর্ত কি ভাবল। তারপর মেলানিয়া তিখোনভ্না কাঁপা হাতে ঘড়ির কাঁটাটা পিছনে ঘুরিয়ে দিল। পুরাতন বছরের আয়ু বিশ মিনিট বেড়ে গেল।

"ওরা অপেক্ষা করতে পারবে।" এই কথা বলে গৃহস্বামিনী ছুটে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল।

১৮৮৩



বাঁকা আয়না

The Crooked Mirror

একটি খৃস্ট্‌মাসের গল্প

আমার স্ত্রী ও আমি ড্রয়িংরুমে ঢুকলাম। শেওলার ভেজা-ভেজা গন্ধ নাকে এল। একশ' বছরেও যে দেয়ালে আলো পড়ে নি সে দেয়ালে আলো পড়তেই লাখ-লাখ ইঁদুর ও ধেড়ে ইঁদুর ছুটাছুটি শুরু করে দিল। দরজাটা বন্ধ করতেই বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ হল, আর ঘরের কোণে স্তূপীকৃত কাগজ-পত্রগুলি উড়তে লাগল। তার উপর আলো পড়তেই দেখতে পেলাম প্রাচীন পুথিপত্র আর মধ্যযুগের সব ছবি। দেয়ালে টাঙানো পিতৃপুরুষেব প্রতিকৃতি-গুলি কালের প্রভাবে সবুজাভ হয়ে গেছে। সেই সব পূর্বপুরুষদের মুখ উদ্ধত ও রুক্ষ ; যেন বলতে চাইছে ঃ

"তোমাকে চাবকানো উচিত বন্ধু!"

আমাদের পায়ের শব্দ সারা বাড়িতে ধ্বনিত হতে লাগল। আমার কাশির উত্তর এল তাবই প্রতিধ্বনিতে, যে প্রতিধ্বনি একদিন আমার পূর্বপুরুষদের ডাকেও সাড়া দিত।

বাতাস গর্জন করছে। আর্তনাদ করছে। অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে কে যেন কাঁদছে ; সে কান্নায় হতাশা ঝরে পড়ছে। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা অন্ধকার নোংরা জানালার উপর ছট্-ছট্ করে পড়ছে, আব সেই শব্দ বয়ে আনছে দুঃখ।

একটা অর্থপূর্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আমি বলে উঠলাম, "হে পিতৃপুরুষগণ! আমি যদি লেখক হতাম তাহলে ঐ ছবিগুলি দেখে একটা দীর্ঘ উপন্যাস লিখে ফেলতাম। যাই বলুন, এই সব প্রাচীনদের প্রত্যেকেই একদিন যুবক ছিলেন এবং পুরুষ হোন আর নারী হোন প্রত্যেকের জীবনেই রোমান্সও ছিল। আর সে কী রোমান্স। যেমন, আমার প্রপিতামহী ঐ বৃদ্ধ মহিলার দিকে তাকিয়েই দেখুন। ঐ কুৎসিত, ভয়ংকর নারীরও একটা নিজস্ব কাহিনী আছে, আর সে কাহিনী অতীব আকর্ষণীয়। ঐ কোণে যে আয়নাটা ঝুলছে দেখতে পাচ্ছ?" প্রশ্নটা আমাব স্ত্রীকে কবলাম।

আমার প্রপিতামহীর প্রতিকৃতির কাছেই এক কোণে ঝোলানো কালো ব্রোঞ্জের ফ্রেমে বাঁধানো একটা বড় আয়না তাকে দেখালাম।'

''ঐ আয়নাটার জাদুকরী শক্তি আছে; আমার প্রপিতামহীকে ওটাই ধ্বংস করেছে। এটার জন্য তিনি প্রভূত অর্থ দিয়েছিলেন; মৃত্যু পর্যন্ত কোন দিন এটাকে হাতছাড়া করেন নি। দিন-রাত তিনি অবিরাম এটার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। এমন কি খানাপিনার সময়ও এটার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। রাতে শুতে যাবার সময় সর্বদাই সঙ্গে নিয়ে বিছানায় যেতেন, আর মৃত্যুকালে বলে গিয়েছিলেন এটাকে যেন তার সঙ্গে তার শবাধারেই কবর দেওয়া হয়। তার সে বাসনা যে পূর্ণ করা যায় নি তার একমাত্র কারণ আয়নাটা শবাধারের থেকে অনেক বড়।''

''তিনি কি প্রণয়ে চপলা ছিলেন?''

''সম্ভবত। কিন্তু তার কি আর কোন আয়না ছিল না? অন্য সব আয়না ছেড়ে বিশেষ করে এই আয়নাটাকেই তিনি ভালবাসতেন কেন? এটার চাইতে ভাল আয়না কি তার ছিল না? না, এর মধ্যে কোথাও একটা ভয়ংকর গোপনীয় কিছু আছে। অবশ্যই আছে। প্রবাদ আছে, একটা দৈত্য এই আয়নায় বাস করে, আর ঐ প্রপিতামহীর দৈত্যদের সম্পর্কে একটা দুর্বলতা ছিল। অবশ্য এ সবই বাজে কথা, কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে ব্রোঞ্জ-ফ্রেমের এ আয়নাটির জাদুকরী শক্তি আছে।''

আয়নাটার ধূলো ঝেড়ে তার ভিতরে তাকিয়ে হেসে উঠলাম। আমার হাসির একটা চাপা প্রতিধ্বনি হল। আয়নাটা ছিল বাঁকানো, আর আমার মুখটা সব দিক থেকেই বিকৃত দেখাচ্ছিল: আমার নাকটা ছিল বাঁ গালের উপর, আর আমার চিবুক ছিল একদিকে সরানো এবং একটার জায়গায় দুটো।

''আমার প্রপিতামহীর রুচি ছিল অদ্ভুত!'' আমি বললাম।

একটু ইতস্তত করে আমার স্ত্রী আয়নার কাছে গেল এবং তার মধ্যে তাকাল, আর তার পরেই একটা ভয়ানক ব্যাপার ঘটল। সে ফ্যাকাসে হয়ে গেল, তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল, সে আর্তনাদ করে উঠল। মোমবাতি-দানটা তার হাত থেকে পড়ে মেঝেতে গড়াগড়ি যেতে লাগল; বাতিটা নিভে গেল। আমরা অন্ধকারে ডুবে গেলাম। শুনতে পেলাম, একটা ভারী কিছু মেঝেতে পড়ে গেল: আমার স্ত্রী ভীষণভাবে মূর্ছিত হয়ে ধরাশায়ী হয়েছে।

বাতাস আরও করুণ সুরে আর্তনাদ করতে লাগল, ইঁদুরগুলো ছুটাছুটি শুরু করল, ধেড়ে ইঁদুরগুলো কাগজপত্রের মধ্যে খস্‌-খস্‌ করে নড়াচড়া করতে লাগল। একটা পাল্লা যখন জানালা থেকে খুলে নীচে পড়ে গেল তখন আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল। জানালায় চাঁদ দেখা দিল....

আমার স্ত্রীকে তুলে নিয়ে আমার পূর্বপুরুষদের বাসভবন থেকে বাইরে চলে গেলাম। সন্ধ্যার আগে তার চেতনা ফিরল না।

সুস্থ হয়েই সে বলে উঠল, "আয়নাটা! আমাকে আয়নাটা দাও! কোথায় সেই আয়না?"

পরবর্তী একটা পুরো সপ্তাহ সে পানীয় মুখে দিল না, খেল না, ঘুমল না, কিন্তু সারাক্ষণ আয়নাটা তাকে এনে দেবার কথা বলতে লাগল। সে ফুঁপিয়ে কাঁদল, চুল ছিঁড়ল, বিছানায় গড়াগড়ি খেল, আর শেষ পর্যন্ত ডাক্তার যখন জানিয়ে দিল যে অতিকৃশতার ফলে সে মারা যেতে পারে, তার অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক, তখন আমি সব ভয়কে জয় করে আবার নীচে নেমে গেলাম এবং প্রপিতামহীর আয়নাটা এনে তাকে দিলাম। সেটা দেখেই সে খুশিতে হেসে উঠল, তারপর জড়িয়ে ধরে সেটাকে চুমো খেল, আর একদৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর দশ বছর কেটে গেছে; এখনও সে আয়নাটার দিকেই তাকিয়ে থাকে, একমুহূর্তের জন্যও সেটাকে হাতছাড়া করে না।

"ও কি সত্যি আমি?" সে ফিস্‌ফিস্ করে বলে, আর আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে তার মুখটা আরও লাল হয়ে ওঠে। "হ্যাঁ, এ তো আমি। একমাত্র আয়না ছাড়া আর সব কিছুই মিথ্যা বলে। সব লোকই মিথ্যা বলে, আমার স্বামীও মিথ্যা বলে! ওঃ যদি আরও আগে নিজেকে দেখতাম। যদি জানতে পারতাম সত্যি আমি দেখতে কেমন, তাহলে ওই লোকটাকে বিয়েই করতাম না! সে আমার যোগ্য নয়! অতি সুপুরুষ মহান নাইটরা এসে আমার পায়ে উপুড় হয়ে পড়ত!"

একদিন আমার স্ত্রীর পিছনে দাঁড়িয়ে হঠাৎই আয়নার উপর চোখ পড়ায় একটা ভয়ংকর গোপন কথা আমি জেনে ফেললাম। চোখ-ঝলসানো রূপের অধিকারিণী এমন এক নারীকে দেখলাম যেমনটি আমি জীবনে দেখি নি। প্রকৃতির এক অলৌকিক সৃষ্টি, রূপ লাবণ্য ও প্রেমের এক অপূর্ব সমন্বয়। কিন্তু এটা কেমন করে সম্ভব হল? কি এমন ঘটেছিল? আমার কুৎসিত, অনাকর্ষণীয় স্ত্রীকে আয়নার মধ্যে এত সুন্দরী দেখায় কেন? কেন?

কারণ বাঁকা আয়নাটাতে আমার স্ত্রীর কুৎসিত মুখটা সব রকম ভাবেই বিকৃত হয়ে ধরা পড়ে, এবং তার নাক, মুখ, চোখের স্থান পরিবর্তনের ফলেই আকস্মিকভাবে তার মুখটা সুন্দর হয়ে ওঠে। বিয়োগকে বিয়োগ দিয়ে গুণ করায় ফল দাঁড়িয়েছে যোগ।

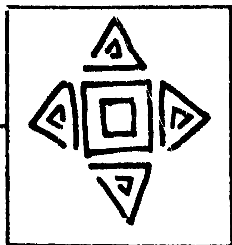
এখন আমরা দু'জন, আমার স্ত্রী ও আমি, আয়নাটার সামনে বসে থাকি, এবং এক মুহূর্তের জন্যও আয়নার উপর থেকে চোখ না সরিয়ে সেই দিকেই তাকিয়ে থাকি। আমার নাকটা গুড়ি মেরে সরে যায় আমার বাঁ গালের উপর, আর চিবুকটা দুই ভাগ হয়ে একদিকে সরে যায়; কিন্তু আমার স্ত্রীর মুখ হয়ে ওঠে রমণীয়—আর একটা বেপরোয়া, উন্মাদ কামনা আমাকে পরাভূত করে।

"হা, হা, হা!" আমি পাগলের মত হেসে উঠি।

আর আমার স্ত্রী প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে ফিস্‌ফিস্ করে বলে:

"আমি কত সুন্দর!"

১৮৮৩



আনন্দ

Joy

তখন রাত বারোটা।

মিতিয়া কুল্‌দারভ উত্তেজিতভাবে, আলুথালু বেশে সবেগে বাবা-মার ফ্ল্যাটে ঢুকে সবগুলো ঘরে দ্রুত পায়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল। তার বাবা-মা শুতে গেছে। তার বোন বিছানায় শুয়ে একটা উপন্যাসের শেষ পাতাটা শেষ করতে ব্যস্ত। তার উচ্চ-বিদ্যালয়ের ভাইরা ঘুমিয়ে পড়েছে।

তার বাবা-মা অবাক হয়ে বলল, "তুমি কোথায় ছিলে? তোমার কি হয়েছে?"

"ওঃ, আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না! এ আমি কোন দিন আশা করি নি! না। এটা আমি আশা করি নি। ... এমন কি এটা অবিশ্বাস্য!"

হো-হো করে হাসতে হাসতে মিতিয়া হাতল-চেয়ারে বসে পড়ল। অতি সুখে সে পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না।

"এটা অবিশ্বাস্য! তোমরা কল্পনাও করতে পার না! তাকিয়ে দেখ!"

তার বোন লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠল; একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে দাদার কাছে গেল। বিদ্যালয়গামী ছেলেরা জেগে উঠল।

"ব্যাপার কি? তুমি ভাল আছ তো?"

"সুখ মাম, সুখ। আজ সারা রাশিয়া আমাকে চিনেছে! এতদিন কেবল তোমরা জানতে পৃথিবীতে দিমিত্রি কুল্‌দারভ নামে একটি কলেজিয়েট রেজিস্ট্রার আছে, কিন্তু আজ সারা পৃথিবী এটা জেনেছে! মাম! হে প্রভু!"

মিতিয়া লাফ দিয়ে উঠল, আবার সবগুলি ঘর ঘুরে এল, আবার বসে পড়ল।

"হয়েছে কি? সহজভাবে বল!"

"তোমরা তো বুনো জন্তুর মত বাস কর, খবরের কাগজ পড় না, খবরের ধার ধার না, অথচ কাগজে কত উল্লেখযোগ্য জিনিস থাকে! কোন কিছু ঘটলে সকলেই তা সরাসরি জানতে পারে, কোনকিছুই লুকিয়ে রাখা হয় না! ওঃ, আমি কত সুখী! হে প্রভু! তোমরা জান খবরের কাগজে কেবল বিখ্যাত লোকদের কথাই লেখা হয়, আর আজ তারা আমার কথাও কিছু ছেপেছে!"

"তুমি কি বলছ? কোথায়?"

বাবার মুখ সাদা হয়ে গেল। মা বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল। ছোট ছেলেরা লাফিয়ে উঠে রাত-পোশাকেই বড় ভাইয়ের কাছে চলে এল।

"হ্যাঁ, তারা আমার কথা কিছু ছেপেছে। আজ সারা রাশিয়া আমাকে

চেনে। এই সংখ্যাটা সযত্নে রেখে দাও। আমরা মাঝে মাঝেই এটা পড়ব। তাকিয়ে দেখ।''

মিতিয়া পকেট থেকে একখানা খবরের কাগজ টেনে বের করে বাবার হাতে দিল।

নীল পেন্সিল দিয়ে গোল করা একটা লেখার উপর আঙুলটা চেপে ধরল।

''এটা পড়।''

বাবা চশমাটা চোখে দিল।

''নাও, এটা পড়।''

মা বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল। একটু কেশে বাবা পড়তে শুরু করল :

২৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ১১টায় কলেজিয়েট রেজিস্ট্রার দিমিত্রি কুলদারভ—''

দেখছ, দেখছ তোমরা? পড়।''

কলেজিয়েট রেজিস্ট্রার দিমিত্রি কুলদারভ মালায়া ব্রোন্নায়া স্ট্রীটের কোজিখিনের বাড়ির মদের দোকান থেকে বেরিয়ে আসছিল এবং মত্ত অবস্থায় থাকার দরুন

''আমার সঙ্গে ছিল সেমিয়ন পেত্রভিচ এ সবই সবিস্তারে লেখা আছে। পড়ে যাও। মন দিয়ে শোন।''

মত্ত অবস্থায় থাকার দরুন সে পা পিছলে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ির ঘোড়ার পায়ের নীচে পড়ে যায়। ঘোড়াটা ভয় পেয়ে কুলদারভকে পায়ে মাড়িয়ে গাড়ির আরোহী মস্কোর দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবসায়ী স্তেপান লুকভ সহ স্লেজটাকে তার উপর দিয়ে টেনে নিয়ে দ্রুত ছুটতে থাকে এবং দারোয়ানরা গাড়িটাকে ধরে ফেলে। কুলদারভ প্রথমে অচৈতন্য হয়ে পড়ায় তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং একজন ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে। তার মাথার পিছনে যে আঘাত লেগেছিল।''

''গাড়ির ডান্ডাটা আমার মাথায় লেগেছিল বাবা। পড়ে যাও।''

সেটা খুব সামান্য বলে রেকর্ড করা হয়েছে। এই ঘটনার একটা প্রতিবেদনও তৈরী করা হয়েছে। আহত লোকটির চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

''আমার মাথার পিছনটাতে ঠাণ্ডা জল ঢালতে বলে দিয়েছে। এখন পড়লে তো? অ্যাঁ? হলো তো। খবরটা এখন সারা রাশিয়াতে ছড়িয়ে গেছে। এবার দিয়ে দাও।''

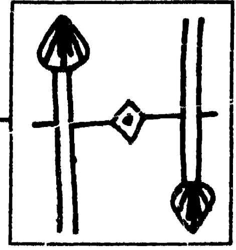
কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে মিতিয়া সেটাকে ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

''এক ছুটে গিয়ে মাকারভদের দেখাতে হবে। তারপর দেখাতে হবে আইভানিৎস্কিদের, নাতালিয়া আইভানভনা ও এনিসিম ভাসিলিভিচকে। এক্ষুণি যাচ্ছি। চলি।''

তকমা আঁটা ইউনিফর্ম ক্যাপটা মাথায় দিয়ে মিতিয়া মহা আনন্দে বিজয়গর্বে রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগল।

১৮৮৩

নির্বিকার



Gormless

একদিন আমার ছেলেমেয়েদের গভর্নেস উলিয়া ভাসিলিয়েভনাকে আমার পড়ার ঘরে আসার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলাম। তার সঙ্গে হিসাবটা মিটিয়ে ফেলার দরকার ছিল।

তাকে বললাম, ''বস উলিয়া ভাসিলিয়েভ্না! আমাদের হিসাবপত্রটা মিটিয়ে ফেলা যাক। তোমার টাকার দরকার অবশ্যই আছে। কিন্তু তুমি এতই শিষ্টাচারসচেতন যে তোমার মাইনেটাই চাও না। ...দেখ, তোমাতে-আমাতে বসে মাসিক ত্রিশ রুব্‌লই স্থির করেছিলাম।''

''চল্লিশ।''

''না, ত্রিশ। আমি লিখে রেখেছি। আমার গভর্নেসদের আমি সব সময়ই ত্রিশ দিয়েছি। তাহলে আজ পর্যন্ত ধরলে তুমি এখানে আছ দু' মাস হল ...''

''দু' মাস পাঁচ দিন।''

''ঠিক দু' মাস। তার মানে তোমার পাওনা হয়েছে ষাট রুব্‌ল্। ন'টা রবিবার বাদ দাও। কলিয়াকে তুমি রবিবারে পড়াও না, কেবল বেড়াতে নিয়ে যাও। আর আছে তিনটে গির্জার দিন।''

উলিয়া ভাসিলিয়েভ্নার মুখ লাল হয়ে উঠল। সে পোশাকের কুঁচিটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। কিন্তু একটা কথাও বলল না।

''তিনটে ছুটির দিন। ...ফলে বারো রুব্‌ল্ বাদ। কলিয়া চারদিন অসুস্থ ছিল, পড়তে বসে নি। কেবল ভারিয়াকে পড়িয়েছ। তিনদিন তোমার দাঁতের ব্যথা হয়েছিল; আমার স্ত্রী ডিনারের পরেই তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিল। বারো আর সাতে উনিশ। তাহলে থাকল ... হুম ... একচল্লিশ রুব্‌ল্। ঠিক আছে?''

উলিয়া ভাসিলিয়েভ্নার বাঁ চোখটা লাল হয়ে জলে ভরে উঠল। তার চিবুক কাঁপতে লাগল। আবেগে সে কাশল, নাক ঝাড়ল—একটা কথাও বলল না!

''নববর্ষের দিন তুমি একটা পিরিচ ও চায়ের পেয়ালা ভেঙেছ। তাতে দুই রুব্‌ল্ বাদ গেল। পিরিচটার দাম আরও বেশী, ওটা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। কিন্তু...থাক সে কথা। তারপর, তুমি ঠিকমত খেয়াল না রাখায় কালিয়া গাছে চড়ে তার কোটটা ছিঁড়ে ফেলেছিল। দশ রুব্‌ল্ বাদ। তোমার দেখাশুনার ত্রুটির ফলেই বাড়ির দাসী ভারিয়ার জুতো চুরি করেছিল। তোমার

তো সব দিকেই নজর রাখার কথা। তুমি মাইনে নিচ্ছ। অর্থাৎ আরও পাঁচ বাদ গেল। দশই জানুয়ারি তুমি আমার কাছ থেকে দশ রুব্‌ল্‌ ধার নিয়েছিলে ...''

''আমি ধার নেই নি!'' উলিয়া ভাসিলিয়েভ্‌না ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল।

''কিন্তু আমি সেটাও লিখে রেখেছি!''

''ভাল কথা ঠিক আছে।''

''একচল্লিশ থেকে সাতাশ বাদ গেলে থাকে চৌদ্দ।''

দুটি চোখই জলে ভরে গেল। সুন্দর নাকটির উপর ঘাম জমল। বেচারি!

কাঁপা গলায় সে বলল, ''আমি শুধু একবারই ধার করেছি। আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে তিন রুব্‌ল্‌ ধার করেছিলাম। ... তার বেশী কখনও নেই নি ...''

''আচ্ছা, আচ্ছা, সেটা আমি লিখে রাখি নি! চোদ্দ থেকে তিন গেলে থাকে এগারো। এই তোমার টাকাটা সোনা! তিন...তিন...তিন। আর এক এবং এক। এ সব তোমার!''

এগারো রুব্‌ল্‌ তার হাতে দিলাম। কাঁপা হাতে সেগুলি নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

''ধন্যবাদ'' সে চুপিচুপি বলল।

আমি লাফিয়ে উঠলাম। ঘরময় পায়চারি করতে লাগলাম। আমার ভীষণ রাগ হল।

''কিসের জন্য ধন্যবাদ?'' আমি প্রশ্ন করলাম।

''টাকাটার জন্য।''

''কিন্তু আমি তো তোমাকে ঠকিয়েছি। তোমাকে লুঠ করেছি! তোমার কাছ থেকে চুরি করেছি। তাহলে কিসের জন্য ধন্যবাদ?''

''অন্যসব জায়গায় কেউ আমাকে কিছু দেয় নি—''

''কিছুই দেয় নি? তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই! শোন, আমি তোমার সঙ্গে তামাসা করছিলাম। তোমাকে একটা নিষ্ঠুর শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। পুরো আশী রুব্‌ল্‌ই তোমাকে আমি দেব! এই নাও। এইখানে সবটাই আছে। কিন্তু মানুষ এত নির্বিকার হয় কেমন করে? তুমি প্রতিবাদ কর না কেন? কিছু বল না কেন? তুমি কি মনে কর পৃথিবীতে দাঁত ছাড়া তুমি বাঁচতে পার? এত নির্বিকার হওয়া কি সম্ভব?''

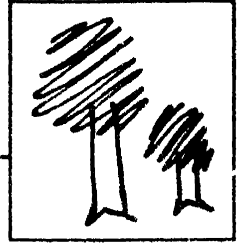
সে ঈষৎ হাসল; তার মুখে আমি যেন পড়তে পারলাম: ''সম্ভব!''

কঠিন শিক্ষাটার জন্য আমি তার কাছে ক্ষমা চাইলাম। তাকে অবাক করে দিয়ে পুরো আশী রুব্‌ল্‌ই তাকে দিলাম। সে নতমুখে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবলাম: ''এ পৃথিবীতে শক্ত হওয়াটাই সহজ!''

১৮৮৩

উইলো গাছ

The Willow Tree



তুমি কি কখনও গাড়িতে চেপে ডাকগাড়ির রাস্তা ধরে বি. থেকে টি. পর্যন্ত গিয়েছ?

যদি গিয়ে থাক তাহলে ছোট্ট নদী কোজিয়াত্‌কার ধারে আন্দ্রেয়েভের একাকি দাঁড়িয়ে-থাকা কল-ঘরটা তোমার অবশ্যই মনে আছে। কলঘরটা ছোট...তার শানপাথরের সংখ্যা দুই জোড়া...কল-ঘরটা একশ' বছরেরও বেশী পুরনো এবং দীর্ঘকাল অচল হয়ে পড়ে আছে। এই কলঘরটা দেখলেই মনে হয় সে যেন একটা ছোটখাট, ন্যুব্জ, শীর্ণ বুড়ি যেকোন মুহূর্তে মাটিতে পড়ে যেতে পারে। আর একটা চওড়া পুরনো উইলো গাছ না থাকলে সে অনেককাল আগেই মাটিতে পড়ে যেত। গাছের কাণ্ডটা এতই চওড়া যে দুটো মানুষ হাত দিয়ে তাকে বেড় দিতে পারে না। গাছের সবুজ ডালপালাগুলি ছাদের উপরে এবং বাঁধের উপরে নেমে এসেছে; আরও নীচে নেমে ডালপালাগুলি জলেও ডুবছে, আবার মাটিতেও ছড়িয়ে পড়েছে। গাছটাও বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। একটা বড় কালো গর্ত থাকায় গাছের কাণ্ডটাকে বিশ্রী দেখায়। সেই গর্তে হাত দিলে কালো মধু হাতে লেপ্‌টে যাবে। মৌমাছিরা মাথার চারদিকে গুন গুন করবে, কামড়াবে। গাছটা কতদিনের পুরনো? তার বন্ধু আর্খিপ বলে, সে যখন নেহাৎ ছেলেমানুষ ছিল তখনও গাছটা বুড়োই ছিল।

আর্খিপ নিজেও উইলো গাছটার মতই বয়সের ভারে ন্যুব্জ একটি ধ্বংসস্তূপ, তার দন্তহীন মুখটাও গাছের কাণ্ডের ভিতরকার গর্তের মতই দেখতে। দিনের বেলা সে গাছটার শিকড়ের উপর বসে মাছ ধরে, আর রাতের বেলা কি যেন ভাবে। দিনরাত তারা দু'জন--বুড়ো উইলো আর আর্খিপ--চুপি চুপি কথা বলে...যখন সুদিন ছিল তারাও অনেক কিছু দেখেছে। কান পেতে শোন তাদের কথা...

ত্রিশ বছর আগে এক ঈস্টার-পূর্ব রবিবারে বৃদ্ধ মানুষটি তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসে একই সঙ্গে বসন্তের শোভা ও মাছধরা উপভোগ করছিল। যথারীতি সব কিছুই শান্ত ও নিস্তব্ধ। ...কেবল শোনা যাচ্ছে বুড়োদের ফিস্‌ফিস্ কথা, আর মাঝে মাঝে কোন দলছাড়া মাছের জল ছিটানোর শব্দ। বুড়ো লোকটি মাছ ধরছে আর দুপুরের জন্য অপেক্ষা করছে। সেই সময়েই সে নিজের জন্য মাছের ঝোল রাঁধতে শুরু করবে। উইলো গাছের

ছায়াটা অপর তীর থেকে সরে যেতে শুরু করলেই বোঝা যাবে মধ্যাহ্ন আসন্ন। ডাক-গাড়ির ঘণ্টা শুনেও আর্খিপ সময় বলে দিতে পারে। ডাক-গাড়িটা বাঁধ পার হয় ঠিক মধ্যাহ্নকালে।

সে রবিবারেও আর্খিপ যথারীতি ডাক-গাড়ির শব্দ শুনতে পেল। ছিপসুতো নামিয়ে রেখে সে বাঁধের দিকে তাকাল। একটা ছোট পাহাড় পেরিয়ে ত্রয়কাটা উৎরাই বেয়ে নেমে হাঁটার গতিতে বাঁধের দিকে এগিয়ে চলেছে। ডাক-পিওন ঘুমুচ্ছে। বাঁধের উপর উঠে ত্রয়কাটা কোন কারণে থেমে গেল। আর্খিপ অনেকক্ষণ ধরেই অবাক হয়ে দেখছিল, এবার সে খুবই অবাক হল। অস্বাভাবিক কিছু ঘটে গেল। কোচোয়ান চারদিকে তাকাল, অস্বস্তির সঙ্গে নড়াচড়া করল, ডাকপিওনের মুখ থেকে রুমালটা সরিয়ে নিল, তারপরই গদাটা ঘোরাল। ডাক-পিওন আর কোনদিন নড়ল না। তার চুলভর্তি মাথায় একটা গভীর লাল দাগ হা করে রইল। কোচোয়ান লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল, অস্ত্রটাকে আর একবার মাথার উপরে তুলে আবার আঘাত করল। মিনিট খানেকের মধ্যেই আর্খিপ কাছাকাছি পায়ের শব্দ শুনতে পেল ঃ তীর থেকে নেমে কোচোয়ান তার দিকেই আসছে। তার রোদে-পোড়া মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। কাঁপতে কাঁপতে সে ছুটে গেল উইলো গাছটার দিকে, আর্খিপের উপস্থিতি টের না পেয়ে ডাকের থলিটাকে গাছের গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল; তারপর এক দৌড়ে ফিরে গিয়ে লাফ দিয়ে ত্রয়কায় উঠে বসল এবং আর্খিপকে অবাক করে দিয়ে নিজের মাথায় একটা আঘাত করল। তার মুখটা রক্তে ভেসে গেল; সেও ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারল।

সে চীৎকার করে বলে উঠল, ''বাঁচাও। খুন!''

বাতাসে তার কথার প্রতিধ্বনি হতে লাগল। আর্খিপ অনেকক্ষণ ধরে ''বাঁচাও'' কথাটা শুনতে পেল।

ছয় দিন পরে তদন্তকারীরা এসে হাজির হল কলঘরে। তারা কলঘর ও বাঁধের একটা রেখাচিত্র আঁকল, কোন কারণে নদীর গভীরতা মাপল, এবং উইলো গাছের তলায় খানা-পিনা সেরে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল; সারাটা তদন্ত-কাল আর্খিপ ডাকের থলিটার দিকে তাকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে কলের চাকার নীচে বসে থাকল। তার চোখে পড়ল অনেকগুলি খাম ও পাঁচটা সিল। দিন-রাত ঐ সিলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে ঃ উইলো গাছটা দিনের বেলা চুপ করে থাকে আর রাত হলে কাঁদে! তার কান্না শুনতে শুনতে আর্খিপ ভাবে ''বোকা!'' এক সপ্তাহ পরে ডাকের থলিটা নিয়ে আর্খিপ শহরের দিকে যাত্রা করল।

শহরের ফটক পার হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, ''এখানে সরকারী আপিসগুলো কোথায়?''

তাকে দেখিয়ে দেওয়া হল দরজায় ডোরা-কাটা শান্ত্রী-বাক্স বসানো একটা বড় হলুদ রংয়ের বাড়ি। ভিতরে ঢুকে বাইরের ঘরে সে দেখতে পেল

ঝকঝকে বোতাম-আঁটা একটি ভদ্রলোককে। পাইপ টানতে টানতে সে কোন কারণে শান্ত্রীকে শাপান্ত করছিল। তার সামনে গিয়ে আর্খিপ কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো উইলো গাছ সম্পর্কিত ঘটনাটা তাকে বলল। কর্মচারিটি মেলের থলিটা হাতে নিয়ে তার বাঁধন খুলল; তার মুখটা প্রথমে সাদা ও পরে লাল হয়ে উঠল।

"এক মিনিট!" বলেই সে এক দৌড়ে আপিসে ঢুকে গেল। কর্মচারীরা তাকে ঘিরে ধরল। ...লোকজন ছুটোছুটি শুরু করে দিল, চুপিচুপি কথা বলতে লাগল...দশ মিনিট পরে কর্মচারিটি থলিটা এনে আর্খিপকে দিয়ে বলল ঃ

"তুমি ভুল জায়গায় এসেছ বন্ধু। নিঝনায়া স্ট্রীটে যাও, তারাই হদিস বলে দেবে; এটা তো কোষাগার, বন্ধু! পুলিশের কাছে যাও।"

থলিটা নিয়ে আর্খিপ বেরিয়ে গেল।

মনে মনে বলল, "এটা তো হাল্কা লাগছে! যত ভারী ছিল তার অর্ধেক মাত্র!" নিঝনায়া স্ট্রীটে তারা তাকে আর একটা হলুদ বাড়ি দেখিয়ে দিল; তার বাইরে দুটো শান্ত্রী বাক্স। আর্খিপ ভিতরে ঢুকল। এবার কোন বাইরের ঘর নেই; সিঁড়ি থেকেই সোজা সব আপিস-ঘর। বুড়ো মানুষটি একটা টেবিলের কাছে গিয়ে কেরাণিদের কাছে থলির বৃত্তান্ত খুলে বলল। তারা ডাকের থলিটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে ধমকাল, আর তাদের বড়বাবুর কাছে লোক পাঠাল। একটি গোঁফওয়ালা মোটা লোক দেখা দিল। অল্প কিছু প্রশ্ন করেই থলিটা নিয়ে সে আরেকটা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

এক মিনিট পরেই সেই ঘর থেকে তার কানে এল "টাকাটা কোথায় গেল?" থলিটা তো খালি। ভাল কথা, বুড়ো লোকটাকে বলে দাও, সে চলে যেতে পারে। না, তাকে আটক কর! আইভান মার্কোভিচের কাছে নিয়ে যাও! না, তাকে যেতেই দাও!"

আর্খিপ মাথাটা নুইয়ে বেরিয়ে গেল। একদিন পরে মাছের দল আবার তার পাকা দাড়ি দেখতে গেল।

এটা হেমন্ত শেষের ঘটনা। বুড়ো লোকটা বসে বসে মাছ ধরছিল। তার মুখটা আজকের হলুদ গাছটার মতই বিষণ্ণ; হেমন্তকালটা তার পছন্দ নয়। সেই কোচোয়ানকে কাছে আসতে দেখে তার মুখ আরও বিষণ্ণ হয়ে গেল। তাকে খেয়াল না করেই কোচোয়ান উইলো গাছটাব কাছে গিয়ে গর্তের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল! স্যাঁৎসেঁতে অলস মৌমাছিগুলো তার আস্তিন বেয়ে উঠতে লাগল। এক ঘণ্টা পরে দেখা গেল, নদীর তীরে বসে সে শূন্য দৃষ্টিতে জলের দিকে তাকিয়ে আছে।

আর্খিপকে জিজ্ঞাসা করল, "সেটা কোথায়?"

আর্খিপ প্রথমে চুপ করেই ছিল। বিষণ্ণমুখে সে খুনিটাকে এড়িয়েই গেল, কিন্তু অচিরেই সেজন্য তার দুঃখ হল।

বলল, "সেটা আমি উপরওয়ালাদের দিয়েছি! কিন্তু তুমি ঘাবড়ে যেও না বোকা! তাদের আমি বলেছি, সেটা আমি উইলো গাছের তলায় পেয়েছি!"

কোচোয়ান লাফিয়ে উঠল, ষাঁড়ের মত গর্জে উঠে আর্খিপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে তাকে মারধোর করল। তার বুড়ো মুখটাকে থেঁতলে দিল, মাটিতে ফেলে লাথি মারল। মারধোর শেষ করেও বুড়োকে ছেড়ে গেল না, তার সঙ্গে কল-ঘরেই বাস করতে লাগল।

দিনের বেলা সে চুপচাপ ঘুমিয়ে থাকে, কিন্তু রাত হলেই বাঁধের উপর ঘুরে বেড়ায়। ডাক-পিওনের ভূতটা বাঁধের উপর ভর করেছে; কোচোয়ান তার সঙ্গে কথা বলে। বসন্ত এল, কিন্তু কিছুই বদলাল না; কোচোয়ান তেমনই চুপচাপ, তেমনই ঘুরে বেড়ায়। এক রাতে বুড়ো মানুষটি তার কাছে গেল।

বাঁকা চোখে কোচোয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল, "অনেক তো ঘুরলে! এবার চলে যাও।"

ডাক-পিওন সেই কথাই বলল। উইলো গাছটাও ফিস্ফিস্ করে তাই বলল।...

কোচোয়ান বলল, "আমি যেতে পারছি না! আমি চলেই যেতাম, কিন্তু আমার পায়ে যন্ত্রণা, আমার মনেও যন্ত্রণা!"

বুড়ো মানুষটি কোচোয়ানের হাত ধরে শহরে নিয়ে গেল। নিয়ে গেল নিঝনায়া স্ট্রীটে, ঠিক সেই আপিসে যেখানে সে ডাকের থলিটা হস্তান্তর করেছিল। কোচোয়ান বড়বাবুর সম্মুখে নতজানু হয়ে নিজের দোষ কবুল করল। গোঁফওয়ালা লোকটা অবাক হয়ে গেল।

বলল, "কিসের জন্য তুমি নিজের কুৎসা গেয়ে বেড়াচ্ছ বোকা! তুমি কি মাতাল হয়ে গেছ, পাজির দল! বৃথাই গোলমাল পাকাচ্ছ! অপরাধীটা ধরা পড়ে নি, বাস, মিটে গেছে! এখন আর কি করতে চাও? এখান থেকে কেটে পড়!"

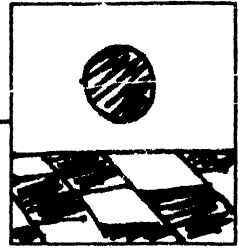
বুড়ো মানুষটি ডাকের থলিটার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে গোঁফওয়ালা লোকটা হো-হো করে হেসে উঠল, আর কেরাণিরা অবাক হয়ে গেল। অবশ্যই তাদের স্মৃতিশক্তি বড়ই দুর্বল! নিঝনায়া স্ট্রীটেও কোচোয়ান মুক্তি পেল না। তাকে ফিরে যেতে হল উইলো গাছের কাছে।

বিবেকের কাছ থেকে তাকে তো পালাতেই হবে। সে জলে ঝাঁপ দিল, আর ঠিক সেই জায়গার জলটাই ঢেউয়ে দুলে উঠল যেখানে আর্খিপের বড়শির ফাতনাটা ভাসছিল। কোচোয়ান জলে ডুবে মরল। বুড়ো মানুষটা আর বুড়ো গাছটা এখন বাঁধের উপর দুটো ভূতকে দেখতে পায়। তারাই কি নিজেদের সঙ্গেই ফিস্ফিস্ করে কথা বলে?

১৮৮৩

ঠিক ঠাকুর্দার মতই

Just Like Grandpa



গুমোট রাত; সব জানালা খোলা; মাছি ও মশা। নোনা হেরিং মাছ খাবার পরের মত তেষ্টা। বিছানায় শুয়ে আছি এ-পাশ ও-পাশ করে ঘুমুতে চেষ্টা করছি। দেয়ালের পিছনে অন্য একটা ঘরে আমার ঠাকুর্দাও ঘুমুতে পারছে না; সেও এ-পাশ ও-পাশ করছে; ঠাকুর্দা অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল; পেনসনের টাকায় আমাকে নিয়ে বাস করে। দু'জনই মাছির কামড় খাচ্ছি, আর দু'জনই ধৈর্য হারিয়ে এ-পাশ ও-পাশ করছি। ঠাকুর্দা কাশছে, হাঁচি দিচ্ছে; কড়া মাড়-দেওয়া রাত-টুপিটা খচ-মচ্ শব্দ করছে।

তো-তো করে ঠাকুর্দা বলতে লাগল, "পাগলা! হুম...একেবারে নিস্তেজ! পিঠের উপর যথেষ্ট মার পড়ে নি, বোকা ছোকরা!"

"কার কথা বলছ ঠাকুর্দা?"

"তুমি জান কার কথা...মোটেই কড়া নয় তো, তারাই তোমাকে নষ্ট করল, তারা তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দেয় না..." গভীরভাবে শ্বাস টেনে ঠাকুর্দা বুড়ো মানুষের মতই কাশতে থাকে। "বার বার তিনবার তোমার ঠেঙানি খাওয়া দরকার, তাহলেই বুঝবে কিছুটা পারসিক গুঁড়ো কেন তুমি কেন নি? তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি, কেন? আলসেমি? নোংরামি?"

"ঠাকুর্দা, তুমি দেখছি আমাকে ঘুমুতে দেবে না। চুপ কর!"

"তর্ক করো না! মনে রেখো, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ?"

আরও জোরে কাশতে কাশতে ঠাকুর্দা গলা চড়িয়ে বলল, "আবার বলছিঃ কিছু পারসিক গুঁড়ো কেন তুমি কেন নি? আর তোমার বিরুদ্ধে এত নালিশ আসা সত্ত্বেও এ ধরনের উৎকট ব্যবহার করার সাহস তুমি পেলে কোথায় মহাশয়? আঁ? গতকাল কর্ণেল দুবিয়াকিন নালিশ জানিয়েছেন যে তুমি তার স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়েছ। এ কাজ করার অনুমতি তোমাকে কে দিল? কি অধিকার তোমার আছে?"

অনেক সময় ধরে আমাকে গালাগালি করে ঠাকুর্দা গালমন্দ ছেড়ে নীতি-কথার আশ্রয় নিল: সপ্তম নির্দেশ, পরিণয়ের প্রতিষ্ঠাভূমি, ইত্যাদি।

আমি বলি, "এসব আমি তোমার চাইতে বেশী বুঝি ঠাকুর্দা। স্বীকার করছি, বিবেক আমাকে দংশন করে, কিন্তু আমার কিছু করার নেই। আমি ঠিক তোমার মত! তোমার রক্ত-মাংসের সঙ্গেই তোমার মত গুণও আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে লড়াই করা বড় শক্ত।"

"আমি..." আমি অন্যের বৌয়ের গায়ে হাত দেই নি। ...এটা তোমার আবিষ্কার।"

"সত্যি? কিন্তু দশ বছর আগে, তোমার বয়স যখন ষাট, মনে পড়ে তোমার প্রতিবেশীর বৌকে নিয়ে তুমি পালিয়েছিলে। বিধবা নয়, সে ছিল এক যুবতী! নিনচকাকে মনে পড়ে?"

"আমি...আমি তাকে বিয়ে করেছিলাম..."

"কী সুকর্মই করেছিলে? একটা ষাট বছরের বুড়োর জন্য নিনচ্কাকে পেলেপুষে বড় করা হয় নি। এ রকম একটি বুদ্ধিমতী, সুন্দরী মেয়েকে যেকোন ভাল ছেলেই বিয়ে করত, কিন্তু তুমি এগিয়ে এলে তোমার সামাজিক মর্যাদা, তোমার টাকা নিয়ে, তার বাপ-মাকে ভয় দেখালে, নানা রকম শাড়ি-গয়না দিয়ে একটা সতেরো বছরের মেয়ের মাথাটা একেবারে ঘুরিয়ে দিলে। বিয়ের সময় সে কী কান্নাটাই কেঁদেছিল! পরবর্তীকালে বেচারি কত অনুশোচনা করেছে। শেষ পর্যন্ত একটা মাতালকে নিয়ে পালিয়ে গেল, কেবল তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারবে বলে! তুমি একটা শুয়োর ঠাকুর্দা!"

"থাম। ওটা তোমার ব্যাপার নয়।... তুমি যদি পাঁচ-পাঁচ বার গণ-ধোলাই খেতে, তাহলে তোমার বোন দাশার টাকা লুঠ করতে না। তোমার গায়ে তো দুর্গন্ধ লেগে আছে। একশ' দেসিয়াটিনের দাবীতে কেন তুমি তার নামে নালিশ করেছিলে, আর সে টাকাটা নিয়েছিলে?"

"আমি তোমার দৃষ্টান্তই অনুসরণ করেছিলাম। ঠাকুর্দা গো, ঠিক তোমার মতই। জোচ্চুরি করাটা তোমার কাছেই শিখেছিলাম। মনে পড়ে তুমি যখন কমিসারিতে কাজ করতে তখন উফা গুবার্নিয়াতে নিযুক্ত হয়েছিলে, আর.."

এ রকম ঝগড়া আমাদের মধ্যে অনেক দিন ধরেই চলে। ঠাকুর্দা আমার ঘাড়ে বিশটা অপরাধ চাপায়, আর আমি সেই বিশটাই চাপাই রক্তের সম্পর্কের উপর, উত্তরাধিকারের উপর। শেষ পর্যন্ত রাগের ঝাল মেটাতে ঠাকুর্দা দেয়াল আঁচড়াতে থাকে।

আমি বলি, "শোন ঠাকুর্দা, এভাবে আমরা কোন দিনই ঘুমুতে পারব না। চল, একটু সাঁতার কেটে কিছুটা ভদকা খেয়ে আসি; তাহলেই অসাব কাঠের মত ঘুমিয়ে পড়ব।"

রাগে ঠোঁট চাটতে চাটতে ঠাকুর্দা পোশাক পরে নেয়; আমরা নদীতে নেমে যাই। সুন্দর জ্যোৎস্না-ধোয়া রাত। কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে আমরা বাড়ি ফিরে যাই। সাজ-সরঞ্জাম টেবিলেই ছিল। আমি দুই গ্লাসে ঢাললাম, একটা গ্লাস হাতে নিয়ে ঠাকুর্দা ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে বলল:

"যদি তুমি...দশবার ধোলাই খাও তাহলে বুঝতে পারবে। মা...মাতাল।"

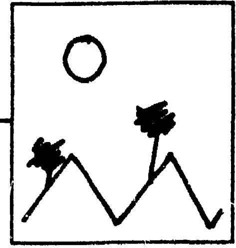
সে গজ-গজ করে, রেগে গলায় মদ ঢালে আর চাটনিতে কামড় দেয়। তার মদে আসক্তি আমার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া; তাই আমিও মদ গিলে বিছানায় যাই।

প্রতিটি রাত আমাদের এইভাবেই কাটে।

১৮৮৩

বছরে একদিন

Once a Year



প্রিন্সেসের তিন-জানালার ছোট বাড়িটা উৎসবের সাজে সেজেছে। দেখে মনে হয়, বাড়িটার বয়স কমে গেছে। চারদিক ধোয়া-পোছা করা হয়েছে, ফটকটা খোলা, আর জানালা থেকে গ্রিলগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সদ্য-ধোয়া জানালার কাঁচগুলো বসন্ত কালের সূর্যের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। ... বৃদ্ধ, নুব্জ, পোকায়-কাটা তকমাপরা দরোয়ান মার্ক সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সারা সকাল ধরে কাঁপা হাতে কামানো তার কর্কশ চিবুকে, সদ্য পালিশ করা বুটে, ও কুলচিহ্নের নিদর্শন অঙ্কিত বোতামে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। মার্ক তার কুঠরি থেকে অকারণে বেরিয়ে আসে নি। আজ প্রিন্সেসের জন্মদিন , তাই দর্শকদের জন্য দরজা খুলে দিয়ে তাদের নাম ঘোষণার কাজটা তো তাকেই করতে হবে। বাইরের ঘরটায় যথারীতি গুঁড়ো কফির গন্ধ নয়, উৎসবের ঝোলের গন্ধও নয়, ছড়িয়ে আছে এমন গন্ধ যা ডিম-সাবানের গন্ধ স্মরণ করিয়ে দেয়। ঘরগুলো আগাগোড়া ঝাড়-পোছ করা হয়েছে। পরিষ্কার পর্দা টাঙানো হয়েছে। ছবিগুলো থেকে মসলিনের পর্দা সরিয়ে ফেলা হয়েছে ; চটা-ওঠা জীর্ণ মেঝেগুলি মোম দিয়ে মাজা হয়েছে। বদরাগী কুকুর ঝুল্‌কা, বাচ্চাকাচ্চা সমেত বিড়ালটা, আর মুরগিগুলোকেও সন্ধ্যা পর্যন্ত বান্না ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে।

তিন জানালাওয়ালা বাড়ির মালিক ন্যুব্জদেহ, বলিরেখায় আকীর্ণ বৃদ্ধা প্রিন্সেস নিজে বসে আছে একটা বড় হাতল-চেয়ারে, আর মাঝে মাঝেই সাদা মসলিনের তৈরী গাউনের ভাঁজগুলি পাট করছে। তার কুঁচকানো বুকের উপর পিন দিয়ে আঁটা একটিমাত্র গোলাপই বুঝিয়ে দিচ্ছে, পৃথিবীতে এখনও যৌবন আছে। প্রিন্সেস আশা করে আছে, অতিথিরা এসে তাকে অভিনন্দন জানাবে। তাদের তালিকায় আছে ব্যারন ট্রাম্ব ও তার ছেলে, প্রিন্স খালাখাজে, বার্লান্তিব, শয়নকক্ষের ভদ্রজন, তার জ্ঞাতি-ভাই জেনারেল বিৎকভ ও আরও অনেকে। প্রায় জনা বিশেক। তারা এসে কথাবার্তায় ড্রয়িং-রুমটা ভরে তুলবে। প্রিন্স খালাখাজে গান গাইবে, আর জেনারেল বিৎকভ দু' ঘণ্টা ধরে গোলাপ ফুলটা চাইবে। —এই সব ভদ্রলোকদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হবে তা সে জানে। তার চলাফেরায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে নিস্পৃহতা, মর্যাদা ও সৎ শিক্ষা-দীক্ষা। অন্য অনেকের মধ্যে আর আসার কথা তুল্‌কিন ও পেরেউল্‌কভের ব্যবসায়ীদের ; তারা যাতে সই করেই চলে যায় সেজন্য বাইরের ঘরে রাখা আছে কাগজ ও কলম। যার যেথা স্থান সেটা তারা বুঝে নিক।

বারোটা বাজল। প্রিন্সেস তার পোশাক ও গোলাপটাকে ঠিক করে নিল। কান পাতল। কেউ কি ঘণ্টা বাজাল? একটা গাড়ি এসে থামল। পাঁচ মিনিট কেটে গেল।

''আমাদের কেউ নয়,'' প্রিন্সেস ভাবল।

না, তোমার জন্য নয় প্রিন্সেস। এবারও বিগত বছরগুলির কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। একটা নিষ্ঠুর কাহিনী! দুটো বাজলে গত বছরের মতই প্রিন্সেস শোবার ঘরে যাবে, উদ্বায়ী লবণ শুঁকে কাঁদতে শুরু করবে।

''কেউ আসে নি! কেউ না!''

বুড়ো মার্ক তার চারদিকে ঘুরঘুর করে। সেও কম হতাশ হয় নি, মানুষগুলোই খারাপ হয়ে গেছে। একদিন তারা মাছির মত ড্রয়িং-রুমে ভিড় করত, কিন্তু এখন...

প্রিন্সেস ফুঁপিয়ে বলে উঠল, ''কেউ আসে নি। ব্যারন নয়, প্রিন্স খালাখাজে নয়, জর্জেস বুভিৎস্কি নয় ... সবাই আমাকে ত্যাগ করেছে। কিন্তু আমি না থাকলে তাদের কি হত? তাদের সুখ, তাদের উন্নতির জন্য তারা আমার কাছে ঋণী — কেবল আমার কাছেই। আমি না থাকলে তারা কিছুই হতে পারত না।''

''তারা কিছুই হতে পারত না।'' মার্ক কথাগুলির প্রতিধ্বনি করল।

''আমি কৃতজ্ঞতা চাইছি না। তার কোন দরকার আমার নেই! আমার দরকার সহানুভূতি! হা ঈশ্বর, এটা কত বড় আঘাত! ওঃ কত বড় আঘাত! এমন কি আমার ভাইপো জিন পর্যন্ত আসে নি। সে কেন এল না? আমি তার কি ক্ষতি করেছি? তার সব হাতচিঠির টাকা আমি দিয়েছি, ভাল লোকের সঙ্গে তার বোন তানিয়ার বিয়ে দিয়েছি। সে আমার অনেক টাকা খরচ করিয়েছে ঐ জিন! তার বাবা, আমার ভাইয়ের কাছে দেওয়া কথা আমি রেখেছি। ...তার জন্যও টাকা খরচ করেছি তুমি নিজেই তো জান...

''ইয়োর হাইনেস, অনুমতি করেন তো বলি, আপনিই তো ছিলেন তার বাবা-মারও বাবা-মা!''

''আর আজ দেখ—চেয়ে দেখ, কী কৃতজ্ঞতা! হায়রে মানুষ!''

গত বছরের মতই তিনটের সময় প্রিন্সের মূর্ছারোগের আক্রমণ হল। উত্তেজিত মার্ক মাথায় মার্কামারা টুপি পরে কোচোয়ানের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে দর-কষাকষি করে ভাইপো জিনকে ডাকতে গেল। ভাগ্য ভাল, যে সুসজ্জিত ঘরে প্রিন্স জিন বাস করে সেটা বেশী দূরে নয়। ...মার্ক দেখতে পেল, প্রিন্স বিছানায় শুয়ে আছে। সবেমাত্র সে গত রাতের মদের আসর থেকে ফিরেছে। তার কুঞ্চিত শুয়োরের মত মুখটা লাল হয়ে গেছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। মাথাটা ভোঁ-ভোঁ করছে, পেটের মধ্যেও বিপ্লব ঘটে গেছে। ঘুমুতে পারলেই বেঁচে যায়, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। তার হতাশ চোখ দুটি ছোট বেসিনটার উপর স্থিরনিবদ্ধ; নোংরায় ও সাবান-জলে সেটা ভর্তি।

নোংরা ঘরের ভিতরে ঢুকে চোখ-মুখ কুঁচকে সে বিছানার কাছে এগিয়ে গেল।

মাথা নেড়ে তিরস্কারের সুরে বলল, ''এটা ঠিক হয় নি আইভান মিখালিচ! এটা অন্যায়!''

''কি অন্যায়?''

''আজ আপনার পিসির সঙ্গে দেখা করেন নি, জন্মদিনে তাকে অভিনন্দন জানান নি! এটা কি ভাল?''

সাবান-জল থেকে চোখ না তুলেই জিন বলল, ''চুলোয় যাক!''

''আপনি কি মনে করেন আপনার পিসি কষ্ট পান নি? অ্যাঁ? হায় আইভান মিখালিচ! আপনার কি মন বলে কিছু নেই! কেন তাকে এমন করে নিরাশ করলেন?''

''আমি ও সব দেখাদেখির মধ্যে নেই। তাকে বলে দিও ও সব প্রথা অনেক দিন উঠে গেছে। ঘুরঘুর্ করার মত সময় আমাদের নেই। ও সব তোমরাই করগে, কারণ তোমাদের কোন কাজ নেই। আমাকে রেহাই দাও! বেরিয়ে যাও। আমি একটু ঘুমুব।''

''আমি একটু ঘুমুব' আপনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন! আমার চোখে-চোখে চাইতে কি আপনি লজ্জা পাচ্ছেন?''

''খুব হয়েছে! যত সব! সেকেলে বুড়ো!''

মার্ক অনেকক্ষণ ধরে চোখ পিট্‌পিট্ করল। দীর্ঘ নিস্তব্ধতা।

পরে শান্তভাবে বলল, ''অন্তত একবার গিয়ে অভিনন্দনটা জানিয়ে আসুন। ...তিনি কান্নাকাটি করছেন, চুপচাপ শুয়ে থাকতেও পারছেন না। ...এটুকু দয়া করুন, তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসুন। একবার চলুন স্যার!''

'আমি যাব না। যাবার কোন মানে হয় না। আর সে সময়ও আমার নেই! তাছাড়া, সেই বুড়ির কাছে গিয়ে আমি করবই বা কি?''

''একবার চলুন ইয়োর হাইনেস! শ্রদ্ধাটুকু জানিয়ে আসুন! এটুকু করুণা তাকে করুন! আপনার অকৃতজ্ঞতায় ও অনুভূতিহীনতায় তিনি ভীষণ হতাশ হয়েছেন, এ কথা বলতে আমি বাধ্য।''

মার্ক চোখের উপর হাত তুলে বলল, ''এটুকু করুণা তাকে করুন!''

''হুম...সেখানে ব্র্যাণ্ডি পাওয়া যাবে?'' জিন বলল।

''পাবেন ইয়োর হাইনেস।''

প্রিন্স চোখ টিপল।

''আর একশ' রুবল মিলবে?''

''সেটা একেবারেই সম্ভব নয়। আপনি জানেন না ইয়োর হাইনেস, একদিন যে টাকা আমাদের ছিল আজ আর তা নেই। আত্মীয়-স্বজনরাই আমাদের শেষ করে ফেলেছে আইভান মিখালিচ। যখন আমাদের টাকা ছিল তখন সকলেই আসত, তার সঙ্গে দেখা করত, কিন্তু এখন...সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা।''

"গত বছর তোমাদেব সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম? তখন দু'শ' রুব্‌ল্ ছিল। আর আজ তোমাদের একশ' রুব্‌ল্‌ও নেই? তুমি তামাশা করছ বুড়ো দাঁড়কাক! বুড়ির বাড়িটা খুঁড়লেই ওটা পেয়ে যাবে। এখন চলে যাও। আমি একটু ঘুমুব।"

"দয়া করুন ইয়োর হাইনেস! তিনি বৃদ্ধ, দুর্বল ... তাব জীবন একটা সুতোয় ঝুলঁছে। তাকে দয়া করুন মিখালিচ!"

জিন অনড়। মার্ক দরকষাকষি শুরু করল। চাবটের পরে জিন রাজী হল, ড্রেসকোট গায়ে পরল তাবপর প্রিন্সেসের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পড়ল।...

পিসিকে চুমো খেতে নিচু হয়ে ধরা গলায় জিন বলল, "মা তাঁতে।"

তাবপর সোফায় বসে গত বছরের কথাগুলিই বলতে শুরু করল।

"মা তাঁতে, মারি ক্রাইস্কিনা একটা চিঠি পেয়েছে নাইসের কাছ থেকে। ...তার স্বামী—খুব ভাল ছেলেটি। একটা গায়িকা মেযেব জন্য জনৈক ইংবেজের সঙ্গে তার যে দ্বৈত যুদ্ধটা হয়ে গেল তার বিস্তারিত বিববণ সে লিখে পাঠিয়েছে, গায়িকার নামটা ভুলে গেছি।"

"সত্যি?"

দুই চোখ ঘুরিয়ে, দুই হাত উপরে তুলে ভয় ও বিস্ময মিশ্রিত গলায প্রিন্সেস আবার কথাটা বলল ঃ

"সত্যি!"

"হ্যাঁ সে দ্বৈত যুদ্ধ কবছে, গায়িকাদের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে, আব তার বৌটা চিন্তা করে কবে শুকিয়ে যাচ্ছে, বলিহাবি তাকে। এ ধবনেব মানুষকে আমি বুঝতে পারি না মা তাঁতে।"

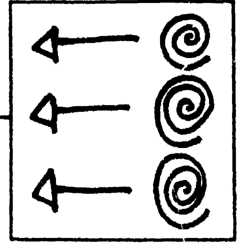
সুখী প্রিন্সেস জিনের আবও কাছ ঘেঁষে বসে; তাদেব কথাবার্তা চলতেই থাকে। চা ব্র্যাণ্ডিও আসে।

প্রিন্সেস যখন মন দিয়ে নিজেব কথা শোনে, হাসে কখনও আঁতকে ওঠে, আবাব অভিভূত হয়, তখন বুড়ো মার্ক নিজের সিন্দুক হাতড়ে ব্যাংকনোট গুছোতে থাকে। প্রিন্স জিন অনেক টাকা ছাড় দিয়েছে। তাব চাই মাত্র পঞ্চাশ রুবল্। কিন্তু সেটা দিতেও একাধিক সিন্দুক হাতড়াতে হবে!

১৮৮৩

জনৈক কেরাণীর মৃত্যু

Death of a Clerk



এক চমৎকার রাতে এক সুস্থদেহ কেরাণী আইভান দিমিত্রিচ চেরভিয়াকভ স্টলের দ্বিতীয় সারিতে বসে চোখে অপেরা-গ্লাস লাগিয়ে "লে ক্লোচেস্ দ কর্ণেভিল" দেখছিল। নাটক দেখতে দেখতে সে নিজেকে সবচাইতে সুখী মানুষ বলে ভাবছে এমন সময় হঠাৎ। "হঠাৎ" একটা খুব চলতি কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু জীবনটাই যখন বিস্ময়ে ভরা তখন লেখক কি সেটা ব্যবহার না করে পারে? অতএব হঠাৎ তার মুখটা কুঁচকে গেল, চোখ দুটো ঘুরে গেল আকাশের দিকে, তার দম বন্ধ হয়ে এল...অপেরাগ্লাস থেকে মুখটা সরিয়ে নিজের সিটেই উপুড় হয়ে পড়ল আর—হ্যাঁচ্চো! তার মানে সে একটা হাঁচি দিল। যখন ইচ্ছা হ্যাঁচ্চো করার অধিকার সকলেরই আছে। চাষীরা হাঁচে, পুলিশ ইন্সপেক্টররা হাঁচে, এমন কি প্রিভি কাউন্সিলরাও হাঁচে। প্রত্যেকেই হাঁচে—প্রতিটি মানুষ। চেরভিয়াকভও বিব্রত বোধ করল না, পকেটরুমাল দিয়ে নাকটা মুছল, চারদিক তাকিয়ে দেখল তার হাঁচিতে কেউ অসুবিধা বোধ করেছে কিনা। আর তখনই সে বিব্রত বোধ করল; কারণ সে দেখতে পেল প্রথম সারিতে তার ঠিক সামনে বসে একটি ছোটখাট বুড়ো মানুষ দস্তানা দিয়ে নিজের টাক-মাথার তালু ও গলা সযত্নে মুছছে আর বিড় বিড় করে কি যেন বলছে। চেরভিয়াকভ চিনতে পারল, বুড়ো লোকটি যোগাযোগ মন্ত্রকের অসামরিক জেনারেল ব্রিঝালভ।

চেরভিয়াকভ ভাবল, "আমি ওর গায়ের উপর হাঁচি দিয়েছি! সে আমার উপরওয়ালা নয়, সে কথা সত্যি, কিন্তু তবু এটা বিসদৃশ। আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে।"

ঈষৎ কেশে চেরভিয়াকভ সামনে ঝুঁকে জেনারেলের কানে কানে বলল:

"ক্ষমা করবেন ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমি হেঁচে ফেলেছি...আমি চাই নি যে...

"ও কথা বলবেন না।"

"আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি...ভেবে চিন্তে কাজটা করি নি।"

"দোহাই আপনার। চুপ করুন। আমাকে শুনতে দিন!"

কিছুটা ভ্যাবাচেকা খেয়ে বোকার মত হেসে চেরভিয়াকভ মঞ্চের দিকে মন দিতে চেষ্টা করল। সে অভিনেতাদের দেখল, কিন্তু নিজেকে আর সবচাইতে সুখী মানুষ বলে ভাবতে পারল না। অনুতাপ যেন তাকে পেয়ে বসল। বিরতির সময় ব্রিঝালভের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরঘুর করে একসময় সব ভয়কে জয় করে থেমে থেমে বলল:

''আমি আপনার গায়ের উপর হাঁচি দিয়েছিলাম ইয়োর এক্সেলেন্সি.. আমাকে মাপ করুন...কি জানেন...কিছু মনে করে...''

''ওঃ, সত্যি...আমি তো সেটা ভুলেই গেছি, আপনি তবু চালিয়ে যাবেন ?'' অধৈর্য হবার ভঙ্গিতে নীচের ঠোঁটটা বাঁকিয়ে জেনারেল বলল।

জেনারেলের দিকে অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে তাকিয়ে থেকে চেরভিয়াকভ ভাবল, ''উনি বলছেন ভুলে গেছেন, কিন্তু ওর চোখের চাউনিটা আমার ভাল লাগল না। যেন আমার সঙ্গে কথাই বলতে চান না। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমি ইচ্ছা করে ওটা করি নি...ওটা স্বাভাবিক কারণেই ঘটেছে ; অন্যথায় উনি ভাবতে পারেন যে তার গায়ে থুথু ফেলতেই আমি চেয়েছিলাম। এখন যদি সেটা নাও ভেবে থাকেন, পরে তো ভাবতে পারেন !''

বাড়িতে ফিরে চেরভিয়াকভ নিজেই এই অভদ্রজনোচিত আচরণের কথা স্ত্রীকে বলল। তার মনে হল, তার স্ত্রী কথাটাকে যথোচিত গুরুত্বই দিল না, একটু হাল্কাভাবেই নিল। এ কথা ঠিক, মুহূর্তের জন্য সে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু ব্রিজালভ ''আমাদের'' ওপরওয়ালা নয় জেনে নিশ্চিন্ত হল।

বলল, ''যদিও আমি মনে করি যে তার কাছে গিয়ে তোমার ক্ষমা চাওয়াই উচিত। নতুবা তিনি ভাববেন যে লোকের সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার করতে হয় তা তুমি জান না।''

''ঠিক তাই! আমি ক্ষমা পাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বিচিত্র তার আচরণ। একটা বুদ্ধির কথাও বললেন না। তাছাড়া, কথা বলার মত সময়ও ছিল না।''

পরদিন চেরভিয়াকভ নতুন সরকারী ফ্রক-কোটটা পরল, চুল কাটল, এবং ব্রিজালভের কাছে নিজের আচরণটা বুঝিয়ে বলতে গেল। জেনারেলের অভ্যর্থনাকক্ষটিতে তখন আবেদনকারীদের ভিড়, আর আবেদন-পত্রগুলি নেবার জন্য জেনারেল স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিল। আবেদনকারীদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলার পরেই জেনারেল চেরভিয়াকভের মুখের দিকে তাকাল।

কেরাণী বলতে শুরু করল, ''আপনার হয়তো স্মরণ আছে ইয়োর এক্সেলেন্সি যে গতকাল রাতে 'আর্কেডিয়া'-তে আমি অ্যা—হাঁচি দিয়েছিলাম, আর—অ্যা—তার ফলে—মানে...আমি ক্ষমা...''

''আঃ, কী বাজে বকছেন!'' জেনারেল বলল। ''আপনার জন্য আমি কি করতে পারি ?'' প্রশ্নটা করেই জেনারেল পরবর্তী লোককে ডাকল।

মুখ গোমড়া করে চেরভিয়াকভ ভাবল, ''আমার কথাই শুনতে চান না! তার মানে তিনি রাগ করেছেন...আমি তো এ ভাবে ব্যাপারটা ছেড়ে দিতে পারি না...তাকে বুঝিয়ে বলতেই হবে...''

জেনারেল যখন শেষ আবেদনকারীটির সঙ্গে কথা বলে নিজের ব্যক্তিগত ঘরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল, তখন চেরভিয়াকভ তার পিছু নিয়ে তো-তো

করে বলতে লাগল ঃ

''ক্ষমা করবেন ইয়োর এক্সেলেন্সি! কেবলমাত্র আমার আন্তরিক অনুশোচনার দায়েই আপনাকে বিরক্ত করার সাহস আমার হয়েছে।...''

জেনারেলকে দেখে মনে হল সে বুঝি কেঁদে ফেলবে। সে হাত নেড়ে চেরভিয়াকভকে চলে যেতে ইসারা করল।

''আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন মশায়।'' বলে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

চেরভিয়াকভ ভাবতে লাগল, ''ঠাট্টা! এর মধ্যে ঠাট্টার কি আছে আমি তো বুঝতে পারছি না। উনি কি কিছুই বোঝেন না, অথচ উনি একজন জেনারেল? খুব ভাল, ক্ষমা চেয়ে আর আমি এই অতিশয় ভদ্রলোকটিকে বিরক্ত করব না। তাকে শয়তানে পাক! আর তার কাছে যাব না, একটা চিঠি লিখে দেব! যাব না, বাস!''

বাড়ি ফেরার পথে চেরভিয়াকভ এই রকমই ভাবল। কিন্তু কোন চিঠি সে লিখল না। আনেক ভেবেচিন্তেও ঠিক করতে পারল না, কি কথা লিখবে। অতএব কাজটা সরাসরি মিটিয়ে ফেলার জন্য পরদিন সে আবার জেনারেলের কাছে গেল।

জেনারেল যখন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল তখন সে বলতে শুরু করল, ''ইয়োর এক্সেলেন্সি, কাল যে আপনি বলেছিলেন আপনাকে ঠাট্টা করতেই আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চেয়েছিলাম সেটা ঠিক নয়। আমি এসেছিলাম হাঁচি দিয়ে আপনার অসুবিধা ঘটানোর জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে... আর আপনাকে ঠাট্টা করার কথা তো আমি ভাবতেই পারি না। সে স্পর্ধা আমার হবে কি করে! মানুষকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করার ঝোঁক যদি আমাদের মাথায় ঢোকে তাহলে তো শ্রদ্ধা-ভক্তি... গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি বলে কিছু থাকেই না।...''

রাগে কাঁপতে কাঁপতে জেনারেল গাঁক্‌গাঁক্ করে উঠল, ''বেরিয়ে যাও এখান থেকে!''

ভয়ে সিঁটিয়ে চেরভিয়াকভ ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, ''কি বললেন?''

পাটা মাটিতে ঠুকে জেনারেল আবার বলল, ''বেরিয়ে যাও!''

চেরভিয়াকভের মনে হল, কিছু একটা যেন তার বুকের মধ্যে আঘাত করল। কিছুই তার কানে ঢুকল না, কিছুই সে দেখতে পেল না, দরজার দিকে পিছিয়ে গিয়ে পথে নেমে সে ইতস্তত হাঁটতে লাগল। যন্ত্রের মত টলতে টলতে সে বাড়ি ফিরল, যে অবস্থায় ছিল সেই ভাবে সরকারী ফ্রক-কোট পরেই সোফায় শুয়ে পড়ল, তারপর মরে গেল।

১৮৮৩

অসভ্য ছোট ছেলেটা

The Nasty Little Boy



মনোরম চেহারার যুবক আইভান আইভানিচ ল্যাপ্‌কিন আর টিকলোনাক, যুবতী আন্না সেমিওনভ্‌না জাম্‌ব্রিৎস্কায়া একসঙ্গে নদীর খাড়া পাড় বেয়ে নীচে নেমে একটা বেঞ্চিতে বসল। আসনটা একেবারে জলের ধারে ঘন উইলো ঝোপের ফাঁকে। জায়গাটা চমৎকার! সেখানে বসলেই তুমি বাইরেব জগৎ থেকে হারিয়ে যাবে; তোমাকে দেখবে কেবল মাছেরা আর সেই সব জলচর মানুষরা যারা বিদ্যুতের মত জলের উপর স্কেটিং করে। মাছ ধরার ছিপ, জাল, পোকাভর্তি পাত্র, ও অন্য সব সরঞ্জামই তাদের সঙ্গে ছিল। সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে তারা মাছ ধরতে বসে গেল।

চারদিকে তাকিয়ে ল্যাপকিন্ বলতে শুরু করল, "শেষ পর্যন্ত আমরা যে একলা হতে পেরেছি তাতে ভারী ভাল লাগছে। তোমাকে অনেক কথা বলার আছে আন্না সেমিওনভ্‌না...অনেক কথা। তোমাকে যখন প্রথম দেখলাম..তোমার ছিপে মাছ ভিড়েছে! তখনই বুঝলাম কিসের জন্য এতদিন বেঁচে ছিলাম, বুঝতে পারলাম কে আমার আরাধ্যা দেবী যার কাছে আমাব সৎ ও কঠোর শ্রমের জীবনটাকে নিবেদন করতে হবে...একটা বড় মাছ ভিড়েছে! তোমার সঙ্গে দেখা হতে প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেমে পড়ে গেলাম; প্রগাঢ় প্রেমে পড়লাম! ছিপটা টানবার আগে একটু অপেক্ষা কর। আরও শক্ত করে কামড় বসাক...আমাকে বল লক্ষ্মীটি, আমার মিনতি, আমি কি তোমার উপর ভরসা করতে পারি; না, আমি তার যোগ্য নই, সে কথা আমি ভাবতেও পারি না—আমি কি ভরসা করতে... টান মার!"

আন্না সেমিওনভ্‌না ছিপটাকে জলের উপরে তুলে টানতে টানতে কাছে এনেই চেঁচিয়ে উঠল। একটা রূপোলি সবুজ মাছ শূন্যে চকচক করছে।

"আরে, একটা মিষ্টিজলের মাছ! ওঃ শিগ্‌গির! মাছটা লাফিয়ে পড়ল!"

বড়শি ছেড়ে মাছটা ঘাসের উপর লাফিয়ে পড়েই ছলাৎ করে জলে ডুব মারল।

ল্যাপ্‌কিন মাছটাকে ধরতে গিয়ে দৈবাৎ মাছের বদলে আন্না সেমিওনভ্‌নার হাতটা ধরে ফেলল এবং দৈবাৎই হাতটাকে নিজের ঠোঁটের কাছে তুলে ধরল "মেয়েটি হাতটা টেনে নিল, তবে একটু দেরীতে; দু'জনের ঠোঁট দৈবাৎই একটি চুম্বনে মিলিত হয়ে গেল। সব কিছুই দৈবক্রমেই ঘটে গেল। একটা চুমোর পরে আরও একটা, তারপর প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি...কয়েকটা সুখের মুহূর্ত! অবশ্য পার্থিব জীবনে নির্বিঘ্ন সুখ বলে

কিছু নেই। সাধারণত সুখই নিজের মধ্যে বিষ বয়ে আনে, অথবা বাইরে থেকে কিছু এসে তাকে বিষময় করে তোলে। এখানেও তাই হল। যুবতী-যুগল যখন চুম্বন-মগ্ন, তখন হঠাৎই একটা হাসির শব্দ শোনা গেল। নদীর দিকে তাকিয়ে তারা একেবারে জমাট বেঁধে গেল; কোমর পর্যন্ত জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি উলঙ্গ ছোট ছেলে। ছেলেটি আন্না সেমিওনভ্‌নার দশ বছরের ছোট ভাই কলিয়া। জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দুটি যুবক-যুবতীর দিকে তাকিয়ে সে বিশ্রীভাবে হাসছে।

ছেলেটি বলে উঠল, "আহ,...চুমো খাচ্ছ, তাই তো? ভাল! আমি মাকে বলে দেব!"

ল্যাপ্‌কিন লজ্জায় লাল হয়ে তো-তো করে বলল, "আমি তো আশা করি, একজন পূজনীয় ব্যক্তি হিসাবে ..লুকিয়ে কিছু দেখা খুব নিন্দার কাজ, আর সে সব কথা বলা তো নীচ, হেয়, ঘৃণ্য কাজ...তাই আমি মনে করি একজন পূজনীয়, মহৎ ব্যক্তি হিসাবে তুমি..."

"আমাকে একটা রুব্‌ল্‌ দাও, কিচ্ছু বলব না," মহৎ ছেলেটি বলল। "নইলে আমি বলে দেব!"

ল্যাপ্‌কিন একটা রুব্‌ল্‌ পকেট থেকে বের করে কলিয়াকে দিল; সেও ভেজা মুঠোয় মুদ্রাটা চেপে ধরে শিস্‌ দিতে দিতে সাঁতার কেটে চলে গেল। সেদিন আর যুগলের চুমো খাওয়া হল না!

পরদিন ল্যাপ্‌কিন শহর থেকে কিছু রং ও বল এনে কলিয়াকে দিল, আর দিদি দিল তার সব ওষুধের বাক্স। তারা তাকে সৌখীন কাফ-লিংকও এনে দিল। দুষ্টু ছোট ছেলেটা খুবই মজা পেয়ে গেল; আরও কিছু পাবার আশায় সে এদের পিছনেই লেগে রইল। ল্যাপ্‌কিন ও আন্না সেমিওনভ্‌না যেখানে যায় সেও সেখানেই যায়। এক মুহূর্তের জন্যও তাদের একলা থাকতে দেয় না!

দাঁতে দাঁতে ঘষে ল্যাপ্‌কিন গজরায়, "ছোকরা তো আচ্ছা! এই বয়সেই এত বড় শয়তান! শেষ পর্যন্ত কি হয়ে উঠবে?"

সারা জুন মাস কলিয়া দুই অসহায় প্রেমিকের জীবনটাই মাটি করে দিল। সব সময়ই কথাটা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখায়, পিছন-পিছন ফেরে, আর উপহার দাবী করে। কিছুতেই সে খুশি হয় না; শেষ পর্যন্ত একটা পকেট-ঘড়ির বায়না ধরল। ওরা আর কি করে? শেষ পর্যন্ত সেই কথাই দিল।

একদিন ডিনারের সময় যখন কেক পরিবেশন করা হচ্ছে তখন ছেলেটা হঠাৎ হেসে হেসে চোখ পিটপিট করতে করতে ল্যাপ্‌কিনকে বলল:

"এখন বলে দেব কি? অ্যা?"

ল্যাপ্‌কিনের মুখ ভীষণ লাল হয়ে উঠল; কেকের বদলে সে তোয়ালেটাই খেতে শুরু করল। লাফ দিয়ে টেবিল থেকে উঠে আন্না সেমিওনভ্‌না পাশের ঘরে পালিয়ে গেল।

দুই যুবক-যুবতী এই সংকট-অবস্থার মধ্যেই আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত কাটাল। শেষ পর্যন্ত ল্যাপ্‌কিন বিয়ের প্রস্তাব করল।

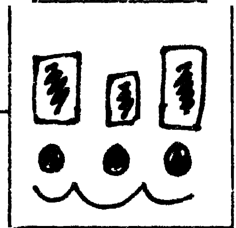
বড়ই সুখের সে দিনটি! মেয়েটির বাবা-মার সঙ্গে কথা বলে তাদের সম্মতি পেয়ে ল্যাপ্‌কিন প্রথমেই ছুটে গেল বাগানে. কলিয়াকে খুঁজতে লাগল। তাকে দেখতে পেয়েই আনন্দে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে অসভ্য ছোট ছেলেটার কান চেপে ধরল। আর সেমিওনভ্‌নাও কলিয়াকে দেখতে পেয়ে তার আর একটা কান ধরল। কলিয়া তখন কাঁদতে কাঁদতে তাদের মিনতি করে বলল ঃ ''তোমরা আশ্চর্য মানুষ, বড় ভাল মানুষ, আর কখনও এ কাজ করব না। ওঃ, ওঃ! আমাকে ক্ষমা কর।''

তারা দু'জনই পরবর্তীকালে স্বীকার করেছে, যে সময়টুকু তারা সেই অসভ্য ছোট ছেলেটার কান মুলেছিল তখনকার মত এত সুখ, এমন সর্বগ্রাসী আনন্দ সারা অভিসার-কালে তারা একটিবারের জন্যও পায় নি।

১৮৮৩

যৌতুক

Dowry



বড় ও ছোট, ইঁটের ও কাঠের, পুরনো ও নতুন, আমার জীবনে অনেক বাড়ি আমি দেখেছি, কিন্তু বিশেষ করে একটা বাড়ি আমার স্মৃতিতে গভীর দাগ কেটে আছে। বস্তুত, এটা একটা বাড়ি নয়, একটা কুটীর।

ছোটখাট, তিনটে দরজাওয়ালা বাড়িটা দেখতে একেবারেই নৈশ টুপি পরা একটা কুঁজী বুড়ির মত। পলস্তারা সাদা, ছাদটা টালির, চিমনিটি বাঁকানো, বর্তমান মালিকের পিতামহ ও প্রপিতামহদের হাতে লাগানো তুঁত, বাবলা ও ঝাউগাছের সারির মধ্যে বাড়িটা একেবারে ঢাকা পড়েছে। ডালপালার জন্য বাড়িটা চোখেই পড়ে না। অবশ্য এত গাছপালা থাকা সত্ত্বেও বাড়িটাকে শহরের বাড়ি বলে চিনতে ভুল হয় না। এর প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মত পাশাপাশি আরও অনেক সবুজ প্রাঙ্গণ থাকায় প্রাঙ্গণটাই একটা ছোটখাট রাস্তার মত। সে রাস্তায় কেউ কখনও ঘোড়া চালায় না। হাঁটেও যৎসামান্য কয়েকজন।

কুটীরের খড়খড়িগুলো স্থায়ীভাবে বন্ধ ; বাসিন্দাদের আলোর দরকার হয় না। আলো তাদের কাছে অপ্রয়োজনীয়। জানালাগুলি কোনদিন খোলা হয় না; কারণ বাসিন্দারা তাজা বাতাস পছন্দ করে না। তুঁত, বাবলা ও চোরকাঁচ্‌কি গাছের মধ্যে যারা স্থায়ীভাবে বাস করে প্রকৃতির প্রতি তারা উদাসীন। প্রকৃতির সৌন্দর্য ভোগ করার ক্ষমতা ঈশ্বর কেবল শহুরে লোকদেরই দিয়েছেন ; বাকি মানব সমাজ এই সব সৌন্দর্যের ব্যাপারে গভীর

অজ্ঞানতায় ডুবে আছে! অনেক বেশী পরিমাণে যা পাওয়া যায় মানুষ তার মূল্য দেয় না। যা আমাদের আছে তা আমরা ভোগ করি না। অথবা যা আমাদের আছে তা আমরা ভালবাসি না। এই কুটীরকে ঘিরে আছে এক মাটির স্বর্গ; এখানে সবুজ আছে, কূজনমুখর পাখিরা আছে, কিন্তু বাড়ির ভিতরে-হায়রে! গ্রীষ্মকালে গুমোট দমআটকানো ভাব, আর শীতকালে যেমন গরম তেমনই ঘাম। একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর।...

অনেকদিন আগে আমি প্রথম সে কুটীরে গিয়েছিলাম একটা কাজে ঃ কুটীরের মালিক কর্নেল চিকামাসভের অভিনন্দন-বার্তা নিয়ে গিয়েছিলাম তার স্ত্রী ও মেয়ের কাছে। সেই প্রথম সাক্ষাতের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। অন্যথা হওয়াটাই ছিল অসম্ভব।

কল্পনা করুন, আপনি বাইরের ঘর থেকে বড় ঘরে হেঁটে যেতেই একটি প্রায় চল্লিশ বছরের ছোটখাট মোটা মেয়েমানুষ আতংকে ও বিস্ময়ে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। আপনি একজন "বাইরের লোক", একজন অতিথি, একটি "যুবক"—আর তাকে আতংকিত ও বিস্মিত করার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। আপনার হাতে মুগুর নেই, কুড়ুল নেই, রিভলবার নেই, আপনার মুখে অমায়িক হাসি, কিন্তু আপনাকে দেখেই ত্রাসের সঞ্চার।

স্ত্রীলোকটিকে আপনি চিনতে পাবলেন বাড়ির কর্ত্রী চিকামাসভা হিসাবে, আর স্ত্রীলোকটি কাঁপা গলায় প্রশ্ন কবল, "কার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ও সুখ আমার হয়েছে?"

আপনি নিজের পরিচয় দিলেন, কেন এসেছেন তাও বুঝিয়ে বললেন। আতংক ও বিস্ময়ের পরিবর্তে শুনতে পেলেন একটা মর্মভেদী, সানন্দ "আঃ!" ও দুই চোখের বিঘূর্ণিত অবস্থা। সেই "আঃ" প্রতিধ্বনির মত বাইরের ঘব থেকে বড় ঘরে ঢুকল, বড় ঘর থেকে ড্রয়িং-রুমে, ড্রয়িং-রুমে থেকে রান্নাঘরে...আর সেখান থেকে ভূগর্ভস্থ ভাঁড়ারঘরে! দেখতে দেখতে সমস্ত কুটীরটা ভরে গেল বহু কণ্ঠের সানন্দ "আঃ!" ধ্বনিতে। পাঁচ মিনিট পরে একটা বড়, নরম, গরম ডিভানে বসে আপনি শুনতে পেলেন সারা মাস্কো স্ট্রীটে সেই এক "আঃ"! ধ্বনি।

নাকে এল ন্যাপথলিন-বলের গন্ধ, আর আমার পাশেই চেয়ারের উপর রুমালে জড়ানো একজোড়া নতুন সোয়েডের জুতোর গন্ধ। ঘরে ছিল বক-ঠোঁটি গাছ আর জানালায় ছিল পুরনো মসলিনের পর্দা! পর্দার উপরে ছিল অনেক ফুলে-ওঠা মাছি। দেয়ালে ঝুলছিল কোন আর্চবিশপের তৈলচিত্র; কাঁচের একটা কোণ ভাঙা। আর্চবিশপের পরে একসারি হলুদ জিপসি-মুখের পূর্বপুরুষের ছবি। টেবিলের উপর পড়েছিল একটা অঙ্গুলিত্রাণ, এক বীল সুতো, আর একটা আধ-বোনা মোজা; মেঝের উপর পড়েছিল নানা বকম নক্সা ও কালো জ্যাকেটের কয়েকটা টুকরো সুতো দিয়ে গাঁথা। পাশের ঘরে দুটি ভীত, বিস্মিত বৃদ্ধা নক্সা ও কাপড়েব টুকরোগুলো মেঝে থেকে তুলে নিচ্ছিল।

চিকামাসভা বলল, ''ক্ষমা করবেন, আমরা ভীষণ ব্যস্ত!''

সে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল, কিন্তু বিব্রতভাবে বারে বারে দরজার দিকেও তাকাতে লাগল ; দরজার ওপাশে দুই বৃদ্ধা তখনও নক্সাগুলি কুড়িয়ে নিচ্ছে। দরজাটা একটু খুলেই আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

চিকামাসভা যেন দবজাকেই বলল, ''আচ্ছা, এটা কি?''

দরজার ও-পাশ থেকে একটি নারীকণ্ঠ ফরাসী ভাষায় প্রশ্ন করল, ''যে 'টাই'টা আমার বাবা কুর্স্ক থেকে পাঠিয়েছিল সেটা কোথায়?''

''ওঃ, এটাই কি মারি?...কিন্তু আসলে, আজ আমাদের এখানে একটি লোক এসেছে যাকে আমরা মোটেই ভাল করে চিনি না... লুকেরিয়াকে জিজ্ঞাসা কর!''

চিকামাসভা খুশিতে আরক্তিম হয়ে উঠল। তার দুই চোখে আমি যেন পড়তে পারলাম ঃ ''কিন্তু আমরা কী সুন্দর ফরাসী বলতে পারি!''

দরজা খুলে গেল, দেখতে পেলাম বছর উনিশ বয়সের একটি একহারা মেয়েকে ; পরনে লম্বা মসলিনের পোশাক, সোনার কোমর-বন্ধ থেকে ঝুলছে একটা মুক্তোর পাখা। সে এগিয়ে এসে শিষ্টতা প্রদর্শন করল। তার মুখটা লাল হয়ে উঠল। প্রথমে লাল হল তার লম্বা, সামান্য ছিট-ধরা নাক ; পরে সে রং ছড়িয়ে পড়ল তার দুই চোখে, এবং চোখ থেকে কপালে।

চিকামাসভা বলল, ''আমার মেয়ে। আর ইনি মানেচ্‌কা, এই সেই যুবক যে...''

নিজের পরিচয় দিয়ে আমি নক্সাগুলোর প্রশংসা করলাম। মা ও মেয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

মা বলল, ''উত্থান উৎসব'' হয়ে গেল। সেই মেলায় আমরা কাপড় কিনি এবং পরের মেলা পর্যন্ত দরকারী পোশাকপত্র নিজেরাই সেলাই করি। সেলাইয়ের কাজটা কখনো বাইরে পাঠাই না। আমার পিওতর সেমিওনভিচ তো বেশী টাকা পাঠাতে পারে না, তাই কোনরকম বিলাসিতা আমরা করি না। নিজেদের পোশাক নিজেরাই বানাই।''

''কিন্তু এত পোশাক কারা পবে? আপনারা তো মাত্র দু'জন!''

''আহা, এগুলো তো পরবার জন্য নয়, এটা যৌতুক!''

মেয়েটি সলজ্জ ভঙ্গীতে বলল, ''ওঃ মামন, সত্যি! এ ভদ্রলোক তো ভাবতেও পারেন... আমি কোনদিন বিয়েই করব না! কোনদিন না!''

মুখে সে কথাগুলি বলল বটে, কিন্তু ''বিয়ে'' শব্দটা উচ্চারণ করতেই তার চোখ দুটো ঝিকমিকিয়ে উঠল।

চা এল ; সঙ্গে বিস্কুট, মাখন ও জ্যাম, তারপর পরিবেশিত হল ফল ও দুধের সর। সন্ধ্যা সাতটায় ছয় পদের নৈশ ভোজ। খেতে খেতেই আমার কানে এল একটা লম্বা হাই তোলার শব্দ, পাশের ঘর থেকে শব্দটা এল ; এ রকম হাই একমাত্র পুরুষ মানুষেই তুলতে পারে।

আমার বিস্ময় লক্ষ্য করে চিকামাসভা বুঝিয়ে দিল, ''ও পিওতর

সেমিওনভিচের ভাই ইগর সেমিওনভিচ। গত বছর থেকে সে আমাদের কাছেই থাকে। সে এখানে আসতে পারছে না, তাকে ক্ষমা করুন। সে বড়ই লাজুক...নবাগত লোকের সামনে বিব্রত বোধ করে। তার ইচ্ছা কোন মঠে চলে যাবে। চাকরির ব্যাপারে খুবই নিরাশ হয়ে পড়েছে। কাজেই ব্যাপারটা এখন শোক-তাপের বাইরে চলে গেছে।''

নৈশ ভোজনের পরে চিকামাসভা একটা ছোট চাদর দেখিয়ে জানাল, ইগর সেমিওনভিচ নিজের হাতে সেটা সেলাই করছে পরে গির্জাকে দান করবে বলে। এক মুহূর্তের জন্য ভীরুতা ছেড়ে মানেচ্‌কা আমাকে একটা তামাকের থলে দেখাল, যেটা সে বাবাকে দেবে বলে তাতে নক্সা তুলছে। আমি যখন তার কাজ দেখে প্রশংসার ভান করলাম, তখন সে লজ্জায় লাল হয়ে মার কানে কানে কি যেন বলল। তার মার মুখটাও উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; আমাকে ডেকে ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে ঢুকে আমি দেখতে পেলাম গোটাপাঁচেক বড় বড় তোরঙ্গ, অনেকগুলি সুটকেস ও বাক্স।

মা আমার কানে কানে বলল, ''এই হল...যৌতুক! সবকিছু আমরা নিজেরাই সেলাই করেছি।''

সেই বিষণ্ণ-দর্শন তোরঙ্গগুলি দেখা হলে আমার অতিথিপরায়ণা গৃহকর্ত্রীদের কাছ থেকে একে একে বিদায় নিলাম। সকলকেই কথা দিতে হল, আবার সে বাড়িতে আসব।

প্রথম সাক্ষাতেব সাত বছব পরে সে কথা রাখার সুযোগ পেলাম। আদালতের একটা কাজে বিশেষজ্ঞ হিসাবে সেই ছোট শহরে আমাকে যেতে হয়েছিল। সেই পরিচিত কুটীরে ঢুকতেই সেই একই শব্দ কানে এল ''আ!'' তারা আমাকে চিনল। আমার প্রথম সাক্ষাৎটা তাদের জীবনে একটা সত্যিকারের ঘটনা হয়ে উঠেছিল ; আর ঘটনা যেখানে অল্পই ঘটে সেখানে সেটা দীর্ঘ দিন স্মরণে থাকে। ড্রয়িং-রুমে ঢুকে দেখলাম. মার চেহারা আরও শক্ত-সমর্থ হয়েছে, মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে ; মেঝেতে উপুড় হয়ে বসে সে একটা গাঢ় নীল রংয়ের কাপড় কাটছে ; তার মেয়েটি ডিভানে বসে কাপড়ের ফুল তুলছে। সেই একই নক্সা, ন্যাপথলিনের গন্ধ, কোণ-ভাঙা কাঁচে ঢাকা সেই একই তৈলচিত্র। তবু কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ল। আর্চবিশপের ছবির পাশেই ঝোলানো আছে পিওতর সেমিওনভিচের ছবি। আর মেয়েরা শোক প্রকাশ করছে। জেনারেলের পদে উন্নীত হবার এক সপ্তাহ পরেই পিওতর সেমিওনভিচ মারা গেছে।

শুরু হল স্মৃতি-রোমন্থন! জেনারেলের বিধবা স্ত্রী কাঁদতে শুরু করল।

সে বলতে লাগল, ''আমাদের একটা বড় ক্ষতি হয়ে গেছে! পিওতর সেমিওনভিচ—তাকে তো আপনি চিনতেন—আর আমাদের মধ্যে নেই। আমরা একা, নিজেদের এখন নিজেদেরই দেখাশুনা করতে হয়। ইগর সেমিওনভিচ জীবিত আছে, কিন্তু তার গুণগান করতে পারছি না। মঠ থেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে...মদ খাবার জন্য। মার্শালের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা

আছে। আমি নালিশ করতে চাই। ভাবতে পারেন, সে বেশ কয়েকবার তোরঙ্গগুলো খুলেছে...মানেচকাব যৌতুকগুলি হাতিয়ে নিয়ে যত সব ভবঘুরেদের দিয়েছে। দুটো তোবঙ্গ খালি করে ফেলেছে! এভাবে চলতে থাকলে তো আমার মানেচ্কার একটা যৌতুকও থাকবে না!'

মানেচ্কা বিব্রত হয়ে বলল, "কী বলছ মামন! ভদ্রলোক কি মনে করবেন! আমি কোনদিন বিয়ে করব না, কোনদিন না!"

প্রেরণা ও আশা নিয়ে মানেচ্কা সিলিংয়ের দিকে তাকাল; স্পষ্টতই সে যা বলল তা নিজেই বিশ্বাস করে না।

বাইরের ঘবে একটি ছোটখাট, টাক-মাথা মানুষকে আমি একনজর দেখেছিলাম; পরনে একটা বাদামি ফ্রক-কোট, পায়ে বুটের বদলে গালোশ; একটা ইঁদুরের মত ছুটে চলে গেল।

ভাবলাম, "সেই লোকটিই ইগর সেমিওনভিচই হবে!"

মা ও মেয়ের দিকে তাকালাম; দু'জনেবই বয়স ভীষণ বকমের বেড়ে গেছে। মার মাথা রূপোলি সাদা, আব মেয়েও মলিন হয়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে; এখন মাকে মেয়েব চাইতে পাঁচ বছরের বেশী বড় বলে মনে হয় না।

আমাকে যে একবাব বলা হয়েছে সেটা ভুলে গিয়ে বৃদ্ধ মহিলা বলল, "ভেবেছি মার্শালের সঙ্গে দেখা করব। আমি নালিশ কবতে চাই! আমরা যা কিছু সেলাই কবেছিলাম ইগর সেমিওনভিচ সব হাতিযে নিচ্ছে, আব নিজের আত্মাব মুক্তিব জন্য দান কবছে। আমাব মানেচকাব একটা যৌতুকও আর নেই!"

মানেচ্কাব মুখ লাল হয়ে উঠল, কিন্তু এবাব সে একটা কথাও বলল না!

"সব কিছু আবাব নতুন কবে সেলাই করতে হবে। আর সকলেই জানে যে আমবা ধনী নই! আমাদেব কত বড় ক্ষতি হয়ে গেছে।"

"সত্যি ক্ষতি হযে গেছে।" মানেচকা কথাটাব পুনবাবৃত্তি কবল।

গত বছব নিয়তি আমাকে আবাব সেই পরিচিত কুটীবে টেনে নিয়ে গেল। ড্রয়িং-রুমে ঢুকে বৃদ্ধা চিকামাসভাকে দেখতে পেলাম। আগাগোড়া কালো পোশাক পরে শোকজ্ঞাপক ফেটি বেঁধে ডিভানে বসে সেলাই করছিল। তার পাশেই বসেছিল বাদামি ফ্রক-কোট গায়ে, বুটের বদলে গালোশ পায়ে একটি ছোটখাট বুড়ো মানুষ।

আমাকে দেখেই সে লাফিয়ে উঠে ঘর থেকে ছুটে বেরিযে গেল।

আমার শুভকামনার উত্তরে বৃদ্ধ মহিলাটি হেসে বলল : "আপনাকে আবার দেখে বড় ভাল লাগল মঁসিযে।"

একটু পরে আমি বললাম, "আপনি কি সেলাই কবছেন?"

"একটা শার্ট। এটাকে শেষ করে গির্জায় ফাদারকে দিযে আসব লুকিয়ে বাখতে, নইলে ইগর সেমিওনভিচ এটাও নিয়ে যাবে। এখন আমি সব কিছুই পুরোহিতের কাছে লুকিয়ে রাখি," মহিলা চুপি চুপি বলল।

নিজের টেবিলের সামনে রাখা মেয়ের ফটোগ্রাফের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলল ঃ

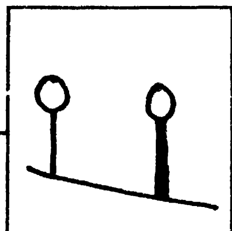
"দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমাদের একটা ক্ষতি হয়ে গেছে।"

কিন্তু তার মেয়েটি কোথায়? মানেচ্কা কোথায়? আমি জিজ্ঞাসা করি নি। গভীর শোকমগ্ন বৃদ্ধাকে কোন প্রশ্ন করতে আমার মন চায় নি। যতক্ষণ সেখানে ছিলাম, এবং সেখান থেকে চলে আসার সময়ও মানেচ্কা আমার সামনে আসে নি; তার কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাই নি, তার শান্ত, ভীরু পায়ের শব্দও না। ... সবই বুঝলাম; মনে বড় দুঃখ পেলাম।

১৮৮৩

মোটা মানুষটি ও সরু মানুষটি

The Fat Man and the Thin Man



দুই বন্ধুর দেখা হল নিকোলায়েভ্স্কি রেলওয়ে স্টেশনে—একজন মোটা, আর অপরজন সরু। মোটা লোকটি সবে রেস্তোরাঁ থেকে খেয়ে এসেছে, তার মাখন-মাখা ঠোঁট দুটো পাকা চেরিফলের মত চকচক করছে। তার গায়ে শেরি ও সুগন্ধি তেলের বাস। সরু লোকটি সবে রেলের কামরা থেকে নেমেছে, তার ঘাড়ে সুটকেস, বাণ্ডিল ও কার্ডবোর্ড বাক্সের বোঝা। গায়ে শুয়োরের মাংস ও গুঁড়ো কফির গন্ধ। তার পিছন থেকে উঁকি মারছে লম্বা থুতনির চামড়াসার একটি ছোটখাট স্ত্রীলোক—তার বৌ, আর আছে উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি ছাত্র—তার ছেলে। ছেলেটি ঢেঙা, আর একটা চোখ ট্যাঁরা।

সরুকে দেখে মোটা চেঁচিয়ে বলে উঠল, "পর্‌ফিরি! আরে, তুমি? কত যুগ পরে দেখা বলতো?"

সরু সবিস্ময়ে বলল, "কী আশ্চর্য! মিশা! আমার ছোটবেলার বন্ধু! কোথা থেকে মাটি ফুঁড়ে উঠলে?"

দুই বন্ধু পর পর তিনবার আলিঙ্গন করল; অশ্রুভরা চোখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। দু'জনই মধুর বিস্ময়ে আবিষ্ট।

প্রিয়-সম্ভাষণের পরে সরু বলতে শুরু করল, "ভাই রে! আমি তো কোন দিন আশাই করি নি! কী বিস্ময়, দাঁড়াও! আগে তোমাকে ভাল করে দেখে নেই! যেমন ছিলে ঠিক সেই রকম সুন্দরটিই আছ! তেমনই আকর্ষণীয় ফুলবাবুটি! তোমার সব খবর বল বন্ধু! ধনী হয়েছ? বিয়ে করেছ? দেখতেই পাচ্ছ আমি বিয়ে করেছি। এই আমার স্ত্রী লুইসা ওরফে ওয়াল্টজেবাক... লুথেরান। আর এটি আমার ছেলে ন্যাথেনিয়াল, থার্ড-ফরমে পড়ে। নাত্রি, এই আমার ছেলেবেলার বন্ধু! উচ্চ বিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়েছি!"

ন্যাথেনিয়াল এক মুহূর্ত চিন্তা করে টুপিটা খুলল।

সরু বলেই চলল, "উচ্চ বিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়েছি। মনে আছে, সকলে তোমাকে কি রকম ক্ষেপাত? তোমাকে ডাকত হেরোস্ট্রেটাস বলে, কারণ তুমি স্কুল-রেজিস্টারে আগুন দিয়ে একটা গর্ত করে দিয়েছিলে; আর আমাকে ডাকত ইফিয়াল্টিস্ বলে, কারণ আমি গল্প বলতে ভালবাসতাম। হো, হো! আরে তখন তো আমরা ছোট ছিলাম! তুমি লজ্জা পেয়ো না নাট্টি। ভদ্রলোকের আরও কাছে যাও। আর এই আমার স্ত্রী, পূর্বনাম ওয়াল্টজেন্‌বাক... লুথেরান।...

ন্যাথেনিয়াল এক মুহূর্ত চিন্তা করে বাবার পিছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

মোটা লোকটি খুশি মনে অপর জনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "তারপর, কেমন আছ হে বন্ধু? তুমি কি সরকারী চাকরিতে কোথাও আছ? বেশ উন্নতি করেছ তো?"

"চাকরিতেই আছিরে ভাই। কলেজিয়েট এসেসর হিসাবে এই দ্বিতীয় বছর হল, আর 'অর্ডারি অব স্টেট স্যানিস্‌লস'-ও পেয়েছি। মাইনেটা খুবই কম কিন্তু আমি তার কি করতে পারি বল? আমার স্ত্রী গান শেখায়, আমিও চাকরির সঙ্গে চুরুটের কাঠের বাক্স তৈরীর ব্যবসা করি। চুরুটের বাক্সগুলি চমৎকার! প্রতিটা এক রুব্‌ল্ দরে বিক্রি করি। কেউ যদি দশটা বা তার বেশী কেনে তাহলে কিছুটা ছাড়ও দেই। যে করেই হোক, ভালভাবেই চলে যাচ্ছে। আমি সিভিল সার্ভিসে আছি, আর বর্তমানে এখানে বদলী হয়ে এসেছি সেই মন্ত্রকেরই বিভাগীয় প্রধান রূপে। এখানেই আমার কাজ চলবে। তারপর, তুমি কেমন আছ? আমি বাজি ধরতে পারি, এর মধ্যেই তুমি নির্ঘাৎ স্টেট কাউন্সিলর হয়েছ, কি বল?"

মোটা লোকটি বলল, "নারে ভাই, আমাকে আরও একটু ঠেলে তোল। আমি প্রিভি কাউন্সিলর পর্যন্ত ঠেলে উঠেছি। আমার দুটো তারকা আছে।"

সরু লোকটি হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, কেমন যেন মিইয়ে গেল। কিন্তু অচিরেই প্রচণ্ড হাসিতে তার মুখটা যেন ফেটে পড়ল; মনে হল তার চোখ-মুখ থেকে যেন আগুনের ফুলকি ছুটছে। নীচু হয়ে, কুঁকড়ে গিয়ে সে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। তার সুটকেস, বাণ্ডিল ও কার্ডবোর্ডের বাক্সগুলিরও সেই অবস্থা ঘটল। ...তার স্ত্রীর লম্বা থুতনিটা আরও লম্বা হল; ন্যাথেনিয়াল সোজা হয়ে দাঁড়াল; তার স্কুল-ইউনিফর্মের সবগুলো বোতাম এঁটে দিল।

"ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমি ...এ তো সুখের কথা স্যার! ছোটবেলাব বন্ধু, তা বলতে পারা যায়, আব হঠাৎ সে এত বড় হয়ে গেছে! হিঃ, হি!"

মোটা লোকটি ভুরু কোঁচকাল। "খুব হয়েছে! তোমার গলার স্বর হঠাৎ বদলে গেল কেন? তুমি আর আমি ছোটবেলায় বন্ধু ছিলাম—এর মধ্যে ছোট বড়র প্রশ্ন আসে কেন?"

"আপনার দয়া...সত্যি স্যার", সরু লোকটি আরও নীচু হয়ে বলতে

লাগল, "ইয়োর এক্সেলেন্সির এই সদয় দৃষ্টি আমার কাছে যেন একটি জীবনদায়ী মলম। ...এটি আমার ছেলে ন্যাথেনিয়াল ইয়োর এক্সেলেন্সি... আমার স্ত্রী লুইসা, লুথেরান..."

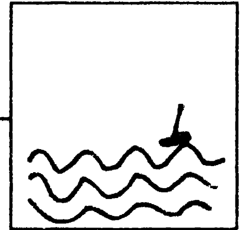
মোটা লোকটি আপত্তি জানাতে চাইল, কিন্তু সরু লোকটির সারা মুখে এত বেশী ভক্তি, মিষ্টতা, ও সশ্রদ্ধ কটুতা ফুটে উঠেছিল যে প্রিভি কাউন্সিলর বিরক্ত হয়ে উঠল। সরু লোকটির দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল বিদায় জানাতে।

সরু লোকটি তিনটে আঙুল কচলাল, সারা দেহ নুইয়ে অভিবাদন জানাল, আর চীনাম্যানের মত বোকা হাসি হাসতে লাগল : "হি, হি, হি!" তার স্ত্রী মৃদু হাসল। ন্যাথেনিয়াল পা ঘষতে ঘষতে টুপিটা ফেলে দিল। তিনজনই মধুর বিস্ময়ে আবিষ্ট।

১৮৮৩

অভিভাবক

The Guardian



দুই হাতে সাহস সঞ্চয় করে আমি জেনারেল শ্বাইগালভের পড়ার ঘরে ঢুকে পড়লাম। জেনারেল তার ডেস্কে বসে "পেশেন্স" খেলছিলেন!

মাথা নেড়ে হাতল চেয়ারটা দেখিয়ে তিনি অমায়িকভাবে শুধালেন, "তুমি কি চাও?"

"আমি একটা কাজে আপনার কাছে এসেছি ইয়োর এক্সেলেন্সি", চেয়ারে বসে ফ্রক-কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে আমি বললাম। "আমি আপনার কাছে এসেছি একটা ব্যক্তিগত কাজে, চাকরির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। আমি এসেছি আপনার বোন-ঝি বারবারা ম্যাক্সিমভ্‌নার পাণি-গ্রহণের অনুমতি চাইতে।"

জেনারেল ধীরে ধীরে আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন, তাসগুলো মেঝের উপর ফেলে দিলেন। কিছু সময় ঠোঁট দুটি নেড়ে তার পর বললেন :

"তুমি... কি বললে? তুমি কি বদ্ধ পাগল হয়ে গেছ, না আর কিছু? কি পাগলের মত বক বক্ করছ? তুমি... তোমার এত সাহস?" মুখ লাল করে তিনি হিস্‌হিসিয়ে বললেন। "ময়ূরপুচ্ছধারী কাক, মেদামারা পুরুষ! এত স্পর্ধা তোমার! আমার সঙ্গে তামাসা করাব সাহস মহাশয়ের হল কেমন করে..."

শ্বাইগালভ এত জোরে পা ঠুকে চীৎকার শুরু কবলেন যে জানালার শার্সিগুলো খট্‌খট্ শব্দ করতে লাগল।

''সোজা হয়ে দাঁড়াও! কার সঙ্গে কথা বলছ তাও ভুলে গেছ। দয়া করে এখান থেকে বেরিয়ে যাও, আর কোন দিন আমাকে মুখ দেখিও না! দয়া করে চলে যাও! ভাগো!''

''কিন্তু আমি তো বিয়ে করতে চাই ইয়োর এক্সেলেন্সি!''

''তুমি যেখানে খুশি বিয়ে করতে পার, কিন্তু আমার বাড়িতে নয়। মহাশয়! তুমি তো আমার বোন-ঝিকে বিয়ে করাব মত বড় এখনও হও নি! তুমি তার উপযুক্তই নও! তোমার আর্থিক স্বচ্ছলতা বা তোমাব সামাজিক মর্যাদা, কোনটাই এ বিয়ের প্রস্তাব করার অধিকার তো দেয় নি.. এ হেন প্রস্তাব আমার কাছে! তোমার পক্ষে এটা তো নিছক ধৃষ্টতা। নমস্কার যুবক, দয়া করে আমাকে আর বিরক্ত করো না!''

''হুম...ইতিমধ্যেই পাঁচজন পাণি-প্রার্থীকে আপনি এইভাবে দরজা দেখিয়েছেন। ষষ্ঠ প্রার্থীর বেলায় সেটা করতে পারবেন না। কেন তাদের বাতিল করেছেন তা আমি জানি! শুনুন ইওর এক্সেলেন্সি...আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি ভাবিয়ার অভিভাবক হিসাবে যত টাকা আপনি উড়িয়েছেন তাব একটা কোপেকও আমি বিয়েব পরে দাবী করব না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি!''

কুঁজো হয়ে এক কদমে আমার দিকে ছুটে এসে ক্রুদ্ধ রাজহাঁসের মত অস্বাভাবিক ফ্যাঁসফেঁসে গলায় জেনারেল বললেন, ''এই মাত্র যে কথা বললে সেটা আবাব বল! আর একবার বল পাজি-বদমাস!''

কথাগুলি আবার বললাম। জেনারেলের মুখটা লাল হয়ে উঠল; তিনি ঘরময় ছুটতে লাগলেন।

ছুটতে ছুটতেই গলা কাঁপিয়ে বলতে লাগলেন, ''এটাই আমার দরকার ছিল! আমার নিজের বাড়িতে বসে আমারই অধীনস্থ লোক আমাকে ভয়ংকরভাবে খণ্ডনাতীত অসম্মান করবে এটাই আমার পাওনা ছিল! হে ঈশ্বর! বেঁচে থেকে এ কী দেখতে হচ্ছে! আমি অসুস্থ বোধ করছি।''

''আমি নিশ্চিত কবে বলছি ইয়োর এক্সেলেন্সি, শুধু যে দাবী করব না তাই নয়, আপনি যে চরিত্রেব দুর্বলতাব জন্য ভারিয়ার টাকা উড়িয়েছেন সেরকম ইঙ্গিত করে কোন দিন একটা কথাও বলব না! তাছাড়া, ভারিয়াকেও বলব চুপ করে থাকতে! আমি কথা দিলাম। কেন আপনি এখনও রেগে আগুন হয়ে ড্রয়ারগুলো টানাটানি করছেন? আমি আপনার নামে নালিশ করব না!''

''কোথাকার কে এক উচ্চাকাংখী, নগণ্য যুবক, এক মেদামারা পুরুষ একটা ভিখারী তারও এত সাহস যে আমার মুখের উপর এই সব নোংরা কথা বলে! দয়া কবে চলে যাও যুবক, আর মনে রেখো এ-কথা আমি কোন দিন ভুলব না। তুমি আমাকে সাংঘাতিক অপমান করেছ! যাই হোক... আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম! তোমার দায়িত্বহীনতা, তোমার বোকামির বশেই এ সব নোংরা কথা তুমি উচ্চারণ করেছ... তোমার হাতে আমার

ডেস্কটা ছুঁয়ো না! তাসেও হাত দিও না! চলে যাও, আমি ব্যস্ত আছি!''

''আমি কিছুতেই হাত দিচ্ছি না। আপনি কি করতে চাইছেন? আপনাকে তো কথা দিলাম জেনারেল! কথা দিলাম, এ ব্যাপারে কোন ইঙ্গিতও করব না! ভারিয়াকেও নিষেধ করে দেব! আপনি আর কি চান? ঈশ্বরের দোহাই, আপনি তো মজার লোক। সে বেচারি বাবার কাছ থেকে যে দশ হাজার পেয়েছিল সেটা আপনি উড়িয়ে দিয়েছেন। বেশ তো, তাতে কি হয়েছে? দশ হাজার কিছু একটা বড় সম্পত্তি নয়। ওটা ক্ষমা করা যেতে পারে।''

''কিছুই আমি উড়িয়ে দেই নি! না! এই মুহূর্তে তোমাকে তার প্রমাণ দেব! এখনই ... আমি সেটা প্রমাণ করব!''

কাঁপা হাতে জেনারেল ডেস্কের একটা ড্রয়ার টেনে খুলে ফেললেন, তার ভিতর থেকে কিছু কাগজপত্র বের করলেন! আর চিংড়ি মাছের মত লাল হয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরে উদ্দেশ্যহীনভাবে পাতাগুলি ওল্টালেন ঃ বেচারি! ভয়ংকর রকমের উত্তেজিত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। তার কপাল ভাল, জনৈক পরিচারক পড়ার ঘরে ঢুকে জানাল, খাবার দেওয়া হয়েছে।

পাতাগুলি সরিয়ে রেখে জেনারেল বলল, ''ভাল কথা, ডিনারের পরে তোমাকে সব দেখিয়ে দেব! চিরদিনে মত সব গাল-গল্প বন্ধ করে দেব। ডিনার সেরে আসি তখন দেখবে! কে এক ম্যাদামারা ছেলে, একটা পরগাছা। ঠোঁট থেকে এখনও মায়ের দুধ শুকোয় নি... যাও ডিনার সেরে এস। ডিনারের পরে সব তোমাকে দেখাব।''

আমরা ডিনারে গেলাম। প্রথম ও দ্বিতীয় পদ পরিবেশনের সময় জেনারেল ছিলেন ক্রুদ্ধ ও বিষণ্ণ। রাগে ফুলতে ফুলতে সুপে নুন মেশালেন, দূরাগত বজ্রের মত গর্জন করতে লাগলেন আর অনবরত নিজের চেয়ারটা সশব্দে ঘষতে লাগলেন।

''আজ তুমি এ রকম চটে আছ কেন?'' ভারিয়া মন্তব্য করল। ''তোমার যখন এ রকম অবস্থা হয় তখন তোমাকে আমার ভাল লাগে না। সত্যি ভাল লাগে না।''

জেনারেল খেঁকিয়ে উঠলেন, ''আমাকে ভাল লাগে না একথা বলার সাহস তোমার হল!''

তৃতীয় ও চতুর্থ পদের সময় শ্মাইগালভ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ পিটপিট করতে লাগলেন। তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল পরাজয় ও আত্মসমর্পণের ভাব। তাকে দেখে অসুখী ও ক্ষুব্ধ মনে হতে লাগল। কপালে ও নাকের উপর বড় বড় ঘামের ফোঁটা জমে উঠল। ডিনার শেষ হলে জেনারেল তার পড়ার ঘরে আমাকে ডেকে নিলেন।

আমার দিকে না তাকিয়ে আমার কোটের উপর হাত বুলোতো বুলোতে বলতে শুরু করলেন, ''দেখ বাবা! তুমি ভারিয়াকে নাও, আমি সম্মতি

দিলাম। তুমি একটি সৎ, ভাল ছেলে! আমার সম্মতি দিলাম। তোমাকে আশীর্বাদ করছি... দেবদূতদের নামে তোমাদের দু'জনকেই আশীর্বাদ করছি। ডিনারের আগে এখানে তোমাকে গালাগালি করেছি বলে আমাকে ক্ষমা কর। আমি মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিলাম। তার কারণ আমি ভালবাসি... পিতার মত। ...কিন্তু তবু তোমাকে বলছি, আমি ...দশ হাজার উড়িয়ে দেই নি, কিন্তু...ষোল। আণ্ট নাতালিয়া তার জন্য যা রেখে গিয়েছিল সেটাও ফুঁকে দিয়েছি। সেটা হেরেছি জুয়া খেলে। এস, একটু পান করে আজকের দিনটাকে পালন করি। শ্যাম্পেনের একটা বোতল আজ ভাঙব। তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ তো?''

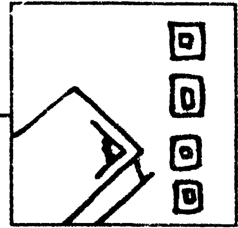
ধূসর, প্রায় অশ্রুভরা চোখে জেনারেল একাগ্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। সে দুটি চোখে একই সঙ্গে ছিল উল্লাসেরও আভাষ। অন্য ছয় হাজারের জন্য আমি তাকে ক্ষমা করলাম; ভারিয়াকে বিয়ে করলাম।

সব ভাল গল্পই বিয়েতে শেষ হয়ে থাকে!

১৮৮৩

কুৎসা

Slander



হস্তলিপির শিক্ষক সের্গেই কাপিতোনভিচ আখিনেয়েভের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে ইতিহাস ও ভূগোলের শিক্ষক আইভান পেত্রভিচ লশাদিনিখের সঙ্গে। বিবাহ-উৎসব সুষ্ঠুভাবে চলছে। বড় ঘরে চলেছে গল্প, বাজনা ও নাচ। ক্লাব থেকে ভাড়া-করা কালো লেজ ও সাদা দাগ-ধরা টাইওয়ালা উর্দিপরা চাকররা এ-ঘর ও-ঘর ছুটে বেড়াচ্ছে। সারাক্ষণই হৈ-হল্লা চলেছে। একটা সেটিতে পাশাপাশি বসে কথা-কাটাকাটি করছে গণিতের শিক্ষক তারান্তলভ, ফরাসী পাস্‌দেকু আর কণ্ট্রোল-অফিসের জুনিয়র ইন্সপেক্টর ইগর ভেনেদিক্তিচ্ মাজ্‌দা। প্রত্যেকেই অতিথিদের শোনাচ্ছে জীবন্ত সমাধির নানা গল্প, আর প্রেতবাদ সম্পর্কে নিজ নিজ অভিমত। তিনজনের একজনও প্রেতবাদে বিশ্বাস করে না, কিন্তু তারা স্বীকার করে পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু আছে যা মানুষ কোনদিন বুঝতে পারবে না। আরেকটা ঘরে সাহিত্যের শিক্ষক দোদনস্কি অতিথিদের বোঝাচ্ছে, কোন্ পরিস্থিতিতে একজন শান্ত্রী পথযাত্রীদের উপর গুলি চালাতে পারে। বুঝতেই পারছেন, আলোচনাগুলি ভয়ংকর, কিন্তু সব মিলিয়ে বেশ মুখরোচক। বাইরের উঠোনে জমায়েত যে সব লোকজনের সামাজিক মর্যাদা ভিতরে ঢোকার পক্ষে যথেষ্ট নয় তারা জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে।

ঠিক মাঝরাতে গৃহকর্তা আখিনেয়েভ রান্নাঘরে ঢুকল রাতের ভোজ তৈরী হয়েছে কিনা সেটা দেখতে। রান্নাঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত রাজহাঁস, পাতিহাঁস ও আরও অনেক কিছুর ধোঁয়ায় ম-ম করছে। দুটো টেবিলে নানারকম মদের বোতল রুচিসম্মতভাবে সাজানো হয়েছে! বিরাট ভুঁড়িওয়ালা লালমুখো রাঁধুনি তার টেবিলে কর্মব্যস্ত।

''মাছটা একবার আমাকে দেখাও তো ভাল মানুষের মেয়ে'', হাতে হাত ঘষে ঠোঁট চাটতে চাটতে আখিনেয়েভ বলল। ''আহা কী সুঘ্রাণ! কী সব ফুলের তোড়া! ইচ্ছা করছে গোটা রান্নাঘরটাই খেয়ে ফেলি! এ, মাছটা একবার দেখাও!'' একটা বেঞ্চির কাছে গিয়ে মার্ফা খবরের কাগজের একটা তৈলাক্ত পাতা সযত্নে তুলে ধরল। তার নীচে মস্ত বড় থালায় একটা বড় চকচকে মাছ ধনে পাতা, অলিভের পাতা ও গাজর দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আখিনেয়েভ মাছটার দিকে তাকিয়ে ঢোঁক গিলল। তার মুখটা চকচক করতে লাগল, চোখ দুটো ঘুরতে লাগল। একটু এগিয়ে গিয়ে সে দুই ঠোঁট দিয়ে তেল-না-দেওয়া গাড়ির চাকার মত একটা শব্দ করল। সেখানে একটু দাঁড়িয়ে থেকে সে আনন্দে আঙুল মটকাল এবং আবারও ঠোঁট চাটতে লাগল।

পাশের ঘর থেকে কার গলা ভেসে এল, ''আহাঃ! গভীর চুম্বনের শব্দ! তুমি কাকে চুমো খাচ্ছ মার্ফা?'' দরজায় দেখা দিল সহকারী শিক্ষক ভান্‌কিনের মুখ। ''তুমি কাকে...ওঃ...খুব ভাল, সেগেই কপিভোনভিচ! বেশ ভাল লোকই জুটিয়েছ! মেয়েদের সঙ্গে নিভৃত আলাপ!''

আখিনেয়েভ বিব্রত হয়ে বলল, ''আমি মোটেই চুমো খাচ্ছি না! ধারণাটা তোমাকে কে দিল মূর্খ কোথাকার? ...এ তো আমি ঠোঁট চাটছিলাম ...মনের সুখে। মাছটাকে দেখেই।...''

''ও গল্প পরে শুনিয়ো!''

আকর্ণবিস্তৃত মুচকি হেসে ভান্‌কিন দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আখিনেয়েভের মুখ লাল হয়ে উঠল।

সে ভাবল, ''মরুক গে! হতভাগা গিয়েই গুজব ছড়াতে শুরু করবে। শহরময় আমার নামে কালি ছিটোবে।''

আখিনেয়েভ ভয়ে ভয়ে বড় ঘরে ঢুকে চারদিকে তাকাল। কোথায় ভান্‌কিন? পিয়ানোটার পাশে দাঁড়িয়ে সে ইন্সপেক্টর (প্রধান শিক্ষকের সহকারী)-এর হাস্যময়ী শ্যালিকার কানে কানে কি যেন বলছে।

আখিনেয়েভ ভাবল, ''আমার কথাই বলছে! আমার কথা। গুলি মার! আর মেয়েটাও ওর কথা বিশ্বাস করছে! সে হাসছে! না, আমি ছেড়ে দেব না! ওর কথা যাতে কেউ বিশ্বাস না করে সেটা আমাকে করতেই হবে! সকলের সঙ্গেই আমি কথা বলব। তাহলেই কুৎসারটনাকারী কোট্‌নাদের দশাই তারও হবে।''

আখিনেয়েভ গা চুলকোতে চুলকোতে বিব্রতভাবে পাস্‌দেকুর কাছে গেল।

ফরাসী ভদ্রলোককে বলল, "এইমাত্র আমি রান্নাঘরে গিয়েছিলাম খাবার ব্যাপারে কিছু নির্দেশ দিতে। আমি জানি, তুমি মাছ ভালবাস, তাই একটা ভাল মাছ এনেছি। হি, হি, হি! হ্যাঁ...ভাল কথা...ভুলেই গিয়েছিলাম... খাবারের তদারকি করতে এইমাত্র আমি রান্নাঘরে ঢুকেছিলাম। মাছটা দেখেই মনের আনন্দে...অতি উল্লাসে, সশব্দে ঠোঁট চেটেছিলাম। আর ঠিক তখনই ঐ বোকা ভান্‌কিন ঘরে ঢুকেই বলে কি না 'ওহো...এখানে চুমোখাওয়া চলছে বুঝি?' তাও আবার রাঁধুনি মার্ফাকে। ভাব একবার ব্যাপারটা। কী আহাম্মক! মেয়েটাই বা কি এমন দেখতে। আর সে ধরে নিল আমি তাকে চুমো খেয়েছি! মাথায় ছিট আছে ওর!"

এগিয়ে এসে তারান্তলভ শুধাল, "কার মাথায় ছিট আছে?"

"ওই তো ওখানে আছে, ভান্‌কিন! আমি রান্নাঘরে ঢুকেছি, মানে..."

ভান্‌কিনের সব ব্যাপারটাই সে খুলে বলল।

তারপর আরও বলল, "কী বোকার মত কথা, ব্যাটা ছিটগ্রস্ত! সত্যি, মার্ফাকে চুমো খাওয়ার চাইতে আমি বরং একটা কুকুরকে চুমো খাব।" চারদিক তাকিয়ে পিছনে দেখতে পেল মাজ্‌দাকে।

তাকেই বোঝাতে শুরু করল, "আমরা ভান্‌কিনের কথা বলছিলাম। রান্নাঘরে ঢুকে আমাকে মার্ফার পাশে দেখেই যত সব বাজে তামাসার কথা তার মনে উদয় হল। বলে উঠল, 'তুমি চুমো খাচ্ছিলে কি?' নির্ঘাৎ নেশার ঘোরেই এসব তার মাথায় এসেছে! তাই আমি বলছিলাম, আমি বরং একটা টার্কি পাখিকে চুমু খাব, কিন্তু মার্ফাকে কদাপি নয়। তাছাড়া, আমার বৌ আছে। তাই তাকে বলে দিয়েছি. 'তুমি কি বোকা হে'!"

ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষক এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, "কে বোকা বল তো?"

'ভান্‌কিন! কি জান, আমি রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে একটা মাছ দেখছিলাম"...

তারপর কথার পর কথা। প্রায় আধা ঘণ্টার মধ্যেই ভান্‌কিন ও মাছের গল্প সব অতিথিরাই শুনে ফেলল।

দুই হাত ঘষতে ঘষতে আখিনেয়েভ ভাবল, "এবার সে সবাইকে বলুক! একবার বলেই দেখুক! সে বলতে শুরু করবে আর সকলেই বলে উঠবে, 'তোমার বাজে কথা রাখ হে বোকারাম! আমরা সব জানি!"

আখিনেয়েভ এতই স্বস্তি বোধ করল যে মনের আনন্দে পুরো চার গ্লাস ভদ্‌কাই খেয়ে ফেলল। খাওয়া-দাওয়ার পরে নবদম্পতিকে তাদের শোবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে একটা সম্পূর্ণ নির্দোষ ছোট ছেলের মতই সে ঘুমিয়ে পড়ল; পরদিন সকালে মাছের ব্যাপারটা সে একেবারেই ভুলে গেল। কিন্তু হায়, মানুষ ভাবে এক, আর ঈশ্বর করেন অন্য। একটা অশুভ জিহ্বা আগেই অশুভ কাজটা সম্পন্ন করে ফেলল; আখিনেয়েভের চালাকিতে কোন কাজই হল না! ঠিক এক সপ্তাহ পরে, অর্থাৎ বুধবারে, স্কুলের তৃতীয় ঘণ্টার পরে আখিনেয়েভ যখন কমনরুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভিসেকিন নামক একটি ছেলের দুষ্কর্মপ্রবণতার কথা বলছিল তখন প্রধান শিক্ষক এসে তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গেল।

বলল, "দেখুন সগেঁই কাপিতোনভিচ, আমাকে ক্ষমা করবেন। এটা আমার কোন ব্যাপার নয়, তবু আমাকে একটা ফয়সালা করতেই হবে। এটা আমার কর্তব্য...দেখুন সর্বত্র গুজব রটেছে যে আপনার এই...এই রাঁধুনির সঙ্গে আপনি বসবাস করছেন। এটা আমার কোন ব্যাপার নয়, কিন্তু...তার সঙ্গে বাস করুন, চুমো খান...যা কিছু ইচ্ছা করুন, শুধু দয়া করে প্রকাশ্যে করবেন না! আপনাকে অনুরোধ করছি! ভুলে যাবেন না যে আপনি একজন শিক্ষক!"

আখিনেয়েভ বুঝি জমে বরফ হয়ে গেল। তার মুখ থেকে একটা কথাও বের হল না। সে এমনভাবে বাড়ি ফিরল যেন একঝাঁক মৌমাছি তার গায়ে হুল ফুটিয়েছে, তার সারা দেহে গরম জল ঢেলে দেওয়া হয়েছে। পথে যেতে যেতে তার মনে হল, সারা শহর এমনভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে যেন তার দেহে আলকাতরা মাখিয়ে পাখির পালক গুঁজে দেওয়া হয়েছে।... ওদিকে বাড়িতে তার জন্য নতুন বিপদ অপেক্ষা করে ছিল।

খেতে বসে তার স্ত্রী শুধাল, "তুমি কিছুই খাচ্ছ না কেন? কি ভাবছ? পিরিতের কথা? মার্ফার জন্য মন খারাপ করছে? আমি সব জেনেছি। কিছু লোক আমার চোখ খুলে দিয়েছে! উঃ! তুমি একটা নির্লজ্জ বর্বর!"

বৌ তার গালে একটা চড় মারল। সেও টেবিল থেকে উঠে পড়ল। তার পা টলছে। সেই অবস্থায়ই টুপি নেই, কোট নেই, সে ভান্‌কিনের বাড়ি গেল।

ভান্‌কিনকে দেখেই বলে উঠল, "তুমি একটা পাজি বদমাস! কেন তুমি সকলের সামনে আমার গায়ে কাদা ছিটিয়েছ? কেন আমার নামে এত কুৎসা রটিয়েছ?"

"কিসের কুৎসা? তুমি কি খোয়াব দেখছ!"

"আমি মার্ফাকে চুমো খেয়েছি একথা কে রটিয়েছে? তুমি না?"

ভান্‌কিন তার বাঁকা-চোরা মুখটাকে আরও বিকৃত করে বিগ্রহের দিকে চোখ তুলে বলল : "ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দেবেন! তোমাকে নিয়ে যদি আমি একটা কথাও বলে থাকি তাহলে আমার চোখ দুটো যেন কানা হয়ে যায়, আমাব নাকটা যেন বন্ধ হয়ে যায়! আমি যেন এই পৃথিবী থেকেই উধাও হয়ে যাই!"

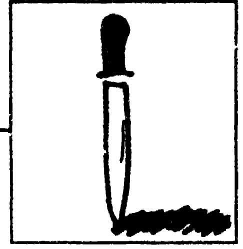
ভান্‌কিনের আন্তরিকতা সব সন্দেহের উর্ধ্বে। পরিষ্কার বোঝা গেল, এ সব গুজব সে ছড়ায় নি।

আখিনেয়েভ অবাক হয়ে মনে মনে পরিচিত সকলের কথাই ভাবল; তারপর বুক চাপড়ে বলে উঠল, "তাহলে কে? কে?"

"কে?" এই একই প্রশ্ন পাঠকদের কাছে আমরাও তো রাখতে পারি?

১৮৮৩

সুইডিশ দেশলাইটা



The Swedish Match

একটি অপরাধমূলক গল্প

১৮৮৫-র ৬ই অক্টোবর একটি সুবেশ যুবক এস-জেলার ২ নং সেক্টরের থানায় এসে খবর দিল, তার মনিব রক্ষীবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল মার্ক আইভানভিচ ক্লৌজভ খুন হয়েছে। কথাগুলি বলার সময় যুবকটিকে বিবর্ণ ও অত্যধিক উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। তার হাত দুটো কাঁপছিল, আর চোখ দুটো ছিল আতংকপূর্ণ।

পুলিশের বড়বাবু এভগ্রাফ কুজ্‌মিচ জানতে চাইল, "কার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য আমার হয়েছে?"

"সেকভ, ক্লৌজভের ম্যানেজার। কৃষিবিশেষজ্ঞ ও যন্ত্রবিদ।"

পুলিশের বড়বাবু ও সাক্ষীরা সেকভের সঙ্গে অপরাধের ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখতে পেল ঃ একদল লোক ক্লৌজভের বাড়ির দিকটায় ভিড় করে আছে। অপরাধের খবরটা দাবানলের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, আর যেহেতু সেটা ছিল উৎসবের দিন তাই পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে দলে দলে লোক স্রোতের মত সেখানে এসে হাজির হয়েছে। হৈচৈ ও হল্লা শুরু হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে কিছু বিবর্ণ, অশ্রুসিক্ত মুখও দেখা যাচ্ছে। ক্লৌজভের শোবার ঘরটাকে তালাবন্ধ দেখা গেল। তার চাবিটা ছিল ভিতরে।

দরজাগুলি পরীক্ষা করে সেকভ বলল, "স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে দুর্বৃত্তরা জানালা দিয়ে তার কাছে পৌঁচেছিল।"

ওরা শোবার ঘরের জানালার বাইরের দিককার বাগানে ঢুকল। জানালাটা দেখতে ভয়াবহ ও অশুভ! তাতে একটা সবুজ, বিবর্ণ পর্দা ঝুলছিল। একটা কোণ ঈষৎ ওল্টানো থাকায় শোবার ঘরের ভিতরটা দেখা যাচ্ছিল।

বড়বাবু প্রশ্ন করল, "আপনারা কেউ জানালা দিয়ে ভিতরটা দেখেছেন কি?"

বাগানের মালী এফ্রেম বলল, "না হুজুর, সারা শরীর যখন থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে তখন তার ভিতরে তাকাবার কথা মনেই আসে নি!"

জানালার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বড়বাবু বলে উঠল, "প্রিয় মার্ক আইভানভিচ! আমি তো আগাগোড়াই বলে এসেছি, একটা খারাপ পরিণতিই তোমার হবে! আমি তোমাকে বলেছি, কিন্তু তুমি আমার কথায় কান দাও নি! অমিতাচারের পরিণতি খারাপই হয়।"

সেকভ বলল, "এফ্রেম ছাড়া আমরা কেউ তো একথা ভাবতেই

পারতাম না। সেই প্রথম সন্দেহ করে যে এখানে একটা কিছু গোলমাল ঘটেছে। আজ সকালেই সে আমার কাছে এসে বলল ঃ 'আমাদের মনিব এত দীর্ঘ সময় জেগে আছেন কেন? পুরো একটা সপ্তাহ্ তিনি শোবার ঘর থেকে বের হন নি!' সে যখন কথাটা বলল তখন আমার মাথায় যেন নীল আকাশ থেকে বজ্র ভেঙে পড়ল। তখনই আমার মনে পড়ে গেল, গত শনিবার থেকে তার দেখা পাই নি, আর আজ রবিবার! সাতটা দিন—এটা তো হাসির ব্যাপার নয়!''

বড়বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ''সত্যি বেচারি...চটপটে, শিক্ষিত, আর কত দয়ালু। বলতে পার, দলের প্রাণ ও আত্মা। কিন্তু একটু ভ্রষ্টচরিত্র, তার আত্মার শান্তি হোক! আমাব তো আশংকাই ছিল, একটা কিছু ঘটবে! স্তেপান!''

এভ্গ্রাফ কুজ্‌মিচ একজন সাক্ষীর দিকে ঘুরে বলল, ''এখনই আমার বাড়ি চলে যাও; আন্দ্রুশ্‌কাকে জেলা পুলিশের বড়বাবুর কাছে পাঠাবে; সে যেন ঘটনাটা রিপোর্ট করে! বলো, মার্ক আইভানভিচ খুন হয়েছে! আর কনেস্টবলের কাছে দ্রুত চলে যাবে—সেখানে বসে সে কি করছে? সে যেন এখানে চলে আসে। যত তাড়াতাড়ি পার গোয়েন্দা অফিসার নিকোলাই এর্মোলায়েভিচের কাছে যাবে; তাকে এখানে আসতে বলবে। দাঁড়াও, তাকে একটা চিঠি লিখে দেব।''

পুলিশের বড়বাবু বাড়িটার চারদিকে পাহারা বসাল, গোয়েন্দা অফিসারকে একটা চিঠি লিখল, তারপর ম্যানেজারের ঘরে গেল চা খেতে। প্রায় দশ মিনিট পরে তাকে দেখা গেল, টুলে বসে সযত্নে একটা মিষ্টিতে কামড় বসাচ্ছে, আর ফুটন্ত গরম চা খাচ্ছে।

সে সেকভকে বলছে, ''দেখলে তো! একজন ভদ্রমানুষ, ধনী... পুশ্‌কিনের ভাষায় বলা যায়, দেবতাদের প্রিয়, কিন্তু তাতে হলটা কি? কিচ্ছু না। সে মদ খেত, ব্যভিচার করত, আর...এখন চেয়ে দেখ...খুন হল।''

দু'ঘণ্টা পরে গোয়েন্দাপ্রবর পৌঁছে গেল। নিকোলাই এর্মোলায়েভিচ চুবিকভ (তার নাম) দীর্ঘকায়, সৌম্যদর্শন, বয়স প্রায় ষাট; সিকি শতাব্দী ধরে নিজের কাজ করছে। একজন সৎ, বুদ্ধিমান, উৎসাহী ও নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত বলে গোটা জেলার লোক তাকে জানে। সে ঘটনাস্থলে এল তার অপরিহার্য সঙ্গী, সহকারী ও সচিব দ্যুকোভ্‌স্কিকে সঙ্গে নিয়ে; বছর ছাব্বিশের একটি দীর্ঘকায় যুবক সে।

সেকভের ঘরে ঢুকে দ্রুত সকলের সঙ্গে করমর্দন করে চুবিকভ বলল, ''ভদ্রমহোদয়গণ, এটা কি হতে পারে? মার্ক আইভানভিচ খুন হয়েছেন? না, এটা অসম্ভব। অ-স-ম্ভ-ব!''

''আচ্ছা...'' এভ্গ্রাফ কুজ্‌মিচ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

''হা ঈশ্বর! এই তো গত শুক্রবারেও তারাবাংকোভোর মেলায় তার সঙ্গে দেখা হল! একসঙ্গে ভদ্‌কা খেলাম,...একথা শুনে কিছু মনে করবেন না।''

''আচ্ছা...'' এভ্‌গ্রাফ কুজ্‌মিচ আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সকলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আতংক প্রকাশ করল, এক গ্লাস করে চা খেল, আর তারপরে ঘটনাস্থলে গেল।

কনেস্টবল চেঁচিয়ে ভিড়ের লোকদের বলল, ''রাস্তা ছাড়!''

মহলে ঢুকে গোয়েন্দা অফিসার প্রথমেই শোবার ঘরের দরজাটা পরীক্ষা করল। পাইন কাঠের দরজা, হলুদ রং করা, একটা দাগও পড়ে নি।

তারা দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকার ব্যবস্থা করল। অনেক ধাক্কাধাক্কি, হাঁকাহাঁকির পরে কুড়ুল ও বাটালির আঘাতে দরজাটা ভেঙে পড়লে গোয়েন্দা অফিসার হেঁকে বলল, ''অনধিকারীরা দয়া করে পিছিয়ে দাঁড়ান! দয়া করে তদন্তের স্বার্থে...কনেস্টবল, কাউকে ঢুকতে দিও না!''

চুবিকভ, তার সহকারী এবং পুলিশের বড়বাবু দরজা খুলে একটু ইতস্তত করে একে একে শোবার ঘরে ঢুকল। নিম্নলিখিত দৃশ্যটি তাদের চোখে পড়ল। ঘরের একমাত্র জানালাটার ধারে একটা মস্তবড় পালকেব বিছানা। হাঁসের নরম পালকের কুঁচকানো গদীর উপর একটু ভাঁজ-ভাঙা, কুঁচকানো লেপ পড়ে আছে। সুতীর ওড়-পরানো বাঁকা-চোরা দুমড়ানো একটা বালিশ মেঝেতে পড়ে আছে। পাশের ছোট টেবিলের উপর আছে একটা রূপোর ঘড়ি ও একটা রূপোর বিশ কোপেকের মুদ্রা। একটা গন্ধক-বাতির বাক্সও ছিল। বিছানা, টেবিল ও একটিমাত্র চেয়ার ছাড়া শোবার ঘরে আর কোন আসবাব নেই। বিছানার নীচে তাকিয়ে বড়বাবুর চোখে পড়ল প্রায় দুই ডজন খালি বোতল, একটা পুবনো খড়ের টুপি ও এক বোতল ভদ্‌কা। টেবিলের নীচে ছিল ধূলোমাখা একটা বুট। গোয়েন্দা অফিসার ঘবের চারদিকটা দেখল, ভুরু কুঁচকালো, তার মুখটা লাল হয়ে উঠল।

''বদমাশের দল!'' ঘুষি পাকিয়ে সে বিড়বিড় কবে বলল।

দ্যুকভস্কি শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, ''কিন্তু মার্ক আইভানভিচ কোথায় গেলেন?''

কর্কশ গলায় চুবিকভ তাকে বলল, ''দয়া করে নাক গলাবে না! ভাল মানুষের মত মেঝেটা পরীক্ষা করে দেখ। আমার অভিজ্ঞতায় এ ধরনের ঘটনা এই দ্বিতীয়বার ঘটল এভ্‌গ্রাফ কুজ্‌মিচ,'' নীচু গলায় পুলিশেব বড় বাবুকে কথাগুলি বলল চুবিকভ। ''আঠারোশ'' সত্তরে অনুরূপ আর একটি ঘটনা আমার হাতে এসেছিল। কিন্তু তখন আপনার হয়তো মনে আছে... ব্যবসায়ী পোর্ত্রেতভ খুন হয়েছিল। তখনও এই একই ভাবে। দুর্বৃত্তরা তাকেও খুন করে দেহটাকে জানালা দিয়ে টেনে বের করেছিল...''

চুবিকভ জানালার কাছে গিয়ে পদাটা একপাশে সরিয়ে দিয়ে সাবধানে ফ্রেমটাকে ঠেলা দিল। জানালা খুলে গেল।

''এটা খুলে গেল, তার মানে এটা আটকানো ছিল না। হুম! জানালার গোবরাটে দাগ লেগে আছে। দেখতে পাচ্ছেন? একটা হাঁটুর দাগ। কেউ জানালা বেয়ে ভিতরে ঢুকেছিল। জানালাটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে।''

দ্যকভ্স্কি বলল, ''মেঝেতে বিশেষ লক্ষণীয় কিছু নেই। কোন দাগ নেই, আঁচড় নেই। পেয়েছি শুধু একটা সুইডিশ দেশলাইয়ের খালি বাক্স। এই সেটা! যতদূর মনে পড়ে, মার্ক আইভানভিচ ধূমপান করতেন না; প্রাত্যহিক প্রয়োজনে তিনি গন্ধকের দেশলাই ব্যবহার করতেন, সুইডেনের দেশলাই নিশ্চয় নয়। এই দেশলাইটাও একটা সূত্র হতে পারে।''

''আঃ, দয়া করে থাম তো!'' হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে গোয়েন্দা অফিসার বলল। ''উনি দেশলাই নিয়েই আছেন! হঠকারীদের আমি সহ্য করতে পারি না! দেশলাইয়ের খোঁজ ছেড়ে তুমি বরং বিছানাটা ভাল করে পরীক্ষা কর!''

বিছানা পরীক্ষা করে দ্যকভ্স্কি জানাল ঃ

''রক্তের দাগ বা অন্য রকমের কোন দাগ নেই। নতুন কোন ছেঁড়াও নেই। বালিশে দাঁতের দাগ। কম্বলে জলের দাগ; তাতে বিয়ারের গন্ধ ও স্বাদ। ... বিছানার অবস্থা দেখে মনে হয় তার উপর ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছিল।''

''লড়াইয়ের কথা বলতে তোমাকে বলি নি! সে কথার আমার দরকার নেই। লড়াইয়ের খোঁজ না করে তুমি বরং...''

''এখানে একটা বুট আছে, আর একটা পাওয়া যাচ্ছে না।''

''তার মানে কি?''

''বুট খোলার সময়ই তাকে গলা টিপে মেরে ফেলা হয়েছে। দ্বিতীয় বুট খোলার সময়ই পান নি...''

''ফুঃ! কি করে বুঝলে যে তাকে গলা টিপে মারা হয়েছে?''

''বালিশে দাঁতের দাগ রয়েছে। বালিশটাও দুমড়ানো-মোচড়ানো অবস্থায় বিছানা থেকে ছ' ফুট দূরে পাওয়া গেছে।''

''বাকসর্বস্ব! তুমি বরং বাইরে যাও। এখানে ঘুরঘুর্ না করে বাগানটা খুঁজে দেখ। তোমাকে ছাড়াই আমি এখানকার কাজটা চালিয়ে নিতে পারব।''

বাইরে গিয়ে তদন্তকারী প্রথমেই ঘাস পরীক্ষা করল। জানালার নীচের ঘাস মাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। দেয়ালের নীচে একটা কাঁটা গাছও পদদলিত। দ্যকভ্স্কি অনেক খুঁজে সেখানে কয়েকটা ভাঙা ডাল ও একটুকরো তুলো পেল। গাছের মাথায় পাওয়া গেল ঘন-নীল মোমের কয়েকটি সূক্ষ্ম গুছি।

''তার নতুন সুটের রং কি ছিল?'' দ্যকভ্স্কি জিজ্ঞাসা করল পিশেকভকে।

''হলুদ।''

''চমৎকার। তার মানে তারা নীল রংয়ের জামা পরেছিল।''

''কাঁটাগাছের কয়েকটা ডগা কেটে সযত্নে কাগজে মুড়ে রাখা হল। ঠিক তখনই জেলা পুলিশের বড়কর্তা আর্তসাইবাসেভ-স্বিস্তাকভ্স্কি, জেলা পুলিশের বড়কর্তা এবং ডাক্তার ত্যুত্যুয়েভ এসে হাজির হল। জেলা পুলিশের বড়কর্তা কুশল বিনিময় করেই নিজের কৌতূহল মেটানোর কাজ

শুরু করে দিল, কিন্তু ডাক্তার-লোকটি লম্বাটে, অত্যন্ত সরু, চোখ দুটি গর্তে-বসা, লম্বা নাক ও চোখা থুতনি—কারও সঙ্গে কুশল-বিনিময় করল না, কোন প্রশ্ন করল না, একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঃ

''সার্বরা আবার বিদ্রোহ করেছে! তারা কি যে চায় তাও বুঝি না! ওঃ, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রিয়া! এ সবই তোমার কাজ!''

বাইরে থেকে জানালাটা পরীক্ষা করে কিছুই পাওয়া গেল না ; কিন্তু জানালার নিকটবর্তী ঘাস ও ঝোপ পরীক্ষা করে তদন্তকারীরা অনেক দরকারী সূত্র পেয়ে গেল। যেমন, দ্যুকভ্স্কি ঘাসের উপর একটুকরো লম্বা কালো জায়গা পেয়ে গেল যেটা জানালা থেকে বেশ কয়েক গজ দূরে বাগানেব ভিতর পর্যন্ত চলে গেছে। জমিটা শেষ হযেছে লিলাক ফুলেব একটা ঝোপেব নীচে গাঢ়-বাদামী রংয়ের একটা বড় দাগেব মত হযে। সেই ঝোপের নীচেই পাওয়া গেল একপাটি বুট যার মাপ মত আর এক পাটি পাওয়া গিয়েছিল শোবার ঘরে।

দাগটা পরীক্ষা করে দ্যুক্ভস্কি বলল, ''এটা তো পুরনো রক্ত!''

''রক্ত'' কথাটা শুনেই ডাক্তার উঠে দাঁড়াল এবং হেলাফেলাভাবেই এক নজর দাগটার দিকে তাকাল।

বিড়বিড় করে বলল, ''হ্যাঁ, রক্তই বটে।''

বাঁকা চোখে দ্যুকভ্স্কির দিকে তাকিয়ে চুবিকভ বলল 'তার মানে তাকে গলা টিপে মারা হয় নি। যখন বক্ত পাওয়া যাচ্ছে।''

''তারা তাকে গলা টিপে খুন করেছে শোবার ঘবে, কিন্তু এখানে এসে, পাছে সে বেঁচে যায এই ভয়ে তাকে ধারালো কিছু দিয়ে আঘাত কবেছে। ঝোপের তলাকার দাগ দেখে মনে হয়, সেখানেই তিনি বেশ কিছু সময পড়েছিলেন, আর ততক্ষণ দুর্বৃত্তরা তাঁকে বাগান থেকে বেব কবে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছিল।''

''আর বুটটা?''

শুতে যাবার আগে বুট খোলার সময়ই তাকে খুন করা হয়েছিল, বুটটা আমাব সেই ধারণাকেই সমর্থন করছে। একটা বুট তিনি খুলে ফেলেছিলেন, অপরটা, যেটা এখানে পাওয়া গেল সেটা তিনি মাত্র অর্ধেক খুলেছিলেন। তারপর তাকে যখন টেনে নিয়ে যাচ্ছিল অথবা তিনি যখন পড়ে গিয়েছিলেন, তখনই অন্য পাটিটা আপনা থেকেই খুলে গিয়েছিল। ...''

চুবিকভ বিদ্রূপ করে বলল, ''কী বুদ্ধি! ওর কথা শোন! এই সব বাজে কচকচি কবে তুমি ছাড়তে শিখবে? এসব ছেড়ে তুমি বরং কিছু ঘাস ও রক্ত নিয়ে বিশ্লেষণ করলে ভাল কাজ হবে!''

তদন্ত শেষ করে জায়গাটার একটা মানচিত্র এঁকে নিয়ে সকলে ম্যানেজারের ঘরে ঢুকল একটা প্রতিবেদন লিখতে ও দুপুরের খাবার খেতে। খেতে খেতে তারা কথাবার্তা বলতে লাগল।

আলোচনার সূত্রপাত করে চুবিকভ বলল, "ঘড়ি, টাকা এবং অন্যান্য জিনিস... সব ঠিক আছে। কাজেই এটা দুই আর দুইয়ের মতই নিশ্চিত যে কোন লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে খুন করা হয় নি।"

"কিন্তু কাজটা করেছে একজন শিক্ষিত লোক", দ্যকভ্স্কি ফোড়ন কাটল।

"এ রকম অনুমান করার কারণ?"

"আমার স্বপক্ষে আছে এই সুইডিশ দেশলাইটা, এ রকম দেশলাইয়ের সঙ্গে স্থানীয় চাষীরা পরিচিত নয়। একমাত্র জমিদাররাই, তাও সকলে নয়, এ সব ব্যবহার করে থাকে। প্রসঙ্গত বলা যায়, অন্তত তিনজনে মিলে খুনটা করেছে, একজন নয়; দু'জন তাকে চেপে ধরেছে, অন্য জন তার শ্বাস রোধ করেছে। ক্লৌজভ শক্তিশালী লোক ছিলেন, খুনীরা অবশ্যই সেটা জানত।"

"ধর, সেই সময় তিনি যদি ঘুমিয়ে থাকতেন তহলে তাঁর গায়ের জোর কোন্ কাজে লাগত?"

"খুনীরা যখন তাকে চেপে ধরেছিল তখন তিনি বুট খুলছিলেন। তা যদি হয় তাহলে তখন তিনি ঘুমচ্ছিলেন না।"

"এই সব আবিষ্কার থামাও! তার চাইতে যেমন খাচ্ছ খেয়ে যাও!"

টেবিলের উপর সামোভারটা রাখতে রাখতে বাগানের মালী এফ্রেম মাঝখান থেকে বলে উঠল, " আমার মতে হুজুর, এই নোংরা কাজটা করেছে নিকোলাশকা, অন্য কেউ নয়।"

"সম্পূর্ণ সম্ভব," বলল সেকভ।

"এই নিকোলাশ্কাটা কে?"

এফ্রেম জবাব দিল, "মনিবের খাস চাকর হুজুর। সে ছাড়া আর কে হবে? পাজি লোক হুজুর! এত বড় মাতাল আর দুশ্চরিত্র যে ভাবা যায় না! সেই তো বরাবর মনিবকে ভদ্কা এনে দিত, আর সেই তাকে বিছানায় শুইয়ে দিত। সে ছাড়া আর কে? তাছাড়া, আরও একটা কথা সাহস করে হুজুরের কাছে নিবেদন করতে চাই ঃ শুঁড়িখানায় বসে সেই তো আস্ফালন করে বলেছিল, মনিবকে খুন করবে, এ সবই তো ঘটেছে আকুল্কার জন্য, একটা মেয়েমানুষের জন্য। সেই তো সৈনিকের বৌকে রেখেছিল... মনিবের নজরও পড়ল তার উপর, তাকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। আর নিকোলাশ্কা...সেও অবশ্য রেগে গিয়েছিল। এখন তো সে মদ খেয়ে রান্নাঘরে পড়ে আছে। কান্নাকাটি করছে। এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন মনিবের জন্য তার দুঃখের শেষ নেই..."

সেকভ বলল, "সত্যি, আকুল্কার উপর রাগ হতেই পারে। সে একজন সৈনিকের বৌ, চাষীর মেয়ে, কিন্তু...মার্ক আইভানভিচ যে তাকে "নানা" বলতেন সেটাও ঠিক। তার মধ্যে "নানা"-র কিছু কিছু ভাব ছিল। খুবই আকর্ষণীয়া..."

লাল রুমালে নাকটা ঝেড়ে গোয়েন্দা অফিসার বলল, "আমি তাকে

দেখেছি। আমি জানি।''

দ্যুকভ্স্কি লজ্জায় লাল হয়ে চোখ নামিয়ে নিল। পুলিশের বড়বাবু চায়ের প্লেটের উপর আঙুল ঠুকে বাজাতে শুরু করল। তার উপরওয়ালা কাশতে শুরু করল, আর কোন কারণে হাতটাকে পোর্টফোলিওর ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। আকুল্কা এবং নানার নাম উল্লেখ করাতে একমাত্র ডাক্তারেরই কোন ভাবান্তর ঘটল না। গোয়েন্দাটি নিকোলাশ্কাকে ডেকে পাঠাল।

একটি চাষাড়ে চেহারার যুবক সেকভের ঘরে ঢুকে নত হয়ে গোয়েন্দা অফিসারকে অভিবাদন করল। তার দাগভর্তি লম্বা নাক, ফাঁকা বুক, আর পরনে মনিবের ফেলে-দেওয়া জামা। মুখে ঘুম-ঘুম ভাব, চোখের জলের স্পষ্ট দাগ। পাড় মাতাল অবস্থা, সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছিল না।

''তোমার মনিব কোথায়?'' চুবিকভ প্রশ্ন করল।

''তিনি খুন হয়েছেন হুজুর!''

এই কথা বলেই নিকোলাশ্কা চোখ পিটপিট করে কাঁদতে শুরু করল।

''আমরা জানি খুন হয়েছেন। কিন্তু এখন তিনি কোথায়? তাঁর দেহটা কোথায়?''

''সকলে বলছে তাঁকে জানালা দিয়ে টেনে নিয়ে বাগানে কবর দেওয়া হয়েছে।''

''হুম! দেখছি তদন্তের ফলাফল এরই মধ্যে রান্নাঘরেও পৌঁছে গেছে! মারাত্মক ব্যাপার! কিন্তু বাছা, যে রাতে তোমার মনিব খুন হন তখন তুমি কোথায় ছিলে? অর্থাৎ শনিবারে?''

নিকোলাশ্কা মাথা খাড়া করে বকের মত গলাটা বাড়িয়ে অনেক চিন্তা করল।

তারপর বলল, ''আমি জানি না হুজুর। মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে ছিলাম, কিছুই মনে পড়ছে না।''

দাঁত খিঁচিয়ে হাত ঘষতে ঘষতে দ্যুকভ্স্কি ফিসফিসিয়ে বলল, ''এলিবাই!''

''বটে। মনিবের জানালার নীচে রক্ত কেন?''

মাথাটা পিছনে ঝাঁকিয়ে নিকোলাশ্কা ভাবতে লাগল।

''তাড়াতাড়ি ভাব,'' জেলা পুলিশের বড়বাবু বলল।

''একটু সবুর করুন। রক্তটা কোন ব্যাপারই নয় হুজুর। আমি একটা মুরগিকে জবাই করছিলাম। যথারীতি জবাই করছি এমন সময় সেটা এক লাফে আমার হাত থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। তাহলে বুঝুন রক্তটা এল কোথা থেকে।''

এফ্রেম বলল, ''নিকোলাশ্কা নানা জায়গাতেই মুরগি জবাই করে থাকে একথা ঠিক, কিন্তু কেউ কখনও দেখে নি যে একটা আধমরা মুরগি বাগানময় ছুটে বেড়ায়। অবশ্য কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না।''

''এলিবাই'', দ্যুকভ্স্কি নাক সিঁটকে বলল। ''আর কী বাজে এলিবাই।''

"তুমি আকুল্‌কাকে চিনতে ?"

"চিনতাম।"

"মনিব কি তোমার কাছ থেকে তাকে ফুস্‌লে নিয়েছিলেন ?"

"না। আমার কাছ থেকে আকুল্‌কাকে ভাগিয়ে নিয়েছিলেন উনি, মিস্টার সেকভ, আইভান মিখাইলভিচের কাছ থেকে। আসল ঘটনা এটাই।"

সেকভ নিজের বাঁ চোখটা ঘষতে শুরু করল।

দ্যুক্‌ভস্কি কড়া চোখে তার দিকে তাকাল ; বুঝতে পারল সে বিব্রত বোধ করছে ; আঁতকে উঠেছে। এতক্ষণে তার খেয়াল হল, ম্যানেজারের পরনে গাঢ় নীল রঙের ট্রাউজার। এটা সে আগে লক্ষ্য করে নি। ট্রাউজার দেখেই তার মনে পড়ে গেল কাঁটাগাছের উপরে পাওয়া নীল সুতোর কথা। চুবিকভও সন্দেহের চোখে সেকভের দিকে তাকাল।

নিকোলাশ্‌কাকে বলল, "তুমি যেতে পার। আর মিঃ পিসেকভ যদি অনুমতি করেন তো আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি অবশ্যই শনিবারে এবং রবিবারের আগের রাতটা এখানেই ছিলেন ?"

"হ্যাঁ, দশটার সময় মার্ক আইভানভিচের সঙ্গে রাতের খাবার খেয়েছি।"

"আর তারপরে ?"

সেকভ বিব্রতভাবে উঠে দাঁড়াল।

তো-তো করে বলতে লাগল, "তারপর...তারপর...আসলে, আমার মনে পড়ছে না। সেই সময়ে প্রচুর মদ খেয়েছিলাম...কোথায় বা কখন শুতে গিয়েছিলাম তাও মনে নেই...আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে আছেন কেন ? ঠিক যেন খুনটা আমিই করেছি !"

"ঘুমটা ভেঙেছিল কোথায় ?"

"ঘুম ভেঙেছিল চাকরদের রান্নাঘরের স্টোভের টেবিলের উপর। এ কথা সকলেই সমর্থন করবে। কেমন করে সেখানে গিয়েছিলাম তা মনে নেই।"

"এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? আপনি আকুল্‌কাকে চিনতেন ?"

"মোটামুটি।"

"সে কি ক্লৌজভের জন্য আপনাকে ছেড়েছিল ?"

"হ্যাঁ। এফ্রেম, আরও ছত্রক দাও তো। এতগ্রাফ কুজমিচ, চা ?"

প্রায় পাঁচ মিনিট একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। দ্যুকভ্‌স্কি একটা কথাও বলল না ; সেকভের বিবর্ণ মুখের উপর থেকে মর্মভেদকারী দৃষ্টিও সরাল না। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল গোয়েন্দা অফিসার।

বলল, "বড় বাড়িতে গিয়ে মৃতের বোন মারিয়া আইভান্‌ভনার সঙ্গে কথা বলা দরকার। তিনি আমাদের কিছু সূত্র দিতে পারেন।"

ভোজের জন্য গৃহস্বামীকে ধন্যবাদ জানিয়ে চুবিকভ ও তার সহকারী জমিদার বাড়িতে ঢুকল। সেখানে দেখতে পেল, পঁয়তাল্লিশ বছরের কুমারী মারিয়া আইভানভ্‌না পারিবারিক বিগ্রহের সামনে প্রার্থনা করছে। হাতে পোর্টফোলিও ও মাথায় ব্যাজ-আঁটা টুপি। অতিথিদের দেখে মহিলার মুখ

কালো হয়ে গেল।

সপ্রতিভ চুবিকভ গোড়ালি ঘষতে ঘষতে বলতে শুরু করল, ''আপনার পবিত্র ভাবকে ভঙ্গ করলাম বলে প্রথমেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনার সমীপে কিছু নিবেদন করার আছে। ইতিমধ্যেই আপনি অবশ্যই শুনেছেন...সকলেরই সন্দেহ যে আপনার ভাইকে খুন করা হয়েছে। আপনি তো বোঝেন সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। কি জার আর কি রাখাল বালক, মৃত্যুকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না। কোনরকম ইঙ্গিত বা ব্যাখ্যার দ্বারা আপনি কি আমাদের সাহায্য করতে পারেন?''

আরও বিবর্ণ হয়ে মুখটাকে দুই হাতে ঢেকে মারিয়া আইভানভ্না বলল, ''ওঃ, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি কিছুই বলতে পারব না। কিচ্ছু না! আমি আপনাদের মিনতি করছি! এমন কিছুই নেই যা আমি... আমি কি করতে পারি। ওঃ, না, না...আমার ভাই সম্পর্কে একটা কথাও নয়! কিছু বলার আগেই যেন আমার মৃত্যু হয়!''

মারিয়া আইভানভ্না কাঁদতে কাঁদতে পাশের ঘরে চলে গেল। তদন্তকারীরা দৃষ্টি বিনিময় করল, ঘাড় ঝাঁকুনি দিল, এবং ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বড় বাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্যুকভ্স্কি ধিক্কার জানিয়ে বলে উঠল, ''হায় নারী জাতি! স্পষ্টতই উনি কিছু জানেন, আর সেটা চেপে গেলেন। তার মুখে অবশ্যই কিছু লেখা ছিল। অপেক্ষা কর শয়তানরা! সব কথা আমরা টেনে বের করব!''

সেদিন সন্ধ্যায় চুবিকভ ও তার সহকারী ম্লান চাঁদের আলোয় বাড়ি ফিরছিল; দুই চাকার গাড়িতে বসে তারা মনে মনে সারা দিনের কাজের হিসাব কষছিল, দু'জনই ক্লান্ত, নিশ্চুপ। পথ চলতে চলতে কথা বলাটা চুবিকভ পছন্দ করে না, আর বাকসর্বস্ব দ্যুকভ্স্কি বুড়ো মানুষটার জন্যই মুখ বুজে ছিল। অবশ্য যাত্রা শেষ হবার পরে সহকারীটি আর চুপ করে থাকতে পারল না।

সে বলে উঠল, ''ঐ নিকোলাস্কা এ ব্যাপারে জড়িত আছেই; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার কুৎসিত মুখটা দেখলেই বোঝা যায় সে কোন্ কিসিমের খরিদ্দার। ...তার এলিবাই থেকেই সে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। আর এ ব্যাপারে সেও যে আসল মাথা নয় সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। সে তো একটা বোকা, ভাড়াটে গুণ্ডা মাত্র। আর এ ব্যাপারে সেকভের ভূমিকা তুচ্ছ নয়। গাঢ় নীল ট্রাউজার, বিব্রত ভাব, খুনের পরে ভয়ে স্টোভের টেবিলের উপর শুয়ে থাকা, তার এলিবাই, আর আকুল্কা।''

''বোকার মত কথা বলো না! তোমার মতে, আকুল্কাকে যে চিনত সেই খুনী? ওহে মাথা গরম! তোমার কাজ খুকুমণির মত দুধ খাওয়া, অপরাধের তদন্ত করা নয়। তুমিও তো আকুল্কার পিছনে ছুটেছ; তার অর্থ কি এই যে তুমিও এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত?''

''আকুল্কাও তো এক মাসের মত আপনার বাড়িতে বাস করেছে রাঁধুনি হিসাবে, কিন্তু আমি তো কিছু বলছি না। সেই শনিবার সন্ধ্যায় আমি আপনার সঙ্গে তাস খেলেছি, আপনাকে দেখেছি ; না হলে তো আপনাকেও সন্দেহ করতাম.। না মশায়, মেয়েছেলের ব্যাপারটাই বড় কথা নয়। আসল কথা হল নীচ, নোংবা পাশবিক অনুভূতি...একটি লাজুক যুবক চায় না যে কেউ তাব উপর টেক্কা মেরে যাক। অহংকার বুঝলেন...সে প্রতিহিংসা নিতে চায়। তারপর...ঐ দুটি পুরু ঠোঁটই তো কামুকতার জোরদার লক্ষণ। সে যখন ''নানা''র সঙ্গে আকুল্কার তুলনা করছিল তখন সে কি ভাবে ঠোঁট চাটছিল সেটা মনে আছে কি? ঐ হতভাগা লোকটা যে কামনার দাস সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে আমরা পাচ্ছি আহত অহংকার ও অতৃপ্ত কামনা। একটা খুনের পক্ষে সেই 'মোটিভ'টাই তো যথেষ্ট। দু'জনকে তো ধরতে পেরেছি ; কিন্তু তৃতীয় জনটি কে? নিকলাশ্কা সেকভ শিকারকে চেপে ধরেছিল কিন্তু তার শ্বাসবোধ করেছিল কে ; সেকভ ভীতু, লাজুক ও ভীরু। নিকলাশ্কা একটা বালিশ দিয়ে কারও শ্বাসরোধ করতে পারে না ; তার মত লোক একটা কুড়ুল বা মুগুর ব্যবহার করে থাকে।...সে কাজটা করেছে কোন তৃতীয় ব্যক্তি, কিন্তু সে কে?''

দ্যকভ্স্কি টুপিটাকে চোখের উপর নামিয়ে ভাবতে লাগল। গাড়িটা তদন্তকারী গোয়েন্দার বাড়িতে পৌঁছনো পর্যন্ত সে চুপ করে বসে থাকল।

বাড়িতে ঢুকে কোটটা খুলেই সে বলে উঠল, ''ইউরেকা! ইউরেকা! নিকলাই এর্মোলায়েভিচ! এ কথাটা আগে কেন যে মনে আসে নি তা তো আমি ভাবতেই পারছি না। আপনি কি জানেন তৃতীয় লোকটি কে ছিল?''

''দয়া কবে ওসব ভুলে যাও। খাবার প্রস্তুত! বসে খেতে শুরু কর!''

দু'জন খেতে বসল। দ্যকভ্স্কি এক গ্লাস ভদ্কা ঢেলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর চোখ দুটি চক্চক্ করে বলল ঃ

''আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, যে তৃতীয় ব্যক্তিটি শয়তান সেকভের সঙ্গে ছিল এবং যে শিকারের শ্বাসরোধ করেছিল সে একটি নারী! হ্যাঁ! আমি নিহত লোকটির বোন মারিয়া আইভানভ্নার কথা বলছি।''

ভদ্কায় চুমুক দিতে দিতে চুবিকভ স্থির দৃষ্টিতে দ্যকভ্স্কির দিকে তাকাল।

''তুমি.. তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ? তোমার কি মাথা ধরেছে?''

''আমি ভাল আছি। বেশ তো, তাহলে ধরুন আমার ভুলই হয়েছে— সে ক্ষেত্রে আমাদের উপস্থিতিতে তার বিব্রত ভাবটাকে আপনি কি ভাবে ব্যাখ্যা কববেন? তাব সাক্ষী দেবার অনিচ্ছাটাকেই বা আপনি কি ভাবে ব্যাখ্যা করবেন? যদি ধরেই নেই যে এ সব খুটিনাটির ব্যাপার—বেশ। ঠিক আছে! তাদেব সম্পর্কটার কথা মনে আছে তো? মহিলাটি পুরাতনপন্থী ধর্মবিশ্বাসী, কিন্তু লোকটি তো পাষণ্ড, লম্পট। সেখানেই তো ঘৃণার জন্ম। লোকে বলে, লোকটি মহিলাকে ভাল করেই বোঝাতে পেরেছিল যে সে শয়তানের দোসর।

মহিলার উপস্থিতিতেই সে প্রেতবাদের অনুশীলন করত।''

''বেশ তো, তাতে কি হল?''

''বুঝতে পারছেন না! প্রাচীনপন্থী ধর্মবিশ্বাসী মহিলাটি ধর্মীয় গোড়ামির জন্যই তাকে খুন করেছেন! তিনি যে কেবল ধর্মপথের একটি কাঁটা, একটি লম্পটকে শেষ করেছেন তাই নয়, একটি যীশুবিরোধী মানুষের হাত থেকে তিনি পৃথিবীটাকে রক্ষা করেছেন—আর তিনি মনে করেন এটাই তাঁর কর্তব্য, তাঁর ধর্ম-কার্য! ওঃ, এই বয়স্কা কুমারী, এই প্রাচীনপন্থীদের আপনি চেনেন না! দস্তয়েভ্স্কি পড়ুন! আর লেস্‌কভ ও পেচেরেস্কি কি লিখেছেন...তিনিই আসল লোক, অতএব আমাকে সাহায্য করুন! তিনিই ভাইয়ের গলা টিপে তাকে খুন করেছেন! ওঃ, শয়তানী! আমরা যখন ভিতরে ঢুকলাম তখন আমাদের চোখে ধূলো দিতেই কি তিনি বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন না? আমি এখানে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে থাকি, তাহলেই ওরা ভাববে যে আমি স্বাভাবিক অবস্থাতেই আছি, তারা যে আসবে সেটা আমি জানিই না! উঠ্‌তি অপরাধীদের এটাই তো চাল। প্রিয় নিকলাই এর্মোলায়েভিচ! বন্ধু আমার। এই মামলাটা আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি নিজে এটা আগাগোড়া দেখতে চাই! এটা আমি শুরু করছি, আমিই শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাব!''

চুবিকভ মাথা নেড়ে ভুরু কোঁচকাল।

বলল, ''আমার সমস্যার সমাধান করতে আমি জানি। আর অবাঞ্ছিতভাবে নাগ গলানোটা তোমার কাজ নয়। যা বলল তাই করবে—সেটাই তোমার কাজ!''

দ্যুকভ্স্কি রেগে আগুন হয়ে সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

তার গমন-পথের দিকে তাকিয়ে চুবিকভ বলল, ''খুব চালাক, বাস্কেল! কেবল একটু বেশী উত্তেজনাপ্রবণ। মেলা থেকে উপহার হিসাবে একটি সিগারেট-কেস তাকে কিনে দিতে হবে।''

পরদিন সকালে ক্লৌজভ্কা থেকে তদন্তকারী গোয়েন্দার কাছে এনে হাজির করা হল বড় মাথা ও খরগোসের মত ঠোঁটওয়ালা একটি যুবককে। নিজেকে মেষপালক দানিল্‌কা বলে পরিচয় দিয়ে সে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্যও জানাল।

বলল, ''আমি খুব মাতাল হয়ে পড়েছিলাম। মাঝরাত পর্যন্ত এক ভাইয়ের সঙ্গে জেগে ছিলাম। বাড়ি ফেরার পথে সাঁতার কাটতে নদীতে নামলাম। সাঁতার কাটতে কাটতেই দেখলাম ঃ দুটো লোক একটা কালো জিনিসকে বহন করে বাঁধটা পার হচ্ছে। চেঁচিয়ে ডাকলাম ''হেই!'' তারা ভয় পেয়ে মাকারেভের ফল-বাগানের দিকে ছুটে গেল। তারা যাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তিনি যদি মনিব না হন তো ঈশ্বর আমাকে মেরে ফেলুন!''

সেদিন সন্ধ্যার আগেই সেকভ ও নিকলাশ্‌কাকে গ্রেপ্তার করে পাহারা সঙ্গে দিয়ে জেলা শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানে তাদের কারাগারে রাখা হল।

॥ ২ ॥

বারো দিন পার হয়ে গেল।

সকালবেলা। গোয়েন্দা নিকলাই এর্মোলায়েভিচ নিজের বাড়িতে একটা সবুজ ডেস্কের পাশে বসে 'ক্লৌজভ মামলা''র নথিপত্র ওল্টাচ্ছিল। দ্যুকভস্কি খাঁচায় বন্দী নেকড়ের মত অশান্তভাবে পায়চারি করে চলেছে।

ছোট দড়িটা টানতে টানতে সে উত্তেজিতভাবে বলল, ''আপনি তো নিকলাশকা ও স্কেভের অপরাধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। মারিয়া আইভানভনাই যে দোষী সেটা আপনি বিশ্বাস করতে চাইছেন না কেন? যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ কি আপনি পান নি?''

''আমি তো বিশ্বাস করছি না তা বলি নি। আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু যে কারণেই হোক, এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। সত্যিকারের প্রমাণ যাকে বলে সেটা নেই, যা আছে সেটা এক রকমের দার্শনিক কথা—ধর্মীয় গোড়ামির মত কিছু।

' একটা কুড়ুল এবং রক্তমাখা কাপড় না হলে বুঝি আপনার চলে না। উকিলের দল! যে করেই হোক, এটা আমি প্রমাণ করবই। তখন আপনি ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক দিকটাকে হাল্কা করে দেখাটা বন্ধ করতে বাধ্য হবেন। আপনার মারিয়া আইভানভনাকে সাইবেরিয়ায় যেতেই হবে। আমি এটা প্রমাণ করে দেবই। দার্শনিক তত্ত্ব যদি আপনার কাছে যথেষ্ট না হয় তাহলে বাস্তব প্রমাণই দেব। আপনাকে দেখিয়ে দেব আমার দর্শনশাস্ত্র কত সঠিক। একবার আমাকে জেলাটা ঘুরে আসতে দিন।''

''তুমি কি বলতে চাও? এ সবের অর্থ কি?''

''একটা সুইডিশ দেশলাই ভুলে গেছেন? আমি ভুলি নি। নিহত লোকটির ঘরে কে এটা জ্বালিয়েছিল তা আমি খুঁজে বের করবই। নিকলাশকা বা স্কেভ দেশলাই জ্বালায় নি, কারণ তল্লাসীর সময় তাদের কাছে দেশলাই পাওয়া যায় নি, দেশলাই জ্বালিয়েছিল কোন তৃতীয় ব্যক্তি, অর্থাৎ মারিয়া আইভানভনা। আমি এটা পমাণ করবই! আমাকে শুধু জেলাটা ঘুরে আসতে দিন, তাহলেই আমি খুঁজে পাব।''

''ঠিক আছে, তাহলে বসে পড় আমরা জেরার কাজ চালিয়ে যাই।''

দ্যুকভস্কি টেবিলের পিছনে বসে নিজের লম্বা নাকটাকে নথিপত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দিল।

গোয়েন্দা হাঁক দিল 'নিকলাই তেতেখভকে হাজির কর।''

হাজির করা হল নিকলাশকাকে। বিবর্ণ, আঁচড়ার মত সরু লোকটার সারা শরীর কাঁপছে।

চুবিকভ শুরু করল, ''তেতেখভ! আঠারো শ' উনআশী সালে প্রথম সেক্টরের ম্যাজিস্ট্রেট তোমাকে চুরির অপরাধে দণ্ডিত করে কারাগারে পাঠিয়েছিলেন। আঠারো শ' বিরাশী সালে চুরির অভিযোগে আবার তোমার বিচার হয় এবং শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার তুমি কারারুদ্ধ হও .আমরা সব জানি।

নিকলাশ্‌কার মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়-রেখা। গোয়েন্দার সর্বজ্ঞতা তাকে বাক্যহারা করে দিয়েছে। কিন্তু অচিরেই বিস্ময়ের বদলে সেখানে দেখা দিল গভীর দুঃখের আভাষ। সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। হাত-মুখ ধুয়ে একটু শান্ত হয়ে আসার জন্য অনুমতি চাইল। তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল।

"সেকভকে হাজির কর!" গোয়েন্দা হুকুম করল।

সেকভকে হাজির করা হল। গত কয়েক দিনেই যুবকটির মুখমণ্ডলের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তাকে সংকুচিত, বিবর্ণ ও ছন্নছাড়া দেখাচ্ছে। দুই চোখে ফুটে উঠেছে গভীর উদাসীনতা।

চুবিকভ বলল, "বস সেকভ। আশা করি আজ তুমি সুবুদ্ধির পরিচয় দেবে, আগেকার মত মিথ্যা বলবে না। এ কয়দিন ক্লৌজভের খুনের সঙ্গে তোমার জড়িত থাকাটাকে তুমি অস্বীকার করেছ। এটা বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। দোষ স্বীকার করলে তার গুরুত্ব হ্রাস পায়। এই শেষ বারের মত তোমার সঙ্গে আমি কথা বলছি। আজ যদি অপরাধ স্বীকার না কর তাহলে কাল কিন্তু অনেক দেরী হয়ে যাবে। এস, না। সব কথা আমাদের বল।"

"আমি কিছুই জানি না।...আর সাক্ষী বলতে আপনি কি বোঝেন তাও জানি না," সেকভ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল।

"এ সব বলে কোন লাভ নেই! বেশ, তাহলে কেমন করে এটা ঘটল তা আমাকেই বলতে দাও। শনিবার সন্ধ্যায় তুমি ক্লৌজভের শোবার ঘরে বসে তার সঙ্গে ভদ্‌কা ও বিয়ার খাচ্ছিলে।" (দুকভ্‌স্কি স্থির দৃষ্টিতে সেকভের দিকে তাকিয়ে রইল; সমস্ত একক কথার মধ্যে একবারও সে দৃষ্টি সরিয়ে নিল না) "নিকলাই তোমাদের পরিচর্যা করছিল। মাঝ রাতের পরে মার্ক আইভানভিচ জানালেন এবার তিনি ঘুমুতে যাবেন। তিনি বরাবরই বারোটা থেকে একটার মধ্যে শুতে যান। তিনি যখন বুট খুলতে খুলতে তোমাকে গোলাবাড়ি সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছিলেন তখন পূর্বনির্দিষ্ট সংকেত মাত্রই তুমি ও নিকলাই তোমাদের মাতাল মনিবকে চেপে ধরে বিছানায় ফেলে দিলে। একজন বসলে তাঁর পায়ের উপর, অপরজন মাথার উপর। সেই মুহূর্তে হল থেকে এগিয়ে এল কালো পোশাক-পরা একটি স্ত্রীলোক; তাকে তোমরা চেন; এই পাপ কাজে তার ভূমিকা সম্পর্কেও আগেই তোমাদের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়েছিল। সে একটা বালিশ তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে তার শ্বাস বন্ধ করার চেষ্টা শুরু করল। ধস্তাধস্তির ফলে মোমবাতিটা নিভে গেল। স্ত্রীলোকটি তার পকেট থেকে একটা সুইডিশ দেশলাই বের করে মোমবাতিটাকে আবার ধরাল। তাই তো? তোমার মুখই বলে দিচ্ছে যে আমি সত্যি কথাই বলছি। কিন্তু যা বলছিলাম, তার শ্বাসরোধ করে যখন বুঝলে যে তার নিঃশ্বাস পড়ছে না তখন তুমি এবং নিকলাই তাকে জানালার ভিতর দিয়ে টানতে টানতে কাটাগাছের কাছে ফেলে রাখলে। পাছে তিনি বেঁচে ওঠেন এই ভয়ে একটা ধারালো কিছু দিয়ে তাকে আঘাত করলে। তারপর তাঁকে বয়ে নিয়ে একটা

লিলাক-ঝোপের কাছে কিছু সময়ের জন্য শুইয়ে দিলে। একটু বিশ্রাম করে কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে তোমরা তাঁকে তুলে নিলে। বেড়ার উপর দিয়ে তাঁকে বইলে। তারপর রাস্তা ধরে হাঁটিতে শুরু করলে। তারপরেই এল বাঁধটা। সেটার কাছে যেতেই জনৈক কৃষকের হাঁক শুনে তোমরা ভয় পেলে। কিন্তু তোমার হল কি?''

কাগজের মত সাদা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই সেকভ টলতে লাগল।

বলল, ''আমি শ্বাস টানতে পারছি না! ঠিক আছে...তাই হোক। শুধু আমি একবার বাইরে যাব। দয়া করুন।''

সেকভকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল।

আরাম করে আড়মোড়া ভেঙে চুবিকভ বলল, ''শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছে! একেবারেই ভেঙে পড়েছে! কেমন পরিষ্কার ধরে ফেললাম। ওকে একেবারে কব্জা করে ফেলেছিলাম...''

দ্যুকভস্কি হেসে বলল, ''আর কালো পোশাক-পরা স্ত্রীলোকটির কথাও সে অস্বীকার করে নি! কিন্তু ওই সুইডিশ দেশলাইটা নিয়েই গোলমালে পড়েছি। ওটাকে আর সহ্য করতে পারছি না। নমস্কার, আমি চললাম!''

দ্যুকভস্কি টুপিটা পরে গাড়ি হাঁকিয়ে দিল। চুবিকভ আকুল্কাকে জেরা শুরু করল। সে জানাল, কোন ব্যাপারেই সে কিছু জানে না।...

''আমি কেবল তোমার কাছেই থেকেছি, আর কারও কাছে নয়!'' আকুল্কা বলল।

সেদিন সন্ধ্যা পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যেই দ্যুকভস্কি ফিরে এল। সে আগেকার চাইতে অনেক বেশী উত্তেজিত। তার হাত দুটো এমনভাবে কাঁপছে যে কোটের বোতামই খুলতে পারছে না। গাল দুটি লাল হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট বোঝা গেল, সে নতুন কোন খবর নিয়ে এসেছে।

এক দৌড়ে চুবিকভের ঘরে ঢুকে একটা হাতল-চেয়ারে ধপাস করে বসে বলে উঠল, ''ভেনি, ভিডি, ভিচি! (এলাম, দেখলাম, জয় করলাম! --লাতিন) আমার সম্মানের নামে শপথ করে বলছি, নিজের প্রতিভার উপর আমার বিশ্বাস বেড়ে যাচ্ছে। শুনুন, আপনি গোল্লায় যাচ্ছেন! বুড়ো বাবু, শুনুন আর অবাক হোন! ব্যাপারটা যেমন মজার, তেমনই দুঃখের। আপনি তো ইতিমধ্যেই তিনজনকে হাতের মুঠোয় পেয়েছেন, কি তাই তো? আচ্ছা, আমি এক চতুর্থ জনকেও পেয়েছি, আর সেও একটি স্ত্রীলোক। আর সে কী স্ত্রীলোক! শুধু তার কাঁধে হাত বুলাবার জন্য আমার জীবনের দশটা বছর আমি দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু মন দিয়ে শুনুন! আমি ক্লৌজভ্কায় গিয়েছিলাম এবং তার চারপাশে কেবলই চরকির মত ঘুরেছি। পথে যত দোকানপাট, শুঁড়িখানা ও সরাইখানা পেয়েছি সর্বত্র ঢুঁ মেরেছি আর সুইডিশ দেশলাইয়ের খোঁজ করেছি। সর্বত্র সকলেই 'না' বলে দিয়েছে। এই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে ঘুরেছি। বিশবার সব আশা ছেড়েছি, আবার বিশবারই নতুন করে আশা করেছি। সারাটা দিন চারদিকে ঘুরে বেড়িয়েছি,

আর মাত্র একটা ঘণ্টা আগে যার সন্ধানে ফিরেছি তারই দেখা পেয়েছি! এখান থেকে তিন ভার্স্ট দূরে। তারা আমাকে দশটা বাক্সের একটা প্যাকেট দিল। একটা বাক্স তাতে ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে : 'সে বাক্সটা কে কিনেছিল?' 'অমুক'। 'মহিলাটির সেটা অবশ্যই চাই। তিনি নাকি বলেছেন, ওটার কাঠিগুলো থেকে একটা মজার শব্দ বের হয়।' প্রিয় মহাশয়! নিকলাই এর্মোলায়েভিচ! আজ থেকে নিজের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল! হিউ! চলুন, যাওয়া যাক!''

''কোথায়?''

''চতুর্থ সঙ্গিনীর কাছে...খুব তাড়াতাড়ি যেতে হবে, অন্যথায়...আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছি না! আপনি কি জানেন তিনি কে? আপনি ভাবতেই পারবেন না! আমাদের পুলিশের বড়বাবু বুড়ো প্রভ্গ্রাফ কুজ্মিচের তরুণী ভার্যা! ওল্গা পেত্রভ্না! তিনিই দেশলাইয়ের বাক্সটা কিনেছিলেন!''

''তুমি...তুমি...তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?''

''আমার মাথা ঠিকই আছে। প্রথম, তিনি ধূমপান করেন। দ্বিতীয়, ক্লৌজভের প্রেমে তিনি একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। আকুল্কা নামক একজনের প্রতি নিজের ভালবাসাকে তিনি বাতিল করে দিয়েছিলেন। প্রতিহিংসা! এখন মনে পড়ছে, তার রান্নাঘরের পর্দার পিছনে একবার দু'জনকে দেখেছিলাম। মহিলা তাকে ভালবাসা জানাচ্ছিলেন, আর ভদ্রলোক তার দেওয়া সিগারেট খেয়ে তার মুখেই ধোঁয়া ছাড়ছিলেন। যাই হোক, এখন চলুন। খুব শিগগির, অন্ধকার হয়ে আসছে। চলুন!''

''একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী তুচ্ছ মানুষের জন্য এত রাতে একটি ভদ্র মেয়েছেলেকে বিরক্ত করব ততটা পাগল আমি এখনও হই নি।''

''ভদ্র! আপনি দেখছি গোয়েন্দা নন, একটি দুর্বল প্রাণী! আগে কখনও আপনাকে অপমান করার সাহস আমার হয় নি, কিন্তু এখন সে কাজটা করতে আপনি আমাকে বাধ্য করছেন! দুর্বল! ফাঁকিবাজ! সত্যি, প্রিয় নিকলাই এর্মোলায়েভিচ! দয়া করুন!''

গোয়েন্দা অসম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে থুথু ফেলল।

''দোহাই আপনার! আমার জন্য নয়, ন্যায় বিচারের খাতিরে! আমি আপনাকে মিনতি করছি! সারা জীবনে এই একটিবার আমার প্রতি দয়া করুন!''

দ্যুকভ্স্কি নতজানু হল।

''নিকলাই এর্মোলায়েভিচ! দয়া করুন! সেই স্ত্রীলোকটির সম্পর্কে আমি যদি ভুল করে থাকি তাহলে আমাকে শয়তান বলবেন, অকর্মার ধাড়ি বলবেন। কী একটা ঘটনা! কী একটা ঘটনা! ঘটনা নয়, একটা রোমান্স! সারা রাশিয়াতে এর খ্যাতি ছড়িয়ে যাবে! আপনি বিশেষ গোয়েন্দা পদে উন্নীত হবেন! যুক্তিহীন বৃদ্ধ, আমাকে বুঝতে চেষ্টা করুন!''

গোয়েন্দা ভুরু কুঁচকে টুপিটার জন্য হাত বাড়াল।

''তুমি গোল্লায় যাও।'' সে বলল, ' এবার যাওয়া যাক।''

গোয়েন্দার দুই চাকার গাড়ি যখন পুলিশের বড়বাবুর গাড়িবারান্দায় ঢুকল তখন অন্ধকার নেমে এসেছে।

ঘণ্টার দিকে হাত বাড়িয়ে চুবিকভ বলল, ''কী শুয়োরের দল আমরা! মানুষদের বিরক্ত করে বেড়াচ্ছি!''

চৌকাঠেই চুবিকভ ও দ্যুকভ্স্কির দেখা হয়ে গেল, বছর তেইশের একটি লম্বা, মোটা স্ত্রীলোকের সঙ্গে। তার ভুরু দুটো ঝুলকালির মত কালো আর ঠোঁট দুটি তরতাজা লাল। ইনিই পুলিশের বড়বাবুর স্ত্রী ওল্‌গা পেত্রভ্না।

সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে স্ত্রীলোকটি বলল, ''আঃ, কী আনন্দের কথা! আপনারা নৈশভোজের ঠিক সময়েই এসে পড়েছেন। আমার এভ্গ্রাফ কুজমিচ বাড়িতে নেই। তিনি অনেক রাত পর্যন্ত পুরোহিতের বাড়িতেই কাটান। কিন্তু তাকে ছাড়াই আমরা সব ব্যবস্থা করে নিতে পারব। দয়া করে বসুন! আপনারা কি গোয়েন্দা আপিস থেকে আসছেন?''

ড্রয়িং-রুমে ঢুকে একটা হাতল-চেয়ারে বসতে বসতে চুবিকভ বলল, ''হ্যাঁ। দেখুন না, আমাদের গাড়ির একটা স্প্রিং ভেঙে গেল তাই.. ।''

দ্যুকভ্স্কি তার কানে কানে বলল, ''এই মুহূর্তে চেপে ধরুন।''

''একটা স্প্রিং...মানে...হ্যাঁ তাই আমরা একটু নেমে পড়েছি।''

''আমি বলছিলাম চেপে ধরুন! দেরী হলে উনি সব বুঝতে পারবেন...''

চেয়ার থেকে উঠে জানালার দিকে যেতে যেতে চুবিকভ বলল, ''তুমি যা ভাল বোঝ কর, আমাকে এর মধ্যে টেনো না। আমি এর মধ্যে থাকতে চাই না! তুমি আমাকে মহা মুস্কিলে ফেলেছ।''

দ্যুকভ্স্কি লম্বা নাকটা কুঁচকে ওল্‌গা পেত্রভ্নার কাছে গিয়ে বলতে শুরু করল, ''হ্যাঁ, একটা স্প্রিং। আমরা...মানে নৈশভোজন করতে বা এভ্গ্রাফ কুজ্‌মিচের সঙ্গে দেখা করতে এখানে ঢুকে পড়ি নি। আমরা আপনাকেই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, মার্ক আইভানভিচ, যাকে আপনারা খুন করেছেন, তিনি কোথায়?''

হঠাৎ ওল্‌গা পেত্রভ্নার মুখের উপর একটা উজ্জ্বল আলোর আভা খেলে গেল। সে থতমত খেয়ে বলল, ''কি? কোন্ মার্ক আইভানভিচ? আমি...আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।''

''আমি আইনের নামে প্রশ্নটা করছি। ক্লৌজভ কোথায়? আমরা সব জেনেছি।''

''কার কাছ থেকে?'' দ্যুকভস্কির স্থির দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে ইন্সপেক্টরের স্ত্রী পাল্টা প্রশ্ন করল।

''দয়া করে দেখিয়ে দিন তিনি কোথায় আছেন।''

''কিন্তু আপনারা জানলেন কেমন করে? কে আপনাদের বলেছে?''

''আমরা সব জেনেছি। আইনের নামে বলছি!''

স্ত্রীলোকটির ভীতি-কাতরতায় উৎসাহিত হয়ে গোয়েন্দা তাঁর কাছে এগিয়ে বলল, "বলে দিলেই আমরা চলে যাব। নইলে আমরা..."

"তিনি আপনাদের কে হন?"

"কেন এ সব প্রশ্ন করছেন ম্যাডাম? আমরা আপনাকে বলছি তাঁকে দেখিয়ে দিন! আপনি কাঁপছেন, বিচলিত হয়েছেন...হ্যাঁ, তিনি খুন হয়েছেন, আর আপনারাই তাঁকে খুন করেছেন! আপনার সঙ্গীরাই সব ফাঁস করে দিয়েছে।"

ওল্‌গা পেত্রভ্‌নার মুখটা সাদা হয়ে গেল।

হাত মোচড়াতে মোচড়াতে সে শান্ত গলায় বলল, "চলুন। তাঁকে আমার স্নানঘরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ঈশ্বরের দোহাই! আমার স্বামীকে বলবেন না! আপনাকে মিনতি করছি! তিনি এতটা সইতে পারবেন না!"

দেয়াল থেকে একটা বড় চাবি নিয়ে ওল্‌গা পেত্রভ্‌না অতিথিদের সঙ্গে করে রান্নাঘর ও দালান পার হয়ে উঠোনে নামল। বাইরেটা অন্ধকার। টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি পড়ছে। পুলিশের বড়বাবুর স্ত্রী সকলের আগে। চুবিকভ ও দ্যুকভ্‌স্কি তার পিছন পিছন বড় বড় ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। বুনো শনগাছ ও পায়ের তলাকার আবর্জনার গন্ধ নাকে আসছে। একটু পরেই তাদের পা পড়ল লাঙল-দেওয়া মাটিতে। অন্ধকারে চোখে পড়ল গাছগাছালির ছায়া-রেখা, আর গাছপালার ফাঁকে বাঁকা চিমনি-ওয়ালা একটা ছোট ঘর।

ওল্‌গা পেত্রভ্‌না বলল, "ওটাই স্নান-ঘর! কিন্তু আপনাদের মিনতি করছি, কাউকে কিছু বলবেন না!"

সেখানে পৌঁছে চুবিকভ ও দ্যুকভ্‌স্কি দরজায় একটা মস্ত বড় তালা দেখতে পেল।

গোয়েন্দা তার সহকারীকে চুপিচুপি বলল, "একটা মোমবাতি ও কয়েকটা দেশলাইয়ের কাঠি তৈরী রাখ!"

বড়বাবুর স্ত্রী তালা খুলে আগন্তুকদ্বয়কে স্নানঘরে ঢুকিয়ে দিল। দ্যুকভ্‌স্কি একটা দেশলাইয়ের কাঠি ঠুকতেই বাইরের ঘরটা আলোকিত হল। মাঝখানে একটা টেবিল। তার উপর একটা পেটমোটা ছোট সামোভারের পাশে ভুক্তাবশিষ্ট বাঁধাকপির ঝোলের একটা গামলা এবং কিছুটা হস্‌শুদ্ধ একটা ছোট পাত্র।

"তারপর!"

সকলে পাশের ঘরে ঢুকল। সেটাই স্নান-ঘর। সেখানেও একটা টেবিল। তার উপরে শূকর-মাংসের একটা বড় থালা ও এক বোতল ভদ্‌কা; সঙ্গে প্লেট, ছুরি ও কাঁটা।

গোয়েন্দা শুধাল, "কিন্তু তিনি...তিনি কোথায়? আসল লোকটি কোথায়?"

বিবর্ণ ওল্‌গা পেত্রভ্‌না কাঁপতে কাঁপতে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "তিনি আছেন একেবারে উপরের তাকে!"

মোমবাতিটা হাতে নিয়ে দ্যকভ্স্কি উপরের তাকে উঠে গেল। দেখতে পেল, সেখানে একটা লম্বা মনুষ্যদেহ বড় পালকের গদিতে নিশ্চলভাবে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে সামান্য নাক ডাকার শব্দও আসছে।

''আমাদের ঠকানো হয়েছে, গুলি মার।''

দুকভ্স্কি চীৎকার করে বলে উঠল, ''এ তো সে লোক নয়। এখানে তো শুয়ে আছে একটা সাক্ষাৎ বোকারাম! হেই, তুমি কে? গুলি মার।''

শিসের মত শব্দ করে শ্বাস টেনে লোকটি নড়ে উঠল। দ্যকভ্স্কি তাকে কনুই দিয়ে খোঁচা মারল। লোকটি দুই হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল, মাথাটাও সামান্য তুলল।

একটা কর্কশ ভারী গলায় প্রশ্ন করল, ''চোরের মত কে ঘরে ঢুকল? কি চাও?''

মোমবাতিটা অপরিচিত লোকটির মুখের কাছে তুলে ধরে দ্যকভ্স্কি আর্তনাদ করে উঠল। লাল নাক, এলোমেলো চুল, আর ঝুল্‌কালো গোঁফ, তার একটা কোণ খাঁড়া উঠে গেছে সিলিং-এর দিকে—সব দেখে চিনতে অসুবিধা হল না যে লোকটি স্বয়ং কর্নেল ক্লৌজভ।

''আপনি...মার্ক...আইভানভিচ? এ হতে পারে না।''

উপরের দিকে তাকিয়ে গোয়েন্দা বুঝি জমাট বেঁধে গেল।

''হ্যাঁ, আমি। আর তুমি, দ্যকভ্স্কি। তোমাদের আবার এখানে কি কাজ পড়ল? আর নীচে ওই কদাকার মুখটা কার? সাধু সন্তরা বেঁচে থাকুন, এটি গোয়েন্দাপ্রবর নয়? পৃথিবীটা বড়ই ছোট, তাই না!''

কোনরকমে নীচে নেমে ক্লৌজভ চুবিকভকে জড়িয়ে ধরল। ওল্‌গা পেত্রভ্না দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল।

''এসব কি চলছে? এস, একটু পান করা যাক, গুলি মার এসব ব্যাপারে। ট্রা-টা-টা-টম্-টম্! একপাত্র হোক। তোমাদের এখানে আনল কে? তোমরা কেমন করে জানলে আমি এখানে আছি? অবশ্য তাতে কিছুই যায়-আসে না। একপাত্র হয়ে যাক।''

ক্লৌজভ আলো জ্বালিয়ে তিন গ্লাস ভদ্‌কা ঢালল।

হতচকিত গোয়েন্দা বলল, ''আমি বলতে চাই, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। এ কি তুমি, না আর কেউ?''

''যথেষ্ট হয়েছে।...আবার একটা বক্তৃতা শোনাতে চাও নাকি? সে কষ্টে আর কাজ নেই। দ্যকভ্স্কি, তোমার গ্লাসটা শেষ কর! বন্ধুগণ, আজকের এই উৎসবের রাত...এক দৃষ্টিতে কি দেখছ? ঠোঁট ভেজাও!''

ভদ্‌কা গলায় ঢেলে গোয়েন্দা বলল, ''আমি এখনও বুঝতে পারছি না...তুমি এখানে কেন?''

''আমার ইচ্ছা হলে এখানে আসতে পারব না কেন?''

ভদ্‌কা শেষ করে ক্লৌজভ একটুকরো শূকর মাংস খেয়ে নিল।

''দেখতেই তো পাচ্ছ, আমি পুলিশ-কর্তার স্ত্রীর সঙ্গে বাস করছি। অবশ্য

এই পাতালে লুকিয়ে আছি গুহ দানবের মত, পানপাত্র শেষ কর। বউটির জন্য আমার বড় দুঃখ হল। তার জন্য করুণা হল, তাই এখানে বাস করছি সন্ন্যাসীর মত একটা ভাঙা স্নানঘরে। খাবারটা তো পাচ্ছি। পরের ... এখান থেকে বেরিয়ে পড়ার কথা ভাবছি। এর মধ্যেই ... ধরে গেছে।

দুর্বোধ্য।'' দ্যুকভস্কি বলল।

''কি দুর্বোধ্য?''

দুর্বোধ্য। ঈশ্বর সাক্ষী, আপনার বুট বাগানে গেল কেমন করে

''কোন বুট?''

আমরা একটা বুট পেলাম শোবার ঘরে আরেকটা বাগানে

তুমি এ সব জানতে চাইছ কেন? এটা তো তোমার কোন [illegible] [illegible] একপাত্র খাও, গুলি মার। তুমি আমার ঘুম ভাঙিয়েছ [illegible] [illegible] ব্যাপারে বন্ধু, বুটের ব্যাপার একটা মজার গল্প। আমি [illegible] [illegible] চাই নি [illegible] মতোটো ভাল [illegible] তো [illegible] [illegible] [illegible] সে তখন জানালার নীচে এসে [illegible] শুরু [illegible] [illegible] এই সব মেয়েমানুষদের রকম। [illegible] [illegible] [illegible] পাশি বুট নিয়েই [illegible] [illegible] [illegible] সে তখন [illegible] পরে [illegible], [illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible] কান্না [illegible] [illegible] নিয়ে [illegible] [illegible] বাঁধল [illegible] আমি এখানে [illegible] [illegible] আহারের দায়ে। [illegible] কোথায় [illegible] [illegible] যাচ্ছ?''

মুখ [illegible] গোয়েন্দা স্নানঘর থেকে বেরিয়ে গেল [illegible] মাথা [illegible] করে [illegible] দ্যুকভস্কি [illegible] চড় ছুটিয়ে দিল। পথভ্রমণ আর কখনও [illegible], [illegible] দীর্ঘ মনে হয় নি। সারা পথ চুবিকভ রাগে কাঁপতে লাগল, আর দ্যুকভস্কি [illegible] দিয়ে মুখটা ঢেকে রাখল, পাছে অন্ধকার এবং রাত্রি তার মুখে লজ্জার প্রকাশটা দেখে ফেলে।

বাড়ি পৌঁছে গোয়েন্দা দেখল, ডাক্তার ত্যুতুয়েভ সেখানে হাজির। টেবিলে বসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে 'নিভা' ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছে।

বিষণ্ণ হাসি দিয়ে গোয়েন্দাকে স্বাগত জানিয়ে ডাক্তার বলল, ''এ জগতে কত কী না ঘটে। অস্ট্রিয়া আবার শুরু করেছে। আর গ্ল্যাডস্টোনও।''

চুবিকভ টুপিটাকে টেবিলের তলায় ছুঁড়ে দিয়ে একেবারে ফেটে পড়ল।

''গুলবাজ। এখান থেকে চলে যাও। তোমাকে হাজার বার বলেছি, তোমার রাজনীতি নিয়ে আমাকে জ্বালিও না। রাজনীতি করবার মত সময় আমার নেই। আর তুমি ...'' বদ্ধমুষ্টি নেড়ে চুবিকভ এবার দ্যুকভস্কির দিকে

ঘুরে বলল, "আব যতদিন বেঁচে থাকব আমি তোমাকে কখনও ক্ষমা করব না।"

"কিন্তু...সুইডিশ দেশলাইটা! আমি কেমন করে জানব?"

"রাখো তোমার দেশলাই। এখান থেকে চলে যাও। আর আমাকে জ্বালিও না।...চলে যাও আর দূরে দূরেই থেকো।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দ্যুকভ্স্কি টুপিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

"চলে তো যাবই, তারপর মদ গিলব।" ফটক পার হয়েই সে মনস্থির করে ফেলল এবং সোজা শুঁড়িখানার দিকে চলতে লাগল।

স্নান-ঘর থেকে বাড়ি ফিরে ওল্‌গা পেত্রভ্না দেখল, তার স্বামী ড্রয়িং রুমে বসে আছে।

"গোয়েন্দা এসেছিল কেন?" স্বামী শুধাল।

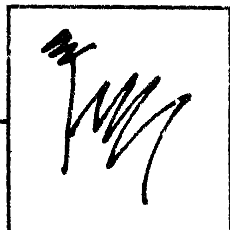
"সে বলতে এসেছিল তারা ক্লৌজভকে খুঁজে পেয়েছে। কল্পনা কর. অন্য একজনের স্ত্রীর সঙ্গে তাকে খুঁজে পেয়েছে।"

চোখ খুলে পুলিশের বড়বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, 'ওঃ, মার্ক আইভানভিচ. মার্ক আইভানভিচ! কতবার তোমাকে বলেছি এই লাম্পট্যই তোমাব কাল হবে। আমি তো বলেছি, কিন্তু সে-কথা তোমার কানে ঢোকে না।"

১৮৮৪

ত্রিফন

Trifon



অতীতের এমন কিছুই নেই যার জন্য আমাকে অনুশোচনা করতে হয়।

– লারমন্তভ

গ্রিগরি সেমিওনভিচ শেগ্‌লভ পিঠের নরম জায়গায় একটা দুঃসহ যন্ত্রণা অনুভব করল। ঘুম থেকে জেগে উঠে বিছানায় পাশ ফিরে শুল।

ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "নাস্তিয়া, একটু স্পিরিট এনে আমার পিঠে মালিশ করে দাও।"

কোন জবাব এল না। শেগ্‌লভ পাশে হাত বাড়িয়েও কাউকে পেল না। তাকে বাদ দিলে বিছানাটা খালি।

"কোথায় গেল সে?" শেগ্‌লভ অবাক হল। "নাস্তিয়া! নাস্তিয়া।"

এবারও কোন জবাব এল না। কানে এল কেবল পাহারাওয়ালার পায়ের শব্দ আর বিগ্রহের নিভু-নিভু বাতির ছটফট্ আওয়াজ। একটা বিপদের আশংকা করে শেগ্‌লভ কপাল থেকে ঠাণ্ডা ঘাম মুছে ফেলে লাফ দিয়ে

বিছানা থেকে নামল। এখন সকাল তিনটে—এ সময় নাস্তিয়া সাধারণত ছোট শিশুর মত ঘুমিয়ে থাকে। অঘটন কিছু না ঘটলে তার ঘুম ভাঙে না। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে শেগ্‌লভ ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে নামল।

সেনাপতির গৃহরক্ষকের মতই পূর্ণ ও নিরেট চাঁদটা আকাশের বুকে ভেসে চলেছে। তার বল্লব মত আলোয় সারা আকাশ, অসংখ্য দালান-কোঠায় ভরা উঠোন, আর বাড়ির দুই পাশের ভূতের মত দাঁড়িয়ে-থাকা বাগানটা ঝলমল করছে। চাঁদের সে আলো নরম, কোমল ও স্নেহময়। মাটিতে বা গাছের ডালে একটা সবুজ পাতাও নেই ; বাগানটাকে কালো ও কঠিন মনে হচ্ছে, কিন্তু সব কিছুতেই মার্চের শেষ ও বসন্তের শুরুর আভাষ। শেগ্‌লভ উঠোনের চারদিকে চোখ ফেলল। বহুদূর পর্যন্ত কিছুই চোখে পড়ল না ; কেবল দড়িতে এক পা বাঁধা একটা বাছুর পাগলের মত অনবরত লাফাচ্ছে। শেগ্‌লভ বাগানে ঢুকল। সেখানেও সব কিছুই চুপচাপ ও আলোকিত! অন্ধকার ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে একটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব বেরিয়ে আসছে, ঠিক যেমনটি আসে ভূগর্ভস্থ ঘর থেকে।

অস্বস্তিকর শীতে কাঁপতে কাঁপতে গ্রিগরি সেমিওনভিচ অবাক হয়ে ভাবল, 'সে কি তাহলে গ্রামের দিকে গেছে? সে যদি গ্রীষ্মাবাসেও না থাকে তাহলে তো লোক পাঠাতে হবে।''

নাস্তিয়ার দুটো দুর্বলতার কথা শেগ্‌লভও জানে। মন খারাপ হলেই সে বাবা-মার কাছে গ্রামে চলে যায়। আবার রাত হলে গ্রীষ্মাবাসে যাবার অভ্যাসটাও আছে। সেখানে অন্ধকারে বসে করুণ সুরে গান গায়।

গ্রিগরি সেমিওনভিচ ভাবল, ''আমি একটা অথর্ব বুড়ো ; আমার সঙ্গে জীবন কাটানোটা তার কাছে তো এক বাটি চেরিফল নয়।''

গ্রীষ্মাবাসে পৌঁছেই সে একটা নারী-কণ্ঠ শুনতে পেল। কিন্তু সে কণ্ঠ গান করছে না, কথা বলছে। না থেমে, কোনরকম ইতস্তত না করে দ্রুত কথা বলে যাচ্ছে ; যেন নালিশ জানাচ্ছে।

একটা কর্কশ পুরুষ-কণ্ঠ তাকে বাধা দিল, ''বুড়ো শয়তানকে ছেড়ে দাও। আমাদের একটা উপকার কর। রেশম ও সাটিন পরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, স্ফটিকের পাত্রে খাচ্ছ, কিন্তু বুঝতে পারছ না এটা ভুল। ও সব ছেড়ে দাও নাস্তিয়া! তোমাকে পেটান উচিত, কিন্তু সে কাজটা করবার কেউ নেই!''

''তুমি বুঝতে পারছ না ত্রিফন! যদি কেবল আমি হতাম, আমার নিজস্ব ব্যাপার হত, তাহলে আমি তার কাছ থেকে শত মাইল দূরে চলে যেতাম। কিন্তু ভেবে দেখ, বাবা আছে, সে একটা বাড়ি করতে চায়,...আমার ভাইরা সব সেনাবাহিনীতে। তাদের তামাক ও নানা রকম জিনিস পাঠাতে হয়...''

নাকে কান্নার শব্দ হল, তারপর চুমো খাওয়ার শব্দ। শেগ্‌লভের সারা শিরদাঁড়ায় যেন কাঁটা ফুটতে লাগল। লোকটিকে সে চিনতে পেরেছে, তারই পাহারাদার ত্রিফন।

''আমি ওকে আস্তাকুড় থেকে তুলে আনলাম, তার বন্ধু হলাম, বলতে পারা যায় তার হিতকারী হলাম,'' আতংকের সঙ্গে সে ভাবতে লাগল। ''সে তো আমার স্ত্রীর মতই ছিল, আর এখন সে বোকা ত্রিফনের সঙ্গে জুটি বেঁধেছে। এ্যাঁ! ওকে রেশমী জামা-কাপড় পরিয়েছি, একজন মহিলার মত তাকে নিয়ে খানা খেয়েছি, আর সে কিনা এখন ত্রিফনের সাথী হয়েছে!''

ক্ষোভে ও দুঃখে বুড়ো মানুষটার হাঁটু দুটো কাঁপতে লাগল। আরও কিছুক্ষণ কান পেতে শুনে আহত ও হতভম্বের মত সে বাড়ি ফিরে গেল।

বিছানায় শুয়ে সে ভাবতে লাগল, ''আমি ওকে দগ্ধে দগ্ধে মারব। ও হয়তো ভেবেছে ওকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। না, ও ভুল করেছে। কালই ওকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করব। ওই মুঝিকদের সঙ্গে বসে ওকেও ভুষি খেতে হবে। আর ঐ শয়তান ত্রিফন।...আর কোনদিন ওর মুখ দর্শন করব সকালেই ওটাকে ত[illegible]ব।''

কম্বলটা জড়িয়ে সে [illegible] বসল। সে চিন্তা যেমন পীড়াদায়ক তেমনই নাস্তিয়া যখন বাগ[illegible] থেকে ফিরে এসে যেন কিছুই ঘটে নি এই রকম দেখিয়ে বিছানায় উঠল তখন শেগলভ রাগে একেবারে ফেটে পড়ল।

''কালই ওটাকে তা[illegible]ব। না.. ওকে তাড়াব না। যদি তাড়াই তাহলে ও একটা কাউকে যোগা[illegible] করে নিয়ে মজা করে থাকবে, যেন ও কোন[illegible]ই করে নি। ওকে এমন শাস্তি দেব যাতে বাকি জীবনটা ভুলতে না[illegible]। যদি আগেকার মত ওকে চাবুক মারতে পারতাম...আস্তাবলে নিয়ে ভাল করে বেঁধে মাটিতে ফেলে চাবকে ওর চোখ থেকে দিনের আলোও মুছে দিতাম। আচ্ছা করে চাবকে দিতাম, সে দোরেদোরে ভিক্ষা করে বেড়াত, আর আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাতে হাত ঘষতাম। যেমন কুকুর তার তেমন মুগুর। কড়া! আরও কড়া!''

সকালে নাস্তিয়া যথারীতি চা ঢালল। শেগলভ আসনে বসে তার দিকে তাকাল। তার মুখটা শান্ত, চোখ দুটো পরিষ্কার, অপরাধের ছায়ামাত্র নেই।

শেগলভ ভাবতে লাগল, ''ওকে কিচ্ছুটি বলব না। ও নিজে নিজেই বুঝুক। আমি চাই, ও নীতিবোধের দিক থেকে কষ্ট পাক। আমি ওর সঙ্গে কথা বলব না, ওর উপর রাগ করব না, তাহলেই ও বুঝবে। কিন্তু ও যদি শয়তান ত্রিফনের কথা শুনে সত্যি সত্যি আমাকেই ছেড়ে যায়, তাহলে?''

এক সময় এই শেষের চিন্তাটা তাকে এতই ভয় পাইয়ে দিল যে সে ফ্যাকাসে মুখে বলল ঃ

''নাস্তিয়া, লক্ষ্মীসোনা, তুমি একটা বোলও খাচ্ছ না কেন? ওগুলোতো আসলে তোমার জন্যই কেনা!''

আটটার পরে পাহারাদার রিপোর্ট নিয়ে এল। শেগলভের মনে হল লোকটা তার দিকে তাকাচ্ছে বিদ্বেষ, ঘৃণা ও বিজয়ী ঔদ্ধত্যের দৃষ্টিতে।

তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে শেগলভ ভাবল, ''তাকে ছাড়িয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে না। চাবুক মারতে হবে।''

ত্রিফন তার হাতে যে রসিদপত্রগুলো দিয়েছিল সেগুলি দেখতে দেখতে সে বলতে লাগল, "এ সবের মাথামুণ্ড কিছুই তো বুঝতে পারছি না। এটা কোন্ সংখ্যা? পঁচাত্তর না পনেরো? তুমি একটা মাথামোটা। সাতের উপরকার টানটাও ঠিক মত দিতে পার না। সাতটা দেখাচ্ছে আগুনখোঁচানো শিকের মত, আর এটা দেখাচ্ছে লেজওয়ালা লাঠির মত। তুমি কি এটাও জান না? মাথামোটা। এ ধরনের কাজ করলে তোমার মত লোককে আস্তাবলে নিয়ে চাবুক মারা হত।"

সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ত্রিফন নীচু গলায় বলল, "তারা তো কেবল সেটাই করত না...।"

শেগলভ অপাঙ্গে ত্রিফনের দিকে তাকাল। তার মনে হল, লোকটা তাকে বিদ্রূপ করছে, আগের চাইতেও উদ্ধত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ত্রিফনের উদ্ধত মুখটাকে সহ্য করতে না পেরে শেগলভ চেঁচিয়ে বলল "বেরিয়ে যাও।"

সন্ধ্যা পর্যন্ত উঠোনে পায়চারি করতে করতে শেগলভ শাস্তি ও প্রতিশোধের ফন্দি আঁটতে লাগল। অনেক ফন্দিই তার মাথায় এল কিন্তু তার প্রত্যেকটাই ফৌজদারী দণ্ডবিধির কোন না কোন ধারার আওতায় পড়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ ভাবনা চিন্তার পরে সে বুঝতে পারল, কোন কিছু করার সাহসই তার নেই।...

সকাল দুটো থেকে তিনটের মধ্যে গ্রীষ্মাবাসের কাছে দাঁড়িয়ে এমন সব সংলাপ তার কানে এল যা গতকালের চাইতেও খারাপ। গতকাল মনিবের সঙ্গে তার যা কথাবার্তা হয়েছিল ত্রিফন হেসে হেসে সেটাই নাস্তিয়াকে শোনাচ্ছে।

"ওঃ, কলারটা চেপে ধরে কয়েকটা ঝাঁকুনি দিলেই তার এই ভূত তাকে ছাড়বে।"

শেগলভের আর সহ্য হল না।

কর্কশ গলায় বলে উঠল, "কি বলছিস্ হতভাগা। ভূত কাকে ছাড়বে?"

গ্রীষ্মাবাসটা সহসা নিশ্চুপ হয়ে গেল। ত্রিফন অদ্ভুতভাবে গলাটা পরিষ্কার করতে লাগল। এক মুহূর্ত পরে এক পা দুই পা করে সে গ্রীষ্মাবাস থেকে বেরিয়ে দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

"কে চেঁচাচ্ছে? কে ওখানে? ওঃ, আপনি—" মনিবকে দেখতে পেয়ে বলল, "তাহলে আপনি!"

এক মিনিট সব চুপচাপ।

"আমাদের মত লোককে তারা আস্তাবলে নিয়ে চাবুক মারত সেটা তো অনেককাল আগে, কিন্তু আজ কি ঘটতে যাচ্ছে তা আমি জানি না," দাঁতে দাঁত চেপে চাঁদের দিকে তাকিয়ে ত্রিফন কথাগুলি বলল। "মনে হচ্ছে,

আমাব চাকরিটা যাবে...আমি তো ভয়েই মরে যাচ্ছি।''

উচ্চকণ্ঠে হাসতে হাসতে সে বাড়ির পথ ধরল। শেগলভ তাব পিছু পিছু ছুটল।

দু'জন একই সময়ে বাগানেব ফটকে পৌঁছামাত্রই ত্রিফনের আস্তিন চেপে ধরে সে বলল, ''ত্রিফন! তোমাকে শুধু একটা কথা বলতে চাই। দাঁড়াও। আমি এটা বলতে চাই নি...কেবল একটা কথা।...তুমি শয়তান, এই বৃদ্ধ বয়সে আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি, মিনতি করছি! বন্ধু!''

''আচ্ছা।''

''এবার আমার দিকে তাকাও...আমি তোমাকে পঁচিশ রুব্‌ল্ দেব এবং যদি চাও তো তোমাব মাইনেও বাড়িয়ে দেব! তোমাকে ত্রিশ রুব্‌ল দেব, কিন্তু তুমি...তোমাকে একবাব চাবুক মারতে দাও! মাত্র একটিবাব! তোমাকে মাত্র একবাব চাবুক মারব, তার বেশী নয়।''

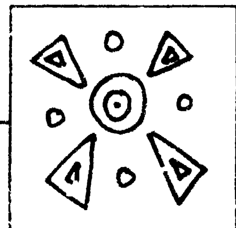
ত্রিফন এক মুহূর্ত কি ভাবল, চাঁদের দিকে তাকাল, তারপর মাথাটা নাড়ল।

''আমি রাজী নই।'' এই কথা বলে সে চাকরদেব রান্নাঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

১৮৮৪

যে অশ্রুজল কেউ দেখে না

Tears Unseen By The World



θ একটি ছোট গল্প 0

সদলে ক্লাব থেকে বেরিয়ে সামরিক বিভাগের সেনানায়ক লেফটেনান্ট কর্ণেল রেব্রতেসভ বলল, ''ভদ্রমহোদয়গণ, এবার একটা নৈশভোজনের ব্যবস্থা হলে মন্দ হয় না।'' রেব্রতেসভ মানুষটি টেলিগ্রাফের থামের মতই ঢ্যাঙা ও সরু। ''সাবাতাভের মত ভাল ভাল শহরে ক্লাবই রাতের খাবারটা দেয়, কিন্তু এখানে আমাদের এই পোড়া চের্ভিয়য়ানস্ক-এ ভদ্‌কা আর মাছি-ওড়া চা ভিন্ন আর কিছুই মেলে না। একটা ভাল পানীয়ের পর কিছু খাবার না জোটার চাইতে খারাপ আর কিছু হতে পারে না।''

ডিভিনিটি কলেজের ইন্সপেক্টর আইভান আইভানোভিচ এ বিষয়ে একমত। বাতাস আটকাতে একটা লালচে-বাদামী কোটে শরীর ঢেকে বলল, ''হ্যাঁ, কিছু পেলে মন্দ হত না। এখন দুটো বাজে; সব শুঁড়িখানাই বন্ধ হয়ে গেছে; এ সময়ে কিছু নোনা হেরিং..ব্যাঙের ছাতা...বা ঐ রকম কিছু পেলে মন্দ হত না—''

ইন্সপেক্টর বাতাসের গায়ে আঙুলগুলি বেঁকিয়ে মুখের ভাবভঙ্গিতে এমন একটা সুস্বাদু খাবারের ছবি ফুটিয়ে তুলল যাতে উপস্থিত সকলেই জিভ চাটতে শুরু করল। পুরো দলটাই দাঁড়িয়ে পড়ল এবং নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল। তারা ভেবেই গেল, কিন্তু খাবার মত কোন কিছুর হদিস করতে পারল না। সকলেই যার যার স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেল।

পুলিশের সহকারী বড়বাবু প্রার্থনাপ্রার্থিনস্থ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল "গতবার গালোপেসভের ওখানে চমৎকার মুরাগা খেয়েছি। ভাল কথা মশায়েরা কি কখনও ওখানে গিয়েছেন। তারা এইভাবে ওটা বানায় সাধারণ রাটা মাছ তখনও জ্যান্ত লাফাচ্ছে — নিয়ে দুধের মধ্যে ফেলে দেয়। একদিন তারা দুধের মধ্যে সাঁতার কাটে তারপর রাঁধে। স্মেতানা' দিয়ে ভাজা হয় ইহলোক ছেড়ে একেবারে পরলোকে পাঠিয়ে দেয়। ঈশ্বর সাক্ষী বিশেষ করে যদি দু এক পাত্র ভদকা পেটে পড়ে। খাও আর খুশিতে মজে যাও। শুধু ঘ্রাণটুকুর জন্যই তুমি প্রাণটাও দিতে রাজী হবে।'

আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিয়ে বেব্রতেসভ বলল 'বিশেষ করে নুনশশা সহযোগে। আমরা যখন পোল্যাণ্ডে ছিলাম তখন না জেনেই আমরা তাদের দু শ মাংসপুডিং সাবাড় করেছিলাম' প্লেটের উপর পর পর সাজিয়ে নাও তাতে লংকা মেশাও, জোয়ান ও সজি ছড়িয়ে দাও, তারপর সে স্বাদ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।''

হঠাৎ থেমে গিয়ে বেরতেসভ কি যেন ভাবতে লাগল। ১৮৫৬তে ট্রিনিটি লাভাতে যে মাছের ঝোল সে খেয়েছিল তার স্মৃতি মনে পড়ে গেল। সে ঝোলের স্মৃতি এতই সুস্বাদু যে কম্যাণ্ডান্টের নাকে সহসা তার গন্ধটা এসে লাগল নিজের অজ্ঞাতেই সে চিবুতে শুরু করল, একবার খেয়ালও করল না যে তার দুটো গালোশই কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে।

সে বলে উঠল না এ আর সহ্য হয় না। কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়। বরং নিজের বাড়িতে গিয়েই একটু মৌজ করা যাক। চলুন ভদ্রজনরা, আমার বাড়িতেই চলুন। ঈশ্বর সাক্ষী। একটা গ্লাস তো পাবই, যাহোক কিছু খাবারও জুটবে। মাছ ভাজা, সসেজ খেতে খেতেই একাল-সেকালের গল্প করা যাবে। আমার স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু তাকে আমরা জাগাব না। চুপচাপ কাটিয়ে দেব। চলুন।''

এই আমন্ত্রণ যেরকম উচ্ছ্বাসের সঙ্গে গৃহীত হল সেটা অবর্ণনীয়। আমি কেবল এইটুকুই বলব যে সে রাতে বেরতেসভের যত শুভানুধ্যায়ী জুটেছিল তেমনটি আর কোন দিন জোটে নি।

অতিথিদের অন্ধকার বাইরের ঘরে বসাতে বসাতে কম্যাণ্ডান্ট আর্দালিকে বলল, ''তোমার কান দুটো ছিঁড়ে ফেলব! হতভাগা, তোমাকে হাজারবার বলেছি, যখনই বাইরের ঘরে ঘুমবে, একটা সুগন্ধি পাকানো কাগজ জ্বালিয়ে রাখবে। হাঁদারাম, এবার যাও, সামোভারটা জ্বালাও, আর ইরিনাকে বল, মানে, ভাঁড়ারঘর থেকে মাছ ভাজা ও মূলো আনতে বল। আর কিছু হেরিং

রান্না কর। আর...তাতে পেঁয়াজ-নুন ছড়িয়ে দাও, চাকা-চাকা করে কিছু আলু কাট। কিছু বীট পালংও আন। তুমি তো জানই সব কিছুতেই ভিনিগার, তেল আর সরষেও দেবে। আর কিছু লংকা।...এক কথায়, বেশ সাজিয়ে দেবে। বুঝলে ?''

রেব্রতেসভ আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগল তার খবারটা সাজিয়ে দেবার ব্যাপারে যেটা ভাষায় বলতে পারল না সেটাও আকার-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল।...অতিথিরা যার যার গালোশ খুলে রেখে অন্ধকার বড় ঘরটায় ঢুকল। গৃহকর্তা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে একটা গন্ধকের কাঠি জ্বালাল, এবং সেটা দিয়ে দেয়ালে টাঙানো ''নিভা''-পুরস্কার, ভেনিসের কিছু নিসর্গ-দৃশ্য এবং সাহিত্যিক লাঝেচ্‌নিকভ ও বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের এক সেনাপতির প্রতিকৃতিকে আলোকিত করে দিল।

দ্রুত হাতে টেবিল-ঢাকনাগুলো তুলে গৃহকর্তা নীচু গলায় বলল, ''এক মিনিট...এখনই টেবিলটা সাজিয়ে আমরা বসে পড়ব। আমার মাশা আজ খুব সুস্থ নয়। অনুগ্রহ করে তাকে ক্ষমা করবেন।...মেয়েদের ব্যাপার আর কি। ডাক্তার গুসিন বলেন, এটা উৎসবের খাওয়া-দাওয়ার ফল। হতেও পারে! আমি তাকে বলেছি, 'দেখ, এটা খাওয়ার ব্যাপারই নয়! দুই ঠোঁটের ভিতর দিয়ে যা ভিতরে ঢোকে তাতে কিছু যায়-আসে না, আসল ব্যাপার হল দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে যা নিঃসৃত হয়।' আমি তাকে বলেছি, 'তুমি লেন্‌টেন্‌ মেলায় গিয়ে খাও, তাতে তোমার মেজাজের কোন হেরফের হবে না। অতএব রক্ত-মাংসের শরীরটাকে কষ্ট না দিয়ে মেজাজটাকে ঠিক রাখ, গালি-গালাজ করো না।'...কিন্তু সে আমার কথাই শোনে না! বলে, 'ছোটবেলা থেকে আমরা ওটাই শিখেছি।''

আর্দালি ঘরে ঢুকে গলা বাড়িয়ে গৃহকর্তার কানে-কানে কি যেন বলল। রেব্রতেসভের ভুরু দুটো উল্টে গেল।

সে বলল, ''হুঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা! সুতরাং—ও কিছু নয়, তুচ্ছ ব্যাপার। আমি এলাম বলে। চাকর-বাকরদের জন্য মাশা ভাঁড়ার-ঘরে তালা দিয়ে চাবিটা নিজের কাছেই রেখে দেয়। আমি যাব আর আসব।''

রেব্রতেসভ পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে নিঃশব্দে দরজাটা খুলে স্ত্রীর কাছে গেল। সে তখন ঘুমচ্ছে।

সাবধানে বিছানার কাছে গিয়ে ডাকল, ''মাশা সোনা! একটু ওঠ মাশা, এক সেকেণ্ডের জন্য।''

''কে ? ওঃ তুমি ? কি চাও ?''

''কি জান মাশা,..চাবিটা আমাকে দাও লক্ষ্মীটি ; কোন চিন্তা করো না...ঘুমিয়ে পড়।...আমি নিজেই সব দেখাশোনা করব। প্রত্যেককে একটা করে মাছভাজা দেব, আর কিচ্ছু দেব না। তা যদি দেই তাহলে ঈশ্বর যেন আমাকে শেষ করে ফেলেন। তুমি তো চেনই, দোয়েতোচিয়েভ, প্রঝিনা-প্রঝিনস্কি, ও আরও কয়েকজন। সকলেই চমৎকার লোক। সমাজ

তাদের মান্য করে...প্রুঝিনস্কি তো চতুর্থ শ্রেণীর ভ্লাদিমির পুরস্কারও পেয়েছে। সে তোমাকেও খুব শ্রদ্ধা করে।''

''তাহলে এতক্ষণ কোন্ চুলোয় ছিলে?''

''এই তো, আবার মেজাজ খারাপ করছ? সত্যি তুমি একটা...প্রত্যেককে একটা করে মাছভাজা দেব, বাস তারা চলে যাবে...ব্যবস্থাদি সব আমিই করব। তোমাকে কোনরকম জ্বালাতন করব না। যেমন শুয়ে আছ তেমনই থাক লক্ষ্মীটি। কেমন আছ? আমি বাইরে যাবার পরে গুসিন কি এসেছিল? তোমার হাতে চুমো খেতেও রাজী আছি। আর আমার অতিথিরা তোমাকে কত সম্মান করে। তুমি তো জান, দোয়েতোচিয়েভ ধর্মভীরু লোক...প্রুঝিনাও তাই। তোমার প্রতি সকলেই শ্রদ্ধাশীল।...তারা তো বলেই, 'মারিয়া পেত্রভ্না স্ত্রীলোক মাত্র নয়, সে অন্য কিছু—অতুলনীয়া...আমাদের জেলার উজ্জ্বল আলো।''

''শুয়ে পড় গে। অনেক বকর-বকর করেছ। দলবল নিয়ে ক্লাবে মদ গিলবে, আর তারপর সারারাত হল্লোড় করে বেড়াবে। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। তোমার না ছেলেমেয়ে আছে!''

''আমার...আমার ছেলেমেয়ে আছে, কিন্তু মাথা গরম করো না মাশা—বিরক্ত হয়ো না। আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার মূল্য বুঝি...আর ছেলেমেয়ে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমিই তাদের সামাল দিতে পারব। মিতিয়াকে কোন উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেব। তুমি তো আশা করতে পার না যে ওদের আমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব। বিরক্তিকর—তারা এসে কিছু খেতে চাইল। বলল, 'আমাদের কিছু খেতে দাও!' ওই দোয়েতোচিয়েভ, প্রুঝিনা-প্রুঝিনস্কির মত লোক—বড় ভাল লোক—তারা তোমাকে ভালবাসে, তোমার প্রশংসা করে। আমি তাদের একটা মাছভাজা দেব, এক চুমুক ভদ্কাও দেব।...তারপর তারা চলে যাবে। আমিই ব্যবস্থা করছি—''

''সত্যি বলছ! তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে? এটা কি অতিথিদের আসার মত সময়? তাদেরই তো লজ্জাবোধ করা উচিত, যত সব ভবঘুরে, রাত-বিরেতে মানুষকে উত্যক্ত করে বেড়ানো মানুষ। এমন অসময়ে মানুষ অন্যের বাড়িতে আসে—এমন কথা কে কবে শুনেছে? এটা কি একটা শুঁড়িখানা? আমি এত বোকা নই যে তোমার হাতে চাবি তুলে দেব। রাতটা এক ঘুমে কাটিয়ে তারা যেন কাল সকালে আসে।''

''হুম...এ কথাটা আগে বলে দিলেই তো হত। তাহলে তোমার হাতে আমাকে এ ভাবে হেনস্তা হতে হত না। তাহলে—এর অর্থ তুমি আমার জীবনসঙ্গিনী নও, তোমার স্বামীর সান্ত্বনার স্থল নও, যে কথা ধর্মশাস্ত্রে বলে থাকে।...কিন্তু...তুমিই আমাকে কথাটা বলতে বাধ্য করছ...তুমি চিরদিনের সাপ, আর আজও সাপই আছ।''

''আঃ! আবার শাপান্ত শুরু করলে? তুমি...''

তার স্ত্রী বিছানায় উঠে বসল, আর কম্যাণ্ড্যান্ট থুতনি চুলকে বলতে

লাগল, ''থাম। একটা পত্রিকায যা পড়েছিলাম দেখছি সেটাই সত্যি। 'বাইবে কোচাব পওন -বাড়িতে ছুঁচোব কেত্তন'--খুব খাঁটি কথা তুমি চিবকাল শযতানী ছিলে, আব এখনও আছ ''

''তবে মব।''

''মাবলে, তুমি আমাকে মাবলে। তোমাব একমাত্র স্বামীকে মাবলে। নতজানু হযে আমি তোমাকে মিনতি কবছি .মিনতি কবছি মাশা। আমাকে ক্ষমা কব। চাবিগুলো দিযে দাও। মাশা। দেবদূত। যত নিষ্ঠুবই হও, সকলেব সামনে আমাকে অপমান কবো না। বুনো জানোযাব, আব কতকাল আমাকে কষ্ট দেবে? আমাকে মাব মাব। দোহাই তোমাব, আবাব তোমাকে মিনতি কবছি।

স্বামী-স্ত্রীব এ ধবনেব সংলাপ অনেকক্ষণ ধবে চলল। বেব্রতেসভ নতজানু হল, দু'বাব চোখেব জল ফেলল, উঠে দাঁড়াল, মাঝে মাঝেই গাল চুলকোতে লাগল। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীটি উঠে দাঁড়াল, থুথু ফেলে বলতে লাগল :

''বুঝতে পেবেছি তোমাব মূর্খতাব কোন শেষ নেই। চেযাবেব উপব থেকে আমাব পোশাকটা দাও।''

বেব্রতেসভ যত্ন কবে পোশাকটা তাব হাতে দিল। তাবপব নিজেব চুলটা ঠিকঠাক কবে নিযে অতিথিদেব কাছে ফিবে গেল। সকলেই জেনাবেলেব প্রতিকৃতিব সামনে দাঁড়িযে তাব বিস্মযাবিষ্ট চোখ দুটিব দিকে তাকিযে একটা সমস্যাব সমাধান কবতে চেষ্টা কবছিল, দু'জনেব মধ্যে কে বযসে বড় এই জেনাবেল না সাহিত্যিক গুবিচনকভ? সাহিত্যিকেব অমবত্বেব বিচাব কবে দোযেওচাযেভ লাঝেচনিকভেব পক্ষ নিল আব প্রুঝিনস্কি বলল :

ভাল লেখক সে বিষযে দ্বিমত নেই তাব লেখা সবস ও আবেগপূর্ণ কিন্তু তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাও তখন সেখানে সে একটা ছোট্ট সেনাদলেব সঙ্গেও যুঝতে পাববে না কিন্তু জেনাবেলকে একটা পুবো বাহিনীব বিরুদ্ধে দাঁড় কবিযে দাও দেখবে তাকে সে তোযাক্কা কবে না ''

গৃহকর্তা ঘবে ঢুকে বাধা দিয়ে বলল, ''আমাব মাশা আসছে—''

''সত্যি তোমাকে বড় বিবক্ত কবলাম—ফিওদব একিমোভিচ, তোমাব গালে কি হল? হা ভগবান আমাব চোখেও তো কালশিবা পড়েছে। এ সব কাব কাণ্ড?''

বিব্রত গৃহকর্তা হেসে বলে বলল, 'গাল? গাল? ওঃ, হ্যাঁ। এইমাত্র মাশাব সঙ্গে একটা ধাক্কা লেগে গেল, তাকে ঘুম থেকে তুলতে গিযে অন্ধকাবে বিছানাব উপব পড়ে গেলাম আব কি! হা, হা, হা। কিন্তু এই তো সেও এসে পড়েছে। কিন্তু কী এলোমেলো চুল তোমাব! ঠিক যেন লুইসি মাইকেল।''

মাবিযা পেত্রভনা ঘবে ঢুকল। তাব চুল অগোছালো চোখ দুটো বসা, কিন্তু খুশিতে ঝলমল কবছে।

সে বলতে লাগল, "এই ভাবে এখানে এসে খুব ভাল করেছেন। আপনারা বিকেলে না এলে আমার স্বামী অন্তত রাতেও আপনাদের এনে হাজির করতই। আমি এই মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আপনাদের গলা শুনেই—অবাক হয়ে ভাবলাম, "কারা হতে পারেন?" সেদিয়া আমাকে বিছানা ছেড়ে উঠতে বারণ করেছিল, কিন্তু আমি শুয়ে থাকতে পারলাম না।"

মারিয়া পেত্রভ্না তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকল। নৈশভোজও শুরু হয়ে গেল।

পরে অন্য সকলের সঙ্গে সে-বাড়িটা থেকে বেরিয়ে প্রুঝিনা-প্রুঝিন্স্কি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বিবাহিত জীবন কী মহান! যখন ইচ্ছা খাও, মদ খাবার ইচ্ছা হলেই চুমুক দাও। তুমি জান, এমন একজন আছে যে তোমাকে ভালবাসে। আর সে পিয়ানো অথবা অন্য কিছু বাজাবে।...বেব্রতেসভ কত সুখী!"

দোয়েতচিয়েভ নীরব। সারা পথ সে ভাবল আর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বাড়িতে পৌঁছে পোশাকপত্র ছেড়ে সে এত জোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল যে তার স্ত্রীর ঘুম ভেঙে গেল।

সে বলে উঠল, "যাঁতার কল, তোমার বুটের ঠকঠকানি থামাও। তুমি কি আমাকে ঘুমতেও দেবে না! ক্লাবে মদ খাবে আর বাড়িতে এসে হৈচৈ বাধাবে। অসভ্য জানোয়ার।"

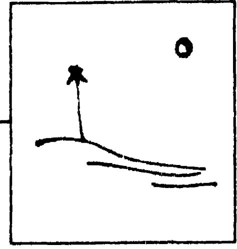
ইন্সপেক্টর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোমার তো আছেই কেবল গালাগালি আর গালাগালি। বেবতেসভদের জীবনযাত্রাটা তোমার একবার দেখে আসা উচিত। ভগবান! সে কি জীবন। তাদের দেখলেই তুমি কেঁদে ফেলবে, সেটা এতই মর্মস্পর্শী। আর আমি, অভাগা, আমার কপালে জুটেছ তুমি 'বাবা ইয়াগা।'—কুৎসিত ডাইনি। পাশ ফিরে শোও।"

কম্বলটা মুড়ি দিয়ে মনে মনে নিজের ভাগ্যকে দোষী সাব্যস্ত করে ইন্সপেক্টর ঘুমিয়ে পড়ল।

১৮৮১

কৃকলাস

Chamelcon



নতুন গ্রেট-কোটটা গায়ে দিয়ে হাতে একটা পুঁটুলি নিয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর ওচুমেলভ বাজারের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। তার পিছনে চলেছে একজন কনেস্টবল; তার মাথার চুল লাল, হাতে বাজেয়াপ্ত গুজবেরিতে ভর্তি একটা চালান। চারদিক চুপচাপ।...বাজারে জনমনিষ্যি নেই। ছোট ছোট দোকান ও শুঁড়িখানার খোলা দরজাগুলো একগাদা ক্ষুধার্ত মুখের মত ঈশ্বরের দুনিয়াটার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। আশেপাশে একটা ভিক্ষুকও দাঁড়িয়ে নেই।

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর ওচুমেলভের কানে এল। ''আরে তুই কামড়াবি নাকি রে খেঁকি কুত্তা। ওটাকে ছেড়ে দিও না বাছারা। আজকাল কুকুরের কামড়ানো নিষিদ্ধ হয়েছে। ধর, ধর, হেই।''

কুকুরের ডাকও শোনা গেল। শব্দ অনুসরণ করে ওচুমেলভ দেখতে পেল : একটা কুকুর ব্যবসায়ী পিচুগিকের কাঠ-গোলা থেকে তিন পায়ে ছুটে বেরিয়ে এল আর সেটাকে তাড়া করে মাড়-দেওয়া ছাপা কাপড়ের শার্ট ও বোতাম-খোলা ওয়েস্টকোট গায়ে একটি লোক শরীরটা ঝুঁকিয়ে হুমড়ি খেয়ে কুকুরের পিছনের একটা পা চেপে ধরল। কুকুরটা আবার ঘেউ-ঘেউ করে উঠল, আর সেই একই চীৎকার আবারও শোনা গেলঃ ''ওটাকে ছেড়ে দিও না।'' অনেকগুলি ঘুমে-ঢুলুঢুলু মুখ দোকানগুলো থেকে উঁকি দিল, আর দেখতে দেখতে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে কাঠ-গোলাটাকে ঘিরে ভিড় করল।

কনেস্টবল বলল, ''একটা হাঙ্গামা বলে মনে হচ্ছে হুজুর।''

ওচুমেলভ মুখটা ঘুরিয়ে ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল। কাঠ-গোলার ফটকের ঠিক সামনেই উপরে উল্লেখিত বোতাম-খোলা ওয়েস্টকোট-পরা লোকটিকে দেখতে পেল। সেখানে দাঁড়িয়ে লোকটি তার ডান হাতটা তুলে ধরে একটা রক্তাক্ত আঙুল ভিড়ের লোকগুলোকে দেখাচ্ছে। ''শয়তান, আমিও তোর এই দশাই করব।'' এই কথাগুলিই যেন লেখা আছে তার নেশাগ্রস্ত মুখে আর আঙুলটা দেখে মনে হচ্ছে যেন তার বিজয়-নিশান। ওচুমেলভ লোকটিকে চিনল—স্যাকরা খৃউকিন। ভিড়ের ঠিক মাঝখানে সামনের পা দুটি ফাঁক করে বসে আছে আসামীটি—বর্জে জাতের একটা সাদা কুকুরের বাচ্চা, টিকলো নাক, পিঠের উপর হলুদ ছোপ; বাচ্চাটার সমস্ত শরীর কাঁপছে। সজল দুটি চোখে ফুটে উঠেছে কষ্ট ও আতংকের ভাব।

ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে ওচুমেলভ প্রশ্ন করল, ''এ সব কি হচ্ছে? তোমরা এখানে কি করছ? তুমিই বা আঙুলটা তুলে ধরেছ কেন? কে চেঁচাচ্ছিল?''

''শান্তশিষ্ট একটা মেষশাবকের মতই আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম হুজুর,'' নিজের মুঠোর উপর একটু কেশে নিয়ে খৃউকিন কথা বলতে শুরু করল। ''এখানে মিস্ত্রি মিস্ত্রিচের কাছে এসেছিলাম কিছু কাঠের দরকারে, আর হঠাৎই, একেবারে বিনা কারণে, ওই কুকুরের বাচ্চাটা আমার আঙুলটা কামড়ে দিল! মাফ করবেন, কিন্তু আমি একজন খেটে-খাওয়া মানুষ...আমার কাজটাও একটু জটিল ধরনের। ওরা যাতে আমাকে ক্ষতিপূরণ দেয় তার ব্যবস্থা করে দিন—হয়তো এক সপ্তাহের মধ্যে এই আঙুলটাকে নাড়াতেই পারব না। আইনে তো একথা লেখা নেই হুজুর যে হিংস্র জানোয়ারদের সঙ্গে আমাদের বাস করতে হবে। প্রত্যেকেই যদি কামড়াতে শুরু করে, তাহলে আর বেঁচে থেকে সুখ কি...''

ওচুমেলভ কাশতে কাশতে ভুরু কুঁচকে শক্ত গলায় বলল, ''হুম...আচ্ছা, আচ্ছা, এটা কার কুকুর? আমি সহজে ছাড়ব না। রাস্তায় কুকুর ছেড়ে দেওয়ার মজা বের করে দেব। যে সব ভদ্রলোকরা আইন মানতে চান না তাদের একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। পাজিটাকে এমন 'ফাইন' করব! —কুকুর ও গরু-বাছুরকে রাস্তায় ছেড়ে দিলে কি হয় সেটা তাকে শিখিয়ে দেব! দেখিয়ে দেব যে কত ধানে কত চাল হয়! এলদিরিন!'' কনেস্টেবলের দিকে তাকিয়ে বলল, ''খুঁজে বার কর এটা কার কুকুর, আর একটা প্রতিবেদন তৈরী কর। অবিলম্বে কুকুরটাকে খতম করে দিতেই হবে। সম্ভবত ওটা পাগলা...আমি জানতে চাই ওটা কার কুকুর।''

ভিড়ের ভিতর থেকে একজন বলে উঠল, ''আমার মনে হয় ওটা ঝিগালভের কুকুর।''

''জেনারেল ঝিগালভ! হুম...আমার কোটটা খোল তো এলদিরিন।—ফুঃ কী গরম পড়েছে! নিশ্চয় বৃষ্টি হবে।'' খৃউকিনের দিকে ঘুরে বলল, ''একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না—এটা তোমাকে কামড়াল কেমন করে? এটা তোমার আঙুলের নাগাল পেল কেমন করে? কুকুরটা তো এতটুকু, আর তুমি বেশ ঢ্যাঙা! নির্ঘাৎ তোমার আঙুলে পেরেকের খোঁচা লেগেছে, আর তার পরে তোমার মাথায় ঢুকেছে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ফন্দি। তোমাদের আমি চিনি। যত সব শয়তান!''

''মজা করার জন্য উনি কুকুরটার নাকে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাকা দিয়েছেন, আর কুকুরটাও ওর আঙুল কামড়ে দিয়েছে। এটা সকলেই বোঝে! খৃউকিন সব সময়ই মানুষের ক্ষতি করেই বেড়ায় হুজুর।''

''মিছে কথা বলাটা ছাড় হে টেঁরা! তুমি তো আমাকে ও কাজ করতে দেখ নি, তাহলে মিথ্যা বলছ কেন? হুজুর বুদ্ধিমান ভদ্রলোক, উনি ভালই জানেন কে মিথ্যা বলছে আর কে সত্যবাদী। আমি যদি মিথ্যা বলে থাকি

তো আদালত আমার বিচার করুক!...এখন তো সব মানুষই সমান। যদি জানতে চাও তো বলি, আমার এই ভাইও পুলিশে কাজ করে—"

"তর্ক করো না!"

কনেস্টবল গম্ভীর মুখে বলল, "না, এটা জেনারেলের কুকুর নয়। জেনারেলের এ রকম কোন কুকুর নেই। তার সবগুলিই শিকারী কুকুর।"

"তুমি ঠিক জান?"

"ঠিক জানি হুজুর।"

"তুমি ঠিকই বলেছ। জেনারেলের কুকুরগুলো দামী, কুলীন জাতের, আর এটা—ভাল করে তাকাও! কুৎসিত, ছাল-পড়া বাচ্চা! এ রকম কুকুর কেউ পোষে? তোমাব কি মাথা খারাপ হয়েছে? এ রকম একটা যদি মস্কো বা পিতার্সবার্গে গিয়ে পড়ত তাহলে তার কি হত জান? কেউ আইন নিয়ে মাথাই ঘামাত না, এক মিনিটের মধ্যেই সেটাকে শেষ করে দিত। তোমাকেই কামড়েছে খ্রিউকিন; এখানেই ছেড়ে দিও না কিন্তু। তাকে উচিত শিক্ষা দিতেই হবে। আজ সময় এসেছে..."

কনেস্টবল আপন মনেই বলে উঠল, "হয় তো এটা জেনারেলের কুকুরও হতে পারে। চোখে দেখেই সব কিছু বলা যায় না। সেদিন তার উঠোনে এই রকম একটা কুকুর দেখেছিলাম বটে।"

ভিড়েব ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, "এটা জেনারেলের কুকুরই বটে।"

"হুম ..এলদিরিন, আমার কোটটা পবিয়ে দাও তো...দমকা হাওয়ায় কেমন যেন শীত-শীত করছে। এটাকে জেনারেলের কাছে নিয়ে যাও, আর সব কথা জেনে এস। তাকে বলো, আমি এটাকে খুঁজে পেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। আবও বলে দিও, এটাকে যেন রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া না হয়। হয়তো এটা খুব দামী কুকুব; প্রত্যেক জানোয়াবই যদি মনে করে যে ওব নাকে একটা সিগাবেটের খোঁচা মেরে দেই, তাহলে অচিবেই কুকুবটার বারোটা বেজে যাবে। কুকুর হল নরম প্রকৃতির জীব। তোমাব হাতটা নামাও বুদ্ধুরাম। সব্বাইকে তোমার বাজে আঙুলটা দেখাচ্ছ কেন? দোষ তো তোমারই।"

"ওই তো জেনাবেলেব বড় রাঁধুনি আসছে, একেই জিজ্ঞাসা করি। হেই প্রোখর! এদিকে এস হে বুড়ো! এই কুকুরটাকে দেখতো--এটা কি তোমাদের?"

"বল কি? এ রকম কুকুর আমাদের কোন কালেই ছিল না।"

ওচুমেলভ বলল, "আর খোঁজ-খবর কবার দবকার নেই। এটা বেওয়ারিশ কুকুর। এখানে দাঁড়িয়ে কথা বাড়িয়ে কি হবে। তোমাকে বলা হল বেওযারিশ, অতএব বেওয়ারিশ। ওটাকে মেবে ফেল; বাস, ব্যাপাবটা চুকে গেল।"

প্রোখর আরও বলল, "এটা আমাদের নয়। কিছুদিন আগে জেনারেলের

ভাই এখানে বেড়াতে এসেছিলেন, এটা তার কুকুর! আমাদের জেনারেল 'বর্জে' জাতের কুকুরে আগ্রহী নন। তার ভাই এখন...."

সারা মুখে উল্লসিত হাসি ছড়িয়ে ওচুমেলভ চেঁচিয়ে বলল, "কি? জেনারেলের ভাই এসে গেছেন? ভ্লাদিমির আইভানভিচ? একবার ভাব! আর আমি জানতেই পারি নি। এখানে থাকবেন তো?"

"হ্যাঁ!"

"একবার ভাব! ভাইকে দেখতে আসছেন। আর আমিই জানি না। তাহলে এটা তার কুকুর? নিয়ে যাও...কী সুন্দর বাচ্চা কুকুর। আর কামড়াল কিনা এই হাঁদারামের আঙুল? হা-হা-হা! আয়, আয়, অত কাঁপছিস কেন? গড়্‌র-গড়্‌র...দুষ্টু বাচ্চাটা খুব রেগে গেছে...."

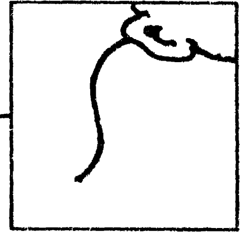
প্রোখর কুকুরটাকে ডেকে কাঠগোলা থেকে বেরিয়ে গেল। ভিড়ের লোকরা খ্রুকিনকে নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল।

"আমি তোমাকে দেখে নেব।" ওচুমেলভ তাকে ভয় দেখাল। তারপর বড় কোটটা গায়ে জড়িয়ে বাজারের ভিতর দিয়ে হাঁটিতে শুরু করল।

১৮৪৮

মুখোশ

The Mask



দাতব্য তহবিলের জন্য অমুক সামাজিক ক্লাবে একটা মুখোস বলনাচের অনুষ্ঠান চলছিল।

তখন রাত বারোটা। নাচের ব্যাপারে নেই এমন পাঁচজন মুখোশবিহীন বুদ্ধিজীবী পড়ার ঘরে একটা বড় টেবিলে বসে ছিল। তাদের নাক ও দাড়ি খবরের কাগজের মধ্যে ডুবে ছিল। তারা পড়ছিল ঝিমুচ্ছিল, আর—সেন্ট পিতার্সবুর্গের সংবাদপত্রসমূহের স্থানীয় সংবাদদাতা এবং অতিশয় উদারমানসিকতাসম্পন্ন জনৈক ভদ্রলোকের ভাষায়—"চিন্তা-ভাবনা" করছিল।

প্রধান হল থেকে 'কোয়াড্রিল' নাচের সুর ভেসে আসছিল। পরিবেশকরা মাঝে মাঝেই দরজার পাশ দিয়ে ছুটোছুটি করছে, তাদের জুতোর খট্‌খট্‌ ও চায়ের বাসনপত্রের টুং টাং শব্দ শোনা যাচ্ছে। অবশ্য পড়ার ঘরে গভীর নৈঃশব্দ বিরাজমান।

"এইখানটা অনেক বেশী আরামদায়ক হবে," একটা নীচু, ঈষৎ চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল; মনে হল যেন একটা স্টোভের শব্দ। "ভিতরে ঢুকে পড়! এ পথে গো মেয়েরা।"

দরজাটা খুলে গেল। পড়ার ঘরে ঢুকল একটি চওড়া, স্থূলকায় লোক, পরিধানে কোচয়ানের পোশাক ও ময়ূরপুচ্ছ আঁটা টুপি, মুখে একটা মুখোশ। তার পিছনে দুটি মহিলা, তাদেরও মুখে মুখোশ; আর ট্রে হাতে একটি পরিবেশক। ট্রের উপর একটা পেট-মোটা সুবাসিত মদের বোতল তিন বোতল লাল মদ ও কয়েকটা গ্লাস সাজানো।

লোকটি বলল, "এই পথে! এ জায়গাটা ঠাণ্ডাও বটে। ট্রে-টা টেবিলের উপর রাখ।...বসে পড় মাদমযজেলরা। ভদ্রমহোদয়গণ, উঠে দাঁড়ান।"

লোকটি সামান্য ঝুঁকে হাত দিয়ে টেবিলের উপর থেকে কয়েকটা সংবাদপত্র সরিয়ে দিল।

"ট্রে-টা এখানে রাখ। ভদ্রমহোদয়গণ, এবার আপনারা যেতে পারেন। এটা খবরের কাগজ ও রাজনীতির জায়গা নয়।—কেটে পড়ুন।"

চশমার ভিতর দিয়ে মুখোশটার দিকে তাকিয়ে একজন বুদ্ধিজীবী বলল, "আমি আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি--আস্তে কথা বলুন। এটা পাঠকক্ষ, হৈ-হুল্লোড়ের জায়গা নয়।. .এটা মদ খাবার জায়গাও নয়।"

"কেন নয়? টেবিলটা কি নড়বড়ে, না সিলিংটা ভেঙে পড়তে পারে? কিন্তু...পাইপটা নামান। খবরের কাগজগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিন। অনেক তো পড়লেন, সেটাই যথেষ্ট, দেখে তো মনে হয় বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, চোখ দুটো তো যাবে, আর আমি এসব সহ্য করব না। বাস।"

পরিবেশক টেবিলের উপর ট্রে-টা রাখল; কাঁধের উপর একটা তোয়ালে ফেলে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে মহিলারা লাল মদে চুমুক দিতে শুরু করল।

নিজের জন্য সুবাসিত মদ গ্লাসে ঢেলে ময়ূরপুচ্ছধারী লোকটি বলতে লাগল, "মানুষের এমন বুদ্ধি কি করে হয় যে তারা এই মদের চাইতে খবরের কাগজকে বড় বলে মনে করে? মাননীয় মশায়রা, আমার তো মনে হয়, আপনাদের মদে চুমুক দেবার মত পয়সা নেই বলেই কাগজকে ভালবাসেন! ঠিক বলি নি? হা, হা! আসুন না। এ সব ভারিক্কি ভাব ছাড়ুন তো। বরং এক পাত্র টানুন।"

ময়ূরপুচ্ছধারী লোকটি কিছুটা দাঁড়িয়ে থেকে চশমা-পরা ভদ্রলোকের হাত থেকে খবরের কাগজটা কেড়ে নিল। ভদ্রলোক প্রথমে ফ্যাকাসে, পরে লাল হয়ে উঠল। সে অন্য বুদ্ধিজীবীদের দিকে তাকাল, আর বুদ্ধিজীবীরা তার দিকে।

সে রেগে বলল, "আরে মশায়, আপনারা দেখছি নিজেদেরই ভুলে গেছেন। পড়ার ঘরটাকে তো আপনি শুঁড়িখানা বানিয়ে তুলেছেন, আপনার আচরণ লজ্জাজনক--লোকের হাত থেকে সংবাদপত্র টেনে ছিঁড়ে ফেললেন। আমি এ সব সহ্য করব না! আপনি জানেন না মশায় কার সঙ্গে কথা বলছেন! আমি ব্যাংকের ম্যানেজার ঝেস্তিয়াকভ।"

"আপনি ঝেস্তিয়াকভ হলেন তো আমার বয়েই গেল! আর আপনার

সংবাদপত্র ''

সংবাদপত্রটা তুলে সে টুকবো টুকবো কবে ছিঁড়ে ফেলল।

ঝেস্তিযাকভ ঘোঁৎ-ঘোঁৎ কবে বলল, ''ভদ্রমহোদযগণ, এটা কি হল? এ তো অত্যাচাব! বীতিমত ভযংকব ব্যাপাব।''

লোকটি হেসে উঠল। 'ছোট বাবুটি বেগে গেছেন। উঃ, আমি তো ভয পেযে গেলাম। আমাব হাঁটু দুটো পর্যন্ত কাঁপছে। এই দেখুন না ভদ্রমহোদযবা। ঠাট্টা বাখুন, আপনাব সঙ্গে কথা বলাব ইচ্ছাও আমাব নেই। দেখতেই তো পাচ্ছেন, ভদ্রমহিলাদেব নিযে আমি একটু একা থাকতে চাই, একটু ফূর্তি কবতে চাই, দযা কবে তাতে বাদ সাধবেন না, চুপচাপ চলে যান। দযা কবে এই দিকে মিস্টাব বেলেবুখিন, তাবপব যেখানে খুশি চলে যান। ও বকম নাক উঁচু কবছেন কেন? আমি তো বললাম, চলে যান, তাব মর্থ বেবিযে যাও। জলদি, নইলে এক ঘুষিতে চোযাল ভেঙে দেব।''

বাগে লাল হযে দুই কাঁধ ঝাঁকুনি দিযে অনাথ আদালতেব কোষাধ্যক্ষ বেলেবুখিন বলল, 'এ সব কি হচ্ছে? আমি তো বুঝতেই পাবছি না কোথা থেকে একটা চাষাড়ে লোক এখানে ঢুকেছে আব হঠাৎ এইসব কাণ্ড।

'কি বললে? চাষাড়ে?'' মযূবপুচ্ছধাবী লোকটি চীৎকাব কবে বলল। ক্ষেপে গিযে সে এত জোবে টেবিলেব উপব ঘুষি মাবল যে ট্রেব উপবে গ্লাসগুলি লাফিযে উঠল। তুমি কাব সঙ্গে কথা বলছ জান? তুমি কি ভেবেছ আমি মুখোশ পবে আছি বলে যা খুশি তাই বলে যাবে? আমি বেবিযে যেতে বলেছি, এক্ষুণই বেবিযে যাও। ব্যাংক ম্যানেজাবও সবে পড়! সকলেই কেটে পড়। একলাফে নীল আকাশে চলে যাও।'

প্রবল উত্তেজনায় ঝেস্তিযাকভেব চশমা পর্যন্ত ঘামে ভিজে উঠেছে। সে বলল সে ব্যবস্থা আমবাই কবছি। দেখাচ্ছি মজা। কে আছেন ম্যানেজাবকে ডেকে দিন তো। '

এক মিনিট পবেই লাল-মাথা ছোটখাট ম্যানেজাবটি ঘবে ঢুকল। কোটেব উপব একটা বিবর্ণ নীল ফিতে ঝোলানো। সে এতক্ষণ নাচছিল। তখনও হাঁপাচ্ছে।

সে বলল, 'দযা কবে এখান থেকে চলে যান। এটা মদ খাবাব জাযগা নয।''

মুখোশপবা লোকটি বলে উঠল, ''তুমি আবাব কোথা থেকে উদয হলে? আমি তোমাকে ডেকে পাঠিযেছি? তাহলে?''

'অত খোঁজে দবকাব কি? দযা কবে চলে যান।''

শোন হে বাপু, তোমাকে এক মিনিট সময দিচ্ছি। যেহেতু তুমি এখানকাব ম্যানেজাব, একজন কর্তাব্যক্তি, তাই এই ভাঁড়দেব টানতে টানতে বেব কবে দাও। আমাব ম্যাদমযজেলবা বাইবেব লোকেব উপস্থিতিটা পছন্দ কবছেন না। তাবা বড়ই লাজুক, আব আমিও চাই তাদেব অনাবৃত দেহ

দেখে আমাব টাকাটা উশুল কবে নেই।''

ঝেস্তিয়াকভ চীৎকাব কবে বলে উঠল, ''এই হাঁদাবামটা বুঝতে পাবছে না যে এটা গোশালা নয। তুমি এভস্ত্রাভ স্পিবিদোনিচকে পাঠিযে দাও।''

সাবা ক্লাবে এভস্ত্রাত স্পিবিদোনিচেব খোঁজ কবা হল। ''এভস্ত্রাৎ স্পিবিদোনিচ কোথায?''

অচিবেই পুলিশেব পোশাক-পবা একটি বুড়ো মানুষ এসে হাজিব হল। তাব চোখ দুটো হিংস্রভাবে বেবিযে এসেছে, মোমে মাজা গোঁফ জোড়া খাড়া হযে উঠেছে।

সাঁই সাঁই শব্দ কবে সে বলল, ''দযা কবে এখান থেকে চলে যান।''

খুশিতে হো-হো কবে হেসে উঠে লোকটি বলল, ' আবে এ যে আবাব ভয দেখাচ্ছে। হায ভগবান আমাকে ভয দেখাচ্ছে। কে আছ বাঁচাও, আমি যে থব্ থব কবে কাঁপছি। হা ঈশ্বব। বিড়ালেব মত গোঁফ আবাব চোখ দুটো কেমন ঘোবাচ্ছে হি, হি, হি।''

এভস্ত্রাত্ স্পিবিদোনিচ কাঁপতে কাঁপতে সাধ্যমত চীৎকাব কবে বলল দযা কবে তর্ক কববেন না। বেবিযে যান। নইলে আমিই বেব কবে দেব।'

পড়াব ঘবে শুরু হল এক অকল্পনীয হট্টগোল। এভস্ত্রাত স্পিবিদোনিচ বাগে চিংড়ি মাছেব মত লাল হযে পা ঠুকে চীৎকাব কবতে লাগল। ঝেস্তিযাকভ চীৎকাব কবছে। বেলেবুখিন চীৎকাব কবছে। সব ক'জন বুদ্ধিজীবীও চীৎকাব কবছে, কিন্তু মুখোশপবা লোকটিব নীচু, আধচাপা খাদেব গলা তাদেব সকলেব গলাকে ডুবিযে দিল। সে গোলমালে নাচ বন্ধ হযে গেল, আব সব লোক স্রোতেব মত নাচ ঘব থেকে পড়াব ঘবেব দিকে ছুটল।

একটা বড় বকমেব তাক লাগিযে দেবাব জন্য এভস্ত্রাৎ ক্লাবেব সব পুলিশদেব ডেকে পাঠাল, আব নিজে বসে গেল একটা প্রতিবেদন লিখতে।

এ বাসেব নীচ আঙুল ঢুকিযে মুখোশপবা লোকটি বলল, লিখে যাও লিখে যাও এবাব আমাব মত বেচাবি ছোট মানুষটিব কি হবে? হা, হা, হা। আচ্ছা প্রতিবেদনটি তৈবী তো? সকলে সই কবেছে? বেশ তাহলে এবাব চোখ তুলে তাকাও এক দুই তিন।'

লোকটি উঠে দাঁড়াল, সম্পূর্ণ খাড়া হযে মুখ থেকে মুখোশটা ছিঁড়ে ফেলল। নিজেব মাতাল মুখটাকে খুলে দিযে তাব ফলাফল দেখে খুশি হযে লোকটি একটা হাতলচেযাবে বসে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। নিশ্চিতরূপেই প্রতিক্রিযাটা হযেছিল অসাধাবণ। বুদ্ধিজীবীবা হতবুদ্ধি হযে পবস্পবেব দিকে তাকিযে কেমন যেন বিবর্ণ হযে গেল, অনেকেই মাথাব পিছনটা চুলকোতে লাগল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা বড় বকমেব ভুল কবা মানুষেব মত এভস্ত্রাত স্পিবিদোনিচ গলা খাঁকাবি দিতে লাগল।

সকলেই মানুষটিকে চিনতে পেবেছে—লোকটি স্থানীয কোটিপতি,

কল-কারখানার মালিক এবং বংশানুক্রমিক খেতাবপ্রাপ্ত নাগরিক পিয়াতিগোরভ। নিজের নানাবিধ কুৎসা, দানধ্যান এবং—স্থানীয় সংবাদপত্রের ভাষায়—শিক্ষানুরাগের জন্যই তার খ্যাতি।

একটু চুপ করে থেকে পিয়াতিগোরভ প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, এবার আপনারা যাবেন কি যাবেন না?"

শান্তভাবে একটিও কথা না বলে বুদ্ধিজীবীরা পায়ে পায়ে পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিয়াতিগোরভ দরজাটা বন্ধ করে দিল।

যে পরিবেশকটি মদ নিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকেছিল তার ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে এভ্স্ত্রাত্ স্পিরিদোনিচ বলল, "কিন্তু তুই তো জানতিস ইনি পিয়াতিগোরভ! তাহলে চুপ করে ছিলি কেন?"

"আমাকে বলতে নিষেধ করা হয়েছিল!"

"বলতে নিষেধ করা হয়েছিল!...ব্যাটা গাধা, এক মাসের জন্য তোকে ঘানি টানতে পাঠাই, তখন বুঝবি 'বলতে মানা করা' কাকে বলে। বেরিয়ে যা।" পরে বুদ্ধিজীবীদের দিকে ঘুরে বলল, "আর আপনাদেরও বলিহারী ভদ্রমহোদয়গণ!" একেবারে একটা বিদ্রোহ ঘটিয়ে ফেললেন! দশ মিনিটের জন্য পড়ার ঘরটা ছেড়ে দিতে পারলেন না! বিছানা তো পেতেছেন, এবার শুয়ে পড়ুন! ওঃ, ভদ্রজন,....এ কাজ করা আপনাদের উচিত হয় নি!"

বুদ্ধিজীবীরা ক্লাবের মধ্যে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল। বিষণ্ন, বিমূঢ়, অপরাধী লোকগুলো অশুভ ভবিষ্যতের আশংকায় অভিভূত হয়ে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে। তাদের স্ত্রী ও কন্যারা যখন জানতে পারল পিয়াতিগোরভ "অসন্তুষ্ট" ও ক্রুদ্ধ হয়েছে তখন তারাও মনমরা হয়ে বাড়িতে ফিরে যাওয়াই স্থির করল। নাচ বন্ধ হয়ে গেল।

দু'টোর সময় পিয়াতিগোরভ পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সে তখন নেশাগ্রস্ত, তার পা টলছে। নাচ-ঘরে ঢুকে অর্কেস্ট্রার পাশে বসে পড়ল, বাজনা শুনে ঢুলতে লাগল, করুণভাবে মাথাটা নীচু করল, তারপর নাক ডাকতে শুরু করল।

সংগঠকরা বাজনাদারদের ইসারায় বলল, "আর বাজিয়ো না! শ্স্স্! ইগর নিলিচ ঘুমিয়ে পড়েছেন..."

বেলেবুখিন কোটিপতির কানের কাছে ঝুঁকে প্রশ্ন করল, "ইগর নিলিচ, আপনাকে বাড়িতে নিয়ে যাব কি?"

পিয়াতিগোরভ ঠোঁট নাড়ল, যেন গালের উপর থেকে মাছি তাড়াবার চেষ্টা করল।

"আপনি কি বাড়িতে যেতে চান?" বেলেবুখিন আবার জিজ্ঞাসা করল। "আপনার গাড়িটা ডাকব কি?"

"এঃ?...কে কি চাই?"

"আপনাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাই স্যার। ঘুমবার সময় হয়েছে!"

"ঠিক আছে। বাড়িতেই নিয়ে চল।"

বেলেবুখিন খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে পিয়াতিগোবভকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য কবতে লাগল। অপব বুদ্ধিজীবীবাও ছুটে এল। বংশানুক্রমিক খেতাবপ্রাপ্ত নাবিকটাকে হাসি মুখে তুলে নিয়ে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

পিয়াতিগোবভকে তাব আসনে ঠিকমত বসিয়ে দিয়ে ঝেন্তিযাকভ খুশিব সুবে বলল, "একমাত্র একজন শিল্পী একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিই এ বকম একটা গোটা দলকে বোকা বানাতে পাবে। আক্ষবিক অর্থেই আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি ইগব নিলিচ! তাই তো এখনও হেসেই চলেছি! হা, হা! আব আমবা কিনা বেগে একটা গণ্ডগোল পাকিয়েছিলাম। হা, হা! বিশ্বাস কৰুন এত হাসি আগে কখনও হাসি নি, এমন কি থিয়েটাব দেখতে বসেও! লাখ লাখ হাসি! যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন এই স্মবণীয় সন্ধ্যাটিকে মনে বাখব!

পিয়াতিগোবভকে বিদায় কবে দিয়ে বুদ্ধিজীবীবা সোল্লাসে আবাম কবে বসল।

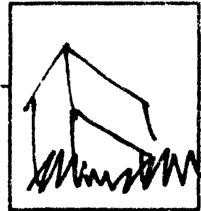
ঝেন্তিযাকভ খুশি হয়ে বলল, 'বিদাযকালে তিনি আমাব সঙ্গে কবমর্দন কবেছেন। কাজেই তিনি মোটে বাগ কবেন নি।"

এভস্রাত স্পিবিদোনিচ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'সেটাই আশা কবা যাক! লোকটা মোটেই ভাল নয়, ইতব পাজি কিন্তু আব যাই হোক তিনি আমাদেব উপকাবই কবেন! নিজেদেব দিকটা ভুললে তো চলবে না।"

১৮৮৪

অথর্ব বৃদ্ধ ও দুরারোগ্য রোগীদের আশ্রম

In The Home For The Senile And Incurably Ill



প্রত্যেক শনিবাব সন্ধ্যায় ছেঁড়া জুতো পাযে গলগণ্ডগ্রস্ত ছোট্ট মেয়ে সাশা এনিযাকিনা তাব মাব সঙ্গে অথর্ব বৃদ্ধ ও দুবাবোগ্য বোগীদেব অমুক আশ্রমটি দেখতে যায। তাব ঠাকুবদা অবসবপ্রাপ্ত বথী-সৈনিক পাবফোনি সাভিচ সেখানে থাকে। ঠাকুবদাব ঘবটা গুমোট ও গর্জন তেলেব গন্ধে ভবা। দেযালে যত সব নোংবা ছবি টাঙানো—স্নানবতা সুন্দবী, বোদ-লাগানো পবীব দল মাথাব পিছন দিকে টপ-হ্যাট পবা একটা লোক ফটিলেব ভিতব দিয়ে দেখছে এক উলঙ্গিনী নাবীকে, এমনই সব ছবি। ঘবেব কোণে কোণে মাকড়শাব জাল, টেবিলেব উপব রুটিব টুকবো ও মাছেব আঁশ।...ঠাকুবদা নিজেও কিছু দর্শনীয নয। সে বুড়ো, নুব্জ দেহ, আব পাড় নস্যিদাব। তাব চোখ দিয়ে জল পড়ে, দন্তহীন মুখটা সব সময়ই হা কবে থাকে। সাশা ও তাব মা যখন ঘবে ঢোকে তখন ঠাকুবদা হাসে, আব তাব সে হাসিও একটা বড় বলিবেখাব মত দেখায়।

সাশা যখন ঠাকুরদার হাতে চুমো খেতে তার কাছে যায় তখন ঠাকুরদা জিজ্ঞাসা করে, ''আচ্ছা, তোর বাবা কেমন আছে?''

সাশা জবাব দেয় না। মা নীরবে কাঁদিতে থাকে।

''এখনও শুঁড়িখানায় পিয়ানো বাজিয়ে বেড়ায়? বটে...আগাগোড়াই কেবল অবাধ্যতা আর অহংকার। সে তোর মাকে বিয়ে করল...সেও আর এক বোকামি। হ্যাঁ। ভদ্রলোকের ছেলে, আর যাকে-তাকে বিয়ে করে বসল, এক অভিনেত্রীকে, সে তো সেগেঁইর মেয়ে...সেগেঁই ছিল আমার ক্ল্যারিওনেটবাদক, আবার আস্তাবলও পরিষ্কার করত।. কাঁদ, কাঁদ নারী! আমি সত্যি কথা বলছি। তুমি তো একটা সাধারণ মেয়ে, তার বেশী কিছু নও!''

সেগেঁইর মেয়ে ও এক অভিনেত্রী মার দিকে তাকিয়ে সাশাও কাঁদতে শুরু করল। কিছুক্ষণ এক বেদনাদায়ক কষ্টকর নিস্তব্ধতা।....একটা কাঠের পাওয়ালা বুড়ো ছোট একটা তামার সামোভার নিয়ে ঘরে ঢুকল। পরফেনি সার্ভিস এক চিমটে অত্যন্ত কড়া এবং অতিমাত্রায় ধূসর রংয়ের চা কেটলির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে নাড়তে লাগল।

তিনটে বড় কাপ ভর্তি চা ঢেলে সে বলল, ''খেয়ে নে! তুমিও খাও অভিনেত্রী!''

অতিথিরা কাপ তুলে নিল। চা-টা বাজে, ছাতাপড়া গন্ধ, তবু তাদের খেতেই হবে। নইলে ঠাকুরদা কষ্ট পাবে। চা খাওয়া শেষ হলে পারফেনি সার্ভিস নাতনিকে হাঁটুর উপর বসিয়ে সস্নেহ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আলাপ জমিয়ে তুলল।

''তোর একটা বিশিষ্ট উপাধি আছে রে নাতনি! ভুলে যাস্ নি আমাদের রক্ত শুধুই এক অভিনেত্রীর রক্ত নয়। আমি বড়ই অভাবের মধ্যে আছি, আর তোর বাবাও শুঁড়িখানায় পিয়ানো বাজিয়ে বেড়ায়; তাতে তুই কিছু মনে করিস না। তোর বাবার এই পরিণতি হয়েছে কারণ সে উচ্ছৃংখল ও অহংকারী। কিন্তু আমার দুঃখের কারণ দারিদ্র্য। একদিন আমরাও নাম-করা লোক ছিলাম। আমি কে ছিলাম সকলকে জিজ্ঞাসা করিস। শুনলে তুই অবাক হয়ে যাবি।''

হাড়-কঠিন হাত দিয়ে সাশার মাথাটা সাদরে চাপড়াতে চাপড়াতে ঠাকুরদা তাকে কত কথা বলতে লাগল।

''আমাদের গোটা জেলায় মাত্র তিনজন বড়লোক ছিল; কাউন্ট ইগর গ্রিগোরিচ, শাসনকর্তা ও আমি। আমরাই ছিলাম একেবারে উপরতলার লোক, আর আমাদের দাপট ছিল খুব। আমি ধনী ছিলাম—নারে নাতনি...সম্বলের মধ্যে ছিল মাত্র পাঁচ হাজার ডেসিয়াটিন জমি আর ছয় শ' মনুষ্য—এবং আরও অনেক কিছু। আমার কোন বড় মাপের আত্মীয়-স্বজন ছিল না। আমি লেখক নই, রাফেল নই, একজন দার্শনিকও নই। এক কথায় একটি মনুষ্য মাত্র...কিন্তু তথাপি—শোন্‌রে নাতনী!—কখনও কারও সম্মুখে টুপি খুলে দাঁড়াই নি। শাসনকর্তাকে ডাকতাম ভাসিয়া বলে,

মহামান্যের সঙ্গে করমর্দন করতাম। আর কাউন্ট ইগর গ্রিগোরিচ ছিল আমার পেয়ারের বন্ধু। আর সে সব কিছুর মূলে ছিল আমার বুদ্ধিদীপ্ত জীবনযাত্রা, ইউরোপীয় ধাঁচের চিন্তা-ভাবনা...."

দীর্ঘ ভূমিকার পরে ঠাকুরদা তার অতীত জীবনের কথা শোনাল। মহা উৎসাহে কথা বলতে লাগল।

"আমি চাষী মেয়েছেলেদের শুকনো মটরের উপর হাঁটু ভেঙে বসিয়ে রাখতাম। মেয়েগুলো কষ্ট পেত, কিন্তু পুরুষগুলো হাসত। পুরুষগুলো হাসত আর আমিও হাসতাম, বেশ মজা পেতাম। শিক্ষিত চিরদাসদেব জন্য অন্যরকম শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। তাদের হয় হিসাবের খাতাগুলি মুখস্ত করতে হত, নয়তো আমার হুকুমে ছাদের উপর উঠে এত জোরে 'ইউরি মাইলোস্লাভস্কি' উপন্যাস থেকে পড়তে হত যা আমি ঘরে বসে শুনতে পেতাম। যদি এই সব মানসিক শাস্তিতে কাজ না হত তাহলে দৈহিক শাস্তি।"

যে শৃংখলা না থাকলে "মানুষ অনুশীলনবিহীন মতবাদের মত হয়ে পড়ে" তার কথা বলতে গিয়ে ঠাকুরদা আরও বলত যে, শাস্তি ও পুরস্কারের মধ্যে একটা ভারসাম্য অবশ্যই রাখতে হবে।

"প্রতিটি সাহসিক কাজের জন্য—যেমন চোরধরা—আমি ভাল পুরস্কার দিতাম; বুড়োদের সঙ্গে তরুণীদের বিয়ে দিতাম, যুবকদের সামরিক চাকরি থেকে রেহাই দিতাম, এবং এই রকম অনেক কিছু করতাম।"

ঠাকুরদা যেরকম আমুদে লোক ছিল "সেবকমটি আজকাল দেখা যায় না।"

"সীমিত সাধ্য সত্ত্বেও আমার বাদক ও গায়কের সংখ্যা ছিল ষাট। আমার হয়ে বাজনার দেখাশোনা করত একজন ইহুদি, আর সঙ্গীতের ব্যাপারটা দেখত একজন বারখাস্ত পাদরি। ইহুদিটি ছিল একজন বড় মাপের সুরকার. স্বয়ং শয়তানও তার মত বাজাতে পারত না। উচ্চগ্রামে সে এমন সুর-ঝংকার তুলতে পাবত যেমনটি রুবিনাস্টিন বা বীঠোভেনও তাদের বেহালায় বাজাতে পারত না।....সে সুরের সাধনা শিখেছিল বিদেশে, সব রকম যন্ত্রে তার হাত ছিল পাকা, আর সঙ্গীত নির্দেশক হিসাবে তার হাতের আন্দোলন ছিল উঁচুদরের। তার একটিমাত্র ত্রুটি ছিল : তার গায়ে ছিল পচা মাছের গন্ধ, আর সৌজন্যবোধের কোন বালাই ছিল না। সেই জন্যই তাকে একটা পর্দার আড়ালে রাখতে হত।...বরখাস্ত পাদরিটিও যে বোকা লোক ছিল তা নয়; সে স্বরলিপি পড়তে জানত, আর বাজাবার সময় কিভাবে নির্দেশ দিতে হয় সেটাও জানত। তার শৃংখলাবোধ এতই উঁচুদরের ছিল যে আমি পর্যন্ত বিস্মিত হতাম। সে যা চাইত তাই পেত। সে ছিল একজন শিল্পী...যেমন আকর্ষণীয় তেমনই মর্যাদাসম্পন্ন চেহারা। কেবল একটা দোষ ছিল—ভীষণ মদ খেত; কিন্তু জানিস নাতনি, সেটা নির্ভর করে তুমি লোকটা কে। মদ খাওয়াটা একজনের পক্ষে ক্ষতিকর আবার অন্যের পক্ষে দরকারী।

একজন গায়কের মদ প্রয়োজন, কারণ ভদ্‌কা কণ্ঠস্বরকে সমৃদ্ধ করে। ইহুদিটিকে আমি বছরে একশ' রুব্‌লের ব্যাংকনোট দিতাম, কিন্তু পাদরিকে কিছুই দিতাম না। তার শুধু থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তাকে মাইনে দেওয়া হত জিনিস দিয়েঃ খাবার, মাংস, নুন, মেয়েমানুষ, জ্বালানি, ইত্যাদি। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল কম্বলের সঙ্গে ছারপোকার মতই নিবিড়, যদিও প্রায়ই দুটি লোক তাকে তুলে ধরত আর আমি চাবুক মারতাম।...মনে পড়ে, একদিন তাকে আর সেগেইকে, মানে ওর বাবাকে, তোর মার বাবাকে, একসঙ্গে বেঁধে...''

সাশা হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরল। তার মা তখন কাগজের মত ফ্যাকাসে হয়ে একটু একটু কাঁপছে।

''মামা, চল বাড়ি যাই...আমার ভয় করছে।''

''কিসের ভয় রে নাতনি?''

ঠাকুরদা নাতনির দিকে এগিয়ে গেল, মেয়েটি তার কাছ থেকে সরে গিয়ে মাকে আরও বেশী করে জড়িয়ে ধরল।

মা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বলল, ''নিশ্চয় ওর মাথা ধরেছে। ওর ঘুমের সময় হয়ে গেছে। চলি—''

যাবার আগে সাশার মা ঠাকুরদার কাছে গিয়ে তার কানে কানে কি যেন বলল।

ভুরু কুঁচকে আর ঠোঁট চেটে ঠাকুরদা বলল, ''তোমাকে একটা কোপেকও দেব না। একটা কোপেকও না। ওর বাবা শুঁড়িখানা থেকে ওর জন্য জুতো কেনার টাকা আনুক, কিন্তু আমার কাছে এক কোপেকও মিলবে না।...তোমরা অনেক নীচে নেমে গেছ। আমি তোমাদের কৃপা করি, কিন্তু কিছু চিঠি ছাড়া আর কিছুই তো পাই না। তোমার সেই আদুরে গোপাল কয়েকদিন আগে আমাকে কি রকম একটা চিঠি লিখেছে তা তুমি জান? লিখেছে 'প্লাইউস্‌কিনের কাছে মাথা নোয়ানোর আগে আমি বরং শুঁড়িখানা ঘুরে ঘুরে রুটির টুকরো কুড়িয়ে বেড়াব।' আর সে চিঠিটা লিখেছে তার নিজের বাবার কাছে।''

সাশার মা মিনতি করে বলল, ''তাকে ক্ষমা করুন। সে বড় দুঃখী, বড় অভিমানী ...''

সে অনেক সময় ধরে কাকুতি-মিনতি করল। শেষ পর্যন্ত ঠাকুরদা রাগে থুথু ফেলতে ফেলতে তার সিন্দুকটা খুলল এবং সেটাকে সমস্ত শরীর দিয়ে ঢেকে রেখে একটা হলদেটে অত্যন্ত দুমড়ানো ব্যাংকনোট বের করল। স্ত্রীলোকটি দুটি আঙুল দিয়ে সেটাকে ধরে নিয়ে পাছে সে নিজেই নোংরা হয়ে যায় এই ভয়ে তড়িঘড়ি নোটটাকে পকেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। এক মিনিট পরে সে ও তার মেয়ে আশ্রমের অন্ধকার ফটকের ভিতর দিয়ে দ্রুত পায়ে চলতে লাগল।

সাশা কাঁপতে কাঁপতে বলল, ''মামা, আর কোন দিন আমাকে

ঠাকুরদার কাছে নিয়ে যেয়ো না। তাকে দেখলে আমার ভয় করে।''

'ও কথা বলতে নেই সাশা আমাদের যেতেই হবে নইলে যে আমরা খেতে পাব না। তোমার বাবার এক পয়সা উপার্জন নেই। সে অসুস্থ আর সে মদ খায়।''

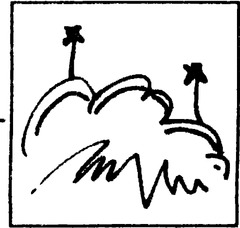
বাবা মদ খায় কেন মামা?''

' তার খুব দুঃখ, তাই মদ খায়। দেখো সাশা, আমরা যে তোমার ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করছি সেকথা তোমার বাবাকে যেন বলে দিও না। সে খুব রেগে যাবে আর তার ফলে তার কাশিও বেড়ে যাবে সে খুব অহংকারী মানুষ, আমরা যে টাকা পয়সা চাই এটা তার পছন্দ নয় তাই তাকে কিছু বলো না বুঝলে?''

১৮৮৪

মার্শালের বিধবা পত্নী

The Marshal's Widow



প্রতি বছর ফেব্রুয়ারির পয়লা তারিখে শহিদ মহাত্মা ত্রাইফনের প্রয়াণ দিবসে জমিদার সমাজের প্রাক্তন জেলা মার্শাল ত্রাইফন লিভোভিচ জাভজিয়াতভের বিধবা পত্নীর জমিদারীতে অসাধারণ কর্মচাঞ্চল্য দেখা দেয়। সেই দিনটিতে লিউবভ পেত্রভনা জাভজিয়াতভা স্বর্গত মহাত্মার উদ্দেশে একটা প্রার্থনা-সভার আয়োজন করে এবং তার পরে একটা ধন্যবাদ প্রদানের অনুষ্ঠান হয়। সারা জেলার মানুষ প্রার্থনাসভায় যোগ দেয়। সেখানে দেখতে পাবেন বর্তমান মার্শাল খ্রুমভ, জমিদার পরিষদের সভাপতি মার্ফুৎকিন, স্থায়ী সদস্য পোত্রশকভ, দুই জেলা-জজ, পুলিশ-প্রধান ক্রিনোলিনভ, দুই পুলিশ ইন্সপেক্টর, জমিদার পরিষদের ডাক্তার দিভর্নিয়াগিন (যার গায়ে আইডোফর্মের গন্ধ) এবং ছোট-বড় সব জমিদার-জোতদার, সর্বসাকুল্যে প্রায় পঞ্চাশ জনকে।

বিকেলে ঠিক ১২ টার সময় লম্বা-মুখ অতিথিরা বিভিন্ন ঘর থেকে ড্রয়িংরুমের দিকে পা বাড়ায়। মেঝেতে কার্পেট পাতা, ধাপগুলি নিঃশব্দ, কিন্তু অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য রক্ষা করতে আপনাকে পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে এবং হাঁটতে হবে দুই হাতে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে। ড্রয়িং-রুমে সব কিছু প্রস্তুত। মাথায় কামেলাউকিন (পুরোহিতের টুপি) পরা ছোটখাট বৃদ্ধ এভ্‌মেনি কালো পোশাকটা পরে নিচ্ছে। ডিয়েকন কনকর্ডিয়েভ যথাযথ পোশাক পরে নীরবে প্রার্থনা পুস্তকের পাতা ওল্টাচ্ছে আর পাতার ফাঁকে কাগজের টুকরো ঢুকিয়ে রাখছে। সামনের হলের দরজায় মন্ত্রপাঠক লুকা ধূপ জ্বালাচ্ছে; তার গাল দুটো ফোলা আর চোখ দুটো

বের-করা। ড্রয়িং-রুমটা ধীরে ধীরে ভরে যাচ্ছে গাঢ় নীল স্বচ্ছ ধোঁয়ায় আর ধূপের গন্ধে। যুবক শিক্ষক জেলিকন্‌স্কির পরনে নতুন ব্যাগি ফ্রক-কোট আর মুখময় বড় বড় ব্রণের দাগ; একটা রূপোর পাতে মোড়া ট্রেতে মোমবাতি সাজিয়ে সে জনে জনে বিতরণ করছে। গৃহকর্ত্রী লিউবভ পেত্রভ্‌না সকলের সামনে একটা ছোট টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। টেবিলের উপর রাখা আছে একটা ''কুতিয়া'' (মিষ্টান্ন)-এর পাত্র। গৃহকর্ত্রী আগে থেকেই মুখের উপর একটা রুমাল চাপা দিয়ে রেখেছে। চারদিক নীরব; মাঝে মাঝে সে নীরবতা ভঙ্গ করছে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ।

প্রার্থনা-অনুষ্ঠান শুরু হল। ধূপতি থেকে ঘন নীল ধোঁয়ার স্রোত-ধারা পাকিয়ে-পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে বৌদ্রঝলকের মত; মোমবাতির ক্ষীণ ফট্‌ফট্‌ শব্দ হচ্ছে। গান শুরু হল; প্রথমে উচ্চগ্রামে, কানে তালা লাগাবার মত জোরে; গায়কবৃন্দ ঘরের শব্দ-প্রসারণ ব্যবস্থার সঙ্গে যতই নিজেদের কণ্ঠস্বরকে মিলিয়ে নিতে পাবল ততই তাদের গানও হতে লাগল নরম ও সুসমঞ্জস্য। সব সুরই বিষণ্ণ ও নৈরাশ্যপূর্ণ। সেই বিষণ্ণ পবিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অতিথিরাও ক্রমেই বিষময় হয়ে উঠল। তাদের মনের ভিতর ঘুরতে লাগল মানব জীবনের স্বল্পায়ু, ক্ষণস্থায়িত্ব ও পার্থিব অহমিকার নানা চিন্তা! তাদের মনে পড়ল স্বাস্থ্যবান, আরক্ত কপোল স্বগত জাভ্‌জিয়াতভের কথা। লোকটি এক চুমুকে এক বোতল শ্যাম্পেন শেষ করে ফেলত আর কপাল দিয়ে ঠুকে একটা আয়না ভেঙে ফেলত। কিন্তু সমবেত কণ্ঠ যখন গান ধরল ''সন্তদের পাশে শান্তিতে থাক'' আর গৃহকর্ত্রী যখন ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল তখন অতিথিরা মনের দুঃখে এক পা থেকে অপর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শুরু করল। যারা অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর তারা গলায় ও চোখের কোণে একটা সুড়সুড়ি অনুভব করতে লাগল। জমিদার পরিষদের সভাপতি মার্ফুৎকিন মনের এই অপ্রীতিকর অনুভূতিকে ভুলবার জন্য পুলিশ প্রধানের দিকে ঝুঁকে তার কানে কানে বলল :

''আমি কাল আইভান ফিয়োদোরভিচের বাড়ি গিয়েছিলাম।...পিয়োতর পেত্রভিচ আর আমি বিনা তুরুপে একটা ''গ্র্যাণ্ড স্লাম'' করে ফেললাম। ঈশ্বরের দিব্যি, সত্যি করেছি।...ওল্‌গা আন্দ্রেয়েভ্‌নার দাঁতে দাঁতে লেগে এমন খটখট শব্দ উঠল যে তার নকল দাঁতটা মুখ থেকে খুলে পড়ে গেল।''

কিন্তু এখন তারা গাইছে ''শাশ্বত স্মৃতি''। জেলিকন্‌স্কি সসম্মানে মোমবাতিগুলো ফিরিয়ে নিল। অনুষ্ঠান শেষ হল। তারপর মুহূর্তকালের জন্য হৈ-চৈ হল, পোশাক পরিবর্তন হল, তারপর প্রার্থনা। প্রার্থনার পরে ফাদার এভ্‌মোনি পোশাক ছাড়ল, অতিথিরা হাত ঘষে কাশতে লাগল, আর তাদের গৃহকর্ত্রী প্রয়াত ত্রাইফন লিভোভিচের গুণকীর্তন করতে লাগল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিবরণ শেষ করে সে বলল, ''ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, দয়া করে যার যার কাজ করুন।''

কাউকে ধাক্কা না দিয়ে বা কারও পা না মাড়িয়ে অতিথিরা অতি দ্রুত খাবার ঘরের দিকে ছুটল। সেখানে তাদের জন্য ভোজ্য প্রস্তুত। সে ভোজ্য

এতই উপাদেয় ও মহার্ঘ যে প্রতি বছর তা দেখে ডিয়েকন কন্‌কর্দিয়েভ আপনা থেকেই দুই হাত ছুঁড়ে, বিস্ময়ে মাথাটা নেড়ে বলে ওঠে ঃ

"অলৌকিক! ফাদার এভ্‌মেনি, এটা ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত প্রসাদ, মানুষের ভোজ্য নয়।"

লাঞ্চটা অপূর্ব। আমিষ-নিরামিষ সব রকম খাবার টেবিলে সাজানো; তবে একটা অলৌকিক ব্যাপার ঃ একমাত্র মদজাতীয় পানীয় ছাড়া টেবিলে আর সব কিছু আছে। লিউবভ পেত্রভ্‌না প্রতিজ্ঞা করেছে, বাড়িতে তাস ও মদ ঢুকবে না; এই দুটো বস্তুই তার স্বামীকে নষ্ট করেছে। আর সেই কারণেই টেবিলে আছে শুধু ভিনিগারের আর তেলের বোতল; বুঝি বা অতিথিদের মধ্যে যারা একেবারে পাড় মাতাল ও নেশাখোর তাদের ঠাট্টা করতে ও শাস্তি দিতেই ব্যবস্থাটা করা হয়েছে।

মার্শালের বিধবা পত্নী সব্বাইকে আহ্বান করল, "ভদ্রমহোদয়গণ, খেতে শুরু করুন। আমাকে ক্ষমা করবেন, এখানে ভদ্‌কার ব্যবস্থা নেই, কারণ ওটা আমি রাখি না।..."

টেবিলে বসেও অতিথিরা সংকোচের সঙ্গেই একটা গুঞ্জন শুরু করল। কাঁটা নিয়ে ঠোকাঠুকি, রুটি কাটা এবং চিবনোর ব্যাপারে কেমন যেন একটা অনিচ্ছা বা বিরূপ মনোভাব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল।...পরিষ্কার বোঝা গেল, কিসের যেন অভাব ঘটেছে।

এক জর্জ অপর জজের কানে কানে বলল, "কেমন যেন মনে হচ্ছে একটা কিছু পাচ্ছি না। আমার স্ত্রী যখন এক ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে পালিয়ে গেল তখনও এ রকমটা মনে হয়েছিল। আমি তো খেতেই পারছি না।"

খাওয়া শুরু করার আগেই মার্ফুৎকিন অনেক সময় পর্যন্ত এ-পকেট সে-পকেট হাতড়ে রুমাল খুঁজতে লাগল।

"ওঃ, হ্যাঁ, ওটাতো আমার লোমের কোটটার পকেটে আছে। এখনই উঠে গিয়ে দেখে আসছি," একটু জোর গলায় কথাগুলি বলেই সে হল ঘরে ঢুকে গেল; সব কোট সেখানেই ঝোলানো ছিল।

চোখ মিটমিট করতে করতে ফিরে এসে নতুন উৎসাহে গুঞ্জনে যোগ দিয়ে সে ফাদার এভ্‌মেনির কানে কানে বলতে লাগল, "আমি হলফ করে বলতে পারি, এই শুকনো খাবার আপনি খেতে পারছেন না। পাশের ঘরে চলুন ফাদার। সেখানে আমার কোটের পকেটে একটা বোতল আছে।...শুধু খেয়াল রাখবেন বোতলের টুংটাং শব্দ যেন না হয়।"

ফাদার এভ্‌মেনি সবেগে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল। দিভনিয়াগিন ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলে বলল, "ফাদার। দুটো কথা...গোপনে..."

খুমভ বড়াই করে বলতে লাগল, "মশাইরা, যে লোমের কোটটা আমি নিজে কিনেছি সেটা সকলেরই দেখার মত জিনিস; জলের দামেই পেয়েছি! তার দাম হাজার তো হবেই, আর আমি দিয়েছি—আপনারা বিশ্বাস করবেন না...দুই শ' পঞ্চাশ! ব্যস!"

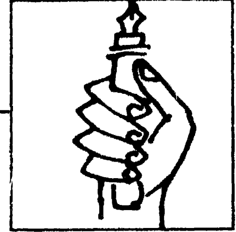
অন্য সময় হলে অতিথিরা এ-সংবাদটাকে পাত্তাই দিত না। কিন্তু এখন তারা বিস্ময় প্রকাশ করল, বিশ্বাসও করল না। শেষ-পর্যন্ত. সেই কোর্টটাকে দেখার জন্য সকলেই পাশের ঘরে গিয়ে ভিড় করতে লাগল, যতক্ষণ না ডাক্তারের মিকেশ্‌ক পাঁচটা খালি বোতল লুকিয়ে নিয়ে পাশেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।...যখন ভাঁপে সেদ্ধ মাছটা পরিবেশন করা হল তখনই মার্ফুৎকিনের হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে সিগারের বাক্সটা স্লেজ গাড়িতে ফেলে এসেছে; তখনই সে ছুটল আস্তাবলের দিকে। আর একজন সঙ্গী দরকার বলেই ডিয়েকনকেও সঙ্গে নিল, আর সেও ঘোড়াটাকে দেখার অন্য ব্যাগ্র হয়ে পড়ল। ....

সেদিন সন্ধ্যায় লিউবভ পেত্রভ্‌না পড়ার ঘরে বসে সেন্ট পিতার্সবার্গ তার এক বৃদ্ধ বন্ধুকে একটা চিঠি লিখল:

''অন্যান্য বছরের মত আজও,'' অন্য অনেক কথাব মধ্যে সে লিখল, ''প্রয়াত মানুষটির জন্য প্রার্থনা-অনুষ্ঠান কবলাম। প্রতিবেশীরা সকলেই এসেছিলেন। সকলেই সাদামাঠা মানুষ, কিন্তু কী হৃদয়! তাদের আপ্যায়ন রাজকীয়ভাবেই করেছি. তবে আগেকার বছরগুলির মতই একটা ফোঁটা মদের ব্যবস্থাও ছিল না। যেহেতু মদের বাড়াবাড়িতেই তিনি মারা গেছেন, তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আমাদের জেলায় মিতাচার প্রবর্তন করব এবং তার দিয়েই তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবব। এই মিতাচার-অভিযান নিজের বাড়ি থেকেই শুরু করেছি। ফাদার এভ্‌মেনিও আমার এই সাধু প্রচেষ্টায় মুগ্ধ হয়েছেন এবং কথায ও কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন। ওঃ, প্রিয় সখী, যদি জানাতে আমার প্রতিবেশীরা আমাকে কত ভালবাসে! প্রাতরাশেব পরে জমিদার পরিষদের সভাপতি মার্ফুৎকিন আমার হস্তচুম্বনের কালে দীর্ঘ সময় ঠোঁট দুটি হাতের উপর চেপে ধরেছিলেন এবং হাস্যকরভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে কেঁদে ফেললেন। এত গভীর আবেগ. কিন্তু মুখে একটা কথা নয়। ফাদার এভ্‌মেনি এক আশ্চর্য বৃদ্ধ; আমার পাশে বসে অশ্রুসজল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, আর দীর্ঘ সময় ধরে ছোট শিশুর মত হড়বড় করে কি সব বলে গেলেন। তার কথা আমি বুঝতে পারি নি। কিন্তু আন্তরিক আবেগ কেমন করে অনুভব করতে হয় তা আমি জানি। সুদর্শন পুলিশ-প্রধানের কথা তো তোমাকে আগেই লিখেছি; আমার সমুখে নতজানু হয়ে তার স্বরচিত কবিতা (তিনি আমাদের কবি) আমাকে আবৃত্তি করে শোনাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু...কিন্তু সে সামর্থ্য তাঁর ছিল না, তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন...শক্ত মানুষটা কেমন মূর্ছারোগের কবলে পড়লেন।...আমার অবস্থাটা তুমি কল্পনা করতে পার। ভাল কথা, অনুষ্ঠানটি যে নির্বিঘ্নে হয়েছে তাও নয়। গ্রামীন কংগ্রেসের সভাপতি আলালাইকিন শক্ত-সবল সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত মানুষ; তিনি অসুস্থ হয়ে দুই ঘন্টা আমার সেটির উপর অজ্ঞান হয়ে শুয়েছিলেন। তাকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হয়েছিল। ডাক্তার দিভনিয়াগিনকে ধন্যবাদ; তিনি তার ডিসপেন্সারি থেকে

এক বোতল ব্যাণ্ডি এনে তাঁর কপালে জলপটি দিয়েছিলেন, আর তার ফলেই তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং তাঁকে গাড়িতে করে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

১৮৮৫



জীবন্ত ইতিহাস

A Living Chronology

রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য শারামাইখিনের বসবার ঘরটা মনোরম আবছা আলোয় জড়ানো। সবুজ ঢাকনা দেওয়া ব্রোঞ্জের বড় বাতিটা থেকে একটা সবুজ আভা ছড়িয়ে পড়েছে দেয়ালে, আসবাবপত্রে ও মানুষের মুখে, ঠিক ''ইউক্রেনের রাত'' ছবিটার মত। মাঝে মাঝেই নিভু-নিভু অগ্নিকুণ্ডের একটা জ্বলন্ত কাঠের আগুনে লাল আলো ক্ষণিকের জন্য মুখগুলোকে উদ্ভাসিত করে তুলছে, কিন্তু তাতে রংয়ের সামঞ্জস্য নষ্ট হচ্ছে না। শিল্পীরা যাকে বলে রংয়ের সাধারণ আভাষ সেটা ঠিকই থাকছে।

অগ্নিকুণ্ডের সামনে একটা হাতল-চেয়ারে বসে আছে স্বয়ং শারামাইখিন সদ্য নৈশভোজ সেরে-আসা মানুষের ভঙ্গীতে। বয়স্ক ভদ্রলোকটির সারা মুখে একটা কোমলতা মাখানো; দুটি ঠোঁটে জড়িয়ে আছে বিষণ্ণ হাসি; চোখ দুটি বিনম্র, ঘন নীল। তার পায়ের কাছে অগ্নিকুণ্ডের দিকে পা ছড়িয়ে একটা ছোট টুলে বসে আছে উপশাসনকর্তা লপ্‌নেভ; বছর চল্লিশ বয়সের একটি উদ্যোগী পুরুষ। শারামাইখিনের ছেলেমেয়েরা—নিনা, ফলিযা, নাদিয়া ও ভানিয়া পিয়ানোটার পাশে খেলা করছে। মিসেস শারামাইখিনের পড়ার ঘরের আধ-খোলা দরজা দিয়ে কিছুটা আলো এসে পড়েছে সেখানে। দরজাটার পিছনে লেখার টেবিলে বসে আছে শারামাইখিনের স্ত্রী আন্না পাভ্‌লভ্‌না; বয়স ত্রিশের উপরে, চটপটে ছোটখাট মহিলা, স্থানীয় নারী সমিতির সভানেত্রী। তার দুটি কালো চোখ পিস্‌নের ভিতর দিয়ে একখানি ফরাসী উপন্যাসের পাতার উপর ঘুরছে। উপন্যাসের নীচে চাপা আছে গত বছরের সমিতি-প্রতিবেদনের জীর্ণ পাতাগুলি।

''আগেকার দিনে আমাদের শহরটা সে ব্যাপারে আরও ভাগ্যবান ছিল,'' জ্বলন্ত আগুনের দিকে চোখ রেখেই শারামাইখিন বলতে লাগল। ''কোন না কোন নক্ষত্র এসে হাজির হয় নি এমন একটা শীতও কাটত না। কত সব বিখ্যাত অভিনেতা, গায়ক, আর এখন...তা কেবল শয়তানই জানে। জাদুকর আর অর্গ্যান-বাজিয়ে ছাড়া আর কেউ আসে না। কোন সুরুচিসম্পন্ন আনন্দ নেই...আমরা যেন জঙ্গলে বাস করছি। সত্যি...কিন্তু ইতালীর সেই করুণ নাটকের অভিনেতাকে আপনার মনে আছে ইয়োর এক্সেলেন্সি? কি

যেন তাব নাম? কালো চুল, লম্বা চেহারা...নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না...ওঃ, হ্যাঁ! লুইগি আর্নোস্তো দ রাগিয়েরো। খুবই প্রতিভাবান... শক্তিমান। তার মুখের একটা কথায় সারা প্রেক্ষাগৃহ একেবারে চুপ। তার প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আমার আনিয়া। অভিনেতাটির জন্য সে একটা থিয়েটারের ব্যবস্থা করেছিল এবং দশটা অভিনয়ের টিকিট বিক্রি করেছিল। বিনিময়ে অভিনেতাটি তাকে শিখিয়েছিল উদ্দীপক বক্তৃতা ও মূকাভিনয়। সে এখানে এসেছিল...ভুল বলা আমাব ইচ্ছা নয়...প্রায় বারো বছর আগে। না, আমার ভুল হল। হ্যাঁ, প্রায় দশ বছর হল। আনিয়া, আমাদের নিনার বয়স কত হল?''

''নয়!'' আন্না পেত্রভ্না পড়ার ঘর থেকে বলল। ''কেন?''

''ঠিক আছে জননী, কিছু নয়। ভাল ভাল গায়কও আসত...প্রিলিপ্চিনকে মনে আছে? কী সুন্দর মানুষ! কী দৃষ্টি! সোনালী চুল, অভিব্যক্তিপূর্ণ মুখ, প্যারিস-সুলভ আচার-আচরণ।...আব কী কণ্ঠস্বর ইয়োর এক্সেলেন্সি! কেবল একটা ক্রুটি ছিল, কিছু সুব তুলত পেটের ভিতর থেকে, কিছু সুর উঠত বেশী চড়ায়, কিন্তু বাকিটা চমৎকার। লোকে বলে, সে তাম্বারলিকের কাছে গানের তালিম নিত। আনিয়া ও আমি তার জন্য একটা হল ঠিক করে দিয়েছিলাম। আর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সে আমাদের গান শুনিয়েছিল সারা রাত, সারা দিন...সে আনিয়াকেও গান শিখিয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে, সে এসেছিল লেন্ট উৎসবের সময়...প্রায় বারো বছর আগে। না, আরও বেশী...একটা পুরানো কথা আপনাকে বলছি, ঈশ্বর আমাকে মার্জনা করুন। আনিযা, আমাদের নাদিয়ার বয়স কত হল?''

''বারো।''

''বারো..তার সঙ্গে দশ মাস যোগ কবলে...ওই তেরো! তখন আমাদের শহরটা আরও জীবন্ত ছিল। যেমন ধরুন, সাহায্য-রজনীর অনুষ্ঠানগুলি। সে সব কী আশ্চর্য সন্ধ্যাই না ছিল! কত আনন্দ। গান, নাটক, পাঠ। মনে পড়ে, যুদ্ধের পব তুর্কী যুদ্ধ-বন্দীরা যখন আমাদের এখানে ছিল তখন আনিয়া আহতদের জন্য একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। তারা এগারো শ' রুব্‌ল্ সংগ্রহ করেছিল। মনে পড়ে, আনিয়ার গলা শুনে তুর্কী অফিসাররা একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল; সকলেই আনিয়ার হাতে চুমো খেয়েছিল। হি, হি! তারা এশিয়াবাসী হতে পারে, কিন্তু তারা সমঝদার লোক। সেই সন্ধ্যাটা এতই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল যে, বিশ্বাস করুন, সে কথাটা আমি আমার দিন-পঞ্জীতে লিখে রেখেছি। যতদূর মনে পড়ে সেটা ঘটেছিল ছিয়াত্তরে...না! সাতাত্তরে..না! তুর্কীদের এখানে রাখা হয়েছিল কোন্ সালে? আনিয়া, আমাদের কলিয়ার বয়স কত?''

বাদামি রং, ফোলা মুখ ও ঝুল-কালির মত কালো চুলের ছোট ছেলে কলিয়া বলল, ''আমার বয়স সাত বাবা।''

মাথাটা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে লপ্নেভ বলল, ''সত্যি, আমরাই বুড়ো

হয়ে গেছি ; এখন আর সে শক্তি নেই! সেটাই আসল কারণ। বার্দ্ধক্য। নতুন ধ্যান-ধারণা নিয়ে নতুন লোক আসছে না, আর পুরনো লোকরা বুড়ো হয়ে গেছে। সেই আগুন আর নেই। আমি যখন যুবক ছিলাম তখন সমাজকে একঘেয়ে থাকতে দিতাম না। তোমাদের আন্না পাভ্‌লভ্‌নার আমিই ছিলাম এক নম্বর সচিব। কোন দাতব্য অনুষ্ঠানের জন্য সান্ধ্য আসরের আয়োজনই হোক, আর লটারির খেলাই হোক, অথবা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বর্দ্ধনাই হোক—অন্য সব কাজ ফেলে দিয়ে আমি তখন সেই কাজ নিয়েই মেতে থাকতাম। মনে পড়ে, এক শীতকালে এতই কর্মব্যস্ত ছিলাম আর এত বেশী দৌড়-ঝাঁপ করেছিলাম যে অসুখ বাঁধিয়ে বসলাম! সে শীতকালটা কোনদিন ভুলব না! মনে করে দেখ, অগ্নিদগ্ধ মানুষগুলির সাহায্যের জন্য আমাদের আন্না পাভ্‌লভ্‌না ও আমি কী একখানা আসরই না বসিয়েছিলাম!''

''সেটা কোন্ সালে?''

''খুব বেশী দিন হয় নি, ঊনআশীতে।...না, আশীতে...মনে হচ্ছে...মাফ করবেন, এই ভানিয়ার বয়সটা কত হল?''

''পাঁচ, পাঁচ।'' পড়ার ঘর থেকেই আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলে উঠল।

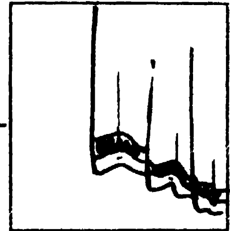
''দেখুন, তাহলে তো ওটা ছয় বছর আগেকার ঘটনা। ঠিক, ঐ সময়ই ঘটেছিল! এখন আর সে দিনকাল নেই! সে আগুনও আর নেই।''

লপনেভ ও শারামাইখিন বিষণ্ন হয়ে পড়ল। একটা নিভু-নিভু কাঠ শেষবারের মত জ্বলে উঠেই ছাইতে ঢাকা পড়ে গেল।

১৮৮৫

কূটকুশলী

Diplomat



❑ একটি দৃশ্য ❑

জনৈক নিম্নপদস্থ কর্মচারীর স্ত্রী আন্না লিভভ্‌না কুভাল্‌দিনা মারা গেল।

পারিবারিক বৈঠকের শুরুতেই আত্মীয়রা শুধাল, ''এখন আমাদের কি করণীয়? ওর স্বামীকে খবর দেওয়া উচিত। সে স্ত্রীর সঙ্গে বাস করত না, কিন্তু তাকে ভালবাসত। এই সেদিনও এসে তার সঙ্গে দেখা করে গেছে ; নতজানু হয়ে সারাক্ষণ কেবলই বলেছেঃ 'আন্না! আর কত দিনে একটা সাময়িক মোহের জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করবে?' তোমরা তো জান এই রকম অনেক কথাই সে বলেছে। তাকে খবর দেওয়া উচিত....''

পারিবারিক বৈঠকে কর্নেল পিস্মারেভ উপস্থিত ছিল। চোখের জল ফেলতে ফেলতে মাসি তাকে বলল, ''আরিস্তার্ক আইভানভিচ! তুমি মিখাইল পেত্রভিচের বন্ধু। আমাদের একটা উপকার কর। রেলের হেড

আপিসে গিয়ে এই দুর্ভাগ্যের কথা তাকে জানাও। প্রিয় বন্ধু, খুব শান্তভাবে কথাটা ভাঙবে। পাছে কিছু হয়ে যায় তাই তাকে আঘাত দেবে না। সে খুব স্পর্শকাতর। আগে তাকে সইয়ে নেবে, তারপর..."

উঁচু টুপিটা মাথায় দিয়ে কর্ণেল পিস্কারেভ রেলের হেড আপিসের উদ্দেশে যাত্রা করল। সদ্য বিপত্নীক লোকটি সেখানেই কাজ করত। সে দেখল, লোকটি বসে বসে হিসাবের খাতা লিখছে।

কুভাল্‌দিনের ডেস্কে বসে কপালের ঘাম মুছে ফেলে সে বলতে শুরু করল, "মিখাইল পেত্রভিচ! ওহে বন্ধু! উঃ, রাস্তায় কী ধূলো! লিখে যাও...লিখে যাও...আমি বাধা দিচ্ছি না। এখানে এক মিনিট বসেই চলে যাব। এখান দিয়েই যাচ্ছিলাম, বুঝলে, ভাবলাম, আরে, মিশা তো এখানেই কাজ করে! একবার ঢুঁ মেরেই যাই। তাছাড়া, একটা ছোটখাট কাজও আছে..."

"একটু বস আরিস্তার্ক আইভানভিচ। একটু অপেক্ষা কর। পনেরো মিনিটের মধ্যে হাতের কাজটা শেষ হয়ে যাবে, তারপর দু'জনে গল্প-গুজব করা যাবে...."

"লিখে যাও, লিখে যাও। আসলে আমি তো এখান দিয়েই যাচ্ছিলাম। মাত্র দুটো কথা বলেই চলে যাব।"

কুভাল্‌দিন কলমটা রেখে তার কথা শোনার জন্য কান পাতল। ঘাড় চুলকে কর্ণেল শুরু করল ঃ

"এখানটা বড় গুমোট, বাইরেটা যেন নিছক স্বর্গ। রোদ, কী সুন্দর বাতাস, বুঝলে। পাখি...বসন্তকাল! পথ ধরে হাঁটিতে কী ভালই যে লাগছে! আমি স্বাধীন, আমি বিপত্নীক। আমি যেখানে খুশি যেতে পারি। ইচ্ছা হলে শুঁড়িখানায় ঢুকতে পারি, ইচ্ছা হলে আমি ঘোড়ার ট্রামে চড়ে যত্রতত্র যেতে পারি, কেউ আমাকে বারণ করবে না; কেউ তাগিদ দেবে না বাড়ি ফেরার জন্য...নারে ভাই, অবিবাহিত অবস্থার চাইতে সুখের জীবন হয় না। তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন! আমি বাড়ি যাব, সেখানে কেউ নেই...কেউ আমাকে শুধাবে না আমি কোথায় ছিলাম! আমিই আমার কর্তা। বন্ধু হে, অনেকেই পারিবারিক জীবনের প্রশংসা করে থাকে। কিন্তু আমার মতে সেটা সশ্রম কারাদণ্ডের চাইতেও খারাপ। যত সব ফ্যাশান। হৈচৈ, গল্প-গুজব চেঁচামেচি...সারাক্ষণ অতিথির ভিড়। একের পর এক সন্তানরা হামাগুড়ি দিয়ে ঈশ্বরের পৃথিবীতে আসতে থাকে। কত খরচ। বাঃ!"

কলমটা তুলে নিয়ে কুভাল্‌দিন বলল, "কাজটা এখনই শেষ করে নিচ্ছি, তারপর..."

"লিখে যাও, লিখে যাও...সবই ঠিক আছে, অবশ্য তোমার স্ত্রী যদি শয়তানি বনে না যায়; কিন্তু সে যদি পেটিকোট-পরা শয়তান হয়ে ওঠে? কিন্তু সে যদি আসলেও তাই হয়, সে যদি দিনের পর দিন খুঁত ধরতেই থাকে? সেটাই তো যে কোন মানুষের চোখে জল আনার পক্ষে যথেষ্ট!

তোমার কথাই ধর না। তুমি যখন একা ছিলে, তখন মানুষের মতই ছিলে, কিন্তু যখন তোমার বৌকে বিয়ে করলে তখন থেকেই তুমি শুকিয়ে যেতে লাগলে, মানসিক অবসাদের শিকার হলে। সারা শহরের সামনে সে তোমার মুখে চুণকালি মাখিয়ে দিল; সে তোমাকে বাড়িছাড়া করল। তাতে লাভটা কি হল? সেরকম স্ত্রীর জন্য তো দুঃখ হবারও কথা নয়।''

কুভাল্‌দিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঃ সে বিচ্ছেদের জন্য তো আমিই দোষী, সে নয়।''

''ও সব কথা রাখ তো! আমি তাকে চিনি! নোংরা, খামখেয়ালি, ধূর্ত! তার প্রতিটি কথা এক-একটি বিষাক্ত হুল, প্রতিটি চাউনি ছুরির আঘাত। আর মৃতার দোষের পাল্লাটা এত বেশী ভারী ছিল যে ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না।''

চোখ বড় বড় করে কুভাল্‌দিন শুধাল, ''কি বলছ তুমি? মৃতা?''

একটু থতমত খেয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে পিস্কারেভ বলল, ''আমি কি 'মৃতা' বলেছি? সে রকম কথা আমি কক্ষণও বলি নি। সত্যি, ঈশ্বরের দোহাই! আর তুমি একেবারে ফ্যাকাসে মেরে গেলে! ছিঃ ছিঃ! কিসে কি যে শোন!''

''তুমি কি আজ আনিউতার কাছে গিয়েছিলে?''

''আজ সকালেই গিয়েছিলাম। সে শুয়েছিল...বিছানায়। চাকররা ঘুরে বেড়াচ্ছে—প্রথমে তারা যে খবর দিল সেটা ভুল। তারপরই সেই খবর। অসহ্য নারী! ঈশ্বর তার সহায় হোন, আমি তো বুঝতে পারি না কি দেখে তুমি তাকে ভালবাস। তোমার দুঃখ দেখে মনে হয় ঈশ্বরের অনুগ্রহে সে যদি তোমাকে ছেড়ে যেত। তাহলে তো তুমি কিছুটা স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারতে, কিছুটা সুখ পেতে। অন্য কাউকে বিয়ে কবতে পারতে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি থামছি। ও রকম চোখ করে তাকিও না। আমি তা বলতে চাই নি, ওটা বুড়ো মানুষের কথা বলার একটা ধরণ মাত্র। তুমি নিজের মতই চলতে থাক। ইচ্ছা হয় তাকে ভালবাস, ইচ্ছা না হয়...আমি ভালর জন্যই বলছি। সে তোমার সঙ্গে থাকে না, তোমাকে চিনতেও চায় না। সে তাহলে কি ধরনের বৌ? কুশ্রী, রগ্ন, ঈর্ষাকাতর। আর এ নিয়ে দুঃখ পাবার কিছু নেই...শুধু তাকে....''

কুভাল্‌দিন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ''তুমি তো সহজেই কথাটা বলে দিলে আরন্তির্খ আইভানভিচ! কিন্তু ভালবাসা একটা মাথার চুল নয় যে একটানে তুলে ফেলব।''

''তাও যদি তার মধ্যে ভালবাসার মত কিছু থাকত! নোংরামি ছাড়া তার কাছ থেকে আর কিছুই তো তুমি পাও নি। আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে তুমি ক্ষমা কর, কিন্তু আমি তাকে পছন্দ করতাম না। তাকে দুই চক্ষে দেখতে পারতাম না! তার বাড়ির সামনে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় চোখ বন্ধ করে থাকতাম যাতে তাকে দেখতে না হয়। ঈশ্বর তার সহায়

হোন। সে শান্তিতে বিশ্রাম করুক...কিন্তু নিজে পাপী হলেও তাকে আমি পছন্দ করতাম না।''

কুভাল্‌দিন ফ্যাকাসে মুখে বলল, '' শোন আরিস্তার্খ আইভানভিচ...এই দ্বিতীয়বার তোমার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে এল...তাহলে সে কি মারা গেছে ?''

কেন, কে মারা গেছে? কেউ মারা যায় নি। আমি মৃতাকে পছন্দ করতাম না, এই কথাই তো আমি বলেছি...আমি বলতে চাই, মৃতা নয়, কিন্তু তার—তোমার আনুশ্‌কা...''

কিন্তু সে কি মারা গেছে, আরিস্তার্ক আইভানভিচ, আমাকে আর জ্বালিও না। তুমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছ, সব কিছু গুলিয়ে ফেলছ...তুমি অবিবাহিত জীবনের গুণগান করছ—সে কি মারা গেছে ? সত্যি ?''

গলাটা পরিষ্কার করে পিস্কারেভ তো-তো করে বলল, ''সে কেন মরতে যাবে ? তুমি বড় বাজে বকছ।...কিন্তু সে যদি মারা যায়ই, আমরা সকলেই তো মারা যাব, হয়তো তার মারা যাওয়াটাই দরকার ছিল। তুমিও তো মারা যাবে, আর আমিও।''

কুভাল্‌দিনের চোখ দুটি লাল হয়ে জলে ভরে গেল।

''কখন ?'''সে শান্তভাবে প্রশ্ন করল।

''কোন সময়েই না। তুমি যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করলে। কিন্তু সে তো মারা যায় নি! কে বলল সে মারা গেছে ?''

'আরিস্তার্ক আইভানভিচ, আমি...আমি তোমাকে মিনতি করছি। আমাকে বৃথা সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করো না!''

''তোমার সঙ্গে কথা বলাই অসম্ভব—তুমি দেখছি একেবারে ছেলে মানুষ। আমি কি বলেছি সে গত হয়েছে ? বলেছি এ কথা ? কিসের জন্য নাকে কাঁদছ ? যাও, তার গুণগান করে এস, সে বেঁচে আছে, হাত-পা ছুঁড়ছে! যখন তার সঙ্গে দেখা করলাম তখন সে মাসিমার সঙ্গে ঝগড়া করছিল...ফাদার মাত্‌ভেই তখন শেষকৃত্য পরিচালনা করছিল, আর সে এত জোরে চেঁচাচ্ছিল যে সারা বাড়ি তা শুনতে পাচ্ছিল।''

''কিসের শেষকৃত্য ? কেউ কি মারা গেছে ?''

''শেষকৃত্য ? ঠিক তা নয়...অনেকটা সাধারণ প্রার্থনা-অনুষ্ঠানেরই মত...অর্থাৎ...শেষকৃত্য নয়, কিন্তু একটা কিছু...কিচ্ছু না।''

আরিস্তার্ক আইভানভিচ উঠে দাঁড়াল; জানালার কাছে গিয়ে কাশতে লাগল।

''আমার কাশি হয়েছে বন্ধু....কোথা থেকে যে কাশিটা বাঁধালাম জানি না।''

কুভাল্‌দিনও উঠে দাঁড়াল; অস্থিরভাবে ডেস্কের কাছেই পায়চারি করতে লাগল।

কাঁপা আঙুল দিয়ে নিজের দাড়ি টানতে টানতে বলল, ''তুমি আমার

কাছ থেকে কি যেন লুকোচ্ছ। এবার আমি বুঝতে পেরেছি...সব কিছু বুঝতে পেরেছি। এর জন্য এত সব কূটকৌশলের কি দরকার তাতো জানি না। কথাটা সোজাসুজি বলছ না কেন? সে মারা গেছে, তাই তো?''

পিস্কারেভ ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, ''আরে...কি করে যে তোমাকে বোঝাব? সে মারা গেছে সেটা তো কথা নয়, কথাটা হচ্ছে...এই দেখ, কাঁদতে শুরু করে দিলে! শেষ পর্যন্ত সকলেই তো মরবে। একমাত্র সেই তো মরণশীল জীব নয়; সকলেরই শেষ গতি তো ওই পরলোকে! লোকের সামনে কাঁদছ কেন? তোমার কাজ তার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখানো। তোমার উচিত নিজের বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকা।''

আধা মিনিট সময় কুভাল্‌দিন হা করে পিস্কারেভের দিকে তাকিয়ে রইল; তারপর তার মুখটা ভয়ংকর রকমের সাদা হয়ে গেল, আর একটা হাতলচেয়ারে এলিয়ে পড়ে সে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগল। তার সহকর্মীরা যার যার ডেস্ক ছেড়ে লাফ দিয়ে এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে গেল। পিস্কারেভ ভুরু কুঁচকে মাথা চুলকোতে শুরু করল।

সে ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠল, ''ঈশ্বরের দোহাই, এই সব মানুষই গলার কাঁটা! কেমন কাঁদছে দেখ। কিন্তু আমি জানতে চাই, কিসের জন্য সে কাঁদছে? মিশা, তোমার মনমেজাজ ঠিক আছে তো? মিশা।'' সে কুভালদিনকে ঝাঁকি দিতে লাগল। ''শোন বলছি, সে এখনও মরে নি। তোমাকে কে বলল যে সে মারা গেছে? বরং ডাক্তাররা বলছে এখনও আশা আছে। মিশা! হেই মিশা! আমি নিশ্চিত করে বলছি, সে এখনও জীবিত। ঈশ্বর আমাকে মেরে ফেলুন। আমার চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে পড়ুক। তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না? তাই যদি হয়, তাহলে চল আমরা গিয়ে তাকে দেখে আসি।...যদি দেখ...তাহলে আমাকে যা ইচ্ছা তাই বলো..এ ধারণা তোমার মাথায় এল কোত্থেকে? আমি তো বুঝতে পারছি না। আমি স্বয়ং মৃতা রমণীর পাশে ছিলাম—মানে, আমি বলতে চাই, মৃতা রমণীর পাশে নয়..ওঃ গুলি মার!''

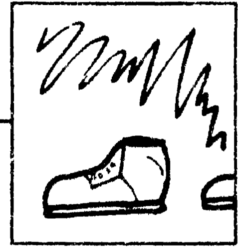
কর্নেল হাত নাড়ল, থুথু ফেলল, তারপর হেড আপিস থেকে বেরিয়ে গেল। মৃতা রমণীর বাড়িতে পৌঁছে একটা সেটির উপর ধপাস করে বসে নিজের চুল টানতে লাগল।

হতাশ হয়ে বলে উঠল, ''তোমরা নিজেরাই তার কাছে চলে যাও। এই খবরের জন্য তোমরাই তাকে প্রস্তুত করগে, কিন্তু আমাকে রেহাই দাও। আমি সে কাজ করতে চাই না। আমি তাকে কেবল দুটো কথা বলেছি...কেবল ইঙ্গিতটুকু করেছি, আর দেখে এস তার ফল কি হয়েছে। সেও মরতে বসেছে! অচেতন! আর কোন দিন তার চৈতন্য হবে না। চীনের সব চায়ের জন্যও না! তোমরাই যাও!''

১৮৮৫

একজোড়া বুট

The Boots



পিয়ানো-সুরকার মারকিনের হলদেটে মুখটা পরিষ্কার করে কামানো, নাকটা পাইপের মত, কানে তুলো গোঁজা। ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে সে কাঁপা গলায় ডাকল ঃ

''সেমিয়ন! সেমিয়ন!''

তার মুখে ত্রাসের যে চিহ্ন ফুটে উঠেছে তা দেখলে মনে হবে ঘরের সিলিংটা ভেঙে পড়েছে অথবা এইমাত্র ঘরের মধ্যে সে একটা ভূত দেখেছে।

সে যখন দেখতে পেল সেমিয়ন বারান্দা ধরে তার দিকেই ছুটে আসছে তখন সে চীৎকার করে বলল, ''এটা কি হয়েছে? আমার বাত আছে, আমি একটি রুগ্ন লোক, আর তুমি আমাকে খালি পায়ে বাইরে পাঠাচ্ছ! এখনও আমার বুট জোড়া এনে দাও নি কেন? সেগুলো কোথায়?''

সেমিয়ন মারকিনের ঘরে ঢুকল, বুরুশ-করা বুটজোড়া সাধারণত যেখানে রেখে দেওয়া হয় সেখানে তাকিয়ে দেখল, তারপর মাথা চুলকোতে লাগল। বুটজোড়া সেখানে নেই।

সেমিয়ন বলল, ''সে দুটো গেল কোথায়? আমি তো জানি, কাল সন্ধ্যায় বুটজোড়া পরিষ্কার করে এখানেই রেখেছিলাম। হুম! কাল আমি খুব নেশা করেছিলাম তা জানি। হয়তো বুটজোড়া অন্য ঘরে রেখেছিলাম! বুটের তো গোণাগুণতি নেই, আর নেশার ঘোরে বুটজোড়াকে কি আর জায়গামত রেখেছিলাম! নিশ্চয় পাশের ঘরের তরুণী অভিনেত্রীটির কাছেই রেখে দিয়েছিলাম।''

''তাহলে তোমার জন্যই এখন আমাকে গিয়ে ভদ্রমহিলাকে বিরক্ত করতে হবে। একটা তুচ্ছ জিনিসের জন্য একটি ভালো মানুষের মেয়ের শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে হবে!''

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে কাশতে কাশতে মারকিন পাশের ঘরের দরজায় গিয়ে আস্তে টোকা দিল।

''কে?'' এক মুহূর্ত পরেই একটি নারী-কণ্ঠ ভেসে এল।

কোন উঁচু মহলের মহিলার সঙ্গে আলাপরত রসিক পুরুষের ভঙ্গীতে মারকিন করুণ কণ্ঠে জবাব দিল, ''আমি! আপনাকে বিরক্ত করছি বলে ক্ষমা করবেন মিস, কিন্তু আমি রুগ্ন মানুষ, বাতব্যাধিগ্রস্ত।...ডাক্তারের নির্দেশক্রমে সব সময়ই আমাকে পা দুটি গরম রাখতে হয়; বিশেষ করে যেহেতু এখনই আমাকে একবার বের হতে হবে পিয়ানোর বড় জলসায়

মাদাম শেভেলিংৎসিনের জন্য সুর করে দিতে। আমি তো খালি পায়ে তার কাছে যেতে পারি না।''

''আপনি কি চান? কোন পিয়ানোর কথা বলছেন?''

''পিয়ানোর কথা নয় মিস, আমি বলছি বুটজোড়ার কথা। ওই বৃদ্ধ সেমিয়ন আমার বুটজোড়া পালিশ করে ভুল করে আপনার ঘরে রেখে গেছে। মিস যদি দয়া করে আমার বুটজোড়া দিয়ে দেন।''

একটা খস খস আওয়াজ কারও বিছানা থেকে নামার শব্দ, চটির আওয়াজ, তারপরেই দরজাটা একটু ফাঁক হল আর একটি নারীর গোলগাল হাত একজোড়া বুট ছুঁড়ে দিল মারকিনের পায়ের কাছে। পিয়ানো সুরকার তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

বুটজোড়া পরতে গিয়ে সে বলে উঠল, ''আশ্চর্য! এটা তো আমার বুট নয়! এখানে তো দেখছি দুটো বাতিল বুট। দুটোই বাতিল। সেমিয়ন, শোন এ বুটজোড়া আমার নয়। আমার বুটের ফুঁটোগুলো লাল আর কোনরকম তালিমারা না এ বুটজোড়া তো ছেঁড়া আর ফুঁটোহীন।

সেমিয়ন বুটজোড়া তুলে বারকয়েক চোখ ঘুরিয়ে ভুরু কুঁচকাল। তারপর অপাঙ্গে তাকিয়ে বলল, এ তো পাভেল আলেকজান্দ্রভিচের বুট।

লোকটার বা চোখটা ট্যাঁরা।

'কোন পাভেল আলেকজান্দ্রভিচ?'

অভিনেতা। প্রতি মঙ্গলবার এখানে আসেন। নির্ঘাৎ তিনি নিজের জুতোর বদলে আপনার জোড়াই পরে গেছেন। আমি তো বুটজোড়া অভিনেত্রীটির ঘরেই রেখেছিলাম, মানে, তার এবং আপনার—দু জোড়াই রেখে দিয়েছিলাম। সেখানেই বদল হয়ে গেছে।

তাহলে যাও, বদলে নিয়ে এস।''

আচ্ছা ফ্যাসাদ' সেমিয়ন মুখটা বেকাল। নাও, বদলে নিয়ে এস। এখন সে বুটজোড়া কোথায় পাব? তিনি তো এক ঘন্টা আগেই চলে গেছেন। আপনি বরং তার খোঁজ করুন।

কিন্তু তিনি থাকেন কোথায়?'

''কে জানে? এখানে তিনি প্রতি মঙ্গলবার আসেন, কিন্তু কোথায় থাকেন তা কেউ জানে না। তিনি আসেন, রাতটা এখানে কাটান। তারপরে পরবর্তী মঙ্গলবারের আগে তার টিকিটাও কেউ দেখতে পায় না'

'ও হে বৃদ্ধ, তাহলে বোঝ তুমি কি কাণ্ড করেছ। এখন আমি কি করি? মাদাম শেভেলিংৎসিনের কাছে যাবার সময় হয়ে গেছে। তুমি একটা অপদার্থ। আমার পা দুটো জমে গেল।'

বুটজোড়া পাল্টাতে বেশী সময় লাগবে না। এই দুটো পরে নিন, সন্ধ্যা পর্যন্ত পরে থাকুন, তারপর থিয়েটারে চলে যান। সেখানে অভিনেতা ব্লিস্তনভের খোঁজ করুন। যদি থিয়েটারে যেতে না চান তাহলে পরবর্তী মঙ্গলবার পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। কেবলমাত্র মঙ্গলবারেই

তিনি আসেন।''

সন্দিগ্ধ চোখে বুটজোড়া তুলে নিতে নিতে পিয়ানো-সুরকাব প্রশ্ন করল, ''এই পুরনো বুটজোড়াই বা এখানে এল কেমন করে?''

''যখন যেখানে সেরা জুতোটি পান সেটাই তিনি পায়ে গলান। গরীব লোক তো। একজন অভিনেতা ভাল বুট পাবে কোথায়? আমি তাঁকে বলি, 'পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ, এই বুটজোড়া আপনাকে মোটেই মানায় না', আর তিনি বলেন, 'চুপ কর, বাজে বকবক্ করো না! এই বুট পরে আমি কত রাজা-মহারাজাব পার্ট করেছি!' বড় মজার লোক। এক কথায়, অভিনেতা। আমি যদি শাসনকর্তা বা পদস্থ কর্মচারী হতাম তাহলে এই সব অভিনেতাদের ধরে ধরে জেলে পাঠাতাম।''

হাঁকডাক করে খুঁত-খুঁত করতে করতে মারকিন সেই পুরনো বুট জোড়াই পায়ে গলিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাদাম শেভেলিৎসিনের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। সারাদিন সে শহরময় চক্কর দিল পিয়ানোর সুর বাঁধার কাজে, আর সারাটা দিনই তাব মনে হল বুঝি গোটা পৃথিবীটাই তার জুতোর দিকে তাকিয়ে আছে এবং দুমড়ানো গোড়ালির তালিমারা বুটজোড়াকেই লক্ষ্য করছে। মানসিক যন্ত্রণা ছাড়াও দৈহিক কষ্ট তাকে সহ্য করতে হল; পায়ে ফোস্কা পড়ে গেল।

সেই সন্ধ্যায়ই সে থিয়েটারে গেল। সেখানে ''নীলদাড়ি'' অপেরার অভিনয় হচ্ছিল। একেবারে শেষ অংকের আগে জনৈক পরিচিত বংশীবাদকের চেষ্টায় সে রঙ্গমঞ্চেব পিছনের ঘরে ঢোকাব অনুমতি পেয়ে গেল। পুরুষদের সাজঘরে ঢুকে দেখল সব অভিনেতাই সেখানে হাজির; কেউ পোশাক বদলাচ্ছে, কেউ মেক-আপ নিচ্ছে, আবার অনেকে ধূমপান করছে। ''নীলদাড়ি'' রাজা বাউবেচের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে একটা রিভলবার দেখাচ্ছে।

''নীলদাড়ি'' বলছে, ''এটা কিনে ফেল! আমি নিজে এটা কুর্স্ক থেকে কিনেছি আট দিয়ে, আর তুমি এটা ছয়তেই পেয়ে যাচ্ছ...এটার কাজ খুবই ভাল!''

''সাবধান.. এটাতে গুলি ভরা আছে।''

পিয়ানো-সুরকাব ভিতরে ঢুকে বলল, ''মিঃ ব্লিস্তানভের সঙ্গে দেখা করতে পারি কি?''

তাব দিকে ঘুরে ''নীলদাড়ি'' বলল, ''আমি সেই লোক! আপনার জন্য কি করতে পারি?''

পিয়ানো-সুরকার মিনতিভরা গলায় বলল, ''আপনাকে বিরক্ত করছি বলে ক্ষমা করবেন স্যার, কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি রুগ্ন মানুষ। বাতের রোগী। ডাক্তাররা বলেছেন সব সময় পা দুটো গরম রাখতে হবে।''

''ঠিক আছে, কিন্তু আপনার জন্য আমি ঠিক কি করতে পারি?''

''নীলদাড়ি''র দিকে ঘুরে পিয়ানো-সুরকার বলল, ''দেখুন ব্যাপারটা এই

রকমই...কাল রাতে আপনি বণিক বুখতেয়েভ-এর সুসজ্জিত ঘরে ছিলেন...চৌষট্টি নম্বর ঘরে....

রাজা বাওবেচ দাঁত বের করে বলল, "এটা ডাহা মিথ্যে কথা। চৌষট্টি নম্বর ঘরে থাকে আমার স্ত্রী।"

"স্ত্রী। সুখের কথা..." মারকিন হাসল। "তিনিই তো, আপনাব স্ত্রী, নিজের হাতে বুটজোড়া আমাকে দিয়েছিলেন।" সুবকার মাথা নেড়ে ব্রিন্তানভকে দেখাল—তিনি সেখান থেকে চলে যাবার পবে আমার বুটজোড়া না পেয়ে বারান্দা থেকে পবিচাবককে ডাকলাম, কিন্তু সে বলল, 'হ্যাঁ স্যাব, আপনার বুটজোড়া আমি পাশের ঘবে রেখে দিয়েছি।' সে ব্যাটা নেশাব ঘোরে ভুল করে আমার বুটজোড়া চৌষট্টি নম্বব ঘরে বেখে দিয়েছিল, এবং আপনার জোড়াও"—মাবকিন ব্রিন্তানভের দিকে তাকাল—"আব আপনিও আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে চলে যাবার সময় আমাব বুটজোড়া পবেই..."

ভুরু কুঁচকে ব্রিন্তানভ বলল, "কি বলছেন আপনি? আপনি কি একটা গণ্ডগোল পাকাতেই এখানে এসেছেন?"

"মোটেই না। ঈশ্বর যেন তেমনটি না কবান। আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন...আমি কেন এসেছি? এসেছি বুটজোড়াব জন্য। আপনি কি চৌষট্টি নম্বর ঘরে রাত কাটান নি?"

"কবে?"

"কাল রাতে।"

"আপনি কি আমাকে সেখানে দেখেছিলেন?"

"না, আমি আপনাকে সেখানে দেখি নি।"

খুবই হতভম্ব হয়ে মারকিন নীচে বসে তাড়াতাড়ি বুটজোড়া পা থেকে খুলে ফেলল। "আমি আপনাকে দেখি নি, কিন্তু আপনাব স্ত্রী আমার বুটজোড়া বদলে আপনার জোড়াই বাইবে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন।"

"এ ধরনেব আব্দার কবার অধিকাব আপনাকে কে দিয়েছে মশায়? আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, আপনি একটি মহিলাকেও অপমান করছেন, তাব চেয়েও বড় কথা, সেটা করছেন তারই স্বামীর কাছে এসে।"

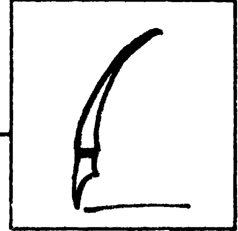
রঙ্গমঞ্চের পিছন দিকে একটা ভয়ংকব সোরগোল উঠল। রাজা বাউবেচ—সেইতো ক্রুদ্ধ স্বামী—হঠাৎ বেগে লাল হয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে টেবিলের উপর একটা ঘুষি মারল, আর পাশের সাজঘরে দু'জন অভিনেত্রী মূর্ছা গেল।

"নীলদাড়ি" তার দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বলল, "আব আপনি তাকে বিশ্বাস করলেন? এই অকর্মাব ধাড়িকে বিশ্বাস করলেন? ও-হো-হোঃ। আপনি কি চান আমি তাকে কুকুরের মত খুন করে ফেলি? তাই কি চান? আমি তাকে মাংসের কিমা করে ছাড়ব। এক ঘুষিতে তার মাথার ঘিলু বের করে দেব।"

সেদিন সন্ধ্যায় যে সব মানুষ গ্রীষ্মকালীন থিয়েটারের পার্শ্বস্থ

মিউনিসিপালিটির বাগানে বায়ুসেবনে বেরিয়েছিল তারা সকলেই দেখেছে হলদেটে মুখ ও আতংকগ্রস্ত চোখের একটি খালি পা মানুষ থিয়েটার থেকে বেরিয়ে রাজপথ ধরে ছুটে যাচ্ছে। আর "নীলদাড়ি"র পোশাক-পরা একটি মানুষ রিভলবার ঘোরাতে ঘোরাতে তাকে তাড়া করছে। তারপরে কি ঘটেছে তা কেউ দেখে নি। কেবল এইটুকু জানা গেছে যে, ব্রিস্তানভের সঙ্গে দেখা করার পরে মারকিন দুই সপ্তাহকাল অসুস্থ ছিল। আর তার মুখের দুটি কথা—"আমি রুগ্ন মানুষ, বাতব্যাধিগ্রস্ত"—এই দুটি কথার সঙ্গে সে যোগ করেছিল "আমি একটি আহত মানুষ।"

১৮৮৫



স্নায়ুর জোর

Nerves

স্থপতি দিমিত্রি ওসিপোভিচ ভাক্সিন সদ্যসমাপ্ত প্রেতবাদী মজলিসের টাটকা অভিজ্ঞতা নিয়ে শহর থেকে নিজের পল্লী-ভবনে ফিরে এসেছে। পোশাক ছেড়ে নির্জন ঘরে কোচে বসে (মাদাম ভাকসিন গেছে "ত্রিমূর্তি নির্জন আবাসে") সে যা কিছু শুনে এসেছে, দেখে এসেছে সেই সবই মনে করছিল। ঠিক মত বলতে গেলে সেটা ঠিক প্রেত-মজলিস ছিল না; সন্ধ্যাটা কেটেছিল কিছু ভয়ংকর আলোচনায়। কোন বিশেষ কারণ ছাড়াই একটি তরুণী অপরের চিন্তা-পাঠের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল। মন থেকে ধীরে ধীরে এল আত্মার কথা, আত্মা থেকে প্রেত এবং প্রেত থেকে সেই সব মানুষের কথা যাদের জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছে। একটি ভদ্রলোক এমন একটি মৃতদেহের ভয়াবহ গল্প শোনাল যে শবাধারের মধ্যেই পাশ ফিরে শুয়েছিল। ভাক্সিন স্বয়ং একটা রেকাব আনিয়ে সমবেত মহিলাদের দেখাল কেমন করে প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। অন্য অনেকের সঙ্গে মিলে সে তখন তার খুড়ো ক্লাভ্দি মিরোনভিচকে আবাহন করে মনে মনে প্রশ্ন করল, "আমার বাড়িটা আমার স্ত্রীর নামে হস্তান্তর করার সময় কি হয় নি?" তার উত্তরে খুড়ো বলল, "ঠিক সময়ে সব কিছুই ঠিক।"

কম্বলের নিচে ঢুকে ভাক্সিন ভাবল, "প্রকৃতিতে অনেক কিছুই ঘটে যা রহস্যময়...ও ভয়ঙ্কর। শবদেহরা ভীতিপদ নয়, যা অজ্ঞাত তাই ভয়ঙ্কর।"

সকাল একটা বাজল। ভাক্সিন পাশ ফিরে কম্বলের ভিতর থেকেই বিগ্রহের বাতির নীল আলোর দিকে তাকাল। আলোটা দুলছিল আর তাই আলোটা আবছা হয়ে পড়ছিল বিগ্রহের ছবির উপর এবং বিছানার বিপরীৎ দিকে ঝোলানো খুড়ো ক্লাভ্দি মিরোনভিচের বড় প্রতিকৃতিটার উপর।

"এই আলো-আঁধারিতে হঠাৎ যদি খুড়োর প্রেত এসে হাজির হয়

তাহলে ?'' এই চিন্তাটাই ভাক্‌সিনের মনের ভিতর দিয়ে ভেসে গেল। ''না। এটা অসম্ভব।''

ভূত-প্রেত একটা কুসংস্কার, অপরিণত মানসের ফসল ; কিন্তু তথাপি ভাকসিন মাথার উপরে কম্বলটা টেনে দিয়ে চোখ দুটোকে শক্ত করে বন্ধ করল। কল্পনায় এক ঝলক দেখতে পেল, একটি মৃতদেহ শবাধারের মধ্যেই পাশ ফিরল ; তারপর একে একে দেখা দিল তার মৃত শাশুড়ির মূর্তি, এক সহকর্মীর মূর্তি যে গলায় ফাঁসি দিয়েছিল, আর একটি মেয়ের মূর্তি যে জলে ডুবে মরেছিল। এই সব বিষণ্ণ চিন্তাকে মন থেকে মুছে ফেলার অনেক চেষ্টা ভাক্‌সিন করল, কিন্তু তার চেষ্টা যত জোরদার করতে লাগল ততই মূর্তিগুলি স্পষ্টতর হতে লাগল, আর তাব চিন্তাও হতে লাগল ভয়ঙ্কবতর। সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

''দূর হোক ছাই...তুমি যে ছোট ছেলের মত ভয় পেলে! বোকা কোথাকার!''

''টিক...টিক...টিক'' দেয়ালের পিছনে ঘড়িটা বেজে চলেছে। গ্রামের পাহারাদার গির্জাব ঘড়িটা বাজাচ্ছে। শব্দটা ধীর, বিষণ্ণ মনটাকে জমাট বেঁধে দেবার মত। ভাক্‌সিনের শিরদাঁড়া বেয়ে কতকগুলি কাঁটা উঠছে আর নামছে। কে যেন মাথার উপরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে, মনে হচ্ছে খুড়ো বুঝি ফ্রেম থেকে বেরিয়ে এসে ভাইপোর উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। স্নায়ুর চাপ ভাক্‌সিনের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। আতংকে দাঁতে দাঁত চেপে সে নিঃশ্বাস বন্ধ করল। শেষ পর্যন্ত যখন একটা গুবড়েপোকা জানালা দিয়ে উড়ে এসে তার বিছানার উপর ডাকতে শুরু করল তখন আর সে সহ্য করতে পাবল না ; ছুটে গিয়ে ঘন্টার দড়িটাকে পাগলের মত টানতে লাগল।

''দেমেত্রি ওসিপিচ, আপনি কি চাইছেন ?'' এক মিনিট পরে দরজার পিছন থেকে জার্মান গভর্নেসের গলা শোনা গেল।

ভাক্‌সিন উল্লসিত হয়ে বলে উঠল, ''ওঃ তুমি, রোজালিয়া কার্লভ্‌না ? তুমি আবার এলে কেন ? গাভ্রিলাই তো আসতে...''

''গাভ্রিলাকে আপনি তো শহরে পাঠিয়েছেন, আর ক্লাফিরাও সন্ধ্যায়ই কোথায় যেন গেছে। বাড়িতে কেউ নেই। আপনি কি চাইছেন ?''

''আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা হচ্ছে...আর ....কিন্তু তুমি ভিতরে এস, লজ্জা'করো না। এখানে অন্ধকার...''

মোটা ও গোলাপী-লাল রোজালিয়া শোবার ঘরে ঢুকে একটা প্রত্যাশার ভঙ্গীতে দাঁড়াল।

''বস লক্ষ্মীটি। ব্যাপারটা কি জান'' বাঁকা চোখে খুড়োর প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে ভাক্‌সিন অবাক হয়ে ভাবল, 'ওর কাছে কি পাওয়া যায় ?' ''আসলে তোমাকে কি বলতে চেয়েছি জান...আগামী কাল লোকটি যখন শহরে যাবে তখন তাকে বলতে ভুলো না...মানে...সে যেন কিছু কার্তুজ কিনে আনে। কিন্তু তুমি বসে পড়।''

''কার্তুজ! বেশ তো! আপনার আর কি চাই?''

''আমি চাই—আমি কিচ্ছু চাই না, কিন্তু—তুমি বস। ভেবে দেখছি আর কি চাই।''

''কোন পুরুষ-মানুষের ঘরে ঢোকা একটা মেয়ের পক্ষে উচিত কাজ নয়। দেমেত্রি ওসিপিচ তো দেখছি একটি জোকার...রসিক পুরুষ।...বুঝতে পেরেছি কার্তুজের জন্য কেউ মানুষকে ডেকে তোলে না। আমি বুঝতে পেরেছি....''

রোজালিয়া কার্লভ্না মুখ ঘুরিয়ে বেরিয়ে গেল। কথাবার্তায় কিছুটা শান্ত হওয়ার ফলে এবং নিজের ভীরুতায় লজ্জিত হয়ে ভাক্সিন মাথার উপর কম্বলটা টেনে দিয়ে চোখ বুজল। দশ মিনিটের মত বেশ ভালই কাটল, কিন্তু তারপরেই সেই বাজে চিন্তাগুলো আবার তার মাথায় এসে ঢুকল। একবার থুথু ফেলল, দেশলাই খুঁজল, এবং চোখ না খুলেই মোমবাতি জ্বালাল। কিন্তু আলোতেও কোন সুফল হল না। আতংকিত কল্পনায় ভাক্সিনের মনে হতে লাগল, কেউ বুঝি ঘরের কোণ থেকে তাকে দেখছে আর খুড়োর চোখদুটো মিটমিট করছে।

সে স্থির করল, ''আবার আমি ঘন্টাটা বাজাব, তাতে যার যা হয় হোক। তাকে বলব আমি অসুস্থ। কয়েক ফোঁটা ওষুধ চাইব।''

ভাক্সিন ঘন্টা বাজাল। আবার বাজাল, আর যেন তারই ডাকের জবাবে গির্জার ঘন্টাটাও আবার বেজে উঠল। প্রচণ্ড ভয়ে তার সারা শরীর হিম হয়ে গেল; এক দৌড়ে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ভীরুতাকে গালাগালি করতে করতে খালি পায়ে মাত্র তলবাসটি পরেই গভর্নেসের ঘরে পালিয়ে গেল।

দরজায় ধাক্কা দিয়ে কাঁপা গলায় বলতে লাগল, ''রোজালিয়া কার্লভ্না! তুমি কি...ঘুমিয়ে পড়েছ? আমি...মানে...আমি অসুস্থ। কয়েক ফোঁটা ওষুধ চাই।''

কোন উত্তর এল না। চারদিক নিস্তব্ধ।

''দয়া করে...তুমি কি বুঝতে পারছ না? দয়া কর। তুমি যে এত...খুঁতখুঁতে কেন তা তো বুঝি না, বিশেষ করে আমি যখন...অসুস্থ? তুমি এত ভয়-কাতুরে কেন বল তো? তোমার বয়সে?''

''আমি আপনার বৌকে বলে দেব। একটা ভাল মেয়েকে আপনি শান্তিতে থাকতে দিচ্ছেন না...আমি যখন ব্যারন আনজিগের বাড়ি ছিলাম আর ব্যারন যখন দেশলাই নেবার ছল করে আমার ঘরে ঢুকতে চাইত, তখনই তাকে আমি বুঝতে পারতাম...সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলতাম সেই দেশলাই আসলে কি বস্তু...আর ব্যারনেসকে সব কথা বলে দিতাম—আমি একটি সাচ্চা মেয়ে—''

''ওঃ, তোমার সাচ্চা-ঝুটা নিয়ে আমি কি করব? আমি অসুস্থ...কয়েক ফোঁটা ওষুধ চাই। বুঝতে পারছ না? আমি অসুস্থ।''

"আপনার স্ত্রী একটি সৎ ভাল মেয়ে মানুষ। তাকে ভালবাসা আপনার কর্তব্য। হায়! তিনি মহান। আমি তার শত্রু হতে চাই না।"

"তুমি একটি মূর্খ। বাস! মহামূর্খ!"

ভাক্‌সিন দরজার বাজুতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, দুই হাত বুকের উপর ভাঁজ করে কতক্ষণে তার ভয়টা চলে যাবে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। নিজের ঘরে ফিরে যাবার সাহস তার হল না—সেখানে যে বিগ্রহের বাতিটা দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছে, আর ছবির ফ্রেমের ভিতর থেকে খুড়ো তাকিয়ে আছে। কিন্তু তলবাস পরে গভর্নেসের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকাটাও তো কোন দিক থেকেই আরামদায়ক নয়। সে করবেই বা কি? দুটো বাজল, তখনও তার ভয় গেল না, একটু কমলও না। বারান্দাটা অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারে কালো-কালো কি একটা যেন প্রতিটি কোণ থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ভাক্‌সিন দরজার বাজুর দিকে মুখ ফেরাতেই তার মনে হল পিছন থেকে কে যেন তার শার্টটা ধরে টানল আর তার কাঁধে হাত রাখল।

"কী আপদ...রোজালিয়া কার্লভ্‌না!"

কেউ সাড়া দিল না। ভাক্‌সিন ইতস্তত করেও দরজাটা খুলে ভিতরে উঁকি দিল। ধর্মাত্মা জার্মান ফ্রাউলিন শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। ছোট রাত-বাতিটার আলোয় তার মোটাসোটা স্বাস্থ্যকর দেহ-রেখাটা চোখে পড়ল। ভাক্‌সিন ভিতরে ঢুকল; দরজার পাশে রাখা সিন্দুকটার উপর বসল। একটি ঘুমন্ত কিন্তু জীবিত প্রাণীর উপস্থিতিতে সে অনেকটা স্বস্তি বোধ করল।

ভাবল, "জার্মান ঘোটকী ঘুমিয়ে আছে, ঘুমিয়েই থাকুক। কিছুক্ষণ তার কাছে বসে ভোর হলেই আমি বেরিয়ে যাব...এখন তো বেশ আগেই আলো ফুটে ওঠে।"

ভোরের অপেক্ষায় ভাক্‌সিন মাথার নীচে হাত রেখে সিন্দুকের উপর শুয়ে পড়ে কত কি ভাবতে লাগল।

"এ থেকেই বোঝা যায় স্নায়ু কী না করতে পারে। একটি বয়স্ক, চিন্তাশীল মানুষ, অথচ...যাক গে সে সব। আমারই লজ্জা হচ্ছে।"

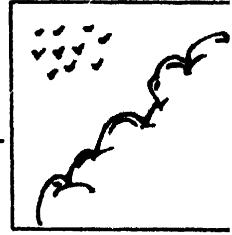
অচিরেই রোজালিয়া কার্লভ্‌নার সমান তালের মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে শুনতে সে সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে চোখ বুজল।

সকাল ছ'টার সময় ভাক্‌সিনের স্ত্রী "ত্রিমূর্তি নির্জন-আবাস"-এ ফিরে শোবার ঘরে স্বামীকে দেখতে না পেয়ে গভর্নেসের ঘরে গেল কোচোয়ানের ভাড়া মিটিয়ে দেবার জন্য কিছু খুচরো আনতে। গভর্নেসের ঘরে ঢুকে নিম্নলিখিত দৃশ্যটি তার চোখে পড়ল : গরমের জন্য হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় ঘুমিয়ে আছে রোজালিয়া কার্লভ্‌না, আর তার থেকে কয়েক ফুট দূরে একটা সিন্দুকের উপর বলের মত কুঁকড়ে তার স্বামী নির্বিকার হয়ে ঘুমিয়ে আছে। তার খালি পা, পরনে তলবাস। তখন স্ত্রী কি বলল, আর জেগে ওঠার পর স্বামীটিকে কতটা বোকা-বোকা দেখাল, সেটা পাঠকদের কল্পনার উপরই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে অসহায়; কেবলমাত্র হাতের কলমটাই নামিয়ে রাখতে পারি।

১৮৮৫

গ্রীষ্মের অতিথিবৃন্দ

The Summer Residents



একটি নববিবাহিত দম্পতি শহরতলির রেলস্টেশনের প্লাটফর্মে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। ছেলেটি জড়িয়ে ধরেছে মেয়েটির কোমর, আর মেয়েটি তাকে বেঁধেছে আলিঙ্গনে; দু'জনই খুব সুখী। ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে তাদের দিকে তাকিযে আছে চাঁদ; চাঁদের চোখে ভ্রূকুটি; নিঃসন্দেহে তার মনে ঈর্ষা জেগেছে; নিজের একঘেয়ে কুমারী জীবন তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। শান্ত বাতাসে ছড়িয়ে আছে লিলাক ও চেবিফুলের গন্ধ। রেল-পথের ওপারে কোথায় যেন একটা পাখি ডাকছে...

বৌটি বলল, "কী সুন্দর সাশা, কী সুন্দর! সত্যি, তোমার মনে হবে এ সবই একটা স্বপ্ন। চেয়ে দেখ, ওই বনটাকে কত আরামদায়ক আর স্নেহময় মনে হচ্ছে। ওই নিরেট, নীরব টেলিগ্রামের থামগুলিই বা কী সুন্দর! এরা যেন দৃশ্যপটটাকেই জীবন্ত কবে তুলেছে, আর বলছে যে অনেক দূরে কোন এক স্থানে এমন সব মানুষ আছে. .সভ্যতা আছে.. আব এই যে একটা ট্রেনের শব্দ ক্ষীণ হয়ে বাতাসে ভেসে আমাদের কানে আসছে সেটা কি তোমারও ভাল লাগছে না?"

"হ্যা, তা লাগছে...কিন্তু তোমার হাতটা কী গরম! এর কারণ তুমি উত্তেজিত হয়েছ ভারিযা। আজ আমাদের রাতের খাবারেব জন্য কি বেঁধেছ?"

"ঠাণ্ডা ঝোল আব মুরগিব মাংস। দু'জনের পক্ষে অনেকটা মুরগিব মাংসই আছে। তোমাব জন্য শহব থেকে কিছু সার্ডিন মাছ আব ভাঁপে-সিদ্ধ সুখাদ্য মাছ আনা হয়েছে।"

চাঁদটা মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে, যেন ওর নাকে তামাকের গন্ধ লেগেছে। মানুষের সুখ ওকে মনে করিয়ে দিয়েছে ওব নির্জনতা আর অরণ্য ও প্রান্তবের ওপারে সঙ্গীবিহীন গৃহকোণের কথা..."

ভারিয়া বলে উঠল, "একটা ট্রেন আসছে। কী মজা!"

দূরে দেখা দিল তিনটে আগুনে চোখ। স্টেশন-মাস্টার প্লাটফর্মে বেরিয়ে এল। লাইন-বরাবব সাংকেতিক আলো এখানে-ওখানে জ্বলতে লাগল।

হাই তুলে সাশা বলল, "ট্রেন ছাড়াটা দেখে আমরা বাড়ি ফিবব। দু'জন একসঙ্গে থাকতে কী ভালই যে লাগছে ভাবিযা! এত ভাল যে হতে পারে সেটা যেন বিশ্বাস করাই যায় না।"

একটা কৃষ্ণকায় দৈত্য নিঃশব্দে প্লাটফর্মে ঢুকে থেমে গেল। কামবাগুলোব অর্ধ-আলোকিত জানালা দিয়ে অনেক ঘুমন্ত মুখ, টুপি, কাঁধ

চোখে পড়ল...

"ওঃ! ওঃ!" একটা কামরা থেকে কথা ভেসে এল ঃ "ভারিয়া ও তার বর আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ওই তো তারা! ভারিয়া! ভারিয়া! ওঃ।"

দুটি ছোট মেয়ে কামরা থেকে লাফিয়ে নেমে ভারিয়ার গলা ধরে ঝুলে পড়ল। তাদের পরে এল একটি শক্তপোক্ত বর্ষীয়সী নারী ও একজন কৃশকায় ভদ্রলোক, তারপর বোঁচ্‌কা-বুঁচকি কাঁধে দুটি স্কুলের ছাত্র; ছাত্রদের পর এল গভর্নেস, এবং গভর্নেসের পরে ঠাকুরমা।

সাশার হাতটা চেপে ধরে ভদ্রলোক বলে উঠল, "ওহে বন্ধু, আমরা এখানে, আমরা এখানে। বাজী রেখে বলতে পারি যে তোমরা ধরে নিয়েছিলে আমরা হারিয়ে গেছি। বাজী ধরে বলতে পারি, খুড়োমশায় না আসায় তোমরা তাকে গালমন্দ করছিলে। কলিয়া, কস্তিয়া, নিনা, ফিফা...ছোটরা! তোমাদের দাদা সাশাকে চুমো খাও। তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে আমরা সকলেই এসেছি, সদলে এসেছি, তিন-চার দিন থাকব। আশা করি, ভিড়ের জন্য তোমরা ঘরছাড়া হবে না। আমাদের জন্য ব্যস্ত হয়ো না।"

সপরিবার খুড়োকে দেখে নবদম্পতি প্রমাদ গুণল। খুড়ো যখন তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছিল তখন একটা ছবি সাশার মনের সামনে ভেসে উঠল ঃ সে ও তার বৌ বাড়ির মোট তিনটে ঘর, বালিশ ও কম্বল অতিথিদের জন্য ছেড়ে দিল; এক সেকেণ্ডের মধ্যে সুস্বাদু মাছ, সার্ডিন মাছ, ও ঠাণ্ডা ঝোল সব সাবাড় হয়ে গেল; ভাই-বোনরা মিলে ফুল ছিঁড়ছে, কালি ঢালছে, আর খুড়ি সারাদিন ধরে তার অসুখের গল্প (তার পাকস্থলীর ব্যথা) এবং কেমন করে সে ব্যারনেস ভন ভিন্তিস হয়েছিল সেই সব গল্প বলছে।....

আর সাশা নিজেও তরুণী বধূর দিকে বিদ্বেষের চোখে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল ঃ

"তোমাকে দেখতেই ওরা সব এসেছে, যত সব!"

"না, তোমাকে দেখতে।" ঘৃণায় ও তিক্ততায় ফ্যাকাসে হয়ে ভারিয়া বলে উঠল। "তারা আমার আত্মীয় নয়, তোমার আপন জন।"

তারপরই অতিথিদের দিকে ফিরে সাদর হাসি হেসে বলল ঃ

"আপনাদের স্বাগত জানাই।"

চাঁদটা আবার মেঘের আড়াল থেকে ভেসে উঠল। মনে হল চাঁদটা হাসছে ঃ মনে হল কোন আপনজন না থাকায় সে যেন খুশি হয়েছে। কিন্তু সাশা অতিথিদের কাছ থেকে নিজের ক্রুদ্ধ, হতাশ মুখটা লুকিয়ে রাখতে ঘুরে দাঁড়াল আর মোলায়েম সাদর গলায় বলল ঃ

"স্বাগত! স্বাগত, প্রিয় অতিথিবৃন্দ!"

১৮৮৫



উপরতলার খাতির

Up the Ladder

প্রাদেশিক পবিষদেব সদস্য দলবনোসভ কার্যোপলক্ষে যখন পিতার্সবার্গে ছিল তখন একদিন প্রিন্স ফিংগলভেব বাড়িতে একটা জলসায় গিয়েছিল। সেখানে আইনেব ছাত্র শেপৎকিনকে দেখে সে খুবই অবাক হয়ে গেল। পাঁচ বছব আগে এই ছাত্রটি তাব ছেলেমেয়েদেব গৃহশিক্ষক ছিল। সেই জলসাব আসবে তাব অন্য কোন পবিচিত লোক ছিল না। কাজেই একঘেয়েমিব হাত থেকে বাঁচাব জন্য সে শেপৎকিনেব কাছে এগিয়ে গেল।

প্রশ্ন কবল, 'আবে, তুমি এখানে এলে কেমন কবে ?'

''যেমন কবে আপনি এসেছেন ?''

দলবনোসভ ভুরু কুঁচকে শেপৎকিনকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল, 'আমি যে ভাবে এসে পড়েছি তুমি বোধ হয় সে ভাবে আস নি। আবে ভাল কথা তোমাব খববটবব কি ?'

এই চলে যাচ্ছে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়েছি এবং পোদোকোন্নিকভেব অধীনে একটা বিশেষ কাজে অফিসাব হিসাবে কাজ কবছি।''

'সত্যি ? এই অল্প বয়সেব পক্ষে খাবাপ নয়। কিন্তু মানে একটা অবিবেচক প্রশ্নেব জন্য ক্ষমা কবো, এই কাজে তোমাব হাতে কত আসে ?''

''আট শ' কবল্।''

'ফুঃ! ওতে তো তামাকেব খবচও চলে না।' উপবওয়ালাব পিঠচাপড়ানোব ভঙ্গীতে দলবনোসভ কথাগুলি বলল।

অবশ্যই পিতার্সবার্গে ভালভাবে থাকাব পক্ষে টাকাটা যথেষ্ট নয়, কিন্তু, কি জানেন, ওটা ছাড়াও উগাবো-দেবোশিবস্কায়া বেলপথেব পবিচালক-সমিতিব আমি সচিব তাতে আমাব আসে দেড় হাজাব।''

''সত্যি'', সে ক্ষেত্রে অবশ্য '' দলবনোসভ টেনে টেনে বলল, তাব মুখটা কেমন যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ''ভাল কথা, আচ্ছা বাবা, আমাদেব এই আমন্ত্রণকর্তাব সঙ্গে কি কবে তোমাব পবিচয় হল ?''

শেপৎকিন ঠাণ্ডা গলায় বলল, ''খুব সহজে। বাষ্ট্রসচিব লোদকিনেব বাড়িতে তাব সঙ্গে দেখা হয়েছিল।''

'তুমি তুমি লোদকিনেব সঙ্গেও দেখা কবে থাক ?'' দলবনোসভ বলল, তাব চোখ দুটো তখন ঠেলে বেবিয়ে এসেছে।

''মাঝে মাঝেই। তাব ভাইঝিব সঙ্গে আমাব বিয়ে হয়েছে।''

''তাব ভাইঝি ? আবে সে কথা বলবে তো আমাকে কি জান

আমি...মানে...আমি বরাবর চেয়েছি তুমি...আমি ভবিষ্যৎবাণী করছি...ভবিষ্যতে তুমি অনেক বড় হবে...তুমি আমার বড় আদরের আইভান পেত্রভিচ।"

"পিয়োতর আইভানভিচ।"

"তা বটে, পিয়োতর আইভানভিচ...আর, কি জান, এইমাত্র তাকাতেই দেখতে পেলাম...আরে, এ যে আমাব পরিচিত মুখ। এক মুহূর্তেই তোমাকে চিনে ফেললাম। মনে মনে বললাম, 'ওকে তো আমার এখানে নৈশভোজে নেমন্তন্ন কবতেই হবে।' হিঃ হিঃ। বুড়ো মানুষের কথা সে ঠেলবে না তা আমি জানি। হোটেল ইউবোপ, তেত্রিশ নম্বর ঘর...একটা থেকে ছ'টা পযন্ত।"

১৮৮৫



প্রতারক

The Dissemlers

জেনাবেলেব বিধবা পত্নী মার্ফা পেত্রভ্না পেচংকিনা দশ বছব যাবৎ একজন পেশাদার হোমিওপ্যাথ হিসাবে চিকিৎসা করছে, এবং মে মাসেব কোন এক মঙ্গলবারে ডাক্তারখানায় বসে রোগী দেখছে। তার সম্মুখে ডেস্কেব উপব আছে একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স, একখানা চিকিৎসা-পুস্তক ও হোমিওপ্যাথিক দাড়িপাল্লা। দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে সেন্ট পিতার্সবার্গেব জনৈক হোমিওপ্যাথের সোনাব ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা চিঠি; মার্ফা পেত্রভনাব মতে লোকটি খুবই বিশিষ্ট এক মহান ব্যক্তি। দেয়ালে আরও ঝোলানো বয়েছে ফাদাব আবিস্তার্খেব প্রতিকৃতি। ক্ষতিকাবক এলোপ্যাথি পবিত্যাগ কবে সত্যজ্ঞানলাভরূপ মুক্তিব জন্য পেচংকিনা তাব কাছেই ঋণী। বোগীবা অধিকাংশই পুরুষ; সকলেই পাশেব ঘরে অপেক্ষা করছে। দুই-তিনি জন ছাড়া সকলেরই খালি পা, কারণ মাদাম পেচংকিনার হুকুম, দুর্গন্ধযুক্ত বুট বাইবে ছেড়ে আসতে হবে।

মার্ফা পেত্রভ্না ইতিমধ্যেই দশটি বোগী দেখেছে।। এবার একাদশতম বোগীব ডাক পড়ল।

"গাভ্রিলা গ্রুজদ্।"

দবজা খুলে গেল, আর গাভ্রিলা গ্রুজদের পরিবর্তে ঘরে ঢুকল তাব প্রতিবেশী জামুখ্শিন—পড়তি জমিদাব এক ছোটখাট বৃদ্ধ, দুটি নিষ্প্রভ চোখ আব বগলে সম্ভ্রান্ত লোকদেব উঁচু টুপি। লাঠিটা এক কোণে রেখে সে পায়ে পায়ে মাদাম পেচংকিনাব কাছে এগিয়ে গেল এবং তাব সামনে এক পায়ে নতজানু হল।

মুখ লাল কবে সত্রাশে মাদাম বলে উঠল, 'এ কি কবছেন আপনি? কি কবছেন কুজমা কুজ্মিচ? দোহাই প্রভুব।"

তাব হাতেব উপব ঠোঁট ছুঁইযে জামুখৃশিন বলল, "যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন উঠে দাঁড়াতে পাবব না। হে মানব জাতিব অবধাযক ও কল্যাণদাত্রী। সব মানুষ আমাব সম্মুখে নতজানু মূর্তিটিকে দেখুক। তাবা দেখুক যে পবীদেব বাণী আমাকে জীবন দিযেছেন, আমাকে সত্য পথ দেখিযেছেন, আমাব নাস্তিক চিন্তা ভাবনাব উপব আলোকপাত কবেছেন, তাব সম্মুখে কেবল নতজানু হওযা নয, আগুনেব ভিতব দিযে হেঁটে যেতেও আমি বাজী। হে অলৌকিক চিকিৎসক, অসহায় ও প্রিযজনবিধুবদেব মাতৃস্বৰূপা। আমি সেবে উঠেছি। হে জাদুকবী। আমি নবজন্ম লাভ কবেছি।"

আনন্দে লাল হযে মাদাম পেচংকিনা বলল, "আমি আমি খুব খুশি হযেছি। এ কথা শুনলেও কত আনন্দ পাই দযা কবে বসুন। এই তো গত মঙ্গলবাবেও আপনি কত অসুস্থ ছিলেন।"

আসনে বসে জামুখৃশিন বলল, "ঠিক, কী অসুস্থই না ছিলাম। সে কথা মনে কবতেও ভয কবে। সাবা দেহে, সর্ব অঙ্গে বাতব্যাধি। আট বছব কত কষ্ট পেযেছি, মনে এতটুকু শান্তি ছিল না। হে কল্যাণদাত্রী। দিনেও শান্তি ছিল না বাতেও না। কত ডাক্তাব দেখিযেছি, কাজানে অধ্যাপকদেব সঙ্গে দেখা কবেছি, কত বকম কাদা-মাটিব চিকিৎসা কবিযেছি, কত ধাতুজ জল খেযেছি, কী না কবেছি। চিকিৎসাব জন্য যথাসর্বস্ব ব্যয কবেছি। সেই সব ডাক্তাব আমাকে ক্ষতি ভিন্ন আব কিছুই দিতে পাবে নি। আমাব বোগাকে তাবা আমাব ভিতবে ঢুকিযে দিযেছে, কিন্তু তাদেব বিজ্ঞান তাকে ভিতব থেকে টেনে বেব কবে আনতে পাবে নি। তাদেব চাই কেবল টাকা। ডাকাত সব, আব মানুষেব উপকাব কবাব বেলায অষ্টবম্ভা। কিছু তুক-তাক লিখে দেবে আব তাই তোমাকে গিলতে হবে। এক কথায, যত সব খুনীব দল। আমাব দেবদূত আপনি না থাকলে তো এতদিনে আমি কববে যেতাম। গত মঙ্গলবাব আপনাব কাছ থেকে বাড়িতে ফিবে যে বড়িগুলো আপনি দিযেছিলেন সেগুলিব দিকে তাকিযে ভাবলাম: "এগুলি দিযে কি হবে? এই ছোট ছোট দানাগুলো তো চোখে প্রায দেখাই যায না, আমাব এত দীর্ঘদিনেব এত বড় বোগ কি এতে সাববে? বিশ্বাস হল না, মুচকি হেসে বড়িগুলো খেলাম, কিন্তু যেই না খাওযা—অমনি সঙ্গে সঙ্গে। আমাব যেন কোন দিন কোন অসুখ ছিল না, অথবা থাকলেও হাত দিযে তাকে একেবাবে মুছে ফেলেছি। আমাব স্ত্রী বড় বড় চোখ কবে আমাকে দেখল, কিন্তু বিশ্বাস কবতে পাবল না, "কলিযা, এ কি সত্যি তুমি?" আমি বললাম, 'সত্যি।" দু'জনে মিলে বিগ্রহেব সামনে নতজানু হযে আমাদেব দেবদূতটিব জন্য প্রার্থনা জানালাম: 'হে প্রভু আমাদেব এই অনুভূতি তাকে জানিযে দাও।' "

জামুখৃশিন আস্তিনে চোখ মুছে আবাব উঠে দাঁড়াল, তাব ইচ্ছা আবাব

নতজানু হবে, কিন্তু পেচংকিনা তাকে বাধা দিয়ে আবার বসিয়ে দিল।

উত্তেজনায় লাল হয়ে এবং উচ্ছ্বসিত দৃষ্টিতে ফাদার আবিস্তার্খের প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে মাদাম বলে উঠল, ''ধন্যবাদ আমাকে নয়। এখানে আমি তো অপরের হাতের যন্ত্রমাত্র সত্যি, এটা অলৌকিক ব্যাপার। আট বছরের শেকড়-গজানো বাতব্যাধি কি না সেরে গেল এক দানা ওষুধে।''

''আপনি তো তবু দয়া করে আমাকে দিয়েছিলেন তিনটে বড়ি। তার একটা খেলাম ডিনারের সঙ্গে—আর সঙ্গে সঙ্গে ফল পেলাম। আরেকটা খেলাম সন্ধ্যায় এবং তৃতীয়টা পরদিন—সেই থেকে কিছু নেই। একটা আলপিনের খোঁচাও না। অথচ আমি তো মরতেই বসেছিলাম, মস্কোতে আমার ছেলেকে চিঠি লিখেছিলাম চলে আসতে। হে নিরাময়কারী! ঈশ্বরই আপনাকে সুবুদ্ধি দিয়েছিলেন। আর এখন আমি হেঁটে বেড়াচ্ছি, যেন স্বর্গে আছি। যে মঙ্গলবার আপনার কাছে এসেছিলাম সেদিন তো খুঁড়িয়ে হাঁটছিলাম, আর এখন আমি খরগোশকেও তাড়া করতে পারি। আমি তো আরও এক শ' বছর বাঁচতে পারতাম। কিন্তু একটাই বিঘ্ন দেখা দিয়েছে। আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি, কিন্তু যা খেয়ে বাঁচব তাই যদি না থাকে তাহলে স্বাস্থ্য নিয়ে কি হবে? এখন তো রোগের চাইতে অভাবটাই বড় হয়ে উঠেছে। একটা কথাই ধরুন। এই তো যই শস্য বোনার সময়, কিন্তু বীজ না থাকলে বুনব কি? বীজ কিনতে হবে, কিন্তু টাকা. আপনি তো জানেন কি টাকা আমাদের আছে।''

আমি আপনাকে যই দেব কুজমা কুজমিচ। বসুন, বসুন। আপনি আমাকে এত খুশি করেছেন, এত আনন্দ দিয়েছেন যে ধন্যবাদটা আমারই দেবার কথা, আপনার নয়।''

আপনিই আমাদের আনন্দ। ভাবুন তো, ঈশ্বর কী একজন ভাল মানুষকেই সৃষ্টি করেছে! আপনার সৎকর্মের দিকে তাকিয়ে আনন্দ করুন। কিন্তু আমরা পাপী, আমাদের আনন্দ করার মত কিছু নেই। আমরা তুচ্ছ লোক, ভীরু অকর্মন্য—পদমর্যাদায় ভদ্রলোক, কিন্তু বাস্তবে আমরা মুঝিকদের মতই দীনহীন, তাদের চাইতেও খারাপ। আমরা পাথরের ঘরে বাস করি, কিন্তু সে তো মরীচিকা, কারণ ছাদটাই ফুটো .ছাদ মেরামত করার পয়সাও আমাদের নেই।''

''সে পয়সা আমি দেব কুজমা কুজামচ্।''

জামুখ্‌শিন আরো চাইল এবং পেয়েও গেল—একটা গরু, যে মেয়েটিকে একটা বড় স্কুলে ঢোকাতে চায় তার জন্য একটা সুপারিশ-পত্র এবং মাদাম পেচংকিনার উদারতায় অভিভূত হয়ে সে ভাবাবেগের আধিক্যে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে, মুখ সিটকে হাসে, এবং রুমালের জন্য পকেটে হাত ঢোকায়। জেনারেলের পত্নী দেখতে পেল, রুমালের সঙ্গে একটুকরো লাল কাগজ তার পকেট থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে মেঝেতে পড়ল।

বৃদ্ধ তখনও বলেই চলেছে, ''আমি কোন দিন ভুলব না, কোন দিন

না...আমার ছেলেমেয়েদের মনে রাখতে বলব, আর আমার নাতি-নাতনিদের, এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষান্তরে বলে যাব...সন্তানগণ, ইনিই আমাকে কবর থেকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন—ইনিই—"

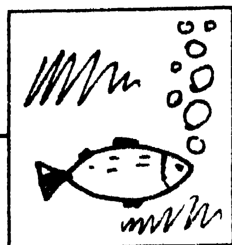
রোগী ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলে মাদাম পেচংকিনা অশ্রুভরা চোখে ফাদার আরিস্তার্খের দিকে এক মিনিট তাকিয়ে থাকল; তারপরে সস্নেহে ও শ্রদ্ধা সহকারে ওষুধের বাক্স, দাড়ি-পাল্লা এবং যে হাতল-চেয়ারটি থেকে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে-ওঠা লোকটি এইমাত্র উঠে গেল সেটার দিকে তাকিয়ে রইল। সেই লোকটি যে কাগজের টুকরোটা ফেলে গেছে সেটাও তার নজরে পড়ল। কাগজটা তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলে তার মধ্যে সেই তিনটি বড়িই দেখতে পেল যা আগের মঙ্গলবার সে নিজে জামুখ্শিনকে দিয়েছিল।

হতচকিত গলায় সে বলে উঠল, "সেই একই বড়ি...সেই একই কাগজ। কাগজের মোড়কটা সে তো খোলেই নি; তাহলে সে খেয়েছে কি? আশ্চর্য! নিশ্চয়ই সে আমাকে মিথ্যা বলে নি?"

দশ বছর ধরে চিকিৎসা করার পরে এই প্রথম মাদাম পেচংকিনার মনে সন্দেহ দেখা দিল। বাকি রোগীদের ডাকল এবং তাদের রোগ সম্পর্কে কথা বলার সময় সেই সব খুটিনাটির দিকে নজর রাখল যা এতদিন তার মনোযোগকে এড়িয়ে গেছে। তার মনে হতে লাগল, যেন পূর্বব্যবস্থামতই শেষ লোকটি পর্যন্ত সকলেই প্রথমে অলৌকিক রোগ নিরাময়ের জন্য তার প্রশংসা করল, তার চিকিৎসাসংক্রান্ত জ্ঞান নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল, এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের মুণ্ডুপাত করল, আর তারপরে সে নিজে যখন আত্মতৃষ্টিতে রাঙা হয়ে উঠল, তখন তারা নিজ নিজ অভাবের ফিরিস্তি দাখিল করতে শুরু করল। কেউ চায় একটু জমি, কেউ চায় জ্বালানি কাঠ, কেউ বা জঙ্গলে শিকার করার অনুমতি চায়, ইত্যাদি। মাদাম চোখ তুলে তাকাল ফাদার আরিস্তার্খের প্রশস্ত, অমায়িক মুখের দিকে ঃ তিনিই তো তার কাছে সত্যকে প্রকাশ করেছেন। একটা নতুন সত্য তার আত্মাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। সে সত্য কুৎসিত, বেদনাদায়ক...

মানুষ বড় ধূর্ত।

১৮৮৫



বাইন মাছ

The Burbot

গ্রীষ্মকালের এক সকাল। বাতাস নিঃশব্দ, নদীর তীর থেকে একটি মাত্র শব্দ আসছে—গঙ্গাফড়িং-এর ডাক। ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা বরফের মত আকাশে নিশ্চলভাবে ঝুলে আছে পালকের মত ছেঁড়া মেঘ। নির্মীয়মান ঘাটের কাছে ছুতোর গেরাসিম একটা উইলো গাছের সবুজ ডালপালার নীচে জল ছিটিয়ে চলেছে ঃ লোকটি ঢ্যাঙা, কৃশকায়, মাথাভর্তি কোঁকড়ানো লাল চুল, মুখভরা বড় বড় লাল দাড়ি। সে হাঁসফাঁস করছে, জল ছিটচ্ছে, আর মহা উৎসাহে উইলো গাছের শিকড়ের তলা থেকে কি যেন বের করার চেষ্টা করছে। মুখটা ঘামে ভিজে উঠেছে। গেরাসিমের কাছ থেকে প্রায় ছ' ফুট দূরে আর এক ছুতোর ল্যুবিম গলা-জলে দাঁড়িয়ে আছে, যুবকটি কুঁজো, মুখটা ত্রিকোণ, চোখ দুটো চীনাদের মত। দু জনই ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছে, কারণ এক ঘন্টারও বেশী তারা জলে নেমেছে।

কুঁজো ল্যুবিম জ্বরের মত কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে বলে উঠল, তুমি হাত দিয়ে কি হাতড়ে বেড়াচ্ছ? চেপে ধর, চেপে ধর নইলে পালিয়ে যাবে। শয়তান! আমি বলছি, চেপে ধর।''

''পালাবে না .সাঁতার কেটে যাবে কোথায়? একটা শিকড়ের নীচে আটকে পড়েছে যে'', কর্কশ গলায় গেরাসিম বলল, তার কাঁপা কণ্ঠস্বর যেন পেটের ভিতর থেকে উঠে আসছে, গলা থেকে নয়। ব্যাটা খুব পিছল, আর ধরবার মতও কিছুই নেই।''

''ফুলকোটা চেপে ধর, ফুলকো।''

''ফুলকোটা তো দেখতে পাচ্ছি না। দাঁড়াও কি যেন একটা ধরতে পেরেছি, ঠোঁটটা চেপে ধরেছি। শয়তানটা আবার কামড়াচ্ছে।

''ঠোঁট ধরে টেনো না, টেনো না। ফুলকোটা ধর, তাহলেই ওটাকে বাগে আনতে পারবে। আবার হাতটা ছুঁড়তে শুরু করলে। তুমি একটা বোকা-পাঠা, ঈশ্বরজননী আমাকে মার্জনা করুন। চেপে ধর।

''চেপে ধর।'' গেরাসিম ঠাট্টা করে বলল। হুকুম করার লোক বটে তুমি। কুঁজো শয়তান, নিজেই এসে চেপে ধর না দেখি। ওখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?''

''পারলে তো ধরেই ফেলতাম। তুমি কি আশা কর আমার মত একটা বেঁটে কুঁজো মানুষ নদীর পাড়ের নীচে দাঁড়াবে? ওখানে তো গভীর জল।

কুঁজো লোকটা সাঁতার কেটে গেরাসিমের কাছে গিয়ে একটা ডাল

আঁকড়ে ধরল। উঠে দাঁড়াবার প্রথম চেষ্টাতেই মাথাটা জলের নীচে চলে গেল, সে বুড়বুড়ি কাটতে লাগল।

রাগে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, ''আগেই বলেছিলাম এখানে গভীর জল। এখন কোথায় দাঁড়াব? তোমার ঘাড়ে?''

''একটা শিকড়ের উপর দাঁড়াও...এখানে তো অনেক শিকড় আছে, ঠিক মইয়ের মত।''

কুঁজো গোড়ালি দিয়ে একটা শিকড় পেয়ে কয়েকটা ডাল ধরে তার উপর দাঁড়িয়ে দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে নতুন অবস্থায় নিজেকে ঠিকমত মানিয়ে নিয়ে সে এমন ভাবে উপুড় হল যাতে তার মুখে জল ঢুকতে না পারে; তারপর ডান হাতটা বাড়িয়ে শিকড়গুলোর ভিতরে হাতড়াতে লাগল। জলজ লতাপাতায় জড়িয়ে পড়ে শেওলা-ঢাকা শিকড়ের ভিতর দিয়ে হাত চালাতে চালাতে একটা গলদা চিংড়ির ধারালো দাঁড়া তার হাতে ফুটে গেল।

''এইবার ধরেছি।'' বলে ল্যাবিম প্রচণ্ড জোরে চিংড়িটাকে তীরের উপর আছড়ে ফেলল।

শেষপর্যন্ত তার নিজের হাত গিয়ে পড়ল গেরাসিমের হাতের উপর, আর সে হাতকে পাশ কাটিয়ে নীচে নামতেই কি একটা চটচটে ঠাণ্ডা জিনিস, তার হাতে লাগল।

ল্যাবিম হেসে বলল, ''এই তো সেটাকে পেয়েছি। বেশ বড়...তোমার আঙুলগুলো খোল, তাহলেই আমি...ওর ফুল্‌কোটা ধরতে পারব।...দাঁড়াও, তোমার কনুই দিয়ে আমাকে গুঁতিয়ো না...ওটাকে আমি এখনই টেনে বার করব।...আমাকে একবার ভাল করে ধরতে দাও।...ব্যাটা শিকড়ের অনেক নীচে ঢুকে আছে...ধরবার মত কিছুই পাচ্ছি না...মাথা পর্যন্ত হাতটা যাচ্ছে না...এটা তো পেট।...আমার গলার উপর থেকে মশাটা তাড়াও তো, মশাটা কামড়াচ্ছে। এবার ধরতে পারব...ফুল্‌কোর নীচে...পাশ থেকে ঠেলা মার, ঠেলা মার। আঙুল দিয়ে খোঁচা মার।''

কুঁজো লোকটি গাল ফুলিয়ে দম বন্ধ করে চোখ ঘোরাতে লাগল; মনে হল, ''ফুল্‌কোর নীচ থেকে'' সে হাতটা সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সে বাঁ হাত দিয়ে যে ডালটা ধরে ছিল হঠাৎ সেটা ভেঙে গেল, আর তাল সামলাতে না পেরে সে সশব্দে জলের মধ্যে পড়ে গেল। বুঝি বা ভয় পেয়েই ঢেউয়ের বৃত্তগুলি তীর থেকে দূরে চলে যেতে শুরু করল আর যে জায়গাটাতে সে ডুবে গিয়েছিল সেখানে অনেকগুলি বুদবুদ্‌ ফুটে উঠল। এক সময় কুঁজো লোকটাও মাথা তুলে গাছের একটা ডাল ধরে ফেলল।

গেরাসিম হাহা করে বলে উঠল, ''তুমি দেখছি ডুবে মরবে, আর তার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে আমাকে। ডালটা বেয়ে উঠে পড়, তারপর জাহান্নামে যাও। ওটাকে আমিই ঠেলে তুলতে পারব।''

তারা তর্ক শুরু করল।...সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে। ছায়াগুলো ছোট হতে হতে শামুকের শুঁড়ের মত নিজের মধ্যেই ঢুকে যাচ্ছে। রোদের তাপ লেগে

লম্বা ঘাসগুলো থেকে মধুর মত একটা গন্ধ বের হচ্ছে। মধ্যাহ্নের আর দেরী নেই। গেরাসিম ও ল্যুবিম তখনও উইলো গাছের তলায় জল তোলপাড় করছে। ফ্যাঁসফেঁসে মোটা গলা আর কর্কশ চিকচিক্ শব্দ গ্রীষ্মকালের নীরবতাকে বার বার ভেঙে দিচ্ছে।

''ফ্ল্‌কো ধরে ওটাকে টেনে তোল। ভাল করে ধরে রাখ, আমি ওটাকে ঠেলে উপরে তুলব। ওটাকে তোমার মোটা হাত দিয়ে চেপে ধরছ কেন? তোমার মুঠিটা দিয়ে নয়, আঙুল দিয়ে চেপে ধর হাঁদারাম। এক পাশ থেকে এগিয়ে যাও। বাঁ দিক থেকে যাও। বাঁ দিক থেকে, ডান দিকে একটা গর্ত আছে। তুমি একটা বড় দরের ডম্বল, তুমি! ঠোঁট ধরে ওটাকে টানছ!''

একটা চাবুকের শব্দ শোনা গেল। গো-রাখাল এফিমের তাড়া খেয়ে একপাল গরু, ভেড়া নদীর তীর ধরে অলসভাবে জল খাবার ঘাটের দিকে চলেছে। এক চোখ কানা ও বাঁকা মুখ অথর্ব বুড়ো রাখাল মাথাটা নীচু করে পায়ের দিকে তাকিয়ে হাঁটছে। প্রথম জলে নামল ভেড়াগুলো, তারপর ঘোড়াগুলো এবং ঘোড়ার পরে গরুর পাল।

''নীচ থেকে ওটাকে ঠেলা মার।'' ল্যুবিমের চীৎকার সে শুনতে পেল। ''আঙুলগুলো ঢুকিয়ে দাও। তুমি কি কালা নাকি? বাঃ!''

''তোমরা কাকে ঠেলছ হে?'' এফিম চেঁচিয়ে বলল।

''একটা বাইন মাছ! কিছুতেই বের করে আনতে পারছি না। একটা শিকড়ের নীচে সেঁধিয়ে গেছে। একটা পাশ থেকে ঢুকে পড়। ঢুকে পড়, ঢুকে পড়।''

এফিম এক চোখে মুহূর্তকাল দুই মাছ-ধরার দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর পা থেকে বাকলের জুতো খুলে ফেলল, থলেটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখল, শার্টটাও খুলে ফেলল। বীচেস খুলে ফেলার ধৈর্য তার ছিল না; সেই অবস্থায়ই ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দুটি সরু কালো হাতে দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে জলে নেমে পড়ল।...নদীর কাদা-জলের ভিতর দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাত হেঁটে তারপর সাঁতার দিল।

চেঁচিয়ে বলল, ''সবুর কর বাছারা। সবুর। দেখ, কি ভাবে কাজটা করতে হয়। কায়দাটা জানা থাকা চাই।''

এফিম দুই ছুতোরের কাছে পৌঁছে গেল। তিনজন মিলে চেঁচামেচি করে গুঁতোগুঁতি করে একই জায়গায় হুলুস্থুলু বাঁধিয়ে বসল। কুঁজো ল্যুবিম তো জল খেয়ে প্রচণ্ড কাশতে শুরু করে দিল।

''রাখালটা কোথায় গেল?'' তীর থেকে একটা ডাক ভেসে এল। ''এ-ফি-ম! রাখাল! তুমি কোথায়? জানোয়ারের দল যে বাগানে ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দাও। কোথায় গেল সেই ক্ষুদে ডাকাতটা!''

প্রথমে পুরুষের কণ্ঠ শোনা গেল, তারপর একটি নারীকণ্ঠ। জমিদারের বাগানের রেলিংয়ের ওপার থেকে দেখা দিল স্বয়ং জমিদার আন্দ্রেই

আন্দ্রেইচ।...তার পরনে পারসিক ড্রেসিং-গাউন, হাতে খবরের কাগজ।...নদীর যেদিক থেকে চীৎকার ভেসে আসছে সেইদিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে দ্রুতগতিতে স্নান-ঘাটে নেমে গেল।...

উইলো গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে মাছধরাদের তিনটে ভেজা মাথা দেখতে পেয়ে সে শক্ত গলায় বলল, ''এখানে কি হচ্ছে? কে এত চেঁচাচ্ছে? তোমরা এখানে কি করছ?''

মাথা না তুলেই এফিম বলল, ''আমরা মাছ ধরছি।''

''ধরাচ্ছি মাছ। গরু-ছাগল সব বাগানে ঢুকছে আর উনি মাছ ধরছেন। শয়তানের দল, স্নান-ঘাটটা কবে তৈরী হবে? দু'দিন ধরে তো কাজে লেগেছ, কিন্তু কি কাজ করেছ?''

কর্কশ গলায় গেরাসিম বলল, ''ও..হয়ে যাবে। গরম কালের কাঠ, আরও একটু ভিজুক হুজুর...আরে-রে, এই বাইনটাকে নিয়ে তো পারা গেল না..একটা শিকড়ের তলায় গিয়ে বসে আছে ..ঠিক যেন একটা গর্তে ঢুকেছে; এ-দিক ও-দিক কোন দিকেই নড়ছে না।

''বাইন মাছ?'' জমিদার প্রশ্ন করল; তার চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করছে। ''তাহলে তাড়াতাড়ি তুলে আন।''

''একটা আধ রুবল্ দেবেন কি? যদি ওটাকে ধরতে পারি? মস্ত বড় মোটা-সোটা একটা বাইন, বণিকের বৌয়ের মত। আধ রুবলের যোগ্য মাছ হুজুর.. যা খাটুনি গেল...ওটাকে চেপে ধরো না ল্যুবিম, তুমি দেখছি ওটাকে মেরেই ফেলবে। নীচ থেকে তুলে ধর। আগে শিকড়টা তুলে নাও হে...কি যেন তোমার নামটা? তুলে ধর, নীচু করে নয়। তোমার পা চালানোটা থামাও।''

পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেল, তারপর দশ...জমিদার ধৈর্য রাখতে পারছে না। জমিদার-বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে সে চীৎকার করে ডাকাল, ''ভাসিলি! ভাসিলি!''

কোচয়ান ভাসিলি ছুটে এল। সে কি যেন চিবুচ্ছে আর ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে।

মনিব হুকুম করল,. ''জলে নেমে পড়! বাইন মাছটাকে বের করার কাজে ওদের সাহায্য কর।...ওরা নিজেরা কোন কিনই কাজটা করতে পারবে না।''

ভাসিলি তাড়াতাড়ি পোশাক খুলে জলে নেমে পড়ল।

সে তো-তো করে বলতে লাগল, ''এই তো ধরলাম বলে। বাইন মাছটা কোথায়? চোখের নিমেষে ধরে ফেলছি। তুমি চলে যেতে পার এফিম। তোমার মত একটা বুড়ো মানুষের এখানে থেকে দল ভারী করা কেন? কোথায় সেই বাইন? এই মুহূর্তে ধরব। এই তো পেয়েছি। তোমাদের হাত সরিয়ে নাও।''

''কেন আমাদের হাত সরিয়ে নেব? কথা শোন! 'তোমাদের হাত তুলে

নাও।' ওটাকে টেনে বের কবাব চেষ্টা একবার করেই দেখ।''

''তোমরা কি ভেবেছ এভাবে ওটাকে বেব কবে আনতে পারবে? ওটার মাথাটা চেপে ধরতে হবে।''

''ওর মাথাটা তো শিকড়েব নীচে। আমরা কি করছি সেটা আমবা বুঝব, বোকা কোথাকাব।''

''গালাগাল থামাও, নইলে দেব এক ঘা বসিয়ে। যত সব বাজে লোক।''

এফিম বলল, ''মনিবেব সামনেই কথাব কি ছিবি। দেখ বাছারা, তোমবা কউ ওটাকে বের করতে পাববে না। ওখানে বেশ ভাল বকম খুঁটি গেড়ে বসেছে।''

''এক সেকেণ্ড অপেক্ষা কর,'' বলেই জমিদাব তাড়াতাড়ি পোশাক খুলতে শুরু করল। ''তোমরা চাব বোকাবাম জুটেছ, আর একটা বাইন মাছকে তুলে আনতে পারছ না।''

পোশাক ছাড়া হয়ে গেলে একটু শান্ত হয়ে আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ জলে নেমে গেল। কিন্তু তার হস্তক্ষেপেও বিশেষ কোন ফায়দা হল না।

শেষ পর্যন্ত ল্যবিম স্থিব কবল, ''শিকড়টাকে কেটে ফেলতে হবে। গেরাসিম, কুড়ুলটা নিয়ে এস। কুড়ুলটা আমাদেব দাও।''

জলের নীচে কুড়োলের কোপের শব্দ শুনতে পেয়ে জমিদাব বলল, ''তোমাদের আঙুল যেন কেটো না। এফিম, ওখান থেকে চলে এস। সবুব কব, আমি নিজেই বাইন মাছটাকে তুলে আনব। তোমবা ঠিক মত ধবতে পারছ না।''

শিকড়টা কেটে ফেলা হল। সকলে মিলে সেটাকে একটু তুলে ধবল, আর আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ্ পবম সুখে অনুভব কবল যে তাব আঙুলগুলো বাইনের ফুলকোর মধ্যে নেমে গেছে।

''উঠছে, উঠছে...ভাই সকল! আমাকে ঘিবে ধরো না এটাকে তুলে ধব...সে আসছে।''

একটা বড় বাইন মাছেব মাথাটা জলের উপবে দেখা দিল, আব তারপরেই দেখা দিল দু' ফুটের বেশী লম্বা একটা কালো দেহ।

বাইনটা সবেগে লেজটা আছড়ে ফেলছে আর নিজেকে ছাড়িয়ে নেবাব চেষ্টা করছে।

''সে গুড়ে বালি। নড়েচড়ে কোন লাভ হবে না বন্ধু! তোমাকে হাতের মধ্যে পেয়েছি। আহা!''

সকলের মুখেই একটা মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়ল। এক মিনিট সকলেই নিঃশব্দে চিন্তামগ্ন।

নিজেব কণ্ঠাস্থির নীচটা চুলকোতে চুলকোতে এফিম বলে উঠল ''বেশ মোটাসোটা বড় বাইনটা। পুরো দশ পাউণ্ড হবেই।''

''হ্যাঁ, তা হবে'', মনিবও একমত। ''আর ওব যকৃৎটাও ফুলে উঠেছে,

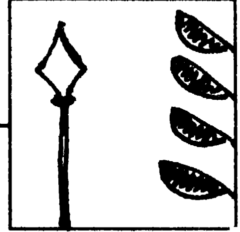
নির্ঘাৎ ফাটবে। ওঃ!''

বাইন মাছটা হঠাৎ চটাৎ করে শব্দ করে লেজটা তুলল আর মাছ-ধবারা শুনল জোরালো একটা ছলাৎ শব্দ। সকলে এক সঙ্গে হাত বাড়াল, কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে ; বাইন মাছটা তখন একটি সুখ-স্মৃতি মাত্র।

১৮৮৫

শিকারী

The Hunter



দুপুবটা যেমন গরম তেমনই গুমোট। আকাশে একটুকরো মেঘ নেই· রোদে-পোড়া ঘাসকে বিষণ্ন ও নিরাশ দেখাচ্ছে ; এমন কি বৃষ্টি হলেও সে ঘাস আর সবুজ হবে না। অরণ্যটা দাঁড়িয়ে আছে নীরব, নিশ্চল, গাছের মাথাগুলি যেন দূরে তাকিয়ে আছে, অথবা যেন কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করে আছে।

বছর চল্লিশ বয়সের একটি ঢ্যাঙা, সরু-কাঁধ লোক বনের প্রান্তের পথটা ধবে সগর্বে অলস ভঙ্গীতে হেঁটে চলেছে। তার পরনে লাল ব্লাউস, ভদ্রলোকদের মত ছোপ-মারা ব্রীচেস ও বড় মাপের বুট জুতো। তার ডানদিকে একটা সবুজ মাঠ, আর বাঁ দিকে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত পাকা রাই শস্যেব এক সোনালী সমুদ্র।...লোকটির মুখটা লাল, দর্‌দর্‌ করে ঘাম ঝরছে। তার মাথায় হাল্কাভাবে বসানো জকি-ধরনের চূড়াওয়ালা একটা চ্যাপ্টা সাদা টুপি—স্পষ্টতই কোন জমিদার সাময়িক উদারতাবশে সেটা তাকে উপহার দিয়েছে। তার কাঁধে ঝোলানো শিকার-থলের মধ্যে একটা বিল-মোরগ ভবা আছে। হাতে একটা দো-নলা শট্‌-গান ; তার ঘোড়াটা পিছন দিকে টানা ; সে তাকিয়ে আছে তার ক্ষীণকায় বুড়ো কুকুরটার দিকে ; কুকুরটা আগে আগে ছুটছে আর ঝোপ-ঝাড় দেখলেই সেটা শুঁকছে। সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে , একটা শব্দও শোনা যাচ্ছে না। সব জীবিত প্রাণী গরমের ভয়ে যার যার আশ্রয়ে চলে গেছে।

''ঈগর ভ্লাসিচ্‌।'' পিছন থেকে নরম গলায় কে যেন ডাকল

চমকে ঘুরে তাকিয়ে সে ভুরু কুঁচকাল। তার কাছেই যেন এইমাত্র মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আছে বছর ত্রিশের একটি বিষণ্নমুখী নারী ; তার হাতে একখানি কাস্তে। সে লোকটির মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করে লাজুক ভঙ্গীতে হাসল।

''আরে, তুমি, পেলাগেয়া ?'' চলা থামিয়ে বন্দুকের ঘোড়াটাকে যথাস্থানে ঠেলে দিয়ে শিকারী বলে উঠল। ''হুম্‌। তুমি এখানে এসেছ কেন ?''

"আমাদের গ্রামের মেয়েরা কাছেই কাজ করছে। আমিও তাদের সঙ্গে এসেছি...আমি তো ভাড়া খাটি ইগর ভ্লাসিচ।"

"বটে..." কথাটা বলে ইগর ভ্লাসিচ্ ধীরে ধীরে হাঁটিতে লাগল।

পেলাগেয়া তাকে অনুসরণ করল। নীরবে তারা প্রায় বিশ মিনিট হাঁটল।

সস্নেহে শিকারীর পিঠ ও কাঁধের দিকে তাকিয়ে পেলাগেয়া বলল, "কত যুগ তোমাকে দেখি নি ইগর ভ্লাসিচ্। গত ইস্টারের সময় সেই যে আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে এক গ্লাস জল খেতে তারপর আর দেখা হয় নি তুমি তো মুহূর্তের জন্য একটিবার মাত্র তাকিয়েছিলে, কিন্তু তুমি, ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন, তুমি তো তখন মাতাল হয়েছিলে। আমাকে গালাগাল করলে, মারধোর করলে, তারপর চলে গেলে। ..আমি অপেক্ষাই করলাম, তোমার জন্য অপেক্ষা করে করে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ওঃ, ইগর ভ্লাসিচ, ইগর ভ্লাসিচ্! তুমি যদি একটিবারও আসতে!"

"তোমাদের বাড়িতে আমার কি করার আছে?"

"করার মত কিছু নেই, কিন্তু...তবু একটা বাড়ি তো। তুমি তো নিজের চোখে সব দেখতে পারতে...তুমি তো মনিব। আরে, তুমি একটা বিলমোরগ ঝুলিতে ভরেছ দেখছি। একটু বসে তোমার বিশ্রাম নেওয়া উচিত ইগর ভ্লাসিচ্।"

কথাগুলি বলার সময় পেলাগেয়া বোকার মত হেসে হেসে ইগরের দিকে তাকাতে লাগল। তার চোখে-মুখে সুখের ঢেউ উঠেছে...

"বসব। বেশ..." শান্ত গলায় কথাটা বলে ইগর দুটো ছোট দেবদারু গাছের মাঝখানে বসে পড়ল। "তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? তুমিও বস।"

পেলাগেয়া একটু দূরে রোদে বসল। নিজের সুখে লজ্জা পেয়ে হাত দিয়ে মুখটা ঢাকল। মিনিট দু'য়েক নীরবে কেটে গেল।

পেলাগেয়া নরম গলায় বলল, "একটিবার তো আসতে পারতে।"

টুপিটা খুলে লাল ভুরু মুছে ইগর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কিসের জন্য? কোন দরকার নেই। দু'এক ঘন্টার জন্য যদি যাই, সেটা তো নিছক সময় নষ্ট, তুমিও বিব্রত হবে, আর এখানকার বিধি-ব্যবস্থার জন্য গ্রামে থাকাটা আমারও সয় না। .. তুমি তো জান, আমার অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। আমার বিছানা চাই, ভাল চা চাই, আর ভদ্র কথাবার্তাও চাই।...সব রকম আরাম আমার চাই। কিন্তু গ্রামে তোমাদের তো দারিদ্র্য আর নোংরামিই সার। সেটা আমি একদিনও সহ্য করতে পারতাম না। ধর সম্রাটের হুকুম হল, আমাকে কিছুদিনের জন্য তোমাদের কাছেই থাকতে হবে। তখন তো সে এক মহা কেলেঙ্কারি অবস্থা। ছোটবেলা থেকেই আমি কিছুটা খেয়ালি, আর সে ব্যাপারে কারও কিছু করার নেই।"

"এখন তুমি কোথায় আছ?"

"জমিদার দিমিত্রি আইভানিচের বাড়িতে তার শিকারী হয়ে; আমি তার খাবার জন্য পাখি শিকার করি, কিন্তু বেশীর ভাগ সময় মজা করার জন্যই

তিনি আমাকে রেখেছেন।''

''তোমার কাজটা সম্মানজনক নয় ইগর ভ্লাসিচ্. এটা অন্যের পক্ষে শিকার হলেও তোমার কাছে এটা একটা ব্যবসা...একটা সত্যিকারের চাকরি।''

স্বপ্নালু দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে ইগব বলল, ''তুমি বুঝতে পারছ না বোকা। আমি যে কি রকম মানুষ তা তুমি আগেও কোন দিন বোঝ নি। আরও একশ' বছরেও বুঝবে না। তোমাদের মতে, আমি একটা বিপথগামী ভবঘুরে লোক, কিন্তু এসব ব্যাপার যে বোঝে সে জানে আমি গোটা জেলার সেরা শিকারী। ভদ্রলোকরা এটা জানে ; এমন কি পত্রিকাতেও তারা আমার কথা লিখেছে। শিকারের ক্ষেত্রে আমার তুল্য লোক একটাও নেই।...আর আমি যে তোমাদের গেঁয়ো কাজকে ঘৃণা করি সেটা আমি বখে গিয়েছি বলে নয়, অহংকারের জন্যও নয়। ছোটবেলা থেকেই আমি বন্দুক ও কুকুর ভিন্ন আর কিছু জানি না। তারা যদি আমার বন্দুকটা কেড়ে নেয়, তাহলে আমি হাতে তুলে নেব একটা মাছ-ধরা ছিপ ; তারা যদি আমার ছিপটাও কেড়ে নেয়, তাহলে খালি হাতেই শিকার করব। একথা ঠিক যে আমি একজন ঘোড়ার দালাল, আমি মেলায় মেলায় ঘুরেছি কারণ সেখানে টাকা আছে ; কিন্তু তুমি তো জান যে একজন চাষী যদি ঘোড়ার দালাল বা শিকারী হয়ে ওঠে তাহলেই লাঙলের সঙ্গে তার সব সম্পর্ক চুকে যায়। একটা মানুষ একবার যদি মুক্তির স্বাদ পায়, তাহলে আর তাকে তা থেকে ফিরিয়ে আনা যায় না। ঠিক সেই রকম কোন ভদ্রলোক যদি অভিনেতা বা অন্য কোন রকম শিল্পী হয়ে ওঠে—তার আর সরকারী কর্মচারী বা জমিদার হবার সুযোগ হয় না। এটা তুমি বোঝ না নারী, কিন্তু বোঝা দরকার।''

''আমি বুঝি ইগর ভ্লাসিচ্।''

''তুমি যে কাঁদতে শুরু করলে তাতেই বোঝা যায় যে তুমি বোঝ না।''

মুখটা ঘুরিয়ে পেলাগেয়া বলল, ''আমি...আমি কাঁদি নি। এটা পাপ ইগর ভ্লাসিচ্। অন্তত একটা-দুটো দিন তো তুমি আমার কাছে থাকতে পারতে। বারো বছর হয়ে গেল তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে, আর...আর তুমি একটা দিনও আমাকে ভালবাসলে না। আমি...আমি কাঁদছি না...''

নিজের হাতটা আঁচড়াতে আঁচড়াতে ইগর ধীরে ধীরে বলতে লাগল, ''ভালবাসা...এখানে কোন ভালবাসা হতে পারে না। আমরা তো কেবল নামেই স্বামী-স্ত্রী, কিন্তু আসলে আমরা কি তাই? আমি তোমার কাছে একটা উচ্ছৃংখল পুরুষমাত্র, আর আমার কাছে তুমি তো একটা সরল চাষী স্ত্রীলোক, কিছুই তুমি বোঝ না। আমরা কি সমান-সমান জুটি? আমি মুক্ত, বখাটে, একটা ভবঘুরে, আর তুমি একটা মজুরনি, নোংরার মধ্যে বাস কর আর নখ থেকে হাড় পর্যন্ত খেটে মর। আমি জানি শিকারের বেলা আমি পয়লা নম্বর, কিন্তু তুমি আমাকে করুণার চোখে দেখ। কি করে আমরা জুটি

হব ?''

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পেলাগেয়া বলল, ''কিন্তু আমাদেব তো বিয়ে হয়েছে ইগর ভ্লাসিচ্।''

''আমাদের স্বাধীন ইচ্ছায় তো হয় নি। না কি তুমি সব ভুলে গেছ ? সেজন্য কাউন্ট সেগেই পাভ্লিচকে ধন্যবাদ দাও...আর তোমাকেও। শুধুমাত্র ঈর্ষাবশতঃ যেহেতু তার তুলনায় আমি ভাল শিকারী তাই কাউন্ট একটা পুরো মাস আমাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে রাখল, আর একটা মানুষ যখন মাতাল হয় তখন তুমি তাকে ধর্মান্তরিত করতেও পার, বিয়ে দেওয়াটা তো সহজ ব্যাপার। সে চলে গেল আর তোমাকে মাতাল অবস্থায় এনে ঈর্ষাবশতঃ তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিল। একজন শিকারীর বিয়ে এক গোয়ালিনীর সাথে। তুমি তো দেখেছিলে আমি মাতাল, তবু আমাকে বিয়ে করলে কেন ? আমরা তো চিরদাস নই, তুমি তো আপত্তি করতে পারতে ? অবশ্য একজন শিকারীকে বিয়ে করা তো এক গোয়ালার মেয়ের কাছে ভাগ্যের কথা, কিন্তু তোমার নিজেরও তো কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি থাকা দরকার। অতএব এখন দুঃখ কব আর কাঁদ। কাউন্ট মজা করেছে, আর তুমি কাঁদ।...দেয়ালে মাথা খোঁড়।''

নীরবতা নেমে এল। জলের উপর দিয়ে তিনটে বুনো হাঁস উড়ে গেল। ইগর সেই দিকে তাকিয়ে রইল। ক্রমে তিনটে অদৃশ্যপ্রায় বিন্দু হয়ে তারা বনের ওপারে ডুবে গেল।

বুনো হাঁস থেকে পেলাগেয়ার দিকে চোখ ফিরিয়ে সে জানতে চাইল ''তুমি কি খেয়ে বেঁচে আছ ?''

''এখন বাইরে ভাড়া খাটি, আর শীতকালে অনাথ আশ্রম থেকে একটা বাচ্চাকে এনে তার দেখাশোনা করি। মাসে দেড় রুব্‌ল্ পাই।''

''বটে ?''

আবার নীরবতা। ধান-কাটা মাঠের দিক থেকে একটা শান্ত গান ভেসে আসে। শুরু হতেই সেটা থেমে গেল। এই গরমে গান গাওয়া যায় না...

''লোকে বলছে আকুলিনার জন্য তুমি একটা নতুন ঘর বেঁধেছ।'' পেলাগেয়া বলল।

ইগর নীরব।

''নিশ্চয় সে তোমার মনের মত...''

শিকারী হাই তুলে বলল, ''সেটা তোমার মন্দ ভাগ্য, তোমার নিয়তি। ধৈর্য ধর বুড়ি মেয়ে। সে যাই হোক, আমি চলি, তোমার সঙ্গে অনেক বক্‌বক্ করেছি। সন্ধ্যার মধ্যে আমাকে বলোতভো পৌঁছতে হবে।''

ইগর উঠে দাঁড়াল; একটা হাই তুলল; বন্দুকটা কাঁধে নিল। পেলাগেয়াও উঠে দাঁড়াল।

''আবার কবে গ্রামে আসবে ?'' সে ধীর গলায় শুধাল।

''তা ঠিক নেই। আমি তো কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আসি না, আমি মাতাল হলে সেটা তোমার পক্ষে খুব সুখের ব্যাপার নয়। মাতাল হলে আমি

অভদ্র হয়ে যাই। বিদায়।''

''বিদায় ইগর ভ্লাসিচ্।''

টুপিটা মাথায় দিয়ে ইগর শিস্ দিতে দিতে পথে নামল। পেলাগেয়া স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার কাঁধের ওঠা-নামা, বলিষ্ঠ গর্দান, চলার সহজ দোদুল ভঙ্গী—সব কিছুর দিকে তাকিয়ে তার দু' চোখ দুঃখে ও স্নেহে ভরে উঠল। মনে হল ইগর বুঝি তার এই তাকিয়ে থাকাটা অনুভব করেই একটু থেমে ঘুরে দাঁড়াল। সে মুখে কিছুই বলল না, কিন্তু তার মুখ দেখে, ঈষৎ উন্নত কাঁধ দেখে পেলাগেয়া বুঝতে পারল, সে তাকে কিছু বলতে চায়। ভয়ে ভয়ে সে ইগরের কাছে গিয়ে সানুনয় চোখে তার দিকে তাকাল।

মুখটা না ফিরিয়েই ইগর বলল, ''এটা তোমার জন্য।''

এক রুবলের একটা পুরনো নোট তার হাতে দিয়ে ইগর দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।

হাত পেতে নোটটা নিয়ে পেলাগেয়া বলল, ''বিদায় ইগর ভ্লাসিচ্।''

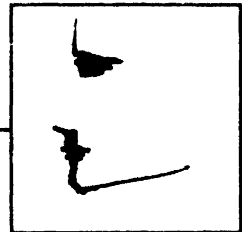
প্রসারিত কোমরবন্ধের মত দীর্ঘ সোজা পথটা ধরে ইগর এগিয়ে চলেছে। পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল বিষণ্ণ মেয়েটি সেখানে দাঁড়িয়ে ইগরের প্রতিটি পদক্ষেপ দেখতে লাগল। ক্রমেই তার ব্লাউজের লাল রং তার ব্রীচেসের গাঢ় রংয়ের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, তার পদক্ষেপগুলোকে আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না, তার বুট জোড়া থেকে কুকুরটাকেও আলাদা করা যাচ্ছে না। সে শুধু দেখতে পাচ্ছে তার ছোট টুপিটা ; কিন্তু হঠাৎ ইগর ডাইনে মোড় নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল আর টুপিটা সবুজের মধ্যে হারিয়ে গেল।

''বিদায় ইগর ভ্লাসিচ্।'' পেলাগেয়া অস্ফুট স্বরে বলল। তারপর পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে আরো একটিবার ছোট সাদা টুপিটা দেখতে চেষ্টা করল।

১৮৮৫

নরাধম

The Miscreant



ঘরে-বোনা সুতির শার্ট আর ছোপ-ধরা ব্রীচেস্ পরা একটি ছোটখাট অস্থিচর্মসার লোক সরকারী গোয়েন্দার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মুখময় বড় বড় দাড়ি ও বসন্তের দাগ, ঘন ঝুলে-পড়া ভুরুর নীচে চোখ দুটো প্রায় দেখাই যায় না, সব মিলিয়ে একটা গভীর বিষণ্ণতার প্রকাশ। মাথাভর্তি এলোমেলো জট-বাঁধা চুল যেন তার মুখের মাকড়সাসুলভ ভয়াবহতাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। তার দুটো পা-ই খালি।

গোয়েন্দা কথা শুরু করল, ''ডেনিস গ্রিগরিয়েভ, আরো কাছে এসে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। এই জুলাই মাসের সাত তারিখ সকালে রেলের পাহারাদার সেমিয়োনভ আকিন্‌ফভ রেলপথের একশ' একচল্লিশতম ভার্স্টের কাছে তোমাকে যখন দেখতে পায় তখন তুমি যে নাটগুলি দিয়ে রেলকে স্লিপারের সঙ্গে আটকানো হয় সেগুলো খুলে ফেলেছিলে। এই সেই নাট। এটা সমেত সে তোমাকে আটক করেছিল। এটাই কি ঘটনা ?''

''কোন্‌টা ?''

''আকিনফভ যেটা বলছে ?''

''অবশ্যই তাই।''

''ভাল। কেন তুমি নাট খুলছিলে ?''

''কি ?''

''ও-সব কি-ফি রাখ; আমার প্রশ্নের জবাব দাও, কেন তুমি নাট খুলছিলে ?''

''সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে সাঁই-সাঁই শব্দ করে ডেনিস বলল, ''আমার যদি দরকার না থাকত তাহলে ওটা খুলতাম না।''

''ওই নাটটার দরকার তোমার হল কেন ?''

''নাট ? নাট দিয়ে আমরা মাছ-ধরা জালের ভার বানাই...''

''আমরাটা কারা ?''

''আমরা সকলেই....মানে ক্লিমভের চাষীরা।''

''দেখ বন্ধু, বোকা সাজার চেষ্টা করো না; বুদ্ধিমানের মত কথা বল। মাছধরা জালের ভারের মিথ্যে কথাটা বানিয়ে বলে কোন লাভ হবে না।''

ডেনিস চোখ মিটমিট করে বলল, ''জন্মাবধি কখনও মিথ্যে বলি নি আর আজ আমি মিথ্যাবাদী হলাম। হুজুর, আপনি কি মনে করেন ভার ছাড়া আমাদের কাজকর্ম চলে ? আপনার বড়শিতে যদি একটা কুঁচো মাছ বা পোকা গেঁথে দেন তাহলে কি ভার ছাড়াই সেটা জলের তলায় যাবে ? আর আমি হলাম মিথ্যাবাদী।'' ডেনিস দাঁত বের করে হাসল। ''টোপটা যদি জলের উপরেই ভেসে থাকল তাহলে শালা টোপটার দরকারই বা কি ? ধরুন, আপনার পার্চ, পাইক, বাইন একসব মাছ তো টোপ গিলতে জলের তলায়ই যায়, আর টোপটা যদি ভেসে থাকে জলের উপরে তাহলে তো একমাত্র ছোট ছোট আস্‌প মাছই সেটা গিলবে, আর সেটাও কদাচিৎ ঘটবে। সে সব আস্‌প্ আমাদের নদীতে বাস করে না। সে মাছের অনেক বড় জায়গার দরকার হয়।''

''কিন্তু আস্‌প্-এর কথা তুমি আমাকে শোনাচ্ছ কেন ?''

''কি বললেন ? কিন্তু আপনিই তো জিজ্ঞেস করলেন। ভদ্রলোকরা সে ভাবেও মাছ ধরে থাকে। আরে, একটা বাচ্চা ছেলেও ভার ছাড়া মাছ ধরতে যাবে না। অবশ্য যে জানে না সে ভার ছাড়াই মাছ ধরতে যাবে। বোকা হওয়ার বিরুদ্ধে তো কোন আইন নেই ..''

''তাহলে তুমি বলছ যে ভার বানাবার জন্যই তুমি নাট খুলেছ?''

''তাছাড়া আর কিসের জন্য? ওটা দিয়ে আমি তো হাড়-মুড়মুড় খেলা খেলতে যাচ্ছি না।''

''কিন্তু ভার হিসাবে তুমি তো শিসে, বুলেট, পেরেক বা অন্য কিছুও ব্যবহার করতে পারতে...''

''শিসে তো আর রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া যায় না, সেটা কিনতে হয়, আর পেরেকও কাজে লাগে না। নাটের চাইতে ভাল কিছু আপনি পাবেন না।...সেটা ভারী, ভিতরে একটা গর্ত আছে।''

''কত বোকা সাজতেই তুমি পার! যেন কালই তুমি জন্মেছ, নয় তো আকাশ থেকে পড়েছ। তুমি বুঝতে পার না বোকারাম, তোমার এই নাট খোলার ফল কি হতে পারত? পাহারাদারটি যদি সতর্ক না থাকত, তাহলে তো ট্রেনটা বে-লাইন হয়ে যেত, আর সব লোক মারা পড়ত। তুমিই লোকগুলোকে মেরে ফেলতে।''

''ঈশ্বর যেন তেমনটি না করেন হুজুর। লোকজনকে মারতে যাব কেন? আমরা কি নাস্তিক, না গুণ্ডা? ঈশ্বরের আশীর্বাদে সারা জীবনে একটা লোককেও মারি নি, বা সে চিন্তাও কখনও মাথায় আসে নি। পবিত্র জননী আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে দয়া করুন...সত্যি কথাই বলছি স্যার।''

''রেলগাড়িগুলো কেন ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তা কি জান? দু'তিনটে বল্টু খুলে ফেল, তাহলেই একটা রেল-দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলবে।''

ডেনিস দাঁত বের করে অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে গোয়েন্দার দিকে তাকাল।

''দেখুন! এত বছর ধরে গ্রামের লোকরা নাট খুলে আসছে, আর প্রভুও সকলকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, আর আমাদের বেলায়ই দুর্ঘটনা ঘটবে...আর লোকজন মরবে। আমি যদি একটা রেল তুলে নিয়ে যেতাম, অথবা ধরুন যদি লাইনের নীচে একটা কাঠ পেতে রাখতাম, তাহলে হয়তো একটা ট্রেন উল্টে পড়ত, কিন্তু এটা...এই নাটটা খুললেই!...

''কিন্তু দয়া করে বুঝতে চেষ্টা কর। ওই বল্টু দিয়েই স্লিপারের উপর রেলটাকে আটকে দেওয়া হয়।''

''সেটা আমরা জানি কিন্তু ভেবে দেখুন, আমরা তো সবগুলো বল্টু খুলে ফেলছি না...কিছু রেখেই দেই। আমরা মাথা খাটিয়ে কাজ করি। সব বুঝি।''

ডেনিস হাই তুলে মুখের সামনে একটা ক্রুশ-চিহ্ন আঁকে।

''গত বছর ঠিক এখানেই একটা ট্রেন রেল থেকে ছিটকে পড়েছিল,'' গোয়েন্দা বলল, ''কেন যে সেটা ঘটেছিল তা এখন বুঝতে পারছি।''

''কি ঘটেছিল বলুন তো?''

''বললাম তো, কেন যে গত বছর একটা ট্রেন বে-লাইনে গিয়েছিল সেটা এখন বুঝতে পারছি।''

''সেইজন্যই তো আপনারা লেখাপড়া শিখেছেন; আপনারা যে আমাদের

উপকার করতেই আছেন; আপনাদেব তো সব কিছু জানতেই হবে। কি ঘটেছে, কেমন করে ঘটেছে, সে আপনি বুঝিয়ে বললেন, কিন্তু ওই পাহারাদার, সে তো একটা চাষী, তাব তো কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। আর সে কিনা আমার কলার চেপে ধবে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে এল! কিন্তু আগে বুঝিয়ে বলবে তারপর তো কলার ধরে টানবে। লোকে বলে, মানুষ যদি চাষা হয় তো তার মনটাও চাষাড়ে হয়ে যায়।...এ কথাটাও লিখে নিন হুজুর, সে আমার মুখে ও বুকে দু'বার ঘুষি মেরেছে।''

''তোমাব বাড়িতে তল্লাসি চালিযে আরও একটা নাট তারা পেয়েছে। সেটা কোন্ জায়গা থেকে খুলেছিলে আর কবে খুলেছিলে ?''

''যেটা লাল সিন্দুকের নীচে পড়েছিল সেটার কথা বলছেন কি ?''

''কোথায় পড়েছিল তা আমি জানি না, কিন্তু তারা পেয়েছে। সেটা কবে খুলে এনেছিলে ?''

''আমি তো খুলে আনি নি, খোঁড়া সেমিয়নের ছেলে ইগ্‌নাশ্‌কা আমাকে সেটা দিয়েছিল। যেটা ছোট সিন্দুকের তলায় ছিল আমি সেটার কথাই বলছি, কিন্তু যেটা উঠোনের স্লেজগাড়ির মধ্যে পাওয়া গেছে সেটা আমি আব মিত্রোফান দু'জনে মিলে খুলেছিলাম।''

''কোন্ মিত্রোফান ?''

''মিত্রোফান পেত্রভ...তার কথা আপনি শোনেন নি ? সে জাল বানিয়ে ভদ্রলোকদের কাছে বিক্রি করে। তার অনেক নাটের দরকার হয়। জালপ্রতি প্রায় দশটা করে।''

''মন দিয়ে শোন।...দণ্ডবিধির এক হাজার একাশী ধাবায় বলেছে, রেলপথের যে কোন ইচ্ছাকৃত ক্ষতি সাধন করলে, যদি সেই ক্ষতি উক্ত রেলপথের পরিবহনের বিপদ ঘটাতে পারে এবং আসামী যদি আগেই অবহিত থাকে যে তার আচরণের ফলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে—বুঝলে তো ? তুমি আগেই জানতে! এ ভাবে নাট খোলার ফল কি হতে পারে সেটা তোমার না জানার কথা নয়—তাহলে সেই লোককে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।''

''অবশ্য সেটা আপনিই ভাল বোঝেন। আমরা মুখ্খু মানুষ...আপনি কি মনে করেন আমরা এত সব বুঝি ?''

''তোমরা সব বোঝ। তুমি মিথ্যে বলছ, না জানার ভান করছ।''

''মিথ্যে কেন ? আমাকে যদি বিশ্বাস না করেন...গ্রামে গিযে সকলকে জিজ্ঞাসা করুন।...ভার ছাড়া আপনি ধরতে পারেন একমাত্র 'ব্রিক মাছ', বড় জোর একটা 'গাজিয়ন', তাও ভার না হলে তারাও ভিড়বে না।''

গোয়েন্দা হেসে বলল, ''আস্‌প্ মাছের কথা আরও কিছু বল না।''

''আসপ্ এখানে ডিম পাড়ে না।...ভার ছাড়াই একটা প্রজাতিব টোপ গেঁথে বড়শিটা ফেলবেন; একটা 'চাব' মাছ হযতো ঠোকরাতে পারে, কিন্তু সেও কদাচিৎ।''

''ঠিক আছে। এবাব চুপ কর।''

নীরবতা নেমে আসে। ডেনিস এক পা থেকে অপর পায়ে ভর করে দাঁড়াল; মোটা পশমী কাপড়ে ঢাকা টেবিলটার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে চোখ মিটমিট করতে লাগল, যেন ঠিক তার সামনে সূর্য দেখছে, পশমী কাপড়টা নয়। গোয়েন্দা দ্রুত লিখে চলেছে।

একটু চুপ করে থেকে ডেনিস শুধাল, "আমি যেতে পারি কি?"

"না। একজন বক্সী দিয়ে তোমাকে কারাগারে পাঠাব।"

ডেনিস চোখ মিটমিট করা থামাল; ঘন ভুরু তুলে অফিসারের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

"কারাগার মানে? হুজুর! আমার সময় কম, আমাকে মেলায় যেতে হবে। ইগরের কাছ থেকে তিন রুবল্ নিতে হবে শুয়োরের নোনা মাংস কেনার জন্য।"

"চুপ কর; কাজের মধ্যে কথা বলো না।"

"কারাগারে...কোন জিনিসের জন্য হলে না হয় যেতাম, কিন্তু এ ভাবে...কিসের জন্য? চুরিও করি নি, কারো সঙ্গে ঝগড়াবিবাদও করি নি...আর ট্যাক্সের লেনদেনের ব্যাপারে যদি আপনার সন্দেহ থাকে হুজুর, তাহলে বড় কেরাণিকে বিশ্বাস করবেন না...সোজা স্থায়ী সদস্যকে জিজ্ঞাসা করবেন।...কিন্তু বড় কেরাণিটা একটা খৃস্টানই নয়..."

"চুপ কর।"

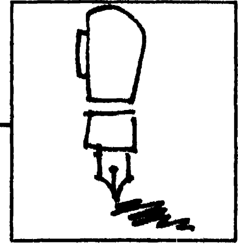
"ঠিক আছে, চুপ করলাম..." ডেনিস বলল, "কিন্তু আমি দিব্যি করে বলব যে হিসাবের ব্যাপারে বড় কেরাণি মিথ্যা কথা বলেছে। আমরা তিন ভাই: কুজমা গ্রিগরিয়েভ, ইগর গ্রিগরিয়েভ আর আমি ডেনিস গ্রিগরিয়েভ..."

"তুমি আমার কাজের ব্যাঘাত করছ।...হেই সেমিয়ন!" গোয়েন্দা চীৎকার করে ডাকল। "ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও।"

দুটি বলিষ্ঠ সৈনিক এসে ডেনিসকে পাকড়াও করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ডেনিস যেতে যেতেই বলতে লাগল, "আমরা তিন ভাই। ভাই তো ভাইয়ের জিম্মাদার নয়, কুজমা ট্যাক্স দেয় না তার জন্য ডেনিসকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে!...বিচারকগণ! প্রয়াত জেনারেল মারা গেছেন, তার আত্মার শান্তি হোক, নইলে আপনাদের মত বিচারকদের তিনি দেখিয়ে দিতেন কিসের জন্য...আপনাদের ন্যায় বিচার করতে হবে, এতবড় অন্যায় করবেন না। চাবুক অবশ্য মারবেন, কিন্তু আগে তারা চাবুক খাবার মত কাজ করুক..."

১৮৮৫

পাণিপ্রার্থী ও পিতাঠাকুর



The Suitor and Papa

একটি সাম্প্রতিক ঘটনা

''শুনছি, তুমি নাকি বিয়ে করছ!'' গ্রীষ্মকালীন এক বল-নাচের আসরে জনৈক বন্ধু পিয়োতর পেত্রভিচ মিল্কিনকে কথাটা বলল। ''তোমাদের এই নারী মহল কবে ছাড়ছ ?''

মিল্কিন লজ্জিত হয়ে বলল, ''কোথায় শুনলে যে আমি বিয়ে করছি ? কোন্ মূর্খ তোমাকে ও-কথা বলেছে ?''

'প্রত্যেকেই বলছে ; আর সব কিছুতেই সেটা চোখেও পড়ছে। ভাই হে, ঢাকাঢাকি করে কোন লাভ নেই।...তুমি ভাবছ আমরা কিছু জানি না, কিন্তু তোমার দিকে তাকালেই আমরা সব দেখতে পাই। হি, হি, হি! সব কিছুতেই তো সেটা ফুটে উঠছে। কোন্দ্রাশকিনাদের বাড়িতেই তো তুমি সারাটা দিন কাটাও, সেখানেই ডিনার খাও, গান কর। নাস্তিয়া কেন্দ্রাশকিনা ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে তুমি বেড়াতে যাও না, আর একমাত্র তাকেই ফুলের তোড়া এনে দাও। আমরা সব দেখতে পাই। সেদিন নাস্তিয়ার বাবার সঙ্গে দেখা হল ; তিনি বললেন, কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে, তুমি গ্রাম থেকে শহরে ফিরলেই বিয়েটা হবে।...কি বল ? ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন। তোমার চাইতে কেন্দ্রাশকিনের জন্যই আমি খুশি হয়েছি। বেচারির সাতটি মেয়ে। সাতটি! এটা ঠাট্টার ব্যাপার নয়। অন্তত একজনের তো হিল্লে হল।...''

''গুলি মার।'' মিল্কিন ভাবল, 'এই দশ নম্বর লোকের মুখে শুনলাম আমি নাস্তিয়াকে বিয়ে করছি। যত সব! এটা তারা বুঝল কেমন করে ? কারণ আমি কোন্দ্রাশকিনের বাড়িতে খাই, আর তার মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে যাই।...না, এ সব গুজব বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে ; অন্যথায় আমার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবার আগে তারা আমাকে বড়শিতে গেঁথে ফেলবে। কালই তাদের বাড়িতে যাব, আর মাথামোটা কোন্দ্রাশকিনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে আসব, যাতে সে বৃথা আশায় না থাকে। আচ্ছা, চলি হে।''

এই কথাবার্তার পরদিনই বিরক্ত ও কিছুটা ভীত মিল্কিন কোর্ট কাউন্সিলর কোন্দ্রাশকিনের পড়ার ঘরে ঢুকল।

তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে গৃহকর্তা বলল, ''পিয়োতর পেত্রভিচ! কেমন আছ ? তার দেখা পাচ্ছ না ? হি, হি, হি। চোখের নিমেষেই নাস্তিয়া এখানে

হাজির হবে। এক মুহূর্তের জন্য সে গুসেভদের বাড়িতে গেছে।''

বিব্রত হয়ে চোখ কচলাতে কচলাতে মিল্কিন ভেঙে ভেঙে বলতে লাগল, ''আসলে আনাস্তাসিয়া কিরিলভ্‌নার জন্য আমি আসি নি। আপনার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি। একটা বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমার চোখে কি যেন পড়ল।''

কোন্দ্রাশ্‌কিন চোখ টিপে বলে উঠল, ''কি প্রসঙ্গ নিয়ে তুমি আলোচনা করতে চাও? হি, হি, হি! তুমি এত ব্যস্ত হয়েছ কেন বাবা? আমি জানি তুমি কি বলতে এসেছ। হি,হি, হি! শুভ দিনটার ব্যাপারে...''

''এক কথায় বলতে গেলে আসল কথাটা হল আমি...আমি এসেছি আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে... কালই আমি চলে যাচ্ছি...''

''কি বলছ তুমি? চলে যাচ্ছ?'' কোন্দ্রাশ্‌কিন প্রশ্ন করল। তার চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

''এক কথায়, চলে যাচ্ছি, বাস। অনুমতি করেন তো আপনার সাদর আতিথেয়তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।...আপনাব মেয়েরা বড় ভাল। সেই মুহূর্তগুলি আমি কখনও ভুলব না যখন. .''

কোন্দ্রাশ্‌কিনের মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল, ''তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।... অবশ্য চলে যাবার অধিকার প্রতিটি মানুষেরই আছে। তোমার যা খুশি তাই করতে পার, কিন্তু তুমি...তুমি আসল ব্যাপারটা এড়িয়ে যাচ্ছ...এটা অসাধু কাজ!''

''আমি...আমি...আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কি ভাবে আমি আসল ব্যাপারটা এড়িয়ে যাচ্ছি?''

সারা গ্রীষ্মকালটা তুমি এখানে এসেছ, খানাপিনা করেছ, সকালে, দুপুরে, রাত্রে গল্প-গুজব করেছ, আর তারপরে হঠাৎ এই ''আমি চলে যাচ্ছি!''

''আমি...আমি কোন আশা জাগাই নি...''

''অবশ্যই বিয়ের প্রস্তাব তুমি কর নি, কিন্তু তোমার আচার-আচরণ কিসের ইঙ্গিত বহন করছিল সেটা যে স্পষ্ট ছিল তা কি তুমি মনে কর না? তুমি প্রতিদিন আমাদের সঙ্গে ডিনার খেয়েছ, সাবা সন্ধ্যা নাস্তিয়ার হাত ধরে বেড়িয়েছ...আর এ সবের ভিতর দিয়ে তুমি কিছুই বোঝাতে চাও নি? একমাত্র পাণি-প্রার্থীরাই প্রতিদিন ডিনারে আসে, আর তুমি যদি তেমনই একজন না হতে তাহলে কি আমি তোমাকে আপ্যায়ন করতাম? সত্যি মহাশয়, এটা অসাধু ব্যবহার! আমি আর কিছুই শুনতে চাই না। দয়া করে বিয়ের প্রস্তাব কর, নইলে... মানে...''

''আনাস্তাসিয়া কিরিলভ্‌না খুব ভাল মেয়ে... চমৎকার তরুণী মহিলা... আমি তাকে শ্রদ্ধা করি আর... তার চাইতে ভাল স্ত্রী আমি চাইও না, কিন্তু ...আমাদের দু'জনের প্রত্যয় ও মতবাদ এক নয়।''

''সেটাই কি কারণ?'' কোন্দ্রাশ্‌কিন হাসল। ''সেটাই কি সব? কিন্তু

প্রিয়তর, তুমি কি মনে কর এমন স্ত্রী তুমি খুঁজে পাবে যার মতামত তার স্বামীরই অনুরূপ? হায় যৌবন, যৌবন! কী সেই সবুজ, সুস্বাদু দিনগুলি! ঈশ্বর জানেন, মতবাদ একটা গড়ে ওঠে... হি, হি, হি! যে কোন মানুষকে ভূপাতিত করতেও পারে। ..আজ তোমার একই মতামতের ব্যাপারে পরস্পরের অংশীদারও নও, কিন্তু কিছুদিন একসঙ্গে বাস কর, তখন দেখবে ঘষা লেগে লেগে সব অমসৃণ কোণগুলি সমান হয়ে গেছে। কোন নতুন-তৈরী রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালানো যায় না, কিন্তু কিছুদিন ব্যবহার করলেই পথটা মসৃণতর হয়ে ওঠে।''

''তা ঠিক, কিন্তু...আমি আনাস্তাসিয়া কিরিলভনার অযোগ্য...''

''ওঃ না, তা তুমি নও! বাজে কথা! তুমি একটি আশ্চর্য ছোট ছেলে।''

''আমার সব ত্রুটির কথা আপনি জানেন না।...আমি দরিদ্র..''

''তাতে কি হল? ঈশ্বরের কৃপায় তুমি একটা মাইনে পাও।''

''আমি..আমি একটি মাতাল!''

''মোটেই না! কোন দিন তোমাকে আমি মাতাল হতে দেখি নি! যুবকরা মদ না খেয়ে পারে না। আমি নিজেও যুবক ছিলাম, কখনও কখনও আমিও সীমা ছাড়িয়েছি। সেটা না ঘটাই আশ্চর্য।''

''কিন্তু আমি মদের আড্ডায় যাই। আমার একটা বংশানুক্রমিক দোষ আছে।''

''এ কথা আমি বিশ্বাস করি না! এত ভাল একটি ছেলে, আর সে কিনা মদের আড্ডায় যায়! এ আমার বিশ্বাস হয় না।''

মিল্কিন ভাবল, ''এ শয়তানকে বোকা বানানো যাবে না! সে কি মেয়েদের হাতছাড়া করতে চায় না?''

তবু সে জোর গলায় বলতে লাগল, ''আমি যে মদের আড্ডায় যাই তাই শুধু নয়, আমার আরও দোষ আছে। আমি ঘুষ খাই।..''

''ওহে বাপু, কে ঘুষ খায় না? হি, হি, হি! তুমি কি ভেবেছিলে এ-কথা শুনে আমি আঁতকে উঠব!''

''আরও আছে। আমার ভাগ্যের ফল না জানা পর্যন্ত বিয়ে করবার অধিকার আমার নেই! সে কথাটাই আমি আপনার কাছ থেকে গোপন রেখেছি, কিন্তু এখন আপনাকে সব কিছু জানাতেই হবে।... বিশ্বাসভঙ্গ করে অপরের টাকা মেরে দেওয়ার অপরাধে আমার বিচার চলছে..''

কোন্দ্রাশকিন হতবাক হয়ে গেল, ''বিচার চলছে? এটা আমার কাছে নতুন খবর। আগে জানতাম না। নিজের ভবিষ্যৎ না জেনে তুমি বিয়ে করতে পার না। তুমি কি অনেক টাকা মেরেছ?''

''একশ চুয়াল্লিশ হাজার।''

''হুম, ঠিক, মোটা টাকা। ঠিক, সাইবেরিয়ার গন্ধ নাকে আসছে। তার অর্থ মেয়েটা বরবাদ হয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে কিছুই করবার নেই। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।''

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মিল্কিন টুপিটা নিতে হাত বাড়াল।

মুহূর্তকাল কি যেন ভেবে কোন্দ্রাশ্‌কিন বলল, "ভাল কথা। নাস্তিয়া যদি তোমাকে ভালবাসে তাহলে তোমার সঙ্গে তারও সেখানে যাওয়া উচিত। যে ভালবাসা ত্যাগকে ভয় করে সেটা কিসের ভালবাসা? তাছাড়া, তম্স্ক অঞ্চলটা খুবই উর্বরা। ওহে বন্ধু, সাইবেরিয়ার জীবন এখানকার তুলনায় অনেক ভাল। পরিবারের বোঝা না থাকলে আমি নিজেই সেখানে চলে যেতাম। তুমি তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে পার!"

মিল্কিন ভাবল, "কী জেদী জানোয়ার! মেয়ের বোঝা ঘাড় থেকে নামাতে সে তাকে স্বয়ং শয়তানের সঙ্গে বিয়ে দিতেও ইচ্ছুক।"

সে জোর গলায় বলে উঠল, "কিন্তু সেটাও শেষ কথা নয়। আমার বিচার চলছে কেবল টাকা মেরে দেওয়ার অপরাধেই নয়, সেই সঙ্গে জালিয়াতির অভিযোগও আছে।"

"ওতে কোন ফারাক হচ্ছে না। শাস্তিটা একই!"

"ফুঃ!"

"এত জোরে নাক ঝাড়লে কেন?"

"শুনুন, এখনও আমার সব কথা আপনাকে বলি নি। আমার জীবনের সেই গোপন কথা প্রকাশ করতে আমাকে বাধ্য করবেন না...বড় ভয়ংকর সেই গোপন কথা!"

"তোমার গোপন কথা জানবার ইচ্ছা আমার নেই! ও সব বাজে কথা!"

"না, বাজে কথা নয় কিরিল ত্রেফিমিচ! যদি আপনি শোনেন....যদি জানতে পারেন আমি কে, তাহলে আপনি স্তম্ভিত হবেন! আমি...আমি একজন জেল-পলাতক আসামী!"

ছোবল খাওয়ার মত কোন্দ্রাশ্‌কিন মিল্কিনের কাছ থেকে সরে গেল। যেন পাথর হয়ে গেল। এক মুহূর্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল—নির্বাক নিশ্চল। সত্রাশ চোখে তাকিয়ে রইল মিল্কিনের দিকে। তারপর একটা হাতল-চেয়ারে ধপাস করে বসে আর্তনাদ করে উঠল।

"এতটা আমি আশাই করি নি.. কী কালসাপই না বুকের মধ্যে পুষে রেখেছিলাম! চলে যাও এখান থেকে! ঈশ্বরের দোহাই, চলে যাও! তোমার মুখ দেখতেও চাই না। ওঃ!"

অভিষ্ট সিদ্ধ হওয়ার আনন্দে মিল্কিন টুপিটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।..

তাকে থামিয়ে কোন্দ্রাশ্‌কিন বলল, "দাঁড়াও! তুমি এতদিন গ্রেপ্তার হও নি কেন?"

"আমি বাস করছি ছদ্ম পরিচয়ে... আমাকে গ্রেপ্তার করা সহজ কাজ নয়।..."

"হয়তো মৃত্যু পর্যন্ত তুমি সেইভাবেই থাকবে, আর কেউ কোন দিন জানতে পারবে না তুমি কে। দাঁড়াও! যাই হোক না কেন এখন তুমি

একজন সৎ লোক—অনেক আগে থেকেই তুমি অনুতপ্ত। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন! বিয়েটা করে ফেল।''

মিল্কিনের শরীর ঘামে ভিজে গেল। ঠকানোর ব্যাপারটা জেল-পলাতক আসামীর্‌ চাইতে নীচে নামালেও কোন কাজ হবে না। এখন একটি মাত্র পথই খোলা আছে ঃ কোন রকম কারণ না দেখিয়ে নির্লজ্জের মত পালিয়ে যাওয়া। দরজা ঠেলে ছুটে বেরিয়ে যাবে এমন সময় একটা কথা তার মনে ঝিলিক দিয়ে উঠল।

সে বলল, ''শুনুন! আপনি এখনও সব কথা শোনেন নি। আমি...আমি একটি পাগল, আর উন্মাদ এবং ক্ষেপা মানুষের বিবাহ নিষিদ্ধ।''

''এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না! পাগল কখনও ও রকম যুক্তিসহকারে কথা বলতে পারে না।''

''এ-কথা যদি বলেন তো বুঝতে হবে আপনি কিছুই জানেন না। আপনি কি জানেন না যে অনেক মানুষ কেবলমাত্র কতকগুলি ব্যাপারে মাথাপাগলা হয়ে যায়, কিন্তু অন্য সব ব্যাপারে সাধারণ মানুষ থেকে তাদের কোন পার্থক্য থাকে না?''

''এ আমি বিশ্বাস করি না!''

''সে-ক্ষেত্রে আমি ডাক্তারের কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট এনে দেব।''

''আমি সার্টিফিকেটটা বিশ্বাস করব, কিন্তু তোমাকে নয়।...আচ্ছা পাগল তো!''

''আধঘন্টার মধ্যেই সেটা আপনাকে এনে দেব। চলি!''

টুপিটা মাথায় দিয়ে মিল্কিন দ্রুত বেরিয়ে গেল। পাঁচ মিনিট পরেই সে হাজির হল তার বন্ধু ডাক্তার ফিতুয়েভের বাড়ি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে যখন বন্ধুর দেখা পেল তখন সে স্ত্রীর সঙ্গে ছোটখাট একটা ঝগড়ার পরে সবেমাত্র মাথার চুলগুলো টেনে টেনে সোজা করছিল।

''প্রিয় বন্ধু, তোমার কাছে একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে এসেছি।'' সে ডাক্তারকে বলল। ''ব্যাপারটা হল,... যে কোন উপায়ে তারা আমাকে কজ্বা করতে চাইছে। সে বিপদটা এড়াতে আমি পাগল সাজব স্থির করেছি।...অনেকটা হ্যামলেটের কৌশল আর কি...তুমি তো জান, পাগল হয়ে গেলে কেউ বিয়ে করতে পারে না। তুমি একটা বন্ধুর কাজ কর; একটা সার্টিফিকেট লিখে দাও যে আমি পাগল।''

''তুমি বিয়ে করতে চাও না?'' ডাক্তার শুধাল।

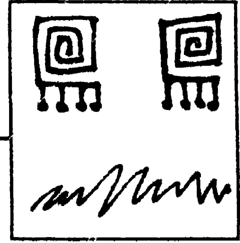
''চীনে যত চা আছে তার বিনিময়েও না।''

চুল টানতে টানতেই ডাক্তার বলল, ''তাহলে তো আমিও তোমাকে সার্টিফিকেট দেব না। যে লোক বিয়ে করতে চায় না সে তো পাগল হতে পারে না; বরং সে অতিশয় জ্ঞানী মানুষ! কিন্তু যখন তুমি বিয়ে করতে চাইবে, বুঝলে তো, একমাত্র তখনই আমার কাছে এসো সার্টিফিকেট নিতে। তখনই বোঝা যাবে যে তুমি একটি বদ্ধ আকাট পাগল...

১৮৮৫

ওয়ারেণ্ট অফিসার প্রিশিবেয়েভ

Warrant Officer Prishibeyeb



''ওয়ারেন্ট অফিসার প্রিশিবেয়েভ! আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, এই সেপ্টেম্বর মাসের তেসরা তারিখে আপনি বাক্যে ও কর্মে কনেস্টবল ঝিগিন, জেলা এল্ডার আলিয়াপভ, সংস্কি এফিমভ, সাক্ষী আইভানভ এবং গারিলভ ও আরও ছ'জন চাষীর প্রতি আপত্তিকর ব্যবহার করেছেন; তাব উপর প্রথমোক্ত যে তিন ব্যক্তি স্বীয় কর্তব্য পালনে ব্রতী ছিলেন তাদের অপমানও করেছেন। আপনি অভিযোগ স্বীকাব করছেন, কি করছেন না?''

ভ্রূকুটিকুটিল কুঞ্চিতমুখ প্রিশিবিয়েভ লাফ দিয়ে উঠে দুই পা এক করে দাঁড়িয়ে কর্কশ ভাঙা-ভাঙা গলায় হুকুমেব ভঙ্গীতে প্রতিটি শব্দেব উপর জোর দিয়ে জবাব দিল: ''মাননীয় জেলা জজ মহাশয়! আইনের সব ধারামতেই প্রত্যেক অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া দবকাব। দোষী অপর সকলে, আমি নই। সব কিছু ঘটেছে একটি মৃতদেহেব কারণে, তার আত্মা শান্তিতে থাকুক। গত পবশু আমার স্ত্রী আনফিসাকে সঙ্গে নিয়ে আমি শান্তিতে সসম্মানে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। তাকিয়ে দেখলাম, নানা ধবনের মানুষেব একটা ভিড় জমেছে নদীব তীবে। 'কার হুকুমে ওখানে লোকে ভিড় করেছে?' আমি প্রশ্ন করলাম। 'কেন? আইনে কি এমন কথা আছে যে মানুষ একপাল ঘোড়ার মত ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারে?' কাজেই আমি চীৎকাব করে বললাম, 'ভিড় ভেঙে দাও।' সব লোককে ধাক্কা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে লাগলাম আব সংস্কিকে ভিড়টা ভেঙে দেবার হুকুম দিলাম। ..''

''যদি অনুমতি দেন তো বলি, আপনি তো কনেস্টবল নন, এল্ডাবও নন—ভিড় ভেঙে দেওয়া কি আপনার কাজ?''

আদালতের বিভিন্ন দিক থেকে আওয়াজ উঠল, ''না, তা নয়, তা নয়! ওর গলায় একটা ব্যথা আছে হুজুব! পনেরো বছব ধবে ওর সঙ্গে কাজ কবছি। উনি সেনাবাহিনী ছেড়ে আসার পব থেকেই আমাদের জীবনটা নবক হয়ে উঠেছে। ওঁর যন্ত্রণায় আমবা সকলেই মবতে বসেছি।''

অন্যতম সাক্ষী এল্ডাব বলল, ''ঠিক তাই হুজুর। আমবা গ্রামেব সব মানুষই অভিযোগ জানাচ্ছি! ওর সঙ্গে চলা অসম্ভব। বিগ্রহ নিয়ে শোভাযাত্রাই হোক, আর বিয়ে বা অন্য কোন অনুষ্ঠানই হোক, সর্বত্রই উনি এসে চীৎকার জুড়ে দেন, হুজ্জুত বাঁধান, হুকুম চালান। বাচ্চাদের কানে ঘুষি মারেন, কোন কিছু ঘটলেই কঠোর শশুর মশাইয়েব মত মেয়েদের প্রতি অভদ্র আচরণ কবেন ..বেশী দিনের কথা নয়, তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুকুম

জারী করে এসেছেন, কেউ দান করতে পারবে না, বাতি জ্বালাতে পারবে না। তিনি বলেন, 'এমন কোন আইন নেই যাতে মানুষকে গান করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।'''

জজসাহেব বললেন, ''অপেক্ষা করুন। আপনাকে সাক্ষ্য দেবার মত সময় দেওয়া হবে। এখন প্রিশিবেয়েভকে তার কথা বলতে দিন। বলুন প্রিশিবেয়েভ।''

প্রিশিবেয়েভ সাঁই সাঁই শব্দে বলতে শুরু করল, ''ঠিক আছে স্যার! হুজুর এইমাত্র বললেন যে জনসাধারণকে হটিয়ে দেওয়াটা আমার কাজ নয়। খুব ভাল কথা স্যার.. কিন্তু যদি বিশৃংখলা ঘটে? জনসাধারণকে অশোভন আচরণ করতে দেওয়া হবে কি? আইনের কোথায় লেখা আছে যে মানুষকে অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে? আমি তা হতে দিতে পারি না। আমি যদি তাদের হটিয়ে না দিই, তিরস্কার না করি, তাহলে কে করবে? আইনকানুন কেউ ঠিকমত বোঝে না, আমি বলতে পারি হুজুর, সমস্ত গ্রামের মধ্যে আমিই একমাত্র লোক যে নীচু তলার লোকদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় সেটা জানি, এবং হুজুর, সব কিছু বোঝার ক্ষমতা আমি রাখি। আমি একটি চাষী নই, আমি একজন ওয়ারেন্ট অফিসার, অবসরপ্রাপ্ত কোয়ার্টার-মাস্টার, আমি ওয়ারসতে কাজ করেছি, হেড কোয়ার্টারে কাজ করেছি, এবং পরবর্তীকালে—কথাগুলি আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই—আমি দমকলের সঙ্গে ছিলাম, আর তারপরে একটা অসুখে অক্ষম হয়ে পড়ায় দমকল ছেড়ে একটা ছেলেদের উচ্চ বিদ্যালয়ে দুই বছরের জন্য দারোয়ানের কাজ করেছি।...সব আইনকানুন আমার জানা আছে। কিন্তু একজন চাষী তো সাদা-সরল মানুষ, সে কিছুই বোঝে না; তাই তাকে তো আমার কথা মানতেই হবে কারণ তাতে তারই সুবিধা। দৃষ্টান্ত হিসাবে এই ঘটনাটাই ধরুন না...আমি জনসাধারণকে হটিয়ে দিয়েছি, আর নদীর তীরে একটা লোকের মৃতদেহ পড়ে আছে? আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি, ''কোন যুক্তিতে সে এখানে পড়ে আছে? এটা কি আইন মোতাবেক কাজ? কনস্টেবলই বা কি ভাবছে?' তাকে আমি বললাম, 'কনস্টেবল, তুমি তোমার উপরওয়ালাদের জানাও নি কেন? এই যে জলে-ডোবা মৃতদেহটা...সে হয় তো নিজেই জলে ডুবে মরেছে অথবা হয় তো এর মধ্যে সাইবেরিয়ার গন্ধ আছে। হয়তো এটা একটা দণ্ডযোগ্য হত্যাকাণ্ড... কিন্তু ঝিগিন তার কথায় কর্ণপাত না করে সমানেই সিগারেট খেতে থাকে। সে বলে, 'এটি কি রকম অনধিকার চর্চা? একে কোথা থেকে জুটিয়েছেন? তাকে ছাড়া কি করে কাজ চালাতে হয় তা কি আমরা জানি না?' আমি বলি, স্পষ্টতই তুমি না' আমি বলি, 'এখানে দাঁড়িয়ে থেকেও তুমি যদি না দেখে থাক তাহলে তো তুমি একটা অন্ধ বোকা।' সে বলে, 'কিন্তু আমি তো গতকাল পুলিশের বড়কর্তাকে রিপোর্ট করেছি।' আমি জানতে চাইলাম, 'পুলিশের বড়কর্তাকে কেন? সংবিধানের কোন আইনে? যে সব মামলায়

মানুষ ডুবে মরে, ফাঁসিতে ঝোলে, বা অনুরূপ কোন কাণ্ড করে, সেখানে পুলিশের বড়কর্তা কি করতে পারেন? এটা একটা অপরাধঘটিত ব্যাপার, আমি তাকে বলি, 'তোমার উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোয়েন্দা অফিসার এবং জজদের কাছে রিপোর্ট করা। আর প্রথম এবং প্রধান কাজ' আমি তাকে বলি, 'একটা রিপোর্ট তৈরী করে জেলা-জজের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া।' আর এখানে এই কনেস্টবল এ সব কথা শুনল আর কেবল হাসল হুজুর। আর চাষীরাও, তারা সকলেই হেসে উঠল হুজুর। আমি শপথ নিয়ে এ-কথা বলতে পারি। ইনি হাসলেন, উনি হাসলেন, আর ঝিগিনও হাসল। 'তুমি আবার দাঁত বের করে হাসছ কেন?' আমি বলি। উত্তরে কনেস্টবল বলল, 'এ সব বিষয় জেলা-জজের আওতায় আসে না।' আর সে কথা শুনেই আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। ''বল সার্জেন্ট, এ কথা তুমি বলেছ, কি বল নাই?'' প্রিশিবেয়েভ কনেস্টবল ঝিগিনকে শুধাল।

''বলেছি।''

''সকলেই শুনেছে তুমি ঠিক এই কথাগুলিই সাধারণ মানুষদের কাছে বলেছঃ 'এ সব বিষয় জেলা-জজের আওতায় আসে না।' তুমি যে ঠিক এই কথাগুলিই বলেছ তা সকলেই শুনেছে...আমিও খুব চটে গেলাম হুজুর। এমন কি হতভম্ব হয়ে গেলাম। বললাম, 'কথাটা আর একবার বল, ঠিক সেই কথাগুলি। আর সেও ঠিক সেই কথাগুলিই আবার বলল।...আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম। বললাম, 'জেলা-জজ সম্পর্কে এমন কথা তুমি বললে কেমন করে? তুমি একজন কনেস্টবল, অথচ তুমি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যাচ্ছ? অ্যা? তুমি কি জান', আমি বললাম, 'ইচ্ছা করলে জেলা-জজ সরকারবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে তোমাকে জেলা সশস্ত্রবাহিনীর হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিতে পারেন। তুমি কি জান এ ধরনের রাজনৈতিক কথাবার্তার জন্য জেলা-জজ তোমাকে কোথায় নির্বাসনে পাঠাতে পারেন?' তখন এল্ডার বলে ওঠে, 'জজ তার ক্ষমতার গণ্ডি ছাড়িয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না!' একমাত্র ছোটখাট মামলাই তাঁর কাছে যায়।' ঠিক এই কথাই সে বলেছে, আর সকলেই সেটা শুনেছে।...আমি বললাম, কোন্ সাহসে তুমি কর্তৃপক্ষকে এভাবে ছোট করছ? আমি এটা সহ্য করব না।' আমি যখন ওয়ারস-তে ছিলাম, বা যখন ছেলেদের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে দারোয়ানের চাকরি করতাম, তখন যদি এ ধরনের উদ্ধত উক্তি আমার কানে যেত তখনই আমি চারদিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করতাম কাছাকাছি কোন সশস্ত্র সৈনিক আছে কি না। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলতাম, 'আপনি আমার সঙ্গে আসুন স্যার', আর তার কাছে সব ব্যাপারটা রিপোর্ট করতাম। কিন্তু এই গ্রামে কার কাছে রিপোর্ট করব? তাই তো আমার মেজাজটা চড়ে গেল। উচ্ছৃংখলতা ও অবাধ্যতার দরুন মানুষ আত্মবিস্মৃত হবে সেটা তো আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারি না। তখন আমি হাত তুলেছি আর...অবশ্য খুব জোরে আঘাত করি নি, হুজুরের সম্পর্কে যাতে এ ধরনের কথা না বলে

সেই শিক্ষাটা দিতেই তাকে একটা হাল্কা ঘুষি মেরেছি মাত্র। তখন কনেস্টবল এল্ডারকে সমর্থ করায় তাকেও এক ঘা দিয়েছি আর ব্যাপারটা যে ভাবে শুরু হয়েছিল...আমি ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম হুজুর...তাদের একটু শিক্ষা দেওয়া ছাড়া আর কিই বা আমি করতে পারতাম? মূর্খকে শিক্ষা না দেওয়াটাই তো পাপ। বিশেষ করে সেটা যদি তাব প্রাপ্য হয়...যদি বিশৃংখলা দেখা দেয়..."

"আমাকে কথা বলতে দিন! বিশৃংখলা দেখার জন্য অন্য লোক আছে। সে কাজের জন্যই তো কনেস্টবল আছে, এল্ডার আছে, সংস্কি আছে।"

"কনেস্টবল সব কিছুর উপব নজব বাখতে পারে না। তাছাড়া, আমি যা বুঝতে পারি সেটাকে সে বোঝে না..."

"দয়া কবে উপলব্ধি করুন যে এটা আপনার কাজ নয়।"

"কি? কি বলছেন আপনি? এত বড় ভাল ব্যাপার দেখছি! মানুষ অশোভন ব্যবহার করবে, আর সেটা আমার ব্যাপার নয়। আমি কি এজন্য তাদের প্রশংসা করব, না আর কিছু? এই তো এরাই নালিশ করেছে যে আমি তাদের গান করতে নিষেধ কবেছি। কিন্তু গান করলে কি উপকারটা হয়? কোনরকম দরকারী কাজের পরিবর্তে তারা গান করে বেড়ায়...তার উপর তারাই অনেক বাত পর্যন্ত জেগে থাকার একটা হুজুগ তুলেছে ঃ মানুষের তখন শুতে যাওয়া উচিত, কিন্তু তারা বক্ বক্ করছে আর হাসছে। এ সব আমি লিখে রেখেছি।"

"কি লিখে রেখেছেন?"

"কে আলো জ্বালিয়ে বসেছিল।"

প্রিশিবেয়েভ পকেট থেকে একটা ময়লা কাগজ বের করে চশমাটা চোখে দিয়ে পড়তে লাগল ঃ

"নিম্নলিখিত চাষীরা অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বালিয়ে বসে থাকে ; আইভান প্রোখরভ, সাভ্ভা নিকিফরভ, পিয়োতর পেত্রভ। সৈনিকের বিধবা স্ত্রী শুস্ত্রোভা বেআইনী ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত হয়ে সেমিয়ন কিস্লভের সঙ্গে বসবাস করছে। ইগনাৎ স্বেরচক পিশাচবিদ্যার অনুশীলন করে, আর তার স্ত্রী মার্ভা একটি ডাইনি—রাত হলেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্য লোকের গাই দুইয়ে দুধ আনে।"

"যথেষ্ট হয়েছে।" এই কথা বলে জজ সাক্ষীদের জেরা করতে শুরু করলেন।

প্রিশিবেয়েভ চশমাটা ঠেলে কপালে তুলে হতচকিতভাবে জজের দিকে তাকাল, সে স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে যে জজও তার পক্ষে নয়। তার বেরিয়ে-আসা চোখ দুটো চকচক করছে, নাকটা লাল হয়ে উঠেছে। সে বুঝতে পারছে না এই জজ কেন এতটা উত্তেজিত হয়েছেন আর সারা আদালত-কক্ষেই বা একটা গুঞ্জন ও চাপা হাসি বার বার শোনা যাচ্ছে কেন। এক মাস হাজতবাস। এ শাস্তিটাও সে বুঝতে পারছে না।

চরম বিহ্বলতার ভঙ্গীতে সে বলে উঠল, "কিসের জন্য? কোন্

আইনে ?''

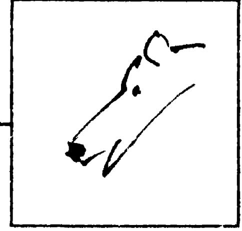
একটা কথা সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে—জগৎটা বদলে গেছে; এই পৃথিবীতে আর বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। নিষ্ঠুর, বিষণ্ণ চিন্তা তাকে পেয়ে বসল। কিন্তু আদালত-কক্ষের বাইরে গিয়ে দেখল, চাষীরা ইতস্তত জটলা করছে আর কি যেন বলাবলি করছে। নিজেকে সে আর সামলাতে পারল না। চিরদিনের অভ্যাস মত একলাফে দুটো পা জুড়ে দাঁড়িয়ে কর্কশ, ক্রুদ্ধ গলায় হেঁকে উঠল ঃ

''ওহে, কে তোমরা! জটলা ভেঙে দাও! ভিড় করো না! যে যার বাড়ি চলে যাও।''

১৮৮৫

দামী কুকুর

An Expensive Dog



সাবল্টার্ন দুবভ্ একজন বয়স্ক সৈনিক; আর ক্ল্যাপ্স্ একজন স্বেচ্ছাসৈনিক। এক বোতল ব্র্যাণ্ডি নিয়ে দু'জন বসেছে।

নিজের কুকুর মিল্‌কাকে দেখিয়ে দুবভ্ ক্ল্যাপ্স্‌কে বলল, ''একটি চমৎকার শিকারী কুকুর। চমৎকার! চিবুক ও নাকটা দেখ! দুটোর দামই তো একটা সম্পত্তির সমান। কোন কুকুর-প্রেমিককে পেলে ওই চিবুক ও নাকের জনই আমি দু'শ' রুবল্ পেতাম। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে তো তুমি কিছুই বোঝ না।''

''আমি বুঝি, কিন্তু...''

''আরে বাবা, একটা শেখানো-পড়ানো শিকারী কুকুর তো বটে! একেবারে কুলীন ইংলিশ শিকারী কুকুর। মুখটা দেখ! আর ওর গন্ধ! আর কী নাক! তুমি কি জান, মিল্‌কা যখন একেবারে বাচ্চা ছিল তখন ওর জন্য কত দিয়েছিলাম? এক শ' রুবল্! আশ্চর্য কুকুর! দুষ্টু মিল্‌কা! এস, এখানে এস তো বাপধন...''

মিল্‌কাকে কাছে টেনে নিয়ে দুবভ তার দুই কানের মাঝখানে চুমো খেল। তার দুই চোখ জলে ভরে উঠল।

''তোমাকে কাউকে দেব না। সুন্দরী আমার ছোট্ট দুষ্টুটি। তুমি তো আমাকে ভালবাস, তাই না মিল্‌কা। ভালবাস তো? এই, সরে যাও।'' সাবল্টার্ন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। ''তোমার নোংরা পাগুলো আমার ইউনিফর্মের উপর তুলে দিলে! হ্যাঁ, ক্ল্যাপ্স্, একটা বাচ্চা কুকুরের জন্য আমি দেড় শ' রুবল্ দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই তার যথেষ্ট কারণ ছিল। কেবল একটা

পরিতাপের কথা ঃ শিকারে যাবার সময়ই আমার নেই। কোন কিছু করার না থাকায় কুকুরটাই বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। ওর প্রতিভা মার খাচ্ছে। সেই কারণেই আমি ওকে বেচে দিচ্ছি। একবার কিনেই দেখ ক্ল্যাপস্, সারা জীবন তুমি আমাকে ধন্যবাদ দেবে! ঠিক আছে, তোমার হাতে যদি যথেষ্ট টাকা না থাকে, তাহলে অর্ধেক দামেই তোমাকে কুকুরটা দিয়ে দেব। পঞ্চাশ দাও। আমাকে লুঠ করো না!''

ক্ল্যাপস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ''না গো; তোমার মিল্‌কা যদি পুরুষ জাতের হত, তাহলে হয় তো কিনতাম, কিন্তু...''

''মিল্‌কা পুরুষ জাতীয় নয়?'' সাবল্টার্ন যেন আকাশ থেকে পড়ল। ''ক্ল্যাপস্, তোমার হল কি? মিল্‌কা পুরুষ...জাতীয় নয়? হা, হা, হা! তাহলে তোমার মতে সে কি? একটা কুক্কুরী? হা, হা, হা! আচ্ছা লোক বটে! পুরুষ কুকুর আর কুক্কুরীর তফাৎটাও বোঝ না!''

''তুমি এমন ভাবে কথা বলছ যেন আমি অন্ধ, একটা ছোট শিশু'' ক্ল্যাপস্ ক্ষুব্ধ হয়ে বলল। ''অবশ্যই সে একটা কুক্কুরী!''

''এর পরে তুমি হয় তো বলবে আমি একটি মহিলা! ওঃ, ক্ল্যাপস্, ক্ল্যাপস! তুমি না একজন টেকনিক্যাল কলেজের গ্র্যাজুয়েট! না হে বন্ধু, সে একটি জাত কুলীন পুরুষ; আর তুমি বলছ সে পুরুষ নয়! হা, হা!''

''আমাকে মাফ কর মিখাইল আইভানভিচ, কিন্তু তুমি...তুমি আমাকে নেহাৎই বোকা ঠাউরেছ সত্যি!''

''ঠিক আছে, তুমি ওটা পাবে না। ওকে কিনো না....তোমার মাথার মধ্যে বুদ্ধি ঢোকানো যাবে না। অচিরেই তুমি বলতে শুরু করবে ওটা একটা ঠ্যাং, লেজ নয়। তোমাকে কিনতে হবে না। আমি তোমার একটু উপকার করতে চেয়েছিলাম মাত্র। ভাখ্রামেযভ, আরও কিছুটা ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এস।''

আর্দালি আরো এক বোতল ব্র্যাণ্ডি এনে দিল। বন্ধুরা এক-একটা গ্লাস ভরে নিয়ে ভাবতে বসল। নীরবে আধা ঘন্টা কেটে গেল।

''সে যদি মেয়ে জাতীয়ই হয়'', নীরবতা ভঙ্গ করে বাঁকা চোখে বোতলের দিকে তাকিয়ে সাবল্টার্ন বলল,''তাতে হয়েছে কি? তোমার পক্ষে সেটা তো ভালই। সে তোমাকে বাচ্চা দেবে, তার এক-একটার দাম পঁচিশ রুবল্। যে কেউ স্বেচ্ছায় কিনে নেবে। তোমরা যে পুরুষ জাতীয় কুকুরকে এত ভালবাস কেন তা তো বুঝি না। কুক্কুরী তো একশ' গুণ ভাল। মেয়ে জাতীয়রা অধিকতর স্নেহশীল, অধিকতর অনুগত। ঠিক আছে, তুমি যদি মেয়ে জাতীয়কে এতই ভয় কর, তাহলে পঁচিশ দিয়েই তাকে নিয়ে নাও।''

''না বন্ধু, আমি এক কোপেকও দেব না। প্রথমত, আমার কুকুরের দরকার নেই, আর দ্বিতীয়ত, আমার টাকা নেই।''

''এ কথা তোমার আগেই বলা উচিত ছিল। মিল্‌কা, এখান থেকে চলে যা।''

আর্দালি ডিমভাজা পরিবেশন করল। বন্ধুরা সেটাকে নিয়েই পড়ল।

চেটেপুটে খেয়ে শেষ করল।

ঠোঁট মুছতে মুছতে সাবল্টার্ন বলল, ''তুমি বড় ভাল মানুষ ক্র্যাপস! তোমাকে এ ভাবে যেতে বলার জন্য আমি দুঃখিত। কি বলছি বুঝতে পারছ তো? বিনা পয়সাতেই তুমি কুকুরটা পেতে পার।''

''কিন্তু প্রিয় বন্ধু, ওটাকে আমি রাখব কোথায়?'' কথাটা বলে ক্র্যাপস্ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ''আর ওর দেখাশোনা করার মতই বা আমার কে আছে?''

''ঠিক আছে, তোমাকে নিতে হবে না, নিতে হবে না।...গুলি মার। যদি না নিতে চাও, নিতে হবে না। আরে যাচ্ছ কোথায়? বস!''

ক্র্যাপস উঠে দাঁড়াল, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর টুপির জন্য হাত বাড়াল।

''সময় হয়ে গেছে, বিদায়...'' সে হাই তুলে বলল।

''দাঁড়াও, আমি তোমাকে বাইরে দিয়ে আসি।''

দুবভ ও ক্র্যাপস্ নিজ নিজ কোট গায়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। প্রথম একশ' পা তারা নীরবেই হাঁটল।

কথা শুরু করল সাবল্টার্ন, ''কুকুরটা দিয়ে দিতে পারি এমন কাউকে কি তুমি চেন? এ রকম পরিচিত লোক তোমার কেউ আছে কি? তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, কুকুরটা ভাল, বংশগৌরবও আছে, কিন্তু...আমি আর তাকে পুষতে চাই না।''

''জানাচেনার মধ্যে এরকম কেউ তো নেই বন্ধু...এখানে কার সঙ্গেই বা আমার পরিচয় আছে?''

ক্র্যাপসের বাসায় পৌঁছনো পর্যন্ত তাদের মধ্যে আর কোন কথাই হল না। ক্র্যাপস যখন সাবল্টার্নের সঙ্গে কর-মর্দন করে বাড়ির পাশের ফটকটা খুলল তখনই দুবভ গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে একটু ইতস্তত করে বলল:

''স্থানীয় চর্মরঞ্জকরা কুকুর কেনে কিনা তুমি কি জান?''

''কেনা তো উচিত...আমি সঠিক বলতে পারি না।''

''কালই কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে ভাক্রামেয়েভকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। গোল্লায় যাক, ওরা যদি কুকুরটার ছাল ছাড়ায় তো ছাড়াক। হতভাগা কুত্তি! ন্যক্কারজনক। শুধু যে ঘর নোংরা করতে শুরু করেছে তাই নয়, গতকাল রান্নাঘরের সব মাংসই গিলেছে, মহা উৎপাত...তাও যদি সত্যি সত্যি একটা জাতের কুকুর হত তাহলেও না হয় ঠিক ছিল, কিন্তু ওটা তো দোঁ-আসলা। শুভরাত্রি!''

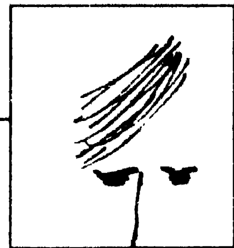
''বিদায়।'' ক্র্যাপস্ বলল।

ফটকটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। সাবল্টার্ন নিজের বাসায় ঢুকে গেল।

১৮৮৫

বলনাচের পিয়ানোবাদক

The Ballroom Pianist



সময় সকাল একটার পরে। আমার হোটেলের ঘরে বসে চুক্তিমত একটা হাস্যরসাত্মক কবিতা লিখছি। হঠাৎ দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকল ঘরের অপর বাসিন্দা পিওতর কবলেভ, এম—সংগ্রহশালার প্রাক্তন ছাত্র। মাথায় টপ হ্যাট, পরনে বুক-খোলা লোমের কোট। তাকে দেখে প্রথমেই মনে পড়ল হাস্যরসের অভিনেতা রেপেতিলভের কথা। পরে তার বিষণ্ণ মুখ ও অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ আপাত জ্বলন্ত চোখ দুটির দিকে ভাল করে তাকাতেই রেপেতিলভের সঙ্গে সাদৃশ্যটুকু মিলিয়ে গেল।

"তুমি এত সকালে এলে কেমন করে?" আমি শুধালাম। "এখন তো সবে দুটো বেজেছে। এরই মধ্যে বিয়েটা হয়ে গেল?"

আমার ঘরসঙ্গী জবাব দিল না। একটা কথাও না বলে সে পর্দার আড়ালে চলে গেল, তাড়াতাড়ি পোশাক বদল করে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করতে করতে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

দশ মিনিট পরে শুনতে পেলাম সে ফিসফিস্ করে বলছে, "ঘুমিয়ে পড়, শুয়োর! শুয়ে তো পড়েছ, এখন ঘুমোও! কিন্তু যদি না ঘুমোও—বেশ, জাহান্নামে যাও।"

"তুমি ঘুমতে পারছ না পেতিয়া?" আমি শুধালাম।

"শয়তানই জানে...সত্যি ঘুমতে পারছি না। ভীষণ হাসি পাচ্ছে। হাসির জন্য ঘুমতে পারছি না! হা, হা, হা!"

"এত হাসির কি হল?"

"ভারী মজার ঘটনা ঘটেছে। কল্পনা করতে পার?"

পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে কবলেভ আমার কাছে বসে পড়ল। তখনও সে হাসছে।

চুল টানতে টানতে বলল, "মজা লাগছে.. আবার লজ্জাও পাচ্ছি। এমন পরিস্থিতিতে জীবনে কখনও পড়ি নি।...হা, হা, হা! একটা পয়লা নম্বরের হুল্লোড়! অভিজাত সমাজের হুল্লোড়!"

নিজের হাঁটুর উপর একটা ঘুষি মেরে কবলেভ লাফ দিয়ে উঠে খালি পায়ে ঠাণ্ডা মেঝেতে পায়চারি করতে লাগল।

একসময় বলল, "একেবারে গলায় আটকে গেল! তাই তো এত সকালে চলে এলাম।"

"এই সব বোকা-বোকা কথা থামাও।"

''সত্যি বলছি—একেবারে গলায়।''

রুব্‌লেভের দিকে তাকালাম।...তার মুখটা মদে চুর, বিধ্বস্ত, কিন্তু তার বাইরের চেহারায় তখনও এত বেশী ভদ্রভাব, মহৎ বংশের নম্রতা এবং শিষ্টাচার প্রকাশ পাচ্ছে যে তার এই অভদ্র ''গলায় আটকেছে'' কথা তার ক্লান্ত, অবসন্ন মুখের সঙ্গে ঠিক মানানসই নয়।

''একেবারে পয়লা নম্বরের হুল্লোড়!...আমি তো সারা পথ হাসতে হাসতে এসেছি। আঃ, তোমার এই আজে-বাজে লেখাটা থামাও তো! তোমাকে সব কথা বলতে চাই, তোমার কাছে আমার মনটাকে হাল্কা করতে দাও..না হেসে থাকতে পারবে না। যাক সে কথা। আমার গল্পটা খুব মজাদার। নাও, মন দিয়ে শোন। কোন এক প্রিসভিস্তভ, আর্বাতে থাকে, একজন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল, বিয়ে করেছে কাউন্ট ভন ক্রাচের অবৈধ কন্যাকে। অবশ্যই সে একজন সম্ভ্রান্ত লোক। সে তার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে এক বণিকের ছেলে এস্কিমসভের সঙ্গে। প্রিস্‌ভিস্তভের বাড়িতে নাচের সঙ্গে বাজাবার জন্য আমি ন'টার আগেই এখান থেকে বেরিয়েছিলাম। বৃষ্টি ও কুয়াশায় রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত ছিল। যথারীতি আমার বেশ মনখাবাপ হয়ে গেল।

''সংক্ষেপ কর'', আমি রুব্‌লেভকে বললাম।

''ঠিক আছে। প্রিস্‌ভিস্তভের বাড়িতে পৌঁছলাম। অনুষ্ঠানের শেষে নব-দম্পতি ও অতিথিরা সশব্দে ফল চিবুচ্ছে। তারাই নাচবে মনে করে আমি আমাব জায়গা বড় পিয়ানোটায় গিয়ে বসলাম।

আমাকে দেখে গৃহস্বামী বলল, ''ওঃ, তুমি এসেছ! বন্ধু হে, ঠিক মত বাজিও; আজ যাই কর মাত্রা ছাড়িয়ে মদ খেয়ো না।''

''এ ধরনের কথা শুনতে আমি অভ্যস্ত, তাই রাগ করলাম না। হা, হা! কুকুরের নামে একটা কুৎসা রটিয়ে দাও, তাহলে সে নিজেই গলায় দড়ি দেবে। ঠিক বলি নি? আমি কি? বলনাচের পিয়ানোবাদক, একজন সেবক, এমন একজন পরিচারক যে পিয়ানো বাজাতে পারে। বণিকরা সকলেই পরিচিত, আমাকে বকশিসও দেয়, তাতে আমি কিছু মনে করি না। যাই হোক; হাতে কোন কাজ না থাকায় হাল্কাভাবে রীড টিপতে টিপতে একটা নাচের সুর ভাঁজতে লাগলাম, যাতে আঙুলগুলোর আড়ষ্টতা ভাঙে। বাজিয়েই চলেছি, একটু পরে শুনতে পেলাম পিছন থেকে কে যেন গান গাইছে। মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম, একটি যুবতী! আমার পিছনে দাঁড়িয়ে চাবিগুলো দেখছে। আমি বললাম, 'ম্যাদময়জেল, আমি জানতাম না যে কেউ আমার বাজনা শুনছে!' যুবতীটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সুরটা বেশ ভাল।' আমি বললাম, 'তা ঠিক। আপনি কি সঙ্গীত-প্রেমিক?' আর এমনি করে আলোচনা চলতে শুরু করল। বোঝা গেল, যুবতীটি কথা বলতে ভালবাসে। আমি প্রশ্ন করে কথাগুলি জানতে চাই নি, সে নিজের থেকেই বলতে শুরু করল। 'বড়ই দুঃখের কথা, আজকালকার যুবকরা সঙ্গীতকে

গভীরভাবে গ্রহণ করে না।' আর আমিও এমনি একটা বোকা গাধা যে সে আমার দিকে নজর দেওয়াতেই খুশি হয়ে গেলাম...সেই মিথ্যা অহংকার এখনও যায় নি। একটা সবজান্তা ভাব দেখিয়ে আজকের সমাজের রসজ্ঞানের অভাবের নিরীখে যুবকদের উদাসীনতার ব্যাখ্যা করলাম। আমি একজন দার্শনিক বনে গেলাম।''

''এটা এমন কি খারাপ কথা যে তা নিয়ে হৈ-চৈ করতে হবে?'' আমি রুব্‌লেভকে শুধালাম, ''প্রেমে-টেমে পড়েছ। না আর কিছু?''

''ধীরে বন্ধু, ধীরে! প্রেম তো একটা ব্যক্তিগত গোলযোগ, কিন্তু যা ঘটেছে সেটা সার্বজনীন ব্যাপার। সমাজের উঁচুতলার ঘটনা।...হ্যাঁ! যুবতীটির সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় দেখলাম কি যেন একটা গোলমাল হয়েছে ঃ আমার পিছনে কতকগুলি চরিত্র ফিসফিস্ করছে...আমার কানে এল 'পিয়ানোবাদক' শব্দটা আর হি-হি হাসি...অতএব তারা আমার কথাই বলছে। গোলমালটা কিসের? আমার 'টাই'টা কি খুলে গেছে? 'টাই'তে হাত দিয়ে দেখি সেটা ঠিকই আছে। অবশ্য সেদিকে নজর না দিয়ে আমি কথাবার্তাটি চালিয়েই গেলাম। যুবতীটি গা গরম করল, অনেক তর্ক করল, রেগে লাল হল। সুরকারদের এমন সমালোচনা শুরু করল যা সহ্য কবা যায় না। 'দৈত্য'-এর অর্কেস্ট্রাটা ভাল, কিন্তু তাতে বিষয়বস্তু কিছু নেই; রিম্‌স্কি—কর্সাকিভ একজন ঢাক-বাজিয়ে, ভার্লামিভ স্বয়ংসম্পূর্ণ কিছুই সৃষ্টি করে যান নি, এই রকম সব কথাবার্তা। আজকালকার ছেলেমেয়েরা বাজনার স্কেলই ধরতে পারে না, সিকি রুব্‌ল খরচ করে কিছু শিখেই মনে করে গানেব সমালোচনা করার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে। আমার মহিলাটিও সেইভাবেই চালাচ্ছে। আমি শুনে যাই, তর্ক করি না।...কোন অনভিজ্ঞ যুবতী যখন ফাঁকা বুলি ঝাড়ে আর মাথার ঘিলু নাড়াচাড়া করে তখন আমার ভালই লাগে। কিন্তু ওরা তখনো আমাব পিছনে বক বক করে চলেছে। হঠাৎ একটি মোটাসোটা মেয়েমানুষ যেন বাতাসে ভেসে আমার যুবতীটির কাছে এগিয়ে এল; মা-মাসিদের মতই নিবেট, বক্তিম আর স্থূল কোমর। আমার দিকে না তাকিয়েই সে যুবতীটির কানে কানে কি যেন বলল। আরে শোনই না...যুবতীটির মুখ-লাল হয়ে উঠল, দুই গাল চেপে ধবে এক লাফে পিয়ানো থেকে সরে গেল, যেন কেউ তাকে হুল ফুটিয়েছে। বুদ্ধিমান ইদিপাস, সমস্যাটার সমাধান করে দাও। যাই হোক, আমি ভাবলাম, হয় আমার সান্ধ্য পোশাকের পিছন দিকের ভাঁজটা ভেঙে গেছে, অথবা দুর্ভাগ্যজনক একটা কিছু ঘটেছে, অন্যথায় তো তার এই ভাবান্তর বোঝাই শক্ত। যাই হোক, দশ মিনিট পরে আমি বারান্দায় গিয়ে নিজেকে ভাল কবে দেখে নিলাম। টাই ও কোট পরীক্ষা করলাম, না, সব ঠিক আছে। আমাব ভাগ্য ভাল বন্ধু, একটি বৃদ্ধ মহিলা একটা পুটুলি হাতে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। সে আমাকে সব বুঝিয়ে বলল। সে না থাকলে আমি তো ভুলের স্বর্গেই থাকতাম। সে জনৈক পরিচারককে বলছে, আমাদের মেয়েটা ও রকম

চালবাজী করে বেড়ায়। পিয়ানোর কাছে একটি যুবককে দেখে সময় কাটাবার জন্য তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে এমন ভাব দেখাল যেন সে একজন কেউকেটা। কি হাসির কথা—সে যুবকটি কিন্তু মোটেই একজন আমন্ত্রিত অতিথি নয়, সে একজন পিয়ানোবাদক, একজন নাচের বাজনাদার...তার সঙ্গেই সে কিনা আলাপ জমাতে গেল! মার্ফা স্তেপানভ্‌নাকে ধন্যবাদ। সে তো মেয়েটির কানে কানে সব বলে দিল, নইলে সে তো যুবকটির হাত ধরে ঘুরতে শুরু করত। এখন সে লজ্জাবোধ করছে, কিন্তু এখন তো অনেক দেরী হয়ে গেছে ঃ যা বলা হয়ে গেছে তা তো আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না...? তাহলে এর থেকে তোমার কি মনে হচ্ছে?''

আমি রুবলেভকে বললাম, ''মেয়েটা বোকা, আর বৃদ্ধাটিও তাই; এটা তো মনে রাখার মত কথাই নয়...''

''আমিও সেটা মনে করে বসে নেই। খুব মজার বলে মনে হয়েছিল এই পর্যন্ত। এরকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে আমি আগেও অনেকবার পড়েছি। একবার খুব আহত হয়েছিলাম, কিন্তু আজকাল আমি ও সব উপেক্ষা করে চলি! মেয়েটি বোকা ও যুবতী কিন্তু তার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে! পিয়ানোর পাশে বসে নাচের সুর বাজাতে শুরু করলাম...সে সব জায়গায় গুরুগম্ভীর কিছু চায় না। কিছু ওয়াল্টজ, কিছু কোয়াড্রিল, কিছু যুদ্ধের বাজনা লাগিয়ে দিলাম। তোমার ভিতরকার সুরকার যদি তাতে অস্বস্তি বোধ করে তাহলে এক গ্লাস গলায় ঢেলে 'বোকাশিও' কে নিয়ে ফূর্তিতে মেতে ওঠ।''

''কিন্তু এর মধ্যে কুৎসাটা কোথায়?''

''আমার তো দাঁত বেরিয়ে পড়ছে আর মেয়েটার কথা মনে করে নয়...আমি কেবল হাসছি, ব্যস...কিন্তু কেন জানি না আমার মনটা খুঁত খুঁত করছে! যেন একটা ইঁদুর আমার পেটের ভিতরে বসে কুট্ কুট্ করে কামড়াচ্ছে। কেন আমার এমন দুরবস্থা হচ্ছে তা আমি নিজেই বুঝতে পারছি না...ব্যাপারটা খুলে বলে নিজেকে হাল্কা করতে চেষ্টা করছি, বিশ্বাস কর, আমি হাসছি, নিজের সুরে গান করছি, কিন্তু কিছু একটা আমার ভিতরটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।—কখনও সেটা আমার বুকে চড়ে ছুরি বসাচ্ছে, কুরে কুরে খাচ্ছে, আবার হঠাৎই আমার গলায় ঢুকে একটা দলা পাকিয়ে তুলছে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরি, সেটাকে ঝেঁটিয়ে ফেলে দি, সেটা চলেও যায়, কিন্তু আবার শুরু করে দেয়। কী ঝঞ্ঝাট! বীভৎস সব চিন্তা এসে মাথার মধ্যে ভিড় করে। মনে পড়ে যায়, জীবনটাকে নিয়ে কী ছিনিমিনি খেলেছি।...হাজার ভার্স্ট হেঁটে মস্কো গিয়েছি, আকাংখা ছিল সুরকার ও পিয়ানোবাদক হব, আর শেষ পর্যন্ত হলাম বলনাচের পিয়ানোবাদক।...আসলে ব্যাপারটা স্বাভাবিক, হয় তো কিছুটা মজারও, কিন্তু আমার বড় দুঃখ হয়। তোমার কথা মনে পড়ল। ভাবলাম, এই তো আমার ঘর-সঙ্গীও রয়েছে, 'সব সময় লিখেই চলেছে।...বেচারি, সভার মধ্যে ঘুমিয়ে-পড়া ডেপুটিদের নিয়ে লিখছে, রুটির কারখানার আরশোলা,

হেমন্তকালের খারাপ আবহাওয়া নিয়েও লিখছে। আগেও লেখা হয়েছে, চিবিয়ে খাওয়া হয়ে গেছে এমন সব কথাও লিখছে। সে কারণে তোমার জন্যও দুঃখ হল...দুঃখে দুই চোখে জল এসে গেল। আশ্চর্য মানুষ তুমি, তোমার একটা প্রাণ আছে, কিন্তু সেই বস্তুটি নেই—আমি কি বলতে চাই বুঝতে পারছ, আগুন, ক্রোধ, শক্তি...তোমার মধ্যে আগ্রহটা নেই। ঈশ্বর জানেন, কেন তুমি রসায়নবিদ বা মুচি না হয়ে লেখক হলে। আমার সেই সব বন্ধুদের কথা মনে পড়ল যারা জীবনের পরাজিত সৈনিক—যত সব গায়ক, শিল্পী, সঙ্গীত-প্রেমিক...যারা একদিন টগবগ করে ফুটত, উৎসাহে ফুলে উঠত, আকাশে উড়ত, কিন্তু এখন...আজ তারা কি হয়েছে তা শয়তানই জানে! কেন যে এই সব চিন্তা মাথায় ঢুকেছিল তা আমি জানি না। যদি নিজেকে মন থেকে সরিয়ে দেই তাহলে বন্ধুরা সেখানে ঢুকে পড়ে, আবার বন্ধুদের যদি সরিয়ে দেই তাহলে মেয়েটি ঢুকে পড়ে। আমি তাকে উপহাস করলাম, তার এক কোপেকও দাম দিলাম না, কিন্তু সে আমাকে শান্তিতে থাকতে দিল না। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, 'রুশ ভাষার এটা কোন্ ধরনের চরিত্র? তুমি যখন মুক্ত থাক, যখন পড়াশুনা কর বা হাতে কোন কাজ না থাকায় ঘুরে বেড়াও, তখন তুমি তার সঙ্গে মদ খেতে পার, তার পিঠ চাপড়ে দিতে পার, তার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পার, কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি তিলমাত্রও তার হাতের মুঠোয় চলে যাও তখনই তোমাকে চোখে দেখলেও সে তোমার কথা শুনতে পায় না।—সে চিন্তাটাকে কোন রকমে চাপা দিলেও আবার একটা দলার মত হয়ে গলার ভিতরে ঠেলে ওঠে। সেটা মাথা তুলল, ঠেলে উঠল, তারপর আমার গলাটা টিপে ধরল। শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম আমার চোখে জল এসেছে, আমার বোকামিও বাধা পেয়েছে, আর...মানে সব কিছু উধাও হয়ে গেছে। মস্ত বড় হলটা অন্য সব শব্দে ভরে গেছে...হৈ হুল্লোড়ের শব্দ...''

''এ হতেই পারে না।''

মুখটা লাল করে হাসতে চেষ্টা করে কভলেভ বলল, ''ঈশ্বর সাক্ষী। কেমন লাগছে তোমার? তারপরই মনে পড়ে আমাকে টানতে টানতে বারান্দায় নিয়ে যাওয়া হল। তারা কোটটা আমার গায়ে পরিয়ে দিল। গৃহকর্তার কর্কশ গলাটা কানে এল : 'পিয়ানোবাদককে সে মাতাল করল? কে তাকে ভদকা দিল?' পরিশেষে পেলাম গলাধাক্কা! হৈ-হুল্লোড়ের বদলে সেটা কেমন লাগে? হা, হা, হা! আমার তখন হাসবার মত অবস্থা ছিল না, কিন্তু এখন ভীষণ মজা লাগছে...ভীষণ! একটা স্বাস্থ্যবান জন্তু...আলোর থামের মত ঢ্যাঙা, আর তার পরেই হঠাৎ উন্নত হুল্লোড়! হা, হা, হা!''

কবলেভের কাঁধ ও মাথা হাসির দমকে কাঁপছে দেখে আমি শুধালাম, ''এর মধ্যে মজার কি আছে? ঈশ্বরের দোহাই পেতিয়া, আমাকে বল এর মধ্যে মজার কি আছে? পেতিয়া! প্রিয় সঙ্গী আমার!''

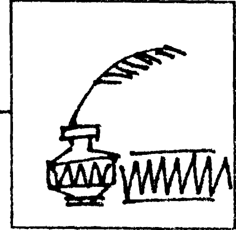
কিন্তু পেতিয়া প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ল। সে হাসির শব্দে আমি যেন

মূর্চ্ছা রোগের আভাষ পেলাম। তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করলাম, আর মস্কো শহরে হোটেলের ঘরে রাতের বেলায় পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকে না বলে শাপান্ত করতে লাগলাম।

১৮৮৫

বহ্বারম্ভে

Overdoing It



আমিন গ্লেব গাভ্রিলোভিচ স্মির্নভ তখন গ্নিলুশকি স্টেশনে পৌঁছে গেছে ; যে জমিদারীতে সীমানা নির্ধারণের জন্য তাকে ডেকে আনা হয়েছে সেখানে পৌঁছতে হলে আরও ত্রিশ-চল্লিশ ভার্স্ট তাকে ভাড়া-গাড়িতে চড়ে যেতে হবে। (চালক যদি মাতাল না হয় আর ঘোড়াগুলি যদি টাট্টু না হয় তাহলে বড় জোর ত্রিশ ভার্স্ট পথ, কিন্তু চালক যদি অকর্মা আর ঘোড়াগুলো হয় জীর্ণ, তাহলে পথটা বেড়ে হবে পঞ্চাশ)।

আমিন স্টেশনের পুলিশকে জিজ্ঞাসা করল, "দয়া করে বলুন না, এখানে ভাড়াটে ঘোড়া কোথায় পাব?"

"কেমন ঘোড়া? ডাকগাড়ির? ডাকগাড়ির ঘোড়া তো দূরের কথা আশপাশের এক শ' ভার্স্টের মধ্যে একটা খেঁকি কুকুরও পাবেন না। কোথায় যাবেন?"

"দেভকিনো, জেনারেল খোখোতভের জমিদারীতে।"

"বটে?" পুলিশটি হাই তুলল। "স্টেশনের পিছন দিকে ঘুরে যান, অনেক সময় চাষীরা সেখানে থাকে, তারা বাইরের যাত্রীও তুলে নেয়।"

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে স্টেশনের পিছন দিকে গেলাম। সেখানে অনেক খোঁজাখুঁজি, কথাবার্তা ও এদিক-সেদিক করার পরে একটি কর্কশ চেহারার চাষীকে দেখতে পেলাম ; বসন্তের দাগভর্তি বিমর্ষ মুখ, পরনে ঘরে-বোনা মোটা কাপড়ের কোট, পায়ে বাকলের জুতো।

গাড়িতে চড়তে চড়তে আমিন ভুরু কুঁচকে বলল, "জানি না তোমার গাড়িটার কি হাল। কোন্‌টা আগা আর কোনটা পাছা তাও বোঝা যায় না।"

"বোঝবার কি আছে? ঘোটকির লেজটা যেদিকে সেইটে আগা, আর যেদিকে মহাশয় বসে আছেন সেটাই পাছা।"

ঘোটকিটার বয়স অল্প, কিন্তু চামড়াসর্বস্ব, পাগুলো ওল্টানো আর কান দুটো কাটা। চালক যখন অর্ধেক দাঁড়িয়ে দড়ির চাবুক তার পিঠে কসাল, তখন সে কেবল মাথাটা নাড়ল ; কিন্তু যখন সে খিস্তি করে আবার চাবুক মারল তখন গাড়িটা ক্যাঁচর ক্যাঁচর করে এমনভাবে কাঁপতে লাগল যেন তার

গায়ে জ্বর এসেছে। তৃতীয় চাবুকের পরে গাড়িটা দুলতে লাগল, আর চতুর্থ চাবুক পড়তেই সেটা ছুটতে শুরু করল।

আমিন প্রচণ্ডভাবে হেলতে-দুলতে লাগল, আর কৃশ চালকের কেরামতি দেখে আশ্চর্য হয়ে বলল, ''এ ভাবেই কি সারাটা পথ চলতে হবে?''

চালক আশ্বাস দিয়ে বলল, ''রাগ করবেন না, ঠিক পৌঁছে যাব। ওটার বয়স কম, চলেও ভাল। একবার চলার তালটা ঠিক করতে দিন, তারপর আর থামাতে পারবেন না। চল্—চল্!''

গাড়িটা যখন স্টেশন থেকে ছেড়েছিল তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। আমিনের দক্ষিণ দিকে একটা অন্ধকার, নির্জন, আদি-অন্তহীন প্রান্তর।...তার ভিতর দিয়ে গাড়ি চালালে একসময় পৃথিবীর সীমান্তে গিয়ে পৌঁছতে হবে। দূর দিগন্তে পৃথিবী যেখানে আকাশের সঙ্গে মিশে উধাও হয়ে গেছে সেখানে হেমন্তের সূর্য ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। রাস্তার বাঁ দিকে অন্ধকারে চোখে পড়ছে বড় বড় ঢিপি যেগুলি গত বছরের খড়ের গাদা হতে পারে অথবা গ্রামও হতে পারে। সম্মুখে কি আছে আমি তা দেখতে পাচ্ছি না, কারণ সেদিকে দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ ঢেকে রেখেছে চালকের চওড়া পিঠটা। চারদিক নিস্তব্ধ, কিন্তু ঠাণ্ডা কুয়াশাচ্ছন্ন।

গ্রেট কোটের কলারের কান দুটো ঢাকার চেষ্টা করে আমিন ভাবল, ''কী জনহীন প্রান্তর! সীমাহীন। যে কোন সময় আমি আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হতে পারি, আর তারা যদি কামান-বন্দুক ছুঁড়তে থাকে তাহলেও কেউ কোন দিন জানতেও পারবে না। হ্যাঁ, চালকটিকেও দেখে সুবিধাজনক লোক বলে মনে হচ্ছে না। ..তার মস্তবড় পিঠটার দিকে তাকান। ওই প্রকৃতির দু ... আঙুল দিয়ে একটা ঠেলা মারলেই আপনার দফা রফা হয়ে যাবে। আর তার কুৎসিত মুখটা এমন অসভ্য দেখতে যে তাকে বিশ্বাসও করা যায় না।''

আমিন শুধাল, ''হেই বন্ধু, তোমার নামটি কি?''

''আমার নাম? ক্লিম।''

''এই অঞ্চলটা কি রকম ক্লিম? খুব বিপজ্জনক কি? কোন ক্ষতি হতে পারে কি?''

ঈশ্বরের আশীর্বাদে কিছুমাত্র নয়। এখানে এমন কে আছে যে ক্ষতি করবে?''

''কেউ যে নেই সেটাই মঙ্গল। তবু আমি সঙ্গে করে তিনটে রিভলবার এনেছি,'' আমি মিথ্যে করে বললাম। ''আর তুমি তো জান একটা রিভলবার কিছু হাসির ব্যাপার নয়। আমি একাই দশটা ডাকাতের মহড়া নিতে পারি।''

অন্ধকার নেমে এসেছে। গাড়িটা হঠাৎ খস্-খস্ কিচ-কিচ্ করতে করতে কাঁপতে লাগল, এবং যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাঁদিকে মোড় নিল।

আমিন অবাক হয়ে ভাবল, ''আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে? এতক্ষণ সোজা সম্মুখে যাচ্ছিল, এবার হঠাৎ বাঁদিকে বাঁক নিল। শয়তানটা নির্ঘাৎ

আমাকে কোন বেকায়দা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে আর এ রকম ঘটনা অনেক ঘটেছে!''

সে চালককে বলল, ''শোন, তুমি তো বলছ এ সব জায়গায় কোন বিপদের ভয় নেই? দুঃখের কথা...ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই আমি ভালবাসি। দেখতে রোগা-পোটকা হলে কি হবে, আমি একটা ষাঁড়ের মত শক্তিশালী। একবার তিনতিনটে ডাকাত আমাকে আক্রমণ করেছিল। তারপর কি হয়েছিল বলে তোমার ধারণা? তাদের একজনকে এমন একটা গুলি করলাম যে...সে সোজা একেবারে তার সৃষ্টিকর্তার কাছে গিয়ে হাজির হল, আর বাকি দু'জন কঠোর সাজা ভোগ করতে চলে গেল সাইবেরিয়ায়। এত শক্তি যে আমি কোথায় পাই তা আমি নিজেই জানি না। আমি এক হাতে একটা দশাসই মানুষকে, ধর ঠিক তোমার মত মানুষকে চেপে ধরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতে পারি।''

ক্লিম মুখ ঘুরিয়ে আমিনকে একবার তাকিয়ে দেখল, ভ্রূকুটিতে তার সমস্ত মুখটা কুটিল হয়ে উঠল, আর তার ঝাল ঝাড়ল ঘটকির পিঠে চাবুক কসিয়ে।

আমিন বলতে লাগল, ''হ্যাঁ বন্ধু, আমার সঙ্গে যে লাগতে আসবে ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন। ডাকাত যে হাত-পা খুইয়েই বেঁচে যাবে তাও নয়, তার পরেও আছে আদালতে জবাবদিহি। সব জজ ও রেলিফদের আমি চিনি। আমি সরকারের লোক, খুবই দরকারী লোক। আমি যদি কোথাও বেড়াতে যাই, উপরওয়ালারা তার খবর রাখে। আমার যাতে কোন রকম ক্ষতি না হয় সেদিকে তাদের কড়া নজর থাকে। আমার ভ্রমণপথের আগাগোড়া পুলিশ সার্জেন্ট আর সৈনিকরা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। থা থা-থামাও!'' আমিন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। ''এ কোথায় যাচ্ছ তুমি? আমাকেই বা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?''

''কেন, দেখতে পাচ্ছেন না? এটা একটা বন!''

আমিন ভাবল, ''বন তো বটেই। ব্যাপারটা আমি আঁচ করতে পেরেছি! কিন্তু দুর্বলতা দেখালে চলবে না—আমি যে ভয় পেয়েছি সেটা সে বুঝতে পেরেছে। কেন সে ফিরে ফিরে আমাকে দেখছে? নির্ঘাৎ তার কোন মতলব আছে। এতক্ষণ তো বলতে গেলে গাড়িটা চলছিলই না, আর এখন কেমন ঘোড়া-দৌড় শুরু করে দিয়েছে!''

''শোন ক্লিম, ঘোড়াটাকে এত জোরে ছোটাচ্ছ কেন?''

''আমি মোটেই ছোটাচ্ছি না, ও নিজেই ছুটছে। একবার ছুটতে শুরু করলে ওকে আর থামাতে পারবো না।''

''তুমি মিথ্যে কথা বলছ বন্ধু! আমি বুঝতে পারছি তুমি মিথ্যে বলছ। আমি বলছি এত জোরে গাড়ি চালিও না। ঘোড়ার রাশটা একটু টেনে ধর। শুনতে পাচ্ছ? একটু আস্তে চালাও!''

''কেন?''

''কারণ...কারণ আমার পিছু পিছু চারজন সহকর্মীর স্টেশন থেকে আসার কথা আছে। তাবা এসে আমাকে ধরবে। তারা আমাকে কথা দিয়েছে সঙ্গে নিয়ে চললে আবও মজা হবে। তারা সকলেই শক্ত-সমর্থ স্বাস্থ্যবান ছেলে। প্রত্যেকের হাতে একটা কবে পিস্তল আছে। চারদিক তাকিয়ে এমন নড়াচড়া করছ কেন? মনে হচ্ছে যেন সুঁচের উপর বসে আছ! অ্যা? বার বাব আমাকে দেখার কি আছে? আমি মোটেই দেখবার মত নই। একমাত্র যদি রিভলবাবগুলিব জন্য হয়—তুমি কি চাও সেগুলি বেব করে দেখাব? ঠিক আছে...''

আমিন পকেটগুলি হাতড়াবাব ভান করতে লাগল, কিন্তু ঠিক সেই সময় এমন কিছু ঘটল যা সে নিজের ভীরুতা সত্ত্বেও আশা করতে পারে নি। ক্লিম হঠাৎ গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল, আর চাব হাত-পায়ে ভর দিয়ে দ্রুতবেগে হামাগুড়ি দিয়ে একটা ঝোপের দিকে ছুটতে লাগল।

সে চীৎকাব কবে বলল, ''বাঁচাও! বাঁচাও! আমার গাড়ি-ঘোড়া সব নাও, কিন্তু আমাকে মেরো না! বাঁচাও!''

দ্রুত বিলীয়মান পায়ের শব্দ ও ঝবাপাতার আওয়াজ কানে এল, তারপর সব চুপচাপ। এ রকম একটা কাণ্ড আমিন মোটেই আশা কবে নি। সে প্রথমে ঘোড়াটাকে থামাল, তারপর গাড়ির মধ্যে আবাম করে বসে ভাবতে লাগল: সে তো পালাল... বোকাটা ভয় পেয়েছে। এখন আমি কি করি? নিজে এগোতে পাবব না। কারণ আমি পথ চিনি না, আর লোকে ভাবতে পারে আমি ঘোড়াটা চুবি করে নিয়ে যাচ্ছি। আমি কি কবি?'

''ক্লিম! ক্লিম!''

প্রতিধ্বনি বলল, ''ক্লিম!''

অন্ধকাব বনের মধ্যে সাবা বাত ঠাণ্ডায় বসে কাটাতে হবে, শুনতে হবে নেকড়ের ডাক, প্রতিধ্বনি আব ছালসর্বস্ব ঘোটকির নাক-ঝাড়াব শব্দ—একথা ভাবতেই আমিনেব শিবদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত ওঠানামা করতে লাগল, মোটা উখার মত।

সে চীৎকার করে ডাকল, ''ক্লিম, প্রিয় সঙ্গী আমার! বন্ধু তুমি কোথায়?''

সে দুই ঘণ্টা ধরে চেঁচাল, চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেলল, আব যখন রাতটা বনের মধ্যে কাটাতেই হবে বলে ধরে নিল, ঠিক তখনই এক ঝলক বাতাসের সঙ্গে ভেসে এল একটা আর্ত কণ্ঠস্বর।

''ক্লিম! ওখানে কি তুমি আমার প্রিয় বন্ধু বসে আছ? এবার চল!''

''আপন...আপনি যে আমাকে মেরে ফেলবেন!''

''আবে বাবা, আমি তো ঠাট্টা করছিলাম! ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, সত্যি আমি তামাসা করছিলাম! রিভলবার আমার কাছে থোড়াই ছিল! ভয়ে আমি মিথ্যে করে বলেছি! দয়া করে এখন গাড়িটা ছাড়! ঠাণ্ডায় জমে গেলাম!''

সত্যিকারের ডাকাত হলে এতক্ষণ গাড়ি-ঘোড়া নিয়ে উধাও হয়ে যেত—হয় তো এটা বুঝতে পেরেই ক্রিম বন থেকে বেরিয়ে এসে ইতস্ততভাবে পা ফেলে তার সওয়ারির দিকে এগিয়ে গেল।

"বোকার মত এত ভয় পেলে কেন হে? আমি করলাম তামাসা, আর তুমি ভয় পেলে? উঠে পড়।"

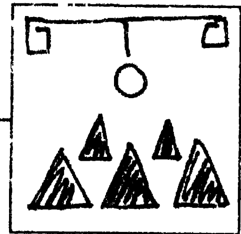
গাড়িতে চড়ে ক্রিম ঠোঁট চেপে বলল, "ঈশ্বর আপনার সহায় হোন মালিক। এ কথা জানলে একশ রুবল দিলেও আপনাকে গাড়িতে তুলতাম না। আমার তো ভয়ে একেবারে মারা পড়ার মত অবস্থা।"

ক্রিম ঘোটকির পিঠে চাবুক মারল। গাড়িটা কেঁপে উঠল। আবার চাবুক। গাড়িটা দুলতে শুরু করল। তৃতীয় চাবুকের পর গাড়িটা যখন চলতে লাগল তখন কোটের কলারে কান ঢেকে চোখ বুজে দিবাস্বপ্ন দেখতে শুরু করল। রাস্তা এবং ক্রিম—তখন আর কোনটাই বিপজ্জনক মনে হল না।

১৮৮২

দুঃখ

Grief



সারা গালচিনস্ক ভোলোস্তের মধ্যে সব চাইতে দক্ষ কুঁদকার আবার সব চাইতে অযোগ্য বলে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত মানুষটির নাম গ্রিগরি পেত্রভ। বুড়ো বউকে সে জেলা হাসপাতালে নিয়ে চলেছে। পাক্কা তিরিশ ভার্স্ট গাড়ি চালিয়ে যেতে হবে। রাস্তাটা ভয়াবহ। সরকারী ডাকহরকরাও এ পথটাকে সামাল দিতে পারবে না, আর কুঁদকার গ্রিগরির মত একটা অকর্মা লোকের তো কথাই ওঠে না। একটা তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডা বাতাস তার মুখে এসে লাগছে। যেদিকেই তাকাও শুকনো বরফের মেঘগুলো বাতাসে এমনভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে যে বরফগুলো আকাশ থেকে আসছে না মাটি থেকে আসছে সেটাই বলা শক্ত। বরফের কুয়াশার ওপারে কিছুই দেখা যায় না, মাঠঘাট নয়, টেলিগ্রামের থামগুলি নয়, বনজঙ্গলও নয়। একটা উদ্দাম বাতাসের ঝাপটা গ্রিগরির সামনে পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শকটদণ্ডটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। দুর্বল, ন্যুব্জ ঘোটকীটা কোনক্রমে এগিয়ে চলেছে। গভীর বরফের ভিতর থেকে পা টেনে তুলতে আর মাথাটা দোলাতেই তার সব শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে। কুঁদকারেরও আবার তাড়া। বাক্সের উপর বসে সে অস্থিরভাবে উঠছে নামছে আর মাঝে মাঝেই ঘোড়ার পিঠে চাবুক চালাচ্ছে।

"কেঁদো না মাত্রিওনা," সে ঠোঁট চেপে বলে উঠল। "একটু ধৈর্য ধর। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা শিগগিরই হাসপাতালে পৌঁছে যাব, আর সঙ্গে সঙ্গেই

তুমিও.. পাভেল আইভানিচ তোমাকে কয়েক ফোঁটা ওষুধ দেবে, অথবা তোমাব বক্তমোক্ষণেব হুকুম দেবে, অথবা হযতো দযা কবে তোমাব গাযে একটু স্পিবিট মালিশ কবে দেবে। আব তোমাব দুই পাঁজবাব ব্যথা কমে যাবে। পাভেল আইভানিচ সাধ্যমত চেষ্টা কববে। সে চেঁচাবে, পা ঠুকবে, কিন্তু যতদব যা সম্ভব তা কববে। আশ্চর্য ভালমানুষ সে, ঈশ্বব তাকে সুস্বাস্থ্য দিন। আমবা পৌঁছনোমাত্র সেই প্রথম একলাফে তাব ঘব থেকে বেবিযে আসবে আব আমাদেব যদৃচ্ছা খিস্তিখেউড় কববে। চীৎকাব কবে বলবে, 'কি? কেন এমনটা হল? কেন তুমি যথাসমযে আস নি? আব আমি কি একটা কুকুব নাকি যে সাবাটা দিন তোমাদেব মত বাজে লোকদেব সঙ্গে কাটাব? কেন সকালে আস নি? চলে যাও! কেটে পড়! কাল সকালে এসো।' কিন্তু আমি বলব, 'মিঃ ডক্টব! পাভেল আইভানিচ! মান্যবব! দযা কবে কাজে লেগে যাও! চোখ বাঙিও না! এস!'

কুঁদকাব ঘোড়াব পিঠে চাবুক মাবল। বুড়িটাব দিকে একবাব তাকিযেও দেখল না। চাপা গলায বিড়বিড় কবতে লাগল:

'মান্যবব! সত্যি বলছি, ঈশ্বব সাক্ষী। শপথ কবে বলছি, কাকভোবেই আমি যাত্রা কবেছিলাম। কিন্তু প্রভু এবং ঈশ্বব-জননী যদি বেগে গিযে এমন ববফ ঝড় পাঠিযে দেন তাহলে কেমন কবে যথাসমযে পৌঁছব? নিজেই বুঝে দেখ। এই দুর্যোগেব মধ্যে ভাল জাতেব ঘোড়াই আসতে পাবত না, আব তুমি তো নিজেব চোখেই দেখতে পাচ্ছ, আমাব এটি তো ঘোড়া নয়, একটা চর্মশাল।' কিন্তু পাভেল আইভানিচ ভুরু কুঁচকে চেঁচিযে উঠবে: 'আমি তোমাদেব চিনি! সব সময ছুতো খুঁজে বেড়াও। বিশেষ কবে তুমি গ্রিগবি। তোমাকে আমি খুব ভাল চিনি। বাজী ধবে বলতে পাবি অন্তত পাঁচটিবাব তুমি শুঁড়িখানায ঢুকেছ।' তাকে আবও বলব, 'মান্যবব! তুমি কি আমাকে এতটা হৃদযহীন বা ধর্মজ্ঞানহীন মানুষ ভাবছ? আমাব বুড়িটা সৃষ্টিকর্তাব কাছে যেতে বসেছে, তাব মুমূর্ষু অবস্থা, আব আমি কিনা শুঁড়িখানায ঢুকে বেড়াব? আমাব পবমাযুব দিব্যি, সেটা কিছুতেই হতে পাবে না। ওই সব শুঁড়িখানা উচ্ছন্নে যাক।' তখন পাভেল আইভানিচ তোমাকে হাসপাতালে পাঠিযে দেবে। আব আমি তাব পাযেব উপব পড়ে বলব, 'পাভেল আইভানিচ! মান্যবব! আমবা তোমাকে কত ধন্যবাদ জানাই! আমবা মূর্খ, আমবা অভিশপ্ত। তুমি আমাদেব ক্ষমা কব, আমাদেব মত চাষীদেব প্রতি অতিনিষ্ঠুব হযো না। ভালবকম পিটুনিই আমাদেব প্রাপ্য, কিন্তু তুমি তো দযালু, কষ্ট স্বীকাব কবে ববফ ঢাকা পথে নেমে এস।' পাভেল আইভানিচকে দেখলে মনে হবে সে বুঝি আমাকে ঠেঙাবে, কিন্তু সে বলবে, 'আমাব পা দুটি পাথবে ঠেকাবাব আগে তোমবা মূর্খেব দল ভদকায ডুবে যাবাব অভ্যাসটা ছেড়ে দিযে এই বুড়িকে একটু দযা কব। তোমাদেব চাবকানো উচিত।' চাবকাও পাভেল আইভানিচ, চাবুক মাব। মাবতে মাবতে ঈশ্বব আমাদেব মেবে ফেলুন। কিন্তু তুমি তো আমাদেব হিতকাবী,

আমাদেব সত্যিকারের পিতা, তোমার পায়ে মাথা না নুইয়ে কি আমরা পারি ?...মান্যবর! এখানে এই মুহূর্তে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করছি... আমার একথা যদি মিথ্যে হয় তো আমাব চোখে থুথু দিয়ো... যে মুহূর্তে মাত্রিওনা ভাল হয়ে যাবে এবং পুনরায় শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে পারবে তখনই তোমার এই দয়ার জন্য তুমি যা হুকুম কববে তাই তোমাকে বানিয়ে দেব! তুমি যদি চাও তো কারেলিয়ান বার্চ কাঠের একটা সিগার-কেস ক্রোকা খেলার কাঠেব বল...সত্যিকারেব বিদেশী স্কিট্‌ল্‌ও আমি বানাতে পারি... তোমাব জন্য আমি সব করতে রাজী। সেরকম একটা সিগার-কেসের জন্য মস্কোতে তোমার কাছ থেকে চার রুবল্‌ বাগিয়ে নেবে, কিন্তু আমি একটা কোপেকও নেব না।' তখন ডাক্তার হেসে উঠে বলবে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমার দুঃখ আমি বুঝি। কেবল দুঃখ এই যে তুমি একটি মাতাল...' ওরে বুড়ি মেয়ে, এই সব কর্তাদেব কি করে সামাল দিতে হয় সেটা আমার জানা আছে। এখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় পথ না ভুল হয়ে যায়। বেশ বরফ-ঝড় চলেছে! আমার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেছে।''

কুঁদকার অবিরাম বক্‌ বক্‌ করেই চলল। বুকের ভিতরকাব আশংকাগুলিকে চাপা দেবার জন্যই তার এই স্বতস্ফূর্ত বকবকানি। মুখে কাথার খৈ ফুটছে, কিন্তু তার মাথার মধ্যে আরও অনেক বেশী চিন্তার, অনেক বেশী প্রশ্নেব আনাগোনা। কুঁদকারের অজ্ঞাতেই গোলমালটা বেঁধেছে একেবারে নীল আকাশ থেকে, আর এখন তো ভেবেই পাচ্ছে না কি দিয়ে কি করবে। এতকাল সে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটিয়েছে মদ খেয়ে সব কিছু ভুলে থেকে; দুঃখ বা সুখ কাকে বলে তার খোঁজও রাখত না; কিন্তু হঠাৎ তার বুকের মধ্যে বাসা বেঁধেছে এক ভয়ংকর বেদনা। একটা বেপরোয়া মাতাল হঠাৎ হয়ে পড়েছে একটি বিপর্যস্ত, বিপন্ন, চিন্তাক্লিষ্ট মানুষ; তাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে।

কুঁদকার জানে, গত সন্ধ্যা থেকেই তার গোলযোগের সূত্রপাত হয়েছে। কাল যথারীতি মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে যখন সে যথারীতি খিস্তি করতে করতে ঘুষি পাকাতে লাগল তখন তার বুড়ি বৌটি এমন দৃষ্টিতে তার জ্বালাতনকারীর দিকে তাকাল যেভাবে আগে কখনও তাকায় নি। যে কুকুর মার খায় বেশী আর ভাত খায় কম তারই মত বুড়ির জরাজীর্ণ চোখে শহীদের মত ভীরু দৃষ্টি। কিন্তু এখন তার দৃষ্টি ছিল কঠিন ও নিশ্চল, অনেকটা বেদীর উপরকার বিগ্রহের মত, অথবা, মুমূর্ষু মানুষের মত। সেই দুটি বিস্ময়কর, বৈরীসুলভ চোখ থেকে গোলযোগের সূচনা। হতবাক কুঁদকার প্রতিবেশীর কাছ থেকেই ধার করে আনল একটা ঘোটকি, আর এখন তার বুড়িকে নিয়ে চলেছে হাসপাতালে। মনে আশা, পাভেল আইভানিচ চূর্ণ আর প্রলেপ দিয়ে বুড়ির মুখের আগেকার অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারবে।

সে ঠোঁট চেপে বলতে শুরু করল, ''দেখ মাত্রিওনা, শুনতে পাচ্ছ, পাভেল আইভানিচ যদি জিজ্ঞাসা করে আমি তোমাকে মেরেছি কি না,

তাহলে একেবারে মুখ খুলবে না। কথা দিচ্ছি, আর কোন দিন তোমাকে মারব না। তোমাকে কষ্ট দেবার জন্য কি কোনদিন মেরেছি? সত্যি, কোনদিন তোমাকে মারতে চাই নি। তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়। তোমাকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না, কিন্তু দেখ, আমি তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। আমি চেষ্টা তো করছি। আর কী প্রচণ্ড বরফ পড়ছে, প্রচণ্ড! হে প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! ঈশ্বর করুন, আমরা যেন পথ হারিয়ে না ফেলি!...তোমার বুকের পাশটা কি ব্যথা করছে? মাত্রিওনা, তুমি কথা বলছ না কেন? আমি জানতে চাইছি, তোমার বুকটা ব্যথা করছে কি না?''

তার কাছে খুবই অবাক লাগছে, বুড়ির মুখের উপর পড়ে বরফ গলছে না, তার মুখটা ক্রমেই ঝুলে পড়ছে, কেমন যেন একটা ম্লান, ধূসর নোংরা মোমের মত রং ধরছে, কঠিন ও গম্ভীর হয়ে উঠছে।

কুঁদকার চাপা গলায় বলে উঠল, ''কেন? মুখখু মেয়ে মানুষ, কথা বলছ না কেন? ঈশ্বরের মত করেই মনপ্রাণ দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, আর তুমি...আঃ কী হাঁদারাম। তোমাকে পাভেল আইভানিচের কাছে নিয়েই যাব না।''

কুঁদকার হাতের লাগাম ফেলে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। বুড়ির মুখের দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছে নাঃ সে ভীষণ ভয় পেয়েছে। প্রশ্ন করে জবাব না পাওয়াটা আরও ভয়ংকর। শেষ পর্যন্ত, এ অনিশ্চয়তা দূর করতে তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে না তাকিয়েই সে বুড়ির ঠাণ্ডা হাতের উপর হাত রাখল। হাতটা তুলে ধরতেই চামড়ার দড়ির মত সেটা আবার নীচে পড়ে গেল।

''ও মরে গেছে! এখানেই শেষ বিদায়!''

কুঁদকার কাঁদতে লাগল। যত না দুঃখে তার চাইতে বেশী উদ্বেগে। সে ভাবল, এই পৃথিবীতে সব কিছু কত তাড়াতাড়ি ঘটে যায়। বিপদ শুরু হতে না হতেই সব শেষ হয়ে গেল। বৃদ্ধ মহিলাটির সঙ্গে একত্রে বাস করার, তার সঙ্গে কথা বলার, তার দুঃখে দুঃখী হবার সময় হবার আগেই সে চলে গেল, মরে গেল। চল্লিশ বছর ধরে সে তার সঙ্গে বাস করছে, কিন্তু এই চল্লিশটা বছরই যেন একটা কুয়াশার ভিতর দিয়ে কেটে গেছে। সত্যিকারের জীবনটা তো মুছে দিয়েছিল মাতলামি, সংগ্রাম আর দারিদ্র্য। আর বুঝিবা বিদ্বেষের বশেই বুড়ি মরে গেল ঠিক তখনই যখন তার জন্য কুঁদকারের মনে জাগল দুঃখ, যখন তাকে ছাড়া আর সে বাঁচতে পারে না, যখন তার প্রতি একটা ভয়ংকর অপরাধের বোঝা চেপে বসেছে তার ঘাড়ে!

তার মনে পড়ল, ''এ বুড়ি ভিক্ষে করে খেত! আমিই তাকে পাঠিয়েছি অন্য লোকের কাছ থেকে রুটি চেয়ে আনতে। কী পরিণাম তার! আরও দশ বছর বাঁচা তার উচিত ছিল, কিন্তু আমি বাজী ধরে বলতে পারি, সে ভেবেছে এটাই আমার আসল চেহারা। পবিত্র জননী, এ আমি কোথায় চলেছি। এখন তো তাকে কবর দিতে হবে, চিকিৎসা নয়! ফিরে চল!''

ঘুরে বসে সমস্ত শক্তি দিয়ে আবার সে ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারল।

প্রতি মুহূর্তেই পথ চলাটা শোচনীয়তর হয়ে উঠছে। এখন তো শকটদণ্ডটাও দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে স্লেজটা ছোট ছোট ফার গাছের গায়ে ধাক্কা খায়, কি একটা কালো বস্তু কুঁদকারের হাতে আঁচড়ে কেটে তার চোখের সম্মুখ দিয়ে ছুটে চলে যায়, তারপরেই তার দৃষ্টি-পথ আবার আচ্ছন্ন হয়ে যায় সাদা, ঘুরন্ত বরফে।

কুঁদকার ভাবল, ''যদি নতুন করে জীবনটা শুরু করতে পারতাম!''

তাব মনে পড়ল, চল্লিশ বছর আগে মাত্রিওনা ছিল তরুণী, সুন্দরী, আনন্দময়ী; এসেছিল একটি সম্পন্ন গৃহস্থ-বাড়ি থেকে। তার হাতের কাজ দেখেই বাবা-মা তার সঙ্গে মেয়েব বিয়ে দিয়েছিল। একটি সুন্দর জীবনের সব সম্ভাবনাই ছিল কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, বিয়ের পর থেকেই সে মদ ধবল, স্টোভের বিছানাতেই রাত কাটাতে লাগল, সেই থেকে তার আর ঘুম ভাঙে নি। বিয়ের কথাটা তার মনে আছে, কিন্তু তার পব কি ঘটল—তাকে মেবে ফেললেও সে মদ খেয়েই চলেছে, মিথ্যা কথা বলেছে, লড়াই করেছে—এ ছাড়া আর কিছুই সে মনে কবতে পাবে না। এই ভাবেই চল্লিশটা বছর নষ্ট হয়েছে।

বরফ-সাদা মেঘ ধীবে ধীরে ধূসর হয়ে আসছে; গোধূলি নামছে।

কুঁদকাব অবাক হয়ে ভাবল, ''কোথায় চলেছি আমি? ওকে তো কবব দিতে হবে, আর আমি চলেছি হাসপাতালে...নিশ্চয় আমাব মাথা খারাপ হয়েছে!''

আবার মুখ ঘুরিয়ে সে ঘোড়াব পিঠে চাবুক মাবল। ঘোটকি সব শক্তি এক করে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে হাল্কা চালে পথ চলতে লাগল।

কুঁদকার বাব বার তার পিঠে চাবুক চালাচ্ছে। পিছন থেকে একটা ঠক ঠক শব্দ কানে এল। সে মুখ ঘুবিয়ে তাকালও না; সে জানে মৃত বুড়িব মাথাটা স্লেজের গায়ে ঠোকাঠুকি করছে। চাবদিক আরো অন্ধকাব হয়ে আসছে; বাতাস বইছে তীক্ষ্ণতর, শীতলতব।..

কুঁদকার ভাবতে লাগল, ''আবার নতুন করে জীবন শুরু কবব। নতুন যন্ত্রপাতি কিনব, অর্ডার সংগ্রহ কবব...টাকা এনে বুড়িকে দেব...হ্যাঁ!''

কিন্তু এবার লাগামটা তার হাত থেকে পড়ে গেল। সেদিকে সে তাকিয়ে রইল, তার হাত দুটি তার কথা শুনল না।

সে ভাবল, ''এতে কিছু যায়-আসে না। ঘোড়াটা নিজের থেকেই চলবে, সে পথটা চেনে। একটু ঘুমিয়ে নেওয়া দবকাব; সংকারের সময় পর্যন্ত একটু শয়ে নেই।''

কুঁদকার চোখ বুজে ঢুলতে লাগল। একটু পরেই শুনতে পেল ঘোটকিটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। চোখ মেলে সামনেই একটা অন্ধকার কি যেন দেখতে পেল, কোন বাড়ি বা খড়ের গাদা।

স্লেজ থেকে নেমে দেখা উচিত ওটা কি, কিন্তু তাব সারা শরীরে এমন অবসাদ জড়িয়ে আছে যে তার কাছে সেখান থেকে নড়াচড়া কবাব চাইতে

ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে মরে যাওয়া ভাল। সে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল।

রং-করা দেয়ালের একটা বড় ঘরে তার ঘুম ভাঙল। উজ্জ্বল রোদ এসে পড়েছে জানালা দিয়ে। কুঁদকার দেখল অনেক লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার ইচ্ছা হল, সকলের সামনে সম্মানিত ও বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে।

সে বলল, "এই বৃদ্ধ মহিলার অন্তিম সৎকার করতে হবে। পবিত্র পিতাকে খবর দিন।"

কে যেন বলে উঠল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন শুয়ে পড়!"

"প্রভু! পাভেল আইভানিচ!" সামনেই ডাক্তারকে দেখে কুঁদকার তো অবাক। "মান্যবর! হিতকারী!"

তার সাধ হল, লাফ দিয়ে উঠে ডাক্তারের পায়েব উপর উপুড় হয়ে পড়বে, কিন্তু তার মনে হল নিজের হাত-পাও তার কথা শুনছে না।

"মান্যবব! আমাব পা দুটো কোথায় গেল? আমার হাত দুটোই বা কোথায়?"

"হাত-পাগুলোকে বিদায় দাও। ঠাণ্ডার কামড়! আরে, কাঁদছ কেন? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে তুমি এখনও বেঁচে আছ! ষাটটি গ্রীষ্ম তো দেখলে, আব কেন? তোমার পক্ষে সেটাই তো যথেষ্ট।"

"সেটাই তো দুঃখ! মান্যবব, সেটাই তো দুঃখ! দয়া কব। ক্ষমা কর! আবও পাঁচ-ছ'টা বছব আমাব চাই।"

"কেন?"

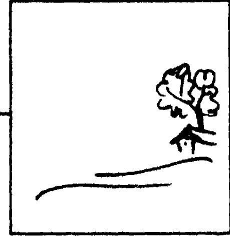
"এটা অন্যের ঘোড়া, তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আব বুড়িকে কবর দিতে হবে।...পৃথিবীতে সব কিছু এত দ্রুত ঘটে যায়! মান্যবর! পাভেল আইভানিচ! কারেলিয়ান বার্চ কাঠের সেরা সিগারকেস। আমি তোমাকে একটা ক্রোকে-বল বানিয়ে দেব..."

বিদায় নেবার ভঙ্গীতে হাতটা দুলিয়ে ডাক্তাব ওযার্ড থেকে বেরিয়ে গেল। আমেন কুঁদকার।

১৮৮৫

আসল সত্য চাপা থাকে না

The Truth Will Out



কঠোরভাবে সকলের অজ্ঞাতে পিওতর পাভ্লোভিচ পসুদিন একটা ভাড়া-করা ত্রয়কা হাঁকিয়ে গ্রামের রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে ছোট জেলা-শহর এন-এর দিকে—সেখানে তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে একটা বেনামী চিঠি লিখে।

কলারে মুখ ঢেকে সে স্বপ্ন দেখছে, "অতর্কিতে তাদের পাকড়াও করবে নীল আকাশ থেকে বাজ পড়ার মত। বদমায়েশগুলো তাদের নোংরা কাজটা শেষ করেছে; এখন তা নিয়ে উৎসব করছে; আমি বাজী ধরে বলছি, তাদের ধারণা সব চিহ্ন তারা মুছে ফেলতে পেরেছে...হা, হা! উৎসবের চরম মুহূর্তে যখন তারা শুনবে, 'ত্যাপকিন—ল্যাপ্‌কিনকে এখানে নিয়ে এস' তখন তাদের আতংক ও বিস্ময়ের ছবিটা আমি যেন দেখতে পাচ্ছি! তখন কী সোরগোলটাই না সেখানে উঠবে! হা, হা!"

স্বপ্ন দেখার পর্ব শেষ করে পসুদিন ত্রয়কা-চালকের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। জনপ্রিয়তার কাঙালদের মত প্রথমে সে নিজের সম্পর্কে প্রশ্ন করল।

"তুমি পসুদিনকে চেন?"

"অবশ্যই চিনি!" চালক মুচকি হাসল। "আমরা তাকে চিনি!"

"তুমি হাসলে কেন?"

"আপনি আমাকে অবাক করে দিয়েছেন! শেষ কেরাণিটি অবধি সকলকে আমি চিনি, কাজেই পসুদিনকে জানব না কেন! এখানে তো তাকে পাঠানো হয়েছে—যাতে সকলেই তাকে চিনতে পারে।"

"তাই বটে...আচ্ছা? তার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? সে কি খুব ভাল মানুষ?"

চালক হাই তুলে বলল, "চলে যাবে। লোকটি ভালই তো, নিজের কাজটা ভালই বোঝে। তাকে এখানে পাঠানো হয়েছে দু'বছরও হয় নি, আর এর মধ্যেই সে প্রচুর কাজ করেছে।"

"বিশেষ করে কি করেছে?"

"অনেক ভাল কাজ করেছে, প্রভু তাকে সুস্বাস্থ্য দান করুন। সে আমাদের একটা রেলপথ পাইয়ে দিয়েছে আর খোখ্‌রিউকভ্‌কে জ্বালিয়ে ছেড়েছে...এমন চালাকি নেই যা খোখরিউকভ করে নি...সে ছিল পাজি লোক, আগেকার সকলেই তার সঙ্গে মানিয়ে চলেছে, কিন্তু পসুদিন এল আর খোখ্‌রিউকভের সঙ্গে লেগে গেল ধস্তুমার, এমন অবস্থা হল যেন সে বুঝি এখানে কোন দিন ছিলই না...সত্যি বলছি রে ভাই! পসুদিনকে কেনা

যায় না, না-আ-আ! তাকে এক শ' দাও এমন কি হাজাব দাও, কিন্তু সে তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে না। এমন মানুষই সে নয়।''

পসুদিন বিজয়েব ভঙ্গীতে ভাবল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অন্তত এতদঞ্চলে ওবা আমাকে চেনে। খুব ভাল।''

চালক বলেই চলল, ' একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, কিন্তু অহংকাবী নয়। আমাদেব লোকবা একটা নালিশ নিয়ে তাব কাছে গিয়েছিল, সে তাদেব সঙ্গে ভদ্র ব্যবহাব কর্বেছিল ঃ সকলেব সঙ্গেই কবমর্দন কবেছিল। বলেছিল 'বসুন'। লোকটি একটি জীবন্ত বোমা কখনও কিছু বোঝবাব চেষ্টা কবে না, একেবাবে চুপচাপ। সে কখনও হেঁটে চলে না, আব সব কিছু কবে একেবাবে তাড়ঘড়ি। আমাদেব লোকবা কোন কিছু বলাব আগেই সে চেঁচিয়ে বলল, 'ঘোড়া আন! আব সোজা চলে এল এখানে। এসেই সব কিছু কাঁপিয়ে তুলল একটা কোপেকও কোন দিন নেয় নি। তাব আগে যে ছিল তাব চাইতে অনেক ভাল। অবশ্য সেও খুব ভাল লোক ছিল। অভিজাত, গুরুত্বপূর্ণ, সাবা গুবার্নিয়াতে তাব তাইতে জোব গলায় কেউ কথা বলত না। সে ঘোড়ায় চেপে বেব হলে চাবদিকেব দশ ভার্স্ট পর্যন্ত মানুষ তাব গলা শুনতে পেত। কিন্তু বাইবেব চেহাবাই বল বা আভ্যন্তবীণ ব্যাপাবই বল, ইনি অনেক বেশী কুশলী মানুষ। এব মাথায় এক শ' ভাগই ঘিলু. মাত্র একটাই দোষ লোকটি সব দিক থেকেই ভাল, কিন্তু একটাই খাবাপ দিক ঃ সে মদ্যপ।''

''আবে না।'' পসুদিন ভাবল।

''তুমি কোথায় শুনেছ?'' সে প্রশ্ন কবল, ''যে আমি ..যে সে একজন মদ্যপ?''

''অবশ্য আমি নিজে কখনও তাকে মাতাল অবস্থায় দেখি নি, অতএব আমি মিথ্যা বলব না, তবে লোকে বলাবলি কবে। আব সেই সব মানুষও তাকে মাতাল হতে দেখে নি তবে চাবদিকে গুজবটা এই বকমই ছড়িয়েছে . প্রকাশ্যে অথবা বাইবে গেলে—নাচেব আসবেই হোক আব দেখা-সাক্ষাৎই হোক—সে কখনও মদ খায় না। বাড়ি ফিবে বোতল খোলে .সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখ মুছেই প্রথম যা চায় সেটা ভদ্কা! খানসামা এক গ্লাস ভবে আনে, সে আবও এক গ্লাস তখনই চেয়ে নেয় . আর সাবা দিন তাই ঢোকে ঢোকে গেলে। ভাবতে পাব—সে মদ খায় কিন্তু কখনও চোখ ওল্টায় না। মদকে কি কবে মুঠোব মধ্যে বাখতে হয় তা সে জানে। আমাদেব খোখবিউকভ্ যখন মদ খেতে শুরু কবে তখন মানুষ তো দূবেব কথা, কুকুববাও ঘেউ-ঘেউ কবে। কিন্তু পসুদিনেব কথা আলাদা, তাব নাকটা পর্যন্ত লাল হয় না। পড়াব ঘবে তালা লাগিয়ে শুয়ে পড়ে, আব সেইভাবে বাতটা কাটিয়ে দেয়. .লোকজন যাতে টেব না পায় তাই সে টেবিলেব টানাব সঙ্গে একটা নল লাগিয়ে নিয়েছে। টানাব মধ্যে সব সময় ভদকা মজুত থাকে। সে নলেব উপব উপুড় হয়ে নলে চুমুক দেয় আব

ভদ্‌কা টানে। তার গাড়িতেও সেই ব্যবস্থা ; তার পোর্টফোলিওর মধ্যে...''

আতংকে শিউরে উঠে পসুদিন নিজের মনেই বলল, ''এ সব ওরা জানল কোথা থেকে? হা ঈশ্বর, সে কথা জানাজানি হয়ে গেছে! কী জ্বালা!''

''আর নারীঘটিত ব্যাপার যদি বল...সে বড় খারাপ ছেলে! (চালক হেসে হেসে মাথাটা নাড়তে লাগল।) এটা লজ্জার কথা, আর তাও সোজাসুজি! তার আছে দশটা—কি যেন বল তোমরা—জলপাত্র...দুটো বাড়িতেই থাকে। একজন—ঐ যে নাস্তাসিয়া ভাইভানভ্‌না—তার গৃহকর্ত্রী, আর অপরটা—কি যেন তার নাম? গুলি মার—লিউডিমিলা সেমিওনভ্‌না নামেই কেরাণি। নাস্তাসিয়াই হচ্ছে এক নম্বর। সে যা বলে লোকটি তাই করে। শেয়ালনী যে ভাবে লেজ নাড়ে ঠিক সেইভাবে সে লোকটিকে নাচিয়ে বেড়ায়। তাকে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সে তাদের যেরকম ভয় করে তারা কিন্তু মোটেই তা করে না। হা, হা! আর তিন নম্বরটি তো থাকে কচলনায়া স্ট্রীটে...খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার স্যাপার!''

মুখটা লাল করে পসুদিন ভাবল, ''এ দেখছি তাদের নামগুলোও জানে। আর লোকটা কি, না একজন মুঝিক, কোচোয়ান...যে কোনদিন শহরেও যায় নি! কী জ্বালা...কী নোংরা, কী দুঃসহ!''

সে সোজাসুজি প্রশ্ন করল, ''এসব তুমি কোথা থেকে জানলে?''

''লোকে বলাবলি করে...নিজের চোখে দেখি নি, কিন্তু অন্যের কাছে শুনেছি। সে যাই হোক, জানাটা কি খুব শক্ত? খানসামা বা কোচোয়ানের জিভটা তো তুমি কেটে ফেলতে পার না.. যাই হোক, নাস্তাসিয়া নিজেই তো পথে পথে নিজের সৌভাগ্যের কথা বলে বেড়ায়। জনসাধারণের চোখ থেকে তো আর লুকিয়ে রাখতে পার না। আর সেই পসুদিনই নাকি ইদানিং গোপনে গাড়ি হাঁকিয়ে আসে তদন্ত করতে। আগে যে ছিল সে যখনই কোথাও যেত একমাস আগেই সেটা জানিয়ে দিত, আর যখন সে যাত্রা শুরু করত তখন এত গোলমাল, হৈচৈ আর ভিড় জমে যেত...ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন! তার সামনে চলত ঘোড়সওয়ার, পিছনে চলত ঘোড়সওয়ার, দুই পাশে চলত ঘোড়সওয়ার। যেখানে যাবার সেখানে পৌঁছে সে ভাল একটা ঘুম দিত, ভাল ভাল খাবার খেত, পান করত, তারপর শুরু হত কর্তব্য কর্ম। সে তখন চীৎকার করত, পা ঠুকত, আবার ঘুমিয়ে নিত, তারপর সেই একইভাবে ফিরে যেত।...কিন্তু এখন যাকে পেয়েছি, সে তো কোন কথা কানে যেতেই চুপি চুপি অতি দ্রুত চলে আসতে চেষ্টা করে, যাতে কেউ কিছু দেখতে বা জানতে না পারে।...সত্যি, হাসির কথা! সরকারী লোকরা যাতে তাকে দেখে না ফেলে তাই সে লুকিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্রেনে চড়ে বসে। প্রয়োজন হলে স্টেশন পর্যন্ত গাড়িতে আসে, তা কোন ডাক-গাড়ি বা ভদ্র গোছের গাড়ি ভাড়া করে না ; কোন চাষীর গাড়ি ভাড়া করাটাই সে পছন্দ করে। চাষী মেয়ের মতই আপাদমস্তক ঢেকে রাখে আর সারাটা পথ একটা বুড়ো

কুকুরের মত হাঁপিয়ে কথা বলে যাতে কেউ তার গলার স্বর চিনতে না পারে। লোকজনরা যখন এ সব কথা বলে তা শুনলে হেসে-হেসে তোমার পেট ফেটে যাবে। লোকটা তাই পথ চলে আর ভাবে কেউ তাকে চিনতে পারে নি। কিন্তু যার ঘটে এতটুকু বুদ্ধি আছে সেই তাকে ঠিক চিনতে পারে!''

''কেমন করে চেনে?''

''খুব সহজে। আগে আমাদের খোখ্‌রিউখভ যখন চুপি চুপি যাতায়াত করত তখনই আমরা বুঝতে পারতাম, কারণ সে ছিল ভার-ভারিক্কী। আর পসুদিনকে তুমি ঠিক সেই কারণেই চিনতে পারবে।..সাধারণ যাত্রী সরলভাবেই চলে, কিন্তু পসুদিন অমন সরলভাবে চলবার লোকই নয়। ডাক-ঘাঁটিতে পৌঁছেই সে দোষ ধরতে শুরু করে। তার কাছে জায়গাটা দুর্গন্ধে ভরা, গুমোট আর ঠাণ্ডা, তাকে খেতে দিতে হবে মুরগি, ফল, আর নানা রকমের জ্যাম—ঘাঁটির লোকরা জানে ঃ কেউ যদি শীতকালে এসে মুরগি ও ফল খেতে চায় তাহলে সে নির্ঘাৎ পসুদিন। সেউ যদি স্টেশন-মাস্টারকে বলে 'আমার ভাল মানুষটি' আর নানান কাজে এখানে-ওখানে লোক পাঠাতে থাকে, তাহলে দিব্যি করে বলতে পার সে পসুদিন। তার গায়ের বাসও সাধারণ মানুষের মত নয়, আর সে বিছানায় শোয় নিজের কায়দায়...সে স্টেশনে একটা সেটির উপর শোয়, চারদিকে আতর ছিটিয়ে নেয় আর বালিশের পাশে তিনটে মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখে। শুয়ে শুয়ে সে কাগজপত্র পড়ে। স্টেশনমাস্টারকে কেয়ারই করে না। সেক্ষেত্রে একটা বিড়ালও তো বুঝতে পারে কোন্ কিসিমের মানুষ সে।''

পসুদিন ভাবল, ''ঠিক, ঠিক। কী আশ্চর্য! এটা আমি আগে বুঝি নি।''

''আর দরকার হলে ফল ও মুরগি ছাড়াই যে কেউ তাকে চিনতে পারে। তারে-তারে সব কিছু জানা হয়ে যায়। সে যত খুশি মুখ ঢেকে রাখুক, যেমন ইচ্ছা লুকিয়ে থাকুক, কিন্তু বাইরে সকলেই জানতে পারে যে সে পথে বেরিয়েছে। সকলেই তার আসার অপেক্ষায় আছে। সব কিছু প্রস্তুত হবার আগে পসুদিন বাড়ি থেকে পা বাড়ায় না, অতএব রক্ষা কর! সে এসেই সম্পূর্ণ অতর্কিতে তাদের পাকড়াও করবে, বিচারের জন্য পাঠিয়ে দেবে বা কাউকে বদলি করে দেবে, কিন্তু অলক্ষ্যে তারা মুচকি-মুচকি হাসবে। তারা বলবে, 'মহামান্য, আপনি চুপি চুপি এসেছেন, দেখুন—এখানে সব কিছু ধোয়া-মোছা!' সে এদিক যাবে, ওদিক যাবে, তারপর খালি হাতে ফিরে যাবে। আরো আছে, সে সকলকে প্রশংসা করবে, প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করবে, অসুবিধা ঘটানোর জন্য সকলের কাছে ক্ষমা চাইবে। ব্যাপারটাই এই রকম। তুমি কি ভেবেছিলে? ওরা [illegible] মানুষ! এখানকার লোকগুলো খুব চতুর, মাথায় বুদ্ধি রাখে! তারা সব যে কত বড় [illegible] তা [illegible] কাজেই [illegible] আমি গাড়ি

চালাচ্ছিলাম, আর কড়া ইহুদি আর্দালিটা স্টেশন থেকে যেন উড়ে আমার কাছে এল। আমি তাকে শুধালাম, 'তোমার ইহুদি কর্তাটি কোথায় যাবে?' সে বলল, 'এনএ যাবে—আমি মদ ও স্ন্যাক্স নিয়ে আসছি। পসুদিনের লোকরা তার জন্য অপেক্ষা করছে।' চতুর? পসুদিন হয়তো সবেমাত্র যাত্রার জন্য তৈরী হচ্ছে অথবা কেউ যাতে চিনতে না পারে সেজন্য মুখটা ঢাকছে। সে হয়তো এখন পথেই আছে আর ভাবছে কেউ তার আসার কথা জানে না। এদিকে তার জন্য তারা সকলেই তৈরী হয়ে আছে—মদ, সামন মাছ, পনির ইত্যাদি হ্যাঁ, সে আসছে আর ভাবছে, 'তোমাদের দফা রফা হবে বাছাধনরা।' কিন্তু বাছাধনরা থোরাই মাথা ঘামায়! আসুক না! কয়েক যুগ আগেই তারা সব কিছু লুকিয়ে ফেলেছে!"

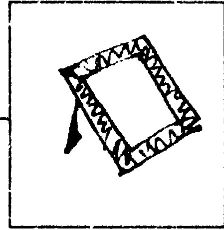
"গাড়ি ঘোরাও!" পসুদিন কর্কশ গলায় হাঁক দিল। "ফিরে চল!"

বিস্মিত কোচোয়ান আবার ফিরে চলল।

১৮৮৫

আয়না

The Mirror



নববর্ষের সন্ধ্যা। এক জেনারেল ও জমিদারের মেয়ে নেলি। দিনরাত সে বিয়ের স্বপ্ন দেখে। এই মুহূর্তে নিজের ঘরে বসে ক্লান্ত, আধবোজা চোখে সে আয়নার মধ্যে কল্পনায় নিজেকে দেখছে। তার মুখটা বিবর্ণ, টানটান, আয়নার মতই নিশ্চল।

একটি সংকীর্ণ, সীমাহীন বারান্দা, সারি সারি অসংখ্য মোমবাতি, তার মুখ, দুই বাহু ও আয়নার ফ্রেমের প্রতিবিম্ব—এ সব কিছুই অনেকক্ষণ আগে কুয়াশার আবরণে একটা সীমাহীন ধূসর সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেছে। জলে ঢেউ ওঠে, ঝিকমিক করে, আর মাঝে মাঝে একটি আকস্মিক আলোর ঝলকানিতে আলোকিত হয়ে ওঠে. .

নেলির স্থির দৃষ্টি ও খোলা মুখের দিকে তাকিয়ে বলা শক্ত সে ঘুমিয়ে পড়েছে না জেগে আছে, কিন্তু তথাপি সে দেখতে পায়। প্রথমে সে দেখতে পায় কেবল একটু হাসি এবং কারও দুটি চোখের শান্ত, মনোমুগ্ধকর দৃষ্টি, তারপর আন্দোলিত ধূসর পটভূমির উপর ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে একটি মাথার রূপরেখা, তারপর একটি মুখ, ভুরু ও দাড়ি। ও ছবিটি তার প্রিয়তমের, দীর্ঘ স্বপ্ন ও আশার বস্তু। নেলির কাছে তার ভালবাসার মানুষটিই সব—জীবনের অর্থ, ব্যক্তিগত সুখ, জীবনচর্যা, নিয়তি। সেই মানুষটি ছাড়া আর আছে ওই ধূসর পটভূমির মত কেবলই বিষণ্ণতা শূন্যতা

ও অর্থহীনতা। আর তাই এতে অবাক হবার কিছু নেই যে যখনই প্রেমিকের সুন্দর, লাজুক, হাসিভরা মুখটা তার সামনে দেখা দেয় তখনই এমন একটা সুখ, এমন একটা অবর্ণনীয় মধুর দুঃস্বপ্ন তাকে পেয়ে বসে যা মুখের বা লেখার ভাষায় বোঝানো যায় না। একটু পরেই সে প্রেমিকের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, দেখতে পায় যে একই ছাদের তলায় তার সঙ্গে বাস করছে, আর ধীরে ধীরে দুটি জীবন এক সঙ্গে মিশে যায়। ওই ধূসর পটভূমিতে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর উড়ে চলে যায়। ...আর নেলির চোখে ভেসে ওঠে, তার পুংখানুপুংখ ভবিষ্যৎ।

ধূসর পটভূমির উপর দৃশ্যের পর দৃশ্য চলে যায়। একবার নেলি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে এক শীতের রাতে সে নিজে স্থানীয় ডাক্তার স্তেপান লুকিচের দরজায় টোকা দিচ্ছে। ফটকের ওপারে বুড়ো কুকুরটা আলস্যভরে কর্কশ গলায় ডেকে উঠল। ডাক্তারের জানালাগুলি অন্ধকার। চারদিক নিস্তব্ধ।

নেলি ফিসফিস করে বলে, "ঈশ্বরের দোহাই, ঈশ্বরের দোহাই!"

শেষ পর্যন্ত পাশের ফটকটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে ওঠে। ডাক্তারের রাঁধুনি নেলির সামনে দাঁড়িয়ে।

"ডাক্তার বাড়ি আছেন?"

পাছে মনিবের ঘুম ভেঙে যায় তাই রাঁধুনি তার কাছে এসে চুপি চুপি বলে, "তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। একটা মহামারী দেখে এইমাত্র ফিরেছেন। তাকে বিরক্ত করা যাবে না।"

কিন্তু নেলি রাঁধুনির কথা শোনে না। এক হাতে তাকে সরিয়ে দিয়ে উন্মাদিনীর মত ডাক্তারের ঘরে ঢুকে যায়। এক ছুটে কয়েকটা অন্ধকার গুমোট ঘর পেরিয়ে দু'তিনটে চেয়ার উল্টে দিয়ে শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের শোবার ঘরটা পেয়ে যায়। স্তেপান লুকিচ পোশাক-পরা অবস্থাতেই বিছানায় শুয়ে আছে। গায়ে কোটটা শুকনো ঠোঁট থেকে নিঃশ্বাস পড়ছে নিজেরই হাতের উপর। কাছেই একটা বাতি-বাতি চিকচিক করে জ্বলছে। একটা কথাও না বলে নেলি চেয়ারে বসে কাঁদতে শুরু করে। খুব কাঁদছে, তার সারা শরীর কাঁপছে।

"আমার স্বামী...আমার স্বামীর অসুখ!" সে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে।

স্তেপান লুকিচ জবাব দেয় না। ধীরে ধীরে উঠে বসে, হাতের উপর মাথাটা রাখে, ঘুম-ঘুম স্থির দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে তাকায়।

নেলি বলে, "আমার স্বামীর অসুখ। ঈশ্বরের দোহাই, আপনি চলুন...তাড়াতাড়ি! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব!"

নিজের হাতের উপর ফুঁ দিয়ে ডাক্তার বলে, "আচ্ছা?"

"চলুন। এই মুহূর্তে! না হলে...না হলে...সে বড় ভয়ংকর...ভাবা যায় না। ঈশ্বরের দোহাই!"

বিবর্ণ, উৎকণ্ঠিত নেলি চোখের জল ফেলে হাঁসফাঁস করে স্বামীর

আকস্মিক অসুস্থতার বিবরণ ও নিজের অবর্ণনীয় আতংকের কথা ডাক্তারকে বলতে শুরু করে। তার দুঃখে পাষাণও গলে যেত, কিন্তু ডাক্তার তার দিকে তাকাল, হাতের উপর ফুঁ দিল, একটুও নড়ল না।

কোনরকমে বলল, "আমি কাল যাব।"

"অসম্ভব!" নেলি ভয় পেল। "আমার স্বামীর জ্বরবিকার হয়েছে। আমি জানি। এখনই...এই মুহূর্তে আপনাকে বড় দরকার!"

ডাক্তার তো-তো করে বলল, "আমি, মানে...এইমাত্র ফিরেছি...একটা মহামারীর চিকিৎসা করতে তিন দিন বাইরে গিয়েছিলাম। আমি ক্লান্ত, নিজেই অসুস্থ। কিছুতেই যেতে পারব না। আমি...আমি...নিজেই অসুস্থ...এই যে!"

নেলির মুখের সামনে ডাক্তার থার্মোমিটারটা তুলে ধরে।

"দেখুন, আমার খুব জ্বর...না, আমি পারছি না এমন কি বসে থাকতেও পারছি না। ক্ষমা করবেন, আমি শুতে চললাম।"

ডাক্তারের তথাকবণ।

নেলি হতাশায় আর্তনাদ করে ওঠে, "কিন্তু দয়া করুন ডাক্তার! আমি আপনাকে মিনতি করছি। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে সাহায্য করুন। গায়ে জোর আনুন, আমার সঙ্গে চলুন। আমি আপনাকে পারিশ্রমিক দেব ডাক্তার।"

"ওঃ ঈশ্বর—কিন্তু আমি তো আপনাকে বলে দিয়েছি!"

লাফিয়ে উঠে নেলি শোবার ঘরেই পায়চারি করতে থাকে। সে ডাক্তারকে বোঝাতে চায়, তার মাথায় ঢোকাতে চায়—ভাবে, ডাক্তার যদি জানত স্বামী তার কত প্রিয় আর সে নিজে কত দুঃখী, তাহলে হয় তো ডাক্তার তার ক্লান্তি ও অসুখের কথা ভুলে যেত। কিন্তু তাকে বোঝাবার মত ভাষা সে কোথায় পাবে?

স্তেপান লুকিচ বলে, "জেমস্তভোর ডাক্তারের কাছে চলে যান।"

"সেটা অসম্ভব! এখান থেকে পঁচিশ ভার্স্ট দূরে তিনি থাকেন, আর এখন সময় বড়ই দামী। আর ঘোড়াও টানতে পারবে না, আমার বাড়ি থেকে এখানে আসতে চল্লিশ ভার্স্ট, আর এখান থেকে জেমস্তভোর ডাক্তারের বাড়ি সেই একই দূরত্ব। না, এটা অসম্ভব। আসুন স্তেপান লুকিচ! আমি আপনাকে বীর হতে অনুরোধ করছি। বীর হোন! আমাকে দয়া করুন।"

"একমাত্র শয়তানই জানে আমার জ্বর হয়েছে...মাথাটা ঘুরছে, অথচ ইনি তা বুঝছেন না। এ কাজ আমি করতে পারি না! আমাকে একা থাকতে দিন।"

"কিন্তু আপনি যেতে বাধ্য! আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারেন না। এটা স্বার্থপরতা! প্রতিবেশীর জন্য জীবনটাও দিয়ে দেওয়া উচিত, কিন্তু আপনি.. আপনি যেতে চাইছেন না! আপনার বিরুদ্ধে আমি আইনের আশ্রয় নেব!"

নেলি জানে, সে এমন একটা মিথ্যা বলছে যা অপরকে আঘাত করছে, যা তার প্রাপ্য নয়, কিন্তু স্বামীকে বাঁচাতে সে যুক্তি, কৌশল ও অপরেব প্রতি অনুকম্পা—সব কিছু ভুলে যেতেও রাজী। তার ভীতি প্রদর্শনের জবাবে ডাক্তার ঢক্ ঢক্ করে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে ফেলল। নেলি আবাব অনুনয়-বিনয় শুরু করল, ভিক্ষুকের মত তার কাছে করুণাব আবেদন জানাল। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার সম্মত হল। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, নাকটা ঝাড়ল, গলা পরিস্কাব কবল। তারপব কোটের জন্য হাত বাড়াল।

তাকে সাহায্য করতে নেলি বলল, "এই আপনার কোট! আমি পবিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, চলুন। আপনাকে পারিশ্রমিক দেব...এর জন্য সাবাজীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।"

কিন্তু কী যন্ত্রণা! কোট গায়ে দিয়ে ডাক্তাব আবার শুয়ে পড়ল। নেলি তাকে তুলে ধরে হল পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। গালোশ ও লোমের কোট পবাতে অনেক ধস্তাধ্বস্তি করতে হল। ডাক্তাবেব টুপিটা পাওয়া গেল না। কিন্তু এবাব, শেষ পর্যন্ত নেলি গাড়িতে উঠে বসল, তার পাশেই ডাক্তার। এখন তাদের একমাত্র কাজ চল্লিশ ভার্স্ট গাড়ি চালিয়ে যাওয়া, আর তাহলেই তার স্বামীর চিকিৎসা হবে। পৃথিবীব বুকে অন্ধকার নেমে এসেছে ; কিছুই দেখা যায় না। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। চাকাব নীচে ববফেব ঢিপি। কোচোয়ান মাঝে মাঝেই থামছে আর কোন্ পথ ধরবে তাই ভাবছে।

সাবাপথ নেলি ও ডাক্তার চুপচাপ বসে। ঠাণ্ডা বা ঝাঁকুনি কোনটাই বুঝতে পাবছে না।

"জোবে, আবও জোরে!" নেলি কোচোয়ানকে হুকুম করে।

সকাল পাঁচটা নাগাদ ক্লান্ত ঘোড়াদুটি উঠোনে ঢুকল। পবিচিত ফটক, দণ্ডসমেত পাতকুয়োটা, আস্তাবল ও গোলঘরেব দীর্ঘসারি—সব কিছুই নেলির চোখে পড়ল। অবশেষে বাড়ি।

স্তেপান লুকিচকে খাবাব ঘরেব সোফাটা এগিয়ে দিয়ে সে বলল "অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আসছি। শবীবটা গরম করে নিন ; আমি দেখে আসি সে কেমন আছে।"

এক মুহূর্ত পবে স্বামীব কাছ থেকে ফিরে এসে দেখে ডাক্তার শুয়ে আছে। সোফাতে টানটান হয়ে শুয়ে কি যেন বলছে।

"এই পথে ডাক্তার...ডাক্তাব!"

"এঃ ? দোমনাকে জিজ্ঞাসা কর"...স্তেপান লুকিচ জড়িয়ে জড়িয়ে বলল।

"কি ?"

"কংগ্রেসে তারা এই কথাই বলেছিল.. ভ্লাসভ বলছিল...কে ? কি ?"

তীব্র আতংকের সঙ্গে নেলি বুঝতে পারল যে ডাক্তারও তার স্বামীর মতই বিকারেব ঘোরে কথা বলছে। এখন সে কি কববে ?

স্থিব কবল, "জেমস্তভোব ডাক্তারেব কাছেই যাব"।

তারপর আরো অন্ধকার, আরো তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডা বাতাস আর জমাট বরফের ঢিপি। তার দেহ-মন দুইই বিপর্যস্ত হল, আর প্রতারক প্রকৃতির এমন কোন উপায় বা প্রতারণা নেই যা দিয়ে সেই বিপর্যয়কে ঠেকানো যায়।

তারপর, ধূসর পটভূমিকায় নেলি দেখতে পায়, যে ব্যাংকে তার স্বামীর জমিদারী বন্ধক দেওয়া আছে সেখানে সুদটা পাঠাবার জন্য তার স্বামী প্রতি বসন্তকালে টাকার জন্য হন্যে হয়ে ঘোরে। তার ঘুম নেই, নেলিও ঘুমায় না, আদালতে বেলিফের আগমনকে কি ভাবে রোধ করা যাবে সেই দুশ্চিন্তায় দু'জনই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

নেলি ছেলেমেয়েদেরও দেখতে পায়। আর এখন আছে সর্দি-কাশি, মসূরিকাজ্বর, ডিপ্‌থেরিয়া, বিশ্রী দাগ, বিচ্ছেদের চিরন্তন ভয়...ওই পাঁচ ছ'টি গোলগাল বাচ্চার একটি হয়তো মারাই যাবে।

ধূসর পটভূমি মৃত্যুর হাত থেকেও মুক্ত নয়। সেটা বোঝা যায়। স্বামী ও স্ত্রী একসঙ্গে মরতে পারে না। একজনের কবরের জন্য অপরজনকে বেঁচে থাকতেই হবে। আর নেলি দেখছে, তার স্বামী মরছে। এই ভয়ংকর বিপদের একটি বিস্তারিত ছবি সে আঁকে। শবাধার, পুরোহিত, এমন কি হলঘরে শববাহকদের পায়ের চিহ্ন পর্যন্ত সে দেখতে পায়।

মৃত স্বামীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে শুধায়, "কিসের জন্য? কেন?"

স্বামীর সঙ্গে এতকাল যে জীবনটা কাটিয়েছে তাকে মনে হচ্ছে এই মৃত্যুর একটা অর্থহীন, প্রয়োজনহীন গৌরচন্দ্রিকা মাত্র।

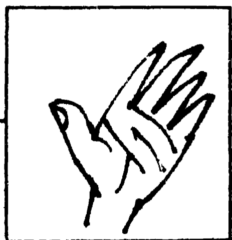
নেলির হাত থেকে কি যেন সশব্দে মেঝেতে পড়ে যায়। সে চমকে ওঠে, লাফ দিয়ে দাঁড়ায়, চোখ দুটি বিস্ফারিত করে তাকায়। দেখে, একটা আয়না তার পায়ের কাছে পড়ে আছে; আর একটা আয়না আগের মতই টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আয়নার দিকে তাকিয়ে আগের মতই টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আয়নার দিকে তাকিয়ে একটি বিবর্ণ অশ্রুসিক্ত মুখ দেখতে পায়। কোন ধূসর পটভূমি আর নেই।

একটা ক্ষীণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে ভাবে, "নিশ্চয় আমার তন্দ্রা এসেছিল।"

১৮৮৫

হাতের কাজ

Artistry



শীতের সকাল।

• বাইস্ত্রায়াংকা নদীর মসৃণ, ঝকঝকে বরফের উপরে দাঁড়িয়ে আছে দুটি মানুষ ঃ শক্ত চেহারার সেবিওঝা আর গিজার্র পাহারাদাব মাৎভেই। সেরিওঝা মানুষটি বেঁটে, অগোছালো, বয়স বছব ত্রিশেক, পা দুটো ছোট ; সে বরফের দিকে তাকিয়ে আছে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে। তার ভেড়ার চামড়ার পুরনো জ্যাকেটের লোমগুলো বেরিয়ে পড়েছে একটা লোমশ কুকুরের মত। তার হাতে একটা ছোট কম্পাস, দুটো লম্বা, সরু লাঠি দিয়ে তৈরী। মাৎভেই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ মানুষ, পরনে ভেড়ার চামড়ার নতুন কোট ও ফেল্ট বুট ; দুটি নরম, নীল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ঢালু উঁচু পারের উপরকার ছোট সুন্দর গ্রামটির দিকে। তার হাতে একটি ভারী সাবল।

মাৎভেইর দিকে রোষদৃষ্টিতে তাকিয়ে সেরিওঝা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে উঠল, ''এই ভাবে কাজকর্ম কিছু না করেই কি আমরা সারাটা দিন দাঁড়িয়ে থাকব ? তুমি কি এখানে বেড়াতে এসেছ, না কাজ করতে এসেছ চাষার পো ?''

মাৎভই চোখ মিটমিট করে থেমে থেমে বলল, ''আরে, তুমি মানে--দেখিয়ে দেবে তো কি করতে হবে—''

''তোমাকে দেখিযে দেব ?—সব সময়ই আমি দেখিয়ে দেব! এটা দেখ! ওটা কর! তোমার নিজের কি কোন বুদ্ধি নেই! কম্পাস দিয়ে মাপ-জোপ করতে হবে, এই তো কাজ! সেটা করা না হলে তো ববফ কাটতে পারব না। অতএব মাপটা করে ফেল! কম্পাসটা হাতে নাও!''

সেরিওঝার হাত থেকে কম্পাসটা নিয়ে মাৎভেই বরফের উপর এলোমেলোভাবে একটা বৃত্ত আঁকার চেষ্টা করতে দুটো কনুইকে যত্রতত্র বরফের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে লাগল। সেরিওঝা দুই চোখ কুঁচকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল ; তার গোলমেলে ভাবভঙ্গী ও অক্ষমতা দেখে ভারী মজা পেয়ে গেল।

সক্রোধে চেঁচিয়ে বলল, ''ইস্ ! এ কাজটাও করতে পার না! গেঁয়ো চাষা কোথাকার! তোমার কাজ হাঁস চরানো, জর্ডন নদী বানানো নয়! কম্পাসটা দাও! আমি বলছি, এখনই দাও।''

মাৎভেইর ঘামে-ভেজা হাত থেকে কম্পাসটা কেড়ে নিয়ে সেরিওঝা বিদ্যুৎ চমকের মত দ্রুত গতিতে অতি সহজেই বরফের উপর একটা বৃত্ত এঁকে ফেলল। অনাগত জর্ডন নদীর সীমানা তৈরী হয়ে গেল ; এখন বরফটা কেটে সরিয়ে ফেলাটাই বাকি...।''

কিন্তু সে কাজে হাত দেবার আগেই সেবিওঝা হম্বিতম্বি শুরু করে দিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত খুঁৎ খুঁৎ করল, দোষ ধরল।

"তোমার জন্য আমি এত কাজ করতে পারব না। গির্জায় কাজ কর তুমি, অতএব এ কাজটাও তুমিই করবে।"

বছরে একবার করে নিজের হাতের কাজ দেখিয়ে সকলকে চমকে দেবার একটা বিরল ক্ষমতা ভাগ্যের কাছ থেকে পেয়েছে বলে যে বিশেষ মর্যাদাটি সে ভোগ করছে তা নিয়ে তাব যেন খুশির অন্ত নেই। নরম মানুষ বেচারি মাৎভেইকে তার অনেক বিষতিক্ত তাচ্ছিল্যকর কথাই শুনতে হয়। সেরিওঝা সেই কাজটিই করতে লাগল তীব্র বিরক্তি ও রাগের সঙ্গে। তাকে কোন রকম বিরক্ত করা চলবে না। বৃত্তটা আঁকা হয়ে গেলেই সে উপরে উঠে গ্রামে চলে যাবে, সেখানে চা খাবে, ঘুরে বেড়াবে, গল্পগুজব করবে।

একটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে সে বলল, "আমি এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসব। আর এদিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাক না গুণে বসবার মত একটা কিছু নিয়ে এস।"

মাৎভেই একেবারে একা। চারদিক ধূসর, শুকনো, বাতাস বইছে না। নদীর তীর বরাবর সারিবদ্ধ কাঠের বাড়িগুলোর মাথার উপর দিয়ে সাদা গির্জাটা যেন মুখ বের করে সকলকে ডাকছে। তার সোনালী ক্রুশেব উপর দিয়ে দাঁড়কাকগুলো অবিশ্রাম ভেসে বেড়াচ্ছে। গ্রামের বাইরে নদীর পাড় যেখানে আবও খাড়া সেখানে একটা নেশাগ্রস্ত ঘোড়া নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত—বোঝা যায় না সেটা ঘুমিয়ে পড়েছে, না দিবাস্বপ্ন দেখছে।

নিশ্চল প্রস্তর-মূর্তির মত দাঁড়িয়ে মাৎভেইও ধৈর্য ধবে অপেক্ষা করে আছে। বিষণ্ণ, ঘুমন্ত ওই নদী, দাঁড়কাকগুলোর বৃত্তাকার চক্রমণ, আর ওই ঘোড়াটা—সবকিছু তাকে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। এক ঘন্টা কেটে গেল, আরও এক ঘন্টা, কিন্তু সেরিওঝার দেখা নেই। সব বরফ সরিয়ে ফেলা হল, বসবার একটা বাক্সও আনা হল। কিন্তু আসল লোকটি এল না। মাৎভেই বসে বসে হাই তুলছে। একঘেয়েমির বিরক্তি কাকে বলে সে জানে না। একটা পুরো দিন, পুরো মাস, বা পুরো বছব তাকে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকতে বলুন, তাই সে করবে।

অবশেষে সারি সারি বাড়িব পিছন থেকে সেরিওঝা দেখা দিল। সে যত না হাঁটছে তার চাইতে টলছে অনেক বেশী। অনেকটা বাস্তা, তাই ঘুরপথ না ধরে সে নেমে আসছে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত একটা সরলবেখাব মত সোজা পথে; কখনও বরফের উপর পড়ছে, কখনও ঝোপ-ঝাড়ে আটকে যাচ্ছে, কখনও চিৎ হয়ে সর্ সর্ করে নেমে আসছে—তবে সবটাই ধীরেসুস্থে, থেমে থেমে।

এসেই মাৎভেইর উপব হম্বিতম্বি শুরু করে দিল, "তোমার ব্যাপার-স্যাপার কি? অকর্মার মত হা করে দাঁড়িয়ে আছ! কাজকর্ম কিছু

নেই ? বরফগুলো কখন কেটে শেষ করবে ?''

মাৎভেই ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে সাবলটা দুই হাতে ধরে বরফ কাটতে শুরু করল সঠিকভাবে বৃত্ত-বরাবর। বাক্সটার উপর বসে সেরিওঝা তার সহকারীর ভারী ও কিম্ভুৎ চালচলন দেখতে লাগল।

হুকুম ঝাড়তে লাগল ঃ ''ধারগুলো আল্‌তোভাবে কাট! খুব সাবধানে! কাজ করতে যদি না পার তো কাজ হাতে নিয়ো না, আর হাতে নিলে সে কাজটা ঠিকমত করবে, বুঝলে মাথামোটা!''

তীরের উপরে লোকের ভিড় জমে গেল। দর্শকদের দেখে সেরিওঝা আরও তেতে উঠল।

একটা দুর্গন্ধযুক্ত বিড়ি ধরিয়ে থুথু ফেলতে ফেলতে বলল, ''এ কাজ আমি করব না, দেখি আমাকে ছাড়া তুমি কেমন করে কাজটা শেষ কর। গত বছর কোন্ এক স্তিয়নকা গুল্‌কভ জর্ডন নদীটা এঁকে দিয়েছিল কোস্তিউকভোতে। আর ফলটা কি হয়েছিল ? একেবারে অশ্বডিম্ব! কোস্তিউকাভোর লোকরা সব দলে দলে এল আমাদের কাছে—শ'য়ে শ'য়ে লোক। সব জায়গা থেকেই লোকজন আসতে লাগল।''

''কারণ একমাত্র আমাদেরটাই হয় সত্যিকারের জর্ডন।...''

''তোমার কাজ কব, বাজে কথার সময় নেই।...হ্যাঁ গো বুড়ো দাদু, সারা দেশে এরকম আর একটা জর্ডন তুমি খুঁজে পাবে না। সৈনিকরা তো বলে, শহরেও এমনটি হয় না। কাজটা সহজ নয়!''

মাৎভেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আর হাঁপায়। কাজটা খুবই শক্ত। বরফটা যেমন শক্ত, তেমনই পুরু। এক এক চাঙড় বরফ সাবল দিয়ে তুলে সঙ্গে সঙ্গে দূরে ফেলে দিতে হবে, যাতে সেখানেই জমে না যায়।

কিন্তু কাজটা যত কঠিনই হোক আর সেরিওঝার নির্দেশগুলো যত অর্থহীনই হোক, বিকেল তিনটে নাগাদ নদীর বুকে আপনি দেখতে পাবেন কালো জলের একটা বড় বৃত্ত।

''গত বছর আরও ভাল হয়েছিল! কাজটা তুমি ভালভাবে করতেই পার না হে মাথামোটা!'' সেরিওঝা গরম হয়ে বলল। ''তোমার মত হাঁদা লোকদের কেন যে গির্জায় কাজ দেওয়া হয়। এবার যাও, কাঠের গজাল বানাবার জন্য একখানা তক্তা নিয়ে এস। আরে মূর্খ, বেড়টা নিয়ে এস। সেই সঙ্গে রুটি ও একজোড়া কাঁকুড়ও এনো।''

মাৎভেই চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এল নানা রঙে সচিত্র একটা মস্ত বড় কাঠের বেড় কাঁধে নিয়ে। সেই বেড়ের মাঝখানে একটা লাল ক্রুশ রয়েছে, আর সেই ক্রুশের প্রান্তগুলিতে আছে গজাল বসাবার মত ছিদ্র। সেরিওঝা বেড়াটাকে নিয়ে বরফের গর্তটার মাথায় বসিয়ে দিল।

''ঠিক আছে...এতেই হবে...আর একটু রং বুলিয়ে দিলেই খাসা হবে। ওখানে হা করে দাঁড়িয়ে থেকো না! বেদিটা বানিয়ে ফেল। আর না হয় ক্রুশ বানাবার মত কিছু কাঠের টুকরো নিয়ে এস।...''

সেই সকাল থেকে মাৎভেই কিছুই খায় নি। সে আবার নদীর তীর বেয়ে উঠতে লাগল। স্বয়ং আল্‌সে হলেও গজালগুলো সে নিজের হাতে নিজেই বানাতে লাগল। সে জানে, এই গজালগুলি বিস্ময়কব কাজ করার ক্ষমতা রাখে। পবিত্র বাড়ির আশীর্বাদের পরে যার কপালে একটি গজাল জুটবে, বৎসরের বাকি দিনগুলিতে ভাগ্য তার প্রসন্ন হবে। অতএব এটা কোন বৃথা কাজ নয়, তাই নয় কি ?

কিন্তু আসল কাজ শুরু হল পরদিন। আর তখনই মূর্খ মাৎভেইর সম্মুখে সেরিওঝা আত্মপ্রকাশ করে তার মহৎ প্রতিভার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে। তার ছিদ্রান্বেষণ, খুঁতখুঁতুনি, খেয়ালিপনা ও কল্পনাব যেন শেষ নেই। দুটো বড় কাঠের টুকরো দিয়ে মাৎভেই একটা বড় ক্রুশ বানাল। সেটা সেবিওঝার পছন্দ হল না, সে তাকে ওটা আবার বানাতে বলল। মাৎভেই যখন নতুন করে কাজ শুরু করল না তখন সেরিওঝা রেগে তাকে অন্যত্র চলে যেতে বলল; আবার সে যখন অন্যত্র চলে গেল তখন সেরিওঝা চীৎকার করে মাৎভেইকে বলল, সে যেখানে ছিল সেখানেই থাকুক। যন্ত্রপাতি, আবহাওয়া, বা নিজের প্রতিভা, কোন কিছু নিয়েই সে সন্তুষ্ট নয়; কিছুই তাকে খুশি করতে পারে না।

মাৎভেই বেদির জন্য একটা বড় রকমেব চাঙড় কেটে তুলল।

তার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে সেরিওঝা চীৎকার করে বলে উঠল, "কোণাটা ভেঙে ফেললে কেন ? আমি জানতে চাই, কোণাটা তুমি কেন ভাঙলে ?"

"ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার নামে দয়া করে আমাকে ক্ষমা কর।"

"আর একটা কেটে তোল।"

মাৎভেই আর একটা চাঙড় কেটে তুলল। ...এইভাবে একের পব এক চলতে লাগল। রং-করা কাঠের বেড়টা দিয়ে বরফের যে গর্তটাকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে তার পাশেই বেদিটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে, তার উপরেই কেটে তুলতে হবে একটা ক্রুশ ও একখানি খোলা "সুসমাচাব"। কিন্তু সেটাই শেষ নয়; বেদীর পিছন দিকে থাকবে একটা উঁচু ক্রুশ, যেটা সমবেত সকলেই দেখতে পাবে, সূর্যকিরণে সেটা এমন ঝলমল করতে থাকবে যেন সেটা হীরে ও চুনি দিয়ে মোড়া। ক্রুশের উপরে থাকবে বরফের ভিতব থেকে কেটে তোলা একটা ঘুঘু পাখি। গির্জা থেকে জর্ডন পর্যন্ত পথটাতে ছড়ানো থাকবে দেবদারু ও জুনিপারের হরিৎ শাখা। এ সব কিছুই ফুটিয়ে তুলতে হবে হাতের কাজে।

প্রথমেই সেবিওঝা বেদিটা বানাতে শুরু করে। উখা, বাটালি ও কাটা নিয়ে কাজ করতে থাকে। বেদিটার উপর ক্রুশ, "সুসমাচার" আর আলুলায়িত আলখাল্লার কাজটা বেশ ভালই ফুটিয়ে তোলে। তারপর শুরু করে ঘুঘু গড়ার কাজ। সে যখন ঘুঘু পাখির মুখে মৃদু স্বভাব ও বিনম্র জ্ঞানের ভাবটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় রত তখন একটা ধীরগতি ভাল্লুকের

মত মাৎভেই কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরী ক্রুশটার কাজ শেষ করে সেটাকে নিয়ে জলে ডুবিয়ে রাখে। যখন ক্রুশের উপরকার জলটা জমে যায় তখন সে আবার সেটাকে জলে ডুবিয়ে রাখে ; এই একই কাজ সে বার বার করতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত কাঠের টুকরোগুলোর উপর বরফের এক পুরু আস্তরণ না পড়ে।...কাজটা বেশ শক্ত ; তাতে শারীরিক শক্তি এবং ধৈর্য দুইয়েরই প্রয়োজন।

কিন্তু জটিল কাজটা এতক্ষণে শেষ হল। এবার সেরিওঝা পাগলের মত গ্রামের পথে পথে ছুটতে লাগল ; হোঁচট খেতে খেতে, গালাগালি করতে করতে আর দিব্যি করতে করতে সে নদীতে নেমে যাবে, আর নিজের হাতের কাজটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলবে। সে সঠিক রংটা খুঁজতে লাগল।

তার পকেট-ভর্তি গিরিমাটি, নীল সিন্দুর ও সবুজ রং ; একটা পেনিও না দিয়ে সে একটা দোকান থেকে ছুটে বেরিয়ে আর একটা দোকানে ঢুকে যায়। সে দোকান থেকে শুঁড়িখানাটা একেবারে হাতের কাছে ; সেখান থেকে কিছু একটা নিয়ে কোন দাম না দিয়েই হাত নাড়তে নাড়তে দ্রুতপায়ে পথে নামে। একটা বাড়ি থেকে বীটপালং বাগিয়ে নেয়, আর এক বাড়ি থেকে পেঁয়াজ, আর তা থেকে হলুদ রং বানায়। সে দিব্যি করে, ধাক্কা মারে, ভয় দেখায়...আর একটা মানুষও পাল্টা আক্রমণ করে না। সকলেই তাকে দেখে হাসে, পরামর্শ দেয়, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে ডাকে সেগেই নিকিতিচ বলে। সকলেই বোঝে তার এই শিল্পকর্ম কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, জনসাধারণের সামাজিক সম্পদ। একটি মানুষ সেটা সৃষ্টি করে, অন্য সকলে তাকে সাহায্য করে। সেরিওঝা একটি অলস, মাতাল, অকর্মা, কিন্তু একটা লাল রং বা কম্পাস হাতে নিলেই সে একজন কেউকেটা হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে প্রভুর সেবক।

খৃস্টের আবির্ভাব-দিবসের সকাল। গির্জার প্রাঙ্গণ ও নদীর দুই তীর অনেক দূর পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য। জর্ডনের অংশীভূত যে কোন জিনিসকেই বাকলের নতুন মাদুর দিয়ে সযত্নে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। নিজের উত্তেজনা গোপন করার চেষ্টায় সেরিওঝা মাদুরের পাশ দিয়ে শান্তভাবে হাঁটছে। হাজার হাজার মানুষকে সে দেখতে পাচ্ছে ; অন্য সব গ্রাম থেকেও বহু লোক এসেছে। এই সব মানুষ মাইলের পর মাইল হেঁটে এসেছে তার বিখ্যাত জর্ডন দেখতে। মাৎভেই তার অপটু হাতে ভালুকের মত কাজটা শেষ করে গির্জায় ফিরে এসেছে। তার দর্শনও মিলছে না। কথাও শোনা যাচ্ছে না। সকলেই তাকে ভুলে গেছে।...দিনটা পরিষ্কার।...আকাশে কণামাত্র মেঘও নেই। উজ্জ্বল রোদ।

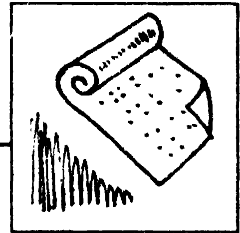
নদীর তীরের উপরে গির্জার ঘন্টাগুলি বাজতে শুরু করেছে...হাজার হাজার মাথা খোলা, হাজার হাত নড়ছে, ক্রুশ চিহ্ন আঁকছে।

সেরিওঝার ধৈর্য আর বাঁধ মানছে না! কিন্তু অবশেষে ঘন্টাগুলি বেজে

উঠল ''সময় হয়েছে''...তারপর আধা ঘন্টা পরে জনতার মধ্যে এবং ঘন্টা-ঘরের মাথায় হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। ঘন্টাগুলির সানন্দ দ্রুত ধ্বনির তালে তালে গির্জা থেকে একে একে বেরিয়ে এল পতাকার পর পতাকা। কম্পিত হাতে সেরিওঝা মাদুরটাকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিল...আর জনতা দেখতে পেল একটা অসাধারণ দৃশ্য। বেদিটা, কাঠের বেড়টা, গজালগুলি এবং ক্রুশটা বহু বিচিত্র বর্ণে ঝল্‌মল্‌ করছে। ক্রুশ ও ঘুঘুটা থেকে এত উজ্জ্বল আলোক-রেখা বিকীর্ণ হচ্ছে যে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে....দয়াময় প্রভু, এ কী সুন্দর দৃশ্য! জনতার মধ্যে বিস্ময়ের অস্পষ্ট গুঞ্জন ও আনন্দ যেন ঢেউ খেলতে লাগল; গির্জার ঘন্টা-ধ্বনি উচ্চতর হতে লাগল, দিনটা হয়ে উঠল উজ্জ্বলতর। জনতার মাথার উপর দিয়ে পতাকাগুলি যেন ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে আর উড়ছে। গির্জার শোভাযাত্রা সোনা ও রূপোর ঝক্‌ঝকে বিগ্রহের এবং পুরোহিতদের ঝল্‌মলে পোশাকের দীপ্তি ছড়িয়ে ধীরে ধীরে পথ চলে জর্ডনের দিকে বাঁক নিল। অনেক হাতের ইসাবায় ঘন্টা-ঘরের বাজনা বন্ধ হয়ে গেল, আর শুরু হল ''পবিত্র বারির আশীর্বাদ''। পুরোহিতরা ধীর গম্ভীরভাবে অনুষ্ঠান চালাতে লাগল, যেন এই সামাজিক প্রার্থনার পবিত্র আনন্দকে দীর্ঘায়িত করতেই চেষ্টা করছে। সর্বত্র স্তব্ধ নীরবতা।

কিন্তু তারপরেই ক্রুশটিকে জলে ডোবানো হল; কামান গর্জনের কান-ফাটা আওয়াজ বাতাসে ধ্বনিত হতে লাগল; ঘন্টা বেজেই চলল; আনন্দের সোল্লাস ধ্বনি ও চীৎকারের সঙ্গে ভিড়ের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল গজালগুলো হাত করতে। সেরিওঝা কান পেতে তাদের কল-ধ্বনি শুনল, দেখল হাজার হাজার চোখের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ, তার মন্থর অন্তরটা ভরে উঠল গৌরবের ও উল্লাসের অনুভূতিতে।

১৮৮৬



ব্যর্থ পরিকল্পনা

The Plan That Failed

ইলিয়া সের্গেইচ পেপ্‌লভ ও তার বৌ ক্লিওপাত্রা পেত্রভ্‌না দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে কান পেতে ছিল। দরজার অপর দিকে ছোট ড্রয়িং-রুমটায় তখন তাদের মেয়ে নাতাশা ও মিউনিসিপ্যাল শিক্ষক শুপকিনের মধ্যে চলছিল প্রণয়-বিনিময়ের সংলাপ।

পেপ্‌লভ অধৈর্য হয়ে কাঁপতে কাঁপতে এবং দুই হাত মুছতে মুছতে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, ''ও তো টোপ গিলছে! শোন পেত্রভ্‌না, যেই তারা ভালবাসার কথা বলতে শুরু করবে অমনি আমরা দেয়াল থেকে বিগ্রহটি নিয়ে ঘরে ঢুকে তাদের আশীর্বাদ করব।...ওদের একেবারে হাতে-হাতে ধরে

ফেলব...বিগ্রহের সামনে আশীর্বাদ একটি পবিত্র কাজ এবং অবশ্য পালনীয়...সেক্ষেত্রে আদালতে গেলেও বাছাধন হাত ফস্‌কে বেরিয়ে যেতে পারবে না।''

ইতিমধ্যে ড্রয়িং-রুমে নিম্নলিখিত সংলাপ চলছে ঃ

নিজের চেক-কাটা প্যান্টে দেশলাইয়ের কাঠিটা জ্বালিয়ে নিয়ে শুপ্‌কিন বলছে, ''তোমার চরিত্র নিয়ে কোন কথাই নয়। তোমাকে তো আমি একটা চিঠি পর্যন্ত লিখি নি!''

হাতের আয়নায় নিজেকে বার বার দেখতে দেখতে মেয়েটি মুচ্‌কি হেসে বলল, ''বটে, কোন দিন না! আমি যেন তোমার হাতের লেখাটা চিনি না! আমি তো সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পেরেছিলাম! অদ্ভুত মানুষ তো তুমি! হস্তলিপির শিক্ষক, অথচ তোমার হাতের লেখা যেন কাকের ঠ্যাং—বকের ঠ্যাং! নিজের হাতের লেখা এত খারাপ হলে তুমি ছেলেমেয়েদের হস্তলিপি শেখাও কেমন করে?''

''হুম! ও কথার কোন মানেই হয় না। হস্তলিপি শেখার ব্যাপারে লেখাটাই আসল কথা নয়, আসল কথাটা হল, ছাত্ররা যাতে নিজেদের ভুলে না যায় সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া। রুলকাঠ দিয়ে মাথাটা ঠুকে দিয়ে এটা শেখানো, হাঁটুতে ঠুকে দিয়ে ওটা শেখানো...হস্তলিপির বেলায় এর চাইতে বড় কথা আর কি আছে? নেক্রাসভ একজন লেখক ছিলেন, কিন্তু তাঁর হাতের লেখার যে কী ছিরি ছিল তা না দেখলে বুঝতে পারবে না। তাঁর গ্রন্থ-সংগ্রহের পাতায় সে-লেখার অনেক অবিকল প্রতিলিপি আছে।''

''তিনি নেক্রাসভ, কিন্তু তুমি....(দীর্ঘশ্বাস) ঃ একজন লেখককেই তো আমি বিয়ে করতে চাই। সে সারাক্ষণ আমার জন্য কবিতা লিখবে!''

''তুমি যদি কবিতাই চাও, সে তো আমিও তোমার জন্য লিখতে পারি।''

''তুমি কি নিয়ে লিখতে পার?''

''ভালবাসা নিয়ে...হৃদয়ের অনুভূতি নিয়ে...তোমার দুটি চোখ নিয়ে...শুনলে তুমি পাগল হয়ে যাবে। কাঁদতে শুরু করবে! কিন্তু আমি যদি তোমাকে নিয়ে কাব্য রচনা করি, তাহলে কি তোমার হাতে একটি চুমো খেতে দেবে?''

''সেটা আর বড় কথা কি? ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তেই তো সে কর্মটি করতে পার।''

শুপ্‌কিন চোখ গোল গোল করে লাফিয়ে উঠে ডিম-সাবানের গন্ধমাখা ফুলো-ফুলো হাতটা চেপে ধরল।

উত্তেজনায় বিবর্ণ হয়ে, কনুই দিয়ে বৌকে খোঁচা মেরে, আর নিজের জামার বোতামগুলি এঁটে নিয়ে পেপ্‌লভ হিস্‌হিসিয়ে বলে উঠল, ''বিগ্রহ নামিয়ে আন। চল ঢুকে পড়ি! চলে এস!''

আর এক সেকেণ্ড সময়ও নষ্ট না করে পেপ্‌লভ দরজাটা সপাটে খুলে

ফেলল।

দুই হাত তুলে ভীষণভাবে চোখ মিট্‌মিট্‌ করে থেমে থেমে বলতে লাগল, ''বাছারা....প্রভু তোমাদের আশীর্বাদ করুন....তোমরা সুখে থাক...ফল লাভ কর. .বংশবৃদ্ধি কর...''

অনেক সুখে কাঁদতে কাঁদতে মা বলল, ''আমিও...তোমাদের আশীর্বাদ করছি...বাছারা আমার, তোমরা সুখী হও!'' শুপ্‌কিনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ''আহা, আমার একমাত্র মানিকটিকে তুমি নিয়ে যাচ্ছ! আমার মেয়েকে ভালবেসো, তাকে করুণা করো...''

ভয়ে ও বিস্ময়ে শুপ্‌কিন হা করে তাকিয়ে রইল। বাবা-মার আক্রমণটি এতই আকস্মিক ও জোরালো যে একটা কথাও তার মুখ থেকে বের হল না।

আতংকে বিবশ হয়ে সে ভাবল, ''আমি ফাঁদে পড়ে গেছি! ওরা আমাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে! আজ তোমার মরণ হে ছোকরা! পালাবার কোন পথ নেই!''

সে বিনীতভাবে মাথা নত করল; যেন বলতে চাইল ঃ ''আমাকে ধরুন, আপনাদেরই জয় হয়েছে!''

''আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি...'' বলতে বলতে বাবাও কেঁদে ফেলল। ''আমার আদরের দুলালী নাতাসা, ওর পাশে দাঁড়াও। বিগ্রহটি আন পেত্রভ্‌না...''

কিন্তু এইখানে বাবা হঠাৎ কান্না বন্ধ করল। তার মুখ রাগে বিকৃত হয়ে উঠল।

সক্রোধে বৌকে বলল, ''বোকা রাজহংসী কোথাকার! মাথামোটা! এটা কোন্‌ ধরনের বিগ্রহ?''

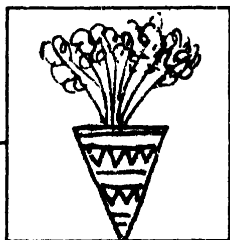
''ওঃ, আমার সন্ন্যাসিনী মাসি!''

ব্যাপারটা কি ঘটল? হস্তলিপির শিক্ষক ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে তাকাল, আর দেখেই বুঝল সে বেঁচে গেছে ঃ বিগ্রহের পরিবর্তে মা ভুল করে নামিয়ে এনেছে লেখক লাঝেচ্‌নিকভের একটা তৈলচিত্র। বুড়ো পেপ্‌লভ ও তার বৌ ক্লিওপাত্রা পেত্রভ্‌না ছবিটা হাতে নিয়ে অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইল; কি করবে বা বলবে কিছুই বুঝতে পারল না। সেই গোলমালের সুযোগে হস্তলিপির শিক্ষকটি প্রিয় প্রাণটি বাঁচাতে পালিয়ে বাঁচল।

১৮৮৬

প্রথম আবির্ভাব

First Debut



একটি ছোট গল্প

সহকারী উকিল প্যাতিয়কিন একটা সাধারণ চাষীদের গাড়িতে চেপে এন.-এর জেলা-কেন্দ্র থেকে ফিরছিল। সেখানে সে গিয়েছিল আগুন লাগাবার অপরাধে অভিযুক্ত এক দোকানির পক্ষ সমর্থন করতে। তার মন-মেজাজ যতদূর সম্ভব খারাপ। নিজেকে বড়ই অপমানিত, লজ্জিত, পুরোপুরি ব্যর্থ মনে হচ্ছে। তার নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মেছে, বিগত দিনটা, তার বহু-প্রতীক্ষিত, বহু-প্রত্যাশার আবির্ভাব-দিনটা তার জীবনটাকে, মানুষের উপর তার বিশ্বাসকে, জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিকোণটিকেই চিরদিনের মত পঙ্গু করে দিয়েছে।

প্রথমত, আসামী নিজেই তাকে অন্যায়ভাবে, নিষ্ঠুরভাবে প্রতারিত করেছে। বিচারের আগে দোকানিটি এমন আন্তরিকতার সঙ্গে চোখ মিটমিট করেছে আর নিজের নির্দোষিতাকে এতই সরল ও খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করেছে যে তার বিরুদ্ধে আনা সব সাক্ষ্য-প্রমাণই এই মনোবিজ্ঞানী ও মুখ দেখে চরিত্র নির্ণয় বিজ্ঞানীটির (তরুণ উকিলটি নিজেকে সেই রকমই মনে করে) চোখে স্পষ্টতই বানাট, ছিদ্রান্বেষপ্রসূত ও অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছে। বিকারের সময় অবশ্য দোকানিকে দেখে মনে হয়েছে যে একটি দুর্বৃত্ত, ঠক, আর বেচারি প্যাতিয়র্কিনের মনোবিজ্ঞানের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট।

দ্বিতীয়ত, প্যাতিয়ার্কিনের নিজেরই মনে হয়েছে যে বিচার চলা কালে সে অসম্ভব রকমের সব আচরণ করেছে—তো-তো করেছে, সূত্র হারিয়ে ফেলেছে, সাক্ষীদের সামনে লম্ফজম্ফ করেছে এবং হাস্যকরভাবে চোখ-মুখ লাল করেছে। নিজের জিহ্বা তার কথা শোনে নি, সরল কথাকে এমন চিবিয়ে-চিবিয়ে বলেছে যেন তার জিবটাই বাঁকা। সওয়াল করেছে বিস্ময়ের ঘোরে লেঙ্চে-লেঙ্চে, জুরিদের মাথার উপর দিকে তাকিয়ে কথা বলার সময়ই তার মনে হয়েছিল যে জুরিমহোদয়গণ ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতেই তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

তৃতীয়ত, আর এটাই সব চাইতে দুঃখের, বাদী ও ফরিয়াদী (তিনি একজন বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ উকিল) দু'জনেরই আচরণ ব্যবসায়িক রীতিবিরুদ্ধ। মনে হয়, তারা দু'জন স্থির করেই এসেছিল যে ফরিয়াদীর কৌসুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে চলবে; যদিও তারা তার দিকে তাকাবার ভান করেছিল কিন্তু সেক্ষেত্রেও তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাকে নাস্তানাবুদ

করা। তাকে নিয়ে মস্করা করা ও সম্মানহানিকর কিছু বলা। তাদের কথাবার্তায় ব্যঙ্গ ও অনুকম্পার সুর ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। ফরিয়াদী পক্ষের কৌসুলি যে এত বড় আকাট মূর্খ ও নির্বোধ সেজন্য তাদেরই ক্ষমাপ্রার্থী বলে মনে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত প্যাতিয়র্কিন এ সব সহ্য করতে পারে নি। বিরতির সময় সে কাঁপতে কাঁপতে ফরিয়াদীর কাছে ছুটে গিয়েছিল ; তাকে বলেছিল, তিনি তাকে কি ভেবেছেন। তারপর মামলাটা শেষ হয়ে গেলে সে সিঁড়ির উপরেই বাদীকে ধরে নিজের মনোভাব জানিয়ে দিয়েছিল।

চতুর্থত...কিন্তু যে সব বিষয় আমার নায়কের অন্তরকে কুরে কুরে খাচ্ছিল তার একটা ফিরিস্তি তৈরী করতে হলে আমাকে তো পঞ্চমত ও ষষ্ঠত থেকে একেবারে শততে পৌঁছতে হয়...

গাড়িতে বসে লোমের কলারে কানদুটো ঢেকে সে সখেদে বলে উঠল, "এটা অপমানকর, বিরক্তিকর। আজই শেষ! আইন ব্যবসা উচ্ছন্নে যাক! এ সব কিছু ছেড়ে আমি চলে যাব কোন চমৎকার নির্জন স্থানে এই সব ভদ্রলোক ও তাদের ঠেলাঠেলি থেকে অনেক দূরে।"

চেঁচিয়ে গাড়োয়ানকে বলল, "ওহে আল্‌সের গুরুঠাকুর, একটু জোরে চালাও! যে কেউ ভাববে তুমি একটা শবাধার নিয়ে চলেছ। একটু জোরে চালাও।"

গাড়োয়ান তাকে নকল করে বলল, "একটু জোরে চালাও! রাস্তাটার কি হাল তা দেখতে পাচ্ছেন না? এ রকম রাস্তায় গাড়ি চালাবার আগে স্বয়ং শয়তানকেও দু'বার ভাবতে হবে। এই আবহাওয়া তো স্বয়ং প্রভুরই দণ্ডস্বরূপ।"

আবহাওয়া সত্যি ভয়াবহ। মনে হচ্ছে সে যেন প্যাতিয়র্কিনের মতই ফুঁসছে, ঘৃণা করছে আর কষ্ট পাচ্ছে। নিকষ কালো অন্ধকারে একটা ঠাণ্ডা ভেজা বাতাস বয়ে চলেছে আর স্বরগ্রামের সবগুলি সুর বেজে উঠছে। বৃষ্টি পড়ছে। বরফ ও নরম কাদা মেশামেশি হয়ে চাকার নীচে আর্তনাদ করছে। পথে অনেক চাকার দাগ, খানাখন্দ ও ভাঙা সেতু।

গাড়োয়ান বলেই চলল, "ঘুরঘুট্টি আঁধার, সকালেও সেখানে পৌঁছতে পারব না। তার চাইতে লুকার বাড়িতে রাতটা কাটালেই ভাল হবে।"

"সে আবার কে?"

"এক বুড়ো—আমাদের পথেই বনের মধ্যে বাস করে। বনরক্ষীর বদলে তাকেই রাখা হয়েছে। ঐ তো তার বাড়িটা দেখা যাচ্ছে।"

একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠল। পত্রহীন গাছের ডালপালার ভিতর দিয়ে একটা মৃদু আলো ঝিলিক দিল। একটা মানুষ যতবড় মানবদ্বেষীই হোক আঁধার রাতে বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালাতে সেও যদি বনের মধ্যে একটা আলো দেখতে পায় তাহলে মানুষের সঙ্গ তাকে আকর্ষণ করবেই। আর প্যাতিয়র্কিনের বেলায়ও তাই ঘটল। একটিমাত্র জানালায় ভীরু আলোর স্বাগত আহ্বান জানানো কাঠের বাড়িটার পাশে গাড়িটা যখন থামল তখন সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ছোট ঘরটার মধ্যে দাঁড়িয়ে লুকা দুই হাতে পেট চুলকোচ্ছিল। তাকেই সে ঘনিষ্ঠ সুরে বলল, ''শুভ দিন বুড়োদাদা! এখানে কি রাতটা কাটাতে পারি?''

লুকা তো-তো করে বলল, ''হ্যাঁ মশায়, আগেই দু'জন এসেছে! এই দিকে চলে যান...''

প্যাতিয়র্কিন মাথাটা নুইয়ে ঘরে ঢুকল আর...তার মানববিদ্বেষ পুরোমাত্রায় তাকে পেয়ে বসল। একটা ছোট টেবিলে চর্বি-বাতির আলোয় যে দুটি লোক বসেছিল তারাই আজ তার মেজাজটাকে খিঁচড়ে দিয়েছে ঃ সরকারী কৌসুলি ভন পাক আর ফরিয়াদী সোমচ্‌কিন। প্যাতিয়র্কিনের মত তারাও এন. থেকে ফেরার পথে লুকার বাড়িতে রাতটা কাটাচ্ছে। প্যাতিয়র্কিনকে ঘরে ঢুকতে দেখে সানন্দ বিস্ময় প্রকাশ করে দু'জনেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বলল, ''প্রিয় সহকর্মী, আপনি এখানে কেন? খারাপ আবহাওয়াই কি আপনাকে এখানে তাড়িয়ে এনেছে আশ্রয়ের জন্য? তাহলে দয়া করে বসে পড়ুন।''

প্যাতিয়র্কিনের নিশ্চিত ধারণা ছিল যে তাকে দেখামাত্রই এই দুটি লোক থতমত খেয়ে কেটে পড়বে, তার সঙ্গে একটা কথাও বলবে না। কাজেই খুব কম করে বললেও তাদের এই বন্ধুত্বপূর্ণ সাদর সম্ভাষণকে নিছক ধৃষ্টতা বলেই তার মনে হল।

মর্যাদাপূর্ণভাবে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে সে কোনরকমে বলল, ''আমি বুঝতে পারছি না...আমাদের মধ্যে যা ঘটে গেছে তারপরেও...আমি...আমি একেবারে স্তম্ভিত।''

ভন পাক বিস্মিত দৃষ্টিতে প্যাতিয়র্কিনের দিকে তাকাল, নিজের কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর সেমেচ্‌কিনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বাধাপ্রাপ্ত আলোচনাটাই আবার শুরু করল ঃ

''তাহলে বিবৃতিটাই পড়ি। সেটা স্ববিরোধিতায় ভর্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ জেলা পুলিশ-অফিসার লিখেছেন, মৃত চাষী রমণী আইভানভ্‌না পাড় মাতাল অবস্থায় অতিথিদের ফেলে চলে গিয়েছিল আর তিন মাইল পায়ে হেঁটে যাবার পরে মারা গেল। কিন্তু সে যদি পাড় মাতালই হবে তাহলে তিন মাইল পথ হেঁটে গেল কেমন করে? অ্যা?''

ভন পাক যখন এইভাবে বকতে লাগল তখন প্যাতিয়র্কিন একটা বেঞ্চিতে বসে তার অস্থায়ী বাসস্থানকে ভাল করে দেখতে লাগল।...বনের মধ্যে একটি বাতি দূর থেকেই কাব্যময়। কাছে গেলে সেটা শোচনীয় রকমের গদ্য। এখানে সে বাতিটা আলো ফেলেছে বাঁকা দেয়ালওয়ালা একটা ছোট অপরিচ্ছন্ন ঘরে ও কালি-মাখা সিলিং-এ। ডান দিকের কোণে ঝোলানো আছে একটি ময়লা বিগ্রহ। বাঁ দিকে আছে একটা ভারী স্টোভ। সিলিং-এর কড়ি-কাঠ বরাবর একটা লম্বা দণ্ড আটকানো আছে; একসময় তা থেকে

দোলনা ঝোলানো থাকত। আসবাবপত্রের মধ্যে আছে একটা জোড়াতালি দেওয়া টেবিল আর দুটো সরু ছোট বেঞ্চি। ঘরটা অন্ধকার, গুমোট ও ঠাণ্ডা। ঘরময় পুরনো জিনিস ও পোড়া চর্বির গন্ধ।

শত্রুদের দিকে তাকিয়ে প্যাতিয়র্কিন মনে মনে বলল, ''শুয়োরের বাচ্চা! ওরা মানুষকে অপমান করে, তাকে কাদায় ফেলে পায়ে মাড়িয়ে যায়। আর তারপর এমন ভাবে কথা বলে যেন কিছুই হয় নি।''

সে লুকাকে বলল, ''শুনুন, আপনার কি আর কোন ঘর নেই? এখানে আমি থাকতে পারব না।''

''লবিটা আছে স্যার। কিন্তু সেটা বড় ঠাণ্ডা।''

''শয়তানী ঠাণ্ডা...'' সেরেচ্‌কিন বলে উঠল। ''আগে জানা থাকলে তাস নিয়ে আসতাম। কিছু পানীয় নিয়ে আসতাম। এখানে হয়তো চা-টা মিলবে। কি বুড়ো, সামোভারটা উনুনে চড়ানো হবে কি?''

আধা ঘন্টা পরে লুকা নিয়ে এল একটা নোংরা সামোভার, নলের মুখ ভাঙা একটা কেটলি ও তিনটে কাপ।

ভন পাক বলল, ''চা তো পেলাম, এবার দরকার চিনি...খানিকটা চিনি নিয়ে এস হে বুড়োখোকা!''

লুকা কপট হেসে বলল, ''কি চাইলেন? চিনি?...বনের মধ্যে ঢুকে চিনি চাইছেন? এটা শহর নয়।''

ভন পাক বলল, ''ঠিক আছে! চিনি ছাড়াই আমরা চালিয়ে নেব।''

সেমেচ্‌কিন চা তৈরী করে তিনটে কাপে ঢালল।

প্যাতিয়র্কিন ভাবল, ''ওরা আমার জন্যও এক কাপ ঢেলেছে...কী আস্পর্দ্ধা! প্রথমে তোমার মুখে থুথু ছিটিয়ে তারপর বাড়িয়ে দিচ্ছে এক কাপ চা। এই লোকগুলোর অহংবোধ বলে কিছু নেই। লুকার কাছে আর এক কাপ চাইব আর গরম জলই খাব। তাছাড়া আমার কাছে খানিকটা চিনিও আছে।

লুকার কাছে চতুর্থ কাপ ছিল না। প্যাতিয়র্কিন তৃতীয় কাপ থেকে চা ঢেলে নিয়ে গরম জল ঢেলে ভরে নিল; একটুকরো চিনিতে কামড় দিতে দিতে চায়ে চুমুক দিতে লাগল। কামড়ের জোরালো শব্দ শুনে তার শত্রুরা দৃষ্টিবিনিময় করে মুখ টিপে হাসতে শুরু করল।

ভন পাক ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, ''কী হাসির কথা বল! আমাদের চিনি নেই আর ওর চা নেই...হি হি!...একটা ধাঁধা যেন। কিন্তু লোকটা কী দাম্ভিক অথচ তুচ্ছ!...আসলে তো ঠ্যাংসর্বস্ব, কিন্তু চাল-চলনে যেন এক রসময়ী তরুণী। আমাদের চায়ের দিকে নাক বাড়িও না বন্ধু,'' সে প্যাতিয়র্কিনের দিকে তাকিয়ে বলল। ''এটা সস্তার চা নয়...আর এটা খেতে যদি তোমার অহংকারে বাধে তাহলে বিনিময়ে আমাদের খানিকটা চিনি দিতে পারতে।''

প্যাতিয়র্কিন কিছুই বলল না।

ভাবতে লাগল, ''কী আস্পর্দ্ধা! ওরা তোমাকে অপমান করবে, অপদস্থ করবে, তার পরেও তোমাকে একলা থাকতে দেবে না! আদালতে আমি যে সব কথা বলেছি তাকে তো ওরা ছেড়ে কথা বলে নি...আমি ওদের দিকে তাকাব না...চুপচাপ শুয়ে পড়ব—''

স্টোভের পাশে মেঝের উপর ভেড়ার চামড়ার একটা কোট পেতে দেওয়া হল। মাথার দিকে খড়ভর্তি একটা লম্বা বালিশ। প্যাতিয়র্কিন ভেড়ার চামড়ার উপর শুয়ে বালিশে মাথা রাখল আর নিজের লোমের কোটটা গায়ে দিল।

সেমেচকিন হাই তুলে বলল, ' কী বিরক্তিকর! এত ঠাণ্ডা আর অন্ধকার যে কিছুই পড়া যায় না. ঘুমবার জায়গাও নেই—বর্‌র্‌। বল তো ওসিপ ওসিপোভিচ, লুকা যদি একটা রেস্তোরাঁতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে তার দাম না দেয় তো তাকে কি বলে ঃ চুরি না জোচ্চুরি ?''

''কোনটাই না...তার বিরুদ্ধে একটা দেওয়ানী মামলা ঠুকে দেবার মত কারণ হত মাত্র!''

এর থেকেই শুরু হল প্রায় দ'ঘন্টাব্যাপী এক বিতর্ক। তা শুনে প্যাতিয়র্কিন রাগে কাঁপতে লাগল...প্রায় পাঁচবার সে প্রায় লাফিয়ে উঠে সেই বিতর্কে যোগ দিল।

সে ফোঁস ফোঁস করে বলল, ''যত বাজে কথা! লোক দুটি একেবারে সেকেলে আর যুক্তির ধার ধারে না।''

বিতর্কের শেষে ভন পাক প্যাতিয়র্কিনের পাশেই শুয়ে পড়ে তার কোটটা নিজের গায়ে টেনে নিয়ে বলল ঃ ''যথেষ্ট হয়েছে!...আমাদের তর্কাতর্কিতে ভদ্রলোকের ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে। শুয়ে পড়!''

প্যাতিয়র্কিনের অপর পাশে শুয়ে পড়ে সেমেচকিন বলল, ''মনে হচ্ছে ও ঘুমিয়েই পড়েছে। তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে বন্ধু ?''

''ওরা আমাকে একা থাকতে দেবে না.'' প্যাতিয়র্কিন ভাবল। ''শুয়োরের বাচ্চা।''

ভন পাক গর্জে উঠল, ''একটা কথাও নয়, ও নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাবতে পার, এই শুয়োরের খোয়াড়েও মানুষ ঘুমতে পারে—লোকে বলে উকিলের জীবন বড় সুন্দর, শান্তির জীবন, কিন্তু আমি বলি এটা কুকুরের জীবন...তাকিয়ে দেখ, আজ রাতে আমরা কোথায় এসে পড়েছি! কিন্তু আমাদেব প্রতিবেশীকে আমি খুব পছন্দ করি...কি যেন তার নাম? শেস্তিয়র্কিন, তাই না? যথেষ্ট উৎসাহ আছে, আবেগ আছে....

''হুম্‌, তা ঠিক...পাঁচ বছরের মধ্যেই সে একজন ভাল উকিল হয়ে উঠবে...ছেলেটির বলার ভঙ্গীটা ভাল. .সবে দোলনা ছেড়ে নেমেছে, অথচ সে কথা বলে বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে, সব সময়ই একটা পরিমণ্ডল রচনার চেষ্টা করে।...তবে নিজের সওয়ালের মধ্যে হ্যামলেটকে টেনে আনার কোন দরকার ছিল না। '

শত্রুপক্ষের এই গায়ে-পড়া ভাব আর তাদের ঠাণ্ডা, পিঠ-চাপড়ানো সুরটা তার দম আটকাবার অবস্থা করে তুলেছে। রাগে ও লজ্জায় গলা আটকে আসছে।

মুখ টিপে হাসতে হাসতে ভন পাক আবার বলে উঠল, "আর ঐ চিনির ব্যাপারটা...ঠিক যেন একটি স্কুল-ফেরৎ তরুণীর মতই। আমরা এমন কি করেছি যে তার রাগ হয়ে গেল ? তুমি বলতে পার ?"

"কি জানি কেন ?"

প্যাতিয়র্কিনের আর সহ্য হল না। লাফ দিয়ে উঠে কিছু বলার জন্য সে মুখটা খুলল, কিন্তু গত দিনের যন্ত্রণাটা আবার উথ্‌লে উঠল ঃ কথার বদলে তার বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল মৃগীরোগীর মত ফুঁপিয়ে কান্না।

ভন পাক সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ওর হল কি ? কি হয়েছে গো তোমার ?"

সেমোর্চ্‌কিনও লাফিয়ে উঠে বলল, "তুমি কি...তুমি কি অসুস্থ ? ব্যাপার কি ? তোমার কি টাকা কম পড়েছে ? দোহাই তোমার. খোলাখুলি বল, কি হয়েছে।"

"এটা অন্যায়...বিরক্তিকর ! সারাটা দিন...সারাটা দিন !"

"কি বিরক্তিকর ? অন্যায়টাই বা কি ? ওসিপ ওসিপোভিচ ! ওকে একটু জল দাও। কি হয়েছে বাবা ? আজ তুমি এত চটে আছ কেন ? এটাই বোধ হয় তোমার প্রথম মামলা, অ্যা ? ঠিক ? তাহলে এতে অবাক হবার কিছু নেই ! বেশ ভাল করে কেঁদে নাও লক্ষীটি...আদালতে আমার প্রথম মামলার পরে আমার তো গলায় দড়ি দেবার সাধ পর্যন্ত হয়েছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে নিজেকে চাঙ্গা করে তোলার চাইতে কান্নাটাই বেশী ভাল ফল দেয়। প্রাণ খুলে একচোট কাঁদ, দেখবে অনেক ভাল লাগবে।"

"অন্যায়...বিরক্তিকর !"

"এর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই ! ঠিক যেরকমটি হওয়া উচিত তাই হয়েছে। তুমি বেশ ভাল বলেছ, তারা তোমার কথা মন দিয়ে শুনেছেন। এ সবই তোমার অযথা কল্পনা বাবা ! আমার প্রথম সওয়ালের কথাটা আজও মনে আছে। এক বাজনাদার কয়েকটা সাদা রঙের ট্রাউজার ও একটা ফ্রক কোট ধার দিয়েছিল। বসে থেকে থেকে আমার মনে হয়েছিল সকলেই আমার ট্রাউজার দেখে হাসছে। আসামী আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছিল আর সরকারী উকিল আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা জুড়ে দিল ; ফলে আমি একেবারে কাঠ হয়ে গেলাম। আমি বাজী রেখে বলতে পারি, তুমি নিশ্চয় স্থির করে ফেলেছ যে ওকালতি ছেড়ে দেবে, অ্যা ? এরকমটা সকলেরই হয় রে বাবা। তুমি প্রথমও নও, শেষও নও, সকলের কাছেই প্রথম আবির্ভাবটা একটু দামীই হয়ে থাকে !"

"কিন্তু আপনারা কি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলেন না ? মস্করা করছিলেন না ?"

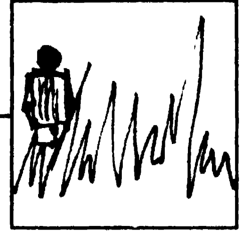
"মোটেই না! ওটা তোমার কল্পনামাত্র! প্রথম মামলার দিন এ রকম কল্পনা সকলের মাথায়ই ঢোকে। তোমার কি মনে হয় নি যে জুরী-মহোদয়গণ ঘৃণাভরে তোমার দিকে তাকাচ্ছে? হয়েছিল তো? তাহলেই বোঝ! এটা খেয়ে নাও বাপু, আর ভালভাবে ঢাকাঢুকি দিয়ে শুয়ে পড়।"

প্যাতিয়র্কিনের শত্রুরা নিজেদের লোমের কোট দিয়ে তাকে ঢেকে দিল, সারা রাত ছোট শিশুর মত তার দেখাশোনা করল। গত দিনের সব কষ্ট যন্ত্রণা তার কাছে কল্পনার সৃষ্টি বলেই মনে হতে লাগল।

১৮৮৬

শিশুতীর্থ

Children



মা, বাবা ও পিসি নাদিয়া কেউ বাড়ি নেই। তারা গেছে পুরনো কর্মচারীর বাড়িতে নামকরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সে কর্মচারীর গাড়িটা টানে একটা ধূসর রঙের ছোট ঘোড়া। তাদের ফেরার প্রতীক্ষায় গ্রিশা, আনিয়া, আলিওশা, সোনিয়া এবং রাঁধুনির ছেলে আন্দ্রেই খাবার ঘরের টেবিলে বসে লোত্তো খেলছে। সত্যি কথা বলতে কি, তাদের শোবার সময় অনেকক্ষণ আগেই পার হয়ে গেছে; কিন্তু যার নামকরণ হবে সেই ছোট্ট শিশুটি দেখতে কেমন হয়েছে আর তারাই বা কি কি খেয়ে এসেছে সে সব মার কাছ থেকে জেনে না নিয়ে তারাই বা ঘুমতে যায় কেমন করে? একটা ঝোলানো বাতির আলোয় আলোকিত টেবিলে ছড়ানো রয়েছে অনেকগুলি সংখ্যা, বাদামের ঘুঁটি, কাগজের টুকরো ও কাঁচের গণক। টেবিলের মাঝখানে একটা সাদা বাটিতে পাঁচটা এক-কোপেকের মুদ্রা রাখা আছে। বাটির পাশেই রাখা আছে একটা আধ-খাওয়া আপেল, এক জোড়া কাঁচি ও এক বাটি ভর্তি বাদামের বীচি। ছেলেমেয়েরা বাজী ধরে খেলছে। জনপ্রতি এক কোপেক বাজী। খেলার নিয়ম হল, যে জোচ্চুরি করবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বাদ দেওয়া হবে। খাবার ঘরে অন্য কেউ নেই। তাদের আয়া আগাফিয়া আইভান্‌ভনা নীচে রান্নাঘরে বসে রাঁধুনিকে পরিবেশনের রীতি-নীতি শেখাচ্ছে, আর তাদের দাদা পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ভাসিয়া ড্রয়িং-রুমের শোফায় শুয়ে আলস্য ভাঙছে।

উত্তেজনা চরমে উঠেছে। গ্রিসার মুখটাই সবচাইতে বেশী উত্তেজিত দেখাচ্ছে। তার বয়স ন' বছর, সারা মাথা কামানো, ফোলা ফোলা গাল আর আফ্রিকানদের মত পুরু ঠোঁট। এরই মধ্যে সে স্কুলের প্রস্তুতি-শ্রেণীতে উঠেছে, সকলেই তাকে বয়সে বড় ও চালাক-চতুর বলে মনে করে। সে কেবল টাকাটার জন্যই খেলছে। টেবিলের বাটিতে যদি কোপেকগুলো না

থাকত তাহলে সে অনেক আগেই শুতে চলে যেত। তার দুটি ক্ষুদে বাদামী চোখ অন্যের তাসের দিকে আগ্রহী, ঈর্ষান্বিত দৃষ্টি হানছে। হেরে যাবার ভয়, ঈর্ষা ও টাকার ভাবনা একসঙ্গে তার মুণ্ডিত মাথার মধ্যে ঢুকে কিছুতেই তাকে চুপচাপ থাকতে ও মনঃসংযোগ করতে দিচ্ছে না। সারাক্ষণ সে হাঁকোড়-পাঁকোড় করছে। যখন সে বাজী জেতে তখন লোভীর মত টাকাটা কেড়ে নেয় আর সোজা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে দেয়। তার বোন আনিয়ার বয়স আট বছরের মত ; তার চিবুক সরু, চোখ দুটি বুদ্ধিদীপ্ত। সেও হেরে যাবার ভয়ে ভীত। খেলতে খেলতে সে কখনও রক্তিম হয়ে ওঠে, আবার কখনও বিবর্ণ হয়ে যায়। টাকার প্রতি তার টান নেই। তার কাছে জেতাটাই গর্বের বিষয়। অপর বোন সোনিয়ার বয়স আট, মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল, গায়ের রং ঠিক যেরকমটি দেখা যায় স্বাস্থ্যদীপ্ত ছেলেমেয়েদের, দামী পুতুলের ও মিষ্টির বাক্সের গায়ে। সে লোত্তো খেলে শুধুই মজার জন্য। তার মুখটা আনন্দে ঝলমল করে। হেসে হাততালি দিয়ে ওঠে, কে জিতল সেটা বড় কথা নয়। আলিওসা নাদুস-নুদুস ছোট্ট ছেলেটি ; হুস্-হুস্ করে নিঃশ্বাস ফেলে আর হাঁপায়, আর তাস নিয়ে নাড়াচাড়া করে। তার বেলায় লোভ অথবা ঈর্ষার প্রশ্নই ওঠে না। কেউ যে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নেয় নি বা বিছানায় শুইয়ে দেয় নি তাতেই সে খুশি! তাকে দেখলে মনে হয় সে শ্লেষ্মার রোগী, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে একটি আসল ক্ষুদে শয়তান। খেলাটার প্রতি তার টান নেই ; তবে খেলাটাকে নিয়ে যে তর্কাতর্কি বাধে তার জন্যই সে খেলে। একজন খেলুড়ে যখন আর একজনকে মারে বা কড়া কথা বলে তখন সে খুব মজা পায়। অনেক আগেই একটা বিশেষ জায়গায় যাওয়া তার উচিত ছিল, কিন্তু পাছে কেউ তার কোপেকগুলি বা গণকগুলি হাতিয়ে নেয় এই ভয়ে সে এক মিনিটের জন্যও টেবিল ছেড়ে যায় নি। যেহেতু সে কেবল দশ পর্যন্ত গুণতে জানে আর যে সব সংখ্যা শূন্য দিয়ে শেষ হয় তাই জানে, তাই আনিয়াই তার হয়ে গণকটা চালায়। পঞ্চম খেলুড়ে বাঁধুনির ছেলে আন্দ্রেই কালো ও রোগাটে ; তার পরনে ক্যালিকোর শার্ট আর বুকের উপর একটা ব্রোঞ্জের ক্রুশ। সংখ্যাগুলোর দিকে স্বপ্নালু দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। টাকা-পয়সা নিয়ে বা কে জিতল তা নিয়ে সে চিন্তাই করে না ; সে সম্পূর্ণ ডুবে থাকে খেলাটার অংকের মধ্যে ; তার সরল দর্শনের মধ্যে : এখানে এত বিভিন্ন রকমের সংখ্যা আছে, অথচ একটার সঙ্গে অপরটা গুলিয়ে যায় না কেন!

সোনিয়া এবং আলিওশা ছাড়া বাকি সকলেই পর পর সংখ্যাগুলি ডাকে। যেহেতু সেগুলি সব সময় একই থাকে তাই তারা নানা ধরনের মুখভঙ্গী ও হাস্যকর নাম তৈরী করে নিয়েছে। যেমন, সাতকে ডাকে "লোহার শিক", এগারোকে—"কাঠি", নয়কে—"নানি", এই রকম। খেলাটা ভারী মজার।

বাবার টুপির ভিতর থেকে একটা হলুদ নল বের ক[illegible] গ্রিশা ডাকল—"বত্রিশ! সতেরো! লোহার কাঠি! আঠাশ—ফটক বন্ধ [illegible]

আনিয়া দেখল, আন্দ্রেই আঠাশটা ভুল করেছে। অন্য সময় [illegible]

সে সমঝে দিত, কিন্তু এখন তার নজর রয়েছে কোপেকের নিকটবর্তী বাটিটার উপর। তাই সে খুশি হল।

"তেইশ!" গ্রিশা ডাকতে লাগল। "বাষট্টি! নয়!"

টেবিলের উপর পড়ে-থাকা একটা আরশোলা দেখিয়ে সোনিয়া চেঁচিয়ে বলল, "একটা আরসোলা! বাঁচাও!"

আলিওশা গম্ভীর গলায় বলে উঠল, "ওটাকে চেপে ধরো না; ওর পেটে বাচ্চা থাকতে পারে.. "

আরশোলাটার দিকে তাকিয়ে সোনিয়া ভাবল, বাচ্চা আরশোলাগুলো না জানি কত ছোটই হবে।

আনিয়া ইতিমধ্যে দুটো সারি প্রায় সাজিয়ে ফেলেছে একথা ভেবে দুঃখিত মনে সে ডাক দিল "তেতাল্লিশ! ছয়!"

চোখ ঘুরিয়ে হো-হো করে হেসে উঠে সোনিয়া চেঁচিয়ে বলল, "আমার হয়ে গেছে। আমি জিতে গেছি!"

অন্য সবাই মুখ নীচু করল।

সোনিয়ার দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে গ্রিশা হুকুম দিল, "ওকে আটকাও!"

সকলের চাইতে বড় হওয়ার জন্য এবং চালাক-চতুর হওয়ার জন্য গ্রিশার কথাটাই চূড়ান্ত। সে যা বলে সকলে তাই করে। সোনিয়াকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা হল এবং অন্য সব খেলুড়েকে হতাশ করে প্রমাণিত হল যে সোনিয়া জোচ্চুরি করে নি। নতুন করে খেলা শুরু হল।

যেন নিজেকেই বলছে তেমনভাবেই আনিয়া বলল, "তোমরা কি জান কাল আমি কি দেখেছি! ফিলিপ ফিলিপোভিচ তার চোখের পাতা দুটো উল্টে দিয়েছিল, তার চোখদুটো লাল ও কাটা-কাটা দেখাল। ঠিক যেন দানবের চোখ।"

গ্রিশা বলল, "আমিও তাকে দেখেছি। আট! আমাদের শ্রেণীর একটা ছেলে তার কান এদিক ওদিক নাড়াতে পারে। সাতাশ।"

আন্দ্রেই গ্রিশার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত কি যেন ভেবে বলল ঃ

"আমার কানও আমি নাড়াতে পারি..."

"বেশ তো করে দেখাও না!"

আন্দ্রেই চোখ, ঠোঁট ও আঙুল নাড়িয়েই ভাবল তার কান দুটোও নড়ছে। সকলে হো-হো করে হেসে উঠল।

সোনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সে লোক ভাল নয়, ওই ফিলিপ ফিলিপোভিচ। গতকাল সবে আমি রাত-পোশাকটা গায়ে চাপিয়েছি এমন সময় সে একেবারে নার্সারিতে ঢুকে পড়ল।...আমার এত অস্বস্তি হয়েছিল!"

"বাজীমাত্!" টাকাশুদ্ধ বাটিটা চেপে ধরে গ্রিশা হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল। "আমি জিতেছি! ইচ্ছা হয় তোমরা পরীক্ষা করে দেখ।"

রাঁধুনির ছেলেটি চোখ তুলে তাকাল। তার মুখটা সাদা হয়ে গেছে।

''আমি আর খেলতে পারব না,'' সে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল।

''কেন পারবে না?''

''কারণ..কারণ আমার কাছে আর টাকা নেই।''

আন্দ্রেই তার পকেট হাতড়াতে লাগল। কিন্তু রুটির টুকরো আর একটা চিবনো পেন্সিল ছাড়া আর কিছুই না পেয়ে তার মুখটা কুঁচকে উঠতে লাগল। সে দুঃখের সঙ্গে চোখ পিট্‌পিট করতে লাগল। যে কোন সময় সে কেঁদে ফেলবে।

তার এই শোচনীয় অবস্থা সোনিয়ার সহ্য হয় না; সে বলল, ''আমি তোমার হয়ে একটা কোপেক রেখে দিচ্ছি! মনে থাকে যেন, পরে সেটা আমাকে ফেবৎ দিতে হবে।''

সকলে টাকা রাখতেই খেলা আবার শুরু হল।

বাটিটার চারদিকে চোখ রেখে আনিয়া বলল, ''মনে হল যেন একটা ঘন্টাব শব্দ শুনলাম।

সকলেই খেলা থামিয়ে অন্ধকার জানালার দিকে তাকাল। বাতিটার আলো অন্ধকারের বুকে ঠিকরে পড়েছে।

''ওটা তোমাব কল্পনা।''

আন্দ্রেই বলল, ''একমাত্র যে জায়গায় বাতের ঘন্টা বাজে সেটা হল কবরখানা।''

''তারা ঘন্টা বাজায় কেন?''

''যাতে চোর গির্জায় ঢুকতে না পারে। ভার ঘন্টাকে ভয় করে।''

''কিন্তু চোররা গির্জায় ঢুকতে যাবে কেন?'' সোনিয়া শুধাল।

''অবশ্যই পাহারাদারকে খুন করতে।''

মুহূর্তকালের নীরবতা। পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে তারা ভয়ে শিউরে ওঠে এবং আবার খেলা শুরু করে। এবার জিত হয় আন্দ্রেইর।

আলিওশা জোর গলায় বলে, ''ও জোচ্চুরি করেছে।''

''মিথ্যে কথা! আমি জোচ্চুরি করি নি!''

আন্দ্রেইর মুখটা সাদা হয়ে যায়, মুখটা মুচড়ে উঠতে থাকে, তারপরেই—ধপ্! আলিওশার মাথায় এক ঘুষি মারে। আলিওশা রেগে কাঁপতে কাঁপতে লাফিয়ে উঠে টেবিলের উপর একটা হাঁটু রেখেই—চপাট! আন্দ্রেইর গালে এক থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। আবার এ ওকে চপেটাঘাত করে আর কান্না জুড়ে দেয়। এসব কাণ্ডকারখানা সহ্য করতে না পেরে সোনিয়া কাঁদতে শুরু করে। আর খাবার ঘরটা কান্নার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে ভরে ওঠে। কিন্তু এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে তাতে খেলাটা বন্ধ হয়ে গেল। পাঁচ মিনিট পরেই ছেলেমেয়েরা আবার হেসে হেসে শান্তিতে গল্প করতে লাগল। তাদের মুখে চোখের জলের দাগ, কিন্তু তাই বলে তাদের হাসি থেমে যায় নি। বরং আলিওশা বেশ খুশি: যাই হোক, একটা ঝগড়া

তো হয়ে গেল!

পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ভাসিয়া ঘরে ঢুকল। তাকে ঘুম-কাতুরে ও বিরক্ত মনে হচ্ছে।

থকেটে হাত ঢুকিয়ে গ্রিশা কোপেকগুলি বাজাচ্ছে। তা দেখে ভাসিয়া ভাবল, "এটা লজ্জার ব্যাপার! ছোটদের হাতে টাকা-পয়সা—এটা ভাবা যায়! তার চাইতেও বড় কথা, তাদের বাজী ধরে খেলতে দেওয়া হচ্ছে! আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—আহা, কী ভালভাবেই ওদের মানুষ করা হচ্ছে! লজ্জার কথা!"

কিন্তু ছেলেমেয়েরা খেলাটাকে এতই উপভোগ করছে যে তারও ইচ্ছা হল খেলায় যোগ দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করে।

বলল, "এক মিনিট অপেক্ষা কর, আমিও খেলব।"

"তাহলে তোমার কোপেকটা বাটিতে রাখ।"

পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে সে বলল, "এক মুহূর্ত অপেক্ষা কর। আমার কাছে তো কোপেক নেই, এই একটা রুব্‌ল আছে। আমি একটা রুব্‌ল্ রাখব।"

"না, না...একটা কোপেকই রাখতে হবে।"

"তোমরা এত বোকা! একটা রুব্‌ল্ তো কোপেকের চাইতে দামী," যুবকটি জবাব দিল। "যে জিতেছে সে তো আমাকে ওটা ভাঙিয়ে দিতে পারে।"

"না, ধন্যবাদ। চলে যাও।"

পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে চাকবদের কাছ থেকে ভাঙানি আনাব জন্য রান্নাঘরে গেল। সেখানেও কারও কাছেই কোপেক নেই।

রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে গ্রিশাকে বলল, "তাহলে তুমি আমাকে ভাঙানি দাও। দেবে না? তাহলে এক রুবল্ দাম নিয়ে আমার কাছে দশটা কোপেক বিক্রি কর।"

গ্রিশা সন্দেহজনক দৃষ্টিতে ভাসিয়ার দিকে তাকায়। সে কি তাকে ফাঁদে ফেলতে চেষ্টা করছে। জুয়াচুরির ফন্দি করছে?

পকেটের উপর হাত রেখে সে বলল, "আমি বিক্রি করতেই চাই না।"

ভাসিয়া ভীষণ রেগে গেল; চীৎকার-চেঁচামেচি করে সে তাদের বলতে লাগল মাথামোটা, তাদের মাথার ঘিলু পাখিদের মত।

সোনিয়া বলল, "ভাসিয়া, তোমার হয়ে আমি একটা কোপেক বাটিতে রাখছি তুমি বস।"

যুবকটি বসল। নিজের দুটো তাস সামনে মেলে রাখল।

আ[illegible]য়া সংখ্যাগুলো ডাকতে শুরু করল।

"আমার একটা কোপেক পড়ে গেছে।" হঠাৎ গ্রিশা সখেদে বলে উঠল। "এক মিনিট অপেক্ষা কর।"

একটা বাতি নিয়ে সকলে টেবিলের নীচে কোপেকটা খুঁজতে লাগল। সেখানে তাদের হাতে লাগল যতরাজ্যের জঞ্জাল, মাথায়-মাথায় ঠোকাঠুকি

হল, কিন্তু কোপেকের দেখা মিলল না। তারা বার বার খুঁজতেই লাগল। শেষ পর্যন্ত ভাসিয়া গ্রিশার হাত থেকে বাতিটা নিয়ে যথাস্থানে রাখল। গ্রিশা অন্ধকারেই কোপেক খুঁজতে লাগল।

অবশেষে কোপেকটা পাওয়া গেল। খেলুড়েরা টেবিলে বসে আবার খেলা শুরু করার আয়োজন করতে লাগল।

''সোনিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে।'' আলিওশা ঘোষণা করল।

কোঁকড়া চুলের রাশ হাতের উপর ছড়িয়ে সোনিয়া পরম শান্তিতে গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে, যেন এক ঘন্টা আগেই সে ঘুমিয়েছে। সকলে যখন কোপেকটা খুঁজছিল তখন নিজের অজান্তেই সোনিয়া ঘুমিয়ে পড়েছিল।

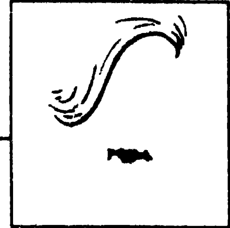
তাকে খাবার ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এসে আনিয়া বলল, ''এস, মায়ের বিছানায় শোবে এস! এস!''

সকলেই ভিড় করে তাকে নিয়ে চলল, আর পাঁচ মিনিট পরে মায়ের বিছানায় সে এক মজার দৃশ্য। সোনিয়া গভীর ঘুমে অচেতন; তার পাশেই নাক ডাকাচ্ছে আলিওশা। তাদের পায়ের কাছে গ্রিশা ও আনিয়ার মাথা, তারাও ঘুমে অচেতন। আর রাঁধুনির ছেলে আন্দ্রেই সেখানেই কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। তাদেব চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে কোপেকগুলো। পরের খেলাটা শুরু না হওয়া পর্যন্ত তারা একেবারেই শক্তিহীন। মধুর স্বপ্ন!

১৮৮৬

দুঃখ

Misery



কারে আমি এ ব্যথা জানাব?

তখন গোধূলি। বরফের বড় বড় পাতলা টুকরোগুলি সদ্য জ্বালানো পথের বাতিগুলোকে ঘিরে অলসভাবে চক্কর দিচ্ছে এবং বাড়ির ছাদে, ঘোড়ার পিঠে ও মানুষের কাঁধে ও টুপিতে ঘন আস্তরণের মত ছড়িয়ে পড়ছে। ছ্যাকরা গাড়ির কোচোয়ান আয়োনা পোততাপভের সমস্ত শরীর ভূতের মত সাদা হয়ে গেছে। একটা জীবন্ত মানুষের দেহ যতটা ঝুঁকে পড়তে পারে সেও ঠিক সেইভাবে ঝুঁকে চালকের বাক্সে নিশ্চলভাবে বসে আছে। বরফের গোটা পাহাড় যদি তার উপর ভেঙে পড়ে হয় তো তাহলেও সে গায়ের উপর থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলবে না।...তার বুড়ি ঘোটকিটাও সাদা ও নিশ্চল। এমন কি কাছে থেকে দেখলে তাকে একটা বরফের ঘোড়া বলেই মনে হবে ঃ সে ছিল এতটাই নিস্প্রাণ, তার আকৃতি এতটাই কৌণিক, তার লাঠির মত পাগুলিও এতটাই আড়ষ্ট ও শক্ত! খুব সম্ভব সে খুবই চিন্তামগ্ন। যাকেই ছিনিয়ে আনা হয় লাঙল থেকে, পরিচিত ধূসর দৃশ্যাবলী থেকে, আর ছুঁড়ে

ফেলে দেওয়া হয় ভয়ংকর আলো, বিরামহীন খটাখট শব্দ ও ধাবমান মানুষের ভিড়ের আবর্তের মধ্যে, বিষণ্ণ চিন্তায় মগ্ন হতে সে বাধ্য।

আয়োনা ও তার ঘোটকি দীর্ঘ সময় এখানে আছে। রাতের খাবারের আগেই সে গাড়ির আড্ডা ছেড়ে এসেছে, কিন্তু এখনও কোন আরোহী পায় নি। শহরের উপর অন্ধকার নেমে আসছে। রাস্তার বাতির মৃদু আলোগুলি বোধ হয় উজ্জ্বলতর হল, আর রাস্তার কলরবও উচ্চতর হল।

আয়োনার কানে এল কে যেন ডাকছে, "কোচোয়ান, ভাইবর্গস্কায়া যাবে?"

আয়োনা একটু এগিয়ে বরফ-ঢাকা চোখের পাতার ভিতর দিয়ে দেখতে পেল টুপিওয়ালা গ্রেটকোট পরিহিত একজন অফিসারকে।

অফিসারটি আবার বলল, "ভাইবর্গস্কায়া যাব। তুমি ঘুমুচ্ছ না কি? আমি বলছি ভাইবর্গস্কায়া যাব!"

সম্মতি জানাতে আয়োনা ঘোড়ার লাগামে টান দিল; ফলে ঘোড়ার পিঠ থেকে ও তার কাঁধ থেকে বরফের স্তর খসে পড়তে লাগল। অফিসার স্লেজের মধ্যে ঢুকল। আয়োনা জিভ দিয়ে জোরে শব্দ করল ঘোড়াটাকে চালাতে, হাঁসের মত বাঁকা করে গলাটা বাড়াল, নিজের আসনে উঠে দাঁড়াল এবং চাবুকটা দোলাতে লাগল, যতটা অভ্যাসবশত ততটা প্রয়োজনে নয়। বুড়ি ঘোটকিও গলাটা বাড়াল, লাঠির মত ঠ্যাংগুলোকে বাঁকাল এবং ইতস্তত ভঙ্গীতে এগিয়ে চলল।

চতুর্দিকে যে অন্ধকার ইতস্তত ঘুরঘুর্ করছিল তার ভিতর থেকে একটা ক্রুদ্ধ চীৎকার আয়োনার কানে এসে বাজল।

"তুমি কোথায় যাচ্ছ হে? মলো যা!"

"ডাইনে চলো!"

"তুমি কি গাড়ি চালাতে জান, না জান না? ডাইনে চালাও।" তার সওয়ারী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল।

একটা সৌখিন গাড়ির চালক তাকে গালাগাল দিল। জনৈক পথচারী রাস্তা পার হতে গেলে তার কাঁধটা ঘেস্টে গেল ঘোটকির নাকের সঙ্গে, আর আয়োনা যখন আস্তিন থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলল তখন সেই পথচারী নোংরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। বেচারি আয়োনা বাক্সে বসেই নড়াচড়া করতে লাগল, গরম কয়লার উপর বসে-থাকা বিড়ালের মত অস্থির হয়ে ডাইনে-বাঁয়ে কনুইয়ের গুঁতো মেরে এমন উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল যেন সে বুঝতেই পারছে না এই শহরের দুঃস্বপ্নের মধ্যে সে কোথায় এসেছে এবং কি করছে।

যাত্রীটি নাক সিঁটকে বলল, "এরা সবাই বাজে লোক! হয় তোমার সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধাতে চায়, নয়তো তোমাকে চাপা দিতে চায়! মনে হচ্ছে তোমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে।"

কিছু একটা মুখে দিয়ে আয়োনা যাত্রীটিকে দেখতে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

স্পষ্টতই সে কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু তার গলা দিয়ে একটা হিস্ হিস্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হল না।

"তুমি কি বললে?" অফিসার শুধাল।

ঈষৎ হাসিতে আয়োনার মুখটা কুঁচকে গেল। গলাটা পরিষ্কার করে সে কোনরকমে বলল ঃ

"আমার ছেলে, বুঝলেন কর্তা...তিন দিন আগে সে মারা গেছে।"

"ওঃ, কিসে মারা গেল?"

আয়োনা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "কে জানে। নিশ্চয় জ্বর হয়েছিল। তিন দিন হাসপাতালে ছিল, তারপর মারা গেল। ঈশ্বরের ইচ্ছাই তাই ছিল।"

অন্ধকারে কে যেন বলে উঠল, "ফিরে যাও হে! দেখতে পাচ্ছ না তুমি কোথায় চলেছ? চোখ খুলে চল!"

যাত্রীটি আয়োনাকে বলল, "জোরে চালিয়ে যাও, জোরে চালিয়ে যাও। এ ভাবে চললে সকালের আগে পৌঁছতে পারব না। চাবুকটা চালাও।"

আয়োনা আবার ঘাড়টা বাড়িয়ে দিয়ে আসনে উঠে দাঁড়াল আর চাবুকটাকে সবেগে দোলাতে লাগল। বার বার সে পিছন ফিরে যাত্রীর দিকে তাকাতে লাগল, কিন্তু সে চোখ বুজে বসে ছিল, পরিষ্কার বোঝা গেল কোন কথা শোনার মত মেজাজ তার নেই। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে সে গাড়ি থেকে নেমে গেল। আয়োনা গাড়ির একটা আড্ডার সামনে থামল, আবার উবু হয়ে বসে আগের মতই নিশ্চল বসে রইল। ভেজা বরফ তার ও ঘোটকির সারা দেহ ঢেকে দিল।...এক ঘণ্টা কেটে গেল, এবং আরও এক ঘণ্টা...

তিনটি যুবক তর্ক করতে করতে সশব্দে গালোশপরা পা ফেলে গাড়িটার কাছে এসে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে দু'জন ঢ্যাঙা ও সরু, আর তৃতীয়জন বেঁটে ও কুঁজো।

কুঁজো লোকটি কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে বলল, "গাড়ি, পলিজেইস্কি সেতু যাবে? আমাদের তিনজনের জন্য বিশ কোপেক পাবে।"

আয়োনা লাগামে টান দিয়ে দুই ঠোঁটে সেই চিরাচরিত শব্দ করতে লাগল। বিশ কোপেক ভাড়া হয় না, কিন্তু তর্ক করার মত অবস্থা তার নয়। এক রুব্‌ল্ বা পাঁচ কোপেক, এখন সবই তার কাছে সমান। যাত্রী পেলেই হল। তিন যুবক ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি করে দু'জন যাত্রীর স্লেজে তিনজন বসার চেষ্টা করতে লাগল। শুরু হয়ে গেল বিতর্ক—তাদের মধ্যে কোন্ দু'জন বসবে। আর কে দাঁড়িয়ে যাবে। অনেক তর্কাতর্কি, মনোকষ্ট ও গালাগালির পরে শেষ পর্যন্ত স্থির হল যেহেতু কুঁজো লোকটি সবচাইতে ছোট সেই দাঁড়িয়ে যাবে।

আয়োনার পিছনে দাঁড়িয়ে তার ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলে কুঁজো বলল, "তাহলে চলা যাক। চাবুক চালাও! হায়রে, কী একখানা টুপি তুমি পরেছ ভাই! সারা সেণ্ট পিতার্সবার্গের সবচাইতে বাজে টুপি!"

আয়োনা বলল, ''আমার ওতেই চলে যায়।''

''রাখো তোমার চলে যাওয়া, চাবুক মার তোমার ঘোটকির পিঠে। তুমি কি সারা পথ এইভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে চলবে নাকি? কি বল? কানের উপর একটা চড় খেতে চাও নাকি?''

সরু যুবকদের একজন বলল, ''আমার মাথাটা ফেটে যাচ্ছে। কাল রাতে ডাকমাসোভের দোকানে ভাস্‌কা ও আমি চার বোতল কগ্‌নাক গিলেছি।''

অপর যুবক রেগে বলল, ''লোকটার মিথ্যে কথার বহর শোন।''

''ঈশ্বর সাক্ষী, কথাটা সত্যি!''

''তুমি যদি বল একটা উকুনের কাশি শুনেছ তার চাইতে বেশী সত্যি তো নয়!''

আয়োনা মুচকি হেসে বলল, ''ভদ্রজনরা দেখছি ভারী আমুদে, অ্যা?''

''ও সব বাকতাল্লা রাখ। তুমি আরও জোরে চালাবে কি না?'' কুঁজো লোকটি রেগে বলল। ''এটা কি গাড়ি চালাবার ছিরি? বুড়ো কাকতাড়ুয়া, চাবুক মার! জোরে চালাও! ওটাকে আচ্ছা করে চাবকাও!''

তার পিছনে কুঁজো লোকটির মোচড়ানো শরীর ও কাঁপা কণ্ঠস্বরের উপস্থিতি আয়োনা বুঝতে পারল। তাকে সম্বোধন করে যে খিস্তি করা হচ্ছে তাও শুনল, চারিদিকে নানা লোকজন দেখতে পেল, আর যে একাকিত্ব তার বুকের উপর চেপে বসেছিল সেটা যেন একটু একটু করে উঠে যেতে লাগল। চীৎকার করতে করতে একসময় একটি জটিল শব্দবদ্ধ অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করতে গিয়ে গলা আটকে সে সমানে কাশতে শুরু করল। সরু যুবক দুটি কোন্ এক নাদেঝদা পেত্রভ্‌না বা অপর কারও কথা নিয়ে আলোচনা শুরু করল। আয়োনা মুখ ঘুরিয়ে তাদের দিকে তাকাল। যেই তাদের কথাবার্তায় একটু ছেদ পড়ল অমনি সে আবার মুখটা ঘুরিয়ে বলল ঃ

''তোমরা কি জান...আমার ছেলে, বুঝলে...সে তিন দিন আগে মারা গেছে।''

কাশির দমকের পরে ঠোঁট মুছতে মুছতে কুঁজো বলল, ''আমরা সকলেই তো মরব। আরও জোরে ছোটাও রে বাপু! ভদ্রজনরা, এভাবে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আমি রাজী নই। ও কখন আমাদের পৌঁছে দেবে? আদৌ দেবে কি?''

''ওকে একটু উৎসাহ দাও...কানের ভিতর কথাটা ঢোকাও!''

''শুনছ হে বুড়ো কাকতাড়ুয়া? তুমি যদি জোরে গাড়ি না চালাও তো ঘাড়ের উপর খাবে এক রদ্দা! তোমার দয়ার জন্য যদি দাঁড়িয়েই থাকতে হয়, তার চাইতে আমরা হেঁটেই যাব! আমার কথাগুলো কানে ঢুকছে হে বুড়ো ড্রাগন? না কি আমাদের কথা খেয়ালই করছ না?''

আয়োনা মাথার পিছনে একটা চড়ও অনুভব করল।

সে বলল, ''কী মজার ভদ্রলোক সব! ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন!''

দুই সরু যুবকের একজন প্রশ্ন করল, ''আচ্ছা কোচোয়ান, তুমি বিয়ে করেছ ?''

''কে, আমি? কী মজার যুবকরা সব!'' আয়োনা হেসে উঠল। ''আমার জন্য এখন তো একমাত্র নারী আছেন মাতা ধরিত্রী...মানে কবর। আমার ছেলে, সে চলে গেল আর মরে গেল, আর আমি বেঁচে রইলাম...হাসির কথা। মৃত্যু দরজা ভুল করেছে, আমার কাছে না এসে সে এল আমার ছেলের কাছে...''

যাত্রীদের কাছে ছেলের মৃত্যুর বিবরণ শোনাবার জন্য সে মুখটা ঘোরাল, আর ঠিক তখনই কুঁজো লোকটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জানাল, অবশেষে তারা পৌঁছে গেছে। হাতের মধ্যে বিশ-কোপেকের মুদ্রাটি চেপে ধরে আয়োনা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফূর্তিবাজ লোক তিনটির দিকে তাকিয়ে রইল। ক্রমে তারা অন্ধকার গলিপথে অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার সে একা হল, নৈশঃব্দ্য আবার তাকে ঘিরে ধরল...কিছু সময়ের জন্য হলেও সে দুঃখের মাত্রা কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল, সেটা এবার অধিকতর বেদনার সঙ্গে তাকে অভিভূত করে ফেলল। আনোয়ার উদ্বিগ্ন, বেদনার্ত চোখ দুটি এই আশা নিয়ে পথের দুই ধারের জনতার ভিড়ের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ, হাজার মানুষের মধ্যে অন্তত একজনও এখানে এসে থামবে, তার সব কথা শুনবে। কিন্তু জনতা দ্রুত ছুটেই চলেছে; তারা ভুলে গেছে তাকে ও তার দুঃখকে। সে দুঃখ প্রচণ্ড,সীমাহীন। আয়োনার বুকটা যদি ফেটে খুলে যেত, আর সব দুঃখ স্রোতের মত বেরিয়ে আসত, তাহলে সারা জগৎটাই ভেসে যেত, অথচ এখনও পর্যন্ত কেউ তা দেখল না। সে দুঃখটা যত বড়ই হোক, এমন তুচ্ছ একটা ঝিনুকের বুকে সে বাসা বেঁধেছে যে সে দুঃখ সকলের অগোচরেই রয়ে গেল।

এই সময় একটি দারোয়ানকে দেখতে পেয়ে সে তার সঙ্গে কথা বলবে স্থির করল।

শুধাল, ''আমি বলছি, এখন ক'টা বাজে?''

''ঠিক ন'টা বেজেছে। তুমি তো এখানে দাঁড়াতে পারবে না। এগিয়ে যাও।''

আয়োনা গাড়িটাকে কিছুদূর চালিয়ে নিয়ে গেল। তারপর আবার উপুড় হয়ে দুঃখের হাতে আত্মসমর্পণ করল।. ভাবল, মানুষের আবেদন জানানো বৃথা . কিন্তু পাঁচটা মিনিট পার হবার আগেই সে সোজা হয়ে বসল, যেন বেদনার তীব্র আঘাতে মাথাটা দোলাতে দোলাতে লাগামে টান দিল। আর সহ্য হচ্ছে না।

নিজেই নিজেকে বলল, ''এবার গাড়ির আড্ডায় ফিরে যাও।''

আর বুড়ো ঘোড়াটাও যেন তার মনের কথাটা বুঝতে পেরেই দুলকি চালে চলতে শুরু করল। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে আয়োনাকে দেখা গেল একটা বড় নোংরা স্টোভের খুব কাছে বসে আছে। লোকজন সব নাক ডাকিয়ে

ঘুমচ্ছে স্টোভ সংলগ্ন বিছানায়, মেঝের উপর ও বেঞ্চিতে। জায়গাটা যেমন গুমোট, তেমনি দুর্গন্ধে ভরা। আয়োনা ঘুমন্ত লোকগুলোর দিকে তাকাল, নিজের দুই পাশ আঁচড়াল, আর এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্য অনুতাপ করতে লাগল।

মনে মনে বলল, ''যই খাবার পয়সাটাও রোজগার হল না। তাই তো এত খারাপ লাগছে। যে লোক নিজের কাজটা বোঝে,... যার যথেষ্ট খাবার আছে এবং যার ঘোড়াটারও যথেষ্ট খাবার জোটে সে তো সব সময়ই ভাল থাকে।''

কোণ থেকে একটি যুবক কোচোয়ান উঠে বসল, ঘুমের ঘোরেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে জলের কলসির দিকে পা বাড়াল।

''তোমার কি তেষ্টা পেয়েছে?'' আয়োনা শুধাল।

''সেই রকমই দেখাচ্ছে, তাই না?''

''ঠিক আছে...তোমার তেষ্টাই মেটাও।...জান কি ভাই যে আমার ছেলেটি মারা গেছে। শুনেছ সে কথা? এই সপ্তাহের গোড়ায়, হাসপাতালে ...আহারে, বাছা আমার!''

আয়োনা যুবকটির দিকে তাকিয়ে দেখল, খবরটাকে সে কি ভাবে নিয়েছে, কিন্তু দেখার কিছুই ছিল না। মাথার উপর কম্বলটা টেনে দিয়ে সে আবার অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। বুড়ো মানুষটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পিঠ চুলকাতে লাগল।...যুবকটির যতটা দরকার ছিল জলের, তারও ঠিক ততটা দরকার ছিল কথা বলার মত একটা লোকের। তার ছেলের মৃত্যুর পরে একটা সপ্তাহ কেটে গেছে। আর এখনও পর্যন্ত একটি লোকের সঙ্গে তা নিয়ে মন খুলে কথা বলতে পারে নি। সে চায় দীর্ঘ সময় ধরে ধীরে সুস্থে কথাটা বলতে। সে বলতে চায় কেমন করে তার ছেলেটি অসুখে পড়ল, কত ভীষণ কষ্ট পেল, সর্বশেষ কি কথা সে বলল, আর কি ভাবে মারা গেল... তার শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান এবং মৃতের পোশাকগুলি আনতে তার নিজের হাসপাতালে যাওয়ার বর্ণনাও তাকে দিতেই হবে। গ্রামের বাড়িতে তার মেয়ে আনিসিয়াকে রেখে এসেছে। তার কথাও অবশ্যই বলতে হবে। শ্রোতা তখন ঢোক গিলবে, দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, কাঁদবে। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে আরও ভাল হয়। তারা বোকা মেয়েমানুষ হতে পারে, কিন্তু দুটো কথা শুনলেই তারা কেঁদে ভাসিয়ে দেবে।

মনে মনে সে আরও ভাবল, ''বাইরে গিয়ে ঘোড়াটাকে একবার দেখে আসব। একটু পরে ঘুমলেও চলবে।...মনে হচেছ অচিরেই আমি প্রাণ খুলে ঘুমতে পারব...''

কোটটা গায়ে চাপিয়ে সে আস্তাবলে তার ঘোটকির কাছে গেল। তার মনে তখনও যই, খড় ও আবহাওয়ার চিন্তা...যখন সে একা থাকে তখন ছেলের কথা ভাবতে তার কষ্ট হয়। তার কথা অন্যকে বলতে পারে, কিন্তু তার ছবিটা স্মরণ করা বড়ই ভয়ংকর, অসহ্য।

ঘোড়াটার চকচকে চোখ দেখে আয়োনা তাকে শুধাল, ''খড় চিবুচ্ছ? তাই চালিয়ে যাও। আমরা যখন যই খাবার মত টাকা উপার্জন করতে পারি নি তখন খড়ই খেতে হবে...হ্যাঁগো মশাই...আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, আর গাড়ি চালাতে পারি না ..এতদিন তো আমার ছেলেরই গাড়িটা চালাবার কথা, আমার নয়...এখন তো সেই হত তোমার আসল কোচোয়ান...আজ সে যদি বেঁচে থাকত...''

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আয়োনা আবার বলতে লাগল ঃ

''ব্যাপারটা কি জানিস্‌রে বাছনি...আমার ছেলে কুজ্‌মা আয়োনিচ বেঁচে নেই...সে দেহ রেখেছে। অকারণেই সে চলে গেল আর মরে গেল...তার জন্য তোরও কষ্ট হবে রে, হবে না?''

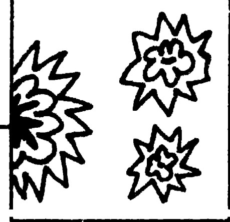
বুড়ি ঘোটকি চিবুতে চিবুতেই শুনল আর তার মালিকের হাতের উপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

আয়োনা অভিভূত হয়ে পড়ল...ঘোড়াটাকেই সব কথা বলতে লাগল।

১৮৮৬

নরক গুলজার

Pandemonium



মাশেংকা পাভ্‌লেৎস্কায়া একটি তরুণীদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে সদ্য স্নাতক হয়ে এসেছে। এইমাত্র সে কুশ্‌কিনদের বাড়ি থেকে ফিরছে। গভর্নেস হিসাবে সেখানে দেখে এসেছে নরক গুলজার অবস্থা। তাকে ফটক খুলে দিয়েছিল দারোয়ান মিখাইলো। সে উত্তেজনায় চিংড়ি মাছের মত লাল হয়ে ছিল।

দোতলা থেকে অনেক গোলমাল কানে এসেছিল। মাশেংকা ভেবেছিল, ''নিশ্চয় কর্ত্রীর ফিট হয়েছে। অথবা তিনি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করছেন...''

হলে এবং বারান্দায় পরিচারিকাদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। তাদের একজন চেঁচিয়ে কাঁদছিল। তারপরেই বাড়ির মালিক নিকোলাই সের্গেয়েভেচের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। ছোটখাট বয়স্ক মানুষ, মুখটা ফোলা-ফোলা, মস্ত টাক। স্ত্রীর ঘর থেকে সে ছুটে বেরিয়ে এল। তার মুখটা লাল। কুঁচকে-কুঁচকে উঠছে... গভর্নেসের উপস্থিতি খেয়াল না করে তার পাশ দিয়েই ছুটে গিয়ে সে দুই হাত তুলে চেঁচিয়ে বলল ঃ

''ওঃ কী ভয়ংকর! কী মোটা বুদ্ধি! যেমন স্থূলদেহ তেমনি স্থূলবুদ্ধি! বিরক্তিকর!''

মাশেংকা ঘরে ঢুকল আর সেখানেই তার জীবনে এই প্রথম সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করল ধনী ও অভিজাত লোকদের উপর নির্ভরশীল অসহায়

মানুষদের চিরাচরিত দুরবস্থা। তার ঘরটা তল্লাসি করা হচ্ছিল। বাড়ির কর্ত্রী ফেদোসিয়া ভাসিলিয়েভ্না মাশেংকার টেবিলের পাশেই দাঁড়িয়েছিল আর কিছু পশমের গোলা, টুকরো জিনিসপত্র ও কাগজ তার সেলাইয়ের থলিতে ভরে নিচ্ছিল। মহিলাটি শক্ত-সমর্থ, চওড়া কাঁধ, ঘন কালো ভুরু, খালি মাথা, গোঁফের অস্পষ্ট রেখা, হাত দুটি লাল আর মুখ ও হাবভাব সাধারণ রাঁধুনির মত। স্পষ্টতই গভর্নেস অপ্রত্যাশিতভাবে ঘরে ঢুকে পড়ায় মেয়েটির বিবর্ণ, বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে সে কিছুটা বিচলিত হয়ে তো-তো করে বলে উঠল ঃ

"ক্ষমা কর, আমি...তারাও আমাকে একটু ঠেলা মারল...আমার আস্তিনের ধাক্কায় এটা উল্টে গেল..."

বিড় বিড় করে আরও কি যেন বলতে বলতে মাদাম কুশ্‌কিন পোশাকের খস্ খস্ শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে নিজের ঘরটাকে ভাল করে নজর করে মাশেংকা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল; দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিল; তারপর ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।... তার থলের ভিতর ফেদোসিয়া ভাসিলিয়েভ্না কি খুঁজছিলেন? যদি তার কথাই সত্যি হয় যে হঠাৎই তার আস্তিনের ধাক্কা লেগে ভিতরের জিনিসগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল, তাহলে নিকোলাই সের্গেয়েভিচ ওভাবে লাল হয়ে বিচলিতভাবে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন কেন? ডেস্কের একটা টানা কিছুটা বের করা হয়েছে কেন? যে টাকার বাক্সে গভর্নেস দশ-কোপেকের মুদ্রা ও ডাক-টিকিটগুলো রেখেছিল সেটাও খোলা হয়েছে। কেউ সেটা খুলেছিল, কিন্তু বন্ধ করে নি, যদিও তালাটার গায়ে অনেক আঁচড় পড়েছে। বুক-কেস, টেবিলের উপরটা, বিছানা—সর্বত্রই খোঁজাখুঁজির স্পষ্ট ছাপ। তার কাপড়-চোপড়ের ঝুড়িটা পর্যন্ত। জিনিসগুলো ভালভাবে, ভাঁজ করে রাখা হয়েছে, কিন্তু বেরিয়ে যাবার আগে মাশেংকা যেভাবে সাজিয়ে রেখেছিল ঠিক সেই ভাবে রাখা হয় নি। অতএব তল্লাসীটা ভালভাবে খুবই ভালভাবেই করা হয়েছে, কিন্তু কেন করা হয়েছে? কি ঘটেছিল? মাশেংকার মনে পড়ল দরোয়ানের উত্তেজনা, যে নারকীয় গণ্ডগোল এখনও চলছে তার কথা, পরিচারিকার অশ্রুসিক্ত মুখ; সেটাও কি তার ঘরে তল্লাসীর ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত? সেও কি কোন ভয়ংকর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে পারে? মাশেংকার মুখ কালো হয়ে গেল; কাপড়ের ঝুড়ির উপর থপ্ করে বসে পড়ে সে শীতে কাঁপতে লাগল।

একটি পরিচারিকা ঘরে ঢুকল।

"লিসা, তুমি কি জান আমার ঘর তল্লাসী করা হয়েছে কেন?" গভর্নেস তাকে জিজ্ঞাসা করল।

লিসা বলল, "মাদামের দুই হাজার দামের একটা ব্রুচ হারিয়ে গেছে।"

"কিন্তু আমাকে তল্লাসী করা হল কেন?"

"সকলকেই তল্লাসী করা হয়েছে মিস্! আমাকেও, আর বেশ ভাল রকমে, যথোচিতভাবে...আমাদের সব কাপড়-চোপড় খুলে তল্লাসী চালানো

হয়েছে।..কিন্তু মিস্, প্রভু জানেন আমি ব্রুচ চুরি করি নি, কখনও না; তার ড্রেসিং-টেবিলের ধারে কাছেও আমি যাই না। পুলিশকে সে কথাও আমি বলব।''

অবাক বিস্ময়ে গভর্নেস আবাব বলল, ''কিন্তু আমাকে তল্লাসী করা হল কেন?''

''আমি তো আপনাকে বললাম, তাঁর ব্রুচটা চুরি হয়ে গেছে। মাদাম নিজের হাতে সব্বাইকে তল্লাসী করেছেন। এমন কি দরোয়ান মিখাইলোকেও! কি লজ্জা! নিকোলাই সের্গেয়েভিচ তো মুরগির মত ছটফট করছেন! ওরকম কাঁপবেন না মিস্। তারা কিছুই পায় নি। আপনি যদি ব্রুচ না নিয়ে থাকেন তাহলে তো আপনার ভয় পাবার কিছু নেই।''

রাগে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে মাশেংকা বলল, ''কিন্তু এ যে ভয়ংকর কথা লিসা... অপমানকর! কী অন্যায়, বিরক্তিকর কাজ বল তো! আমাকে সন্দেহ করার এবং আমার জিনিসপত্র হাতড়াবার কী অধিকার তাঁর আছে?''

লিসা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ''আপনি তো নিজের বাড়িতে থাকেন না মিস্। একজন মহিলা হলেও আপনিও তো এক ধরনের সেবক...বাবা মার সঙ্গে বাড়িতে বাস করা আর এটা তো এক জিনিস নয়!''

বিছানায় ভেঙে পড়ে মাশেংকা ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। আগে কখনও কেউ তার প্রতি আজকের মত হিংসাত্মক আচরণ করে নি. এরূপ গভীরভাবে অপমান করে নি।... সে ভালভাবে মানুষ হয়েছে, সে একজন স্পর্শকাতর তরুণী মহিলা, স্কুলশিক্ষকের মেয়ে, আর চুরির অপরাধে তাকেই কিনা সন্দেহ করা হয়েছে. রাস্তার মেয়েমানুষের মত তাকে তল্লাসী করা হয়েছে! এর চাইতে বড় অপমান আর কি হতে পারে? আবার এই ক্ষতি-বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটা ভীতির অনুভূতিঃ এখন কি হবে? যত রকমের বাজে চিন্তা তার মাথার মধ্যে ভিড় করছে। তার সম্পর্কে যদি চুরির সন্দেহই করা যায়, তাহলে তারা তাকে গ্রেপ্তার করলে, উলঙ্গ করে তল্লাসী চালালে, তারপর পুলিশের পাহারায় তাকে রাজপথ দিয়ে নিয়ে কোন্ এক প্রিন্সেস তারাকানোভাকে যেমন করেছিল সেই রকম ইঁদুর ও ছারপোকা অধ্যুষিত একটা অন্ধকার, ঠাণ্ডা কারা-কক্ষে তালা বন্ধ করে রাখে তাহলেও তো কেউ তা রোধ করতে পারবে না। কে তার পক্ষ সমর্থন করবে? তার বাবা-মা অনেক দূরে গ্রামাঞ্চলে থাকেন; সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার মত টাকা তাঁদের নেই। রাজধানীতে সে একা থাকে, আত্মীয় নেই,. বন্ধু নেই, শূন্য তৃণভূমি-অঞ্চলে একেবারে একা। তাকে নিয়ে তারা যা খুশি তাই করতে পারে।

''সব জজ-ব্যারিস্টারের কাছেই আমি যাব...'' কাঁপতে কাঁপতে মাশেংকা ভাবতে লাগল। ''শপথ নিয়ে সব কথা তাঁদের বুঝিয়ে বলব।...তাঁরা নিশ্চয় বিশ্বাস করবেন যে আমি চোর হতে পারি না!''

মাশেংকার মনে পড়ে গেল, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে থাকতে যেমনটি করত ঠিক

সেই ভাবেই লাঞ্চের সময় কিছু মিষ্টি লুকিয়ে পকেটে ফেলে সে ঘরে নিয়ে এসেছিল এবং কাপড়ের ঝুড়িতে চাদরেব নীচে রেখে দিয়েছিল। তার এই ছোট্ট গোপন ব্যাপারটা যে এখন তার মনিব ও মনিব-পত্নী জেনে ফেলেছেন এই চিন্তাই তাকে পাগল করে তুলল। তার খুব লজ্জা করতে লাগল। আর ভয়, লজ্জা ও ক্ষতি-বোধ সব কিছু মিলে তার কপাল, হাত ও পেটের ভিতরটা দপ্ দপ্ করতে লাগল।

''ডিনার দেওয়া হয়েছে!'' খাবার-টেবিলে মাশেংকার ডাক পড়ল।

সে কি নীচে নেমে যাবে, না যাবে না?

মাশেংকা চুলটা বাঁধল, ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছল, খাবার-ঘরে যাবার জন্য নিচে নেমে গেল। এরই মধ্যে সকলে খেতে শুরু করেছে।...টেবিলের এক প্রান্তে বসেছে ফেদোসিয়া ভাসিলিয়েভনা; মোটাসোটা চেহারা। মুখে একটা গম্ভীর ভাব; আর অপর প্রান্তে বসেছে নিকোলাই সের্গেয়েভিচ। দুই পাশে বসেছে অতিথিরা ও ছেলেমেয়েরা। ফ্রক-কোট ও সাদা দস্তানা পরা পরিচারকরা পরিবেশন করছে। বাড়ির গোলমাল এবং মাদামের ক্ষতির খবরটা সকলেই জেনেছে; তাই চুপচাপ আছে। কানে আসছে শুধু চিবুনোর শব্দ আর প্লেটের উপর চামচের টুং-টুং।

বাড়ির কর্ত্রীই প্রথম কথা বলল।

ক্লান্ত, যন্ত্রণাদীর্ণ গলায় একজন পরিচারককে সে জিজ্ঞাসা করল, ''তৃতীয় পদ হিসাবে আমরা কি পাচ্ছি?''

''এস্তার্জিওঁ আলা রুসে!'' পরিচারক উত্তর দিল।

নিকোলাই সের্গেয়েভিচ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ''ওটা আমিই ফরমাস করেছিলাম ফেনিয়া। মাছ খাবার একটু বাসনা হয়েছিল আর কি। তুমি যদি ওটা না চাও প্রিয়া, তাহলে ওরা যেন ওটা পরিবেশন না করে। আমার মনে হয়েছিল মাত্র, তুমি কিছু মনে করো না...''

নিজে ফরমাস না করলে সে খাদ্য ফেদোসিয়া ভাসিলিয়েভ্নার মুখে রোচে না। তার চোখ জলে ভরে উঠল।

গৃহবাসী ডাক্তার মামিকভ তার হাতে হাত বুলিয়ে মিষ্টি হাসি হেসে মিষ্টি স্বরে বলল, ''এবার সকলে শান্ত হতে চেষ্টা করুন। এমনিতেই আমরা যথেষ্ট মনমরা হয়ে আছি। আসুন, ব্রুচের কথাটা আমরা ভুলে যাই! একজন মানুষের স্বাস্থ্য দুই হাজার থেকেও বেশী দামী।''

মাদামের গাল বেয়ে একটা বড় অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল। সে জবাব দিল, ''দুই হাজার নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছিনা! জিনিসটার জন্যই আমি এতটা রেগে গেছি। আমার বাড়িতে আমি চোর পুষব না। এটা নিয়ে আমার ক্ষোভ নেই, কোন কিছু নিয়েই আমার ক্ষোভ নেই, কিন্তু আমার কাছ থেকে চুরি করাটা কত বড় কৃতজ্ঞতাহীনতা! আমার এত দয়াব এই পুবস্কার ..''

সকলেরই চোখ ছিল যার যার খাবারের পাত্রের দিকে, কিন্তু মাশেংকার মনে হল এই কথাগুলির পরেই সকলের চোখ পড়ল তার উপর। তার গলায়

একটা দলা পাকিয়ে উঠল ; কাঁদতে কাঁদতে একটা তোয়ালে দিয়ে মুখ চাপা দিল।

কোন রকমে বলল, ''আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার শরীরটা ভাল ঠেকছে না। মাথাটা ধরেছে। আমাকে ক্ষমা করবেন।''

সে টেবিল থেকে উঠে দাঁড়াল, সশব্দে চেয়ারটাকে সরিয়ে দিল, তাতে সে আরও বিচলিত বোধ করল, তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

নিকোলাই সের্গেয়েভিচ ভুরু কুঁচকে থেমে থেমে বলল, ''আহা বাছারে! ওর ঘরটা কিনা তল্লাসী করা হল! কাজটা একটু...কোন দরকার ছিল না।''

ফেদোসিয়া ভাসিলিয়েভ্না বলল, ''আমি তো বলি নি যে সে ব্রুচটা নিয়েছে। তুমি কি তার হয়ে কথা দিতে পার? আমি স্বীকার করছি, যে সব শিক্ষিত মিসেসদের হাতে টাকা-পয়সা নেই তাদের আমি বিশ্বাস করি না।''

''সত্যি এটার দরকার ছিল না ফেনিয়া... আমি দুঃখিত ফেনিয়া, কিন্তু আইন তোমাকে মানুষকে তল্লাসী করার অধিকার দেয় নি।''

''তোমার আইনের কথা আমি জানি না। আমি কেবল জানি আমার ব্রুচটা খোয়া গেছে...বাস। আর আমি সেটা খুঁজে বের করবই।'' হাতের কাঁটাটা সে সজোরে প্লেটের উপর ছুঁড়ে দিল ; তার দুই চোখ রাগে জ্বলতে লাগল। ''তুমি খাওয়াটা শেষ করে নিজের কাজে মন দাও!''

নিকোলাই সের্গেয়েভিচ ভয়ে ভয়ে মাথা নীচু করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এদিকে মাশেংকা ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার ভয় ও লজ্জা এতক্ষণে চলে গেছে, কিন্তু তার মনের মধ্যে জেগে উঠেছে একটা অপ্রতিরোধ্য জেদ...এখনই গিয়ে ওই হৃদয়হীন, দুর্বিনীত, স্থূলবুদ্ধি ও ভাগ্যবতী নারীর দুই গালে দুটো চড় কসিয়ে দেবে।

বিছানায় শুয়ে বালিশের উপর নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে তার মনে হল, বাইরে গিয়ে একটা অত্যন্ত দামী ব্রুচ কিনে এনে ওই নির্বোধ মেয়েমানুষটার মুখের উপর ছুঁড়ে দিতে পারলে কী ভালই হত। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি ফেদোসিয়া ভাসিলিয়েভ্না তার সব অর্থ খুইয়ে বসত, ভিক্ষা করে খেত আর দারিদ্র্য ও পরনির্ভরতার যন্ত্রণার অভিজ্ঞতাটা লাভ করে অপমানিত মাশেংকার কাছ থেকে হাত পেতে ভিক্ষা নিত! যদি সে নিজে একটা বড় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হতে পারত, একটা গাড়ি কিনে তার জানালার পাশ দিয়েই সশব্দে চালিয়ে যেতে পারত, আর সেও তাকে ঈর্ষা করত!

কিন্তু এ সবই তো দিবাস্বপ্ন মাত্র। বাস্তবে তো মাত্র একটি কাজই করার আছে—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাওয়া, আর একটি ঘণ্টাও এখানে থাকা নয়। অবশ্য চাকরিটা খুইয়ে সে যদি নিঃস্ব বাবা-মার কাছে ফিরে যায় সেটা তো খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে। কিন্তু এ ছাড়া আর কিই বা সে করতে পারে? তার কর্ত্রীকে বা তার ছোট ঘরখানাকে সে এখন দুই চোখে দেখতে পারছে না। নিজের অসুস্থতা ও কাল্পনিক বংশ-মর্যাদার প্রভাবে বিভোর ফেদোসিয়া ভাসিলিয়েভনা এখন মাশেংকার চোখে এতদূর বিরক্তিকর

হয়ে উঠেছে যে তার অস্তিত্বটাই জীবনের সব কিছুকে রুক্ষ ও কুৎসিত করে তুলেছে। মাশেংকা এক লাফে বিছানা থেকে উঠে বাঁধাছাদা শুরু করে দিল।

নিকোলাই সের্গেয়েভিচ বাইরে থেকে শুধাল, ''ভিতরে আসতে পারি ?'' কোন জবাব না শুনে দরজার কাছে এসে শান্ত গলায় শুধাল, ''আসতে পারি ?''

''আসুন।''

সে ভেতরে ঢুকে দরজার কাছে থেমে গেল। তার চোখ দুটো ঘোলাটে, লাল নাকটা চিকমিক করছে। সে যে বিয়ার খেয়েছে সেটা তার হাবভাবে এবং দুর্বল হাতের দোলানি দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

ঝুড়িটা দেখিয়ে সে শুধাল, ''এ সব কি ?''

''আমি জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করছি। আমাকে ক্ষমা করবেন নিকোলাই সের্গেয়েভিচ, এ বাড়িতে আমি আর থাকতে পারব না। ওই তল্লাসীর ব্যাপারে আমি খুবই অপমানিত হয়েছি।''

''আমি জানি...তবু তুমি যেয়ো না...কেন ? ওরা তোমার ঘরে তল্লাসী চালিয়েছে, কিন্তু....তাতে কি হয়েছে ? তোমার তো কিছুই হয় নি।''

কোন কথা না বলে মাশেংকা বাঁধাছাদাই করতে লাগল। নিকোলাই সের্গেয়েভিচ গোঁফে চাড়া দিল ঃ মনে হল এরপর কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। তারপর করুণাপ্রার্থীর সুরে বলল ঃ

''অবশ্য আমি বুঝেছি, কিন্তু এতটা কঠিন হয়ো না। আমার স্ত্রী অস্থিরচিত্ত ও একরোখা তা তো তুমি জানই। এত কঠোরভাবে তাকে বিচার করো না...''

মাশেংকা কিছুই বলল না।

নিকোলাই সের্গেয়েভিচ বলতে লাগল, ''তুমি যদি এতই অপমানিত বোধ করে থাক তাহলে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। দয়া করে আমার ক্ষমা প্রার্থনাটাকেই মেনে নাও।''

মাশেংকা কিছুই বলল না, কেবল সুটকেসটার উপর আরো কিছুটা ঝুঁকল। এই হতশ্রী, অস্থিরমতি লোকটিকে এই বাড়িতে কেউ মান্য করে না। এমন কি চাকর মহলেও সে একটি অপদার্থ গলগ্রহের শোচনীয় ভূমিকা পালন করে চলে। তার ক্ষমা প্রার্থনার কোন দাম নেই।

''হুম...তাহলে তুমি কিছুই বলবে না ? এটাও যথেষ্ট নয়, কি বল ? সে ক্ষেত্রে আমি আমার স্ত্রীর হয়ে ক্ষমা চাইছি। আমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে...তার আচরণ স্থূলবুদ্ধিরই প্রকাশ, আর একজন ভদ্রলোক হিসাবে স্বীকার করছি...''

নিকোলাই সের্গেয়েভিচ এদিক-ওদিক পায়চারি করল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর বলতে লাগল ঃ

''তাহলে তুমি চাও যে আমার বিবেক আমাকে যন্ত্রণা দিক, অ্যা ঠিক

এখানে, আমার অন্তরের মধ্যে...''

বড় বড় দুটি অশ্রুসিক্ত চোখ তুলে সোজা তাকিয়ে মাশেংকা বলল, ''নিকোলাই সের্গেয়েভিচ, আমি জানি আপনার কোন দোষ নেই। কেন বিবেক আপনাকে যন্ত্রণা দেবে?''

''তা ঠিক...তবু তুমি চলে যেয়ো না। তোমার কাছে এটা আমার প্রার্থনা।''

মাশেংকা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল। নিকোলাই সের্গেয়েভিচ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে জানালার কাঁচ বাজাতে লাগল।

সে বলল, ''এ ধরনের ভুল-বোঝাবুঝি আমার পক্ষে খুবই যন্ত্রণাস্বরূপ। আমাকে কি করতে হবে? তোমার সামনে নতজানু হব? তোমার অহং-এ আঘাত লেগেছে, তাই তুমি কেঁদেছ আর এখন চলে যাচ্ছ, কিন্তু আমারও তো অহং আছে, আর তাকে তুমি রেহাই দিচ্ছ না। অথচ তুমি কি চাও যে আমি তোমাকে এমন কিছু বলি যা আমি কখনও গির্জায় গিয়েও প্রকাশ করি নি? তাই কি চাও? শোন, তুমি কি চাও যে তোমার কাছে আমি এমন কিছু স্বীকার করি যা আমার মৃত্যুশয্যায়ও আমি কবুল করতাম না।''

মাশেংকা কিছুই বলল না।

''ক্রুচটা আমি নিয়েছি!'' হঠাৎ অসাবধানে নিকোলাই সের্গেয়েভিচ কথাটা বলে ফেলল। ''এবার হল তো? এখন খুশি হলে তো? হ্যাঁ, আমি...ওটা.. নিয়েছি। অবশ্য আমি নির্ভর করছি একমাত্র তোমার সুবিবেচনার উপর। ঈশ্বরের দোহাই, কাউকে একটি কথাও বলবে না, ইঙ্গিতটুকুও নয়।''

বিস্মিত, ভীত মাশেংকা বাঁধাছাদা করেই চলল। সব জিনিসপত্র কোনরকমে তুলে তুলে সুটকেস ও ঝুড়িতে বোঝাই করতে লাগল। এখন, নিকোলাই সের্গেয়েভিচের আকস্মিক অপরাধ-স্বীকারের পরে আর এক মুহূর্তও সে এখানে থাকতে পারে না। কেন যে এতদিন এ বাড়িতে বাস করল তাই সে বুঝতে পারছে না।

একটু থেমে নিকোলাই সের্গেয়েভিচ আবার বলতে লাগল, ''এতে অবাক হবার কিছু নেই...এটাই তো স্বাভাবিক। আমার টাকার দরকার, কিন্তু সে কোন টাকাই দেবে না। এই বাড়িটা এবং বাড়ির সব কিছুই আমার বাবার উপার্জন! এ সবই আমার, আর ক্রুচটা ছিল আমার মার, আর...এ সবই আমার! কিন্তু সে এসে সবই হাতিয়ে নিল...কিন্তু আমি তো তাকে আদালতে হাজির করতে পারি না, পারি কি....আমি অনুরোধ করছি, তাকে ক্ষমা কর, আর...এখানেই থেকে যাও। থাকবে তো?''

মাশেংকা থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল। দৃঢ়স্বরে বলল ''না! আপনাকে মিনতি করছি, আমাকে একা থাকতে দিন।''

সুটকেসের পাশে একটা বেঞ্চিতে বসে নিকোলাই সের্গেয়েভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ''ওঃ, ঠিক আছে। আমি স্বীকার করছি, এর পরেও যারা অপরাধ

নিতে পারে এবং ঘৃণা ও তৎসংশ্লিষ্ট সব কিছু অনুভব করে তেমন মানুষকে আমি পছন্দ করি। তোমার উদ্ধত মুখের দিকে তাকিয়ে আমি এখানে চিরকাল বসে থাকতে পারি।....তাহলে তুমি চলেই যাচ্ছ, তাই তো? আমি বুঝি...এই ভাবেই শেষ হতে বাধ্য...হ্যাঁ, অবশ্যই...তোমার পক্ষে এটা ঠিকই হয়েছে। কিন্তু আমার পক্ষে তা নয়। এই ইঁদুরের ফাঁদ থেকে আমার পালাবার কোন পথ নেই। কোন গ্রামের বাড়িতে গিয়েও আমার কোন লাভ নেই। কারণ সে সবই তো ওর চাটুকারে বোঝাই...নায়েব, কৃষিবিদ, সব—সব। তারা সব কিছু বন্ধক দেয়, তারপর আবার নতুন করে বন্ধক দেয়। তারা মাছ ধরে না, ঘাসে পা দেয় না, গাছ কাটে না।"

"নিকোলাই সের্গেয়েভিচ!" হল-ঘর থেকে ভেসে এল ফেদোসিয়া ভাসিলিয়েভ্নার গলা। "অগ্নিয়া, তোমার মনিবকে ডাক!"

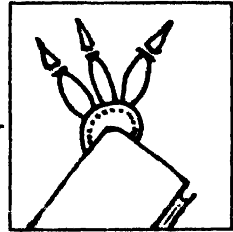
তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হাঁটতে হাঁটতে নিকোলাই সের্গেয়েভিচ বলল, "তাহলে তুমি থাকছই না? তোমার থাকা উচিত, বুঝলে। সন্ধেবেলাটা তোমাকে দেখতে একবার আসতে পারি....আর গল্প-গুজব করতে পারি। কি বল? তুমি থেকে যাবে না? তুমি চলে গেলে সারা বাড়িতে একটা মানুষের মুখও থাকবে না? সে বড় ভয়ংকর!"

নিকোলাই সের্গেয়েভিচ বিষণ্ণ, ফোলা মুখে তাকে অনুরোধ জানাল. কিন্তু মাশেংকা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল, আর নিকোলাই দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আধা ঘন্টা পরে মাশেংকাও পথে নামল।

১৮৮৬

আবির্ভাব



Anyuta

লিস্‌বনের সুসজ্জিত এপার্টমেন্ট-হাউসের সব চাইতে সস্তার একটা ঘরে তৃতীয় বর্ষের ডাক্তারী ছাত্র স্তেপান ক্লোচ্‌কভ এ কোণ থেকে ও কোণে পায়চারি করতে করতে ভীষণভাবে ডাক্তারী পড়া মুখস্ত করছে। সেই অবিশ্রাম উন্মাদ প্রচেষ্টার ফলে তার গলা শুকিয়ে গেছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

চারদিকে বরফের আলপনা আঁকা জানালার ধারে একটা টুলে বসে আছে তার ঘর-সঙ্গী আনিউতা; ছোটখাট সরু শ্যামলা মেয়েটি, বয়স প্রায় বছর পঁচিশ, বিষণ্ণ দুটি নরম চোখ। হাতের কাজটার উপর কুঁজো হয়ে বসে সে একটা পুরুষের শার্টের কলারে লাল সুতোর বুটি তুলছিল। কাজটা জরুরী। বারান্দার ঘড়িতে কর্কশ শব্দে দুটো বাজল, কিন্তু ঘরটা এখনও পরিষ্কার করা

বা গোছানো হয় নি। ভাঁজ-ভাঙা কম্বল, ছড়ানো কুশন, বই, পোশাক, একটা বড় নোংরা জলভর্তি বাটিতে সিগারেটের পোড়া অংশগুলি ভাসছে, আর মেঝেতে রাখা জঞ্জালের বাক্স—মনে হচ্ছে সব কিছু যেন ইচ্ছা করেই স্তূপাকার করে তালগোল পাকিয়ে রাখা হয়েছে...।

''ডান দিকের ফুসফুসের তিনটি অংশ...'' ক্লোচকভ পাগলের মত পড়ে চলেছে। ''বিভাগগুলি! উপরের অংশটি বক্ষ-গহ্বরের সম্মুখস্থ প্রাচীরের চতুর্থ বা পঞ্চম পঞ্জরাস্থি থেকে পাশের দিকে চতুর্থ পঞ্জরাস্থি পর্যন্ত প্রসারিত...এবং পৃষ্ঠদেশে শিরদাঁড়ার স্কন্ধাস্থি পর্যন্ত...''

এই মাত্র যা পড়ল তার একটা ছবি আঁকার প্রচেষ্টায় ক্লোচকভ সিলিং-এর দিকে তাকাল। একটা স্পষ্ট ছবি না পাওয়ায় ওয়েস্টকোটের ভিতর দিয়ে নিজের উপরদিককার পঞ্জরাস্থিগুলো টিপে দেখতে লাগল।

বলল, ''এই পাঁজরাগুলো পিয়ানোর চাবির মত। অভ্যস্ত হলে তবেই জানা যায় কোনটা কি। সেগুলিকে ভাল করে দেখতে হবে কোন কংকালে ও জীবিত মানুষের দেহে।...আনিউতা এস তো, এত সব কোথায় আছে খুঁজে দেখি!''

সেলাইটা রেখে আনিউতা ব্লাউজটা খুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ক্লোচকভ মুখোমুখি হয়ে বসল, ভুরু কোঁচকাল, তারপর পাঁজরের হাড় গুণতে শুরু করল।

''হুম...প্রথম পাঁজরটা ধরতে পারছি না...সেটা কণ্ঠাস্থির পিছনে আছে।...এটা নিশ্চয় দ্বিতীয়টা...এখন তাহলে...এটাই তৃতীয়...এই তো চতুর্থ...হুম...এখন তাহলে...তুমি কাঁপছ কেন?''

''তোমার আঙুলগুলো ঠাণ্ডা!''

''ও কিছু নয়....তুমি আঘাত পাবে না, ওমন করে এঁকে বেঁকে যেয়ো না। তাহলে এটা তৃতীয় পাঁজর, আর এটা চতুর্থ।...তুমি শুটকো আছ বেশ আছ, কিন্তু তোমার পাঁজরের হাড় যে আমি ধরতেই পারছি না। এটা দ্বিতীয়...এটা তৃতীয়...না, এতে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল না, কেমন যেন গোলমেলে...ওগুলোকে আঁকতে হবে। আমার পোড়া কয়লার টুকরোটা কোথায় গেল?''

ক্লোচকভ পোড়া কয়লার টুকরোটা নিয়ে আনিউতার বুকের পাঁজরগুলোর মত কতকগুলি সমান্তরাল রেখা আঁকল।''

''বেশ হয়েছে। খুব পরিষ্কার হয়েছে...ঠিক আছে। এবার একটু টিপে দেখতে চাই। উঠে দাঁড়াও!''

আনিউতা উঠে দাঁড়িয়ে থুতনিটা তুলল। ক্রোচকভ আঙুল দিয়ে ঠুকে ঠুকে দেখতে শুরু করল। আর সে কাজে এতই ডুবে গেল যে তার খেয়ালই হল না যে ঠাণ্ডায় আনিউতার ঠোঁট, নাক ও আঙুলগুলো নীল হয়ে গেছে। আসলে আনিউতা কাঁপছে ভয়ে। তার ভয় পাছে ছাত্রটি তার কাঁপুনি দেখে আঁকা ও ঠুকে দেখাটা থামিয়ে দেয় এবং তার পরীক্ষার ফল খারাপ হবে

যায়।

''এখন সব কিছু পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি।'' কথাগুলি বলে ক্লোচ্‌কভ ঠকে দেখাটা বন্ধ করল। ''তুমি ওখানে গিয়ে বসে পড়, আর কয়লার আঁকগুলো মুছে ফেলো না। ততক্ষণ আমি আর একটু মুখস্ত করে নিই।''

ছাত্রটি আবার এদিক ওদিক পায়চারি করতে করতে আপন মনে পড়া আবৃত্তি করতে লাগল। উল্কি-আঁকা মেয়েদের মত পিঠের উপর কয়লার টানগুলো নিয়ে আনিউতা শীতে কুঁজোর মত হয়ে ভাবতে লাগল। সাধারণতই সে কথা বলে খুব কম; চুপচাপ থাকে আর সারাক্ষণ শুধু ভাবে আর ভাবে।

সুসজ্জিত ঘরে ছয়-সাত বছর কাটিয়ে ক্লোচ্‌কভের মত জনাপাঁচেক লোকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। এখন তারা সকলেই পড়াশুনার পাট চুকিয়ে জগতে নিজ নিজ জায়গা করে নিয়েছে এবং সৎ ও সম্মানিত নাগরিকদের মতই কবে তাকে ভুলেও গেছে। তাদের মধ্যে একজন প্যারিসে থাকে, দু'জন ডাক্তার হয়েছে, চতুর্থজন শিল্পী, আর পঞ্চমজন অধ্যাপক হয়েছে বলে শোনা যায়। ক্লোচ্‌কভ হল ষষ্ঠজন...অচিরেই সেও পড়াশুনা শেষ করে সংসারে তার নিজের জায়গাটা খুঁজে নেবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ক্লোচ্‌কভের সামনে আছে এক বিরাট ভবিষ্যৎ। হয় তো সেও একজন গণ্যমান্য লোক হবে। কিন্তু তার বর্তমানটা মোটেই ভাল নয়ঃ তার তামাক ও চায়ে টান পড়েছে, আর চিনির ডেলা আছে মাত্র চারটি। মেয়েটিকে তাড়াতাড়ি তার সূচী-শিল্পটা শেষ করতে হবে, যে লোকটি এটার বরাত দিয়েছিল তার হাতে কাজটা তুলে দিতে হবে। আর তার দরুণ যে পঁচিশ কোপেক সে পাবে তাই দিয়ে কিনতে হবে চা ও তামাক।

''ভিতরে আসতে পারি?'' বাইরে থেকে কে যেন বলল।

আনিউতা তাড়াতাড়ি একটা পশমী শাল কাঁধে জড়িয়ে নিল। ঘরে ঢুকল চিত্রকর ফেতিসভ।

তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ক্লোচ্‌কভকে বলল, ''তোমার কাছে একটা উপকার চাইতে এসেছি। দয়া করে তোমার এই সুন্দরীটিকে দু'এক ঘন্টার জন্য আমাকে ধার দাও! আমি একটা ছবি আঁকছি, বুঝলে; তাই একজন মডেল আমার চাই-ই।''

ক্লোচ্‌কভ সম্মতি জানিয়ে বলল, ''নিশ্চয়, নিশ্চয়! তুমি চলে যাও আনিউতা।''

''কিন্তু কিসের জন্য আমি যাব?'' আনিউতা শান্তভাবে বলল।

''আরে! আর্টের জন্য যাবে, কোন তুচ্ছ কারণে নয়। যদি পার তো সাহায্য করবে না কেন?''

আনিউতা পোশাক পরতে শুরু করল।

ক্লোচ্‌কভ শুধাল, ''তুমি কি নিয়ে ছবি আঁকছ?''

''মন। খুব ভাল বিষয়বস্তু, কিন্তু মনে হচ্ছে এ নিয়ে চলবে না। নানা

রকম মডেল ব্যবহার করতে হয়। গতকাল একজনকে নিয়ে ছবি আঁকলাম, তার পা দুটো নীল। আমি শুধালাম তার পা নীল কেন, আর সে বলল তার মোজা নেই। তুমি দেখছি সারাক্ষণ পড়েই চলেছ। এত ধৈর্য থাকা সৌভাগ্যের লক্ষণ!''

''মুখস্থ না করলে ডাক্তারী পড়া চালানো যায় না।''

''হুম...তুমি যদি কিছু মনে না কর ক্লোচ্‌কভ তাহলে একটা কথা বলি, তুমি বাস করছ একটা শুয়োরের খোঁয়াড়ে! আসল শুয়োরের খোয়াড়!''

''দেখ, সেটা আমার দোষ নয়। আমার উপায় নেই...বাবার কাছ থেকে আমি পাই প্রতি মাসে মাত্র বারো রুবল্, আর সে টাকায় তুমি নিশ্চয় ভদ্রভাবে বাস করতে পার না।''

অনবরত নাক কুঁচকে চিত্রকর বলল, ''তা অবশ্য সত্যি, কিন্তু তুমি এর চাইতে ভালভাবে তো থাকতে পার...একজন সংস্কৃতিবান লোককে নান্দনিক হতেই হবে। সেটা তো তুমিও মান, না কি? তাকিয়ে দেখ! এই এলোমেলো বিছানা। সব কিছু ছড়ানো-ছিটনো, প্লেট-ভর্তি গতকালের পরিজ দিয়ে তৈরি কেক...উঃ।''

বিচলিত ছাত্রটি বলল, ''তা সত্যি। কিন্তু সব কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার সময় আজ আনিউতা পায় নি। সে আজ খুব ব্যস্ত।''

চিত্রকর ও আনিউতা বেরিয়ে গেলে ক্লোচ্‌কভ ডিভানে শুয়ে আবার পড়া মুখস্থ করতে শুরু করল; পড়তে পড়তে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল; এক ঘন্টা পরে জেগে উঠে দুই হাতের উপর মাথা রেখে নানা রকম বিষণ্ণ চিন্তায় ডুবে গেল। একজন সংস্কৃতিবান মানুষকে নান্দনিক হতেই হবে—চিত্রকরের এই কথাগুলি মনে পড়ে গেল, আর নিজের পরিবেশটা এবার সত্যি তার কাছে বিরক্তিকর বলে মনে হল। মনে মনে সে যেন ভবিষ্যতের একটা ছবি দেখতে পেল—তখন নিজের অস্ত্রোপচার-কক্ষে সে রোগীদের পরীক্ষা করবে, প্রশস্ত খাবার ঘরে স্ত্রীকে নিয়ে চা খাবে, তার স্ত্রী হবে একটি ভদ্র, সম্ভ্রান্ত নারী, তার রান্না-করা বাটিতে সিগারেটের টুকরো ভাসতে দেখে সে শিউরে উঠবে। আনিউতাকে মনে হল কুৎসিত, নোংরা ও করুণ...সে স্থির করল, যা থাকে কপালে এই মুহূর্তেই সে আনিউতার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

আনিউতা যখন চিত্রকরের কাছ থেকে ফিরে এসে কোটটা খুলছে তখনই ছাত্রটি উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলল ঃ

''দেখ বন্ধু...একটু বসে আমার কথা মন দিয়ে শোন। এবার আমাদের সরে যাওয়াই ভাল। এক কথায়, আমি আর তোমার সঙ্গে থাকতে চাই না।''

আনিউতা শ্রান্ত, ক্লান্ত হয়ে চিত্রকরের কাছ থেকে ফিরেছে। দীর্ঘ সময় বিবস্ত্র হয়ে বসে থাকার ফলে তার মুখটা শুকনো ও চিবুক তীক্ষ্ণ দেখাচ্ছে। ছাত্রটির কথার জবাবে সে কিছুই বলল না। কেবল তার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল।

ছাত্রটি বলল, ''আগে হোক পরে হোক আমাদের তো আলাদা হতেই হত, তাই না? তুমি ভাল মেয়ে, তোমার দয়া-মায়া আছে, তুমি বুঝতে পারছ...''

আনিউতা আবার কোটটা গায়ে দিল, নীরবে তার সেলাইটা কাগজে মুড়ল, সুঁচ-সুতো তুলল; তার চোখে পড়ল কাগজে-মোড়া চারটে চিনির টুকরো জানালার গোবরাটে পড়ে আছে; সেগুলোকে তুলে টেবিলে বইয়ের পাশে রেখে দিল।

চোখের জল লুকিয়ে রাখতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে শান্ত গলায় বলল, ''এগুলো তোমার....''

''তুমি কাঁদছ কেন?'' ক্লোচ্‌কভ শুধাল।

অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করতে করতে সে বলল: ''সত্যি, তুমি খুব মজার মানুষ...তুমি নিজেও জান আমাদের সরে যেতে হবেই। চিরকাল আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি না।''

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বিদায় নিতে ঘুরে দাঁড়ালে হঠাৎ ছেলেটি তার জন্য দুঃখিত বোধ করল।

সে ভাবল, ''কেন সে আরও একটা সপ্তাহ থেকে যেতে পারল না? হ্যাঁ, সে আর একটা সপ্তাহ থেকে যাক, তারপর তাকে যেতে বলব।''

নিজের অস্থিরচিত্ততায় নিজের উপরেই রাগ করে সে কঠোর কণ্ঠে চীৎকার করে মেয়েটিকে বলল:

''আরে, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ কেন? যদি যেতেই হয় তো চলে যাও, আর যদি না যেতে চাও তো কোটটা খুলে এখানেই থেকে যাও! থাক!''

নিঃশব্দে, শান্তভাবে আনিউতা কোটটা খুলল, শান্তভাবে নাক ঝাড়ল, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, এবং যথাস্থানে—জানালার পাশে টুলের উপর বসল।

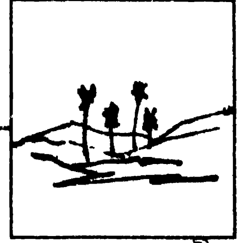
ছাত্রটি বইয়ের পাতায় নাক ঠেকিয়ে পুনরায় এ-কোণ থেকে ও-কোণে পায়চারি করতে শুরু করল।

''ডান দিকের ফুসফুসের তিনটি অংশ''...সে আবৃত্তি শুরু করল। ''উপরের অংশটি বক্ষগহ্বরের সম্মুখস্থ প্রাচীরের চতুর্থ বা পঞ্চম পঞ্জরাস্থি পর্যন্ত প্রসারিত...''

বারান্দায় কে যেন চেঁচিয়ে বলল, ''সামোভারটা নিয়ে এস গ্রিগরি!''

১৮৮৬

একটি ছোট্ট তামাসা



A Little Joke

সূর্যস্নাত শীতের অপরাহ্ন। এত বেশী ঠাণ্ডা পড়েছে যে পায়ের নীচে বরফের মচ্‌-মচ্‌ শব্দ হচ্ছে। নাদেংকা ও আমি হাত ধরাধরি করে হাঁটছিলাম। তার কপালের কোঁকড়া চুলে ও ওষ্ঠের হাল্‌কা লোমের উপর টুকরো বরফের একটা রূপোলি পর্দা পড়ে গেছে। একটা উঁচু পাহাড়ের উপর আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের পায়ের নীচ থেকে পাহাড়ের তলা পর্যন্ত একটা ঢালু জমি খাড়া নেমে গেছে। তার উপর সূর্যের আলো পড়ে আয়নার মত চকচক করছে। উজ্জ্বল লাল কাপড়ে মোড়া একটা ছোট "টোবোগান গাড়ি" দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের পাশে।

আমি মিনতি করে বললাম, "চল নাদেংকা, দু'জনে শাঁ করে নীচে নেমে যাই। শুধু একবার। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার একটুও লাগবে না।"

কিন্তু নাদেংকা ভয় পেল। তার পায়ের ছোট গালোশজোড়া থেকে বরফ-ঢাকা উৎরাইয়ের তলদেশটা তার কাছে মনে হল একটা ভয়ংকর, অবিশ্বাস্য রকমেব গভীর গহ্বর। উৎরাইটার দিকে তাকিয়ে টোবোগানে চড়ার কথা ভাবতেই সে মুসড়ে পড়ল, তার দম বন্ধ হয়ে এল, আর সেই গহ্বরে ঝাঁপ দেবার ঝুঁকি নিলে যে কি হত তা কে জানে! সে হয় তো মরেই যেত, জ্ঞান হারিয়ে ফেলত।

আমি বললাম, "আমার কথা শোন! ভয় পেয়ো না! ভয় পাওয়াটা যে দুর্বল হৃদয়ের, ভীরুতার পরিচয় হবে সেটা কি বুঝতে পারছ না?"

শেষ পর্যন্ত নাদেংকা নরম হল। তার মুখ দেখে মনে হল, সে নিশ্চিত বুঝতে পেরেছে যে তার শেষের দিনটি ঘনিয়ে এসেছে। তার বিবর্ণ, কম্পিত দেহটাকে জড়িয়ে ধরে তাকে নিয়ে টোবোগানে উঠে বসেই সেই গহ্বরে ঝাঁপ দিলাম।

টোবোগানটা শোঁ-শোঁ শব্দে বাতাস কেটে বুলেটের গতিতে নীচে নামতে লাগল। সে বাতাস আমাদের মুখের উপর আঁচড় কেটে আমাদের কানে গর্জন করতে লাগল, তীব্র বেগে চাবুকের আঘাত হানতে লাগল, মনে হল বুঝিবা আমাদের মাথা দুটোকেই গলা থেকে ছিঁড়ে ফেলবে। বাতাস এত জোরে এসে মুখে লাগছে যে আমরা শ্বাস টানতেই পারছি না। মনে হল, স্বয়ং শয়তান বুঝি হি-হি করে আনন্দে হাসতে হাসতে আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে নরকের দিকে। চারদিককার সব কিছুই যেন একটা দ্রুত ধাবমান ভূখণ্ডের মত তালগোল পাকিয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে আর মাত্র একটি সেকেণ্ড, তাহলেই আমরা শেষ হয়ে যাব!

শান্ত গলায় আমি বললাম, ''আমি তোমাকে ভালবাসি নাদেংকা!''

টোবোগানের গতি ধীর হয়ে এল, বাতাসের গর্জন আর ধাবমান বস্তুর হিস্‌হিস্ শব্দ এখন আর তত ভয়ংকর মনে হচ্ছে না, ভালভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারছি, আর শেষ পর্যন্ত নিচেও পৌঁছে গেলাম। নাদেংকার তখন জীবন্মৃত অবস্থা; দেহ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, অতিকষ্টে নিঃশ্বাস ফেলছে...তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলাম।

ত্রাসচকিত, বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, ''কোন কিছুর জন্যই আর আমি নীচে নামছি না। পৃথিবীটার জন্যও না! আমি তো প্রায় মরেই গিয়েছিলাম!''

একটু পরেই সে সুস্থ হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে বার বার তাকাতে লাগল ঃ ওই চারটি শব্দ কি আমি বলেছিলাম, না কি বাতাসের স্বর শুনে সে কথাগুলি কল্পনা করেছিল? তার পাশেই দাঁড়িয়ে আমি ধূমপান করতে করতে সযত্নে আমার দস্তানাটাকে দেখছিলাম।

হাত বাড়িয়ে সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। পাহাড়ের পাশে পাশে দু'জনে অনেকক্ষণ হাটলাম। শব্দ কয়েকটা যেন তাকে স্বস্তি দিচ্ছে না! সেগুলি কি আমি বলেছিলাম, না বলি নি? হাঁ কি না? হাঁ কি না? প্রশ্নটা গর্বের, সম্মানের, জীবনের, সুখের, খুবই গুরুতর প্রশ্ন, পৃথিবীর সবচাইতে গুরুতর প্রশ্ন। নাদেংকা বার বার আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি হানছে, কথার উত্তর দিচ্ছে অন্যমনস্কভাবে, আমার মুখ থেকে কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করছে। আহা, সেই প্রিয় মুখখানিতে কত না ভাবের খেলা। আমি দেখতে পাচ্ছি, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে ক্ষতবিক্ষত, কিছু বলতে চাইছে, জানতে চাইছে কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছে না, কেমন যেন বিব্রত, ভীত, উল্লসিত বোধ করছে...

আমার দিকে না তাকিয়েই বলল, ''তুমি কি জান?''

''কি?'' আমি প্রশ্ন করলাম।

''চল কাজটা আবার করি...নীচে ঝাঁপ দিয়েছিলাম।''

আমরা সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেলাম। আবার বিবর্ণ, কম্পিত নাদেংকাকে ধরে টোবোগানে চড়লাম, আবার সেই ভয়ংকর গহ্বরে ঝাঁপ দিলাম, আবার বাতাস গর্জন করল, গাড়িটা হিস্‌হিস করল, আবার একটি দ্রুততম, শব্দমুখর মুহূর্তে আমি শান্ত গলায় বললাম ঃ ''আমি তোমাকে ভালবাসি নাদেংকা!''

টোবোগানটা থামলে যে পাহাড়টা বেয়ে এইমাত্র আমরা নেমে এলাম নাদেংকা প্রথমে সেটার দিকে তাকাল, তারপর অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, আমার শান্ত উচ্ছ্বাসহীন কথাগুলি শুনল, আর তখনই তার সব কিছুতে, এমন কি তার দস্তানা ও টুপিতে, তার সারা দেহে ফুটে উঠল চরম হতাশা। তার মুখের ভাষা আমি পড়তে পারলাম ঃ

''এ সব কি হচ্ছে? ঐ কথাগুলি কে বলল? সে কি বলল, না কি সবই

আমার কল্পনা ?''

এই চরম অনিশ্চয়তা তাকে বিব্রত করল, তার ধৈর্যের উপর চাপ সৃষ্টি করল। বেচারি মেয়েটি আমার কোন প্রশ্নের জবাব দিল না; ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ জলে ভরে উঠল।

''আমরা কি বাড়ি যাব ?'' আমি শুধালাম।

মুখটা লাল করে সে বলল, ''কিন্তু আমি...এই শাঁ করে নেমে যাওয়াটা আমার বড় ভাল লেগেছে। আর একবার নামা যায় না ?''

নেমে যাওয়াটা তার ''ভাল লেগেছে'', কিন্তু টোবোগানে চড়তেই সে ফ্যাঁকাসে হয়ে গেল, কাঁপতে লাগল, এত বেশী ভয় পেয়ে গেল যে আগের মতই ভাল করে শ্বাস টানতে পারছিল না।

আমরা তৃতীয়বার নীচে নেমে গেলাম। দেখলাম, সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তার দৃষ্টি আমার ঠোঁট দুটির উপর। কিন্তু আমি মুখের উপর একটা রুমাল চাপা দিয়ে কাশলাম, আর অর্ধেক পথ নেমেই কোনরকমে বলে উঠলাম ঃ

''আমি তোমাকে ভালবাসি নাদেংকা !''

অতএব ধাঁধাটার কোন সমাধান হল না। নাদেংকা চুপচাপ নিজের চিন্তার মধ্যেই ডুবে রইল।...নীচে নেমে আমি যখন তাকে বাড়ির দিকে নিয়ে চললাম তখন সে হাঁটতে লাগল ধীরে ধীরে, যেন অপেক্ষা করতে লাগল কখন আমি জোর গলায় কথাগুলো তাকে বলি। আমি বুঝতে পারছি সে খুব যন্ত্রণা ভোগ করছে; আপ্রাণ চেষ্টা করছে যাতে তার মুখ দিয়ে এই কথাগুলো না বের হয় ঃ

''বাতাস তো সে কথাগুলো বলতে পারে না! আমি চাই না যে সে কথাগুলো বলুক !''

পরদিন সকালে একটি চিরকুট পেলাম ঃ তুমি যদি আজ সেই ঢালুটায় যাও তো যাবার পথে আমাকে ডেকে নিও। এন।'' আর সেই থেকে নাদেংকা ও আমি প্রতিদিন সেই ঢালুটায় যাই, আর প্রতিটি দিন টোবোগানে চড়ে সবেগে নীচে নামার সময় শান্ত গলায় সেই একই কথা বলি ঃ

''আমি তোমাকে ভালবাসি নাদেংকা !''

অচিরেই এই কথা কয়টির প্রতি নাদেংকার নেশা ধরে গেল, যেমন নেশা ধরে মদ বা মরফিনের প্রতি। এই কথাগুলি ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। এ কথা সত্যি, পাহাড় থেকে সবেগে নীচে নামতে সে আজও ভয় পায়, কিন্তু সেই ভয় ও বিপদই যেন ভালবাসার কথাকয়টিতে একটা বিশেষ আকর্ষণ জুড়ে দিয়েছে, সে কথাকয়টি আজও তার কাছে একটা রহস্য হয়ে আছে, তার অন্তরকে যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত করছে। সেই একই সন্দেহ আজও আছে ঃ আমি না বাতাস, তার প্রতি এই ভালবাসার কথা কে বলেছে তা সে জানে না, বুঝি জানতে চায়ও না। সুরার যদি নেশা লাগে তো পাত্রে কি যায়-আসে !

ফেব্রু: —১—১৯

একদিন বিকেলে আমি একা গেলাম সেই ঢালু পাহাড়ে। ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, নাদেংকা হাঁটিতে হাঁটিতে পাহাড় পর্যন্ত গিয়ে আমার খোঁজে চারদিকে তাকাচ্ছে।...তারপর সিঁড়ি বেয়ে ভয়ে ভয়ে উঠতে লাগল।...একা একা সবেগে নেমে আসা ভয়ানক ব্যাপার, আঃ, খুবই ভয়ানক! কাঁপতে কাঁপতে বরফের মত সাদা হয়ে সে দৃঢ় পদক্ষেপে এমনভাবে হেঁটে চলল যেন ফাঁসি-কাঠে চড়তে যাচ্ছে, অথচ একবারও ফিরে তাকাচ্ছে না। স্পষ্টতই সে ধরে নিয়েছে, আমি সেখানে না থাকলেও সেই আশ্চর্য মধুর কথা কয়টি সে শুনতে পায় কিনা সেটাই পরখ করে দেখবে। আমি দেখলাম, ভয়ে বিবর্ণ হয়ে মুখটা হা করে সে একটা টোবোগানে উঠল, চোখ দুটো বুজল, তারপর পার্থিব জীবনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খর গতিতে ঢালু বেয়ে নামতে লাগল। হুশ্! টোবোগান ছুটছে। নাদেংকা কথাগুলি শুনতে পেল কিনা বলতে পারব না...আমি শুধু দেখলাম, দুর্বল ক্লান্ত দেহে সে টোবোগান থেকে বের হল। তার মুখ দেখেই আমি বলে দিতে পারতাম, সে কিছু শুনতে পেয়েছে কিনা তা সে নিজেই জানত না। নীচে নামবার সময়কার আতংকে তার শুনবার ক্ষমতা, শব্দের তারতম্য বোঝার ক্ষমতা, বুদ্ধির ক্ষমতা সব হরণ করে নিয়েছিল...

কিন্তু তারপর মার্চ মাস এল...সেই সঙ্গে এল বসন্তকাল...সূর্য আতপ্ত হল। আমাদের বরফ-ঢাকা ঢালুটা অন্ধকার হয়ে গেল, তার ঝকঝকানি হারিয়ে গেল, একসময় বরফ গলতে শুরু করল। আমরাও টোবোগানে চড়ে যাতায়াত বন্ধ করলাম। এখন বেচারি নাদেংকার এমন কোন জায়গা নেই যেখানে গেলে সেই শব্দগুলো শুনতে পায়, এমন কেউ নেই যে সেই শব্দগুলো মুখে বলে, কারণ বাতাস পড়ে গেছে, আর আমিও পাড়ি দিয়েছি সেন্ট পিটার্সবার্গে, হয় তো চিরদিনের মত।

সেখান থেকে চলে যাবার দু'একদিন আগে এক গোধূলি সন্ধ্যায় আমি বাগানে বসে ছিলাম। একটা কাঁটা-বসানো উঁচু বেড়া দিয়ে নাদেংকাদের উঠোন থেকে বাগানটা আলাদা করে দেওয়া।....তখনও বেশ ঠাণ্ডা, জমির উপরকার গোবরের নীচে এবং পাতা ঝরা গাছের নীচে তখনও বরফ আছে, কিন্তু বাতাসে বসন্তের স্পর্শটা বোঝা যায়, দাঁড়কাকগুলো ঘুমিয়ে পড়ার আগে তারস্বরে ডেকে চলেছে। বেড়াটার কাছে গিয়ে একটা ফাটলের ভিতর দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। দেখলাম, নাদেংকা বারান্দায় বেরিয়ে এসে বিষণ্ন, উৎসুক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।...বসন্তের বাতাস এসে সোজাসুজি তার বিবর্ণ, হতাশ মুখের উপর পড়ছে। সেই শব্দ শুনে তার মনে পড়ে গেল পাহাড়ের উপরকার আর একটা বাতাসের গর্জনে যখন সে শুনতে পেয়েছিল সেই চারটি কথা। তার মুখটা বিষণ্ন হয়ে উঠল, গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল এক ফোঁটা চোখের জল...অসহায় মেয়েটি এমনভাবে দুই হাত বাড়িয়ে দিল যেন বাতাসের কাছে প্রার্থনা করছে সেই কথাকয়টিকে আবার বয়ে নিয়ে আসতে। আর, আবার যখন বাতাস উঠল তখন আমি

শান্তস্বরে বললাম ঃ

''আমি তোমাকে ভালবাসি নাদেংকা!''

কী আশ্চর্য, নাদেংকার হল কি! সে চীৎকার করে উঠল, তার সারা মুখ ঝলমল্ করে উঠল, দুটি হাত বাড়িয়ে দিল বাতাসের দিকে—আনন্দে, খুশিতে ভরপুর হয়ে উঠল।

আমি ভিতরে গেলাম জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করতে...

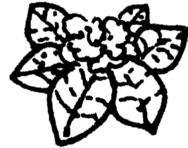
সে অনেক কাল আগেকার কথা। এখন নাদেংকা বিবাহিতঃ তাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, না সে নিজেই বিয়ে করেছে তাতে কিছু যায়-আসে না; সে বিয়ে করেছে অছি পরিষদের সচিবকে; তার তিনটি সন্তান হয়েছে। সে ভুলে যায় নি যে আমরা টোবোগানে চড়ে একত্রে গিয়েছিলাম আর বাতাস তাকে শুনিয়েছিল সেই কথাগুলি ''আমি তোমাকে ভালবাসি নাদেংকা!'' এটাই তার কাছে সবচাইতে সুখের, সবচাইতে মধুর ও সবচাইতে মূল্যবান স্মৃতি....

কিন্তু আজ তো আমিও বুড়ো হয়েছি; আজ আর আমি মনে করতে পারি না কেন সেদিন কথাগুলি বলেছিলাম, কেন এই ছোট্ট তামাসার খেলা খেলেছিলাম....

১৮৮৬

আগাফিয়া

Agafia



এস জেলা পরিভ্রমণের সময়ে দুবভ্স্কির সব্জি বাগানে পাহারাদার সাব্বা স্তুকাচ, বা এক কথায় সাভ্কার সঙ্গে আমি বেশ কিছু দিন কাটিয়েছিলাম। ঐ সব্জি বাগানগুলি ছিল আমার সাধারণভাবে মাছ ধরার প্রিয় জায়গা। সেখানে যাবার জন্য যখন বাড়ি থেকে বের হতাম তখন কবে যে ফিরব সে সম্পর্কে কোন ধারণাই থাকত না; মাছ ধরার সব রকম সাজসরঞ্জাম ও প্রচুর খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়েই সেখানে চলে যেতাম। আসলে, মাছ ধরাটা আমার কাছে বড় আকর্ষণ ছিল না; আমাকে টানত সেখানকার স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ চলাফেরা, অসময়ে খাওয়া, সাভ্কার সাথে গল্প করা, আর গ্রীষ্মকালের শান্ত, দীর্ঘ রাতগুলি ছটফট করে কাটানো। সাভ্কা প্রায় পঁচিশ বছরের যুবক, দীর্ঘকায়, সুদর্শন ও ষাঁড়ের মত শক্তিশালী। সকলেই বলত সে বুদ্ধিমান, লিখতে-পড়তে জানে, কদাচিৎ ভদ্কা খায়, কিন্তু কাজকর্মের বেলায় একেবারে অষ্টরম্ভা। চাবুকের মত শক্ত মাংসপেশীর পাশাপাশি তার মধ্যে বাস করত একটি দুর্জয় আলস্যপরায়ণতা। অন্য সকলের মতই সে গ্রামেই বাস করত নিজের জমিতে নিজস্ব কাঠের বাড়িতে, অথচ লাঙল

চালাত না, বা বীজ বুনত না, কোন ব্যবসাও করত না। তার বুড়ি মা ভিক্ষে করে খাবার জোগাত, আব সে নিজে দিনেব পব দিন কাটিয়ে দিত, অথচ সকালেও জানত না দুপুরে কি খাবে। তার যে ইচ্ছাশক্তি ছিল না, উৎসাহ ছিল না, মার প্রতি সহানুভূতি ছিল না তাও নয়, এক কথায় কাজ করার কোন তাগিদই সে বোধ করত না, কাজ কবাটাকে সে দরকারী বলেই মনে করত না।...তার সমস্ত শরীর থেকেই যেন বিচ্ছুরিত হত একটা স্থৈর্য, কোন কিছু নিয়ে মাথা না ঘামানোর বেপরোয়া জীবনের প্রতি একটা সহজাত, প্রায় শিল্পীসুলভ আকর্ষণ। সাভ্‌কাব যৌবনকালের স্বাস্থ্যদীপ্ত দেহটা যখন পেশীসঞ্চালন কর্মের শাবীরিক প্রয়োজন অনুভব করত তখন ছেলেটা মেতে উঠত কোন স্বাধীন কিন্তু অপ্রয়োজনীয় কাজ নিয়ে, যেমন কোন অদরকারী গজালে ধার করত অথবা মেয়েদের সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ত। নিশ্চল মনঃসংযোগই ছিল তার প্রিয় অবস্থা। কোন নির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে তাকিয়ে তিলমাত্র নড়াচড়া না করে ঘন্টার পর ঘন্টা সে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারত। সে চলাচল করত একমাত্র তখনই যখন তার মন সেটা চাইত, অথবা যখনই কোন দ্রুত কাজ করার সুযোগ জুটে যেত, যেমন একটা ছুটন্ত কুকুরের লেজ ধরে টানা, কোন স্ত্রীলোকের মাথার স্কার্ফ তুলে নেওয়া অথবা একটা বড় নালা লাফিয়ে পাব হওয়া।

একথা বলাই বাহুল্য যে চলাফেরার প্রতি এই বিরূপতার জন্য সাভ্‌কা ছিল গির্জার ইঁদুরের মতই গরিব। যথারীতি অনিবার্যভাবেই তাব ট্যাক্স অনেক বাকি পড়ে যেত ; ফলে স্বাস্থ্যবান যুবক হওয়া সত্ত্বেও গ্রাম পরিষদ তাকে পাঠাত একটা বুড়ো মানুষের কাজ করতে, যেমন জনসাধারণের সব্জি-বাগানগুলোর পাহারাদার ও কাকতাড়ুয়ার কাজ। অকালে বুড়ো সাজবার জন্য সকলে তাকে নিয়ে যত হাসাহাসিই করুক না কেন সে তাতে ভ্রূক্ষেপও কবত না। নিশ্চল ধ্যানের উপযোগী এই শান্ত জায়গাটিই ছিল তার পক্ষে সঠিক জায়গা।

একবার ঘটনাক্রমে মে মাসের একটি চমৎকার সন্ধ্যা আমি সাভ্‌কার সঙ্গে কাটিয়েছিলাম। মনে পড়ে, ডালপালা ও খড় দিয়ে তৈরী একটা কুঁড়ে ঘরের ঠিক পাশেই একটা জীর্ণ কম্বল বিছিয়ে আমি শুয়েছিলাম। কুটিরের ভিতর থেকে বাতাসে ভেসে আসছিল শুকনো ঘাসপাতার একটা তীব্র সুগন্ধ। দুটো হাত ভাঁজ করে মাথার নীচে রেখে আমি তাকিয়েছিলাম সামনের দিকে। পায়ের কাছে পড়ে ছিল একটা কাঠের উকনঠেঙা। সেটার পিছনে মাটির উপর ছিল একটা কালো বস্তু, সাভ্‌কার কুকুর কুৎকা, আর কুৎকার কয়েক ফুট পরেই মাটিটা খাড়া ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদী পর্যন্ত। সেখানে শুয়ে আমি নদীটা দেখতে পাচ্ছিলাম না ; চোখে পড়ছিল কেবল এ পারের উইলো গাছের ঝোপঝাড় আর ও পারে নদীতীর—সবই এমন ভাবে খাঁজ-কাটা যেন কেউ কামড়ে খেয়েছে। আরও দূরে একটা কালো পাহাড়ের উপর সাভ্‌কাদের গ্রামের বাড়িগুলো। গায়ে-গায়ে দাঁড়িয়ে আছে এক ঝাঁক ভীত

তিতির পাখির মত। পাহাড়ের ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। তখন অবশিষ্ট ছিল কেবল একটা ম্লান রক্তিম রেখা; কয়লার উপরকার ছাইয়ের মত খণ্ড খণ্ড ছোট মেঘগুলি ক্রমেই সে লাল আভাকে ঢেকে ফেলছিল।

সব্জি-বাগানের ডান দিকে ছিল একটা অন্ধকার অল্ডার গাছের ঝোপ। হঠাৎ এক ঝলক ঝড়ো হাওয়ায় তার পাতাগুলি কেঁপে কেঁপে নরম গলায় ফিস্‌ফিস্ করে উঠল। বাঁ দিকে একটা বড় মাঠ। অনেক দূরে গোধূলির আঁধারে চোখ যেখানে আকাশ ও পৃথিবীকে আলাদা করে চিনতে পারে না সেখানে একটা উজ্জ্বল আলো ঝিকমিক করছে। আমার কিছুটা দূরেই বসে ছিল সাভ্‌কা। তুর্কী ভঙ্গীতে পা দুটো মুড়ে মাথাটা নীচু করে সে চিন্তিত মুখে কুৎকার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমাদের টোপ-গাঁথা বড়শিগুলো অনেক আগেই নদীতে ফেলা হয়েছিল, কাজেই যে বিশ্রাম অক্লান্ত বিশ্রামবিলাসী সাভ্‌কার এত প্রিয় সেই বিশ্রাম উপভোগ কবা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিল না। সূর্যাস্তের আলো তখনও সম্পূর্ণ মুছে যায় নি, কিন্তু গ্রীষ্মের রাত এর মধ্যেই তার শান্ত, ঘুম-পাড়ানি আলিঙ্গনে প্রকৃতিকে জড়িয়ে ধরেছে।

সেই প্রথম গভীর ঘুমে সব কিছু নিশ্চুপ। কেবল একটা রাত-জাগা পাখি না জানি কোথা থেকে একটা অলস, দীর্ঘ, মুখর শব্দ করে যেন বলছে ''দেখছনিকি ?'' আবাব সঙ্গে সঙ্গে নিজেই উত্তর দিচ্ছে ''দেখছি! দেখছি!''

''আজ রাতে নাইটিঙ্গেল পাখিরা গাইছে না কেন?'' আমি সাভ্‌কাকে শুধালাম।

আমাকে দেখতে সে ধীরে ধীরে মুখ ফেরাল। তার চোখ-মুখ-নাক বেশ টানা-টানা, কিন্তু পরিষ্কার, স্বপ্রকাশ ও মেয়েদের মত নরম। তারপর নরম স্বপ্নালু চোখে ঝোপ-ঝাড়ের দিকে তাকিয়ে সে ধীরে ধীরে পকেট থেকে একটা বাঁশি বের করে মুখে লাগিয়ে একটা মেয়ে নাইটিঙ্গেল পাখির ডাক বাজাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে যেন তার বাঁশির ডাকের জবাব দিতেই একটা তীক্ষ্ণকণ্ঠ জলচব পাখি ডেকে উঠল।

সাভ্‌কা মুখটিপে হেসে বলল, ''ওই তোমার নাইটিঙ্গেল এসে হাজির হয়েছে...গ্রেট, গ্রেট! আমি বাজী ধরে বলতে পারি, ওই পাখিটারও ধারণা সে গান গাইছে।''

আমি বললাম, ''ওই পাখি আমি পছন্দ করি। কেন জান কি? ওরা যখন দেশান্তরে যায় তখন মোটেই ওড়ে না। মাটিতে হেঁটে যায়। ওড়ে কেবল নদী ও সাগরের উপর দিয়ে, অন্য সব সময় হাঁটে।''

''আরে, আমি তো জানতাম না!'' পাখিটার দিকে সসম্ভ্রম দৃষ্টিতে তাকিয়ে সাভ্‌কা চেঁচিয়ে বলল।

আমি জানতাম, নতুন কিছু শুনতে সাভ্‌কা খুব ভালবাসে। তাই শিকারের পুথিপত্র থেকে ওই জাতীয় পাখি সম্পর্কে যা কিছু জেনেছি সব তাকে বললাম। এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যাযাবর পাখিদের কথাও

উঠল। সাভ্‌কা মন দিয়ে শুনতে লাগল, চোখের পলকও পড়ল না, সারাক্ষণ খুশিমনে হেসেই চলল।

একসময় সে শুধাল, ''কিন্তু এই পাখিদের আসল বাড়ি কোথায়? এখানে না সেখানে?''

''অবশ্যই এখানে। এই সব পাখি এখানেই জন্মে। আবার এখানেই বাচ্চা দেয়। এটাই তাদের বাড়ি। শুধু শীতটা এড়াবার জন্যই তারা অন্যত্র উড়ে যায়।''

সাভ্‌কা ধীরে ধীরে বলল, ''বেশ আশ্চর্য তো! তুমি যা কিছু বল তাই শুনতে ভাল লাগে। ধব একটা পাখি, একজন মানুষ...এমন কি এখানকার একটা পাথরের নুড়ি—সব কিছুরই যেন একটা নিজস্ব অর্থ আছে। বড়ই লজ্জার কথা স্যার। আমি যদি জানতাম তুমি আসবে তাহলে আমার মেয়েমানুষটিকেও আজ আসতে বলতাম না...সে জানতে চেয়েছিল সে আজ আসতে পারে কি না....''

''ওহো, আমি সব বুঝতে পেরেছি। আমি কোন বিঘ্ন ঘটাব না!'' আমি বললাম, ''আমি এই বাগানেই ঘুমতে পারব।''

''ও হো, তা হয় না স্যার। সে তো আগামীকালও আসতে পারত।...সে যদি চুপচাপ বসে মন দিয়ে তোমার কথা শুনত, তাহলে তো সব ঠিকই ছিল, কিন্তু সে তো সারাক্ষণ বকর-বকর করবে। সে আশেপাশে থাকলে কথা বলাই দায়।''

একটু থেমে আমি বললাম, ''তুমি কি আশা করছ দারিয়া আসবে?''

''না...আজ একটি নতুন মানুষ সেধে আসছে...আগাফিয়া স্ত্রেল্‌চিখা।''

সাভ্‌কা কথাগুলি বলল তার স্বভাবসিদ্ধ নিরাসক্ত স্বরে, যেন তামাক বা পরিজের কথা বলছে। কিন্তু আমি বিস্ময়ে চমকে উঠলাম। আগাফিয়া স্ত্রেল্‌চিখাকে আমি চিনতাম। সে এখনও তরুণী, উনিশ-কুড়ি বছর বয়স, সবে গত বছর রেলওয়ের পয়েন্টস্‌ম্যানকে বিয়ে করেছে। সে থাকে গ্রামে, আর তার স্বামী প্রতি রাতে রেলওযে থেকে তাকে দেখতে আসে।

''মেয়েমানুষ নিয়ে তোমাব এই লীলা-খেলা একদিন বিপদ ডেকে আনবে,'' আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

''তাতে বয়েই গেল....''

এক মুহূর্ত কি ভেবে সাভ্‌কা আরও বলল ঃ

''আমি তো মেয়েমানুষগুলোকে সেই কথাই বলি, কিন্তু তারা কানই দেয় না....তারা যেন বিপদ খুঁজেই বেড়ায়, বোকার দল!''

দীর্ঘসময় সব চুপচাপ। ইতিমধ্যে অন্ধকার আরো ঘন হয়েছে, কোন কিছুর আকৃতি বোঝা যাচ্ছে না। পাহাড়ের পিছনকার রক্তিম রেখাগুলো একেবারেই মিলিয়ে গেছে, তারাগুলো আরও উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হয়েছে। ঝিঁঝিঁ পোকাদের একঘেয়ে বিষণ্ণ ঝিঁ-ঝিঁ ডাক, জলার পাখিটার কর্কশ কণ্ঠস্বর, ভারুই পাখির ডাক—কিছুতেই রাতের নিস্তব্ধতা বিঘ্নিত হয় নি,

বরং আরো গভীর হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, বিহঙ্গ ও পতঙ্গরা নয় বুঝিবা তারাগুলিই আকাশ থেকে নীচে আমাদের দিকে তাকিয়ে শান্ত সুরে গান গেয়ে আমাদের কানে সুধা ঢেলে দিচ্ছে...."

সাভ্‌কাই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল। দৃষ্টিটাকে কালো কুৎকার দিক থেকে আমার দিকে ফিরিয়ে বলল ঃ

"আমি বুঝতে পারছি স্যার, তোমাকে উৎসাহ দেওয়া দরকার। চল, এবার খাবারটা খেয়ে নেওয়া যাক।"

আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই সে হামাগুড়ি দিয়ে কুঁড়ে ঘরে ঢুকল আর এমন ভাবে খোঁজাখুঁজি শুরু করল যে ঘরটাই পাতার মত কাঁপতে লাগল; তারপর হামাগুড়ি দিয়েই ফিরে এসে আমার ভদ্‌কার বোতল ও একটা মাটির পাত্র আমার সামনে রাখল। পাত্রটাতে ছিল ডিম ভাজা, চর্বিতে রান্না-করা গমের পিঠে, কয়েক টুকরো কালো রুটি, আরও সব সামগ্রি!...দাঁড়িয়ে থাকতেই পারে না এমন একটা বাঁকা গ্লাসে করে আমরা ভদ্‌কা খেলাম, তার পরে খাবারে হাত দিলাম।...নুনটা ঘন ও ধূসর, পিঠেগুলো নোংরা ও চট্‌চটে, ডিমগুলো রবারের মত, কিন্তু সব কিছুই কত যে স্বাদু ছিল!

পাত্রটা দেখিয়ে আমি বললাম, "তুমি তো নিজের উপার্জনেই খাও, কিন্তু তুমি যে সব জিনিস এনেছ তার দিকে একবার তাকাও। এত সব তুমি কোথায় পেলে?"

সাভ্‌কা তো-তো করে বলল, "মেয়েমানুষরাই নিয়ে আসে।"

"কেন আনে?"

"আহা, দয়া করেই আনে..."

কেবল খাবার তালিকাতেই নয়, সাভ্‌কার পোশাকপত্রেও মেয়েমানুষের "দয়া"র চিহ্ন পরিস্ফুট। সেই সন্ধ্যায় আমি দেখেছিলাম সে পরেছে একটা নতুন বোনা কটিবন্ধ, গলায় ঝুলিয়েছে ব্রোঞ্জের ক্রুশ সমেত একটা উজ্জ্বল লাল ফিতে। সাভ্‌কার প্রতি স্ত্রীজাতির দুর্বলতার কথা আমি জানতাম না, সে বিষয়ে কোন কথা বলতে সে যে কত অনিচ্ছুক তাও জানতাম, তাই তাকে আর কোন প্রশ্ন করলাম না। আর সেটা গল্প করার মত সময়ও নয়...কিছু উচ্ছিষ্ট খাবারের টুকরোর জন্য কুৎকা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ সে কান খাড়া করে গর্জন করে উঠল। জলের একটা অস্পষ্ট ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ কানে এল।

সাভ্‌কা বলল, "কে যেন খালটা পার হচ্ছে।"

প্রায় তিন মিনিট পরে কুৎকা আবার ডাকতে লাগল। তারপরেই কাশির মত একটা শব্দ শোনা গেল।

"চুপ কর!" তার প্রভু হুকুম দিল।

অন্ধকারে কয়েকটি ভীরু পদক্ষেপের শব্দ হল। ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি নারীর ছায়ামূর্তি। অন্ধকারেও আমি তাকে চিনতে

পাবলাম। আঘাফিয়া স্ত্রেলচিখা। অনিশ্চয়তার সঙ্গে সে আমাদের দিকে হেঁটে এল। একটু থেমে একটা গভীর শ্বাস টানল। সে হাঁপাচ্ছে, হেঁটে আসার জন্য যতটা নয় তাব চাইতে বেশী ভয়ে ও অস্বস্তিতে। রাতের বেলা নদী পার হওয়াটাই তাব কাবণ। কুঁড়ে ঘরের কাছে একের বদলে দু'জনকে দেখে ঈষৎ চীৎকার করে সে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

একটা পিঠে মুখে দিয়ে সাভকা বলল, ''ওঃ তুমি এসেছ!''

''হ্যাঁ, আমি'', একটা পুটলি মাটিতে রেখে বাঁকা চোখে আমাব দিকে তাকিয়ে সে বলল। ''ইয়াকভ শুভেচ্ছা জানিয়ে এটা...তোমাকে দিতে বলল।....''

সাভকা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, ''মিথ্যে বলাব কি আছ—ইয়াকভ? মিথ্যে বলার দরকাব নেই, ভদ্রলোকটি জানে তুমি কেন এসেছ! বস, আমাদের সঙ্গে হাত লাগাও।''

বাঁকা চোখে আর একবার আমাকে দেখে আগাফিয়া বসে পড়ল।

দীর্ঘ নীরবতার পরে সাভ্‌কা বলল, ''আমি ভেবেছিলাম আজ আব তুমি আসবে না। ওখানে বসে থাকলেই হবে! কিছু খাও। এক পেগ ভদ্‌কা চলবে কি?''

আগাফিয়া বলল, ''খুব বলেছ। তুমি কি মনে কব আমাকে একটা মাতালনি পেয়েছ, অ্যা!''

''এক চুমুকে শেষ কব...শবীব গরম হবে...নাও!''

সাভকা বাঁকা গ্লাসটা আগাফিয়ার দিকে এগিয়ে দিল। অন্য কিছু মুখে না দিয়ে সে ধীরে ধীরে ভদ্‌কাতেই চুমুক দিতে লাগল।

পুটলিটা খুলে সাভকা হাল্কা গলায বলে উঠল, ''ও চাট নিয়ে এসেছে। মেয়েমানুষ কখনও চাট না নিয়ে আসে না। আঃ, মটর আব আলু...কপাল ভাল!'' আমাব দিকে মুখটা ঘুরিয়ে সে বলল। ''সারা গ্রামেব মধ্যে একমাত্র ওদের ঘরেই শীতের পরেও কিছু আলু আছে!''

অন্ধকারে আমি আগাফিয়াব মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু তার ঘাড় ও মাথার নড়াচড়া দেখেই মনে হল তার দুটি চোখ সাভ্‌কার মুখের উপরেই স্থির হয়ে আছে। এখানে অবাঞ্ছিত হয়ে বসে থাকার চাইতে একটু বেড়িয়ে আসাব জন্য আমি উঠে দাঁড়ালাম। ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ একটা নাইটিঙ্গেল পাখি নীচু নারীসুলভ গলায় দু'বার ডেকে উঠল। আধ মিনিট পরেই পাখিটা গলা ছেড়ে বারকযেক ডেকেই গান শুরু করে দিল। সাভ্‌কা লাফ দিয়ে উঠে কান পাতল।

বলল, ''গতকালেব সেই পাখিটা! এক মিনিট সবুব কর!''

যেন আমাকে চুপ করাতেই হাতটা নেড়ে সাভ্‌কা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। যখন মন থেকে চায় তখন সাভ্‌কা একজন ভাল শিকারী ও মাছ-ধরা, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তার দৈহিক শক্তির মতই এ প্রতিভাটারও অপব্যবহারই সে করে চলেছে। সে এতই আলস্যপরায়ণ যে কোন কাজই ঠিক মত করে না;

তাব শিকাবেব পথটাও অর্থহীন চালাকিতেই ব্যয় হয়ে যায়। সব সময় সে নাইটিঙ্গেল পাখি ধবে হাত দিয়ে বড় মাছ ধবে ছোট বড়শিতে আব বড় বড়শি দিয়ে ছোট মাছ ধবাব চেষ্টায় ঘন্টাব পব ঘন্টা সময় কাটায়।

আমাব সঙ্গে নিজেকে একা পেয়ে আগাফিয়া কাশতে কাশতে বাবকয়েক নিজেব কপালে হাত বুলাল। তাব মাথায় ভদকাব নেশা ধবতে শুরু কবেছে।

অনেকক্ষণ চুপ কবে থেকে যখন আবও চুপ কবে থাকাটা বিবক্তিকব মনে হল তখন আমি বললাম, "কেমন আছ আগাফিয়া?"

"প্রভুকে ধন্যবাদ, মন্দ নয়. কাউকে বলো না বলবে কি স্যাব?" আগাফিয়া হঠাৎ বলে উঠল।

"চিন্তা কবো না," আমি তাকে আশ্বাস দিলাম। "তুমি তো ঠাণ্ডা মাথাব খদ্দেব, কখনও ভুল কব না আগাশা। কিন্তু ইয়াকভ যদি দেখে ফেলে?"

"সে দেখতে পাবে না."

"কিন্তু ধব যদি দেখে ফেলে।"

"না আমি তাব আগেই বাড়ি ফিবব। সে এখন লাইনে আছে। মেল ট্রেনটা না যাওয়া পর্যন্ত ফিববে না। ট্রেনেব শব্দ তো তুমি এখান থেকেও শুনতে পাবে।"

আগাফিয়া আবাব নিজেব কপালে হাত বুলিয়ে সাভকা যেদিকে গেছে সেইদিকে তাকাল। নাইটিঙ্গেল পাখিটা গাইছে। আবেকটা বাত জাগা পাখি মাটিব কাছাকাছি উড়ে যেতে যেতে আমাদেব দেখতে পেয়ে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে নদীব উপব দিয়ে উড়ে গেল।

একটু পবেই নাইটিঙ্গেল পাখিব গান বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু সাভকা ফিবল না। আগাফিয়া উঠে দাঁড়াল, অস্থিবভাবে একবাব পা হাঁটল। আবাব বসে পড়ল।

হঠাৎ সে বাগে ফেটে পড়ল। সে কবছেটা কি? ট্রেনটা তো কাল আসবে না। আমাকে তো এখনই চলে যেতে হবে'

"সাভকা!" আমি ডাকলাম। "সাভকা!"

একটা প্রতিধ্বনিও ফিবে এল না। আগাফিয়া অস্থিব হয়ে আবাব উঠে দাঁড়াল।

উত্তেজিত গলায় বলল, "আমাব যাবাব সময় হয়ে গেছে। যে কোন সময় ট্রেনটা এসে যাবে। ট্রেনটা কখন আসে আমি জানি।"

বেচাবি ঠিকই বলেছে। সিকি ঘন্টাবও আগে দূবে ট্রেনেব শব্দ শোনা গেল।

আগাফিয়া পুনবায় জঙ্গলেব দিকে তাকিয়ে অধৈর্য হয়ে হাত নাড়াতে লাগল।

কেমন এক ধবনেব হাসি হেসে বলল. "সে কোথায় গেল? আব কোন

কাজেই বা গেছে? আমাকে তো যেতে হবে। সত্যি এবার আমাকে যেতে হবে স্যার।''

ইতিমধ্যে ট্রেনের শব্দটা ক্রমেই বাড়ছে। চাকার ঘট-ঘটাং আর বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের ভারী দীর্ঘশ্বাসের পার্থক্যটাও বুঝতে পারা যাচ্ছে। তারপরেই একটা হুইস্‌লের শব্দ, ট্রেনটা সশব্দে একটা সেতুর উপর উঠল...এক মিনিট পরে আবার সব চুপচাপ।

''আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখি,'' আগাফিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাল হয়ে বসল। ''খুব অল্পক্ষণ!''

অন্ধকারে সাভ্‌কাকে দেখা গেল। সব্জি-বাগানের নরম মাটির উপর দিয়ে সে খালি পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে আর শান্তভাবে কি যেন বলছে।

''আচ্ছা, তুমিই বল এটা কি হল!'' খুশিতে হেসে সাভ্‌কা বলতে লাগল। ''যেই না আমি ঝোপের কাছে গিয়ে সেটাকে ধরতে হাত বাড়াই অমনি সে গান থামিয়ে দেয়! আবার কখন গাইতে শুরু করবে তার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা কবলাম, তারপর ভাবলাম, দূর ছাই, মরুক গে...''

সাভ্‌কা আগাফিযার পাশে মাটিতে বসে পড়ে দুই হাত বাড়িয়ে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরল।

জিজ্ঞাসা কবল, ''তুমি এমন ঠোঁট ফুলিয়ে আছ কেন? মনে হচ্ছে তুমি যেন মাসির গর্ভে জন্মেছ?''

সাভ্‌কার মন্টা যতই নরম হোক, যতই সরল হোক, তবু স্ত্রীলোকদের সে ঘৃণা করে। তাদের সঙ্গে সে যা-তা ব্যবহার করে, মুরুব্বির মত কথা বলে, এমন কি নিজের প্রতি তাদের মনের টানকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসাও করে। ঈশ্বর জানেন, গ্রাম্য ''উল্‌সিনিয়া''রা তার প্রতি যে অপ্রতিরোধ্য টান অনুভব করে তার এই হাসি-মস্করার মনোভাব হয় তো তারই অন্যতম কাবণ। সে দেখতে ভাল, তার দেহ সুঠাম, এমন কি যে মেয়েমানুষকে সে এত ঘৃণা করে তাদের দিকেও যখন সে তাকায় তখন তার চোখ দুটি এক শান্ত অনুরাগে জ্বল্ জ্বল্ করে ওঠে; কিন্তু কেবলমাত্র বাইরের গুণ দিয়ে তার আকর্ষণকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তার সুন্দর চেহারা আর মেয়েদের প্রতি অস্বাভাবিক আচরণ ছাড়াও সাভ্‌কা যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে নিজের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে সব্জি-বাগানে এসে উঠেছে, তার জীবনের এই করুণ ভূমিকাও মেয়েদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

দুই হাতে আগাফিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরেই সাভ্‌কা বলতে লাগল, ''এই ভদ্রলোককে বলে দাও কেন তুমি এখানে এসেছ! বল, ওকে বলে দাও হে বিবাহিতা নারী! হো—হো...আর এক ফোঁটা ভদ্‌কা খেলে কেমন হয় ভাই আগাফিয়া?''

আমি উঠে দাঁড়ালাম, সব্জি গাছগুলোর ভিতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। বাতাসে ভেসে আসছে সদ্য খোঁড়া মাটির গন্ধ আর শিশির-ভেজা ছোট চারাগাছগুলির সোঁদা সুবাস। আমার বাঁ দিকে লাল আলোটা তখনও

ঝিকমিক করছে। সেটা যেন হেসে হেসে আমাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

একটা সুখের হাসি কানে এল। আগাফিয়া হাসছে।

"কিন্তু ট্রেনটার কি হল?" আমার মনে পড়ে গেল। "ট্রেনটা তো অনেক আগেই চলে গেছে।"

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি কুঁড়ে ঘরে ফিরে গেলাম। সাভ্‌কা তুর্কী ভঙ্গীতে নিশ্চল বসে আছে, আর কোন রকমে শোনা যায় এমন নিম্নস্বরে ছোট ছোট শব্দের এক ধরনের গান গাইছে, যেমনঃ "ও, তুমি, মন্দ তুমি...আমি ও তুমি..." আর আগাফিয়া ভদ্‌কার নেশায়, সাভ্‌কার ঘৃণিত আচরণে ও গরম রাতের যন্ত্রণায় বুঁদ হয়ে তার পাশে পাশেই মাটিতে পড়ে আছে, আর নিজের মুখটাকে বার বার সাভ্‌কার হাঁটুর উপর ঠুকছে। নিজের ভাবে সে এতই বিভোর হয়ে ছিল যে আমাকে খেয়ালই করে নি।

বললাম, "ট্রেনটা তো অনেক আগেই চলে গেছে আগাফিয়া।"

সাভ্‌কা মাথা নেড়ে আমার কথারই প্রতিধ্বনি করল, "এতক্ষণ তোমার চলে যাওয়া উচিত ছিল। ওখানে শুয়ে আছ কেন লজ্জাহীনা নচ্ছার।"

আগাফিয়া উঠে বসল, সাভ্‌কার হাঁটুর উপর থেকে মাথাটা তুলল, আমার দিকে একবার তাকাল, তারপর আবার সাভ্‌কার কাছে ঘেঁসে বসল।

আমি বললাম, "তোমার আর অপেক্ষা করা উচিত নয়!"

আগাফিয়া মুখ ফিরিয়ে এক হাঁটুর উপর উঠে বসল...সে খুব কষ্ট পাচ্ছে...অন্ধকারে যতদূর বুঝতে পারলাম, আধ মিনিটের জন্য তার সমস্ত শরীরে একটা ইতস্তত ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। এক সময় মনে হলো বুঝি তার জ্ঞান ফিরে এসেছে, উঠে দাঁড়াবার জন্য শরীরটা একবার টান-টান করল, কিন্তু পরক্ষণেই কোন্ এক দুর্জয়, নির্দয় শক্তি যেন তাকে পিছনে ঠেলে দিল, সে আবার সাভ্‌কার উপর গড়িয়ে পড়ল।

"তাতে আমার কি!" বলে সে উদ্দাম অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল; সে হাসিতে ধ্বনিত হল বেপরোয়া সংকল্প, অসহায়তা ও যন্ত্রণা।

ধীর পায়ে হাঁটিতে হাঁটিতে আমি জঙ্গলে ঢুকে নদীতে নেমে গেলাম। সেখানে আমাদের বড়শিগুলি ফেলা ছিল। নদী ঘুমিয়ে পড়েছে। লম্বা ডাঁটার উপরকার একটা নরম হাল্কা ফুল যেন আমার গালে হাত বুলিয়ে দিল, ঠিক যে ভাবে একটা ছোট শিশু বোঝাতে চায় যে সে ঘুমিয়ে পড়ে নি। হাতে কোন কাজ না থাকায় আমি একটা ছিপ তুলে ধরলাম। প্রথমে একটু টান পড়লেও পরে সেটা বাতাসে ঝুলতে লাগল—কোন মাছই ধরা পড়ে নি।...ও পারের তীরভূমি ও গ্রামটা দেখা যাচ্ছে। একটা ঘরে আলো জ্বলে উঠেই আবার নিভে গেল। তীরের উপর হাতড়াতে হাতড়াতে বিকেলে দেখা গর্তটা পেয়ে গেলাম এবং হাতল-চেয়ারের মত তার মধ্যে বসে পড়লাম। অনেকক্ষণ বসে ছিলাম...দেখলাম আকাশের তারাগুলি কুয়াসায় ঢেকে গেল, তাদের আলো আবছা হয়ে গেল, একটা ঠাণ্ডা বাতাস এসে জেগে ওঠা উইলো গাছের পাতাগুলিকে ছুঁয়ে যেতে লাগল...

"আ-গা-ফি-য়া।" গ্রাম থেকে একটা ফাঁকা ডাক ভেসে এল। "আ-গা-ফি-য়া!"

তার স্বামীর গলা। সে ফিরে এসে উৎকণ্ঠার সঙ্গে স্ত্রীর খোঁজ করছে। সব্জিবাগান থেকে ভেসে আসছে অপ্রতিরোধ্য হাসির মুক্তো ঃ স্ত্রীটি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, নেশা করেছে, আগামী কাল যে যন্ত্রণা তার জন্য অপেক্ষা করে আছে তারই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আজকের কয়েক ঘন্টার সুখকে আঁকড়ে ধরে আছে।

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম...

জেগে দেখি সাভ্‌কা আমার পাশে বসে আমার কাঁধটাকে আস্তে আস্তে নাড়া দিচ্ছে। নদী, বাগান, সদ্য ধোয়া সবুজ দুটি তীর, গাছপালা, মাঠ—সব কিছুর উপর ছড়িয়ে পড়েছে সকালের উজ্জ্বল আলো। সরু সরু গাছের ফাঁক দিয়ে সদ্য-ওঠা সূর্যের আলো পড়েছে আমার পিঠের উপর।

মুখ টিপে হাসতে হাসতে সাভ্‌কা বলল, "তুমি কি মাছ ধরবে, না ধরবে না? তাহলে উঠে পড়।"

উঠে পড়লাম। আড়মোড়া ভাঙলাম। সদ্য জাগা ফুসফুস দুটো ভেজা সুগন্ধি বাতাসকে লোভীর মত গিলতে লাগল।

"আগাফিয়া কি চলে গেছে?" আমি শুধালাম।

খালটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে সাভ্‌কা বলল, "ওইতো ওখানে আছে।"

মুখ তুলে আগাফিয়াকে দেখতে পেলাম। হাত দিয়ে পোশাকটাকে উঁচু করে ধরেছে, চুল এলোমেলো, মাথার স্কার্ফটা খুলে পড়েছে, সে নদী পার হচ্ছে। তার খুব কষ্ট হচ্ছে...

তার দিকে এক নজর তাকিয়ে সাভ্‌কা বলে উঠল, "বিড়ালই জানে কার মাংস সে খেয়েছে। লেজটাকে তো দুই ঠ্যাংয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে।...এই সব মেয়েমানুষ বিড়ালের চাইতেও ধড়িবাজ, আর খরগোসের চাইতেও ভীরু...কাল যখন যেতে বললাম তখন কিছুতেই আমাকে ছেড়ে গেল না। এখন তো বেশ চলে গেল; ওরা গ্রাম-পঞ্চায়েত ভোলোস্ত-এ গিয়েও আমার নামে লাগাবে...মেয়েমানুষের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করার জন্য আমাকে পিটুনি খাওয়াবে..."

আগাফিয়া নদী পার হয়ে মাঠের ভিতর দিয়ে গ্রামের দিকে চলল। প্রথমে বেশ সাহসের সঙ্গেই হাঁটল, কিন্তু অচিরেই উত্তেজনা ও ভয় তাকে পেয়ে বসল ঃ ঘুরে দাঁড়িয়ে থামল, বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল।

আগাফিয়ার পিছনকার শিশির-ভেজা ঘাসে-ঢাকা সবুজ পথটার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হেসে সাভ্‌কা বলল, "ও খুব ভয় পেয়েছে। যেতে চাইছে না! ওর স্বামী এক ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করে আছে...তাকে তুমি দেখেছ?"

শেষের কথা কয়টি সাভ্‌কা হাসতে হাসতেই বলল, কিন্তু আমার বুকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। গ্রামের মধ্যে পথের ধারে শেষ বাড়িটাতে দাঁড়িয়ে ইয়াকভ কঠিন দৃষ্টিতে বৌয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে একটুও নড়ল না। খুঁটির মত

নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। বৌয়ের দিকে তাকিয়ে সে কি ভাবছে? প্রথম দেখা হলে কি কথা সে বলবে? একটু দাঁড়িয়ে থেকে আগাফিয়া আবার ঘুরে দাঁড়াল, বুঝি আমাদের কাছ থেকে কোন সাহায্য আশা করছে, তারপর আবার চলতে,লাগল। মাতালই হোক আর স্বাভাবিকই হোক, কোন মানুষকেই আমি ও ভাবে হাঁটতে কখনও দেখি নি। মনে হল, স্বামীর রুষ্ট দৃষ্টির সামনে আগাফিয়া যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে। এ-পাশ থেকে ও-পাশে দুলছে; এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ছে, হাঁটু ভেঙে পড়ছে, হাত দুটি সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে, আবার পিছনে সরে আসছে। প্রায় একশ' পা চলার পরে সে আবার পিছনে তাকিয়ে বসে পড়ল।

''তুমি তো একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকতেও পারতে,'' আমি সাভ্‌কাকে বললাম। ''ওর স্বামী যদি তোমাকে দেখে ফেলে তাহলে...''

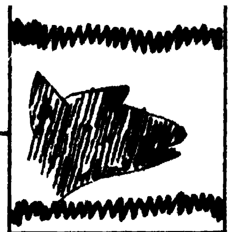
''আগাফিয়া কাকে দেখতে এসেছিল তা সে ভাল করেই জানে...মেয়েমানুষ যে রাতের বেলা বাঁধাকপি তুলতে সব্জিবাগানে যায় না—সে কথা যে কেউ তোমাকে বলে দিতে পারে।''

আমি সাভ্‌কার মুখের দিকে তাকালাম। সে মুখ বিবর্ণ, ঘৃণিত করুণায় বিকৃত, কোন পশুকে যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখলে মানুষের মুখ যেমনটি দেখায়।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ''বিড়ালের কাছে যেটা মজা ইঁদুরের কাছে সেটা চোখের জল...''

হঠাৎ আগাফিয়া লাফিয়ে উঠল, মাথাটা ঝাঁকি দিল, তারপর সদর্প পদক্ষেপে স্বামীর দিকে হেঁটে চলল। এতক্ষণে সে মনের বল ফিরে পেয়েছে, মনস্থির করে ফেলেছে!

১৮৮৬



নেকড়ে

The Wolf

একদা সন্ধ্যায় অসাধারণ দৈহিক শক্তির অধিকারী হৃষ্টপুষ্ট মানুষ হিসাবে সারা প্রদেশে পরিচিত জমিদার নাইলভ ও গোয়েন্দা কুপ্রিয়ানভ শিকার করে ফিরবার পথে বুড়ো ম্যাক্সিমের কল-ঘরে ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে নাইলভের জমিদারী মাত্র দুই ভার্স্ট পথ, কিন্তু দুই শিকারীই এতদূর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে তাদের আর চলতে ইচ্ছা করছিল না; তাই তারা স্থির করল দীর্ঘ সময় কল-ঘরে কাটাবে। এই সিদ্ধান্তটি সুবিবেচিতই ছিল কারণ ম্যাক্সিমের ছিল চা ও চিনি, আর শিকারীদের সঙ্গে ছিল প্রচুর পরিমাণে ভদ্‌কা, ব্র্যাণ্ডি ও নানা রকমের গৃহজাত খাদ্য।

একটা করে গ্লাস ও খাবার শেষ করে শিকারীদ্বয় চা ও চাট নিয়ে বসল।

নাইলভ ম্যাক্সিমকে শুধাল, ''নতুন খবর কিছু আছে নাকি হে বুড়ো?''

বুড়ো দাঁত বের করে বলল, ''নতুন আর কি আছে? আমি আর কি বলব? অনেক দিন থেকেই তো হুজুরের কাছে একটা বন্দুকের জন্য আর্জি জানিয়েছি।''

''তুমি বন্দুক দিয়ে কি করবে?''

''দেখুন, আমার যে ঠিক দরকার আছে তা নয়, আমি কেবল লোক দেখানোর জন্যই চেয়েছি। তাছাড়া, আমার চোখের দৃষ্টিও শিকারের পক্ষে সুবিধার নয়। কোথা থেকে একটা পাগলা নেকড়ে এসে হানা দিয়েছে। আজ দ্বিতীয় দিন সেটাকে আমি এই অঞ্চলে ঘুরতে দেখেছি।...গতকাল সন্ধ্যায় গ্রামে ঢুকে একটা গাধার বাচ্চা ও দুটো কুকুর মেরেছে; আজ ভোরে আমি বাইরে গিয়েছিলাম; সেখানে দেখলাম শয়তানটা উইলো গাছের তলায় বসে নিজের থাবা দিয়ে মুখে চাপড় মারছে। ''ফু!'' সেটাকে দেখে আমি বলে উঠলাম, কিন্তু সে আমার দিকে তাকাল সাক্ষাৎ এক শয়তানের মত...আমি এগিয়ে গিয়ে একটা পাথর ছুঁড়তেই সে দাঁত কড়মড় করে উঠল, চোখ দুটো মোমবাতির মত জ্বলতে লাগল, তারপর একটা আস্পেনের ঝোপে ঢুকে পড়ল...আমি তো তখন ভয়েই মরি।''

গোয়েন্দা বলল, ''আমি তো ভাবতেই পারি নি...আমরা এখানে বসে আছি, আর কাছেই ঘুরে বাড়াচ্ছে একটা পাগলা নেকড়ে।''

''তাতে কি হয়েছে? আমাদের সঙ্গে বন্দুক আছে।''

''কিন্তু ছর্‌রা দিয়ে তো আপনি একটা নেকড়েকে গুলি কবার চেষ্টা করবেন না।''

''গুলি করতে যাব কেন? বন্দুকের কুঁদো দিয়েই তো সেটাকে মারতে পারব।''

তারপরই নাইলভ বোঝাতে শুরু করল বন্দুকের কুঁদো দিয়ে নেকড়ে মারার চাইতে সহজ কাজ আর কিছু নেই; সেই সঙ্গে একটা ঘটনার কথাও তার মনে পড়ে গেল যখন একটা সাধারণ বেড়াবার লাঠির এক আঘাতে একটা আক্রমণকারী পাগলা কুকুর সে মেরে ফেলেছিল।

তার চওড়া কাঁধের দিকে ঈর্ষান্বিত চোখে তাকিয়ে গোয়েন্দা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ''এ কথা বলাটা আপনাকেই মানায়। আপনি ভাগ্যবান মানুষ, একা দশজনের শক্তি ধরেন। বেড়াবার ছড়ি দূরে থাক, আপনি তো কড়ে আঙুল দিয়েই একটা কুকুরকে মেরে ফেলতে পারেন। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ যতক্ষণে লাঠিটা তুলে আঘাত করার মত জায়গাটা বেছে নিয়ে আঘাতটা করবে তার আগেই কুকুরই তাকে পাঁচ-পাঁচবার কামড়ে দেবে। কাজটা খুবই বিপজ্জনক...জলাতংকের চাইতে কষ্টকর ও ভয়ংকর রোগ আর কিছু নেই। যখন আমি প্রথম একটি পাগলা মানুষকে দেখেছিলাম তখন পাঁচটা দিন আমি মোহের ঘোরে হেঁটে

বেড়িয়েছিলাম, আর সেই থেকে সব কুকুর আর কুকুরের মালিকদের আমি ঘৃণা করি। প্রথমত, এই রোগ এতই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত যে সেটাই ভয়ংকর।...একটি সম্পূর্ণ মানুষ শান্ত হয়ে হেঁটে চলেছে, হঠাৎ কোথা থেকে একটা পাগলা কুকুর এসে তাকে কামড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মানুষটি এই ভয়ংকর চিন্তায় এতই অভিভূত হয়ে পড়ল যে তার মৃত্যু নিশ্চিত, কিছুই তাকে বাঁচাতে পারবে না...তার পর থেকে রোগটা কখন দেখা দেবে তার জন্য এই যন্ত্রণাদায়ক প্রতীক্ষা...সে প্রতীক্ষার হাত থেকে একটি মুহূর্তের জন্যও সে রেহাই পাবে না।...সে যে কী এক দুঃসহ অবস্থা তা তুমি সহজেই কল্পনা করতে পার।...অনেক প্রতীক্ষার পরে একদিন রোগটি দেখা দেয়। আর সব চাইতে খারাপ কি জান, রোগটা দুরারোগ্য। একবার হলেই নিজেকে তুমি খরচের খাতায় লিখে ফেলতে পার। আমি যতদূর জানি, ওষুধে এ রোগ সারাবার তিলমাত্রও সম্ভাবনা নেই।''

''আমাদের গ্রামে কিন্তু রোগটা সারানো হয় স্যার'', ম্যাক্সিম বলল। ''আপনি যাকে বলবেন মাইরন তাকেই সারিয়ে তুলবে।''

নাইলভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ''বাজে কথা। আর মাইরনের সব কথাই তো ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। গত গ্রীষ্মকালে স্তিয়প্‌কাকে কুকুরে কামড়েছিল, আর কোন মাইরনই তাকে সারাতে পারে নি। তারা যত রাজ্যের বাজে জিনিস তাকে খেতে দিল, তবু সে পাগল হয়ে গেল। না হে বুড়ো, কোন ওষুধেই কিছু হবার নয়। আমার যদি এমনটি ঘটে, আমাকে যদি পাগলা কুকুরে কামড়ায় তাহলে একটা বুলেট আমি সোজা আমার মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেব।''

জলাতংকের এই সব ভয়ংকর গল্প বৃথা গেল না। শিকারী দু'জন ধীরে ধীরে চুপ করে গেল; নীরবে পানীয়ে চুমুক দিতে লাগল। প্রত্যেকের মাথায় একই চিন্তা ঘুরতে লাগল ঃ মানুষের জীবন ও সুখ মারাত্মকভাবে নির্ভর করে দুর্ঘটনা ও তুচ্ছ সব ব্যাপারের উপর যা নাকি কাঁসারির ঝালার চাইতেও সস্তা। সকলেরই মন বিষণ্ণ ও দুঃখী হয়ে পড়ল।

চা খাওয়ার পরে নাইলভ আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল। তার ইচ্ছা হল একটু বাইরে যাবে। ছোট দরজার খিল খুলে সে বেরিয়ে পড়ল। গোধূলির আলো অনেকক্ষণ আগেই মুছে গেছে; আঁধার নেমেছে। নদীটার শান্ত গভীর ঘুম যেন উপলব্ধি করা যায়।

চন্দ্রালোকিত বাঁধের উপর এক ফালি ছায়াও পড়ে নি; মাঝামাঝি জায়গায় একটা ভাঙা বোতলের গলা তারার মত ঝিকমিক করছে। উইলো গাছটার ঘন পাতার ছায়ায় আধেক ঢাকা-পড়া কলের দুটো চাকা যেন ক্রুদ্ধ, শোচনীয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

একটা গভীর শ্বাস টেনে নাইলভ নদীর দিকে তাকাল।

কিছুই চলমান নয়। জল ও তীর দুটি ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন কি একটা মাছও পাখনা নেড়ে জল ছিটচ্ছে না।...কিন্তু হঠাৎ নাইলভের মনে হল সে

যেন দেখতে পেল, কালো বলের মত একটা ছায়া অপর তীরের উইলো ঝোপের উপর দিয়ে শাঁ করে চলে গেল। ছায়াটা মিলিয়ে গেল, কিন্তু আবার দেখা দিল, এঁকেবেঁকে নদীর দিকে এগিয়ে গেল।

"নেকড়ে!" নাইলভের মনে পড়ল।

কিন্তু যতক্ষণে তার মনে হল যে এক দৌড়ে তার কল-ঘরে চলে যাওয়া উচিত ততক্ষণে কালো বলটা বাঁধ বরাবর ছুটে চলেছে, সোজা নাইলভের দিকে নয়, কিছুটা এঁকেবেঁকে।

মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে বুঝতে পেরে নাইলভ ভাবল, "আমি যদি দৌড়তে শুরু করি তাহলে ওটা পিছন দিক থেকে আমাকে তাড়া করবে। কী আশ্চর্য, আমার হাতে তো একটা লাঠিও নেই। বেশ তো, আমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব আর...খালি হাতেই ওটাকে গলা টিপে মারব!"

অতএব নাইলভ নেকড়েটার গতিবিধির এবং তার আকৃতির ভাবভঙ্গীর উপর সতর্ক নজর রাখতে শুরু করল। নেকড়েটা বাঁধের ধার বরাবর ছুটছে তার সঙ্গে প্রায় একই সমতালে।

নেকড়ের উপর থেকে চোখ না তুলেই নাইলভ ভাবল, "ওটা তো বেরিয়ে যাচ্ছে।"

কিন্তু সেই মুহূর্তে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং তার দিকে না তাকিয়েই নেকড়েটা একটা শোকার্ত কর্কশ চীৎকার করে তার দিকে মাথাটা ঘুরিয়েই থেমে গেল। মনে হল যেন ভাবছে, আক্রমণ করবে, না তাকে এড়িয়ে যাবে।

নাইলভ ভাবল, "আমি ওর মাথায় একটা ঘুষি মারব। ওকে ছুঁড়ে ফেলে দেব..."

নাইলভ এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে সে বুঝতেই পারে নি যুদ্ধটা কে শুরু করেছিল, সে না নেকড়েটা। সে শুধু এটাই বুঝতে পারল যে একটা ভয়ংকর সংকটকাল সমুপস্থিত, আর নিজের সব শক্তি ডান হাতে কেন্দ্রীভূত করে নেকড়েটার গর্দানটা চেপে ধরল। তারপরেই এমন অসাধারণ কিছু ঘটল যেটা বিশ্বাস করাই শক্ত, যেটা নাইলভের কাছেই একটা স্বপ্ন বলে মনে হল। করুণ স্বরে গর্জন করতে করতে নেকড়েটা এমনভাবে নড়াচড়া করতে লাগল যে নাইলভের হাতের ভিতরকার ঠাণ্ডা, ভেজা চামড়ার ভাঁজটা তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিছলে গলে গেল। তার দৃঢ় মুষ্টি থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় নেকড়েটা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। এবার নেকড়ের ডান থাবাটা বাঁ হাতে চেপে ধরে নাইলভ তাকে বগলের উপর ঠেসে ধরল এবং অতি দ্রুত গর্দানটা ছেড়ে দিয়ে ডান হাত দিয়ে বগলের কাছটা চেপে ধরে নেকড়েটাকে মাথার উপরে শূন্যে তুলে ধরল। সব কিছুই ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। নেকড়েটা যাতে তার হাত কামড়াতে না পারে এবং মাথাটা ঘোরাতে না পারে সেজন্য নাইলভ দুটো বুড়ো আঙুলকে কটার মত ঢুকিয়ে দিল সেটার গলার মধ্যে কন্ঠাস্থির খুব কাছে।...নেকড়েটাও তার দুটো থাবা নাইলভের কাঁধের উপর রেখে তার উপর ভর দিয়ে প্রচণ্ড লড়াই চালাতে

লাগল। সে কনুই পর্যন্ত নাইলভের বাহুতে কামড় বসাতে পারছে না। বুড়ো আঙুল দুটো তার গর্দানের উপর চেপে থাকায় নেকড়েটা মাথা তুলে নাইলভের মুখ ও কাঁধেরও নাগাল পাচ্ছিল না।...

মাথাটাকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রেখে নাইলভ আপন মনেই বলল, "উঃ! ব্যাটার লালা আমার ঠোঁটের উপর গড়িয়ে পড়ছে। কোন অলৌকিক শক্তির জোরে এর কবল থেকে মুক্তি পেলেও আমার অবস্থা কাহিল।"

সে চীৎকার করে বলল, "বাঁচাও! ম্যাক্সিম! বাঁচাও!"

নাইলভ ও নেকড়ে—দু'জনের মাথা একই সমতলে থাকায় তারা পরস্পরের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। নেকড়েটা দাঁত কড়মড় করছে, কর্কশ গলায় চীৎকার করছে। আর থুথু ছিটিয়ে দিচ্ছে।...পিছনের পা দুটোর উপর শরীরের ভর রাখার জন্য সে দুটোকে নাইলভের হাঁটুর মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করছে...তার দুই চোখে চাঁদের আলো ঝিলমিল করছে, কিন্তু সেখানে ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই; দুটি চোখই যেন মানুষের মত চীৎকার করছে।

"বাঁচাও!" নাইলভ পুনরায় চীৎকার করে উঠল। "ম্যাক্সিম!"

কিন্তু কলঘরে বসে থাকায় সে চীৎকার তারা শুনতে পেল না। সে বুঝতে পারল, আরো জোরে চেঁচালে তার শক্তি ক্ষয় হবে, অতএব সে আস্তেই চেঁচাতে লাগল।

মনে মনে স্থির করল, "আমি পিছনে হটে যাব...দরজা পর্যন্ত গিয়ে তারপর চেঁচিয়ে ডাকব!"

সে পিছনে হাঁটিতে শুরু করল, কিন্তু গজ দুই যাবার পরেই তার মনে হল ডান বাহুটা দুর্বল ও শক্ত হয়ে পড়ছে। তার কিছু পরেই সে শুনতে পেল নিজেরই হৃদয়-বিদারক চীৎকার, ডান কাঁধে একটা তীব্র বেদনা অনুভব করল, একটা গরম ভেজা ভাব তার সমস্ত বাহু ও বুকের উপর ছড়িয়ে পড়ল। তখনই সে শুনতে পেল ম্যাক্সিমের গলা; গোয়েন্দাটিও ছুটে বেরিয়ে আসায় তার মুখে দেখতে পেল আতংকের প্রকাশ।...

যতক্ষণ পর্যন্ত তারা দু'জনে মিলে নাইলভের বুড়ো আঙুল দুটোকে টেনে তুলে নিয়ে তাকে দেখাল যে নেকড়েটা মরে গেছে ততক্ষণ সে কিছুতেই শত্রুকে ছাড়ল না। অনুভূতির তীব্রতায় হতবুদ্ধি হয়ে এবং নিজের উরুতে ও ডান পায়ের বুটে রক্তের ধারা দেখতে পেয়ে অবসন্ন দেহে সে কল-ঘরে ফিরে গেল। আলোতে ফিরে এবং সামোভার ও বোতল দেখে সে যেন স্বস্তি বোধ করল; এতক্ষণ যে যন্ত্রণা সে সহ্য করেছে, তার পক্ষে যে বিপদ সবে শুরু হয়েছিল—সবই তার মনে পড়ে গেল। তার চোখের মণি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, মাথাটা ভিজে গেছে; বিমর্ষ মুখে বস্তার উপর বসে ক্লান্তিতে সে হাত দুটো এলিয়ে দিল। গোয়েন্দা ও ম্যাক্সিম পোশাক খুলে তার ক্ষতস্থান বেঁধে দিল। দেখা গেল, ক্ষতটা বড় কিছু নয়। নেকড়েটা কাঁধের চামড়াকে ফালা-ফালা করেছে, এমন কি মাংসপেশীতেও আঁচড় লেগেছে।

গোয়েন্দাটি তার রক্তপড়া বন্ধ করার চেষ্টা করছিল। ম্লান মুখে সে শুধাল, ''ওটাকে আপনি নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন না কেন?''

''কোথাটা মনেই হয় নি। একবারও মনে হয় নি!''

গোয়েন্দা তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইল, কিন্তু তার সান্ত্বনায় কোন কাজ হবে না বুঝতে পেরে চুপ করে গেল। ক্ষতস্থানটাকে ভাল করে বেঁধে দিয়ে সে ম্যাক্সিমকে জমিদার-বাড়িতে পাঠাল ঘোড়া নিয়ে আসতে। কিন্তু নাইলভ গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করে পায়ে হেঁটেই বাড়ির পথে যাত্রা করল।

পরদিন সকাল ছ'টায় বিবর্ণ, অগোছালো অবস্থায় ও বিনিদ্র রাত কাটানোর ফলে শুকনো মুখে সে কল-ঘরে গিয়ে হাজির হল।

ম্যাক্সিমকে বলল, ''আমাকে মাইরনের কাছে নিয়ে চল হে বুড়ো। তাড়াতাড়ি! গাড়িতে উঠে পড়। এখনই গাড়ি ছাড়ব!''

বিনিদ্র রাত কাটাবার ফলে ম্যাক্সিমকেও বিবর্ণ ও বিশ্রী দেখাচ্ছিল। বারকয়েক এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল :

''মাইরনের কাছে যাবার দরকার নেই স্যার...ক্ষমা করবেন, তবে এ চিকিৎসা আমিও করতে পারি।''

''খুব ভাল কথা, তবে দয়া করে তাড়াতাড়ি করবে।''

নাইলভ অধৈর্য হয়ে পা ঠুকল। বুড়ো মানুষটি তাকে পূবমুখী করে ঘুরিয়ে দিল, কানে কানে কিছু বলল, একটা মগে কিছু নোংরা, গরম তরল পদার্থ খেতে দিল, তার স্বাদ সোমরাজের মত।

নাইলভ বিড়বিড় করে বলতে লাগল, ''কিন্তু স্তিয়পকা তো মারাই গেল...লোকে বলে অনেক রকম টোটকা ওষুধ আছে, কিন্তু তাহলে স্তিয়পকা মরল কেন? তুমি বরং আমাকে মাইরণের কাছেই নিয়ে চল!''

মাইরণের উপর তার বিশ্বাস ছিল না। তাই সেখান থেকে সে গাড়ি চালিয়ে গেল হাসপাতালে ওভ্‌চিনিকভের কাছে। সেখান থেকে বেলেডোনার বড়ি আর বিছানায় শুয়ে থাকার পরামর্শ নিয়ে গাড়ির ঘোড়া বদল করে এবং হাতের ভয়ংকর বেদনাকে উপেক্ষা করে সে সোজা চলে গেল শহরে কয়েকজন শহুরে ডাক্তারকে দেখাতে।

দিনচারেক পরে এক পড়ন্ত সন্ধ্যায় ওভ্‌চিনিকভের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই তার কোচের উপর এলিয়ে পড়ল।

হাঁপাতে হাঁপাতে বিবর্ণ, বিকৃত মুখের ঘাম আস্তিন দিয়ে মুছতে মুছতে সে বলতে লাগল, ''ডাক্তার! গ্রিগরি আইভানিচ! আমাকে নিয়ে আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন, কিন্তু এ ভাবে আমি আর চলতে পারছি না! হয় আমাকে ভাল করে তুলুন, না হয় বিষ খেতে দিন. কিন্তু এ ভাবে ফেলে রাখবেন না। ঈশ্বর জানেন, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!''

''আপনাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে,'' ওভ্‌চিনিকভ বলল।

''ওঃ, আপনি ও আপনার বিছানায় শোয়া চুলোয় যাক। সহজ, সরল রুশ ভাষায় আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিঃ আমি কি করব? আপনি একজন

ডাক্তার, আপনার উচিত আমাকে সাহায্য করা! আমি কষ্ট পাচ্ছি! সারাক্ষণ মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আমি ঘুমতে পারি না, খেতে পারি না, একটা কাজও করতে পারি না! আমার পকেটে একটা রিভলবার আছে। আমার মাথার ভিতরে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতে মাঝে মাঝেই সেটা বের করি। গ্রিগরি আইভানিচ, ঈশ্বরের প্রেমের দোহাই, দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন! আমি কি করব? হয় তো আমার উচিত অধ্যাপকদের সঙ্গে দেখা করা, কি বলেন?''

''তাতে তফাৎ কিছুই হবে না। ইচ্ছা হলে চলে যান।''

''শুনুন, ধরুন আমি যদি একটা প্রতিযোগিতা ঘোষণা করি এবং যিনি আমাকে সারিয়ে তুলতে পারবেন তাকে পঞ্চান্ন হাজার রুব্‌ল্ দেবার প্রস্তাব করি, তো? সে বিষয়ে আপনি কি মনে করেন? কিন্তু সে ঘোষণা যতদিনে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হবে ততদিনে আমি আরও দশ গুণ পাগল হয়ে যাব। আমার যা কিছু আছে সব সানন্দে দিয়ে দেব। আমাকে ভাল করে তুলুন, আমি আপনাকে পঞ্চাশ হাজার দেব। ঈশ্বরের দোহাই, বলুন আপনি আমার চিকিৎসা করবেন? এই জ্বালাধরানো উদাসীনতার অর্থ আমি বুঝতে পারি না। আপনি কি দেখতে পান না, এখন আমি একটা মাছিকে পর্যন্ত ঈর্ষা করি...কী শোচনীয় অবস্থা আমার! আর আমার পরিবারেরও কত দুঃখ!''

নাইলভের দুই কাঁধ কাঁপতে লাগল। সে কাঁদতে শুরু করল।

ওভ্‌চিনিকভ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ''অংশত আপনার এই উত্তেজিত অবস্থা আমি বুঝতে পারি না। কেন আপনি কাঁদছেন? আর বিপদটাকেই বা এত বড় করে দেখছেন কেন? আপনার অসুস্থ হবার চাইতে অসুস্থ না হবার সম্ভাবনাটাই তো বেশী। প্রথমত, নেকড়ে কামড়ানো মানুষের প্রতি একশ' জনের মধ্যে মাত্র ত্রিশ জনের রোগটা হতে পারে। আর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কথা হল নেকড়ে আপনাকে কামড়েছে পোশাকের ভিতর দিয়ে, অর্থাৎ বিষটা আপনার পোশাকেই লেগেছিল। যদি তার কিছুটা ক্ষতস্থানে ঢুকেও থাকে সেটাও তো রক্তপাতের সাথেই ধুয়ে মুছে গেছে, কারণ আপনার প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল। জলাতংক সম্পর্কে আমার মন সম্পূর্ণ নিঃসংশয়। যদি কোন দুশ্চিন্তা আমার থাকেও তো সেটা ক্ষতটার ব্যাপারে। আপনি এতই অসতর্কভাবে চলেছেন যে সহজেই আপনার বিসর্প বা ঐ ধরনের কোন রোগ হতেই পারে।''

''আপনি সত্যি তাই মনে করেন? নাকি আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছেন?''

''দিব্যি করে বলছি, আমি সত্যি কথাই বলছি। এটা নিয়ে পড়ে দেখুন!''

ওভ্‌চিনিকভ তাক থেকে একটা বই তুলে এনে জলাতংকের অধ্যায়টা নাইলভকে পড়ে শোনাতে লাগল, অবশ্য ভীতিকর অংশগুলো বাদ দিয়ে।

পড়া শেষ হলে সে বলল, ''কাজেই আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণই

নেই। বিশেষ করে যখন সব চাইতে বড় কথা হল, আমরা কেউ জানি না নেকড়েটা পাগল ছিল, না সুস্থ ছিল।''

''হুম, ঠিক...'' নাইলভ কথাটা মেনে নিয়ে হাসল। ''অবশ্য এখন আমি বুঝতে পারছি। তাহলে এ সবই বাজে কথার বোঝা।''

''ঠিক তাই।''

''আচ্ছা, তাহলে অনেক ধন্যবাদ, প্রিয় মহাশয়,'' নাইলভ হেসে উঠল, সানন্দে দুই হাত ঘসতে লাগল। ''আর দুশ্চিন্তা করব না, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি খুশি হয়েছি, এমন কি আনন্দিতও হয়েছি, সত্যি বলছি...হ্যাঁ, সত্যি, আমি আনন্দিত।''

নাইলভ ওভ্‌চিনিকভকে আলিঙ্গন করে তিনবার তাকে চুমো খেল। তারপর হঠাৎ এমন একটা ছেলেমানুষী কাণ্ড করে বসল যা দয়ালু হৃদয় দৈহিক শক্তিসম্পন্ন মানুষরা হামেশাই করে থাকে। টেবিলের উপর থেকে একটা ঘোড়ার পায়ের লোহার নাল তুলে নিয়ে সেটা বাঁকাতে চেষ্টা করল, কিন্তু আনন্দজনিত দুর্বলতা ও ঘাড়ের ব্যথার জন্য সেটা করতে পারল না; সুতরাং তার পরিবর্তে নিজের বাঁ হাত দিয়ে ডাক্তারের ঠিক কোমরের নীচটা জড়িয়ে ধরে তাকে উঁচু করে তুলে কাঁধের উপর ফেলে রোগী দেখার ঘর থেকে খাবার ঘরে বয়ে নিয়ে গেল। ওভ্‌চিনিকভকে সেখানে রেখে চলে যাবার সময় তাকে দেখাচ্ছিল সুখী ও উৎফুল্ল, এমন কি তাব লম্বা কালো দাড়ির উপর ছোট চোখের জলের যে ফোঁটাগুলি চিকচিক করছিল সেগুলোও বুঝি তার আনন্দের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে গভীর খাদে হেসে উঠে সে অলিন্দের থাম্বাগুলোকে এমনভাবে ঝাঁকি দিতে লাগল যে একটা তো ভেঙ্গেই পড়ে গেল। ওভ্‌চিনিকভের পায়ের নীচে গোটা অলিন্দই থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল।

তার প্রকাণ্ড পিঠটার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওভ্‌চিনিকভ ভাবল, ''কী অসুরের মত শরীর! কী চমৎকার মানুষটি!''

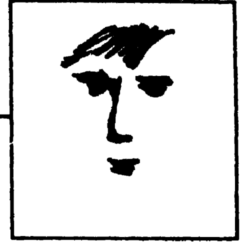
গাড়িতে উঠে বসে নাইলভ আবার একেবারে গোড়া থেকে সবিস্তারে ভাবতে শুরু করল, কেমন করে বাঁধের উপরে সে নেকড়েটার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।

''ঠিক যেন একটা শিকারই হল!'' খুশির হাসি দিয়ে তার ভাবনার শেষ হল।'' ''বুড়ো বয়স পর্যন্ত মনে রাখবার মত একটা ঘটনা বটে। হেই গিড্‌ডাপ, তৃশ্‌কা!''

১৮৮৬

একটি দুঃস্বপ্ন

A Nightmare



কৃষকবিষয়ক প্রাদেশিক বোর্ডের স্থায়ী সদস্য বছর ত্রিশ বয়সের যুবক কুনিন সেণ্ট পিতার্সবার্গ থেকে তার বরিসোভোর জমিদারীতে ফিরে এসেই একজন পত্রবাহককে সিংকোভোতে পাঠাল স্থানীয় পুরোহিত ফাদার ইয়াকভ স্মির্ণভকে ডেকে আনতে।

ফাদার ইয়াকভ এল প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরে।

তার সঙ্গে হল-ঘরে দেখা হতেই কুনিন বলল, ''আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াতে খুব খুশি হলাম। প্রায় এক বছর হল আমি এখানে বাস করছি, কাজকর্ম করছি, তাই পরস্পরের মধ্যে পরিচয় হওয়াটা জরুরী বলে মনে হল। আপনি দয়া করে যে এসেছেন!... কিন্তু কী আশ্চর্য...আপনি তো দেখতে একেবারে যুবকটি! আপনার বয়স কত?''

বাড়ানো হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে এবং কোন অজ্ঞাত কারণে ঈষৎ লজ্জা পেয়ে ফাদার ইয়াকভ বলল, ''আটাশ বছর স্যার।''

অতিথিকে পড়ার ঘরে নিয়ে কুনিন তাকে ভাল করে দেখল।

ভাবল, ''কী বোকা-বোকা চাষী-মেয়ের মত মুখ!''

ফাদার ইয়াকভের মুখটা সত্যি একটি চাষী-মেয়ের মুখের মতই দেখতে—থ্যাবড়া নাক, রক্তিম গাল, বড় বড় ধূসর-নীল চোখ আর ঈষৎ কাজল-টানা চোখ। আদা রঙের লম্বা, শুকনো, মসৃণ চুল সোজা কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। গোঁফ সবেমাত্র পুরোপুরি গজিয়ে উঠেছে, কিন্তু দাড়ির অবস্থাটা মোটেই কোন কাজের নয়, এতই পাতলা যে না চলে তাতে হাত বুলানো, না যায় চিরুনি চালানো, হয়তো কেবল তা' দেওয়াই চলে। পাতলা দাড়িটাও এমন অসমানভাবে গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে গজিয়েছে যে মনে হয় ফাদার ইয়াকভ হয় তো পুরোহিতের সাজে সাজবার জন্য দাড়িটা লাগাতে লাগাতে মাঝপথে থেমে গেছে। তার পরনের জোব্বাটার রং জলো কফির মত, দুই কনুইয়ের উপর বড় বড় দাগ।

তার কাদা-লাগা ঘাঘরার দিকে তাকিয়ে কুনিন ভাবল, ''একটি বিচিত্র জীব। একটা বাড়িতে এই প্রথম এসেছে, অথচ একটু ভদ্র ধরনের পোশাকও পরতে পারেনি।'' একটা চেয়ার ডেস্কের দিকে এগিয়ে দিয়ে অতি সাধারণভাবেই বলল, ''বসুন ফাদার। দয়া করে আসন গ্রহণ করুন!''

ফাদার ইয়াকভ হাতের মুঠোর মধ্যে একটু কাশল, অদ্ভুত ভঙ্গীতে চেয়ারের এক কোণায় বসল, হাত দুটো রাখল হাঁটুর উপরে। বেঁটে-খাটো, অপ্রশস্ত বুক, ঘর্মাক্ত ঈষৎ লাল মুখ, তাকে দেখে শুরু থেকেই কুনিনের

ভাল লাগে নি। কুনিন ভাবতেই পারে নি এমন সব দুঃখী ও হতভাগার মত দেখতে পুরোহিত রাশিয়াতে আছে ; আর ফাদার ইয়াকভের এই ভঙ্গী, দুই হাঁটুর উপর হাত রাখা, চেয়ারের একেবারে কোণে বস—তার মধ্যে সে যেন দেখতে পেল মর্যাদাবোধের অভাব, এমন কি এক ধরনের হীনমন্যতাও।

''একটা কাজের ব্যাপারেই আপনাকে এখানে ডেকে এনেছি ফাদার,'' চেয়ারে হেলান দিয়ে কুনিন বলতে শুরু করল। ''আপনার কয়েকটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগে আপনাকে সাহায্য করার প্রীতিপ্রদ দায়িত্ব আমাব উপর পড়েছে।...পিতার্সবার্গ থেকে ফিরে এসে আমার ডেস্কের উপর মার্শালের একটি চিঠি পেয়েছি। ইয়েগর দিমিত্রিয়েভিস জানিয়েছেন, সিংকোভোতে আপনি যে পল্লীবিদ্যালয়টি খুলতে যাচ্ছেন আমি যেন তার ভার নেই। এতে আমি খুব খুশি হয়েছি ফাদার, সত্যি খুব খুশি হয়েছি। এমন কি, আনন্দের সঙ্গেই মার্শালের এই প্রস্তাব আমি মেনে নিয়েছি।''

কুনিন চেয়ার থেকে উঠে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

''অবশ্য ইয়েগর দিমিত্রিয়েভিচ ও আমি উভয়েই বলতে পারি, আমি যে একজন অনেক টাকাপয়সাওয়ালা লোক নই সেটা আপনিও জানেন। আমার জমিদারী বন্ধক দেওয়া আছে, আর বোর্ডের সদস্য হিসাবে আমি যে বেতন পাই তাতেই আমাব সংসার চলে। সুতরাং আমার কাছ থেকে কোন উল্লেখযোগ্য সহয়াতা আপনি আশা করবেন না, কিন্তু আমি যা পারি তা অবশ্যই করব...বিদ্যালয়টি কখন আপনি খুলতে চান ফাদার?''

''টাকাটা যোগাড় হলেই,'' ফাদার ইয়াকভ জবাব দিল।

''কিন্তু কিছু একটা তহবিল তো আপনার আছেই, তাই নয় কি?''

''প্রায় কিছুই নেই স্যার।...গ্রামের সভায় কৃষকরা জনপ্রতি বার্ষিক ত্রিশ কোপেক করে দিতে সম্মত হয়েছে, কিন্তু সে তো একটা প্রতিশ্রুতি মাত্র! আর কাজটা শুরু করতে হলে অন্তত দু'শ রুব্‌ল্ তো আমাদের হাতে আসা দরকার।''

'হুম, তা বটে।...দুর্ভাগ্যবশত এখনই অত টাকা আমার কাছে নেই,'' কুনিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। ''...আমার যা কিছু ছিল ভ্রমণ করতেই খরচ হয়ে গেছে, এমন কি কিছু ধারও করতে হয়েছিল। একদিন আসুন, সকলে বসে এ নিয়ে কিছু ভাবনা-চিন্তা করি।''

কুনিন তার মনের কথাগুলি মুখে বলতে শুরু কবল। নিজের ভাবনাগুলি মুখে বলতে বলতে সে ফাদার ইয়াকভের দিকে চোখ রাখল, তার সমর্থন ও সম্মতির প্রত্যাশায়। কিন্তু সে মুখটা একেবারেই ফাঁকা ও উদাসীন, সলজ্জ ভীরুতা ও উদ্বেগ ছাড়া আর কোন ভাবের প্রকাশই সেখানে চোখে পড়ল না। তাকে দেখলে আপনারও মনে হবে যে কুনিন এমন কিছু বলছে যা ফাদার ইয়াকভ বুঝতেই পারছে না, কথাগুলি মন দিয়ে শুনছে শুধুই সৌজন্যবোধে আর এই ভয়ে পাছে তার বুদ্ধির অভাবটা পড়ে যায়।

কুনিনও ভাবল, ''ছেলেটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী নয়। বড় বেশী লাজুক

ও অবোধ।''

একটি পরিচারক যখন ট্রেতে করে দুই গ্লাস চা ও একটা বাটিতে বিস্কুট নিয়ে এল একমাত্র তখনই ফাদার ইয়াকভ উৎসাহী হয়ে উঠল. এমন কি একটু হাসলও। নিজের গ্লাসটা তুলে নিয়ে তখনই চুমুক দিতে শুরু করল।

কুনিনেব সবব চিন্তা চলতেই থাকল ঃ ''আমাদের হয়তো বিশপকে লিখতে হবে। কারণ আসলে জমস্তভো বা আমবা নই, গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় খোলার প্রশ্নটা তুলেছিলেন গির্জার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। অতএব তহবিলের ব্যবস্থাটা তাদেবই কবা উচিত। যতদূর মনে পড়ে, এই প্রসঙ্গে আমি পড়েছি যে একটা টাকা ধার্য কবা হয়েছে। আপনি কি এ বিষয়ে কিছু জানেন?''

ফাদার ইয়াকভ চা খাওয়া নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিল যে সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। ধূসর নীল চোখ দুটি তুলে কুনিনের দিকে তাকিয়ে সে এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল, তারপব যেন প্রশ্নটা মনে পড়তেই সাবেগে মাথাটা নাড়তে লাগল। একটা খুশিব ভাব এবং অতি সাধারণ, গদ্যময ক্ষুধাব প্রকাশ তার আকর্ণ বিস্তৃত বেঢপ মুখটাতে ছড়িয়ে পড়ল। সে রসিয়ে রসিয়ে খেতে লাগল। গ্লাসের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত চুমুক দিয়ে শেষ করে গ্লাসটাকে টেবিলের উপর রেখে দিল; আবার সেটা তুলে নিয়ে তলানিটা দেখে পুনরায় বেখে দিল। খুশির ভাবটা তার মুখ থেকে সরে গেল। তারপর কুনিন দেখল, তার অতিথি বাটি থেকে একটা বিস্কুট তুলে নিল, এক কামড় খেল, সেটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া কবল, তারপর চকিতে সেটাকে পকেটে ভবল।

বিরক্তিব সঙ্গে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে কুনিন ভাবল, ''আচ্ছা, এ রকম আচবণ তো একজন পুরোহিতের শোভা পায় না। এটা কি, লোভ না ছেলেমানুষি?''

অতিথিকে আরও এক গ্লাস দিয়ে তাকে নিয়ে হল-ঘরে ঢুকে কুনিন একটা সোফায় শুয়ে ফাদার ইয়াকভের সাক্ষাৎকার তার মনে যে অপ্রীতিকর অনুভূতির সৃষ্টি করেছে সেই কথাই ভাবতে লাগল।

''লোকটা কী বিচিত্র, অভদ্র। নোংরা, অগোছালো, কর্কশ, স্থূলবুদ্ধি, হয় তো পাঁড় মাতালও...হা ঈশ্বর, আব সে কি না একজন পুরোহিত, এক পাল ভেড়ার পালক ও চালক! প্রতিটি জনসমাবেশেব সামনে ডিয়েকন যখন তাকে উদ্দেশ করে বলে 'পুণ্যময় পিতা, আমাদিগকে আপনি আশীর্বাদ করুন' তখন তার কণ্ঠে যে কী বিদ্রূপ ফুটে ওঠে সেটা আমি কল্পনা করতে পারি। একটি পুণ্যময় পিতাই বটে! মর্যাদাবোধ বা শিষ্ট আচরণের ছিটেফোঁটাও নেই, বিদ্যালয়ের ছোট ছেলের মত বিস্কুট নিয়ে পকেট ভর্তি করছে...উঃ! বিশপ যখন এ হেন লোককে দীক্ষা দিয়েছিলেন, না জানি তখন তিনি কি ভেবেছিলেন? এদের মত শিক্ষককে তারা যখন পাঠাতে পারেন, তখন সাধারণ মানুষ সম্পর্কে তাঁরা কি ভাবেন? তাদের তো দরকার এমন সব মানুষকে...''

আর কুনিন তখন ভাবতে বসল, একজন রুশ পুরোহিতের কি রকম মানুষ হওয়া উচিত।

এখন ধরা যাক, আমি যদি পুরোহিত হতাম...একজন সুশিক্ষিত পুরোহিত যে নিজের কাজকে ভালবাসে সে তো অনেক কিছু করতে পারে...অনেক আগেই আমার একটা বিদ্যালয় খোলা উচিত ছিল। আর উপদেশের কথা? একজন পুরোহিত যদি সত্যি সত্যি নিজের কাজকে ভালবাসে, তাহলে কী চমৎকার, উদ্দীপনাময় উপদেশই সে দিতে পারে!''

দুই চোখ বুজে কুনিন মনে মনে একটা উপদেশের খসড়া তৈরী করতে লাগল। একটু পরেই নিজের ডেস্কে বসে অতি দ্রুত সেটা লিখতে শুরু করল।

ভাবল, ''বুড়ো জিঞ্জার হুইস্কার্সকে এটা দেব, সে যেন গির্জায় এটা পড়ে।''

পরের রবিবার সকালে বিদ্যালয়ের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে সে সিংকোভোতে গেল। মনের ইচ্ছা, সেই সঙ্গে গির্জাটাও একবার দেখে আসবে, সেও তো ঐ গির্জারই যজমান। নরম বরফ পড়া সত্ত্বেও সকালটা ছিল সুন্দর। সূর্যের উজ্জ্বল কিরণে পুরনো বরফ গলতে শুরু করেছে। বরফের উপর সূর্যের রশ্মি পড়ে হীরকের মত ঝকমক করছে; সেদিকে তাকালে চোখ ঝলসে যায়। সুযোগ পেয়ে বসন্তের ফসলগুলি সব মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। দাঁড়কাকের দল ঘুরে ঘুরে উড়ছে। একবার উঁচুতে উড়ে যাচ্ছে, আবার মাটিতে নেমে দুই পায়ে ভর দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াবার আগে একটু লাফাচ্ছে।

কুনিন যে কাঠের গির্জাটায় গিয়ে পৌঁছল সেটা দেখতে সাদাসিদে; মেরামত করা হয়েছে খারাপভাবে; প্রবেশ-পথের থামগুলোতে একসময় সাদা রং লাগানো হয়েছিল, এখন সে রং উঠে গিয়ে বিশ্রী শকটদণ্ডের মত দেখাচ্ছে। দরজার উপরকার বিগ্রহ একেবারে কালো হয়ে গেছে। কিন্তু এই দারিদ্র্য কুনিনকে স্পর্শ করল, সে অভিভূত হল। বিনীতভাবে চোখ নীচু করে গির্জায় ঢুকে সে চৌকাঠের উপর থেমে গেল। প্রার্থনা-অনুষ্ঠান সবে শুরু হয়েছে। বুড়ো সেক্সটনটি কুঁজো হয়ে একেবারেই বেঁকে গেছে। কোন রকমে ফাঁকা, অস্পষ্ট সুরে পাঠ করছে। ডিয়েকন না থাকায় ফাদার ইয়াকভই ধূপতি নাড়তে নাড়তে গির্জা প্রদক্ষিণ করছে। অবহেলিত গির্জাটায় ঢুকে কুনিন যদি এতটা অভিভূত না হত তাহলে ফাদার ইয়াকভকে দেখে তার নির্ঘাৎ হাসি পেত। ক্ষুদে পুরোহিতের পরনে ছিল পুরনো হলুদ কাপড়ের একটা খুব লম্বা কুঁচকানো ঢিলে জামা। তার তলার দিকটা মাটিতে গড়াচ্ছে।

গির্জায় মোটেই ভিড় ছিল না। পল্লীর যজমানদের দেখে কুনিন প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল: তার চোখে পড়ল কেবল বুড়ো মানুষ আর ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। যারা কাজকর্ম করে খায় সে বয়সের মানুষজন কোথায় গেল? কোথায় গেল যুবকরা? কিন্তু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরে

বুড়োদের মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে কুনিন বুঝতে পারল যুবকদেরই সে বুড়ো বলে ভুল করেছে। অবশ্য দৃষ্টির এই ছোট ভুলটাকে সে বিশেষ গুরুত্ব দিল না।

গির্জার ভিতরটাও বাইরেটার মতই সাদাসিদে ও ভাঙাচোরা। বিগ্রহের বেদী এবং বাদামী দেওয়ালে এমন একটা জায়গাও ছিল না কালের হস্তাবলেপনে যা এবড়ো-খেবড়ো ও কালো হয়ে যায় নি। অনেকগুলি জানালা থাকলেও মোটামুটি রংটা দাঁড়িয়েছে ধূসর, আর তাই পুরো গির্জাটাই কেমন অন্ধকার দেখাচ্ছে।

কুনিন মনে মনে বলল, ''যার হৃদয় পবিত্র সে এখানে এসে পূজা করুক...রোমের সেণ্ট পিতার্সের জাকজমক দেখে লোকে যেমন অভিভূত হয়, তেমনিই এখানে এলে দীনতা ও সরলতা দেখে লোকে বিচলিত হবে।''

কিন্তু ফাদার ইয়াকভ যখন ভজনালয়ে প্রবেশ করে প্রার্থনা-অনুষ্ঠান শুরু করল তখনই কুনিনের পূজারীর মনোভাব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। বয়সের অল্পতা এবং সরাসরি দীক্ষালাভের ফলে ফাদার ইয়াকভ পুরোহিতের কাজকর্ম কিছুই ঠিকমত শেখে নি। মন্ত্র পড়ার সময় সে ইচ্ছামত উঁচু-নিচু স্বরগ্রাম ব্যবহার করতে লাগল ; প্রণতি জানাতে অবনত হল বিশ্রী ভঙ্গীতে, হাঁটল অতি দ্রুতগতিতে, আর রাজকীয় দরজাগুলি খুলল ও বন্ধ করল কর্কশ শব্দ করে।...স্পষ্টতই অসুস্থ ও বধির বৃদ্ধ সেক্সটন পুরোহিতের সব মন্ত্র ঠিক মত ধরতে না পারায় কিছু ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছিল। ফাদার ইয়াকভ মন্ত্র-উচ্চারণ শেষ করার আগেই সেক্সটন তার অংশটা গেয়ে উঠল, অথবা ফাদার ইয়াকভ অনেক আগেই শেষ করেছে কিন্তু বুড়ো মানুষটি তখন কান পেতে আছে বেদীর দিকে, চুপচাপ থেকে শুনবার চেষ্টা করছে, যতক্ষণ না কেউ তার জোব্বা ধরে টানছে। বুড়ো মানুষটার গলা এমনিতেই বেসুরো ও ভাঙা, মাঝে মাঝেই তার হাঁপ ধরছে, গলা কাঁপছে, উচ্চারণও অস্পষ্ট হচ্ছে। আর এ সব কিছুকে টেক্কা দিয়ে সেক্সটনের কথার প্রতিধ্বনি করছে একটি খুব ছোট ছেলে, গানের গ্যালারির রেলিং-এর উপর দিয়ে তার মাথাটা প্রায় চোখেই পড়ছে না। বালকটি গান করছে উঁচু খনখনে গলায় ; মনে হচ্ছে সে যেন ইচ্ছা করেই ঠিক সুরটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কুনিন কিছুক্ষণ মন দিয়ে শুনে ধূমপান করতে বাইরে গেল। সে খুবই হতাশ হয়ে পড়েছে। প্রায় ঘৃণার দৃষ্টিতেই ধূসর গির্জাটার দিকে তাকাল।

''লোকে নালিশ জানায় যে মানুষের ধর্ম ভাবটা ক্রমে কমে যাচ্ছে'', সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। ''তারা যদি আজকাল ঐ রকম সব পুরোহিত গ্রামে গ্রামে পাঠান তাহলে আমি সে নালিশ শুনে বিস্মিত হব না!''

কুনিন আরও দু'তিনবার গির্জায় ঢুকল, কিন্তু প্রতি বারই বাইরের খোলা হাওয়ায় যাবার জন্য একটুও অপেক্ষা করতে পারল না। অনুষ্ঠান শেষ হলে ফাদার ইয়াকভ তাকে বাড়িতে নিয়ে গেল। বাইরে থেকে দেখলে পুরোহিতের বাড়িটাও অন্য সব কৃষকদের বাড়ির মতই শুধু ছাদের উপরকার খড়গুলো একটু বেশী ছিমছাম, আর জানালায় ছোট ছোট সাদা পর্দা ঝোলানো। ফাদার

ইয়াকভ কুনিনকে নিয়ে একটা ছোট ঝলমলে ঘরে ঢুকল। মেঝেটা মাটির আর দেয়ালে সস্তা দেয়াল-কাগজ ঝুলছে। ফ্রেমে বাঁধানো ফটোগ্রাফ এবং দোলকের সঙ্গে একজোড়া কাঁচি বসানো একটি ঘড়ি—এই রকম কিছু বিলাস-সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও ঘরটা দেখেই মনে হয় এ সব সাজগোজ নেহাৎই সাময়িক। আসবাবপত্রের দিকে তাকালেই মনে হবে যে ফাদার ইয়াকভ বাড়ি-বাড়ি ঘুরে এ সব জিনিস একটা একটা করে সংগ্রহ করেছে : এক জায়গা থেকে তাকে দিয়েছে একটা তিন-পায়ার গোল টেবিল, আর এক জায়গা থেকে একটা টুল, তৃতীয় জায়গা থেকে একটা খাড়া পিঠওয়ালা চেয়ার, চতুর্থ জায়গার চেয়ারের পিঠটা সোজা কিন্তু সিটটা খোলা, আর পঞ্চম জায়গা থেকে উদারতাবশত তাকে দিয়েছে ডিভানের মত দেখতে একটা বস্তু, তার পিঠটা সমান আর আসনটা কারুকার্য করা। এই ডিভানের মত দেখতে জিনিসটাকে গাঢ় লাল দিয়ে রং করা হয়েছে, তার কড়া গন্ধ সহজেই নাকে আসে। কুনিন চেয়ারেই বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে কি ভেবে টুলেই বসল।

একটা মস্ত বড় কদাকার পেরেকের সঙ্গে টুপিটার ঝুলিয়ে ফাদার ইয়াকভ প্রশ্ন করল, "এই কি প্রথমবার আপনি আমাদের গির্জায় এলেন?"

"হ্যাঁ, এই প্রথম। তাহলে ফাদার...কাজের কথা শুরু করার আগে আমাকে এক পেয়ালা চা দিন। আমার আত্মারাম একেবারে শুকিয়ে উঠেছে।"

ফাদার ইয়াকভ চোখ পিট্পিট্ করল, একটু কাশল, তারপর দুই ঘরের মধ্যবর্তী দেয়ালের ওপাশে চলে গেল। ফিস্ফিস্ করে কিছু দ্রুত কথাবার্তা হল।

"উনি নিশ্চয় ওর স্ত্রী হবেন", কুনিন ভাবল। "না জানি তিনি দেখতে কেমন্, এই আদা-রং গোঁফওয়ালা পুরোহিতের স্ত্রী তো।"

কিছুক্ষণ পরে ঘেমে লাল হয়ে ফাদার ইয়াকভ দেয়ালের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে একটু হাসবার চেষ্টা করে ডিভানের একধারে কুনিনের দিকে মুখ করে বসে পড়ল।

অতিথির দিকে না তাকিয়েই বলল, "ওরা সবে সামোভারটা চাপিয়েছে।"

কুনিন সত্রাশে ভাবল, "হায় প্রভু, এখনও সামোভারটা চাপানো হয় নি! তাহলে তো এক যুগ লেগে যাবে!"

মুখে বলল, "বিশপের কাছে লেখা একটা চিঠির খসড়া আপনার জন্য নিয়ে এসেছি। চা পানের পরে সেটা আপনাকে পড়ে শোনাব।...ইচ্ছা হলে আপনি তাতে কিছু যোগ করতে পারেন।"

"খুব ভাল কথা স্যার।"

দীর্ঘ নীরবতা। ফাদার ইয়াকভ উদ্বেগের সঙ্গে তেরছা চোখে দেয়ালের দিকে তাকাল, চুলটা ঠিক করল, নাকটা ঝাড়ল।

বলল, "আমাদের এখানে আবহাওয়াটা চমৎকার স্যার।"

"হ্যাঁ। ভাল কথা, গতকালই একটা মজার কথা পড়েছি। ভলস্কোয়ে ...ভো স্থির করেছে তাদের সবগুলি বিদ্যালয়কে গির্জার হাতে তুলে দেবে।"

কুনিন উঠে মাটির মেঝেতে পায়চারি করতে করতে এ বিষয়ে তার মতামত শোনাতে লাগল।

বলল, "কাজটা ঠিকই হত যদি পাদরিরা তাদের কাজের উপযুক্ত হতেন এবং নিজেদের কাজ সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতেন। আমার দুর্ভাগ্য যে এমন কিছু পুরোহিতকে আমি জানি যাদের শিক্ষা ও নৈতিক গুণাবলী পাদরি তো দূরের কথা, সেনাবিভাগের কেরাণি হবার উপযুক্তও নয়। আর আমি নিশ্চিত জানি আপনি স্বীকার করবেন যে একজন খারাপ শিক্ষক একজন খারাপ পুরোহিত অপেক্ষা একটা বিদ্যালয়ের অনেক কম ক্ষতি করতে পারেন।"

কুনিন ফাদার ইয়াকভের দিকে তাকাল। ফাদার ইয়াকভ পা তুলে বসে নিজের চিন্তায়ই ডুবে ছিল, অতিথির কথাগুলি তার কানেই ঢোকে নি।

"ইয়াশা, এখানে এস!" দেয়ালের ওপার থেকে একটা নারীকণ্ঠ শোনা গেল।

ফাদার ইয়াকভ চমকে উঠে ওপরে চলে গেল। আবার কিছু দ্রুত ফিস্‌ফিস্ কথা হল।

কুনিনের হঠাৎ এক পেয়ালা চা খাবার বাসনা হল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে ভাবল, "না, ভয় হচ্ছে এখানে চায়ের কোন আশা নেই! যে ভাবেই হোক, মনে হচ্ছে এখানে আমি স্বাগত অতিথি নই। গৃহকর্তা আমার সঙ্গে একটা কথাও বলে নি, ওখানে বসে শুধু চোখ মিটমিট করেছে।"

কুনিন টুপিটা হাতে নিয়ে ফাদার ইয়াকভের জন্য একটু অপেক্ষা করে সেখান থেকে সরে পড়ল।

ফেরবার পথে সে রাগে জ্বলতে লাগল, "একটা সকাল বৃথাই নষ্ট হল! একটা হাঁদা! মাথামোটা! গত বছরের বরফ নিয়ে আমার যতটুকু আগ্রহ, একটা বিদ্যালয় নিয়ে তার আগ্রহও ঠিক ততটুকুই। না, তার সঙ্গে কোন কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা করার কোন মানে হয় না! কোন সিদ্ধান্তেই আমরা পৌঁছতে পারব না! মার্শাল যদি জানতেন এখানকার পুরোহিতটি কি চিজ, তাহলে বিদ্যালয়টি নিয়ে তিনি এমন উঠেপড়ে লাগতেন না। প্রথমে একজন ভাল পুরোহিত চাই, তারপর বিদ্যালয়ের কথা ভাবা যাবে।"

কুনিন এখন ফাদার ইয়াকভকে প্রায় ঘৃণা করতে শুরু করেছে। এই মানুষটি, লম্বা, কুঁচকানো পোশাক-পরা তার ব্যঙ্গচিত্রসুলভ করুণ আকৃতি, কৃষক-রমণীর মত মুখ, অপরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ করার ধরণ, তার জীবনযাত্রা এবং কেরাণিসুলভ ভীরু শ্রদ্ধাপ্রবণতা আজ অপমানিত করেছে

ধর্মীয় অনুভূতির সেই ছিটে-ফোঁটাটুকু যা এখনও পর্যন্ত কুনিনের বুকের মধ্যে নিঃশব্দে বাসা বেঁধে আছে ধাই-মার মুখে শোনা রূপকথার কাহিনীগুলোর পাশে পাশে। এই ব্যাপারটা নিয়ে কুনিনের আন্তরিক ও ঐকান্তিক আগ্রহকে সে যেরকম অনাগ্রহ ও উদাসীনতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে সেটা কুনিনের অহংকারের পক্ষে সহ্য করা কঠিন...

সেদিন সন্ধ্যায় কুনিন নিজের ঘরে অনেকক্ষণ ধরে পায়চারি করল আর ভাবল, তারপর মনস্থির করে নিজের ডেস্কে বসে বিশপকে একটা চিঠি লিখল। বিদ্যালয়ের জন্য টাকা ও তার আশীর্বাদের অনুরোধ জানিয়ে ছেলের মত আন্তরিকতার সঙ্গেই সিংকোভোর পুরোহিতটি সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশ করল। লিখল, ''সে বয়সে যুবক, শিক্ষা-দীক্ষা যথেষ্ট নয়, পানাসক্ত বলেও মনে হয়, আর গত কয়েক শতাব্দী ধরে রাশিয়ার মানুষ তাদের পুরোহিতদের সম্পর্কে যে সব দাবী গড়ে তুলেছে সেগুলি সে পূর্ণ করতে পারছে না।'' চিঠি শেষ করে কুনিন একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলল এবং তারপর স্বীয় কর্তব্য পালন করা হয়েছে এই বোধ নিয়ে শুতে গেল।

সোমবার সকালে বিছানায় শুয়েই সে খবর পেল, ফাদার ইয়াকভ তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছিল না বলে সে লোকজনকে হুকুম করল, তারা যেন বলে দেয় যে সে বাড়িতে নেই।

মঙ্গলবারে একটা সভায় যোগ দিতে সে বাইরে চলে গেল আর শনিবারে ফিরে এসে শুনল, তার অনুপস্থিতিতে ফাদার ইয়াকভ প্রতিদিন এসেছে।

''আচ্ছা, আমার বিস্কুটের স্বাদ তাহলে তার ভালই লেগেছে!'' কুনিন ভাবল।

ফাদার ইয়াকভ রবিবারেব পড়ন্ত বিকেলে আবার এল। এবার শুধু তার জোব্বার তলাটা নয়, টুপিটা পর্যন্ত ছিল কাদায় মাখামাখি। প্রথম দিনের মতই সে এল ঘেমে লাল হয়ে, আর আগের মতই বসল চেয়ারের একটা কোণে। কুনিন স্থির করল, বিদ্যালয় নিয়ে কোন কথা বলবে না, বেনাবনে মুক্তো ছড়াবে না।''

''আপনার জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের একটা তালিকা এনেছি পাভেল মিখাইলোভিচ,'' ফাদর ইয়াকভ বলতে শুরু করল।

কিন্তু এটা খুবই পরিষ্কার যে ফাদার ইয়াকভ তালিকাটির কারণেই আসে নি। তার সারা শরীর থেকে ফুটে বের হচ্ছিল একটা চরম বিব্রত ভাব, অথচ তার চোখে মুখে দেখা যাচ্ছিল এমন একটি মানুষের দৃঢ় সংকল্প যার মাথায় হঠাৎই একটা ধারণার উদয় হয়েছে। একটা গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত দরকারী কথা সে বলতে চাইছে, আর নিজের লাজুক স্বভাবকে জয় করার জন্য যুদ্ধ করে চলেছে।

কুনিন ভিতরে ভিতরে গরম হয়ে উঠল ঃ ''ও কিছু বলছে না কেন? এখানে আসবে আর মৌজ করে বসে থাকবে! তার জন্য নষ্ট করার মত সময় তো আমার নেই!''

নিজেব অপটুতা ঢাকাব এবং ভিতবকাব সংঘাতকে লুকোবাব চেষ্টায় পুবোহিত জোব কবে হাসতে লাগল , ঘর্মাক্ত লাল মুখেব উপব জোব কবে ফুটিযে তোলা এবং ধূসব নীল চোখেব ফাঁকা দৃষ্টিব সঙ্গে একান্ত বেমানান সেই দীর্ঘ হাসি কুনিনকে বাধ্য কবল তাব দৃষ্টি ফিবিযে নিতে। সে বিবক্ত হযে উঠল। বলল, ''মাপ কববেন ফাদাব, আমাকে বেব হতে হবে।''

ফাদব ইযাকভ চমকে উঠল, একটি ঘুমন্ত মানুষকে আঘাত কবলে সে যেবকম চমকে ওঠে। তবু সে হাসতে লাগল, আব বিচলিতভাবে গাযেব জোব্বাটা নাড়াচাড়া কবতে শুরু কবল। লোকটিব প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপতা সত্ত্বেও কুনিন হঠাৎ তাব জন্য দুঃখ বোধ কবল, নিজেব কঠোবতাকে নবম কবতে সচেষ্ট হল।

বলল, ''যদি কিছু না মনে কবেন ফাদাব. আপনি অন্য এক সময আসুন। কিন্তু বিদায নেবাব আগে আপনাকে একটা অনুবোধ কবতে চাই সেদিন হঠাৎই দুটি সুসমাচাব লিখে ফেলেছি আমাব ইচ্ছা আপনি সেগুলি একবাব দেখুন। যদি সেগুলিকে উপযুক্ত মনে কবেন, তাহলে সেগুলো পড়ে শোনাতে পাবেন।''

লেখাটা টেবিলেব উপবেই ছিল। তাব উপবে হাত বেখে ফাদাব ইযাকভ বলল, ' ঠিক আছে স্যাব। এগুলি আমি নিযে যাব স্যাব।''

একান্ত বিব্রত ভঙ্গীতে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িযে থেকে হঠাৎ জোব-কবা হাসিটা থামিযে দৃঢ় সংকল্পেব সঙ্গে মাথাটা তুলল।

বেশ জোবেব সঙ্গে স্পষ্টভাবে বলাব চেষ্টাতেই সে মুখ খুলল, ''পাভেল মিখাইলোভিচ. ''

''আপনাব জন্য আমি কি কবতে পাবি বলুন ?''

' আমি শুনেছি আপনি ভাবছেন, মানে আপনাব সচিবকে ছাড়িযে দেবেন এবং একজন নতুন সচিব খুঁজছেন ''

' হ্যাঁ আপনি কি কাউকে সুপাবিশ কববেন ?'

''আমি, কি জানেন আমি কাজটা কি আপনি মানে আমাকে দিতে পাবেন ?''

''আপনি কি পুবোহিতেব কাজটা ছেড়ে দিচ্ছেন ? ' কুনিন বিস্মিত হযে প্রশ্ন কবল।

ফাদাব ইযাকভ তাড়াতাড়ি জবাব দিল, ''না, না।'' যে কাবণেই হোক সে বিবর্ণ হযে গেল, তাব সাবা শবীব কাঁপতে লাগল। ''ঈশ্বব না করুন। আপনাব যদি কোন সন্দেহ থাকে, কাজটা আমাকে দেবেন না। কাজটা আমি ফাঁকে ফাঁকে কবতে চাই আমাব আযটা বাড়াবাব জন্য সত্যিকাবেব প্রযোজন নেই, সেবকম কিছু ভাববেন না।''

''হুম আযবৃদ্ধি কিন্তু আমাব সচিবকে আমি তো দেই মাসিক মাত্র বিশ রুবল।''

''হা ঈশ্বব, আমি তো দশ পেলেই কাজটা কবব।'' চোখ ফিবিযে

ফাদার ইয়াকভ নীচু গলায় বলল। ''এমন কি দশই যথেষ্ট। আপনি ...আপনি অবাক হচ্ছেন; সকলেই অবাক হয়। লোভী, টাকার-কাঙাল পুরোহিতটা টাকা দিয়ে কি করে? আমিও বুঝি যে আমি লোভী,...সেজন্য নিজেকে শাস্তি দেই, নিজের বিচার করি...মানুষের চোখের দিকে তাকাতে লজ্জা বোধ করি...এটাই আসল সত্য পাভেল মিখাইলোভিচ, পরম প্রভু আমার সাক্ষী থাকুন..''

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফাদার ইয়াকভ আবার শুরু করল ঃ

''প্রিয় বন্ধু, আপনার জন্য একটা প্রিয় সুসমাচার আমি তৈরী করেছিলাম, কিন্তু এখন সব ভুলে গেছি, এখন আর সঠিক শব্দগুলো খুঁজে পাচ্ছি না। গ্রাম থেকে আমি বছরে একশ' পঞ্চাশ রুব্‌ল্ পাই, আর কেউ বুঝতে পারে না এত টাকা দিয়ে আমি কি করি...কিন্তু আপনাকে সব কথা বুঝিয়ে বলব—বছরে চল্লিশ রুব্‌ল্ দেই ধর্মীয় বিদ্যালয়ে আমার ভাই পেত্যার জন্য। নিজের থাকা-খাওয়াটা সে পায়, আমি শুধু কাগজ-কলমের ব্যবস্থা করে দেই...''

''হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার কথা আমি বিশ্বাস করছি। কিন্তু এ সবের দরকার কি?'' অতিথির গোপন কথাগুলি শুনে আর তার জলভরা চোখের ঝিলিক এড়াবার কোন পথ না পেয়ে তার মনটা ভয়ংকর রকমের ভারী হয়ে উঠল; কুনিন তাই তার হাতটা নাড়াতে লাগল।

''তারপর স্যার, আমার চাকরির দরুণ ধর্মীয় পরিষদের প্রাপ্য টাকাটা এখনও শোধ করতে পারি নি। আমার চাকরির জন্য তারা দু'শ' রুব্‌ল্ ধার্য করেছে, আর সেটা দিতে হবে মাসিক দশ রুব্‌ল করে...কাজেই আপনি তো বুঝতেই পারছেন, আমার হাতে আর কি থাকছে? এ ছাড়া ফাদার এভ্রমিকে দিতে হয় প্রতি মাসে তিন রুব্‌ল্!

''কে ফাদার এভ্রমি?''

''আমার আগে ফাদার এভ্রমি ছিল সিংকোভোর পুরোহিত। সে বরখাস্ত হয়েছিল—দুর্বলতার জন্য, কিন্তু এখনও সে সিংকোভোতেই থাকে! আর কোথায় যাবে? কে তাকে খাওয়াবে? বুড়ো হলেও এখনও তার কয়লা চাই, খাদ্য চাই, পোশাকপত্র চাই। একজন পুরোহিতকে তো আমি ভিক্ষা করতে দিতে পারি না! তা দিলে তো আমারই পাপ হবে! আমার পাপ! সে তো...সকলের কাছ থেকেই টাকা ধার করেছে, কিন্তু তার হয়ে ধার শোধ করি নি বলে আমি হলাম পাপী।

ফাদার ইয়াকভ লাফ দিয়ে উঠে মেঝের দিকে পাগলের মত তাকিয়ে এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত ছুটে বেড়াতে লাগল।

সারাক্ষণ দুই হাত তুলছে আর নামাচ্ছে, আর দাঁতে দাঁত চেপে বলছে, ''প্রিয় প্রভু! প্রিয় প্রভু! আমাদের উদ্ধার কর প্রিয় প্রভু, আমাদের করুণা কর। যদি তোমার এতটুকু বিশ্বাস না থাকে, শক্তি না থাকে, তাহলে এই পবিত্র কাজে নিয়েছিলে কেন? আমার হতাশার অন্ত নেই। আমাদের বাঁচাও

ঈশ্বর-জননী।''

''শান্ত হোন ফাদার!'' কুনিন বলল।

ফাদার ইয়াকভ তবু বলতে লাগল, ''এ যে ক্ষুধার যন্ত্রণা পাভেল মিখাইলোভিচ! আমাকে ক্ষমা করুন, কিন্তু এ ছাড়া আমার উপায় নেই...আমি জানি, হাত পাতলে, মাথা নোয়ালে, যে কেউ আমাকে সাহায্য করত, কিন্তু...আমি তা পারি না! কেমন করে আমি কৃষকদের কাছে বিক্ষে চাই? আপনি তো এখানে কাজ করছেন আর নিজের চোখেই দেখছেন...যারা অভাবী তাদের কাছে কেমন করে আমি ভিক্ষা চাইব? অথচ যারা ধনী, যারা জমিদার, তাদের কাছেও আমি কিছু চাইতে পারি না! এটা আমার গর্ব! তাতে যে আমার লজ্জাই বাড়ত!''

ফাদার ইয়াকভ দুই হাত দিয়ে মাথা আঁচড়াতে লাগল।

''আমার কী লজ্জা! প্রিয় প্রভু, কত লজ্জা। আমি নিজে গর্ব করি, তাই তো মানুষ আমাব দারিদ্র্য দেখতে পাক সেটা আমি সহ্য করতে পারি না। আপনি যখন আমার বাড়িতে এলেন তখন আমাদের এক আউন্স চাও ছিল না পাভেল মিখাইলোভিচ! একটা দানাও ছিল না, অথচ সে কথা আপনার কাছে স্বীকার করতে গর্বই আমাকে বাধা দিল। আমার পোশাকের জন্যও আমি লজ্জিত, এই সব জোড়াতালি...আমার জোব্বা, আমার ক্ষুধা...এ সবই আমাব লজ্জা...একজন পুরোহিতের কি গর্ব করা সাজে?''

ফাদার ইয়াকভ ঘরের মাঝখানে থেমে গেল। বুঝিবা কুনিনের উপস্থিতি ভুলে গিয়ে নিজেকেই বোঝাতে শুরু করল।

''বেশ তো, আমি না হয় এই ক্ষুধা, এ লজ্জাকে মেনেই নিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রীর কি হবে প্রিয় প্রভু! একটা ভাল ঘর থেকে আমি তাকে এনেছি! তার হাত দু'খানি সাদা, সে শান্ত, চা, বান রুটি ও ভাল চাদরে অভ্যস্ত...বাবা-মার বাড়িতে সে পিয়ানো বাজাত...সে যুবতী, বয়স এখনও বিশও হয় নি...আমি তো বুঝি সে সাজগোজ করতে চায়, মজায় থাকতে চায়, নানান জায়গা দেখে বেড়াতে চায়...কিন্তু আমার কাছে এসে...সে তো রাঁধুনিরও অধম, সে বাইরে বের হতে লজ্জা বোধ করে। প্রিয় প্রভু! প্রিয় প্রভু! জীবনের একমাত্র সুখ যখন আমি যজমানিতে যাই আর তার জন্য নিয়ে আসি একটা আপেল অথবা একখানা বিস্কুট...''

ফাদার ইয়াকভ আবার দুই হাতে মাথার চুল ছিঁড়তে শুরু করল।

''অতএব ভালবাসার বদলে আমাদের আছে কেবল করুণা...তাকে দেখলেই তার জন্য আমার দুঃখ হয়। আর আজকাল এ সব কী ঘটছে প্রিয় প্রভু। এ সব কথা যদি আপনি সংবাদপত্রে লেখেন, লোকে আপনাকে বিশ্বাস করবে না...এ সব কিছুর শেষ হবে কবে?''

তার গলার স্বরে ভয় পেয়ে কুনিন প্রায় চীৎকার করে উঠল, ''যথেষ্ট হয়েছে ফাদার! জীবনটাকে এত বিষণ্ণ চোখে দেখছেন কেন?''

ফাদার ইয়াকভ মাতালের মত সুরে বলে উঠল, ''মাপ করবেন পাভেল

মিখাইলোভিচ...আমাকে মাপ করবেন, এ সব...কিছু নয়, এদিকে মনোযোগ দেবেন না...আমি শুধু আমাকেই দোষ দিচ্ছি, সব সময় দেব। ওখানে দেখুন।''

ফাদার ইয়াকভ চারদিকে তাকিয়ে চুপি চুপি বলতে লাগল ঃ

''একদিন ভোরে আমি হাঁটিতে হাঁটিতে সিংকোভো থেকে লুচ্‌কোভো যাচ্ছিলাম ; এক সময় দেখলাম একটি স্ত্রীলোক নদীর তীরে দাঁড়িয়ে কি যেন করছে...আরও কাছে গিয়ে নিজের চোখকে আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না...হা ঈশ্বর! ডাক্তার আইভান সের্গেয়িচের স্ত্রী কাপড় কেচে নিংড়োচ্ছেন—ডাক্তারের স্ত্রী যিনি কলেজে পড়েছেন! তিনি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছিলেন যাতে কেউ তাঁকে দেখতে না পায়, আর গ্রাম থেকে হেঁটে এসেছিলেন এক মাইল পথ...কী দুর্লংঘ্য গর্ব! তিনি যখন বুঝতে পারলেন আমি সেখানে ছিলাম এবং তিনি যে কত গরিব সেটা দেখে ফেলেছি, তখন তাঁর সারা দেহ রাঙা হয়ে উঠেছিল।...আমি হতবাক, আতংকিত ; ছুটে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে চাইলাম, কিন্তু তিনি ধোয়ার জামা কাপড়গুলো লুকিয়ে ফেললেন, তাঁর ভয় হল পাছে তাঁর ছেঁড়া জামাকাপড় আমি দেখে ফেলি—

সেখানেই বসে পড়ে ত্রাসচকিত চোখে ফাদার ইয়াকভের বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে কুনিন বলল, ''এ সব কিছুই শুনলে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।''

''সত্যি, এটা অবিশ্বাস্য। ডাক্তারদের স্ত্রীরা আগে কখনও নদীতে গিয়ে কাপড় ধুতেন না পাভেল মিখাইলোভিচ! পৃথিবীর কোথাও না! আমার কাছেই তিনি পাপ স্বীকার করেছিলেন, তাই আমি তাঁকে অতটা নীচে নেমে যেতে দিতে পারি না কিন্তু আমি কি করতে পারি? কি? এদিকে তাঁর স্বামী বিনা পয়সায় আমার চিকিৎসা করছেন! আপনি ঠিকই বলেছেন যে এ সব কিছুই অবিশ্বাস্য শোনায়! নিজের চোখকেও আমি বিশ্বাস করতে পারি না! কি জানেন, অনেক সময় সমবেত প্রার্থনা অনুষ্ঠানে বাইরে তাকালে আপনি দেখতে পাবেন ক্ষুধার্ত এভ্রামি ও তাঁর স্ত্রীকে, আপনার মনে পড়বে ডাক্তারের স্ত্রীকে, ঠাণ্ডা জলে তাঁর হাত দু'খানি নীল হয়ে গেছে, তখন আপনি নিজেকেই ভুলে যাবেন, নির্বোধ, অসারের মত সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন যতক্ষণ না সেক্সটন আপনাকে ডাকে...এতো ভয়ংকর!''

ফাদার ইয়াকভ আবার ঘরময় পায়চারি শুরু করল।

হাত দোলাতে দোলাতে সে বলতে লাগল, ''প্রভু যীসাস! পুণ্যাত্মা সন্তগণ! আমার কর্তব্যও আমি পালন করতে পারি না...আপনি যখন বিদ্যালয়ের কথা বলেন তখন আমি কাষ্ঠ খণ্ডের মত দাঁড়িয়ে থাকি, একটা কথাও বুঝতে পারি না, কারণ সারাক্ষণ আমি খাদ্যের কথাই ভাবি...এমন কি বেদীর উপরেও...কিন্তু এ সব কথা কেন বলছি?'' ফাদার ইয়াকভ হঠাৎ থেমে গেল। ''আপনাকে তো বেরোতে হবে। আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার,

এ ভাবে...ক্ষমা করবেন।''

কুনিন নীরবে ফাদার ইয়াকভের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল, তাকে নিয়ে হল-ঘরে ঢুকল, তারপর পড়ার ঘরে ফিরে গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়াল। সে দেখতে পেল, ফাদার ইয়াকভ বাড়ি থেকে বের হল, ছেঁড়া টুপিটা মাথায় দিল এবং মাথাটা নীচু করে ধীরে ধীরে সে হাঁটতে লাগল, যেন গোপন কথাটি বলার জন্য লজ্জিত বোধ করছে।

''তার ঘোড়াটাকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না,'' কুনিন ভাবল। তার ভয় হল, পুরোহিত সম্ভবত প্রত্যেক দিনই পায়ে হেঁটে যাতায়াত করছে ঃ সিংকোভো এখান থেকে অন্তত সাত ভার্স্ট পথ, আর রাস্তাটা গভীর কাদায় ভর্তি। তারপর কুনিন দেখতে পেল, কোচোয়ান আন্দ্রেই ও তার পারামন নামে ছেলেটি ফাদার ইয়াকভের দিকে ছুটে গেল তার আশীর্বাদ নিতে আর একটা ডোবা লাফিয়ে পার হতে গিয়ে তার গায়ে কাদা ছিটিয়ে দিল। ফাদার ইয়াকভ টুপিটা তুলে ধীরে ধীরে আন্দ্রেইকে আশীর্বাদ করল, তারপর ছেলেটিকে আশীর্বাদ করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

কুনিন চোখের উপর হাতটা ঘসল ; মনে হল হাতটা যেন ভিজে গেছে। জানালা থেকে সরে গিয়ে চারদিকে তাকাল ; মনে হল, ঘরের মধ্যে একটা ভ চাপা কণ্ঠস্বর যেন সে শুনতে পেল।...টেবিলটার দিকে তাকাল...ভাগ্য ভাল যে তাড়াতাড়িতে ফাদার ইয়াকভ সুসমাচারগুলি নিয়ে যেতে ভুলে গেছে...দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে কুনিন সেগুলিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে টেবিলের তলায় ছুড়ে ফেলে দিল।

একটা সোফায় এলিয়ে পড়ে সে আর্তনাদ করে উঠল, ''আমি জানতাম না ; অথচ এক বছরের উপর আমি এখানে কাজ করছি বোর্ডের একজন স্থায়ী সদস্য, অবৈতনিক বিচারক এবং বিদ্যালয় পর্ষদের সভ্য হিসাবে। কী এক অন্ধ পুতুল আমি! আচ্ছা এক ফুলবাবু আমি! অবিলম্বে আমি এদের সাহায্য করব! এখনই!''

এঁকেবেঁকে হাঁটতে হাঁটতে সে কপালটা চেপে ধরে কঠিন চিন্তায় মন দিল। আঙুল গুণে গুণে কি একটা হিসাব করে তার ভয় হল, তার সরকারমশায়, চাকর-বাকর যে লোকটি মাংস আনে তাদের মাইনে দিতেই দু'শ' রুবলে কুলোবে না...তার চিন্তা ফিরে গেল সাম্প্রতিক অতীতে, যখন সে নির্বিচারে বাবার ধন-সম্পত্তি উড়িয়েছে, যখন বাইশ বছরের এক কাঁচা যুবক বেশ্যাদের দামী দামী পাখা দিয়েছে, কোচোয়ান কুজমাকে দৈনিক দশ রুব্‌ল্ করে দিয়েছে, আর অহংকারে মত্ত হয়ে অভিনেত্রীদের দান করেছে দামী সব উপহার। হায়, সেই সব উড়িয়ে-দেওয়া রুব্‌ল্ আজ কত কাজেই না লাগত!

কুনিন ভাবতে লাগল, ''ফাদাব এভ্রামি বেঁচে আছে মাসিক মাত্র তিন রুব্‌ল্ নিয়ে। একটি রুব্‌ল্ পেলে পুরোহিতের স্ত্রী একটু আয়েস করতে পারে, আর ডাক্তারের স্ত্রী কাঁচাকাঁচির জন্য একটা মেয়েকে রাখতে পারে।

কিন্তু আমি তাদের সাহায্য করবই ! সত্যি করব !"

তখনই হঠাৎ বিশপকে লেখা চিঠিটার কথা কুনিনের মনে পড়ে গেল, আর যেন হঠাৎই একটা ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে তার শরীরটা কেঁপে উঠল। এই স্মৃতি নিজের কাছে এবং অদৃশ্য সত্যের কাছে এক গভীর লজ্জা তাকে একেবার অভিভূত করে ফেলল।...

আর এই ভাবেই যে সব মানুষের সদিচ্ছা আছে, যারা অতিরিক্ত ভাল খায় ও নিশ্চিন্তে জীবন কাটায় তাদেরই একজনের একটা শুভকর্মের আন্তরিক প্রচেষ্টা শুরুতেই শেষ হয়ে গেল।

১৮৮৬



সুখী মানুষটি

The Happy Fellow

একটি যাত্রী-ট্রেন নিকোলায়েভস্কি রেলপথের বোলোগোয়ে স্টেশন থেকে ছাড়ল। একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর "ধূমপানের" কামরায় পাঁচটি যাত্রী গোধূলির আলোছায়ায় বসে ঝিমুচ্ছে। এই মাত্র খাওয়াদাওয়া শেষ করে আসনের পিঠে হেলান দিয়ে তারা ঘুমোবার চেষ্টা করছে।

দরজাটা খুলে গেল; গাড়ির মধ্যে পা ফেলল একটি ঢ্যাঙা, লাঠির মত মূর্তি; তার মাথায় আদা রংয়ের টুপি আর গায়ে ফ্যান্সি কোট; দেখতে অনেকটা কোন গীতি-প্রহসনের নায়ক অথবা জুলে ভার্নের সংবাদপত্রের প্রতিবেদকের মত।

মূর্তিটি গাড়ির মাঝখানে থামল, বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল, এবং কঠোর দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আসনগুলির দিকে তাকিয়ে রইল।

নিজের মনেই অস্পষ্টভাবে বলে উঠল, "না, এটা তো ঠিক গাড়িটা নয়। কী জ্বালা ! ভারী বিরক্তিকর ! না। এটা ঠিক গাড়ি নয় !"

একজন যাত্রী মূর্তিটির দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল ঃ

"আইভান আলেক্সেয়েভিচ ! তুমি এখানে ? সত্যি তুমি, না কি ?"

লাঠির মত দেখতে আইভান আলেক্সেয়েভিচ চমকে উঠল, বোকার মত যাত্রীটির দিকে তাকাল, তাকে চিনতে পারল, আর আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

"আঃ ! পিয়োতর পেত্রভিচ !" সে বলল। "গতকাল তোমাকে দেখি নি ! তুমি এই ট্রেনে আছ তা তো জানতামই না।"

কেমন আছ ?"

''আছি ভালই, তবে গাড়িটা ভুল করে ফেলেছি। কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না, বোকার হদ্দ তো আমি! আমাব দরকার আচ্ছা করে পিটুনি খাওয়া!''

লাঠির মত আইভান আলেক্সেয়েভিচ দুলছে আর বোকার মত হাসছে।

''যত সব বোকার মত কাজ!'' সে বলতে শুরু করল। ''দ্বিতীয় ঘন্টার পরে বেরিয়ে গেলাম এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি গিলতে। সে কাজটা অবশ্য করলাম। পরেব স্টেশনে পৌঁছতে অনেকটা পথ। তাই ভাবলাম, আরও এক গ্লাস হলে ক্ষতি কি? তারপর যখন ভাবছি আর চুমুক দিচ্ছি, তখন তৃতীয় ঘন্টাটা বাজল...সুতরাং আমিও বিদ্যুৎগতিতে ছুটতে ছুটতে যে গাড়িটা প্রথম দেখলাম সেটাতেই লাফিয়ে উটে পড়লাম। কী বোকা আমি! একেবারে একটা বৃদ্ধ বুড়ো হাঁস!''

''আচ্ছা, তোমাকে তো বেশ খুশি-খুশি মনে হচ্ছে,'' পিয়োতর পেত্রভিচ বলল। ''এখানেই এক মিনিট বসলে কেমন হয়? বসে পড় না!''

''নারে ভাই। আমি চলি, নিজের গাড়িটা খুঁজে দেখি। বিদায়!''

''এই অন্ধকারে তুমি সহজেই ট্রেন থেকে পড়ে যেতে পার। এখানেই বস। পরেব স্টেশনে পৌঁছলে তোমার গাড়ি খুঁজে নিও। এখন বসে পড় তো!''

আইভান আলেক্সেয়েভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেলে একান্ত অনিচ্ছায় পিয়োতর পেত্রভিচের ঠিক উল্টো দিকেই বসে পড়ল। স্পষ্টতই তাকে উত্তেজিত ও উৎকণ্ঠিত মনে হচ্ছিল।

''কোথায় চলেছ?'' পিয়োতব পেত্রভিচ শুধাল।

''আমি? মহাশূন্যে। মাথার মধ্যে এত গোলমাল চলছে যে কোথায় যাচ্ছি তা আমি নিজেই জানি না। ভাগ্য যেখানে নিয়ে যায় সেখানেই যাব। হা—হা! ভাইরে, একটা সুখী বোকা মানুষ কখনও দেখেছ? দেখ নি? তাহলে আমাব দিকে তাকাও! সব চাইতে সুখী মানুষটি তোমার সম্মুখে! হ্যাঁ, সত্যি। আমার মুখ দেখে কি বুঝতে পারছ না?''

''তোমাব মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে...তুমি...একটু...''

''এখন আমার মুখটা নিশ্চয় ভয়ংকর রকমের বোকা দেখাচ্ছে। কী আফশোস এখানে একটা আয়না নেই। আমার কুৎসিত মুখটা একবার দেখতে ইচ্ছা করছে। কি জান, আমি ক্রমেই বোকা বনে যাচ্ছি। সত্যি বলছি! হা—হা! বিশ্বাস কর আর না কর মধুচন্দ্রিমায় যাচ্ছি। আমি তো একটা বোকা বুড়ো হাঁস, তাই না?''

''তোমার মধুচন্দ্রিমা? তুমি তাহলে বিয়ে করেছ?''

''হ্যাঁ। আজই। বিয়েটা সেরেই সোজা ট্রেনে এসে চেপেছি।''

তারপর শুরু হল অভিনন্দন ও যথারীতি সব প্রশ্নের পালা। পিয়োতর পেত্রভিচ হেসে বলল, '' আরে, আমি তো কখনও..তাহলে সেইজন্যই তোমার এত সাজগোজ।''

''হ্যাঁ গো..চোখে ধাঁধা লাগাতে গন্ধও মেখেছি। একেবারে হাবুডুব

খাচ্ছি। চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, কেবলমাত্র মানে...কী যে বলে...হয়তো ভাল থাকা? সারা জীবনে কখনও এত ভাল লাগে নি!''

আইভান আলেক্সেয়েভিচ চোখ বুজে মাথা নাড়তে লাগল।

বলতে লাগল, ''লজ্জাজনক রকমের সুখী! তুমি নিজেই বিচার কর। এক মিনিটের মধ্যেই আমার কামরায় ফিরে যাব। সেখানে জানালার ধারে একটা কোচে বসে আছে এমন একটি মধুরতম প্রাণী যে তোমারই প্রাণী যে তোমারই অনুরাগিনী, বলতে পার দেহে এবং মনে। একটি নীলনয়না সুন্দরী, তিলফুলের মত নাকটি...ছোট ছোট আঙুল...আমার প্রেয়সী! আমার পরী! আমার ছোট্ট ফুলটি! আর তার পা! প্রিয় প্রভু! সে তো আমাদের মত থপ্‌থপে পা নয়, কিন্তু কি এক ছোটখাট, জাদু মাখানো পা, একটি রূপকথা যেন! আমি বুঝি তুলে নিয়ে খেয়ে ফেলতে পারি, এমন পা! আঃ, সে তুমি বুঝতে পারবে না! তুমি বস্তুবাদী, তোমরা বিচার-বিশ্লেষণ, আরও কত কি কর! শুকনো বুড়োকুমারের দল, তাছাড়া আর কি তোমরা! যখন বিয়ে করবে তখন এসব মনে পড়বে! বলবে, আইভান আলেক্সেয়েভিচ এখন কোথায় আছে? হ্যাঁ বন্ধু, এক মিনিটের মধ্যেই আমার কামরায় ফিরে যাব। সেখানে একজন অধৈর্য হয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে...আমার আগমনের প্রতীক্ষায় আছে। হেসে আমাকে স্বাগত জানাবে। আমি বসে দুই আঙুলে তার থুৎনিটা ধরব...''

আইভান আলেক্সেয়েভিচ মাথাটা ঘোবাতে ঘোরাতে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিল।

''তারপর তার ছোট্ট কাঁধেব উপর মাথাটা রেখে বাহু দিয়ে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরা। কী সুন্দর, কী শান্ত, এক কাব্যের গোধূলি। সেই মুহূর্তে গোটা পৃথিবীকে আমি আলিঙ্গনে বাঁধতে পারি। তোমাকেই একবার আলিঙ্গন করতে দাও পিয়োতর পেত্রভিচ!''

''তাই হোক।''

দুই বন্ধু আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল, যাত্রীরা হো-হো করে হেসে উঠল আর সুখী নব-বিবাহিত লোকটি বলতে লাগল :

''আর তার চাইতে বড় বোকামির কথা, যাকে উপন্যাসে বলা হয় বৃহত্তর মরীচিকা, বুফেতে গিয়ে একটা বা দুটো বোতল খুলে গলায় ঢাল। তার পরেই মাথার মধ্যে, বুকের মধ্যে এমন একটা কিছু ঘটল যা তোমরা রূপকথাতে পড় নি। আমি একটা ক্ষুদ্র, তুচ্ছ মানুষ, কিন্তু আমারও মনে হতে থাকে আমি সীমাহীন, গোটা পৃথিবীকে আমি জড়িয়ে ধরতে পারি।''

এই সুখী মাতাল নববিবাহিত লোকটিকে দেখে যাত্রীদের মনেও বুঝি নেশার ঘোর লাগল, তাদের ঘুম টুটে গেল। একজন শ্রোতার বদলে আইভান আলেক্সেয়েভিচ অচিরেই পেয়ে গেল পাঁচটি শ্রোতা। সে একবার লাফিয়ে ওঠে, আবার লাফিয়ে নামে, হাত দুটো দোলাতে থাকে, অবিরাম বকবক করে চলে। সে যখন হাসে, তার সঙ্গে তারাও হাসে।

''শুনুন ভদ্রজন, আসল কথা হল বেশী ভাবনা-চিন্তা না করা! চুলোয় যাক যত সব বিচার-বিশ্লেষণ...যদি মদ খেতে ইচ্ছা হয় তো খান, সেটা ক্ষতিকর কিনা সে দার্শনিক চিন্তা মাথায় আনবেন না...ও সব দর্শন ও মনোবিজ্ঞান চুলোয় যাক।''

কামরার ভিতরে কণ্ডাক্টর ঢুকল।

নববিবাহিত ভদ্রলোক তাকে বলল, ''দেখুন ভাই, আপনি যখন দু'শ' নয় নম্বর কামরায় যাবেন তখন সাদা পাখি আঁকা ধূসর টুপি মাথায় একটি মহিলার খোঁজ করে তাকে বললেন আমি এখানে আছি।''

''ঠিক আছে স্যার। কিন্তু এখন তো এ ট্রেনে দু'শ' নয় বলে কিছু নেই। আছে দু'শ' উনিশ!''

''ওই হল, দু'শ' উনিশই সই। ওতে কোন ফারাক নেই। শুধু মহিলাটিকে বলবেন যে তার স্বামীটি নিরাপদে আছে, ভাল আছে।''

আইভান আলেক্সেয়েভিচ হঠাৎ মাথাটা চেপে ধরে আর্তনাদ করে ওঠে :

''স্বামী...মহিলা...এটা কি অনেক কাল আগে ছিল? স্বামী...হা-হা...তোমার চাবুক খাওয়া উচিত, আর তুমি একটি স্বামী...কিন্তু সে...গতকালও সে ছিল একটি বালিকা...একটা ছোট্ট প্রজাপতি...এটা আমি বিশ্বাস করতেই পারি না!''

একজন যাত্রী বলে উঠল, ''আজকালকার দিনে একটি সুখী মানুষকে দেখতে পাওয়া বেশ আশ্চর্য ঘটনা। বরং একটা শ্বেত হস্তির দেখা পাওয়া যায়।''

আইভান আলেক্সেয়েভিচ ছুঁচলো জুতো পরা লম্বা পা দুটো টান টান করে বলল, ''ঠিক, কিন্তু সেটা কার দোষ? আপনি যদি সুখী না হন, সেটা তো আপনারই দোষ! হ্যাঁ, ভদ্রমশাইরা, আপনারা কি মনে করেন? মানুষ নিজেই তার নিজের সুখের স্রষ্টা। আপনি চাইলেই সুখী হতে পারেন, কিন্তু আপনি জেদ করে সুখের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন।''

''সত্যি? সেটা কি রকম?''

''খুব সরল! প্রকৃতিরই নির্দেশ যে প্রতিটি মানুষ জীবনের কোন এক সময়ে প্রেমে পড়বে। সে সময়টা যখন আসে তখন আপনার উচিত প্রাণভরে ভালবাসা, কিন্তু আপনারা প্রকৃতির নির্দেশ মানেন না, কিসের জন্য যেন অপেক্ষা করে থাকেন। আরও আছে...আইন বলে, প্রত্যেক স্বাভাবিক মানুষেরই বিয়ে করা উচিত। বিবাহ ছাড়া সুখ নেই। সুতরাং সঠিক সময় এলেই বিয়ে করুন, তার অন্যথা করবেন না। কিন্তু আপনারা বিয়ে করেন না, কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। আর পবিত্র পুঁথিতে লেখা আছে মদ মানুষের অন্তরকে আনন্দিত করে। আপনি যদি ভাল থাকেন এবং আরো ভাল থাকতে চান, তাহলে বুফেতে চলে যান, এক চুমুক পান করুন। আসল কথা হল, দার্শনিকের মত ভাবনা-চিন্তা করবেন, একটা রুটিন মেনে চলুন। রুটিন একটা বড় জিনিস!''

"আপনি বলেছেন মানুষ তার নিজের সুখের স্রষ্টা। কিন্তু যদি একটা খারাপ দাঁত বা একটি ক্রুদ্ধ শাশুড়ি তার সুখকে ভেঙে তচনচ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট হয়, তাহলে সে কেমন স্রষ্টা? সব কিছুই দৈবের উপর নির্ভর করে। এখনই যদি একটা কুকুয়েভকা ট্রেন দুর্ঘটনা আণাদের বেলায় ঘটে তাহলেই তো আপনাকে সুর পাল্টাতে হবে..."

"বাজে কথা!" নববিবাহিত লোকটি প্রতিবাদ করে। "ট্রেন-দুর্ঘটনা ঘটে বছরে মাত্র একবার। দুর্ঘটনার ভয় আমি করি না, কাবণ সেটা ঘটার পিছনে কোন কারণ থাকে না। সেগুলি বিরল ঘটনা। দুর্ঘটনা উচ্ছন্নে যাক! সে সম্পর্কে কোন কথা বলতে আমি চাই না। মনে হচ্ছে, আমরা পরবর্তী বিরতি-স্থানে পৌঁছে গেলাম।"

পিয়োতর পেত্রভিচ জিজ্ঞাসা করল," তুমি কোথায় যাবে? মস্কোতে না আরও দক্ষিণে?"

"আচ্ছা, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি! আমি যখন উত্তর দিকে চলেছি তখন দক্ষিণের কোন জায়গায় যাব কেমন করে?"

"কিন্তু মস্কো তো উত্তর দিকে নয়।"

"আমি জানি, কিন্তু আমরা চলেছি সেন্ট পিতার্সবার্গে," আইভান আলেক্সেয়েভিচ বলল।

"মাফ কর, কিন্তু আমরা তো মস্কো যাচ্ছি!"

"আশ্চর্য! তোমার টিকিটটা কোথাকার?"

"সেন্ট পিতার্সবার্গ।"

" সে ক্ষেত্রে আমি জানাতে চাই যে তুমি ভুল ট্রেনে উঠেছ।"

আধ মিনিটকাল সকলেই চুপ। নব-বিবাহিত লোকটি উঠে দাঁড়ায়, ফাঁকা দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকায়।

বিয়োতর পেত্রভিচ বুঝিয়ে বলে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, বোলোগোয়েতে তুমি লাফিয়ে ভুল ট্রেনে উঠেছিলে। ব্র্যাণ্ডি পেটে পড়তেই কিসের নেশায় কে জানে তুমি উল্টে দিকের ট্রেনে উঠে পড়েছিলে।"

আইভান আলেক্সেযেভিচের মুখটা সাদা হয়ে গেল, মাথাটা চেপে ধবে সে কামরার মধ্যে এ-ধার ও-ধার পায়চারি করতে লাগল।

হঠাৎ সে কেঁদে উঠল, "আমি কি বোকা! কী পাজি! শয়তান এসে আমাকে খেয়ে ফেলুক! এখন আমি কি করি? আমার স্ত্রী আছে আর একটা ট্রেনে! সেখানে সে একেবারে একা, অপেক্ষা করছে, দুশ্চিন্তা করছে! আমি একটা বোকা বাঁধাকপি!"

নববিবাহিত লোকটি কোচে এলিয়ে পড়ে; সে এমনভাবে কাতরাতে থাকে যেন কেউ তার আঁতে ঘা দিয়েছে।

সে আর্তনাদ করতে থাকে, "কী অসুখী মানুষ আমি! কি করতে পারি আমি? কি?"

যাত্রীরা তাকে সান্ত্বনা দেয়, "এই যে, এই যে...কোন ভয়

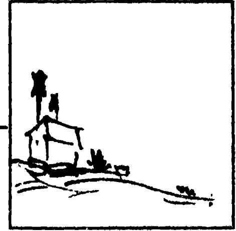
নেই...আপনার স্ত্রীকে একটা টেলিগ্রাম করে দিন, আর একটা ট্রেন ধরে ফিরে যাবার চেষ্টা করুন। তাহলেই তাকে পেয়ে যাবেন।''

''নিজের সুখের স্রষ্টা'' নববিবাহিত লোকটি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, ''একটা এক্সপ্রেসে ট্রেন! এক্সপ্রেস ট্রেনের টাকা আমি কোথায় পাব? আমার সব টাকাই যে স্ত্রীর কাছে আছে।''

কিছুক্ষণ ফিস্‌ফিস্ করবার পরে যাত্রীবা হাসি মুখে একমত হয়ে সুখী মানুষটিকে তার ভাড়াটা দিয়ে দিল।

১৮৮৬

পল্লী-ভবনে



At The Dacha

'''আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমার জীবন, আমার সুখ—আমার সর্বস্ব! এই স্বীকারোক্তির জন্য আমাকে ক্ষমা করো, কারণ নীরবে আরও যন্ত্রণা সহ্য করবার শক্তি আমার নেই। আমার অনুভূতির প্রতিদান তোমার কাছে চাই না, চাই কেবল করুণা...আজ সন্ধ্যা আটটার সময় পুরনো গ্রীষ্মাবাসে এসো ..আমার নাম স্বাক্ষর করবার দরকার আছে বলে মনে করি না, কিন্তু আমার এই অনামী থাকাটাকে তুমি ভয় পেয়ো না। আমি যুবতী, দেখতে ভাল . আর বেশী তোমার কি চাই?''

পাভেল আইভানিচ ভাইখোদৎসেভ সম্মানিত বিবাহিত মানুষ। সম্প্রতি নিজের পল্লী-ভবনে বাস করছেন! চিঠিটা পড়তে পড়তে তিনি বিচলিতভাবে কাঁধে ঝাঁকুনি দিলেন, কপাল আঁচড়ালেন।

ভাবলেন ''এ কী আপদ? আমি বিবাহিত মানুষ, আর নীল আকাশ থেকে এই অদ্ভুত ..অর্থহীন চিঠি! কে লিখতে পারে?''

পাভেল আইভানিচ চিঠিটাকে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন, আবার পড়লেন, মেঝেতে থুথু ফেললেন।

''আমি তোমাকে ভালবাসি'' কথাগুলিকে নকল করে বললেন, ''ও কি ভেবেছে আমি একটা স্কুলের ছেলে! তার সঙ্গে দেখা করতে আমি গ্রীষ্মাবাসে ছুটব! দেখ সোনা, এই সব ভালবাসাবাসির দিন আমি অনেক পিছনে ফেলে এসেছি। হুম! মেয়েটার বোধ হয় মাথার ঠিক নেই।...এই সব মেয়েদের আমরা চিনি। হায় প্রভু, এ কী ধরনের মেয়ে যে আমার মত একজন অপরিচিত পুরুষকে এ রকম চিঠি লেখে, আর তাও একজন বিবাহিত পুরুষকে। এ তো সরাসরি দুর্নীতির ব্যাপার!''

আট বছরের বিবাহিত জীবনে ও সব সূক্ষ্ম অনুভূতির ব্যাপার-স্যাপার তিনি ভুলে গেছেন মাঝে মধ্যে দু' একটা পাল-পার্বনের পোস্টকার্ড ছাড়া

কোন ব্যক্তিগত চিঠিই তার কাছে আসে না। সুতরাং যতই অন্যভাবে নিতে চেষ্টা করুন না কেন, এই চিঠিটা তাকে খুবই বিচলিত করেছে, উত্তেজিতও করেছে।

চিঠিটা পাবার এক ঘন্টা পরে সোফায় শুয়ে তিনি ভাবছিলেন ঃ

''অবশ্যই আমি স্কুলের ছেলে নই, এই মিলন-মেলায় বোকাব মত ছুটেও যাচ্ছি না, তবু চিঠিটা কে লিখেছে সেটা জানার আগ্রহ হয় বৈ কি। হুম! হাতের লেখাটা তো স্পষ্টই মেয়েমানুষের...চিঠিটা আন্তরিকতাব সঙ্গে হৃদয় থেকে লেখা, সুতরাং এটা তামাসা হতে পারে না...সম্ভবত কোন পাগল অথবা বিধবা...বিধবাবা প্রায়ই বাকসর্বস্ব ও ছিটগ্রস্ত হয়ে থাকে। হুম! কে হতে পারে?''

প্রশ্নটাব জবাব পাওয়া আরও শক্ত, কারণ চারদিকেব এতগুলি পল্লীভবনেব মধ্যে একমাত্র নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোকেব সঙ্গে পাভেল আইভানিচেব পরিচয় নেই।

''আশ্চর্য...'' তিনি অবাক হয়ে ভাবলেন। ''আমি তোমাকে ভালবাসি...সে কখনই বা প্রেমে পড়ল? বিস্ময়কব মেয়েমানুষ! পথে ঘাটেও কখনও দেখা হয় নি, কেউ আলাপ করিয়ে দেয় নি, আমি কেমন মানুষ তাও জানে না, অথচ এই রকম প্রেমে পড়ে গেল। দু'বার চোখেব দেখা দেখেই যে প্রেমে পড়তে পাবে সে নেহাৎই ছেলেমানুষ ও বোমান্টিক না হয়ে পাবে না...কিন্তু কে সে?''

হঠাৎ পাভেল আইভানিচের মনে পড়ে গেল, গতকাল এবং তাব আগের দিন তিনি যখন মুক্ত বায়ু সেবন করতে ঘুবে বেড়াচ্ছিলেন তখন একটি থ্যাবড়ানাক, যুবতী, সুকেশিনী, নীলবসনা মেয়েব সঙ্গে বারকয়েক তার দেখা হয়েছিল। স্ত্রীলোকটি বার বার তাব দিকে তাকাচ্ছিল, আব তিনি যখন একটা বেঞ্চিতে বসেছিলেন তখন সেও এসে তার ঠিক ডান দিকে বসেছিল...

ভাইখোদোৎসেভ নিজে নিজেই ভাবলেন, ''সেই কি? তা হতে পাবে না। সেই শান্ত, ক্ষীণ দেহ প্রাণীটি কি সত্যি তাব মত একটা বুড়ো হাবড়াকে ভালবাসতে পারে? না, অসম্ভব!''

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় পাভেল আইভানিচ স্ত্রীব দিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন ঃ

''সে বলছে সে যুবতী, দেখতেও ভাল...অতএব অন্তত বৃদ্ধা সে নয়...হুম...সত্যি কথা বলতে কি, আমিও তো এমন কিছু বুড়ো ও কুৎসিত নই যে কেউ কোন দিন আমাকে ভালবাসতে পারবে না এই তো, আমার স্ত্রী আমাকে ভালবাসে! আর তাছাড়া, ভালবাসা তো অন্ধও হয়।...''

''তুমি কি এত ভাবছ?'' তার স্ত্রী শুধালেন।

''কিছু না...মাথাটা একটু ধরেছে...'' পাভেল আইভানিচ মিথ্যা বললেন।

তিনি স্থির করলেন, প্রেম-পত্রের মত একটা তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাথা ঘামানোটা বোকামি ঃ প্রেম-পত্র ও তার লেখিকা দুটিকেই তিনি হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু হায়, মানুষের শক্রটি বড় শক্তিমান। মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে পাভেল আইভানিচ বিছানায় শুয়ে পড়লেন, কিন্তু ঘুমের বদলে আবার চিন্তা করতে লাগলেন ঃ

...আর সে হয় তো আশা করছে আমি সেখানে হাজির হব! সত্যি সে ভারী বোকা! আমাকে গ্রীষ্মাবাসে না দেখে সে কি খুব অস্থির হয়ে পড়বে না! কিন্তু আমি যাচ্ছি না...আর এটাই শেষ কথা।''

কিন্তু, বলেছি তো, মানুষের শক্রটি বড় শক্তিমান।

আধ ঘন্টা পরেই তিনি ভাবলেন, ''কিন্তু কৌতূহলবশতও তো আমি একবার যেতে পারি।...সেখানে গিয়ে দূর থেকে একবার তাকাব, দেখব সে দেখতে কেমন।... দেখাটা তো ভালই। একটু হাসাও যাবে; বাস, তাহলেই হল! সুযোগ যখন এসেছে তখন একটু হাসবই বা না কেন!''

পাভেল আইভানিচ পোশাক পরতে শুরু কবল।

তাকে একটা পরিষ্কার শার্ট ও কেতাদুরস্ত টাই পরতে দেখে তার স্ত্রী শুধালেন, ''এমন সাজগোজ করে কোথায় যাচ্ছ?''

''কোথাও না...একটু বেড়াতে যাচ্ছি। মাথাটা ধরেছে হুম...''

বেশবাস করে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর পাভেল আইভানিচ বেরিয়ে গেলেন। অস্ত-সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল গাছপালার সবুজ পটভূমিতে অন্য সব পল্লী-ভবনের লোকজনদেরও সাজগোজ করে চলতে দেখে তার বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করতে লাগল।

সলজ্জ ভঙ্গীতে স্ত্রীলোকদের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, ''এদের মধ্যে কোন্‌টি? কিন্তু সুনয়না কাউকেই তো দেখছি না...হুম...চিঠিটা যে লিখেছে সে হয় তো গ্রীষ্মাবাসের ভিতরে গিয়েই বসে আছে...''

ভাইখোদৎসেভ পুরনো গ্রীষ্মবাসের পথে ঢুকলেন ঃ লম্বা সবুজ লেবুগাছগুলির ফাঁক দিয়ে বাড়িটা দেখতে পেলেন। ধীরে ধীরে সেই দিকেই এগিয়ে চললেন...

হাঁটিতে হাঁটিতে ভাবলেন, দূর থেকে একবার মাত্র দেখব। আমার ভয় কিসের? আমি তো আর প্রিয়া-মিলনে যাচ্ছি না! আমি কী বোকা! লজ্জা পেয়ো না! কিন্তু গ্রীষ্মাবাসের ভিতরেই যদি যেতে হয়? না, তা হবে না!''

পাভেল আইভানিচের বুকটা আরও বেশী জোরে টিপ্ টিপ্ করতে লাগল...

ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হঠাৎ যেন কল্পনায় গ্রীষ্মাবাসের একটা মৃদু আলো দেখতে পেলেন...কল্পনায় এক ঝলক দেখতে পেলেন হাল্কা নীল বসন পরা একটি যুবতী, থ্যাবড়া নাক, সুকেশী নারীকে। তিনি তাকে দেখতে পেলেন, লজ্জিত হলেন, সলজ্জ ভঙ্গীতে তাকে এগিয়ে আসতে দেখে তার মাথা পর্যন্ত কাঁপতে লাগল, তার গরম নিঃশ্বাস অনুভব করলেন আর হঠাৎ সেই

নারী তাকে আলিঙ্গন করল।...

পাপ চিন্তাগুলিকে মাথার ভিতর থেকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টায় তিনি ভাবলেন, "আমি যদি বিবাহিত না হতাম তাহলে এটা এমন কি খারাপ কাজ হ্ত...কিন্তু...জীবনে মাত্র একটিবার সে চেষ্টা করলে ক্ষতি কিছু নেই বরং অন্যথায় এটার স্বাদ না জেনেই হয় তো আমাকে মৃত্যু-শয্যায় পৌঁছতে হবে আর আমার স্ত্রী...আরে, এতে তারই বা ক্ষতিটা কি হবে? ঈশ্বর জানেন, আট বছরের মধ্যে একটি মুহূর্তের জন্যও আমি তার সঙ্গ ছাড়া হই নি...আট বছরের নিষ্কলঙ্ক সেবা! সেটাই তো তার পক্ষে যথেষ্ট...এমন কি একটু বেশীই। দূর ছাই, আমার মনে তো কোন পাপ নেই।"

মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপতে কাঁপতে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পাভেল আইভানিচ আইভি ও বুনো দ্রাক্ষালতায় ঢাকা গ্রীষ্মাবাসের কাছে গিয়ে ভিতরে তাকালেন। একটা ভ্যাঁপসা ধূলোর গন্ধও যেন তার নাকে এল...

"মনে হচ্ছে এখানে কেউ নেই", ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি কথাটা ভাবলেন, কিন্তু তারপরেই দেখতে পেলেন এক কোণে একটি মূর্তি বসে আছে।

একটি মানুষের মূর্তি...পাভেল আইভানিচ আরো কাছে গিয়ে দেখেই নিজের স্ত্রীর ভাই মিতিয়াকে চিনতে পারলেন। সে তখন তাদের সঙ্গেই বাস করত।

টুপিটা খুলে আসনে বসে মনের অসন্তোষ গোপন না করেই তিনি বলে উঠলেন, "ওঃ তুমি!"

"হ্যাঁ, আমি..." মিতিয়া জবাব দিল।

একটা মিনিট, হয় তো দুটো, নীরবে কেটে গেল।

মিতিয়াই কথা বলতে শুরু করল, "মাফ করবেন পাভেল আইভানিচ, আমি বলতে চাই যে আমাকে একটু একা থাকতে দিন।...আমাব ডিগ্রিব থিসিসটা নিয়ে একটু ভাবনা-চিন্তা করছি...তাই অন্য করাও উপস্থিতি, এমন কি আপনার উপস্থিতিও আমার কাজে বিঘ্ন ঘটাবে..."

পাভেল আইভানিচ শান্ত গলায় বললেন, "সে ক্ষেত্রে তুমি অন্য কোথাও একটা অন্ধকার গলি খুঁজে নাও গে। খোলা বাতাসে ভাবনা-চিন্তা করাটাই সহজতর হবে। আর আমি...মানে...আমি এই বেঞ্চিটাতে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে চাই। এ জায়গাটা সে রকম গরম নয়..."

মিতিয়া গোঁ-গোঁ করে বলল, "আপনি চান নিদ্রা দিতে, আর আমি চাই থিসিসটা নিয়ে ভাবতে। আমার থিসিসটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।"

আবার নিরবতা। পাভেল আইভানিচের কল্পনা তখন বল্গাহীন হয়ে উঠেছে। প্রতিমুহূর্তেই তিনি যেন কারও পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়িয়ে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে শুরু করলেন ঃ

"দেখ, আমি তোমাকে মিনতি করছি মিতিয়া! তুমি আমার চাইতে ছোট, তোমার তো একটু শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকা উচিত...আমি অসুস্থ আর...আমি

একটু ঘুমতে চাই...তুমি চলে যাও!''

এটা তো অহংকারের কথা...আপনি এখানে থাকবেন, আর আমিই বা থাকব না কেন? আমি যাব না, নীতিগতভাবেই...''

''কিন্তু আমি তোমাকে মিনতি করছি! আমি অহংকাবী আত্মম্ভরী, মূর্খ...তবু তোমাকে মিনতি করছি! জীবনে এই একটিবার! এইটুকু সম্মান আমাকে কর!''

মিতিয়া মাথা নাড়তে লাগল।

পাভেল আইভানিচ নিজেব মনেই বললেন, ''একটা শুয়োর! ও এখানে থাকতে তো দেখা-সাক্ষাৎ হবে না। সেটা হতেই পারে না!''

তিনি বললেন, ''দেখ মিতিয়া, এই শেষ বারের মত তোমাকে বলছি...আমাকে দেখাও যে তুমি একটি বুদ্ধিমান, মানবিক, শিক্ষিত যুবক।''

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে মিতিয়া জবাব দিল, ''আপনিই বা কেন আমাকে বিরক্ত করছেন তা তো বুঝি না। যখন বলেছি আমি যাব না, তখন যাবই না। নীতি হিসাবেই আমি এখানে থাকছি...''

সেই মুহূর্তে থ্যাবড়া-নাক একটি স্ত্রীলোকেব মুখ হঠাৎ গ্রীষ্মাবাসে উঁকি মারল।

মিতিয়া ও পাভেল আইভানিচকে দেখে কপাল কুঁচকে মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেল ..

ঘৃণাব দৃষ্টিতে মিতিয়ার দিকে তাকিয়ে পাভেল আইভানিচ ভাবল, ''সে চলে গেল! এই পাজিটাকে দেখেই চলে গেল। সব শেষ হয়ে গেল!''

ভাইক্কোদৎসেভ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলেন, তারপর দাঁড়িয়ে টুপিটা হাতে নিয়ে বললেন ঃ

''তুমি একটা শুয়োর, একটা পাজি, একটা বদমাস! হ্যাঁ, একটা শুয়োর! তুমি নীচ আব...আর বোকাবাম! আর কোনদিন তোমার সঙ্গে কথা বলব না!''

''শুনে খুব খুশি হলাম!'' মিতিযাও গর্জে উঠল। সেও উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা নিল। ''আমি আপনাকে জানাতে চাই, এ মুহূর্তে এখানে আপনাব উপস্থিতি আমার প্রতি এমন একটা অন্যায় করল যার জন্য জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত আমি আপনাকে ক্ষমা করব না!''

পাভেল আইভানিচ গ্রীষ্মাবাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। রাগে আত্মহারা হয়ে দ্রুত পদক্ষেপে পল্লী-ভবনে ফিবে এলেন। সান্ধ্য ভোজনের জন্য টেবিলটা সাজানো দেখেও তার রাগ পড়ল না।

নিদারুণ ক্ষোভে তিনি নিজের মনেই বললেন, ''এ রকম সুযোগ জীবনে একবারই আসে। আর ও কিনা ওখানে গিয়েই সব পণ্ড করে দিল। এখন সে তো অপমানিত হল...মারাত্মক আঘাত পেল!''

নৈশ ভোজে বসে পাভেল আইভানিচ ও মিতিয়া বিষণ্ণ নীরবতায় যার

যার থালার দিকে তাকিয়ে রইল। একে অন্যকে ঘৃণা করছে সমস্ত অন্তর দিয়ে।

পাভেল আইভানিচ স্ত্রীর প্রতি খেঁকিয়ে উঠলেন, ''তুমি এমন হাসছ কেন? বিনা কারণে হাসে তো কেবল বোকারা!''

তার স্ত্রী স্বামীর ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিতে ফেটে পড়লেন।

শুধালেন, ''আজ সকালে যে চিঠিটা পেলে সেটা কার?''

''আমি? আমি তো কোন চিঠি পাই নি...'' পাভেল আইভানিচ অপ্রস্তুত হয়ে জবাব দিলেন। ''এটা তোমার কল্পনা...''

''বলে যাও, আবার বল! স্বীকার কর যে একটা চিঠি তুমি পেয়েছ! আমি জানি, কারণ চিঠিটা আমিই পাঠিয়েছিলাম। সত্যি বলছি! হা-হা!''

পাভেল আইভানিচ মুখ লাল করে পাতের উপর ঝুঁকে পড়ল।

কী যে বোকা-বোকা তামাসা কর...'' পাভেল রাগে গর্ গর্ করতে লাগলেন।

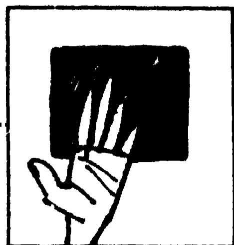
''কিন্তু এ ছাড়া আর কি আমি করতে পারতাম! নিজেই বুঝে দেখ...আজ সবগুলো মেঝে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে, অথচ তোমাদের দুজনকেই বাড়ি থেকে বের করে দিতাম কেমন করে? এটাই ছিল একমাত্র পথ। —রাগ করো না, তুমিও কম বোকা নও—যাতে গ্রীষ্মাবাসে গিয়ে তুমি নিঃসঙ্গ, একাকি বোধ না করে সেই জন্যই তো মিতিয়াকেও সেই একই চিঠি পাঠিয়েছিলাম। মিতিয়া, তুমি গ্রীষ্মাবাসে ছিলে তো?''

মিতিয়া মুখ টিপে হাসতে লাগল; তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে তেমন ঘৃণার চোখে তাকানো ছেড়ে দিল।

১৮৮৬

তিনটি ভয়ের ঘটনা

Terrors



এই পৃথিবীতে যত বছর বেঁচে আছি তার মধ্যে মাত্র তিনবার আমি খুব ভয় পেয়েছি।

আমার প্রথম সত্যিকারের ভয়—যা মনে হলে আজও মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে আর সারা শরীরে একটা কাঁপুনি বয়ে যায়—তার কারণ ছিল একটা তুচ্ছ অথচ বিচিত্র ঘটনা। জুলাই মাসের এক সন্ধ্যায় হাতে বিশেষ কোন কাজ না থাকায় ডাকঘরে গিয়েছিলাম খবরের কাগজ আনতে। সন্ধ্যাটা ছিল শান্ত, আতপ্ত, প্রায়শ্বাসবোধকারী; জুলাই মাসের সেই সব একঘেয়ে সন্ধ্যাগুলির মত যারা একবার আসতে শুরু করলে একের পর এক নিয়মিত নিরবচ্ছিন্নভাবে আসতে থাকে দুই সপ্তাহ, অনেক সময় তারও বেশী দিন ধরে, যতদিন না হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বজ্রপাতসহ ঝড় এসে তাদের থামিয়ে দেয়; সেই ঝড় নিয়ে আসে প্রচুর বৃষ্টি যাতে পরবর্তী বেশ কিছু দিন সব কিছু তাজা হয়ে ওঠে।

সূর্য আগেই অস্ত গেছে; পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে একটা নিবেট ধূসর ছায়া। স্থির, নিশ্চল বাতাসে ঝুলে আছে ঘাস ও ফুলের মধু-গন্ধে ভরা বাষ্প।

ডাক-ঘরে যাবার জন্য আমি একটা সাধারণ মালটানা গাড়ি নিয়েছিলাম। আমার পিছনে মালির ছেলে পাশা একটা খইয়ের বস্তায় মাথা রেখে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছিল। বছর আটেকের সেই ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়েছিলাম পাছে পথে কোথাও ঘোড়াটাকে দেখাশোনা করার দরকার হয়। আমাদের চলার পথটা লম্বা, ঘন গমের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে একটা ধূলোভরা সংকীর্ণ রাস্তা বরাবর সোজা চলে গেছে একটা তীরের মত। সূর্যের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। দিগন্তের উপরে আকাশের হাল্কা রংকে ঢেকে ফেলেছে একটা পাতলা আকারহীন মেঘ—সেটা কখনও দেখাচ্ছে একটা নৌকার মত, আবার কখনও কম্বলে ঢাকা একটা মানুষের মত।

দুই ভার্স্ট পথ যাবার পরেই পপলার গাছের লম্বা, সরু রেখাগুলি আকাশের পাণ্ডুর পটভূমির ভিতর থেকে ক্রমেই বড় হয়ে উঠতে লাগল; তারও পিছনে নদীটা ঝিল্‌মিল্ করে উঠল, আর হঠাৎই যেন জাদুমন্ত্রে আমার সামনে একটা আশ্চর্য ছবি ফুটে উঠল। আমার ঘোড়াটাকে থামিয়ে দিতে হল, কারণ আমাদের তীরের মত সোজা রাস্তাটা শেষ হয়ে ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা একটা খাড়া উৎরাই নেমে গেছে। আমরা ছিলাম একটা পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আর আমাদের নীচে ছিল গোধূলির অন্ধকার, অদ্ভুত সব মূর্তি

ও শূন্যতা দিয়ে ভর্তি একটা প্রকাণ্ড গহ্বর। সেই বিরাট গহ্বরের পাদদেশে ছিল পপলার শ্রেণীর দ্বারা সুরক্ষিত এবং নদীর ঝিলমিলকরা জলের স্নেহধারায় লালিত একটা ঠাসাঠাসি গ্রাম। গ্রামটা এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে! তার ঘর-বাড়ি, গির্জা ও ঘণ্টা-ঘর, তার গাছপালা অস্পষ্ট ধূসরতায় দাঁড়িয়ে আছে, আর নদীর মসৃণ বুকে পড়েছে তাদের কালো ছায়া।

পাশা যাতে গাড়ি থেকে পড়ে না যায় সেজন্য তাকে ডেকে জাগিয়ে দিলাম। তারপর খুব সাবধানে উৎবাই বেয়ে নামতে লাগলাম।

আলস্যভবে মাথাটা তুলে পাশা শুধাল, ''এটাই কি লুকোভো?''

''হ্যাঁ. আমবা এসে গেছি। লাগামটা ধর।''

ঘোড়াটাকে ধরে উৎবাই বেয়ে নামতে নামতে গ্রামটার দিকে তাকালাম। প্রথম থেকেই একটা আশ্চর্য ব্যাপাব আমার চোখে পড়েছিল ঃ ঘণ্টা-ঘরের মাথায় কুঠরি ও ছাদের মাঝখানের ছোট জানালায় একটা ছোট আলো মিট মিট করে জ্বলছে। কম্পিতশিখা বিগ্রহ-প্রদীপের মত এই আলোটাও এখন এক মুহূর্তের জন্য নিভে যাচ্ছে, আবার উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠছে। ওটা কিসের আলো? ওব উৎসটা আমি বুঝতে পারছিলাম না। ওটা জানালার পিছনের কোন আলো হতে পারে না, কারণ ঘণ্টা-ঘরের মাথায় কোন বিগ্রহ বা বিগ্রহপ্রদীপই ছিল না; আমি যতদূর জানতাম সেখানে ছিল কেবল কড়িকাঠ, ধূলোবালি আব মাকড়শার জাল। তাছাড়া, সে জায়গায় যাওয়াও খুব শক্ত, কারণ ঘণ্টা-কুঠরি থেকে উপরে ওঠার পথটা ইঁট গেঁথে বন্ধ করা ছিল।

খুব সম্ভব এই আলোটা বাইরের কোন আলোর প্রতিফলন, কিন্তু চোখ দুটোকে যতটা সম্ভব বিস্ফারিত করেও ঘণ্টা-ঘরের এই আলোটি ছাড়া অন্য কোন আলো আমার সম্মুখে প্রসারিত দূর বিস্তাব পর্যন্ত কোথাও দেখতে পেলাম না। আকাশে চাঁদ ছিল না। শেষ সন্ধ্যার আকাশের অস্পষ্ট আলোর আভাও ঘণ্টাঘরে প্রতিফলিত হতে পারে না, কারণ জানালাটা পূবমুখী, পশ্চিমমুখী নয়। ঘোড়াটাকে নিয়ে উৎরাই বেয়ে নামতে নামতে এই সব এবং আরও নানা চিন্তা আমার মাথায় ঘুরতে লাগল। নীচে নেমে পুনরায় গাড়িতে উঠে আর একবার আলোটার দিকে তাকালাম। সেটা আগের মতই দপ্ দপ্ করছে।

সম্পূর্ণ বিব্রত হয়ে আমি ভাবলাম, ''আশ্চর্য, খুবই আশ্চর্য।''

একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি ক্রমেই আমাকে পেয়ে বসল। প্রথমে ভাবলাম এ রকম একটা সহজ ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে না পারার জন্যই এই বিরক্তিটা বোধ করছি, কিন্তু পরে যখন ভয়ে আলোটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম এবং পাশাকে জড়িয়ে ধরলাম, তখনই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এটা একটা ত্রাসেব অনুভূতি...একাকিত্ব, বিমগ্নতা ও ভয়ের একটা অনুভূতি আমাকে চেপে ধরল; মনে হল, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে এই প্রকাণ্ড গহ্বরের মধ্যে, যেখানে কেবলই অন্ধকার,

যেখানে আমি এখন ঘণ্টা-ঘরটার মুখোমুখী হয়েছি আর সেটাও একটা রক্ত-চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

ত্রাসে দুই চোখ বুজে আমি ডেকে উঠলাম, ''পাশা!''

''অ্যা?''

''পাশা, ঘণ্টা-ঘরে ওটা কি জ্বলছে?''

আমার কাঁধের উপর দিয়ে ঘণ্টা-ঘরের দিকে তাকিয়ে পাশা হাই তুলল।

''ভগবান জানে!''

ছেলেটার সঙ্গে এই স্বল্প কয়েকটি কথায় আমার মন কিছুটা শান্ত হল, কিন্তু সেটা বেশীক্ষণ থাকল না। আমার অস্বস্তি লক্ষ্য করে পাশা বড় বড় চোখ মেলে প্রথমে আলোটার দিকে তাকাল, তারপর আমার দিকে, তারপর আবার আলোটার দিকে।

''আমার ভয় করছে!'' সে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল।

তখন ভয়ে সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে আমি এক হাতে ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরলাম এবং ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসালাম।

নিজেকে বললাম, ''এ তো বোকামি! আলোটা ভয় দেখাচ্ছে কারণ তুমি ওটাকে বুঝতে পারছ না...যা কিছু দুর্বোধ্য তাই রহস্যময়, সুতরাং ত্রাসের কারণ।''

কথাটা নিজেকে বোঝাতে লাগলাম আর সারাক্ষণ গাড়িটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চললাম। ডাক-ঘরে পৌঁছে ইচ্ছা করেই পুরো একটা ঘণ্টা ডাক-বাবুর সঙ্গে গল্প-গুজব করলাম, দু'-তিনটে খবরের কাগজ আগাগোড়া পড়লাম, তবু আমার অস্বস্তি কাটল না। যখন বাড়ির পথে যাত্রা করলাম, তখন আলোটা চলে গেছে; কিন্তু বাড়ি-ঘর, পপলার গাছের সারি, এমন কি যে পাহাড়টায় আমরা উঠছি—সব কিছুই জীবন্ত মনে হতে লাগল। সেই আলোর উৎসটা আজও আমার কাছে রহস্য হয়েই আছে।

আমার দ্বিতীয় ত্রাসটা ঘটেছিল প্রথমটার মতই একটা তুচ্ছ কারণে।...একটা জমায়েত থেকে ফিরছিলাম ঃ তখন সকাল একটা, সময়টা এমন যখন বিশ্বপ্রকৃতি মধুরতম ও গভীরতম ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু সেদিন প্রকৃতি ঘুমিয়ে ছিল না, আর রাতটাকেও শান্ত বলা চলে না। রাতজাগা পাখি, ভারুই পাখি, নাইটিঙ্গেল ও কাদাখোঁচা পাখিরা পরস্পরকে ডাকাডাকি করছে, গঙ্গা-ফড়িং ও ঝিঁঝিঁ পোকারা একটানা ডেকে চলেছে। একটা হাল্কা কুয়াসা ঘাসের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে; আকাশে মেঘের দল চাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। প্রকৃতি ঘুমিয়ে পড়ে নি, বুঝি বা জীবনের এই মধুর মুহূর্তক'টিকে ঘুমিয়ে কাটাতে তারও ভয় করছে;

রেলপথের একটা বাঁধের কিনারা বরাবর একটা সরু পথ ধরে আমি হাঁটছিলাম। রেললাইনের উপর শিশির জমতে থাকায় চাঁদের আলো পড়ে পিছলে যাচ্ছিল। মেঘের বড় বড় ছায়া বারে বারেই বাঁধের উপর ছায়া

ফেলছিল। সম্মুখে দূরে একটা ঘোলাটে সবুজ বাতি শান্ত শিখায় জ্বলছিল।

সেদিকে হাঁটিতে হাঁটিতে ভাবলাম, ' তার মানে সবই ঠিক আছে।''

আমার মেজাজে তখন প্রশান্তি ও সন্তুষ্টির আমেজ ঃ একটা জমায়েত থেকে ফিরছি, তাড়াহুড়ার কোন কারণ ছিল না, ক্লান্তিও ছিল না, প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসে, রাতের একটানা গুঞ্জনের মধ্যে অস্পষ্টভাবে বেজে-ওঠা আমার প্রতিটি পদক্ষেপে অনুভব করছি আমার স্বাস্থ্য ও যৌবনকে। সেই সময়টাতে কি ভেবেছিলাম মনে নেই, কিন্তু এটা বেশ মনে আছে যে আমি সুখে ছিলাম, খুবই সুখে।

এক ভার্স্ট পথও যাই নি এমন সময় পিছনে শুনতে পেলাম বড় স্রোতস্বিনীর কলতানের মত একটা গম্ভীর ধ্বনি। প্রতি সেকেণ্ডে সেটা উচ্চতর হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি ক্রমেই সেটা আরও কাছে এগিয়ে আসছে। চারদিক তাকালাম। একশ' পা দূরে সেই অন্ধকার ঝোপটা দেখা যাচ্ছে যার ভিতর থেকে আমি এইমাত্র বেরিয়ে এসেছি, বাঁধটা সেখানে ডাইনে বেঁকে গাছগুলির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একসময় একটা প্রকাণ্ড কালো মূর্তি বাঁকের উপর দেখা দিল, সশব্দে আমার দিকে দ্রুত ছুটে এল, একটা দ্রুতগতি পাখির মত আমার পাশ দিয়ে রেললাইন বরাবর উড়ে গেল। আধ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যেই সেটা দূরে একটা বিন্দুর মত হয়ে উধাও হয়ে গেল। গম্ভীর ধ্বনিটাও রাতের সাধারণ গুঞ্জনের মধ্যে হারিয়ে গেল।

সেটা ছিল একটা সাধারণ মালগাড়ি। এমনিতে সেটা অসাধারণ কিছু নয়, কিন্তু সেটা ইঞ্জিনবিহীন কেবলমাত্র গাড়ি হওয়ায়, তাও রাতের বেলায়, আমি কেমন যেন বিচলিত হয়ে পড়লাম। সেটা কোথা থেকে এল, এমন ভয়ংকর গতিতে কোন শক্তি সেটাকে রেল লাইন ধরে চালিয়ে নিয়ে গেল? কোথা থেকে এল, আর গেলই বা কোথায়?

আমি যদি কুসংস্কারে বিশ্বাসী হতাম তাহলে ধরেই নিতাম যে দৈত্যদানা অশরীরীরা উড়ে গেল ডাইনীদের উৎসবে যোগ দিতে, আর এ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিজের পথে পা বাড়াতাম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ছায়ামূর্তিটা আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যার অতীত। নিজের চোখকেও বিশ্বাস হচ্ছিল না, নানা উদ্ভট জল্পনার মধ্যে হারিয়ে গেলাম মাকড়শার জালে আবদ্ধ মাছির মত।

হঠাৎ যেন অনুভব করলাম আমি একা, এই দূরবিস্তার জায়গার মাঝখানে আমি একেবারে একা, মনে হল, এই অসামাজিক রাতটা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, আমার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করছে; চারদিকের যত শব্দ, পাখিদের ডাক আর গাছপালার কানাকানি, সব কিছুকেই বিপদের সংকেতরত বলে মনে হচ্ছে, আমার কল্পনাকে আতংকিত করে তুলতেই যেন তারা এখানে হাজির হয়েছে। পাগলের মত সেখান থেকে ছুটলাম, আর সেটা না বুঝেই আরও জোরে ছুটতে লাগলাম। সঙ্গে

সঙ্গে এতক্ষণ যেদিকে মনোযোগ দেই নি তাই শুনতে পেলাম—টেলিগ্রাফের তারগুলোর শোকসূচক প্যান-প্যান শব্দ।

লজ্জা পেয়ে নিজের মনেই ভাবলাম, ''উচ্ছন্নে যাক! এ তো ভীরুতা, মূর্খামি...''

কিন্তু ভীরুতা সাধারণ বুদ্ধি অপেক্ষা শক্তিশালী। সবুজ আলোটা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে আমি গতি কমিয়ে দিলাম; দেখতে পেলাম একটা অন্ধকার রেলের কেবিন আর বাঁধের উপর একটা মানুষের রেখাচিত্র, সম্ভবত একজন পাহারাদার।

হাঁপাতে হাঁপাতে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ''তুমি কি এটা দেখেছ?''

''কি দেখেছি? আপনি কি বলতে চান?''

''এই মাত্র যে মালগাড়িটা চলে গেল!''

''দেখেছি,'' লোকটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল। ''নিশ্চয় একটা মালবাহী ট্রেন থেকে খুলে বেরিয়ে এসেছিল। লাইন ধরে এগিয়ে গেলে একটা উঁচু জমি আছে, সেখানে ইঞ্জিনটাকে পাহাড় বেয়ে উঠতে হয়। নির্ঘাৎ শেষের মালগাড়ির শিকলটা ছিড়ে যাওয়াতে সেটা আলগা হয়ে পিছন দিকে ছুটে গেছে।...একবার চেষ্টা করে দেখুন না ধরতে পারেন কি না!

আশ্চর্য ঘটনাটার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল, তার রহস্যও চলে গেল! আমারও ত্রাস কেটে গেল। আবার পথ চলতে শুরু করলাম।

আমার তৃতীয় সত্যিকারের ত্রাসের অভিজ্ঞতা হয়েছিল কোন এক প্রথম বসন্তের দিনে যখন আমি কাদাখোঁচা পাখি শিকার করে ফিরছিলাম। গোধূলি আসন্নপ্রায়। সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়ায় বনের পথে জায়গায় জায়গায় জল জমেছে, পায়ের নীচের মাটিও নরম। সূর্যাস্তের লাল আভা সমস্ত অরণ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, বার্চ গাছের গায়ে ও তার সবুজ ডালপালায় রং ধরেছে। ক্লান্ত দেহে কোনরকমে শরীরটাকে টেনে নিয়ে হাঁটছিলাম।

বাড়ি থেকে পাঁচ কি ছয় ভার্স্ট দূরে, তখনও বনের পথে চলেছি, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে একটা বড় কালো নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরের দেখা পেলাম। কুকুরটা সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে হাঁটতে লাগল।

ভাবলাম, ''চমৎকার কুকুরটা। কার হতে পারে?''

চারদিকে তাকালাম। আমার উপর থেকে চোখ না সরিয়ে কুকুরটা প্রায় দশ পা দূরে দাঁড়িয়েছিল। এক মিনিটের জন্য পরস্পরের দিকে তাকালাম, তারপরেই সম্ভবত আমার মনোযোগে উল্লসিত হয়ে কুকুরটা লেজ নাড়তে নাড়তে ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে এল।

আমি আমার পথেই হাঁটতে লাগলাম। কুকুরটি পিছু নিল...

নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, ''এটা কার কুকুর? কোথা থেকে এল?''

চারদিকে ত্রিশ চল্লিশ ভার্স্ট পর্যন্ত সব জমির মালিক ও তাদের কুকুরগুলোকে আমি চিনতাম। তাদেরও কারও এ ধরনের নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড

কুকুর ছিল না। যে রাস্তায় কেউ যাতায়াত করে না, কেবলমাত্র জ্বালানি কাঠ বয়ে নিতেই ব্যবহার করা হয়, সে রাস্তায় বনের মধ্যে এটা এল কেমন করে? কোন পথিক হঠাৎই এ পথ দিয়ে চলার সময় ওটাকে ফেলে গেছে তাও ত হতে পারে না, কারণ এই পথে অন্য কোথাও যাওয়াই যায় না।

বিশ্রাম নেবার জন্য একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসে আমার সঙ্গীটির দিকে ভাল করে তাকালাম। সেও বসে পড়ল। মাথাটা তুলে একদৃষ্টিতে আমাকে দেখতে লাগল। অরণ্যের নৈঃশব্দ, তার ছায়া ও শব্দের প্রভাবে কিনা বলতে পারি না, অথবা আমার ক্লান্তির ফলেও হতে পারে. একটা সাধারণ কুকুরেব দুটি চোখের একাগ্র চাউনি দেখে হঠাৎ আমি অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলাম। ফাউস্ট ও তার বুলডগের কথা মনে পড়ে গেল; আরও মনে পড়ল দুর্বল স্নায়ুর মানুষরা অনেক সময় ক্লান্তিবশত ভ্রান্ত দর্শনের শিকার হয়ে পড়ে। যাই হোক, আমি লাফ দিয়ে উঠে দ্রুতপায়ে হাঁটিতে শুরু করলাম। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডও আমার পিছন পিছন হাঁটিতে লাগল...

চীৎকার করে বললাম, ''চলে যা!''

আমার গলার স্বর বোধ হয় কুকুরটার ভাল লাগল, কারণ খুশিতে একটা লাফ দিয়ে সে এক দৌড়ে এগিয়ে গেল।

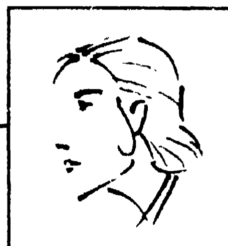
''চলে যা!'' আমি দ্বিতীয়বার চীৎকার করে বললাম।

কুকুরটা চারদিকে তাকিয়ে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চোখ রেখে খুশিতে লেজ নাড়তে লাগল। আমার শাসানি শুনে ও মজা পেয়েছে। ওর পিঠটা চাপড়ে দেওয়া আমার উচিত ছিল, কিন্তু ফাউস্টের বুলডগ আমার মন থেকে যাবাব নয়, ফলে আমার ত্রাসের অনুভূতি তীব্রতর হল।...অন্ধকার নেমে আসছে, আর সেটাই হল আমার শেষ খড়কুটো ঃ কুকুরটা যতবার ছুটে এসে আমার গায়ে লেজ নাড়ে, ততবারই আমি ভয়ে চোখ বুজে ফেলি। ঘণ্টা-ঘরের আলো আর রেলপথের মালগাড়ির সেই একই গল্প ঃ আমি সেটা সহ্য করতে পারলাম না, দৌড়তে শুরু করলাম...

বাড়ি ফিরে দেখলাম একজন অতিথি এসেছে, আমার এক পুরনো বন্ধু। পরস্পরের সাদর সম্ভাষণের পরে সে বলল, আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার পথে বনের মধ্যে সে পথ হারিয়ে ফেলে, আর তখনই সঙ্গী কুকুরটার সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, —বেশ ভাল দামী জাতের কুকুর।

১৮৮৬

ওষুধ-বিক্রেতার বৌ



The Chemist's Wife

মাত্র দুটি কি তিনটি আঁকাবাঁকা রাস্তার ছোট বি. শহরটি তখন গভীর ঘুমে মগ্ন ; বাতাস নিশ্চল ; সব কিছুই চুপচাপ। কেবল দূরে কোথাও, হয় তো শহরের বাইরে, একটা কুকুরের কর্কশ দুর্বল ডাক শোনা যাচ্ছে। অচিরেই ভোর হবে।

সকলেই অনেকক্ষণ যাবৎ ঘুমচ্ছে, কেবল স্থানীয় ওষুধ বিক্রেতার যুবতী বৌটি জেগে আছে। তিনবার সে বিছানায় শুয়েছে, কিন্তু কিছুতেই তার চোখে ঘুম আসে নি ; কেন আসে নি তা সে নিজেও জানে না। শুধু মাত্র রাত-পোশাকটা পরে সে এখন খোলা জানালার ধারে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। নিজেকে ব্যর্থ, একঘেয়ে ও আশাহত মনে হচ্ছে...এতই আশাহত যে তার কান্না পাচ্ছিল ; কিন্তু কেন তা সে জানে না। বুকের মধ্যে যেন একটা দলা পাকিয়ে আছে, সেটা মাঝে মাঝেই গলা পর্যন্ত উঠে আসতে চাইছে...তার পিছনেই, মাত্র কয়েক ফুট দূরে তার স্বামী দেয়ালের গায়ে কুঁকড়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। একটা পিসু পোকা তার নাকের শিরদাঁড়ার উপর বসে লোভীর মত রক্ত চুষে খাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে তার কোন খেয়ালই নেই ; এমনকি সে হাসছে, স্বপ্ন দেখছে যে শহরের সব মানুষই কাশছে আর মানুষের একটা সীমাহীন স্রোত তার দোকানেই আসছে কাশির ওষুধ কিনতে। ইন্‌জেকশন দিয়ে বা কামান দেগে, এমন কি আদর করে হাত বুলিয়েও এখন তুমি তাকে জাগাতে পারবে না।

ওষুধ-বিক্রেতার দোকানটা ছিল শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে। তার বৌ খোলা মাঠের উপর দিয়ে বহু দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিল। সে দেখছিল, আকাশের পূর্ব প্রান্তটা ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে তারপরেই রাঙা হয়ে উঠল, যেন দিগন্তের কোলে কেউ একটা মস্ত বড় আগুন জ্বেলে দিয়েছে। হঠাৎ একটা মস্ত বড় চওড়া-মুখ চাঁদ দূরে কিছু ঝোপঝাড়ের পিছন থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এল। চাঁদটা উজ্জ্বল লাল ঃ বস্তুত যখনই চাঁদটা গাছপালার পিছন থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসে, যে কোন কারণেই হোক তখনই তাকে ভয়ঙ্কর রকমের বিব্রত দেখায়।

আর যেই চাঁদটা দেখা দিল অমনি পায়ের শব্দ, অশ্বারোহীর পায়ের লোহার কাঁটার ঠুং-ঠাং শব্দ ও অন্য নানাবিধ শব্দে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল।

বৌটি নিজের মনেই ভাবল, ''নিশ্চয় পুলিশের বড় কর্তার কাছ থেকে কিছু অফিসার শিবিরে ফিরে যাচ্ছে।''

অচিরেই অফিসারের সাদা পোশাক-পরা দুটি মনুষ্য-মূর্তিকে সে দেখতে পেল ঃ তাদের একজন লম্বা ও হৃষ্টপুষ্ট, অপরজন অপেক্ষাকৃত বেঁটে ও কৃশকায়। তারা বেড়ার ধার ঘেঁষে অলসভাবে হাঁটছিল আর বেশ জোরে জোরে কথা বলছিল। ওষুধের দোকানের সামনাসামনি এসে তারা আরও ধীরে হাঁটতে লাগল আর জানালার দিকে তাকাতে লাগল।

দু'জনের মধ্যে যে একহারা সে বলল,''একটা ওষুধের গন্ধ পাচ্ছি। আরে এটা তো ওষুধেরই দোকান! হ্যাঁ, মনে পড়েছে...কিছুটা ক্যাস্টর ওয়েল কিনতে গত সপ্তাহে আমি এখানে এসেছিলাম। এখানকার ওষুধ-বিক্রেতার মুখটা খিট্‌খিটে আর চোয়ালটা গাধার মত। দেখ হে মশায়, ওখানে তোমার জন্য একটা চোয়াল রয়েছে! এই ধরনের চোয়াল দিয়েই তো স্যামসন ফিলিস্তিনিদের মেরে তাড়িয়েছিল।''

''হুম, ঠিক...'' হৃষ্টপুষ্ট লোকটির গম্ভীর গলা শোনা গেল। ''ওষুধ-বিক্রেতাটি ঘুমিয়ে আছে। আর তার বৌটিও! অব্‌তিওসভ, এই ওষুধ-বিক্রেতার বৌটি কিন্তু বেশ ভাল জিনিস।''

''হ্যাঁ, তাকে আমি দেখেছি। আমার বেশ মনে ধরেছিল...তুমিই বল ডাক্তার, তুমি কি সত্যি মনে কর যে বৌটিও এমন একটা গাধার মত চোয়ালকে ভালবাসতে পারে? সত্যি?''

ওষুধ-বিক্রেতার জন্য দুঃখের স্বরে ডাক্তার উত্তর দিল, ''না, তাকে সম্ভবত সে ভালবাসে না। ছোট স্ত্রীলোকটি নির্ঘাত জানালাটার পিছনেই ঘুমিয়ে আছে। তুমি কি মনে কর অব্‌তিওসভ? গরমে ক্লান্ত হয়ে সে শুয়ে পড়েছে...ছোট্ট সুন্দর মুখখানি অর্ধেক খোলা,...একটা পা বিছানার পাশে ঝুলে আছে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, এই সাক্ষিগোপাল ওষুধ-বিক্রেতাটি জানেই না কি রকম একটা ভাল মাল সে পেয়েছে... হয়তো একটা মেয়েমানুষ পাওয়া আর এক বোতল কার্বলিক এসিড পাওয়া—এই লোকটার কাছে দুইই সমান!''

দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে অর্ব্‌তিওসভ জবাব দিল, ''আমি আর কি বলব ডাক্তার। চল, ভিতরে ঢুকে কিছু জিনিস কিনি! হয়তো ওষুধ-বিক্রেতার বৌয়ের দর্শনও মিলে যাবে।''

''কি ভাবছ তুমি, এত রাতে?''

''আরে তাতে কি হয়েছে? ব্যবসার জন্য রাতেও দোকান খোলা রাখতে তারা বাধ্য। প্রিয় বন্ধু, চল ভিতরে ঢুকে পড়ি!''

''তা বেশ।''

পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থেকেই ওষুধ-বিক্রেতার বৌ ঘণ্টার কর্কশ আওয়াজ শুনতে পেল। স্বামীর দিকে ফিরে তাকাল; সে তখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে; তারপর পোশাকটা গায়ে গলিয়ে, খালি পায়ে একজোড়া চটি পরে বৌটি দৌড়ে দোকানে ঢুকে গেল।

বাতি জ্বেলে দরজাটা খুলতে এগিয়ে যেতে যেতেই কাঁচের ওপারে দু'টি

ছায়া দেখতে পেল ; এখন আর তার একঘেয়ে লাগছে না, আশাহতও লাগছে না, কাঁদবার ইচ্ছাও নেই, কিন্তু তার বুকটা টিপ্ টিপ্ করছে। হৃষ্টপুষ্ট ডাক্তার ও একহারা অব্‌তিওসভ দোকানে ঢুকল ; এবার সে তাদের দিকে ভাল করে তাকাল। ভুঁড়িওয়ালা ডাক্তারের গায়ের রং ঘোর, মুখে দাড়ি, দেখতে বিশ্রী। একটু নড়া-চড়া করলেই তার জামা সেলাইয়ের কাছে কড়্-কড়্ করে উঠছে, মুখে ঘাম দেখা দিচ্ছে। তার সঙ্গী অল্পবয়সী অফিসারটির গায়ের রং গোলাপি, দাড়ি-গোঁফ কামানো, মুখটা মেয়েলি, উইলো গাছের কচি ডালের মত।

পোশাকটা বুকের কাছে চেপে ধরে বৌটি শুধাল, ''আপনাদের জন্য কি করতে পারি ?''

''আচ্ছা, আমরা কি... মানে...পনেরো কোপেক দামের পুদিনার চাটনি পেতে পাদি ?''

বৌটি ধীরে ধীরে তাকের উপর থেকে একটা বয়াম নামাল, তারপর চাটনি মাপতে বসল। দুই খদ্দের তার পিছন দিকটা দেখতে লাগল ; ডাক্তারটি চোখ দুটিকে কুঁচকাল পেট-মোটা বিড়ালের মত, কিন্তু অফিসারের মুখটা গুরুগম্ভীর।

ডাক্তার মন্তব্য করল, ''এই প্রথম আমি একটি মহিলাকে ওষুধের দোকানে কাজ করতে দেখলাম।''

অব্‌তিওসভের গোলাপি মুখের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বৌটি জবাব দিল, ''এর মধ্যে তো অসাধারণ কিছু নেই। আমার স্বামীর কোন সহকারী নেই, তাই সব সময় আমি তাকে সাহায্য করি।''

''ওঃ, ঠিক...তোমাদের দোকানটা বেশ সুন্দব। কত রকম এই সব... বয়াম ! আর এই সব বিষের মধ্যে থাকতে তোমার ভয় করে না !''

ওষুধ-বিক্রেতার বৌ প্যাকেটটা সিল্ করে ডাক্তারের হাতে দিল। অব্‌তিওসভ তাকে পনেরো কোপেক দিল। আধ মিনিট নীরবে কেটে গেল ; দু'জনই পরস্পরের দিকে তাকাল, দরজার দিকে এক পা এগিয়ে গেল, তারপর আবার পরস্পরের দিকে তাকাল।

ডাক্তার বলল, ''আমাকে দশ কোপেকের সোডা দাও।''

ওষুধ-বিক্রেতার বৌটি এবারও ধীরে-সুস্থে তাকের দিকে হাত বাড়াল।

অব্‌তিওসভ তো-তো করে বলল, ''তোমার দোকানে কি... মানে...এমন কিছু যা অর্থবহ, একরকমের বলকারক জলবিশেষ...হয়তো কোন খনিজ জল পাওয়া যাবে ?''

''যাবে,'' ওষুধ-বিক্রেতার বৌ জবাব দিল।

''চমৎকার ! তুমি তো নারী নও, তুমি একটি স্বর্গের পরী। আমাদের তিন-চারটে বোতল দাও !''

তাড়াতাড়ি সোডার প্যাকেটটা সিল করে বৌটি দরজার পিছনের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

''একটি মিঠে ফল!'' ডাক্তার চোখ টিপে বলল। ''এ রকম একটা আনারস খুঁজে পেতে তোমাকে বেগ পেতে হবে অব্‌তিওসভ, এমন কি মাদেইরা দ্বীপে গেলেও। আচ্ছা, তুমি কি মনে কর? কিন্তু...ওই নাক ডাকার শব্দটা শুনতে পাচ্ছ? ওই তো বিক্রেতা স্বয়ং ওখানে—সে আরামে ঘুম দিচ্ছে, আর বৌটি দোকান চালাচ্ছে।''

ওষুধ-বিক্রেতার বৌ এক মিনিট পরে ফিরে এসে পাঁচটা বোতল টেবিলের উপর রাখল। সে এইমাত্র গর্ভ-গৃহ থেকে উঠে এসেছে, তাই মুখটা লাল ও উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

বোতলগুলির মুখ খোলার পরে কর্কস্ক্রুটা পড়ে যেতেই অব্‌তিওসভ বলে উঠল, ''শ-স্...আস্তে। এত শব্দ করো না, তোমার স্বামীর ঘুম ভেঙে যাবে।''

''ঘুম ভাঙলো তো কি হল?''

''সে বেচারি আরামে ঘুমচ্ছে....তোমাকেই স্বপ্নের মধ্যে দেখছে...তোমার স্বাস্থ্য!''

খনিজ জলে চুমুক দিতে দিতে ডাক্তার তার সঙ্গে যোগ করল, ''তাছাড়া স্বামীরা এতই বিরক্তিকর যে তারা যত ঘুমিয়ে থাকে ততই মঙ্গল। মম্, একটা ভাল লাল মদ হলে এই জলের সঙ্গে দারুণ জমত।''

ওষুধ-বিক্রেতার বৌ হেসে শুধাল, ''এরপর আর কি মনে করবেন?''

''তাহলে কি ভালই হত! খুবই দুঃখের কথা যে ওষুধ-বিক্রেতারা মদ বিক্রি করে না। কিন্তু...ওষুধ হিসাবে তো তোমাদের মদ বেচতেই হবে। তোমরা কি 'ভাইনাম গেলিসাম রুব্রাম' রাখ?''

''রাখি।''

''তাহলে তো ঠিক আছে! সেটাই নিয়ে এস! এসব চুলোয় যাক, সেই মাল নিয়ে এস!''

''আপনার কতটা চাই?''

কোয়াণ্টাম সাটিস যতটা দরকার হবে। প্রথমে প্রতিটি গ্লাসের জলে এক আউন্স করে ঢাল, তারপর দেখা যাবে... আচ্ছা অব্‌তিওসভ? প্রথমে জলের সাথেই হোক, তারপর হবে নির্জলা।''

ডাক্তার ও অব্‌তিওসভ টেবিলে বসে টুপি খুলে লাল মদে চুমুক দিতে শুরু করল।

''যদিও মদটা ভয়ংকর ভাল, তবু আমি বলছি ভাইনাম নারকীয়তম! অবশ্য, মানে... এর উপস্থিতির জন্য এটাতে অমৃতের স্বাদ। তুমি মনোহারিণী ম্যাডাম! মনে মনে আমি তোমার হাতে চুমো খাচ্ছি।''

অব্‌তিওসভ বলল, ''আর বাস্তবে এই হাতে চুমো খেতে আমি অনেক কিছুই দিতে রাজী। সত্যি বলছি, সেটা করতে পারলে জীবনটাই দিয়ে দেব।''

লজ্জায় লাল হয়ে কঠিন দৃষ্টিতে তাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে

ওষুধ-বিক্রেতার বৌ বলে উঠল, ''থামুন!''

ঘন ভুরুর নীচ থেকে তার দিকে কুদৃষ্টিতে তাকিয়ে ডাক্তার মৃদু হেসে বলল, ''আঃ, তুমি তো আচ্ছা ছেনাল! তোমার ওই চোখ দুটি যে আমার হৃদয়কে ফালাফালা করে দিচ্ছে! আমার অভিনন্দন ঃ তুমি আমাকে পরাজিত করেছ। আমরা ছোবল খেয়েছি!''

ওষুধ-বিক্রেতার বৌ তাদের আরক্ত মুখের দিকে তাকাল, তাদের বক্‌বকানি শুনল, আর অচিরেই নিজেও উৎসাহী হয়ে উঠল। আঃ, সে কী খুশি। সে তাদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল, একটু ভনিতাও করল, এমন কি অনেক কাকুতি-মিনতির পর দুই আউন্স লাল মদও খেল।

বলল, ''তোমাদের মত অফিসারদের আরও ঘন ঘন শহরে আসা উচিত। অন্যথায় এ জায়গাটা বড়ই নিষ্প্রাণ লাগে। আমি তো একঘেয়েমিতে মরে যাচ্ছি।''

ডাক্তার আতংকে চেঁচিয়ে উঠল, ''আমি এতে অবাক হই নি। এমন একটি আনারস....প্রকৃতির অন্যতম এক আশ্চর্য, আর সে কিনা এই এঁদো ঘরে! গ্রিবোয়েদভ ঠিকই লিখেছেন; 'সাবাতভের নর্দমার জল!' যাই হোক, আমাদের যাবার সময় হল। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুশি হলাম... আনন্দিত! তোমাকে কত দিতে হবে?''

ওষুধ-বিক্রেতার বৌ সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে গুণতে লাগল।

বলল, ''বারো রুব্‌ল্ ও আটচল্লিশ কোপেক!''

অবতিওসভ পকেট থেকে মোটা থলেটা বের করে প্রাপ্য অর্থ মিটিয়ে দিল।

বিদায় নেবার সময় বৌটির হাত চেপে ধরে থেমে থেমে বলল, ''তোমার স্বামী মনের সুখে ঘুমচ্ছে...স্বপ্ন দেখছে...''

''বোকা-বোকা কথা আমি পছন্দ করি না ..''

''বোকা-বোকা কথা? মোটেই তা নয়...এটা মোটেই বোকা-কথা নয়, শেক্সপিয়র বলেছেন ঃ '' যৌবনে যে সত্যি যুবক ছিল সেই ধন্য।''

''আমার হাতটা ছেড়ে দিন!''

শেষ পর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওষুধ-বিক্রেতার বৌকে রাজী করিয়ে দু'জনই তার হাতে চুমো খেয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল; কিন্তু এমন ইতস্তত ভাব দেখিয়ে গেল যেন তারা নিশ্চিত হতে চাইছিল কোন কিছু ভুলে গেছে কি না।

ইতিমধ্যে ওষুধ-বিক্রেতার বৌ ছুটে শোবার ঘরে গিয়ে পুনরায় জানালার পাশে বসল। সে দেখল, ডাক্তার ও অব্‌তিওসভ দোকান থেকে বের হল, অলসভাবে প্রায় বিশ পা হাঁটল, তারপর থামল এবং চুপিচুপি কি যেন বলতে লাগল। ওরা কি নিয়ে কথা বলছে? বৌটির হৃৎপিণ্ডটা দ্রুত শব্দ করছে, কপালে রক্ত উঠে দপ্‌দপ্ করছে, কিন্তু কেন এমন হচ্ছে তা সে

বলাতে পারে না... তার বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে, যেন ওই দুটি মানুষই তার ভাগ্য-বিধাতা।

মিনিট পাঁচেক পরে ডাক্তার তার পথে চলে গেল, কিন্তু অব্‌তিওসভ মুখ ঘুবিয়ে দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল একবার, দু'বার...একবার দরজার কাছে থামল আবার হেঁটে চলে গেল...অবশেষে ঘণ্টাটা বেজে উঠল।

''কে? কে ওখানে?'' ওষুধ-বিক্রেতার গলা শুনে তার বৌ জানালায় বসেই চমকে উঠল। লোকটি রেগে বলল, ''কে যেন ঘণ্টা বাজাচ্ছে, আর তুমি যেন শুনতেই পাচ্ছ না। কি এত ভাবছ?''

লোকটি উঠে পড়ল, ড্রেসিং-গাউনটা গায়ে দিল, তারপর ঘুমের আবেশে বারকয়েক এ-পাশ ও-পাশ করে দোকানে ঢুকল।

''কি...কি চান আপনি?'' সে অব্‌তিওসভকে জিজ্ঞাসা করল।

''আমাকে দাও...আমাকে দাও পনেরো কোপেক দামের পুদিনার আচার।''

ওষুধ-বিক্রেতা বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে তাকের উপর থেকে একটা বয়াম নামিয়ে আনল; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ছিল, তার হাঁটু দুটো বারকয়েক টেবিলের সঙ্গে ঠুকে গেল।

দুই মিনিট পরে ওষুধ-বিক্রেতার বৌ দেখল, অব্‌তিওসভ দোকান থেকে বেরিয়ে গেল, কয়েক পা হাঁটল, তারপর পুদানির আচারের প্যাকেটটাকে ধূলোভরা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। একটা মোড় ঘুরে ডাক্তার তার সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে এল... তাদের দেখা হল, দু'জনই হাত-পা নাড়তে লাগল, তারপর সকালবেলাকার কুয়াসার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্বামীকে দ্রুত পোশাক খুলে আবার ঘুমবার জন্য বিছানায় শুতে দেখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ওষুধ-বিক্রেতার বৌ কেঁদে উঠল, ''ওঃ, আমি কত দুঃখী! আমি কত দুঃখী!'' কথাগুলি সে বার বার বলতে লাগল, আব হঠাৎ তিক্ত অশ্রুজলের ধারা তার মুখ বেয়ে ঝরে পড়তে লাগল। সে বলল, ''আর কেউ তো জানল না। কেউ না...''

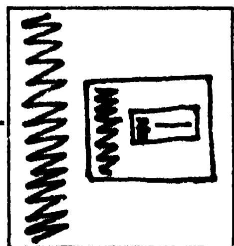
কম্বলটা মুড়ি দিয়ে তার স্বামী অস্পষ্ট স্বরে বলল, ''পনেরো কোপেক টেবিলের উপর ফেলে এসেছি। ওগুলো বুরোতে তুলে রাখ, বুঝছ!''

আর সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

১৮৮৬

গানের দলের মেয়ে

The Chorus Girl



কয়েক বছর আগে মেয়েটি যখন আরও ছোট ছিল, আরও সুন্দরী ছিল এবং আরও ভাল গাইত, সেই সময় একদিন সে ও তার গানের ভক্ত নিকোলাই পেত্রভিচ কোল্‌পাকভ তাদের পল্লীভবনের সামনের ঘরে বসেছিল। অসহ্য গরম ও গুমোট ছিল। কোল্‌পাকভ সবেমাত্র বড় রকমের ডিনার খেয়েছে, একটা পুরো বোতল বাজে পোর্ট গিলেছে, আর অসুস্থ ও অস্বস্তি বোধ করছে। দু'জনই বিরক্ত হয় উঠেছে, গরম কিছুটা কমলেই বেড়াতে বের হবার জন্য অপেক্ষা করছে।

হঠাৎ সামনের ঘরের ঘণ্টাটা বেজে ওঠায় তারা চমকে উঠল। কোল্‌পাকভ শার্ট ও শোবার ঘরের চটি পরে ছিল, লাফ দিয়ে উঠে সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পাশার দিকে তাকাল।

পাশা বলল, ''ডাক-পিয়ন হতে পারে, অথবা আমার কোন বান্ধবীও হতে পারে।''

পাশার বন্ধু বা ডাক-পিয়ন হলে কোল্‌পাকভের চিন্তার কিছু ছিল না, তবু নিরাপত্তার খাতিরে নিজের পোশাকপত্তর তুলে নিয়ে সে পাশার ঘরে চলে গেল, আর পাশা দৌড়ে গেল দরজা খুলতে। পরম বিস্ময়ের সঙ্গে সে যার সম্মুখীন হল সে কিন্তু ডাক-পিয়ন নয় বা তার কোন বান্ধবীও নয়, একজন অপরিচিত, সুন্দরী যুবতী, তার পোশাক ও চেহারা দেখেই মনে হল সে একটি মহিলা।

অপরিচিত মহিলাটির মুখ বিবর্ণ; সে এত ঘন ঘন শ্বাস টানছে যেন অনেকগুলি সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে।

''আপনি কাকে চান?'' পাশা শুধাল।

মহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। এক পা এগিয়ে এক নজরে ধীরে ধীরে ঘরটা দেখে নিল, আর এমনভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়ল যেন সে খুবই পরিশ্রান্ত অথবা আর দাঁড়িয়ে থাকতেই পারছে না। কি যেন বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার রক্তহীন ঠোঁট দুটি নড়তে লাগল, কোন কথা বের হল না।

শেষ পর্যন্ত বড় বড় দুটি চোখ মেলে পাশার দিকে তাকিয়ে বলল, ''আমার স্বামী কি এখানে?''

''কে স্বামী?'' পাশা ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠল; হঠাৎ সে এতই ভয় পেয়ে গেল যে তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। ''কে স্বামী?'' কাঁপতে কাঁপতেই সে আবার প্রশ্নটা করল।

''আমার স্বামী...নিকোলাই পেত্রভিচ কোল্‌পাকভ।''

''না তো... না ম্যাডাম...আমি...আমি আপনার স্বামীকে চান না।''

এক মিনিট নীরবে কাটল। অপরিচিত মহিলাটি একখানা রুমাল দিয়ে বার বার তার বিবর্ণ ঠোঁটদুটো মুছতে লাগল, ভিতরকার কাঁপুনি চেপে রাখার জন্য দম আটকে রাখল, আর পাশা ভয়ে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

এবার একটু হাল্কাভাবে হেসে মহিলাটি দৃঢ় স্বরে প্রশ্ন করল, ''তাহলে আপনি বলছেন যে সে এখানে নেই?''

''আমি... আমি জানি না আপনি কি বলতে চাইছেন।''

ঘৃণা ও বিরক্তিব সঙ্গে পাশাকে আপাদমস্তক লক্ষ্য করে মহিলাটি বলে উঠল, ''তুমি ভয়ংকর, উচ্ছৃংখল, অসৎ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ভয়ংকর। তোমার সম্পর্কে আমি যা ভেবেছি শেষ পর্যন্ত সেটা তোমাকে বলতে পেরেছি বলে আমি খুব, খুব খুশি হয়েছি।''

পাশা বুঝতে পারল ক্রুদ্ধ চোখ ও সরু সরু সাদা আঙুলের এই কালো পোশাকপবা মহিলাটিব কাছে তাকে বেশ নোংরা ও কুৎসিত দেখাচ্ছে; নিজের ফোলা-ফোলা লাল দুটি গাল, নাকেব উপর ব্রণের দাগ, কপালের আঘাতেব দাগ যা চুল দিয়ে ঢাকা যায় নি—সব কিছুর জন্যই সে লজ্জিত বোধ করল। তার মনে হল, সে যদি একহারা হত। সাজগোজ না করত, আর কপালের আঘাতের দাগটা না থাকত, তাহলে হয় তো সে যে একটা নষ্ট মেয়েমানুষ সেটা লুকিয়ে রাখতে পারত, আর সে ক্ষেত্রে এই অপরিচিত রহস্যময়ী মহিলাটিব সামনে সে এতখানি ভীত ও লজ্জিত হয়ে পড়ত না।

মহিলাটি দাবীর সুবে বলল, ''কোথায় আমার স্বামী?'' যাই হোক, সে এখানে থাকুক আর না থাকুক তাতে আমার কিছু যায় আসে না, আমি তোমাকে বলতে এসেছি যে একটা টাকা চুরির ব্যাপার ধবা পড়েছে আর পুলিশ নিকোলাই পেত্রভিচকে খুঁজছে....তারা তাকে গ্রেপ্তার করবে। আর এ সবই তোমার কীর্তি।''

মহিলাটি উঠে দাঁড়াল, তীব্র উত্তেজনায় ঘরময় হাঁটতে লাগল। তীব্র ভয়ে বুদ্ধিহারা পাশা শুধুই তাকিয়ে রইল।

''দিনের আলো নিভে যাবার আগেই সে ধরা পড়বে, গ্রেপ্তার হবে,'' কথাগুলি মহিলাটি দুঃখে ও আহত গর্বে ফুঁপিয়ে উঠল। ''এই ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে কে তাকে ঠেলে দিয়েছে আমি জানি! নীচ, নোংরা জীব! তুমি নির্লজ্জ বেশ্যা! (মহিলাটির মুখ বিকৃত হল, তার নাক বিরক্তিতে কুঁচকে গেল)। আমি অসহায়... শোন, তুমি শোন নীচ মেয়েমানুষ! আমি অসহায়, তুমি আমাব চাইতে শক্তিশালী, কিন্তু একজন আছেন যিনি আমার ছেলেমেয়েকে ও আমাকে রক্ষা করবেন। ঈশ্বরের দৃষ্টি সর্বত্র। তিনি ন্যায়বান। তাঁর কৃপায় আমাব প্রতিটি অশ্রুবিন্দু, আমার সমস্ত নিদ্রাহীন রাতের দাম তোমাকে একদিন মিটিয়ে দিতেই হবে। একদিন আসবে যেদিন

তুমি আমাকে স্মবণ কববে!''

আবাব নীববতা নেমে এল। হাত দুটো মোচড়াতে মোচড়াতে মহিলাটি ঘবময হাঁটিতে লাগল, আব পাশা তখনও বিষণ্ণ নযনে নির্বাক হযে তাব দিকে তাকিযে বইল। সে কিছুই বুঝতে পাবছে না, মহিলাটিব কাছ থেকে একটা ভযংকব কিছু আশংকা কবছে।

''ম্যাডাম, আমি কিচ্ছু জানি না,'' কোনবকমে কথাগুলি বলেই সে হঠাৎ কেঁদে উঠল।

ঘৃণাব দৃষ্টি হেনে মহিলাটি চীৎকাব কবে বলে উঠল, ''তুমি মিথ্যে বলছ! আমি সব জানি! তোমাকে আমি অনেক দিন থেকে জানি। আমি জানি, এই গত মাসেই সে প্রতিদিন এখানে তোমাব কাছে এসেছে।''

''তাতে কি হযেছে? অনেক অতিথিকেই আমি আপ্যাযন কবি, কিন্তু কাউকে জোব কবে ধবে বাখি না। নিজেদেব স্বাধীন ইচ্ছাযই তাবা আসে।''

''আমি তোমাকে বলছিঃ একটা টাকা চুবিব ব্যাপাব ধবা পড়েছে। সে টাকাটা মেবে দিযেছে! তোমাব মতই কাবও জন্যে, তোমাব জন্যই সে এই পাপেব পথে পা দিযেছে। শোন, তুমি'' পাশাব সম্মুখে দাঁড়িযে কঠিন গলায মহিলাটি বলতে লাগল। ''অবশ্য তোমাব কোন বকম নীতিব বালাই থাকাব কথা নয, পাপ কবাই হচ্ছে তোমাদেব জীবনেব লক্ষ্য, তাব জন্যই তোমবা বেঁচে থাক, কিন্তু একথা বিশ্বাস কবা যায না যে মানবিক অনুভূতিব চিহ্নমাত্রও তোমাব মধ্যে নেই। তাব স্ত্রী আছে, ছেলেমেযে আছে। . তাব যদি শাস্তি হয আব তাকে যদি নির্বাসনে পাঠানো হয, তাহলে আমাব ছেলেমেযে ও আমি না খেযে মবে যাব। এটা বুঝতে চেষ্টা কব! আব এখনও এই দাকণ দাবিদ্র্য ও অপমানেব হাত থেকে তাকে ও আমাদেবকে বাঁচাবাব একটা পথ আছে। যদি আজ আমি ন'শ' কবল জমা দিতে পাবি, তাহলেই তাব বিকদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হবে না। মাত্র ন'শ' কবল!''

''কিসেব ন'শ' কবল?'' পাশা শান্ত গলায জিজ্ঞাসা কবল। ''আমি আমি এ ব্যাপাবে কিছুই জানি না। সে টাকা আমি নেই নি।''

'তোমাব কাছে ন'শ' কবল চাইতে আমি আসি নি। তোমাব তো টাকা নেই তাই তোমাব কাছে আমাব চাইবাবও কিছু নেই। তোমাব কাছে আমি অন্য কিছু চাইতে এসেছি। তোমাদেব মত মেযেদেব পুকষবা সাধাবণত অলংকাবপত্র দিযে থাকে। আমাব স্বামী তোমাকে যা দিযেছে সেগুলি আমাকে ফিবিযে দাও।''

এতক্ষণে পাশা বুঝতে পেবেছে। সে আর্তস্ববে বলল, ''কিন্তু ম্যাডাম, সে কখনও আমাকে কিছু দেয নি।''

''টাকাগুলো তাহলে গেল কোথায? সে সব কিছু উড়িযেছে, আমাব টাকা, আব যে টাকা সে মেবে দিযেছে, সব সে সব গেল কোথায? আমাব মিনতি, আমাব কথা তুমি মন দিযে শোন! আমি খুব বেগে গিযেছিলাম, তাই তোমাকে অনেক কটু কথা বলেছি। আমি দুঃখিত। আমি জানি,

আমাকে তোমার ঘৃণা করারই কথা, কিন্তু তোমার মনে যদি দয়ামায়া থাকে তো আমার অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা কর! আমি মিনতি করছি, জিনিসগুলো আমাকে ফিরিয়ে দাও!''

পাশা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, ''দেখুন, আপনার কথা রাখতে পারলে আমি খুশি হতাম, কিন্তু ঈশ্বর জানেন, সে আমাকে কখনও কিছুই দেয় নি। আমাকে বিশ্বাস করুন। মনে পড়েছে, আপনি ঠিকই বলেছেন,'' পাশা অনুতাপের সুরে বলল। একবার দুটো সামান্য গয়না সে আমাকে দিয়েছিল। সে দুটো আপনি নিতে পারেন। যদি চান তো সেটা আপনাকে দিতে পারি...''

পাশা তার পোশাকের আলমারির একটা দেরাজ টেনে একটা ফাঁপা ব্রেসলেট ও চুণিবসানো একটা সস্তাদামের আংটি বের করল।

গয়না দুটো মহিলার দিকে বাড়িয়ে সে বলল ''এই দুটো।''

রাগে মহিলাটির মুখ লাল হয়ে উঠল, সে কাঁপতে লাগল। ভীষণ অপমানিত বোধ করল।

জানতে চাইল, ''এগুলো কী দিচ্ছ আমাকে? আমি তো ভিক্ষা নিতে আসি নি, আমি চাইতে এসেছি সেই সব জিনিস যা তোমার নয়, যা তোমার অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমার স্বামীর কাছ থেকে বাগিয়ে নিয়েছ...ঐ দুর্বল, গরিব মানুষটাকে...গত বৃহস্পতিবার আমি যখন তোমাকে আমার স্বামীর সঙ্গে প্রমোদ-ভ্রমণে বের হতে দেখেছিলাম তখন তোমার গায়ে ছিল দামী ব্রচ ও ব্রেসলেট। কাজেই এখন তোমার নিরীহ মেষশাবকের মত অভিনয়ের কোন মানেই হয় না। এই শেষবারের মত তোমাকে বলছিঃ সেই সব জিনিস তুমি আমাকে দেবে কি দেবে না?''

এতক্ষণে পাশাও রাগ দেখাতে শুরু করল ঃ ''আমি শপথ করে বলছি এই ব্রেসলেট ও আংটি ছাড়া তোমার নিকোলাই পেত্রভিচের কাছ থেকে আর কিছুই আমি কখনও পাই নি। সে আমার জন্য কেবল কেকই নিয়ে আসত।''

''কেক?'' মহিলাটি ঝংকার দিয়ে উঠল। ''বাড়িতে তার ছেলেমেয়ের খাবার জোটে না, আর তোমাকে কেক এনে দেয়। তুমি কি সত্যি অলংকারগুলি ফেরৎ দেবে না?''

কোন জবাব না পেয়ে মহিলাটি বসে পড়ল। পাশাব দিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

তারপব বলল, ''এখন আমি কি করি? ন'শ' রুবল্ যদি যোগাড় করতে না পারি তাহলে তো সে এবং ছেলেমেয়েরা ও আমি সকলেই শেষ হয়ে যাব। এই বেশ্যাকে খুন করব, না কি তার পায়ে ধরব?''

মুখের উপর রুমাল চাপা দিয়ে সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কাঁদতে কাঁদতেই বলল, ''তোমাব কাছে আমি ভিক্ষা চাইছি! তুমিই আমার স্বামীকে শেষ করেছ, তুমিই তাকে বাঁচাও।...তার প্রতি তোমার

কোন দয়ামায়া নেই, ছেলেমেয়েরা...তাদের কি দোষ?''

পাশার চোখের সামনে ভেসে উঠল, তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে রাস্তাব মোড়ে দাঁড়িয়ে ক্ষিদের জ্বালায় কাঁদছে, আর সে নিজে ফোঁপাতে শুরু করে দিল।

সে বলল, ''কিন্তু আমি কি করতে পারি ম্যাডাম? আপনি বলছেন আমি দুষ্ট, নিকোলাই পেত্রভিচকে আমিই শেষ করেছি, কিন্তু ঈশ্বরকে সাক্ষী করে আমি আপনাকে বলছি, তার কাছ থেকে আমি কখনও কিছু নেই নি। আমাদের গানের দলের একমাত্র মতিয়াই জনৈক ধনী প্রেমিকেব রক্ষিতা, বাদবাকি আমরা সকলেই কোনরকমে খেয়ে-পরে বেঁচে আছি। নিকোলাই পেত্রভিচ একজন শিক্ষিত, কুশলী ভদ্রলোক, তাই তাকে ঘরে নিয়েছিলাম। ভদ্রলোকদের তো আমরা ফিরিয়ে দিতে পারি না।''

''আমি অলংকারগুলি চাইছি! সেগুলি আমাকে দাও। আমি কাঁদছি...নিজেকে কত নীচে নামিয়েছি দেখ, নতজানু হয়ে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি! দেখ!''

পাশা আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, প্রতিবাদে হাত দুটি নাড়তে লাগল। সে বুঝতে পারল, এই বিবর্ণ, সুন্দরী মহিলা যিনি রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীদের মতই নিজেকে উদার মূর্তিতে প্রকাশ করতে পাবেন তিনিই আবার নতজানু হয়ে ভিক্ষাও চাইতে পারেন, কাবণ তিনি গর্বিত ও সম্ভ্রান্ত, আর তাই পাশার উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রকাশ কবে তাকে ছোট বানাতে পারেন।''

চোখের জল মুছে পাশা বলল, ''ঠিক আছে, সব অলংকার আমি আপনাকে দেব। এই সে সব। শুধু মনে রাখবেন, এগুলো নিকোলাই পেত্রভিচের কাছ থেকে পাই নি। পেয়েছি অন্য সব ভদ্রলোক অতিথিদের কাছ থেকে। এ নিয়ে আপনি যা ইচ্ছা করুন, যদিও...''

পোশাকেব আলমাবির একেবারে উপরের দেরাজটা টেনে পাশা বের করল একটা হীরের ব্রুচ, প্রবালের একটা হার, কয়েকটা আংটি, একটা ব্রেসলেট; সেগুলি মহিলাটির সামনে মেলে ধরল।

মহিলাটি নতজানু হবার ভয় দেখানোতে অপমানিত বোধ করে পাশা বলল, ''ইচ্ছা করলে এ সব আপনি নিতে পারেন, তবে এর কোনটাই আমি আপনার স্বামীর কাছ থেকে পাই নি। নিন এগুলো, আব নিজেকে ধনবতী করে তুলুন! আর আপনি যদি এতই সম্মানিত ব্যক্তি...তার বিবাহিত স্ত্রীও বটে, তাহলে তাকে ধবে রাখতে পারেন না কেন? বাস! আমি কোন দিন তাকে ডেকে আনি নি, সে নিজের ইচ্ছায় এসেছে...''

চোখের জলের ভিতর দিয়ে অলংকারগুলির দিকে তাকিয়ে মহিলা বলল: ''এই তো সব নয়। এতে তো পাঁচ শ'ও আসবে না।''

পাশা দেরাজের ভিতর থেকে একটা সোনার ঘড়ি, একটা সিগারেট-কেস ও এক জোড়া কাফ-লিং টেনে বের করে টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল।

দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আমার আর কিছু নেই। আপনি আমাকে তল্লাসী করে দেখতে পারেন!"

মহিলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কাঁপা হাতে জিনিসগুলো রুমালে বাঁধল এবং আর একটি কথাও না বলে, মাথাটাও না হেলিয়ে, বাড়ি থেকে চলে গেল।

কোল্‌পাকভ পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার মুখ বিবর্ণ, এমনভাবে মাথাটাকে নাড়ছে যেন এই মাত্র কোন তেতো ওষুধ খেয়েছে। দুই চোখে জলের ফোঁটা চক-চক কবছে।

"কোন্ অলংকার তুমি আজ পর্যন্ত আমাকে দিয়েছ?" পাশা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। "কবে দিয়েছ সেটাও জিজ্ঞেস করতে পারি কি?"

"অলংকার...আরে, কোন্ অলংকার!" কথাটা বলে কোল্‌পাকভ আবার মাথাটা দোলাতে লাগল। "হা ঈশ্বর! সে তোমার সামনে কেঁদে ভাসাল, নিজেকে ছোট করল..."

"আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছিঃ কবে তুমি আমাকে গয়না দিয়েছ?"

"হা ঈশ্বর, সে তো এত সম্মানিত, গর্বিত, পরিচ্ছন্ন...সে নতজানু হতে চাইল'এর সামনে...এই বেশ্যাব সামনে! আমি, আমি তাকে এতদূর টেনে নামিয়েছি! এ কাজ আমি তাকে করতে দিলাম!"

দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে সে আর্তনাদ করে উঠল ঃ

"না, না, এর জন্য কোন দিন আমি নিজেকে ক্ষমা করব না! কোন দিন না! সমাজের পোকা! আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও!" পাশার কাছ থেকে পিছিয়ে গিয়ে কাঁপা হাতে তাকে সরিয়ে দিতে দিতে সে আর্তনাদ করে উঠল। "সে নতজানু হতে চেয়েছে...আর কার সামনে! হে ভগবান!"

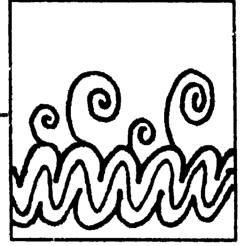
সে তাড়াতাড়ি পোশাক পড়ল, তারপর দরজার দিকে যেতে যেতে ন্যক্কারজনকভাবে পাশাকে এড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

পাশা শুয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল। আবেগের বশে বিলিয়ে দেওয়া অলংকারের জন্য দুঃখ তো ছিলই, তার সঙ্গে যোগ হল অন্যায়ের আঘাত। তার মনে পড়ল, তিন বছর আগে এক ব্যবসায়ী বিনা দোষেই তাকে খুব মেরেছিল; সে আরও জোরে কেঁদে উঠল।

১৮৮৬

বেয়াদব অতিথি

A Troublesome Guest



বনরক্ষকের নিচু ছাদের ঝুলে-পড়া ঘরে একটি বড় কালো বিগ্রহের তলায় দুটি লোক বসেছিল—একজন বনরক্ষর আর্টিয়ম স্বয়ং—বার্ধক্যজনিত কুঞ্চিত মুখ ও অল্প দাড়িওয়ালা একটি ছোটখাট, চামড়াসর্বস্ব মানুষ—অপরজন এক ভ্রাম্যমান শিকারী—নতুন, ঝক্‌ঝকে লাল শার্ট ও জল-কাদার বুট পরা একটি শক্ত-সমর্থ যুবক। তারা বসেছিল ছোট তেপায়া টেবিলের পাশে একটা বেঞ্চিতে; টেবিলের উপর বোতলের মধ্যে বসানো একটা চর্বি-বাতি মিটমিট্‌ করে জ্বলছিল।

বাইরে রাত্রির অন্ধকারে প্রবল বেগে বাতাস বইছে—সেটা বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়ের স্বাভাবিক পূর্বাভাষ। ঝড়ো হাওয়া প্রচণ্ডভাবে গর্জন করছে, আব গাছপালাগুলো বেঁকে বেঁকে করুণ সুরে আর্তনাদ করছে। জানালার একটা খাপে কাঁচের বদলে কাগজ লাগানো ছিল; ঝড়ের দাপটে উড়ে আসা পাতাগুলি সশব্দে তার উপর ছিটকে পড়ছে।

ভয়ার্ত খোলা চোখ মেলে শিকারীর দিকে তাকিয়ে আর্টিয়ম ফ্যাঁসফেঁসে অস্পষ্ট গলায় বলতে লাগল, "শোন বাপু, আমি তোমাকে মনেব কথাটাই বলব। নেকড়ে, অথবা ভালুক, অথবা অন্য কোন বন্য জন্তুকে আমি ভয় করি না, কিন্তু আমার ভয় মানুষকে। একটা বন্দুক বা অন্য কোন অস্ত্র নিয়ে তুমি বন্য জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পার, কিন্তু কোন কিছুই একজন দুষ্ট মানুষের হাত থেকে তোমাকে বাঁচাতে পারে না।"

"খুবই স্বাভাবিক! একটা বন্যজন্তুকে আপনি গুলি করতে পারেন, কিন্তু আপনি যদি একটা ডাকাতকে গুলি করেন তাহলে সেজন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে, এবং সাইবেরিয়াতে কঠোব পরিশ্রম করতে হবে।"

"দেখ ভাল মানুষ, আমি এখানে বনরক্ষক হয়ে আছি প্রায় ত্রিশ বছর হল, আর এই সময়ের মধ্যে দুষ্ট লোকের হাতে আমি যে কত কষ্ট পেয়েছি তা তোমাকে বলে শেষ করতে পারব না। সেরকম মানুষ যে কত আমার এই ঘরে এসেছে তার কোন লেখা-জোখা নেই। তুমি তো দেখছ, এই বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে একটা খোলা জায়গার উপর, রাস্তাটাও একটানা ও চল্‌তি, কাজেই শয়তানদের আসা-যাওয়া কে ঠেকাবে? যে কোন গুণ্ডা-বদমাস এখানে ঢুকে পড়বে, টুপি না খুলে এবং বিগ্রহের সামনে ক্রুশ-চিহ্ন না এঁকেই সোজা আমার কাছে এসে বলবে: 'দাও তো হে, কি যেন তোমার নাম — আমাকে একটা পাউরুটি দাও তো।' এখন আমি পাউরুটি কোথায় পাব? পাউরুটি চাইবার কি অধিকার তার আছে? আমি কি কোটিপতি না আর কিছু যে

প্রতিটি মাতাল পথযাত্রীকেই খাওয়াব? আর সেও স্বভাবতই এই সোজা কথাটা বোঝে না—দুষ্ট শয়তানদের যা হয় আর কি—প্রথমেই তোমার কানের উপর সোজা একটা ঘুষি বসিয়ে দেবে আর বলে উঠবে ঃ 'তাহলে রুটি দাও!' আচ্ছা বল্, আমি কি করতে পারি... সেই ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে লড়াই করতে পারি না, পারি কি? তাদের অনেকেরই গর্দানটা ইয়া চওড়া আর মুঠোটা আমার বুটের মত বড়, আর তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ আমি কি রকম দুর্বল। ওই সব ঠ্যাঙাড়েদের যে কোন একজন তার কড়ে আঙুলটা দিয়েই আমাকে খুন করে ফেলতে পারে...তারপর, ধর শয়তানটাকে কিছু রুটি দিলাম, আর সেটা পেটভরে খেয়ে সেও হাত-পা ছড়িয়ে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল—মুখে একটা ধন্যবাদও দিল না। আবার এমন অনেকে আছে যারা টাকাও চায় ঃ 'ঝেড়ে কাশ, নইলে!' আমি টাকা কোথায় পাব? কোত্থেকে আসবে?''

শিকারীটি মুচকি হেসে বলল, ''আর যেই হোক, একজন বনরক্ষক কখনও অর্থহীন হতে পারে না। আপনি তো প্রতি মাসে মাইনে পান, আর আমি বাজী ধরে বলতে পারি, লুকিয়ে-চুরিয়ে আপনি কাঠও বিক্রি করেন।''

আর্টিয়ম ভীত দৃষ্টিতে শিকারীর দিকে তাকাল, আর ছাতারে পাখি যে ভাবে লেজ নাড়ে সেই ভাবে তার দাড়ি ক'গাছাকে মোচড়াতে লাগল।

বলল, ''তোমার যা বয়স তাতে আমাকে এ রকম কথা বলা তোমাকে সাজে না। এসব কথার জন্য ঈশ্বরের কাছে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে। তোমার আপনজন কারা? তুমি আসছ কোথা থেকে?''

''আসছি ভিয়াজোভ্‌কা থেকে। আমি নেফিয়দের ছেলে। আমার বাবা গ্রামপ্রধান।''

''মজা করতে শিকার করে বেড়াচ্ছ...আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন ও শখটা আমারও ছিল। হায়, আমাদের মত পাপীদের প্রভু করুণা করুন,'' কথাগুলি বলে সে হাই তুলল বলল, ''খারাপ কাজ! ভাল মানুষ আর ক'জন, সবই তো দুর্বৃত্ত; তাদের কাছ থেকে প্রভু আমাদের দূরে রাখুন!''

''আপনি এমন আওয়াজ দিচ্ছেন যেন আমাকেও ভয় পাচ্ছেন।''

''আরে, রাখো তো ওসব কথা! তোমাকে ভয় পাব কেন? আমি সব দেখতে পাই,... সব বুঝতে পারি... তুমি তো ভিতরে ঢুকেই যথাযথভাবে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকলে...মোটেই তাদের মত নয়...আমি বুঝি তোমাকে কিছুটা রুটি দিতেও আমার আপত্তি নেই...কি জান, আমি বিপত্নীক, আমি আলো জ্বালি না, স্টোভ ধরাই না, সামোভারটা বেচে দিয়েছি, আমার মত গরিব মানুষের পক্ষে মাংস বা ঐ রকম কিছু রাখা সম্ভব নয়, কিন্তু তুমি যদি রুটি চাও তো সুস্বাগত।''

ঠিক তখনই বেঞ্চির নীচে একটা গর্‌-গর্‌ শব্দ শোনা গেল, আর তার পরেই একটা হিস্‌-হিস্‌ আওয়াজ। আর্টিয়ম চমকে উঠে পা তুলে নিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শিকারীর দিকে তাকাল।

শিকারী জবাব দিল, "আপনার বিড়ালকে দেখে আমার কুকুরটা গর্জাচ্ছে। 'চুপ, শয়তানরা!' সে চীৎকার করে বলল। 'শুয়ে পড়! কথা না শুনলে পিটুনি খাবে।' আহা, আপনার বিড়ালটা কী শুটকো! কেবল চামড়া আর হাড়।"

"ওটা বুড়ো হয়েছে, মরবার সময় হয়ে গেছে।.. তাহলে তুমি বলছ যে তুমি আসছ ভিয়াজোভ্কা থেকে?"

"আমি তো দেখছি আপনি ওকে খেতেই দেন না। একটা বিড়াল হলেও সেও তো ঈশ্বরের জীব! ছোট আর বড় এই তো। জন্তুদের প্রতি আপনার দয়ালু হওয়া উচিত।"

শিকারের কথাগুলো যেন কানেই যায় নি এমনিভাবে আর্টিয়ম বলেই চলল, "তোমাদের ভিয়াজোভ্কার অবস্থা তো ভাল নয়। এক বছরে গির্জায় দু'বার লুঠতরাজ হয়েছে...পৃথিবীতে কত বিধর্মীই যে আছে, কি বল? ঈশ্বরকেও তারা ভয় করে না, মানুষ তো ছাড়। ঈশ্বরের সম্পত্তি লুঠ! আরে, এদের তো ফাঁসি দিলেও যথেষ্ট শাস্তি হয় না! আগেকার দিনে শাসনকর্তারা এ সব পাষণ্ডদেব তুলে দিত জল্লাদের হাতে! সেটাই ঠিক ছিল!"

"ইচ্ছা হলে আপনি তাদের সকলকেই শাস্তি দিন, চাবুক মারুন, সশ্রম কারাদণ্ড দিন, তাতে ভাল কিছুই হবে না। মানুষ যদি পাপী হয়, কোন কিছু দিয়েই তার পাপকে আপনি তাড়াতে পারবেন না।"

বনরক্ষক ধরা গলায় বলে উঠল, "হা ঈশ্বরজননী, আমাদের দয়া কর। সব রকমের শত্রু ও দুষ্কৃতকারীর হাত থেকে আমাদের বাঁচাও! গত সপ্তাহে ভলোভায় জাইমিশিতে এক ঘাস-কাটা আর একজনকে মারল কাস্তে দিয়ে...মারল তো মারল একেবারে মেরেই ফেলল! আর এসব ভাবলে, ঈশ্বর আমাদের আত্মাকে আশীর্বাদ করুন! একজন এসেছিল শুঁড়িখানা থেকে...মদে একেবারে চুর হয়ে! অপরজনও এসেছিল সেই একই হালে নেশায় টলতে টলতে. ."

শিকারী বেশ মন দিয়েই শুনছিল; হঠাৎ চমকে উঠে বাইরে কান পাতল।

বনরক্ষককে বাধা দিয়ে বলল, "থামুন, কে যেন চেঁচাচ্ছে, মনে হয়..."

শিকারী ও বনরক্ষক দু'জনই খুব মন দিয়ে শুনতে চেষ্টা করল; দু'জনেরই চোখ অন্ধকার জানালাটার উপর। গাছপালার পরস্পর ঠোকাঠুকির ভিতর দিয়ে যে শব্দ তাদের কানে এল সেটা ঝড়ের সময় যে কোন মানুষই শুনতে পায়; কাজেই বোঝা খুবই শক্ত কোন মানুষ সাহায্যের জন্য ডাকছে, না বাতাস চিমনির ভিতর মাথা কুটছে। এমন সময় একটা প্রচণ্ড বাতাস ছাঁদটাকে ফাঁক করে ফেলল, জানালার কাগজের ঢাকনাটাকে ছিঁড়ে ফেলল, আর শ্রোতা দুটির কানে বয়ে আনল একটা সুস্পষ্ট চীৎকার "বাঁচাও!"

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে শিকারী উঠে দাঁড়াল; বলল, "শয়তানের কথা

বলছিলেন তো। আপনার ওই গলা-কাটার দল কাউকে লুঠ করছে।"

বনরক্ষকও ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "ঈশ্বর আমাদের আত্মাকে করুণা করুন!"

শিকারী বৃথাই অন্ধকার জানালার দিকে তাকিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল।

সে বলল, "কী একটা রাত! কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এই তো লুঠ করার মত সময়। শুনতে পাচ্ছেন? কে যেন আবার চীৎকার করল।"

বনরক্ষক বিগ্রহের দিকে তাকাল, তারপর শিকারীর দিকে, তারপর ক্লান্তিতে ধপাস্ করে বেঞ্চিতে বসে পড়ল, কোন আকস্মিক দুঃসংবাদ শুনলে মানুষ যেভাবে ভয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে বসে পড়ে।

বনরক্ষক করুণ গলায় বলল,"ভাল ছেলের মত বাইরের দরজাটায় খিল লাগিয়ে দিয়ে এস! আর আমাদেরও উচিত চর্বিবাতিটা নিভিয়ে ফেলা।"

"কেন?"

"ওরা এখানেও আসতে পারে। ঈশ্বর না করুন হায়, হায়!"

"আমাদের উচিত বাইরে বেরিয়ে সাহায্য করা, আর আপনি দরজায় খিল দিতে চাইছেন। কী বোকা! চলুন, বেরিয়ে পড়ি।"

শিকারী বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে টুপিটা তুলে নিল।

"পোশাক পরে বন্দুকটা হাতে নিন। হেই সুন্দরী!" সে কুকুরটাকে ডাকল। কুকুরটার ঝোলা কান দুটোর নীচের দিকটা থেঁতলানো, দেখেই বোঝা যায় শিকারী কুকুর ও দো-আঁসলার মিলনে তার জন্ম। বেঞ্চির নীচ থেকে বেরিয়ে এসে মনিবের পায়ের কাছে টান-টান হয়ে শুয়ে সে লেজ নাড়তে লাগল।

শিকারী চড়া গলায় বনরক্ষককে বলল, "আসুন, বেঞ্চি থেকে উঠে পড়ুন। না কি আপনি যাবেন না?"

"কোথায়?"

"সাহায্য করতে।"

বনরক্ষক কাঁপতে কাঁপতে বলল, "তাতে লাভটা কি হবে! ও যেমন আছে থাকুক।"

"কিন্তু কেন আপনি আসতে চাইছেন না?"

"এই সব ভয়ংকব কথা শোনার পরে এই অন্ধকারে আমি একটা পাও বাড়াব না। আর বনের মধ্যে যাবই বা কেন?"

"কিন্তু আপনার ভয়টা কিসের? আপনার হাতে বন্দুক রয়েছে না? দয়া কবে চলে আসুন। একলা যেতে ভয় করে, কিন্তু দু'জন হলে একে-অন্যাকে সাহস দিতে পারব। শুনতে পাচ্ছেন? আবার সেই সাহায্যের জন্য চীৎকার। উঠে পড়ুন।"

বনরক্ষক আর্তকণ্ঠে বলল, "তুমি আমাকে কি ভেবেছ হে? তুমি কি মনে কর আমি এতই বোকা যে নিজের মৃত্যুর পথে পা বাড়াব?"

"অতএব আপনি আসছেন না?"

বনরক্ষক জবাব দিল না। সম্ভবত মানুষের গলার সাহায্যের আবেদন শুনে কুকুরটাই করুণ সুরে ডাকতে শুরু করল।

বনরক্ষকের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে শিকারী চীৎকার করে বলল, "আমি জানতে চাই আপনি আসবেন কি না?"

বনরক্ষক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমাকে বিরক্ত করো না। একলাই চলে যাও।"

"জারজ কোথাকার", দাঁতে দাঁত চেপে শিকারী দরজার দিকে পা বাড়াল। কুকুরটাকেও ডেকে নিল।

দরজাটাকে হাট করে খুলে রেখেই সে বেরিয়ে গেল। বাতাস হু-হু করে ঘরে ঢুকতে লাগল। চর্বি বাতির শিখাটা কেঁপে কেঁপে উজ্জ্বল হয়ে উঠে নিভে গেল।

দরজায় খিল দিতে দিতেই বিদ্যুৎ চমকালো, আর বনরক্ষক দেখল খোলা জায়গাটায় জল জমেছে, কাছের পাইনগাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে, আর তার অতিথির মূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। দূরে বজ্র গর্জে উঠল।

তাড়াতাড়িতে মোটা খিলটাকে বড় লোহার আংটার মধ্যে ঠিক মত ঢোকাতে না পেরে সে চাপা গলায় বলে উঠল, "দূর ছাই, দূর ছাই...কী আবহাওয়ারে বাবা!"

হাতড়াতে হাতড়াতে স্টোভের কাছে গেল, তাকের উপর উঠে পড়ল, আর শুয়ে পড়ে ভেড়ার চামড়াটা দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে দিল। সেই ভাবে শুয়ে থেকেই কান পেতে রইল, কিন্তু কোন মানুষের সাহায্য প্রার্থনার ডাক আর শোনা গেল না। আরও জোর শব্দ করে বাজ পড়ল। সে শুনতে পেল, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা বাতাসে তাড়িত হয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আঘাত করছে তার জানালার কাঁচে ও কাগজে।

বনরক্ষক কল্পনায় দেখল, শিকারীটি বৃষ্টিতে ভিজছে, গাছের গুঁড়িতে ঠোক্কর খাচ্ছে। তা দেখে সে ভাবল, "কেন যে ব্যাটা ওখানে গেল। নির্ঘাৎ ভয়ে তার দাঁত-কপাটি লেগেছে!"

দশ মিনিট পরেই সে শুনতে পেল কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

"কে?" সে গলা ছেড়ে বলল।

"আমি," তার কানে এল শিকারীর গলা। "আমাকে ভিতরে ঢুকতে দিন।"

বনরক্ষক স্টোভ-শয্যা থেকে নেমে এল, চর্বি-বাতিটা খুঁজে নিল, সেটাকে জ্বালাল, তারপর দরজার খিল খুলতে গেল। শিকারী ও তার কুকুর কাক-ভেজা ভিজেছে। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে তারা বেরিয়ে গিয়েছিল; তাদের গা বেয়ে এমনভাবে জল ঝরছিল যেন তারা দু'খানি কম্বল যাকে চিপে জল বের করতে হবে।

"সেখানে কি হয়েছিল?" বনরক্ষক শুধাল।

''একটি চাষী মেয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে পথ হারিয়ে ফেলেছিল,'' দম নিতে নিতে শিকারী জবাব দিল। ''সে একটা ঘন ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়েছিল।''

''কী বোকা মেয়েছেলে! সে কি ভয় পেয়েছিল?...আর তুমি কি তাকে পথ দেখিয়ে রাস্তায় তুলে দিয়েছ?''

''আপনার মত একটা ইঁদুরের কথার কোন জবাব দিতে আমি চাই না।''

ভেজা টুপিটাকে বেঞ্চির উপর ছুঁড়ে দিয়ে সে বলতে লাগল ঃ ''আপনার সম্পর্কে আমি এটুকু জেনেছি যে আপনি একটা ইতর লোক, অতি নীচ ইঁদুর। আপনি একজন পাহারাদার, আর একটা মাইনেও পান! আপনার মত জারজ...''

ইতর প্রকৃতির লোকের মতই বনরক্ষক স্টোভের উপর উঠে গেল, একবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করেই শুয়ে পড়ল। শিকারী বেঞ্চির উপর বসে এক মিনিট কি ভাবল, তারপর ভেজা পোশাকেই সটান শুয়ে পড়ল। একটু পরেই উঠে বসল, ফুঁদিয়ে চর্বি-বাতিটা নিভিয়ে দিল, তারপর আবার শুয়ে পড়ল। বাজ পড়ার প্রচণ্ড শব্দে একটু নড়েচড়ে, বিরক্তিতে থুথু ফেলে গজ্ গজ্ করে বলতে লাগল ঃ

''উনি তো ভয় পেয়েছেন, কি যে সব...আচ্ছা, কেউ যদি মেয়েটার গলাটা কেটে ফেলত? তাকে উদ্ধার করতে যাওয়াটা যদি তার কাজ না হয়, তো সেটা কার কাজ? তাছাড়া, লোকটি বৃদ্ধ, একজন খৃস্টানও...আসলে উনি একটি শুয়োর।''

বনরক্ষক ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অন্ধকারে কুকুরটা সজোরে একবার গা-ঝাড়া দিল। ফলে তার গায়ের জল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

শিকারী আবার বলতে শুরু করল, ''তাহলে কেউ মেয়েটার গলা কেটে ফেললেও আপনার কিছু যায় আসে না? না, ঈশ্বরের দোহাই, আমি বুঝতে পারি নি আপনি এত বাজে লোক।''

সে চুপ করল। ঝড়ের মেঘ কেটে গেল, বজ্রের গর্জন দূরে মিলিয়ে গেল, কিন্তু বৃষ্টি তখনও পড়ছে।

নিস্তব্ধতা ভেঙে শিকারী কথা বলল, ''আচ্ছা'' মেয়েটি না হয়ে আপনি নিজে যদি সাহায্যের জন্য চীৎকার করতেন? তখন যদি কেউ আপনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে না আসত তাহলে আপনার মত শুয়োরের কেমন লাগত? আপনার এই বাজে আচরণ আমার সব কিছু গুলিয়ে দিয়েছে।''

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার কথা বলল ঃ

''মানুষকে যখন আপনার এত ভয় তখন নিশ্চয় আপনার কাছে টাকা আছে! গরিব মানুষের তো এরকম ভয় পাবার কথা নয়...''

বনরক্ষক সাঁই সাঁই করে বলে উঠল, ''এ ধরনের কথার জন্য ঈশ্বর তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবে। আমি বলছি, আমার কাছে টাকা-পয়সা

নেই।''

''তা তো বলবেনই। পাজি লোকদের কাছে সব সময় টাকা থাকে।... নইলে মানুষকে ভয় পান কেন? এতেই প্রমাণ হয় যে আপনার টাকা আছে। একটা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই আপনাব টাকা লুঠ করা উচিত।''

আর্টিয়ম নিঃশব্দে স্টোভ-শয্যা থেকে বেয়ে-ছেয়ে নেমে এল, মোমবাতিটা জ্বালাল, তারপর বিগ্রহের নীচে বসে পড়ল। কিন্তু সারাক্ষণ শিকারীর উপর থেকে চোখ সরাল না।

শিকারী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ''আমি লুঠ কববই। আর আপনি কি ভেবেছেন? আপনার মত লোকদের শিক্ষা হওযা দবকার। বলুন, টাকা-পয়সা কোথায লুকিয়ে রেখেছেন?''

আর্টিয়ম পাদুটি গুটিয়ে চোখ পিট পিট করতে লাগল।

''চুপ করে বসুন! সব টাকা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন? শয়তান, জিভটা কি গিলে খেয়েছেন, না কি? মুখ খুলুন!''

সে বনরক্ষকের দিকে এগিয়ে গেল।

''ও ভাবে হা কবে তাকিয়ে থাকলে আপনার চোখ দুটোই ঠেলে বেবিয়ে আসবে! টাকাটা আমাকে দিয়ে দিন, নইলে আপনাকে গুলি করব।''

''আমাকে ছেড়ে দাও!'' বনরক্ষক কর্কশ গলায় বলল। তার দুই চোখ থেকে জল গড়াতে লাগল। ''কেন আমাকে বিরক্ত করছ? ঈশ্বর সবই দেখছে। তোমার এই সব কথার জন্য ঈশ্বব তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবে! আমার কাছে টাকা দাবী করছ কোন অধিকারে?''

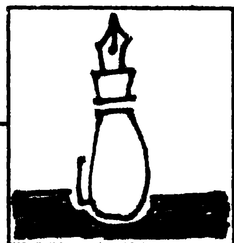
শিকারী আর্টিয়মের অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে তাকাল, ঘৃণায একটু সরে গিয়ে মেঝেতে পায়চারি করতে লাগল, তারপর টুপিটা মাথায় দিযে বন্দুকটা হাতে নিল।

দুই দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলল, ''আপনার দিকে তাকাতেও আমার কষ্ট হচ্ছে! আপনাকে সহ্য করতেই পারছি না। কোন দিন আপনার ঘরে ঘুমব না। বিদায়।''

কুকুবটাকেও ডেকে নিল। দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে জানিয়ে দিল বেযাদপ অতিথি ও তাব কুকুরটা চলে গেছে।... আর্টিযম দরজায় খিল তুলে দিল, ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল. তারপর শুয়ে পডল ঘুমের আশায়

১৮৮৬

প্রথম শ্রেণীর যাত্রী



First Class Passengar

প্রথম শ্রেণীর যাত্রী জনৈক ভদ্রলোক স্টেশন-রেস্তোরাঁ থেকে সবে ডিনার খেয়েছেন। সেই সঙ্গে যে-মদটা পেটে পড়েছিল সেটা একটু একটু করে মাথায় উঠতে শুরু করেছে। নরম বার্থে আরামে হাত-পা ছড়িয়ে তিনি একটু দিবানিদ্রা দিলেন। পাঁচ মিনিটও না ঘুমিয়ে উল্টো দিকের যাত্রীটির দিকে ভদ্রভাবে তাকিয়ে হেসে বললেন ঃ

''আমার স্বর্গত পিতৃদেব—তাঁর স্মৃতি সুখের হোক—পছন্দ করতেন ডিনারের পবে কোন চিবদাসী তার গোড়ালি চুল্‌কে দিক। সব ব্যাপারেই আমি তাঁর অনুগামী, কেবল একটি তফাৎ এই যে আমাব বেলায় গোড়ালির বদলে চুলকোয় আমার জিভ আর মস্তিষ্ক। পাপী মানুষ বলেই পেট ভর্তি হলে অর্থহীন কথাবার্তা বলতে আমাব ভাল লাগে। আপনার সঙ্গে একটু গল্প করতে পারি কি ?''

''নিশ্চিয়, নিশ্চয়'' বিপরীত দিকের যাত্রী বললেন।

''ডিনারটা ভাল হলে যে কোন ছুতো ধরেই বড় বড় চিন্তা এসে আমার মাথায় ভিড় কবতে শুরু করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এইমাত্র আপনি ও আমি রেস্তোরাঁর কাছে যে দুটি যুবককে দেখলাম তাদের একজন অপবজনকে অভিনন্দন জানাচ্ছে শুনতে পেলাম। 'অভিনন্দন, লোকে বলছে এরই মধ্যে তুমি বিখ্যাত হয়ে পড়েছ, সুনাম অর্জ্জন কবতে শুরু করেছ।' নিশ্চয় অভিনেতা অথবা সামান্য প্রতিবেদক। কিন্তু তাদের কথা ছেড়ে দিন। এখন আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে 'বিখ্যাত' এবং 'সুনাম' কথা দুটির অর্থ কি ? আপনি কি মনে করেন ? পুশ্‌কিন খ্যাতিকে বলেছেন কম্বলের উপর একটা উজ্জ্বল রংয়ের দাগ। আমরা সকলেই এটাকে বুঝেছি পুশ্‌কিনের মতই, অর্থাৎ কম-বেশী মানসিকতার দিক থেকে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই কথাটার কোন স্পষ্ট, বিচারসম্মত সংজ্ঞা দেন নি। সে রকম একটা সংজ্ঞার জন্য আমি অনেক কিছু দিতে রাজী।''

''কিন্তু সেটাকে আপনি এত দারুণভাবে চাইছেন কেন ?''

''দেখুন, খ্যাতি কি সেটা জানতে পারলে আমরা হয় তো সেটা অর্জ্জন করার উপায়টাও জানতে পাবতাম। দেখুন মশায়, আপনাকে বলা দরকার যে আমি যখন আরও ছোট ছিলাম তখন আমার সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে আমি খ্যাতির কামনা করতাম। বলতে পারেন জনপ্রিয়তা যেন আমাকে পেয়ে বসেছিল। তার জন্য আমি পড়াশুনা কবেছি, কাজ করেছি, রাত জেগেছি, স্বল্পাহারে কাটিয়েছি, আর নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করেছি। আমি বিশ্বাস করি, এ ব্যাপারে

যতটা নিরপেক্ষ বিচারক আমি হতে পারি, খ্যাতি অর্জনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সে সবই আমার ছিল। সর্বপ্রথম, আমি একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার ছিলাম। আমি রাশিয়াতে প্রায় কুড়িটি চমৎকার সেতু নির্মাণ করেছি, তিনটি শহরে জলসরবরাহ ব্যবস্থা চালু করেছি, রাশিয়া, ইংলণ্ড ও বেলজিয়ামে কাজ করেছি। দ্বিতীয়, আমার বিষয়ের উপর অনেকগুলি বিশেষ প্রবন্ধ লিখেছি। তৃতীয়, ছেলেবেলা থেকেই রসায়নশাস্ত্রে দুর্বল ছিলাম বলে অবসর সময়ে সেই বিজ্ঞানের অনুশীলন করে কয়েকটি জৈব ক্ষার তৈরীর উপায় উদ্ভাবন করেছি, আর সেই কারণে বিদেশের সব রসায়নশাস্ত্রের পাঠ্যপুস্তকে আমার নাম আপনি দেখতে পাবেন। সব সময়ই সিভিল সার্ভিসের আমি একজন কর্মকর্তা ছিলাম, রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলারের পদ পর্যন্ত পৌঁচেছি, আর আমার রেকর্ডে একটাও কালো দাগ পড়ে নি। আমার গুণাবলী ও কার্যকলাপের ফিরিস্তি নিয়ে আপনার মনোযোগের প্রতি অবিচার করব না, কেবল এইটুকুই বলব যে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির চাইতেই বেশী কাজ আমি করেছি। আর তাতে কি হয়েছে? আমি এখন বুড়ো হয়েছি, বলতে গেলে কা-কা করে ডাকার সময় এসে গেছে, অথচ আমার পরিচিতি নদীর ধার ধরে ধাবমান কালো কুকুরটার চাইতে বেশী কিছু নয়।''

''আপনি কি করে জানলেন? হয় তো আপনি খুবই পরিচিত।''

''হুম...সেটা এখনই পরীক্ষা হয়ে যাক।...বলুন, আপনি কি কোন দিন ক্রিকুনভের নাম শুনেছেন?''

তার উল্টোদিকের যাত্রী সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ভেবেই হেসে উঠলেন।

''না, আমি শুনি নি।'' তিনি জবাব দিলেন।

''ওটা আমারই নাম। একজন সংস্কৃতিবান মধ্যবয়সী মানুষ হয়েও আপনি কোনদিন আমার নাম শোনেন নি, আর সেটাই আমার বক্তব্যের অকাট্য প্রমাণ। স্পষ্টতই, খ্যাতি অর্জনের জন্য যে চেষ্টা আমার করা উচিত ছিল তা আমি করি নি। আমি ভুল পথে চলেছি। খ্যাতিকে আমি লেজের দিক থেকে ধরতে গিয়েছিলাম বলেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি।''

''তাহলে সঠিক পথ কোন্‌টা?''

''নরকই জানে। আপনি বলবেন ঃ মেধা? প্রতিভা? অনন্যতা? মোটেই না সুজন মশায়...আমার সঙ্গে তুলনায় যে সব মানুষ অপদার্থ, ঘিলুবিহীন, এমন কি একেবারে পচা, তারাও আমার সমানতালে দিন কাটিয়েছে, জীবনে সাফল্য অর্জন করেছে। তারা আমার চাইতে হাজার গুণ কম কাজ করেছে, আমার মত আপ্রাণ ছোটে নি, কোন সবিশেষ মেধা তাদের ছিল না। তারা খ্যাতির পিছনে ছোটেও নি, অথচ তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন! সব সময়ই সংবাদপত্রে ও আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের নাম আপনি পাবেন। আমার কথাগুলো যদি আপনার বিরক্তির কারণ না হয়ে থাকে, তাহলে এই প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত আপনাকে দেব।

''কয়েক বছর আগে আমি একটা সেতু নির্মাণ করেছিলাম একটা শহরে যার নাম ধরুন কে.। আপনাকে বলতে আমি বাধ্য যে সেই ছোট শহরটির একঘেয়ে জীবন ছিল প্রাণান্তকর। যদি মেয়েমানুষ আর তাস না থাকত, আমার বিশ্বাস তাহলে আমি পাগল হয়ে যেতাম। এখন এটা এক অতীত ইতিহাস—সংক্ষেপে বলতে গেলে একটি স্থানীয় গায়িকার সঙ্গে আমার একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তার কথায় সকলেই কেন যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত তা আমি জানি না, কিন্তু আমার মতে সে ছিল—কোন্ ভাষায় যে প্রকাশ করব? —একটি অতি সাধারণ, ভাসা ভাসা চরিত্রের মানুষ, পৃথিবীর এ রকম অনেক জনের একজন। সে ছিল হাল্কা বুদ্ধির মেয়ে, খেয়ালি, লোভী, বোকা, আর কি। সে খেত প্রচুর, পান করত প্রচুর, ঘুমত সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত। আমি মনে করি এগুলিই তার সব কাজ। সকলেই তাকে ছেনাল মনে করত—সেটাই ছিল তার জীবিকা—মানুষ যখন ভদ্রভাবে তার কথা উল্লেখ করত তখন তাকে বলত অভিনেত্রী ও গায়িকা। সেই কালে আমি ছিলাম রঙ্গমঞ্চের ভক্ত, আব সেই কারণেই 'অভিনেত্রী' উপাধিটি নিয়ে এই ফাঁকিবাজীর খেলায় আমি এতখানি ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। আমার সেই ওড়া পাখিটার কোন অধিকার ছিল না নিজেকে অভিনেত্রী বা গায়িকা বলার। সেই প্রাণীটির মধ্যে মেধা ও অনুভূতির লেশমাত্র ছিল না; এমন কি তাকে একটি দুঃখী জীব বলতেও আমি রাজী। আমি যতদূর বুঝি, তার গান ছিল ভীতিপ্রদ, আর তার এই 'শিল্পকলা' এত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে কারণ সে জানে কখন একটা পা নাচাতে হবে, আর ভদ্রলোক স্তাবকরা যখন সাজঘরে ঢুকে পড়ে তখন ও লজ্জায় লাল হয়ে যায় না। যথারীতি সে বেছে নেয় গানসহ অনূদিত পঞ্চরং যাত্রা এবং সেই সব পালা যাতে সে যুবকের আটোসাটো পোশাক পরে তার শরীরটাকে দেখাতে পারে। এক কথায়, বিরক্তিকর। আহা, এবার এই দিকে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

''মনে পড়ছে যেন গতকালই নবনির্মিত সেতুটির উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়েছিল। ধন্যবাদ জানানো হল, বক্তৃতা হল, টেলিগ্রামগুলি পড়া হল, এমনি অনেক কিছু হল। আমি দাঁড়িয়েছিলাম আমার সৃষ্টিকে আঁকড়ে ধরে, কি জানেন, ভয় হচ্ছিল উত্তেজনায় ও গর্বে আমার বুকটা বুঝি ফেটে যাবে। এটা তো অতীত ইতিহাস, কাজেই এ নিয়ে বিনয় করার কি আছে—তাই আপনাকে বলছি, সেতুটা ছিল একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। ছবির মত সেতু, দেখার মত। আর যে উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে গোটা শহর ভেঙে পড়েছিল, সেখানে কি উত্তেজিত না হয়ে থাকা যায়! দেখুন, আমি ভাবছিলাম, সব মানুষই চোখ মেলে আমাকেই দেখছে। ইচ্ছা করছিল, কোথাও লুকিয়ে পড়ি। কিন্তু আমার বিব্রত হবার কোন কারণই ছিল না মশায়; হায়, কর্তৃপক্ষীয় লোকজন ছাড়া অন্য কেউ আমার দিকে চোখই ফেরায় নি। নদীর তীরে মানুষের ভিড়, সকলেই বোকার মত সেতুটার দিকে তাকিয়েছিল, অথচ যে মানুষ সেটিকে তৈরী করেছে তার কথা তারা একবারও ভাবছিল না। কি

জানেন, সেই থেকেই আমাদের সম্মানিত জনসাধারণকে আমি ঘৃণা করি, তারা জাহান্নামে যাক। কিন্তু যা বলছিলাম। হঠাৎ জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। গুজব—গুজব—আর গুজব—জনসাধারণ হাসতে লাগল। গুঁতোগুঁতি করে সামনে এগোতে শুরু করল। আমি ভাবলাম, তারা আমাকে দেখতে পেয়েছে। নরক! ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, ভিড়ের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছে আমার গায়িকা আর একদল আল্‌সে লোক তার পিছনে ছুটছে ঃ আর সেই শোভাযাত্রা দেখতেই সকলে গলা বাড়িয়েছে! হাজার গলার ফিস্‌ফিস্‌ আওয়াজ ঃ 'ওই তো অমুক...কী দেখতে! কেউ কেউ আমাকেও দেখছে। দুটি বাউণ্ডুলে যুবক—মনে হল তারা নৈসর্গিক অঙ্কণশিল্পের স্থানীয় রসিক—আমাকে দেখে পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করে চুপি-চুপি বলল ঃ 'ওই যে মেয়েটির প্রেমিক!' কি রকম লাগছে? তারপরেই মুখভর্তি দাড়ি ও রেশমী টুপি-পরা যে উঠতি ধনী লোকটি কিছুক্ষণ ধরে আমার চারদিকে ঘুর-ঘুর করছিল সে আমার দিকে ফিরে বলল ঃ

''ও-পারে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে যে মহিলাটি তাকে আপনি চেনেন কি? তিনি মিস্‌ অমুক...তার গলাটা বাজে, কিন্তু গলার উপর তার সম্পূর্ণ দখল আছে।''

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ''আপনি কি বলতে পারেন এই সেতুটা কে বানিয়েছে?''

সে জবাব দিল, ''সত্যি বলছি, আমার কোন ধারণা নেই। কোন ইঞ্জিনীয়ার বা অন্য কেউ হবে।''

''আর আপনাদের শহরের এই উপাসনা-মন্দিরটি কে বানিয়েছে?'' আমি শুধালাম।

''সেটাও বলতে পারব না।''

''তারপর আমি পর পর জানতে চাইলাম, শহরের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক কে, শ্রেষ্ঠ স্থপতি কে, আর আমার সব প্রশ্নের জবাবেই সেই উঠতি বড়লোকটি জানাল যে তার জানা নেই।''

তারপর তাকে প্রশ্ন করলাম, ''আপনি কি বলতে পারেন এই গায়িকাটির বর্তমান প্রেমিক কে?''

''জনৈক ইঞ্জিনীয়ার, ক্রিকুনভ বা ঐ রকম কি যেন নাম।''

''সদাশয় মহাশয়, এবার বলুন, এটা আপনার কেমন লাগছে? কিন্তু এটাই সব নয়।...এখন আর এ জগতে ভদ্র গায়ক বা চারণকবি পাবেন না; সব জনপ্রিয়তার স্রষ্টা একমাত্র সংবাদপত্র। তাই অনুষ্ঠানের পরদিন সকালে স্থানীয় 'হেরাল্ড' পত্রিকার পাতা ওল্টালাম, আমার সম্পর্কে কি লিখেছে সেটা জানতে। সংবাদ-পত্রটাকে, তার চারটি পাতাই, তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, আর শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেলাম —হুররে! সেটাই পড়ে শোনাচ্ছিঃ 'গতকাল সুন্দর রৌদ্রস্নাত আবহাওয়ায় মাননীয় শাসনকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে নতুন সেতুর উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি হয়েছিল। অনুষ্ঠানে স্থানীয়

অধিবাসীদের প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল...' আর সব শেষে : 'অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল মিস অমুক, আমাদের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী, জনসাধারণের চোখের মণি, যৌবন ও সৌন্দর্যে দীপ্তিময়ী। বলাই বাহুল্য, তার উপস্থিতিতে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। ইত্যাদি, ইত্যাদি। আর আমার সম্পর্কে কেউ একটা কথাও বলল না! আধখানা কথাও নয়। হয়তো এটা আমার ক্ষুদ্রতারই পরিচয়, কিন্তু বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, সত্যি রাগে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল!

''নিজেকে এই ভেবে আমি সান্ত্বনা দিয়েছিলাম যে ছোট শহরের মূর্খতা সর্বজনবিদিত, এখানে এ ছাড়া অন্য কিছু আশাই করা যায় না। খ্যাতি খুঁজতে হয় রাজধানীতে, বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্রস্থলে। ঘটনাক্রমে, আমার একটি হাতের কাজ সেণ্ট পিতার্সবার্গের একটি প্রতিযোগিতায় পাঠিয়েছিলাম, আর তার তারিখটা তখন কাছিয়ে এসেছিল।

''অতএব এই ছোট শহরটিকে নমস্কার জানিয়ে সেণ্ট পিতার্সবার্গের পথে যাত্রা করলাম। কে শহর থেকে সেণ্ট পিতার্সবার্গ দীর্ঘ পথ, তাই একঘেয়েমি কাটাবার জন্য একটা আলাদা কামরা নিয়েছিলাম, আর আমার গায়িকাটিকেও অবশ্যই সঙ্গে নিয়েছিলাম। সারা পথ আমরা খেলাম, শ্যাম্পেনে চুমুক দিলাম, আর সময়টা ফূর্তিতেই কাটল। ক্রমে বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্রস্থলটি এসে গেল। প্রতিযোগিতার দিনেই সেখানে পৌঁছে গেলাম, আর জয়ের মালা পেয়ে খুশিও হলাম, আমার কাজটিকে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। হুর্‌রা! পরদিন সকালেই বেরিয়ে পড়লাম এবং সত্তর কোপেক দাম দিয়ে অনেকগুলি সংবাদপত্র কিনে ফেললাম। তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে গেলাম, একটা সোফায় গা এলিয়ে দিলাম, আমার কম্পিত হাত দু'খানিকে বশে এনে দ্রুত পাতা ওল্টাতে শুরু করলাম। একটা কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম—কিছুই নেই। আরেকটা দেখলাম—একটা কথাও নেই। শেষপর্যন্ত চতুর্থ কাগজে এই সংবাদটি পড়ে চমকে উঠলাম : 'মিস্ অমুক নাম্নী একজন সুপরিচিতা মফঃস্বলের অভিনেত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনে গতকাল কে শহর থেকে এখানে এসেছেন। আমরা জানাতে পেরে খুশি হয়েছি যে দক্ষিণের আবহাওয়ায় রঙ্গমঞ্চে তার সুন্দর উপস্থিতির খুবই সহায়ক হয়েছে...' আরও কি লেখা হয়েছিল আমার মনে নেই। তবে সেই সংবাদটির নীচে খুব ছোট হরফে এই কথাগুলি ছাপা হয়েছিল : 'গতকালের প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে ইঞ্জিনীয়ার অমুককে... বাস, ঐ পর্যন্ত। আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত আমার নামটাও তারা ভুল লিখেছিল--ক্রকুনভের বদলে কার্কুনভ। বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্রস্থলের তো এই দশা। কিন্তু এখানেই শেষ নয়...এক মাস পরে যখন সেণ্ট পিতার্সবার্গ ছেড়ে আসি তখন সবগুলি সংবাদপত্র তাদের অতুলনীয়া, ঈশ্বরস্বরূপা, উজ্জ্বল অভিনেত্রীকে নিয়ে কথার খৈ ফুটিয়ে দিল; তারা ইতিমধ্যেই আমার মেয়েমানুষটিকে তার নাম ও পদবী ধরেই ডাকতে শুরু করে দিয়েছিল, কেবলমাত্র মিস্ অমুক নয়।

''এর কয়েক বছর পরে আমি আবার মস্কো গিয়েছিলাম। আজ থেকে একশ' বছরেরও বেশী সময় ধরে যে বিষয়টি নিয়ে মস্কো ও তার সংবাদপত্রগুলো হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিল সেই প্রসঙ্গেই মেয়র একখানি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। অবসর সময়ে সেখানকার একটি জাদুঘরের প্রকাশ্য জনসমাবেশে আমি পাঁচটি বক্তৃতা করলাম, আর সংগৃহীত টাকাটা একটা দাতব্য ভাণ্ডারে দান করার নির্দেশ দিলাম। একটা শহরে অন্তত তিন দিনের খ্যাতির পক্ষে এটাই তো যথেষ্ট হওয়া উচিত, আপনি কি তাই মনে করেন না? হায়! মস্কোর একটা সংবাদপত্রেও আমাকে নিয়ে একটা শব্দও লেখা হল না। তারা সব কিছু নিয়েই লিখল—অগ্নিকাণ্ড, হাল্কা অপেরা, ঘুমন্ত ডেপুটি, মাতাল ব্যবসায়ী—সূর্যের নীচে যা কিছু আছে সে সব নিয়ে লিখল, কিন্তু একটি ফোঁটাও লিখল না কেবল আমার যোজনা ও আমার বক্তৃতা নিয়ে! আঃ মস্কোর প্রিয় জনসাধারণ! আমাকে চড়তে হল ঘোড়ায় টানা ট্রামে...গাড়ি যাত্রীতে বোঝাই—মহিলা, কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী, কে নেই—যদি নোয়ার নৌকো বলে কখনও কিছু থেকে থাকে একেবারে হুবহু তাই।

গাড়ির সব যাত্রী যাতে শুনতে পায় তাই আমি বেশ উচুঁ গলায়ই পাশের লোকটিকে বললাম, 'সকলে বলছে যে নানান ব্যাপারে দুমা একজন ইঞ্জিনীয়ারকে ডেকে এনেছেন। আপনি তো তার নামটা জানেন না, জানেন কি?''

''লোকটি নেতিবাচক ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল। বাকি যাত্রীরা যে ভাবে আমার দিকে তাকাল তাতেই যেন ফুটে উঠল 'আমি জানি না।'

''একটা আলোচনা শুরু করার চেষ্টায় আমি তবু বললাম, 'সকলে বলছে একজন পণ্ডিত মানুষ অমুক জাদুঘরে অনেকগুলি বক্তৃতা করে চলেছে, সকলেই বলছে, হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা।'

''কেউ মাথা নাড়ল না। বোঝা গেল, প্রায় কেউই আমার বক্তৃতার কথাটা শোনে নি, আর মহিলারা তো জানেই না যে সে রকম একটা জাদুঘর আছে। তাতেও তেমন কোন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু সুজন মশায়, হঠাৎ সবগুলো যাত্রী লাফ দিয়ে উঠে জানালায় জানালায় ভিড় করে দাঁড়াল। কি হল? কেন এই চাঞ্চল্য?

''পাশের লোকটি কনুই দিয়ে আমাকে গুঁতো মেরে বলল, 'দেখুন, দেখুন, ওই যে ভারাটে গাড়িতে উঠছে কালো চুলওয়ালা একটি ছেলে? ওই তো রাজা, পদযাত্রার বিখ্যাত চ্যাম্পিয়ন!'

''সঙ্গে সঙ্গে গোটা গাড়ি পদযাত্রা নিয়ে উত্তেজিতভাবে আলোচনা শুরু করে দিল; সেই সময়ে মস্কোবাসীদের মন ঐ নিয়েই মেতে উঠেছিল।

''আরও অনেক দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারি, কিন্তু আমি মনে করি যা দিয়েছি সেটাই যথেষ্ট। এখন, আমরা যদি বলি যে নিজের সম্পর্কে আমার ধারণাটাই ভুল, আসলে আমি একটি আত্মম্ভরী মানুষ, কারও নজর কাড়বার

মত যোগ্যতা আমার নেই, তাহলেও আমাব কথা ছেড়ে দিয়ে সাম্প্রতিক কালের এমন বহু মানুষের নাম আমি বলতে পারি যারা উল্লেখযোগ্য গুণ ও মনোনিবেশের অধিকারী হয়েও একান্ত অপরিচিতি নিয়েই মাবা গেছেন। রাশিয়াতে যত নাবিক, রসায়নবিদ, পদার্থবিদ, যন্ত্রবিদ, ও কৃষিবিদ আছে তাদের কথাই ধরুন না—তারা কি জনপ্রিয়? রাশিয়ার চিত্রশিল্পী, ভাস্কর ও লেখকরা কি শিক্ষিত সমাজেব কাছে পরিচিত? সাহিত্য জগতের একটি প্রধান মানুষ যে কঠোব পরিশ্রমী, যার মেধা আছে, তেত্রিশ বছব ধরে সম্পাদকের দরজায় হানা দিয়ে ফিরেছে, বস্তা-বস্তা কাগজ ফুরিয়ে ফেলেছে, মানহানির দায়ে অন্তত বিশবার তাব বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে, আর আজও সে যেখানে ছিল সেখানেই আছে! এমন একজন বড় লেখকের নাম করুন তো যিনি দ্বৈত যুদ্ধে মৃত্যুর জন্য, উন্মাদ হবার জন্য, নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত হবার জন্য, অথবা তাসেব খেলায় ঠকবাজী করার জন্য কুখ্যাতি অর্জন করার আগে বিখ্যাত হয়েছেন!"

তিনি এতই কুপিত হয়ে উঠলেন যে হাতেব আধ-খাওয়া চুরুটটা ফেলে দিয়ে উঠে বসলেন।

"হ্যাঁ মশায়," তিনি সক্রোধে বলেই চললেন, "অপর দিকে এমন শত শত গায়িকা, দৈহিক কসরৎকারী ও ভাঁড়েব নাম শোনাতে পাবি যাদের নাম শিশুরা পর্যন্ত জানে। তাহলেই বুঝুন!"

দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। এক ঝলক বাতাসেব সঙ্গে ভিতরে ঢুকলেন একটি বিষণ্ণ চেহাবার ভদ্রলোক ; তাব পরনে হাতাবিহীন ওভাবকোট, রেশমী টুপি ও নীল চশমা। ভদ্রলোক আসনগুলোর দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করে নিজের পথে চলে গেলেন।

এক কোণ থেকে একটি লোক নীচু গলায় বলল, "ওই লোকটি কে জানেন? তুলার কুখ্যাত ঠকবাজ তাসারু ; একটা ব্যাংকের মামলায় জড়িয়ে পড়েছে।"

মিঃ ক্রিকুনভ হেসে উঠলেন, "ওই দেখুন! সে তুলার ঠকবাজ তাসারুকে চেনে, কিন্তু আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন সে শিল্পী সেমিরাদস্কিকে, সুরকার শাইভস্কিকে, অথবা দার্শনিক সলোভিয়েভসকে চেনে কি না, তাহলে সে মাথা নাড়বে...বিরক্তিকর!"

প্রায় তিন মিনিট নীরবে কেটে গেল।

বিপরীত দিকের যাত্রীটি একটু কেশে জিজ্ঞাসা করলেন, "অনুমতি করেন তো এবার আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। পুশ্‌কভ নামটি আপনার পরিচিত?"

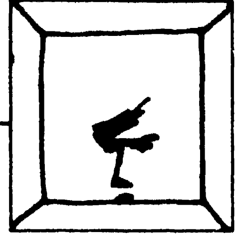
"কে পুশ্‌কভ! ভেবে দেখি....পুশ্‌কভ... না, কোন পুশ্‌কভকে আমি জানি না।"

বিপরীত দিকের লাজুক স্বভাবের যাত্রীটি বললেন, "ওটা আমার নাম। তাহলে এ নামটা আপনি জানেন না? অথচ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে রাশিয়ার

একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি অধ্যাপকের কাজ করছি...আমি একাডেমির একজন সদস্য...আমি কয়েকখানা বইও প্রকাশ করেছি..."

দুটি মানুষ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসিতে ফেটে পড়লেন।

১৮৮৬



একজন তরুণ অভিনেতা

Un Jeune Premier

তরুণ অভিনেতা ইয়েভ্‌গেনি আলেক্সয়েভিচ পোঝারভ একটি একহারা, সৌম্যদর্শন যুবক ; তার মুখটা ডিমের মত আর চোখের নীচটা ফুলো-ফুলো। মরশুমের সময় রাশিয়ার একটা দক্ষিণী শহরে পৌঁছেই সে কয়েকটি গণ্যমান্য পরিবারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় শুরু করে দিল।

সুন্দরভাবে পা দোলাতে দোলাতে নিজের লাল মোজা দেখিয়ে সে প্রায়ই বলে, "ওঃ হ্যাঁ, সিনর। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুইভাবেই একজন অভিনেতাকে জনতার উপর প্রভাব বিস্তার করতেই হয় ঃ প্রথম কাজটা সে সমাধা করে রঙ্গমঞ্চে নাট্যকলা প্রদর্শন করে, আর দ্বিতীয় কাজটা করে শহরের লোকজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় গড়ে তুলে। সত্যি বলছি মহাশয়, কোন পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে অভিনেতারা কেন যে সংকোচ বোধ করে আমি তো বুঝতে পারি না। কেন? ভোজ-সভা, পার্টি, জন্মদিনের কেক এবং জলসার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, নানা রকমের আমোদ-প্রমোদের কথাও বাদ দিচ্ছি, কিন্তু একজন অভিনেতা সমাজের উপর কতটা নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে একবার ভাবুনতো। কারও ঘন মস্তিষ্কের ভিতর আপনি একটি স্ফুলিঙ্গ জ্বেলে দিতে পেরেছেন এটা জানতে কার না ভাল লাগে? আর কী সব মানুষ! কী সব নারী! কোন বণিক-শ্রেণীর পরিবারের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব হল, মস্ত বড় সব বাড়ির মেয়ে-মহলে আপনি জাঁকিয়ে বসলেন, সব চাইতে তাজা, সুন্দর আপেলটি বেছে নিলেন—মুখটা তো আপনারই।"

এই দক্ষিণী শহরের অনেকের মধ্যে সে পরিচিত হল কারখানার মালিক মিঃ জাইবায়েভের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে। ইদানীংকালে যখনই সেই বন্ধুত্বের কথা মনে পড়ে তখনই তার নাক ও চোখ ঘৃণায় কুঁচকে ওঠে, বিরক্ত হয়ে ঘড়ির চেনটা নাড়াচাড়া করে।

একদিন জাইবায়েভ্‌দের বাড়িতে একটা জন্মদিনের পার্টি ছিল—নতুন বন্ধুদের ড্রয়িং-রুমে বসে অভিনেতাটি যথারীতি বক্তৃতা শুরু করল। তার চারদিকে হাতল-চেয়ারে ও সোফায় নানা শ্রেণীর লোক বসেছে ; সকলেই মন

দিয়ে শুনছে ; পাশের খাবার ঘর থেকে চা-পানের ও মেয়েদের হাসির হুল্লোর শব্দ ভেসে আসছে...পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে বসে প্রতিটি কথার পরে একবার করে রাম-মেশানো চাতে চুমুক দিয়ে এবং মুখে একটা সাময়িক বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে অভিনেতাটি বলছে তার রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের কাহিনী।

একটুখানি কৃপার হাসি হেসে সে বলল, "প্রধানত আমি একজন মফঃসলের অভিনেতা। কিন্তু কখনও কখনও রাজধানীগুলিতেও অভিনয় করেছি।.....প্রসঙ্গত, একবার কি ঘটেছিল সেটা আপনাদের বলতে চাই, কারণ ঘটনাটি সাম্প্রতিক মানসিকতারই পরিচায়ক। মস্কোতে আমার সাহায্য-রজনীর নাটকাভিনয়েব পরে আমার ভক্ত যুবকবা আমাকে এত ফুলের মালা দিয়েছিল যে সত্যি আমি তখন বুঝে উঠতে পারি নি সেগুলি দিয়ে কি করব। পরে যখন মনটা একটু স্থির হল তখন সেই সব মালা নিয়ে গেলাম কাঁচা সব্জির দোকানীব কাছে। অনুমান করতে পারেন তার ওজন কতটা হয়েছিল? দুই পুড আট পাউণ্ড! হা-হা-হা! টাকাটা খুব কাজে লেগে গিয়েছিল। সাধারণত অভিনেতারা প্রায়ই অভাবের মধ্যে থাকে। আজ এক শ' হাজার আছে তো পর দিনই শূন্য। আজ আমার একটুকরো রুটিও নেই, আবার কালই হয় তো জুটবে চিংড়ি ও খোকা ইলিশ, যত সব!"

গ্লাসে অল্পসল্প চুমুক দিতে দিতে শহরবাসীরা কান পেতে শুনল। আত্মতুষ্ট গৃহ-কর্তা তার শিক্ষিত, আকর্ষণীয় অতিথির সঙ্গে নিজের দূর-সম্পর্কের ভাই পাভেল ইগনাতেভিচ ফ্রিমভকে তাব সামনে এনে হাজির করল। স্থূলদেহ লোকটির বয়স চল্লিশের মত, পরনে লম্বা ফ্রক-কোট ও অত্যন্ত ঢোলা ট্রাউজার।

জাইবায়েভ বলল, "ইনি পাভেল ইগ্‌নাতেভিচ ক্লিমভ। রঙ্গমঞ্চকে ভালবাসেন, আর নিজেও মঞ্চে অভিনয় করে থাকেন। ইনি তুলার জমিদার।"

পোঝারভ ও ক্লিমভ গল্প জুড়ে দিল। দু'জনই জেনে খুশি হল যে তুলার এই জমিদারটি এক সময় সেই শহরটাতেই বাস করত যেখানে তরুণ অভিনেতাটি পর পর দুটো মরসুম অভিনয় করেছে। তারা কথা বলতে লাগল সেই শহর, পরিচিত মানুষজন ও রঙ্গমঞ্চ নিয়ে।

নিজের লাল মোজা জোড়া দেখিয়ে তরুণ অভিনেতাটি বলল, "কি জানেন, শহরটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। কত সুন্দর রাস্তা, সুন্দর পার্ক...আর কী চমৎকার সমাজ।"

"হ্যাঁ, চমৎকার সমাজ," জমিদারও স্বীকার করল।

"একটা বাণিজ্যিক শহর, কিন্তু বেশ সংস্কৃতিসমৃদ্ধ। যেমন ধরুন...টোলের অধ্যক্ষ, নায়েব, কর্মচারীবৃন্দ...পুলিশ ক্যাপ্টেনটিও খারাপ লোক নয়। ফরাসীরা যাকে বলে আঁচেঁতুর। আর মেয়েরা! আল্লাহ, কী সব মেয়ে!"

''হ্যাঁ, মেয়েরা সত্যি...''

''হয়তো আমার কিছুটা পক্ষপাতও রয়েছে। ব্যাপারটা হল, আপনার শহরে আমি ভালবাসার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড রকমের ভাগ্যশালী ছিলাম। আমি দশটা প্রেমের গল্প লিখতে পারতাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই প্রেমের গল্পটাই ধরুন!...আমি থাকতাম ইয়েগোরেভ্স্কায়া স্ট্রীটে, যে বাড়িটাতে সরকারী কোষাগার অবস্থিত।''

''একটা পলস্তারাহীন ইঁটের লাল বাড়ি?''

''হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাড়িটার পলাস্তরা ছিল না। আর তার কাছাকাছি কশেয়েভ-এর বাড়িতে, আমার স্পষ্ট মনে আছে, থাকত স্থানীয় সুন্দরী ভারেংকা...''

''ভারেংকা নিকোলায়েভনা নয় তো!'' প্রশ্নটা করেই ক্লিমভ খুশিতে ঝল্মল্ করে উঠল। ''সত্যি সে সুন্দরী! শহরের সেরা সুন্দরী!''

''শহরের সেরা সুন্দরী! প্রাচীন ভাস্কর্যের প্রতিমূর্তি, বড় বড় টানা চোখ, কোমর পর্যন্ত লম্বা এক ঢাল কালো চুল। এখন, সে আমাকে দেখেছিল 'হ্যামলেট'-এ...সে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল পুশকিনের তাতিয়ানার ধাঁচে। স্বভাবতই আমিও একটা পাল্টা চিঠি লিখলাম....''

পোঝারভ চারদিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিল সেখানে কোন মহিলা আছে কিনা, তারপর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনুশোচনাজ্ঞাপক হাসি হেসে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে চুপি চুপি বলতে লাগল ঃ

''একদিন নাটকের পরে বাড়ি ফিরে দেখি সেই মেয়েটি সোফায় বসে আছে। তারপর অনেক চোখের জল, অনেক ভালবাসাবাসি, চুমো খাওয়া...ওঃ, সে এক সুন্দর, জাদুময়ী রাত্রি। আরও দু'মাস আমাদের ব্যাপারটা চলল, কিন্তু আশ্চর্যের কথা সেই রাতটা আর কোন দিন ফিরে এল না। আঃ সে কী রাত মশায়!''

মুখটা লাল করে অভিনেতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্লিমভ বলে উঠল, ''দেখুন, আপনি কি বলতে চান? বারবারা নিকোলায়েভ্নাকে আমি খুব ভাল করে জানি। সে আমার ভাই-ঝি!''

পোঝারভ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। তার চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে এল।

দুঃখে দুই হাত ছাড়িয়ে ক্লিমভ আবার বলল, ''আপনি কি বলছেন মশায়? এই তরুণীটিকে আমি ভাল করে চিনি, আর...আর...আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি...''

অভিনেতা উঠে দাঁড়াল; কড়ে আঙুলটা বাঁ চোখের ভিতর ঠেলে দিয়ে তো তো করে বলল, ''কথাটা এভাবে বলার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত...অবশ্য...তার খুড়ো হয়ে—''

অন্য যে সব অতিথি এতক্ষণ খুশি মনে সব শুনছিল এবং মৃদু হাসি দিয়ে অভিনেতাকে পুরস্কৃত করছিল, এবার তারাও অপ্রস্তুত হয়ে চোখ

নামিয়ে নিল।

ভয়ংকর বিড়ম্বিত বোধ করে ক্লিমভ বলল, "না, না, ভাল চান তো আপনার কথাগুলি ফিরিয়ে নিন। দয়া করে..."

"এতে যদি আপনার অপমান হয়ে থাকে...বেশ তো", এই কথা বলে অভিনেতা অস্পষ্ট একটা ইঙ্গিত করল।

"স্বীকাব করুন যে আপনি মিথ্যে বলেছেন।"

"কে মিথ্যে বলেছে? না...আমি বলি নি।....কিন্তু বিড়ালটাকে থলি থেকে বের করেছি বলে আমি খুবই দুঃখিত।....সে যাই হোক, আপনার কথার সুরটা আমাব ভাল লাগে নি!"

হয় একটু ভনিতার জন্য অথবা অস্থিরচিত্ততার জন্য ক্লিমভ নীরবে ঘরময় পায়চারি কবতে লাগল। তার মাংসল মুখটা ক্রমেই অধিকতর রক্তবর্ণ হতে লাগল, আর গলার শিরাগুলি ফুলে উঠল। দুই-তিন মিনিট পায়চারি করার পবে অভিনেতার সামনে দাঁড়িয়ে সে সাশ্রু নয়নে বলল :

"দেখুন মশায়, ভারেংকাকে নিয়ে আপনি যে মিথ্যেই বলেছেন ভালমানুষের মত সেটা স্বীকার করুন। এইটুকু দয়া করুন!"

জোর কবে হেসে পা দুলিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে অভিনেতা বলল, "মজার ব্যাপাব! এটা...এটা সত্যি আমাব পক্ষে অপমানকর!"

"আমি ধরে নিচ্ছি, আপনি স্বীকার করবেন না?"

"সত্যি আমি বুঝতেই পাবছি না!"

"আপনি অস্বীকার করছেন, তাই তো? সেক্ষেত্রে আমিও দুঃখিত...আমাকে অপ্রীতিকব ব্যবস্থাই নিতে হবে...দেখুন মশায়, আমি এখানে ও এই মুহূর্তে আপনাব মুখে একটা চড় কসাব, অথবা অন্যথায় আপনি যদি সম্মানিত লোক হন তাহলে ভালমানুষের মত আমার দ্বৈতযুদ্ধের আহ্বানকে গ্রহণ করুন...গুলিব পথেই এটা মীমাংশা হয়ে থাকে!"

"আপনার যেমন খুশি! ঘৃণার সঙ্গে হাতটা দুলিয়ে তরুণ অভিনেতাটি খেঁকিয়ে উঠল। "আপনার যা খুশি!"

অত্যন্ত বিব্রত হওয়ায় অতিথিবৃন্দ এবং গৃহকর্তা কেউ বুঝতে পারছে না কি কর্তব্য। ক্লিমভকে একান্তে ডেকে নিয়ে তারা তাকে অনুরোধ করল, সে যেন কোন গোলমাল শুরু না করে। অনেকগুলি বিস্মিত মুখ দরজায় উঁকি মারল...তরুণ অভিনেতাটি অস্থিরভাবে দু' একটা কথা বলে এমন ভাব দেখাল যেন যে বাড়িতে তাকে অপমান করা হয়েছে সেখানে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়; আর তারপরেই টুপিটা তুলে নিয়ে কারও কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই সে বেরিয়ে গেল।

বাড়ি ফেরার সময় তরুণ অভিনেতাটি সারাটা পথ বিদ্রূপের হাসি হাসল আর কাঁধ ঝাঁকাল, কিন্তু নিজের ঘরে ঢুকে সোফায় হাত-পা টান করতেই সে ভয়ংকর অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

ভাবতে লাগল, "লোকটা জাহান্নামে যাক। দ্বৈতযুদ্ধ নিয়ে আমি চিন্তিত

নই, সে আমাকে মেরে ফেলবে না, কিন্তু আসল কথা হল, দলের সকলেই ব্যাপারটা জানতে পারবে আর তারা ভাল করেই জানে যে আমি মিথ্যেই বলেছি। বিরক্তিকর! সারা রাশিয়া আমাকে নিয়ে হাসি-তামাসা করবে....

শুয়ে শুয়ে এই সব ভাবল, চুরুট টানল, তারপর স্নায়ুগুলিকে শান্ত করার জন্য বাইরে যাবে স্থির করল।

সে আরও ভাবল, "সেই অভদ্র লোকটার সঙ্গে আমার একবার কথা বলা উচিত, তার মোটা মাথার মধ্যে এ কথাটা ঢোকানো উচিত যে সে একটি মূর্খ ও মাথামোটা...তাকে আমি মোটেই ভয় করি না।"

জাইবায়েভের বাড়ির সামনে থেমে সে জানালার দিকে তাকাল। তখনও আলো জ্বলছে, আর লেন্সের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল লোকজন চলাফেরা করছে।

"আমি অপেক্ষা করব" অভিনেতাটি স্থির করল।

রাতটা অন্ধকার ও ঠাণ্ডা। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। পোঝারভ বাতি-থামের গায়ে হেলান দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দুশ্চিন্তার হাতে সঁপে দিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কাক-ভেজা ভিজে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল।

দুটোর সময় অতিথিরা বাড়ি ছেড়ে যেতে শুরু করল। সকলের শেষে দরজায় দেখা দিল তুলার জমিদার স্বয়ং। সশব্দে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পথে নেমে সে ভারী গ্যালোশের শব্দ তুলে হাঁটতে শুরু করল।

পথেই তাকে ধরে ফেলে তরুণ অভিনেতাটি বলতে শুরু করল, "মাফ করবেন...ঠিক এক মুহূর্ত সময়..."

ক্লিমভ থামল। অভিনেতাটি হাসল, ইতস্তত করল, তারপর কোন রকমে বলল : "আমি...আমি স্বীকার করছি...আমি মিথ্যে বলেছিলাম।"

আবার রেগে লাল হয়ে ক্লিমভ বলল, 'ওঃ, না মশায়, আপনাকে এটা প্রকাশ্যে বলতে হবে। ব্যাপারটাকে আমি এ অবস্থায় রেখে দিতে পারি না..."

কিন্তু আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি! আমি মিনতি করছি—বুঝতে পারছেন না? আমি ভিক্ষা চাইছি কারণ একটা দ্বৈতযুদ্ধ হলেই নানা কথা উঠবে, বুঝতেই পারছেন, আর আমি একজন কর্মী...আমার সহকর্মী অভিনেতারা আছেন....তারা কি মনে করবেন তা ঈশ্বরই জানেন..."

তরুণ অভিনেতাটি চেষ্টা করল নিজেকে অবিচলিত রাখতে, হাসতে এবং নিজেকে খাড়া রাখতে, কিন্তু প্রকৃতি বাদ সাধল, তার গলা কাঁপতে লাগল, অনুতাপে তার চোখ পিট্ পিট্ করতে লাগল, মাথাটা নীচু হয়ে গেল। দীর্ঘ সময় ধরে অনুচ্চ কণ্ঠে সে কিছু বলেই গেল। ক্লিমভ তার কথাগুলি সব শুনল, তা নিয়ে চিন্তা করল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

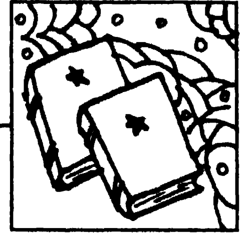
সে বলল, "আচ্ছা, সব ঠিক আছে। ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করবেন। দেখুন যুবক, পরে আর কখনও মিথ্যে বলবেন না। মিথ্যের মত আর কিছুই মানুষকে এত নীচ করতে পারে না...হ্যাঁ মশায়। আপনি যুবক, আপনার

শিক্ষা-দীক্ষা আছে....

তুলার জমিদার সহৃদয় পিতৃসুলভ সুরে তাকে একটা উপদেশামৃত শুনিয়ে দিল, আর তরুণ অভিনেতাটি কান পেতে শুনল, সলাজ ভঙ্গীতে হাসল।...উপদেশ শেষ হলে সে দাঁতে দাঁত চেপে মাথা নোয়াল এবং ইতর লোকের মত কাঁপতে কাঁপতে হোটেলে ফিরে গেল।

আধ ঘন্টা পরে বিছানায় উঠে তবে তার মনে হল বিপদ কেটে গেছে ; তার মন মেজাজও চাঙ্গা হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারটা তার দিক থেকে নিরাপদেই শেষ হয়েছে বুঝেতে পেরে সহজ, খুশি মনে সে বিছানার মধ্যে ঢুকে পড়ল, অচিরেই ঘুমিয়ে পড়ল, আর গভীর নিদ্রায় ডুবে রইল সকাল দশটা পর্যন্ত।

১৮৮৬



জীবনের একটি তুচ্ছ ঘটনা

One of Life's Trivia

পিতার্সবার্গের বাড়িওয়ালা নিকোলাই ইলিচ বেলায়েভের বয়স বত্রিশ বছর, বেশ নাদুস-নুদুস গোলাপি চেহারা, রেসের মাঠে তাকে প্রায়ই দেখা যায়। এক পড়ন্ত বিকেলে সে ওল্‌গা আইভানভ্‌না ইর্নিনার সঙ্গে দেখা করতে গেল। যুবক বেলায়েভ এই ইর্নিনার সঙ্গেই পাপ-জীবন যাপন করছে, অথবা তার নিজের ভাষায় বললে, একটা একঘেয়ে, বিরক্তিকর ব্যাপারকে টেনে নিয়ে চলেছে। সঠিকভাবে বলা যায়, এই আকর্ষণীয় ও উৎসাহব্যাঞ্জক প্রেম-কাহিনীর প্রথম পৃষ্ঠাগুলি অনেক দিন আগেই পড়া হয়ে গেছে ; এখন সে কাহিনীটি গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে, তাতে নতুন বা আকর্ষণীয় কিছু নেই।

ওল্‌গা আইভানভ্‌না বাড়ি ছিল না ; তাই আমাদের নায়ক বসার ঘরের সোফায় শুয়েই অপেক্ষা করতে লাগল।

"শুভ সন্ধ্যা, নিকোলাই ইলিচ," একটি শিশু-কণ্ঠ তার কানে এল। "মাম্মি শিগগিরই ফিরবে। সোনিয়াকে নিয়ে সে দর্জির দোকানে গেছে।"

সেই একই বসার ঘরে একটা কোচে শুয়েছিল ওল্‌গা আইভানভ্‌নার ছেলে আলিওশা, আট বছরের সযত্নপালিত একহারা ছেলেটি, খাটো ভেলভেটের জ্যাকেট ও লম্বা কালো মোজায় ছবির মত পোশাক পরানো। সাটিনের কুশনের উপর শুয়ে ছেলেটি সম্প্রতি সার্কাসে দেখা খেলোয়াড়টির নকল করে একবার এ-পায়ে, একবার অন্য পায়ে সমানে লাথি মেরে চলেছে। খেলাটা দেখাতে দেখাতে দুটি ছোট পা ক্লান্ত হয়ে পড়ায় দুই হাতে ভর দিয়ে বা লাফ দিয়ে উঠে হাতের উপর ভর দিয়ে পা তোলার খেলা শুরু

করল। এ সবই সে করতে লাগল বেশ গুরুগম্ভীরভাবে; তারপর জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে আর শাঁই-শাঁই শব্দ করছে।

বেলায়েভ বলল, ''হ্যালো বন্ধু, তুমি? তুমি এখানে আছ আমি খেয়াল করি নি। মাম্মি ভাল আছে?''

ডান হাত দিয়ে বাঁ পায়ের আঙুল চেপে ধরে একটা অস্বাভাবিক ভঙ্গী করে আলিওশা শরীরটা উল্টিয়ে লাফ দিয়ে উঠে ঝালর-লাগানো একটা বড় বাতি-ঢাকনার পিছন থেকে বেলায়েভের দিকে তাকাল।

আলিওশা কাঁধটা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল, ''কি আর বলব? আসলে তুমি তো জান, মাম্মি কোন সময়েই ভাল থাকে না। সে তো মেয়েমানুষ, আর মেয়েমানুষদের সব সময়ই কোন না কোন ব্যথা থাকেই নিকোলাই ইলিচ।''

বেলায়েভ মুখ ফিরিয়ে আলিওশার মুখটাকে ভাল করে দেখতে লাগল।

ওল্‌গা আইভানভ্‌নার সঙ্গে দীর্ঘ দিনের পরিচয় হলেও ছেলেটির দিকে সে কখনও নজর দেয় নি, তার অস্তিত্বকেই উপেক্ষা করে এসেছে ঃ ছেলেটি আগাগোড়াই তার চোখের সামনে আছে, কিন্তু তার ভূমিকা নিয়ে সে কোন দিনই মাথা ঘামায় নি।

সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় আলিওশার বিবর্ণ কপাল ও সরল কালো দুটি চোখ বেলায়েভকে স্মরণ করিয়ে দিল তাদের প্রেম-কাহিনীর প্রথম দিককার ওল্‌গা আইভানভ্‌নার কথা। ছেলেটির উপর তার কেমন মায়া পড়ে গেল।

সে বলল, ''এখানে এস তো বাবাই। তোমাকে ভাল করে দেখি।''

আলিওশা লাফিয়ে কোচ থেকে নেমে বেলায়েভের কাছে ছুটে গেল।

ছেলেটির চামড়াসর্বস্ব কাঁধের উপর হাত রেখে নিকোলাই ইলিচ বলল, ''আচ্ছা? জীবনটা কেমন লাগছে?''

''আমি জানি না...আগেই ভাল ছিল।''

''কেন?''

''কারণটা খুবই সরল। আগে সোনিয়া ও আমাকে শেখানো হত কেবল পিয়ানো বাজনা ও লেখাপড়া, আর এখন আমাদের ফরাসী কবিতাও মুখস্ত করতে দেওয়া হয়। তুমি নাপিতের কাছে গিয়েছিলে, তাই না?''

''হ্যাঁ, সেদিন গিয়েছিলাম।''

''আমিও তাই ভেবেছি। তোমার দাড়িটা আগের চাইতে ছোট দেখছি। আমি ওতে হাত দিতে পারি কি? ব্যথা লাগবে কি?''

''না, একটুও লাগবে না।''

''আচ্ছা, একটা চুল ধরে টানলে লাগে, আর অনেকগুলো চুল ধরে টানলে লাগে না—এটা কেমন করে হয়? এটা খুব মজার, তাই না? কি জান, তুমি জুল্‌ফি রেখো। এখানে কামিও,...আর এখানে মুখের দুই পাশে চুল গজাতে দিও...''

ছেলেটি বেলায়েভকে জড়িয়ে ধরে তার ঘড়ির চেন নিয়ে খেলা করতে শুরু করল।

বলল, "আমি যখন স্কুলে যাব, মাম্মি আমাকে একটা ঘড়ি কিনে দেবে। আমি তাকে বলব যেন তোমার মত একটা চেনও কিনে দেয়...বাঃ লকেটটা কী সুন্দর! ড্যাডিরও ঠিক এই রকম একটা আছে, কেবল তোমারটার এখানে সরু টার্ন-টান, আর তারটায় আছে অক্ষর। আর ভিতরে আছে মাম্মির একটা ছবি। ড্যাডির এখনকার চেনটা অন্য রকম, ফিতের মতন..."

"তুমি কি করে জানলে? তুমি ড্যাডিকে দেখেছ?"

"কে, আমি?...ওঃ না...আমি..."

আলিওশার মুখটা লাল হয়ে উঠল, সে ভয়ংকর বিব্রত বোধ করল, কারণ তার মিথ্যে বলাটা ধরা পড়ে গেছে। আঙুলের নখ দিয়ে সে লকেটটাকে আঁচড়াতে লাগল। বেলায়েভ কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে

"ড্যাডির সঙ্গে তোমার দেখা হয়?"

"না...না!"

"আমাকে খোলাখুলি বল, সত্য বল। তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি তুমি মিথ্যে বলছ। কোন গোপন কথা একবার বলে ফেললে আর তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। আমাকে বল, তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়? আমাকে বন্ধু ভেবে বল, হয়?"

আলিওশা ভাবতে লাগল।

"মাম্মিকে বলে দেবে না তো?" সে প্রশ্ন করল।

"তা কেন বলব?"

"কথা দিলে?"

"কথা দিলাম।"

"বুকের উপর ক্রুশ-চিহ্ন আঁকো।"

"বাবাঃ, কী নাছোড়বান্দা! তুমি আমাকে কি ভেবেছ?"

আলিওশা তার দিকে তাকিয়ে চুপি-চুপি বলল ঃ

"ঈশ্বরের দোহাই, মাম্মিকে বলো না...মানে, কাউকেই বলো না কারণ এটা গোপন কথা। মাম্মি জানতে পারলে আমরা সকলেই ফেঁসে যাব—আমি, সোনিয়া ও পেলাগেয়া। তাহলে শোন। সোনিয়া ও আমি প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার ড্যাডিকে দেখতে যাই। ডিনারের আগে পেলাগেয়া যখন আমাদের নিয়ে বেড়াতে যায় তখন আমরা আপ্‌ফেলের কফির দোকানে চলে যাই আর ড্যাডি আমাদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করে থাকে। সে সর্বদাই একটা ছোট নিজস্ব ঘরে বসে; সেখানে তার জন্য রাখা আছে একটা শ্বেতপাথরের টেবিল আর পিঠবিহীন হাঁসের মত একটা ছাইদানি..."

"আর তোমরা সেখানে কি কর?"

"কিছু না। প্রথমে আমরা পরস্পরকে হ্যালো বলি, তারপর টেবিলে বসে পড়ি আর ড্যাডি আমাদের কফি ও প্যাস্ট্রি খাওয়ায়। জান, সোনিয়া মাংসের পুর দেওয়া প্যাস্ট্রি পছন্দ করে, আর আমি সেটাই ঘৃণা করি; আমি

পছন্দ করি বাঁধাকপি ও ডিমের পুর দেওয়া প্যাস্ট্রি। আমরা এত পেট ভরে খেয়ে ফেলি যে বাড়িতে ফিরে ডিনারে বসে আমরা যত বেশী পারি খেতে চেষ্টা করি যাতে মাম্মি কিছু বুঝতে না পারে।''

''তোমরা কি নিয়ে কথা বল?''

''ড্যাডির সঙ্গে তো? সব কিছু নিয়ে। সে আমাদের চুমো খায়, আদর করে, কত রকমের ধাঁধা শোনায়। জান, সে বলে আমরা যখন বড় হব তখন সে আমাদের নিয়ে নিজের কাছে রাখবে। ব্যাপারটা সোনিয়ার পছন্দ নয়, কিন্তু আমি খুব ইচ্ছুক। মাম্মিকে অবশ্য পাব না কিন্তু তাকে চিঠি লিখব। আমি তো ছুটির দিনে তার সঙ্গে দেখা করতে পারব, সেটা খুব মজার ব্যাপার হবে, তাই না? ড্যাডিও বলে, আমাকে একটা ঘোড়া কিনে দেবে। সে পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে দয়ালু মানুষ। আমি জানি না কেন মাম্মি তাকে বলে না এখানে এসে আমাদের সঙ্গে থাকতে, আর কেনই বা তার সঙ্গে দেখা করতে আমাদের নিষেধ করেছে। জান, সে মাম্মিকে খুব ভালবাসে। সব সময় আমাদের জিজ্ঞাসা করে মাম্মি কেমন আছে, কি করছে। মাম্মি যখন অসুস্থ হয় তখন সে এইভাবে দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে ঘরময় ছুটে বেড়ায়। সে সব সময় বলে, আমরা যেন মাম্মির বাধ্য থাকি, তাকে শ্রদ্ধা করে চলি। শোন, এ কথা কি সত্যি যে আমরা গরিব ছেলেমেয়ে?''

''গরিব কেন?''

''ড্যাডি তো তাই বলে। সে বলে, 'তোমরা গরিব ছেলেমেয়ে' ('you poor children')। তার মুখে কথাটা শুনে অবাক হয়ে যাই। সে বলে আমরা গরিব, সে গরিব, আর মাম্মিও গরিব; তোমাদের জন্য আর তোমাদের মাম্মির জন্য তোমরা প্রার্থনা করো।''

আলিওশার চোখ পড়ল খড়ভর্তি পাখিটার উপর; সে আরও দুঃখিত হয়ে উঠল।

বেলায়েভ বলল, ''আচ্ছা, আচ্ছা, তাহলে তোমরা এই করে বেড়াচ্ছ। কফির দোকানে দেখা-সাক্ষাৎ করছ। আর বলতে চাও যে মাম্মি সেটা জানে না?''

''কেমন করে জানবে? পেলাগেয়া কোনদিন বলবে না। গত পরশু ড্যাডি কয়েকটি ন্যাসপাতিও খেতে দিয়েছিল। একেবারে জ্যামের মত মিষ্টি। আমি দুটো খেয়েছিলাম।''

''হুম...আচ্ছা, আর....তোমাদের ড্যাডি কি আমার সম্পর্কে কিছু বলে?''

''তোমার সম্পর্কে? আমি কি বলব...''

আলিওশা বেলায়েভের মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল।

''বিশেষ কিছু বলে না।''

''তবু মোটামুটি কি বলে?''

''তুমি কিছু মনে করবে না?''

''বাজে কথা বলো না। সে আমাকে গালাগালি করে না, করে কি?''

''সে তোমাকে গালাগালি করে না, কিন্তু তোমার উপর তার খুব রাগ। সে বলে তোমার জন্যই মাম্মি এত দুঃখী, আর তুমি...তুমিই মাম্মির জীবনটা নষ্ট করেছ। সত্যি সে খুব অদ্ভুত। আমি বারে বারে বলি তুমি কত দয়ালু, আর সে কেবলি মাথা নাড়ে।''

''সে সত্যি বলেছে যে আমি তোমাদের মাম্মির জীবনটা নষ্ট করেছি?''

''হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এতে কিছু মনে করো না নিকোলাই ইলিচ!''

বেলায়েভ উঠে দাঁড়াল, এক মিনিট চুপ করে থাকল, তারপর ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘৃণার হাসি হেসে সে আস্তে আস্তে বলতে লাগল, ''এটা যেমন অদ্ভুত তেমনি হাস্যকর। সবটাই তার দোষ, আর এখন আমি তার জীবন নষ্ট করছি, কি রকম বুঝছ? ওই নির্দোষ মেষশাবকটির দিকে তাকিয়ে দেখ! তুমি কি বলছ যে সে সত্যি বলেছে, আমি তোমার জীবনটা নষ্ট করেছি?''

''হ্যাঁ, কিন্তু তুমিই তো বললে এতে তুমি কিছু মনে করবে না। তাহলে?''

''আমি কিছু মনে করি নি, আর এটা তোমাদের ব্যাপারও নয়। না, এটা সত্যি হাস্যকর! যত দোষ আমার!''

সামনের ঘন্টাটা বেজে উঠল। আলিওশা চমকে উঠে বেরিয়ে গেল। এক মিনিট পরে তার মা ওল্‌গা আইভানভ্‌না সোনিয়াকে নিয়ে বসার ঘরে ঢুকল। মনের আনন্দে লাফাতে লাফাতে তাদের পিছন-পিছন ঢুকল আলিওশা—দুই হাত দুলিয়ে জোর গলায় একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে। বেলায়েভ ঘাড়টা নেড়েই আবার পায়চারি করতে লাগল।

ঘৃণায় নাকটা ঝেড়ে সে বলতে লাগল, ''স্বভাবতই আমি ছাড়া আর কাকেই বা দোষ দেওয়া যায়? তার কোন দোষ নেই! সে তো আহত স্বামী!''

''কী সব বলছ তুমি?'' ওল্‌গা আইভানভ্‌না শুধাল।

''আমি কি বলছি? তাহলে কান পেতে শোন তোমার প্রিয় স্বামীটি কি বলে বেড়াচ্ছে? আমি একটা ইতর, পাজি, আমিই তোমার ও ছেলেমেয়েদের জীবন নষ্ট করেছি! তোমাদের সব্বাইকে অসুখী করেছি, আর কেবল আমিই ভয়ংকর রকমের সুখী!''

''আমি কিছুই বুঝতে পারছি না নিকোলাই। এ সব কি বলছ?''

বেলায়েভ আঙুল বাড়িয়ে আলিওশাকে দেখিয়ে বলল, ''তাহলে এই ছোট্ট ভদ্রলোকটির কথাগুলি শোন!''

ছেলেটি লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, তার সারা মুখ বিকৃত হয়ে গেল।

সজোরে ফিস্ ফিস্ কবে সে মিনতির সুরে বলল, ''নিকোলাই ইলিচ!

বলো না!"

ওলগা আইভানভ্না বিহ্বল চোখে আলিওশার দিকে তাকাল, তারপরে বেলায়েভের দিকে, এবং আবার আলিওশার দিকে।

বেলায়েভ বলল, "যাও, তাকে জিজ্ঞাসা করগে। তোমার পেলাগেয়া, সেই বৃদ্ধারাম, সে ওদের কফির দোকানে নিয়ে যায়, সেখানে ওদের প্রিয় বাপুর সঙ্গে ওদের দেখা করিয়ে দেয়। কিন্তু কথা তো তা নয়, আসল কথা হল, তাদের প্রিয় বাপু একজন শহিদ, আর আমি একটা পাজি, ইতর যে তোমাদের দু'জনের জীবনকেই নষ্ট করে দিয়েছে!"

আলিওশা আর্তনাদ করে উঠল, "নিকোলাই ইলিচ! তুমি কথা দিয়েছিলে!"

বেলায়েভ এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিল, "আঃ, কথা দেওয়ার চাইতে এটা অনেক বড় কথা। এই ভণ্ডামি, এই মিথ্যা অপবাদই আমাকে বিরক্ত করে তুলেছে!"

"আমি বুঝতে পারছি না," ওল্গা বলল ; তার দুই চোখ চিকচিক করে উঠল। "আলিওশা, আমাকে বল, তোমরা কি তোমাদের বাবার সঙ্গে দেখা কর?"

কথাগুলি আলিওশার কানে গেল না ; সন্ত্রাসে সে বেলায়েভের দিকে তাকিয়ে রইল।

"এটা হতেই পারে না'! আমি গিয়ে পেলাগেয়াকে জিজ্ঞাসা করছি", এই কথা বলে ওল্গা আইভানভ্না ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আলিওশা কাঁপতে কাঁপতে বলল, "তুমি তো আমাকে কথা দিয়েছিলে!"

তাকে সরে যেতে বলে বেলায়েভ আবার পায়চারি শুরু করল। নিজের ক্ষোভের মধ্যেই সে ডুবে গিয়েছিল, আর আগের মতই ছেলেটির অস্তিত্বের কথা একেবারেই ভুলে গেল। সে একজন বয়স্ক গম্ভীর মানুষ, ছোট ছেলেদের নিয়ে, তাদের অনুভূতি নিয়ে মাথা ঘামানো তার কাজ নয়। আর আলিওশা এক কোণে বসে ভয়ার্ত গলায় ফিস্ফিস্ করে সোনিয়াকে জানাল, কি ভাবে তাকে প্রতারণা করা হয়েছে। সে কাঁপতে লাগল, তো-তো করে কথা বলল, তারপর কাঁদতে বসল ঃ প্রতারণার সঙ্গে এই তার প্রথম নিষ্ঠুর পরিচয়। এর আগে সে জানত না যে মিষ্টি ন্যাসপাতি, প্যাস্ট্রি ও দামী ঘড়ি ছাড়াও এ পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু আছে যার নাম ছোটদের শব্দকোষে নেই।

১৮৮৬

প্রতিশোধ



Revenge

লেভ সাভিচ তুমানভ একজন সাধারণ নগরবাসী; তার একটা মোটামুটি মূলধন, একটি যুবতী স্ত্রী ও একখানি টাক মাথা ছিল। একদিন সে এক বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে "ভিন্ট" খেলছিল। একটা দান খুব খারাপভাবে হেরে গিয়ে তার গায়ে খুব ঘাম দেখা দিল, আর তখনই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল যে অনেকক্ষণ সে মদে চুমুক দেয় নি। টেবিল থেকে উঠে বেশ ভারিক্কী চালে পা টিপে টিপে অন্য সব টেবিলের ফাঁক দিয়ে ড্রয়িং-রুমটা পার হয়ে গেল। সেখানে যুবক-যুবতীরা নাচছিল। মৃদু হেসে একটি ক্ষুদে ওষুধ-বিক্রেতা যুবকের কাঁধে একটা খুড়োমশায়সুলভ চাপড় দিয়ে সে ছোট দরজাটা পেরিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে পড়ল। একটা গোল টেবিলের উপর মদের বোতল ও ভদ্‌কার কাঁচের পাত্র সাজানো ছিল।...অন্য সব খাবারের মধ্যে তার চোখে পড়ল একটা ডিসের উপর রয়েছে আধ-খাওয়া নোনা হেরিং মাছ, পেঁয়াজ ও অন্য সব্জি দিয়ে সাজানো। লেভ সাভিচ একটা গ্লাসে ভদ্‌কা ঢেলে নিল, শূন্যে এমনভাবে আঙুল নাচাতে লাগল যেন এখনই একটা বক্তৃতা শুরু করবে, ভদ্‌কায় চুমুক দিল, একটা কাঁটা হাতে নিয়ে হেরিংয়ের বুকে বসিয়ে দিল, আর তখনই...শুনতে পেল দেয়ালের ওপারে কারা যেন কথা বলছে।

"হয় তো, হ্যাঁ হয় তো, সেটা কখন হবে?" একটি নারী-কণ্ঠ সাগ্রহে বলল।

কণ্ঠস্বর লেভ সাভিচের চেনা। "এ তো আমার স্ত্রী। তার সঙ্গে কে আছে?"

"যখন তোমার ইচ্ছে, প্রিয় সখী আমার", জবাবটা এল একটা গম্ভীর পুরুষ-কণ্ঠে। "আজ হবে না, কালও সারা দিন আমি ব্যস্ত থাকব..."

লেভ সাভিচ আবার জনৈক বন্ধুকে চিনতে পারল, "এ তো দেগ্‌তিয়ারেভ! ব্রুটাস, তুমিও! বৌ কি তাকেও ভুলিয়েছে? কী একটা অতৃপ্ত কুক্কুরী। একটা ভালবাসার ব্যাপার ছাড়া সে কি একটা দিনও বাঁচতে পারে না!"

পুরুষ-কণ্ঠ বলতে লাগল, "কাল সারা দিন আমি ব্যস্ত থাকব। যদি মনে কর, কাল আমাকে একটা চিরকুট লিখতে পার।...তাহলে আমি কত খুশি হব, সুখী হব...আমাদের মধ্যে পত্রালাপের একটা ব্যবস্থা করা উচিত। একটা কোন উপায় বের করতেই হবে। চিঠি ডাকে ফেলাটা ঠিক হবে না। আমি যদি তোমাকে ডাকে চিঠি লিখি তাহলে তোমার ধেড়ে মোরগটা ডাকপিয়নের

কাছ থেকে সেটা হাতিয়ে নিতে পারে, আর তুমি যদি আমাকে ডাকে চিঠি লেখ তাহলেও আমার অনুপস্থিতিতে আমার অর্ধাঙ্গিনীর হাতেই চিঠিটা পড়বে আর সে অবশ্যই সেটা খুলবে।''

''তাহলে আমরা কি করব ?''

''একটা কোন ভাল ফন্দি বার করতে হবে। চাকরের হাত দিয়ে চিঠি পাঠানোও চলবে না, কারণ তোমার ''সোভানেভিচ'' নিশ্চয় দাসি-চাকরদের ভয় দেখিয়ে হাত করে রেখেছে। এখন সে কি করছে, তাস খেলছে ?''

''হ্যাঁ, সব সময় হারে, প্রেমে ভাগ্যবান!'' দেগ্‌তিয়ারেভ হেসে উঠল। ''এখন আমার মতলবটা মন দিয়ে শোন তো সোনা। কাল ঠিক ছ'টার সময় আমি পার্কের ভিতর দিয়ে হাঁটব! সেখানে সুপারভাইজারের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হবে। আর তুমি করবে কি, আঙুর কুঞ্জের বাঁ দিকে যে শ্বেত পাথরের পাত্রটা আছে তার মধ্যে একটা চিরকুট রেখে দেবে। আমি কি বলতে চাই তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। ছ'টার একটু আগেই কাজটা করার চেষ্টা করো, কিন্তু এক মিনিটও পরে যেন না হয়...''

''হ্যাঁ, হ্যাঁ...''

''ব্যাপারটা হবে রোমান্টিক, উত্তেজনাময় ও নতুন।....তোমার ভুঁড়িওয়ালা স্বামী বা আমার স্ত্রী কেউ জানতে পারবে না। কাজটা করবে তো ?''

লেভ সাভিচ আর এক গ্লাস ভদ্‌কা খেয়ে তাসের ঘরে ফিরে গেল। যে আবিষ্কারটা সে এই মাত্র করেছে সেটা তাকে আঘাত দেয় নি, বিস্মিত করে নি, এমন কি তার রাগও হয় নি। এমন দিন ছিল যখন সে রাগে ফুঁসত, গণ্ডগোল বাঁধাত, শাপান্ত করত, এমন কি স্ত্রীকে কামড়ে দিত, সে সব অনেককাল আগের কথা, ও সব নিয়ে মাথা ঘামানো সে ছেড়ে দিয়েছে, এখন স্ত্রীর চপল ব্যাপার-স্যাপার দেখে চোখ পিট্ পিট্ করে মাত্র। তাহলেও ব্যাপারটা খুবই অপ্রীতিকর। তাকে তুর্কী মোরগ, সোবাকেভিচ ও ভুঁড়িওয়ালা বলায় তার অভিমানে লেগেছে।

''দেগ্‌তিয়ারেভ লোকটা কী অভদ্র,'' লেভ সাভিস হিসাবটা লিখতে লিখতেই বলল। ''পথে দেখা হলেই এমন ভাব দেখাবে যেন কত বড় বন্ধু সে, মুখ টিপে থাকবে, পেটে চাপড় মারবে, আর এদিকে ছুরি শানাচ্ছে! আমার সামনে বলে সে আমার প্রিয় বন্ধু, আর আড়ালে আমাকে বলে ভুঁড়িওয়ালা আর তুর্কী মোরগ...''

খেলায় যত হারছে ততই তার আহত গর্বে আরো আঘাত লাগছে...

রাগে হাতের চকটা ভেঙে সে ভাবতে লাগল, নাকভরা শিক্‌নি, হঠাৎ নবাব...সোভাতেভিচ বলাটা তোমাকে দেখিয়ে দিতাম, কেবল এ নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না তাই...''

নৈশভোজনের সময় দেগ্‌তিয়ারেভের মুখটা তার সহ্য হচ্ছিল না; তার উপরে হতভাগাটা অনবরত নানা প্রশ্ন করে তাকে বিরক্ত করতে লাগল :

সে কি জিতেছে? তাকে এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন? এমন সব প্রশ্ন। এত স্পর্ধা তার যে পরিবারের বন্ধু হবার অধিকারে লেভ সাভিচের স্ত্রীকে পর্যন্ত তিরস্কার করতে লাগল—কেন সে তার এত ভাল স্বামীটির স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেয় না। আর তার স্ত্রীটিও নির্বিকার হয়ে সলজ্জ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে এমন নির্দোষভাবে কথা বলতে লাগল যে স্বয়ং শয়তানও তাকে বিশ্বাসঘাতিনী বলে সন্দেহ করতে পারবে না।

বাড়িতে ফিরে লেভ সাভিচ এতই ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হয়ে পড়ল যেন খেতে বসে সে একটা রবারের পুরনো বুট খেয়ে এসেছে, বাদুরের একটুকরো নরম মাংস নয়। হয় তো রাগ চেপে সে ঘুমতেই চলে যেত, কিন্তু তার স্ত্রীর বক্‌বকানি ও হাসি তাকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে দিল না যে সে একটা তুর্কী মোরগ, একটা ভুঁড়িওয়ালা জীব, একটা সোবাকেভিচ।

সে ভাবল, "আমার উচিত ছিল পাজিটার মুখে একটা থাপ্পড় কসিয়ে দেওয়া, সকলের সামনে তার মুখোশটা খুলে দেওয়া!"

তার ইচ্ছা করছিল এখনই তাকে দু'ঘা মারবে, দ্বৈতযুদ্ধে তাকে চটক পাখির মত গুলি করবে, তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করবে, অথবা শ্বেত পাথরের পাত্রটার মধ্যে কিছু পচা, দুর্গন্ধ বস্তু—যেমন একটা মরা ইঁদুর ফেলে আসবে। আর একটা কাজ করলেও তো মন্দ হয় না। সেই পাত্র থেকে স্ত্রীর চিঠিটা চুরি করে তার বদলে সেখানে রেখে আসবে "তোমার ভালবাসার নোংরা পুরুষ" স্বাক্ষর-করা একটা নোংরা কবিতা, অথবা ঐ রকম একটা কিছু।

এই রকম সব মনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে লেভ সাভিচ অনেকক্ষণ শোবার ঘরে পায়চারি করল। হঠাৎ সে থেমে গিয়ে কপাল চাপড়াতে শুরু করল:

"বাহবা! পেয়ে গেছি!" খুশিতে তার মুখটা জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠল। "চমৎকার ফন্দি! চমৎকার!"

তার স্ত্রী নির্বিবাদে ঘুমিয়ে পড়লে সে লেখার টেবিলে গিয়ে বসল এবং অনেক চিন্তা-ভাবনা করে নিজের হাতের লেখাটা একেবারে পাল্টে, নতুন নতুন ভুল বানান তৈরী করে নীচের পংক্তিগুলো লিখল:

"বণিক দুনিলভকে: প্রিয় মহাশয়, আজ ১২ই ফেব্রুয়ারি ছ'টার মধ্যে যদি আপনি পার্কের দ্রাক্ষাকুঞ্জের বাঁদিকের শ্বেতপাথরের পাত্রটির মধ্যে দু'শ' রুব্‌ল্ রেখে না যান তাহলে আপনাকে খুন করা হবে এবং দাহ্য পদার্থের গুদামটিকে বোমা মেরে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হবে।"

চিঠি লেখা শেষ করে লেভ সাভিচ আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

দুই হাত ঘসতে ঘসতে নীচু গলায় বলল, "খারাপ হয় নি, অ্যা? চমৎকার! এর চাইতে ভাল প্রতিশোধের কথা স্বয়ং শয়তানও ভাবতে পারত না। স্বভাবতই, বণিক ভয় পাবে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেবে, পুলিশও প্রস্তুত হয়ে ছ'টার সময় ঝোপের মধ্যে অপেক্ষা করবে, আর যখনই

হতভাগাটা চিঠির জন্য হাতটা ঢোকাবে তখনই তারা চেপে ধরবে! সে একেবারেই হতবুদ্ধি হয়ে যাবে! আর সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হবার আগেই তার কারাবাস ও দুঃখের পাত্রটি পূর্ণ হবে।....বাহবা!''

লেভ সাভিচ খামের উপর একটা স্ট্যাম্প লাগিয়ে নিজেই ডাক-বাক্সে ফেলে দিল। মুখে খুশির হাসি ফুটিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল, কত ভাল ভাল স্বপ্ন দেখল। সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজের ফন্দিটার কথা মনে করে একটা খুশির সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীর থুতনিটাও একবার নেড়ে দিল। কাজে যাবার পথে এবং অফিসে বসে সারাটা দিন সে হাসতে লাগল আর তার ফাঁদে পড়ে দেগ্‌তিয়ারেভের দুর্দশার কথাটা কল্পনা করতে লাগল।...

শেষ পর্যন্ত উৎকণ্ঠা সহ্য করতে না পেরে পাঁচটার একটু পরেই আপিস থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং শত্রুপক্ষের ভয়ংকর দুরবস্থাটা নিজের চোখে দেখার জন্য দ্রুত পা ফেলে পার্কে গিয়ে হাজির হল।

সেখানে একটি পুলিশকে দেখে খুশি মনে ভাবল, ''আহা!''

দ্রাক্ষাকুঞ্জে পৌঁছে একটা ঝোপের আড়ালে বসে পাত্রটার দিকে নজর রেখে অপেক্ষা করতে লাগল। তখন তার অধৈর্য বর্ণনার অতীত।

ঠিক ছ'টার সময় দেগ্‌তিয়ারেভ এসে হাজির হল। দেখেই বোঝা গেল যুবকটি বেশ খোস মেজাজেই আছে। রেশমী টুপিটাকে বাঁকা করে মাথায় দিয়েছে; বোতাম-খোলা ওভারকোট ও ওয়েস্টকোটের ফাঁক দিয়ে তার আত্মাটাই যেন উঁকি মেরে আছে। শিস্ দিতে দিতে সে একটা চুরুট টানছে...

লেভ সাভিচ মনের আনন্দে বলল, ''আর একটু অপেক্ষা কর! তুর্কী মোরগ ও সোবাকেভিচের ঠ্যালাটা এবার বুঝবে!''

দেগ্‌তিয়ারেভ পাত্রটার কাছে গিয়ে সহজভাবেই তার মধ্যে হাতটা ঢোকাল... লেভ সাভিচ একটু উঠে একদৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল। দেগ্‌তিয়ারেভ একটা ছোট খাম্ তুলে নিল, অবাক হয়ে সেটা দেখতে লাগল, কাঁধ ঝাঁকাল, ইতস্তত করেও খামটা ছিঁড়ল, আবার কাঁধ ঝাঁকাল, আর কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত হাঁ করে রইল ঃ খামের মধ্যে দু'শ' রুবলের নোট!

কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে দেগ্‌তিয়ারেভ নোটগুলো ভাল করে দেখল। শেষ পর্যন্ত সভয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে টাকাটা পকেটে ভরল; বলল ঃ চমৎকার!

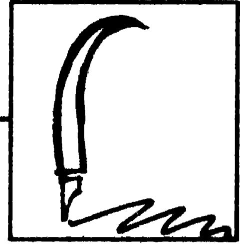
বেচারি লেভ সাভিস কথাটা শুনল। সারা সন্ধ্যা, এমন কি তার পরেও, দুলিনভের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দোকানের সাইন-বোর্ডের দিকে ঘুষি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সক্রোধে বলতে লাগল ঃ

''ভীতু! সস্তা ফেরিওয়ালা ! ভীতুর ডিম। পেটটা মোটা, কিন্তু মনটা মুরগির বাচ্চার!''

১৮৮৬

একটি অসাধারণ মানুষ

An Extraordinary Man



মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে। রেশমী টপ-হ্যাট ও গলাবন্ধ গ্রেটকোট পরা একটি লম্বা ভদ্রলোক ধাত্রী মারিয়া পেত্রভ্না কোশ্‌কিনার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। হেমন্ত রাত্রির অন্ধকারে তার মুখ বা হাত কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু যে ভাবে সে গলা খাঁকারি দিয়ে দরজার ঘণ্টাটা বাজাল তাতেই বোঝা গেল যে সে একজন নির্ভরযোগ্য, সবল ও আকর্ষণীয় ব্যক্তি। তিনবাব ঘণ্টা বাজাবার পরে দরজাটা খুলে গেল, দেখা দিল মারিয়া পেত্রভ্না স্বয়ং। তার পরনে একটা সাদা ঘাঘ্‌রা আর একটা পুরুষের ওভারকোট গলা পর্যন্ত ঢাকা। তার হাতে সবুজ ঢাকনা দেওয়া ছোট বাতি; তার সবুজ আভা ছড়িয়ে পড়েছে স্ত্রীলোকটির ঘুম-কাতর চিত্র-বিচিত্র মুখে, অস্থিসর্বস্ব গলায়, এবং টুপির নীচ থেকে ঝুলে-পড়া লাল্‌চে চুলে।

"আমি কি ধাত্রীর সঙ্গে দখো করতে পারি?" ভদ্রলোক শুধাল।

"আমিই ধাত্রী। আপনার জন্য কি করতে পারি?"

ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকল। মারিয়া পেত্রভ্না দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি দীর্ঘদেহ, একহারা মানুষ, যুবক বলা চলে না, কিন্তু মুখটা সুন্দর ও কঠিন, দুই পাশে মোটা জুলফি।

"আমি কলেজিয়েট এসেসর কিরিয়াকভ। আপনি আমার স্ত্রীকে দেখতে চলুন—এই কথা বলতেই আমি এসেছি। দয়া করে তাড়াতাড়ি চলুন..."

ধাত্রী বলল, "ঠিক আছে। আমি পোশাক পরে আসছি। দয়া করে বসবার ঘরে অপেক্ষা করুন।"

গ্রেটকোটটা খুলে কিরিয়াকভ বসবার ঘরে ঢুকল। ছোট সবুজ বাতিটার সামান্য আলো ছড়িয়ে পড়েছে তালি-মারা সাদা আবরণীতে ঢাকা সস্তা আসবাবপত্রের উপর, সাধারণ সব ফুলদানির উপর, আর জানালা বেয়ে ওঠা লতাগুলির উপর। ঘরে জেরানিয়াম ও কার্বলিক এসিডের গন্ধ। দেয়াল-ঘড়িটা এত আস্তে টিক্‌-টিক্‌ করছে যেন একটি অপরিচিত লোক দেখে লজ্জা পেয়েছে।

পাঁচ মিনিট পরে যথাযথ পোশাক পরে, মুখে জল দিয়ে ঘুমের আভাষটুকু মুছে ফেলে মারিয়া পেত্রভ্না বসবার ঘরে ঢুকে বলল, "আমি তৈরী স্যার। চলুন, যাওয়া যাক।"

"হ্যাঁ, আমাদের তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে", কিরিয়াকভ বলল। "ভাল কথা, এটা কোন অবাস্তব প্রশ্ন নয়: আপনার কাজের জন্য কত পারিশ্রমিক নেবেন?"

স্নিগ্ধ হেসে মারিয়া পেত্রভ্না বলল, "ও, সত্যি আমি জানি না। যা হয় দেবেন..."

ধাত্রীর দিকে উদাসীন, কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিরিয়াকভ বলল, "না এ সবই আমি পছন্দ করি না। মূল্যটা স্থির হওয়া দরকার। আপনার যেটা প্রাপ্য সেটা আমি নিতে চাই না, আর আপনিও নিতে চান না যেটা আমার প্রাপ্য। কাজেই ভুল বোঝাবুঝি এড়াবার জন্য গোড়াতেই মূল্যটা স্থির করে নেওয়াই ভাল।"

"সত্যি আমি জানি না...বাঁধা-ধরা কোন মূল্য নেই।"

"আমি নিজে কাজ করি, আর অপরের কাজের দাম দিতেই আমি অভ্যস্ত। অন্যায় আমি পছন্দ করি না। আমি যদি জানতে পারি যে আপনাকে কম দিয়েছি, অথবা আপনি আমার কাছ থেকে বেশী নিয়েছেন, তাহলে দুটোই আমার কাছে সমান অপ্রীতিকর। তাই বলছি, আপনার প্রাপ্যটা বলে দিন।"

"কিন্তু, কি জানেন, প্রাপ্যটা হের-ফের হয়ে থাকে।"

"হুম, আপনার এই ইতস্তত ভাবটা আমি মোটেই বুঝি না, তবু আমিই প্রাপ্যটা বলে দিচ্ছি। আমি আপনাকে দুই রুব্‌ল্‌ দিতে পারি।"

"সে কি, একটু বিবেচনা করুন! কী লজ্জা, সত্যি...দুই রুব্‌ল্‌ নেওয়ার চাইতে বরং বিনা পয়সায় করে দেব! যদি আমার দামটাই জানতে চান তো বলি—পাঁচ রুব্‌ল্‌।"

"দুই রুব্‌ল্‌, তার এক কোপেকও বেশী নয়। যেটা আপনার ন্যায্য পাওনা তাতে আমি হাত দিতে চাই না। কিন্তু আপনাকে বেশী দেবার ইচ্ছাও আমার নেই।"

"সেটা আপনার যেমন ইচ্ছা, কিন্তু দুই রুবলের জন্য আমি যাচ্ছি না..."

"কিন্তু আইন অনুসারে আপনি যেতে আপত্তি করতে পারেন না।"

"ঠিক আছে, বিনা পয়সাতেই যাব।"

"সেটাও আমি চাই না। সব কাজই প্রাপ্তিযোগ্য। আমি নিজে কাজ করি, আমি সেটা মেনে চলি।"

"দুই রুবলের জন্য আমি যাব না", মারিয়া পেত্রভ্না মৃদু প্রতিবাদ জানাল। "আপনি যদি বলেন তো বিনা পয়সায় যেতে পারি।"

"সেক্ষেত্রে আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত...শুভ রাত্রি।"

বসবার ঘরের বাইরে পর্যন্ত কিরিয়াকভকে অনুসরণ করে ধাত্রী বলল, "আপনি যদি এটাকেই আঁকড়ে ধরতে চান তাহলে তিন রুব্‌ল্‌ পেলে আমি যাব।"

কিরিয়াকভ ভুরু কুঁচকে মেঝের দিকে চোখ রেখে পুরো দুটো মিনিট চিন্তা করল; তারপর দৃঢ়স্বরে বলল, "না!" বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। বিষণ্ন, বিচলিত ধাত্রীও সদর দরজায় তালা লাগিয়ে শোবার ঘরে ফিরে

গেল।

বিছানায় শুয়ে সে ভাবতে লাগল, ''লোকটি সুন্দর ও শ্রদ্ধেয়, কিন্তু বড় অদ্ভুত।''

আধ ঘণ্টাও পার হয় নি, দরজার ঘণ্টাটা আবার বেজে উঠল। ধাত্রী উঠে দেখল, সেই কিরিয়াকভ আবার এসেছে।

সে বলল, ''এখানে শৃংখলার বড়ই অভাব। ধাত্রীদের ঠিকানা কেউ জানে না...ওষুধ-বিক্রেতারা জানে না, পুলিশ জানে না, দারোয়ানরা জানে না, কেউ না। ফলে আপনার শর্ত মেনে নিতেই আমি রাজী হয়েছি। আমি আপনাকে তিন রুব্‌ল্‌ই দেব, কিন্তু আপনাকে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, যখন আমি কোন চাকর রাখি অথবা কাউকে দিয়ে কোন রকমের কাজ করিয়ে নেই তখন টাকা দেবার সময় কোন রকম বাড়তি পাওনা, বকশিস, বা ঐ ধরনের কোন কিছুর কথাই বলা চলবে না। প্রত্যেকেরই যা প্রাপ্য তাই পাবে।''

কিরিয়াকভের কথাবার্তা মারিয়া পেত্রভ্‌না খুব বেশী সময় ধরে শোনে নি, কিন্তু এর মধ্যেই সে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়েছে; তার মনে হচ্ছে, লোকটির একঘেয়ে মাপা কথাগুলি তার মনের উপরে একেবারে চেপে বসেছে। পোশাক পরে সে লোকটির সঙ্গে বেরিয়ে গেল। সে রাতে বাতাস বইছিল না, কিন্তু এতই ঠাণ্ডা ও গুমোট ছিল যে পথের আলোগুলি প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। পায়ের নীচে কাদায় প্যাচ্‌-প্যাচ্‌ শব্দ। মারিয়া পেত্রভ্‌না অন্ধকারেই ভাল করে তাকাল, কিন্তু অপেক্ষমান কোন গাড়িই দেখতে পেল না।

প্রশ্ন করল, ''বোধহয় খুব দূর নয়?''

''বেশী দূর নয়।''

তারা একটা রাস্তা পার হল, দ্বিতীয়টা, তৃতীয়টা...কিরিয়াকভ আগে আগে হাঁটছে; তার প্রতিটি পদক্ষেপে নির্ভরতা ও সঠিক চলার ইঙ্গিত।

আলাপ শুরু করার জন্য ধাত্রী বলল, ''কী ভয়ানক আবহাওয়া!''

লোকটি একেবারে চুপচাপ। সে চেষ্টা করছে প্রত্যেকবারই একটা মসৃণ পাথরের উপর পা ফেলতে যাতে তার গ্যালোশ ছিঁড়ে না যায়। সেটা ধাত্রীর নজর এড়ায় নি। অবশেষে, অনেক পথ পার হবার পরে তারা বাড়িতে পৌঁছে গেল। হল-ঘর থেকেই একটা রুচিসম্মতভাবে সাজানো মস্ত বড় ড্রয়িং-রুম ধাত্রীর নজরে পড়ল। কোন ঘরে জনপ্রাণী নেই। এমন কি যে শোবার ঘরে মহিলাটি প্রসবের জন্যে শুয়ে আছে সেখানেও কেউ নেই। এসব সময়ে যারা এসে ভিড় করে দাঁড়ায় সেরকম কোন আত্মীয়-স্বজন বা বৃদ্ধাকেও সে দেখতে পেল না। কেবলমাত্র রাঁধুনিকে দেখতে পেল। লোকটা বোকা, চোখে-মুখে ভয় ফুটে উঠেছে। পাগলের মত ছুটাছুটি করছে। উঁচু গলার বিলাপ কানে আসছে।

তিন ঘণ্টা কেটে গেল। মারিয়া পেত্রভ্‌না রোগিনীর বিছানার পাশে বসে

তাকে চুপিচুপি কি যেন বলছে। এরই মধ্যে দুটি নারীর মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। এ-কথা সে-কথা ও নবজাত শিশুকে নিয়ে তারা বেশ কিছুক্ষণ ধরে বক্‌বক্‌ করছে।

''আপনি কথা বলবেন না,'' কথাটা বলেও সে বৃষ্টির মত অবিরাম প্রশ্ন করতে লাগল।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গল, স্বয়ং কিরিয়াকভ শোবার ঘরে ঢুকল শান্ত ও মর্যাদানুরূপভাবে পা ফেলে। একটা চেয়ারে বসে জুল্‌ফিতে হাত বুলাতে লাগল। একটানা নীরবতা...মারিয়া পেত্রভ্‌না ভদ্রলোকটির সুন্দর অথচ নিরাসক্ত কাঠের মত মুখের দিকে ভীরু চোখে তাকাল; তার মুখ থেকে কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। লোকটি কিন্তু একদম চুপ, অন্য চিন্তায় মগ্ন। আর অপেক্ষা করতে না পেরে ধাত্রী নিজেই কথা শুরু কববে বলে স্থির করল এবং এ রকম ক্ষেত্রে সাধারণত যা বলা হয়ে থাকে সেই ভাবেই বলল ঃ

''দেখুন, প্রভুকে ধন্যবাদ, এবার পৃথিবীতে আরও একটি লোক বাড়ল!''

মুখের কাষ্ঠ-কঠিন ভাব অক্ষুণ্ণ রেখেই কিবিয়াকভ বলল, ''হ্যাঁ, ভাবতে ভাল লাগে। কিন্তু বাড়তি সন্তান-সন্ততি এলে বাড়তি টাকাও তো থাকা চাই। শিশুটি তো খেয়ে-পরে এসে জন্ম নেয় না।...''

তাব স্ত্রীর মুখে একটা অপরাধীব ভাব ফুটে উঠল, যেন ভদ্রলোকটির অনুমতি ছাড়াই অথবা কেবল নিজের খেয়াল-খুশিমতই একটি জীবিত প্রাণীকে সে প্রসব করেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কিরিয়াকভ উঠে দাঁড়াল, তারপর সমমর্যাদায় বেরিয়ে গেল।

ধাত্রী মন্তব্য করল, ''আরে, কম করে বললেও সে তো একজন ভাগীদার। কী কঠোর, মুখে একটু হাসি নেই।''

কিরিযাকভের স্ত্রী বলল, ''উনি আগাগোড়াই এই রকম...উনি সৎ, ন্যায়বান, বিবেচক, মিতব্যয়ী, কিন্তু এসব কিছুতেই তার এত অসাধাবণ মাত্রাধিক্য যে সাধারণ মানুষের দম বন্ধ হযে আসে। আত্মীয়-স্বজনবা ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, চাকর-বাকর এক মাসের বেশীদিন থাকে না। বন্ধু বলতে কেউ নেই, আর স্ত্রী ও সন্তানরা প্রতি পদক্ষেপে প্রাণের ভয় নিয়ে চলে। উনি তাদের মারধোর করেন না, চেঁচামেচি করেন না, ক্রটি-বিচ্যুতির তুলনায় তার গুণাবলী অনেক বেশী, কিন্তু উনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে সকলেই বেশী সুস্থ বোধ করে, বেশী সুখী হয়। কেন যে এমন হয় তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।''

আবার শোবার ঘরে ঢুকে কিরিয়াকভ বলল, ''এই গামলাগুলোকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে ভাঁড়ার ঘরে রেখে দিতে হবে। এই বোতলগুলোও সরিয়ে রেখে দিতে হবে ঃ ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।''

সে যা বলল সেটা খুবই সরল ও সাধারণ কথা, কিন্তু কোন আপাতদৃষ্টি

কারণ ছাড়াই ধাত্রী তাতেই জড়সড় হয়ে পড়ল। সেও লোকটিকে ভয় করতে শুরু করেছে ; তার পায়ের শব্দ শুনলেই সে চমকে ওঠে। সকালে চলে যাবার সময় কিরিয়াকভের ছোট ছেলেটিকে সে দেখতে পেল। ছেলেটির ম্লান মুখ, মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল, স্কুলে পড়ে। খাবার ঘরে বসে প্রাতরাশ খাচ্ছিল। তার সামনে দাঁড়িয়ে কিরিয়াকভ তার মাপা, একঘেয়ে গলায় বলে চলেছে ঃ

"কেমন করে খেতে হয় সেটা যখন জান, তখন কেমন করে কাজ করতে হয় সেটাও তোমাকে জানতে হবে। এই তো মুখভর্তি চা খেয়েছ, কিন্তু এ চিন্তাটাই হয়তো তোমাব মাথায় কখনও ঢোকে নি যে চা কিনতে পয়সা লাগে, আর সে পয়সা পরিশ্রম করে রোজগার করতে হয়। খাও আর ভেবে দেখ..."

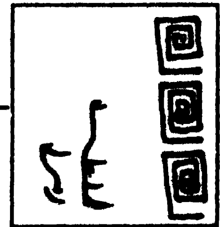
ধাত্রী ছেলেটির বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকাল, আর তার মনে হতে লাগল বাতাসটা বড় বেশী ভারী, এবং এই অসাধারণ লোকটির দুর্বহ উপস্থিতি সহ্য করতে না পেরে আর এক মিনিটের মধ্যেই ঘরের দেয়ালটি ভেঙে পড়বে। ভয়ে আত্মহারা হওয়া ছাড়াও এই লোকটির প্রতি তীব্র ঘৃণার তাড়নায় মারিয়া পেত্রভ্না তার পুঁটুলিটা তুলে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

বাড়ির অর্ধেক পথ গিয়ে তার মনে পড়ল, তার প্রাপ্য তিন রুব্‌ল্ নিয়ে আসতে ভুলে গেছে ; এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল, তারপর সে চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে হাঁটতে শুরু করল।

১৮৮৬

স্বামী

Husband



বদ্ধ জলাশয়-তীরবর্তী শহর কে.তে পৌঁছে রাতের মত যাত্রা-বিরতি করল এন. অশ্বারোহী সৈন্যদল। অফিসারদের এই ধরনের রাত্রিবাসের ঘটনা শহরবাসীদের মধ্যে অত্যন্ত উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে থাকে। দোকানীরা স্বপ্ন দেখে ঃ তাদের যে সমস্ত পচা কাসব ও "সেরা সার্ডিন" অন্তত দশ বছর ধরে তাকের উপর পড়ে আছে এবার সেগুলো বিক্রি হয়ে যাবে ; মদের দোকানী ও অন্যসব খাদ্য পরিবেশনকারীরা সারারাত দোকান খুলে রাখে ; স্থানীয় সামরিক ঘাটির কম্যাণ্ডার, তার কেরাণি ও অন্য সব অধস্তন কর্মচারীরা সবচাইতে ভাল ইউনিফর্ম গায়ে চড়ায় ; পুলিশ পাগলের মত ছুটাছুটি করে ; আব মহিলাদের মধ্যে এমন হৈচৈ পড়ে যায় যা বর্ণনার অতীত।

সেনাদল আসছে শুনেই কে. শহরের মহিলারা মোরব্বা তৈরী বন্ধ করে দিল, ফুটন্ত কড়াই পড়ে রইল উনুনের উপর, আর সকলেই ছুটল রাস্তার দিকে। তারা যে যথাযথভাবে সাজগোজ করে নি, উড়নচণ্ডীর মত দেখাচ্ছে, ভীষণ রকমের হাঁপাচ্ছে—সব কিছু ভুলে গিয়ে তারা জলস্রোতের মত ছুটে চলেছে আগতপ্রায় সেনাদলের উদ্দেশ্যে, আর কান ভরে শুনছে সামরিক বাজনা। তাদের বিবর্ণ, উৎসাহপূর্ণ মুখ দেখে মনে হবে এই আওযাজ বুঝি আসছে স্বর্গ থেকে, সৈন্যদের পিতলের ভেঁপু থেকে নয়।

মনের আনন্দে তারা চেঁচাচ্ছে—''একটা সেনাদল আসছে! সেনাদল!''

যে অপরিচিত সেনাদল হঠাৎই তাদের শহরে এসে পড়েছে এবং পরদিন ভোরেই চলে যাবে তারা তাদের কোন্ কাজে আসবে? পরে স্কোয়ারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই হাত পিছনে রেখে অফিসাররা যখন সেনাদলের বাসস্থান নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত তখন সব মহিলা গিয়ে গোয়েন্দা-অফিসারের স্ত্রীর বৈঠকখানায় বসে একে অন্যকে পাল্লা দিয়ে সেনাদলের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন কেমন করে এরই মধ্যে তারা জেনে ফেলেছে যে, কম্যাণ্ডার বিবাহিত কিন্তু নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বাস করে না। ক্যাপ্টেনের স্ত্রী প্রতি বছর একটি মৃত সন্তান প্রসব করে, এ-ডি-কং কোন এক কাউন্টেসের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং সত্যি সত্যি আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছে। তারা সকলের সম্পর্কেই সব কথা জেনে ফেলেছে। মুখভর্তি ব্রণের দাগ একটি লাল শার্টপরা সৈন্য যেই জানালার পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল তখনই তারা তাকে সম্পূর্ণ চিনে ফেলল যে সে হচ্ছে সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট রিম্‌জভের আর্দালি. মালিকের জন্য ধারে কিছুটা ভদকা কিনতে এ-দোকান সে-দোকান ছুটে বেড়াচ্ছে। আর অফিসারদের তো তারা দেখছে শুধু পিছন থেকে চলমান অবস্থায়, তাও ক্ষণিকের জন্য, কিন্তু এরই মধ্যে তারা বুঝে ফেলেছে যে তাদের মধ্যে সুদর্শন বা আকর্ষণীয় মানুষ একটিও নেই। নিজেদের সব বলা-কওয়া শেষ করে মহিলারা স্থানীয় কম্যাণ্ডার ও ক্লাবের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করে হুকুম জারী করল, সেদিন সন্ধ্যায় একটা নাচের ব্যবস্থা করতে হবে।

তাদের বাসনা পূর্ণ হল। সেদিন সন্ধ্যা আটটার সময় ক্লাবের বাইরের রাস্তায় সামরিক ব্যাণ্ড বেজে উঠল আর ক্লাবের নাচ-ঘরে অফিসাররা স্থানীয় মহিলাদের নিয়ে নাচ শুরু করে দিল। মহিলারা বুঝি ডানা মেলে সপ্তম স্বর্গে উড়ে চলল। নৃত্য, গীত ও পায়ের কাঁটার টুং-টাং শব্দের নেশায় তারা ক্ষণিকের অতিথিদের কাছে দেহ-মন সব সমর্পণ করে দিল, ভুলে গেল তাদের অসামরিক পরিচিত জনদের। তাদের বাবারা ও স্বামীরা সেখান থেকে দূরে ছিটকে পড়ে ভিড় জমাল বারান্দার ঢালাও পান-ভোজনের আসরে। এইসব কোষাধ্যক্ষ, সচিব ও পরিদর্শকের দল নিজেদের অযোগ্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই নাচ-ঘরে ঢোকার চেষ্টা না করে তারা দূর থেকে দেখতে লাগল, তাদের স্ত্রী-কন্যারা নবাগত চটপটে ও একহারা লেফটেন্যান্টদের সঙ্গে

কেমন নাচছে।

স্বামীদের মধ্যে একজনের নাম কিরিল পেত্রভিচ শালিকভ। সে আবগারি শুল্কের কর্মচারী। লোকটি মদ্যপ, সংকীর্ণমনা ও হিংসুটে; মাথাটা বড় আর ঠোঁট দুটো পুরু। এক সময় সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছে, পিসারেভ ও দব্রোলিউবভ পড়েছে, গান গেয়েছে, আর এখন সে নিজের পরিচয় দেয় আবগারি শুল্কের কর্মচারী বলে। সে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, স্ত্রীর উপর থেকে ক্ষণেকের জন্যও চোখ সরায় নি। তার স্ত্রী আন্না পাভ্‌লভ্‌না। বছর ত্রিশেক বয়সের পিঙ্গলা রমণী; নাকটা লম্বা; চিবুক সরু, মুখে পাউডারের প্রলেপ, তালবাসটি কোমরের উপর শক্ত করে আঁটা। সে নেচে চলেছে অবিরাম, বিশ্রামহীন...দেহ ক্লান্ত হলেও তার মনের ক্লান্তি নেই। সারা শরীরে উপচে পড়ছে খুশি ও উচ্ছ্বাস। উত্তেজনায় কাঁপছে, গাল দুটি লাল হয়ে উঠেছে, গতি মন্থর হয়ে পড়েছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, নাচতে নাচতেই তার মনে পড়েছে অতীতের স্মৃতি, সেই নিকট অতীত যখন সে বোর্ডিং-স্কুলে ওয়াল্‌জ্‌ নাচত আর স্বপ্ন দেখত একটি আনন্দময় উজ্জ্বল যৌবন-দিনের, যখন সে স্থিরনিশ্চিত ছিল যে কোন ব্যারন বা প্রিন্স হবে তার স্বামী।

আবগারী-কর্মচারীটি দেখছে আর ক্ষোভে দাঁত কড়-মড় করছে! তার মনে ঈর্ষা নেই, কিন্তু বিরক্তি আছে, কারণ, প্রথমত, নাচ চলার জন্য তাস খেলার মত কোন জায়গা তখন ছিল না; দ্বিতীয়ত, ওই ব্যাণ্ডের পোঁ-পো বাজনা তার ভাল লাগে না; তৃতীয়ত, সাধারণ নাগরিকদের প্রতি ওই সব অফিসারদের মনোভাব বড়ই দাম্ভিকতাপূর্ণ; আর চতুর্থত, এবং সেটাই আসল কথা, স্ত্রীর মুখের ওই সুখের হাসি তাকে চরম আঘাত হেনেছে...

সে নিজের কাছেই বলতে লাগল, ''ও আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে! চল্লিশে পা দিতে চলেছে, আর রূপেরও যা ছিরি, অথচ আঁটো করে কোমরবন্ধ পরে, মুখে পাউডার ঘসে, আর চুল নাচিয়ে বেড়ায়, ছেনালী করে, সুন্দরী হবার ভান করে, আর ভাবে ওকে কেউ ফেরাতে পারে না...আহা, তুমি যে এত মনোরমা তা তো জানতাম না!''

আন্না পাভ্‌লভ্‌না তখন নাচের মধ্যে এতই ডুবেছিল যে স্বামীর দিকে একবার ফিরেও তাকাল না।

আবগারী-কর্মচারীটি মুখ সিঁটকে বলল, ''আমরা তো এখন পাড়াগেঁয়ে ভূত...একেবারে অচল...চাষা, গেঁয়ো চাষা। আর উনি বল-নাচের মক্ষিরাণী! বয়সের তুলনায় চেহারাটা রেখেছে খাসা, তাই এখনও অফিসারদের মনকে টানতে পারে। তারা হয় তো ওর প্রেমেও পড়তে পারে।''

মাজুরকা-নাচ চলার সময় আবগারীর লোকটির মুখ রাগে বিকৃত হয়ে উঠল। আন্না পাভ্‌লভ্‌নার নৃত্য-সঙ্গী তখন একটি কালো যুবক অফিসার; তার চোখ দুটো ঠেলে উঠেছে, চোয়ালের হাড় তাতারদের মত। অত্যন্ত পরিশ্রম করে মন দিয়ে সে নাচের তালে তালে পা ফেলছে, হাঁটু দুটোকে

এমন অস্বাভাবিকভাবে বাঁকাচ্ছে যে তাকে দেখাচ্ছে দড়ির উপর নৃত্যরত পুতুলের মত। আর আন্না পাভ্‌লভ্নান এমন নিষ্প্রাণ ভঙ্গীতে শরীরটাকে পিছনে হেলাচ্ছে আর চোখ ঘোরাচ্ছে যাতে মনে হয় সে বাতাসে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে আর ভাবছে সে অনেক দূরে কোথাও দূরের মেঘের দেশে ভাসছে—এই মাটির পৃথিবীতে একটা ছোট শহরের ক্লাবের মধ্যে নেই। শুধু তার মুখটাই নয়, তারা সারা দেহে বয়ে যাচ্ছে খুশির হিল্লোল...এতটা বাড়াবাড়ি তার পক্ষে অসহ্য ঃ তার ইচ্ছা হল এই সুখের হাসিকে পরিহাসে পরিণত করবে, আন্না পাভ্‌লভ্‌নাকে বুঝিয়ে দেবে সে নিজেই ভুলে গেছে, মোহের বশে তার কাছে জীবনটাকে যত সুন্দর বলে মনে হচ্ছে আসলে জীবনটা তত সুন্দর নয়।

সে ধীরে ধীরে বলল, ''একটু অপেক্ষা কর, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। তখন দেখব এই সুখের হাসি কোথায় থাকে। তুমি তো স্কুলের মেয়ে নও, স্বপ্নবিভোর কুমারীও নও। তুমি একটি ভয়ংকরী বুড়ি, আর তোমাকে বুঝতে হবে যে সত্যি তুমি একটি ভয়ংকরী বুড়ি!''

ঈর্ষা, ক্ষোভ, আহত প্রেম—এই সব ছোট ছোট অনুভূতি একত্র হয়ে গড়ে ওঠে মানুষের প্রতি যে জঘন্য, ছোট শহরসুলভ ঘৃণার মনোবৃত্তি, আর যে মানববিদ্বেষ মফস্বলের ক্ষুদে অফিসাবদেব মনে বাসা বাঁধে অতি মাত্রায় ভদ্‌কা ও অতি অল্প শারীরিক শ্রমের ফলে, সেটাই তাকে ঘিরে ছুটাছুটি শুরু করে দিল ইঁদুরের মত। ...কোনরকমে মাজুরকা নাচটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে সে বল-নাচের ঘরে ঢুকে সোজা এগিয়ে গেল তার স্ত্রীব দিকে। আন্না পাভ্‌লভ্‌না তার নৃত্য-সঙ্গীটিকে নিয়ে বসে ছিল। নিজেকে বাতাস করতে করতে যুবক অফিসারটির দিকে তাকিয়ে ছেনালীর হাসি হেসে সে তাকে শোনাচ্ছিল সেণ্ট পিতার্সবার্গে তার নাচের কথা। (মুখটাকে হৃৎপিণ্ডাকার করে সে বলল ঃ ''পিতার্সবার্গে কত স্বাচ্ছন্দ্য)।''

তার স্বামী খেঁকিয়ে উঠল, ''আন্না, বাড়ি চল।''

সম্মুখে স্বামীকে দেখে আন্না পাভ্‌লভ্‌না চমকে উঠল ; তারপর যেন তার একটি স্বামী আছে এ কথাটি মনে পড়তেই সে ভীষণ রকমের লাল হয়ে উঠল ঃ এমন একটি কিম্ভুত চেহারার বিষণ্ণ সাধারণ স্বামীর জন্য সে লজ্জা পেল।....

''বাড়ি চল,'' স্বামীটি আবার বলল।

''সে কি ? সবে তো সন্ধ্যা হয়েছে!''

তার স্বামী রাগ দেখিয়ে বলল, ''আমি তোমাকে বাড়ি যেতে বলছি।''

''কিন্তু কেন? কিছু ঘটেছে কি?'' আন্না পাভ্‌লভ্‌না চিন্তিত হয়ে শুধাল।

''কিছুই ঘটে নি, কিন্তু আমি বলছি, এখনই বাড়ি চল...এটা আমার ইচ্ছা, বাস, আর কোন কথা নয়। চল।''

আন্না পাভ্‌লভ্‌না স্বামীকে ভয় করে না, কিন্তু এই দৃশ্যটার জন্যই সে

লজ্জিত, কারণ অফিসারটি তার স্বামীব দিকে তাকিয়ে আছে বিস্ময়ে ও পরিহাসের চোখে। সে উঠে স্বামীকে নিয়ে একপাশে সরে গেল।

বলল, ''কি আবোল-তাবোল বকছ? আমি কেন বাড়ি যাব? এখনও তো এগারোটাই বাজে নি!''

''আমি চাই তুমি যাবে, বাস! এখনই বাড়ি চল। কথা অনেক বলেছ।''

''বাজে কথা রাখো! ইচ্ছা হয় তুমি বাড়ি চলে যাও।''

''ঠিক আছে, তাহলে আমি একটা হাঙ্গামা বাধাই।''

আবগারীর লোকটি দেখতে পেল তার স্ত্রীর মুখের আভাষটা ধীরে ধীরে আবছা হয়ে যাচ্ছে, সে দেখতে পেল সে কতখানি লজ্জা পেয়েছে, কতখানি যন্ত্রণা তাকে ভোগ কবতে হচ্ছে—আর তা দেখে তার নিজের মন কিছুটা হাল্কা হল।

তাব স্ত্রী শুধাল, ''ঠিক এখনই আমাকে তোমাব কি এমন দরকার হল?''

''তোমাকে আমাব মোটেই দবকার নেই, কিন্তু আমি চাই তুমি বাড়িতেই থাক। এটাই আমার ইচ্ছা, বাস।''

আন্না পাভ্‌লভ্‌না প্রথমে তার কথা কানেই তুলল না, পরে স্বামীকে মিনতি কবতে শুরু করল—তাকে অন্তত আবো আধ ঘন্টা এখানে থাকতে দেওয়া হোক; আব তাব পরে, কেন সে তা নিজেই জানে না, সে স্বামীর কাছে নতি স্বীকাব করতে শুরু করল, আর এ সবই করল এমনভাবে হেসে হেসে আর চুপি চুপি যাতে অন্য কেউ বুঝতে না পারে যে সে ও তার স্বামী ঝগড়া করছে। সে কথা দিল সামান্য কিছুক্ষণ, দশ মিনিট, পাঁচ মিনিট মাত্র থাকবে, কিন্তু আবগারীব লোকটি সেই একই গোঁ ধবে বইল।

''তোমার ইচ্ছে হয় থাক। তবে আমি হৈচৈ শুরু করে দেব।''

স্বামীর সঙ্গে এই সব কথা বলতে বলতে আন্না পাভ্‌লভ্‌নার মুখটা ক্রমেই কুঞ্চিত হতে লাগল. মনে হল সে যেন শুকিয়ে যাচ্ছে, বুড়ি হয়ে যাচ্ছে।

বিবর্ণ মুখে ঠোঁট দুটো কামড়ে কোনরকমে কান্না চেপে সে হল-ঘরে ঢুকল ও পথে বের হবার মত পোশাক পরতে লাগল।

অন্য মহিলারা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ''এরই মধ্যে চললে! কিন্তু এত তাড়া কিসের বন্ধু?''

স্ত্রীর হয়ে জবাবটা দিল ওর স্বামী, ''ওর মাথা ধরেছে।''

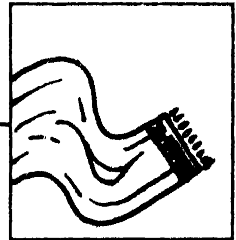
তারা ক্লাব থেকে বেবিয়ে পড়ল। সারা পথ একটাও কথা হল না। স্ত্রীর পিছন পিছন হাঁটিতে তাব শোকে অবনত, ভগ্নহৃদয়, পরাভূত ক্ষুদ্রকায় মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ল স্ত্রীর সেই সুখের কথা যা একটু আগে ক্লাবে তাকে এতখানি জ্বালিয়েছে, আর সেই সুখ যে এখন নেই এই জ্ঞানটাই তার মনকে জয়ের আনন্দে ভরে তুলল। সে খুশি হয়েছে, সন্তুষ্ট

হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে কিসের একটা অভাববোধ যেন তাকে পেয়ে বসল। তার মনে হতে লাগল, ক্লাবেই ফিরে যাবে, আর প্রত্যেকের মনকেই একঘেয়েমি ও তিক্ততায় ভরে তুলবে—যাতে প্রত্যেকই অনুভব করতে পারে যে একটা মানুষ যখন এই রাতের অন্ধকারে পথ চলে, পায়ের নীচে কাদা ছিটকে ওঠার শব্দ শোনে, আর যখন ভাল করেই জানে যে আগামী কাল সকালে সে ঘুম থেকে জেগে উঠবে, আবারও তার কপালে ভদ্‌কা ও তাস ছাড়া আর কিছুই জুটবে না, তখন এই জীবনটা কত তুচ্ছ, কত অগভীর মনে হয়! ওঃ, সে কী ভয়াবহ অবস্থা!

আর আন্না পাভ্‌লভ্‌না হাঁটিতেই পারছে না...নাচ, গান, কথাবার্তা, আলো আর হৈ-চৈ-র ঘোর তার তখনও কাটে নি। চলতে চলতে সে নিজেকেই প্রশ্ন করতে লাগল ঃ কোন্ পাপে প্রভু তাকে এত বড় শাস্তি দিলেন? যে ঘৃণার সঙ্গে সে তার স্বামীর ভারী পায়ের শব্দ শুনছে সেই ঘৃণাই তাকে ভরে তুলল তিক্ততায়, তাকে আঘাত করল, তার শ্বাসকে আটকে দিল। এমন একটা আপত্তিকর, তীব্র ও কর্কশ শব্দ মনে করার চেষ্টা সে করল যা তার স্বামীকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার এটাও বুঝল যে তার এই আবগারীর লোকটির মোটা চামড়ায় কোন শব্দই বিঁধবে না। শুধু কথায় তার কী যায়-আসে? তার এই অসহায় অবস্থার কথা তো অতি বড় শত্রুর মাথায়ও আসত না।

এদিকে আবার বাজনা বেজে উঠল, আর অত্যন্ত উত্তেজক নাচের সুরে অন্ধকারও জীবন্ত হয়ে উঠল।

১৮৮৬



ক্যাল্‌কাস *

Chalchas

ভাসিলি স্বেৎলোভিদভ একজন হাস্যরসের অভিনেতা। শক্ত-সমর্থ চেহারা, বয়স আটান্ন বছর। এই বিশেষ দিনটিতে সে ঘুম থেকে উঠে চারদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল ঃ তার ঠিক সামনে ছোট আয়নাটার দুই পাশে দুটো চর্বিবাতি জ্বলতে জ্বলতে একটু একটু করে ছোট হয়ে যাচ্ছে, আর তাদের মৃদু কম্পিত শিখাগুলি একটা ছোট ঘরের রং-করা কাঠের দেয়ালে মৃদু আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। তামাকের ধোঁয়া ও আধো অন্ধকারে ঘরটা ভরে গেছে, আর চারদিকে ছড়িয়ে আছে বেক্কাস ও মেল্‌পোমিনের গোপন মিলনের চিহ্ন; মিলনটা পাপের মতই উচ্ছৃঙ্খল ও লজ্জাজনক।

*** একটি নৃত্যনাট্যের এক অর্থগৃধ্নু, নীতিহীন চরিত্র।**

চেয়ারগুলোর উপরে আর মেঝেতে ছড়িয়ে আছে ফ্রক-কোট, ট্রাউজার, সংবাদপত্রের পাতা, ঝক্‌মকে লাইনিং দেওয়া ওভারকোট ও একটা টপ-হ্যাট। টেবিলের উপরে এক বিচিত্র বিশৃংখলার রাজত্ব ; খালি বোতল, গ্লাস, তিনটে মালা, গিল্টি-করা সিগারেট-কেস, গ্লাসদানি, লটারির-টিকিট (তার একটা কোণ মদে ভিজছে), বাক্সে-ভরা একটা সোনার টাই-পিন—সব কিছুই এলোপাথাড়ি ছড়িয়ে আছে। সে সব কিছুর উপরেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে সিগারেটের পোড়া টুকরো, ছাই, ও একটা ছেঁড়া চিঠির টুকরো। স্বেৎলোভিদভ স্বয়ং বসে আছে একটা হাতল-চেয়ারে, ক্যাল্‌কাসের পোশাক পরে।

বিস্ফারিত চোখে ঘরটাকে ভাল করে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল, "হা ভগবান, আমি আমার সাজ-ঘরেই রয়েছি!...কী গোলমেলে ব্যাপার!...কখনই বা ঘুমিয়ে পড়লাম!"

যে কোন রকম একটা শব্দ শোনবার আশায় সে কান পাতল, কিন্তু সর্বত্রই কবরের নিস্তব্ধতা। সিগারেট-কেস ও লটারির টিকিট তাকে মনে করিয়ে দিল যে গত রাতটা ছিল তার সাহায্য রজনী, তার অভিনয় হয়েছিল বিরাট রকমের সফল, প্রতিটি বিরতির সময় তার গুণমুগ্ধ দর্শকরা জোর করে সদলবলে তার সাজ-ঘরে ঢুকে তাকে প্রচুর পরিমাণ ব্র্যাণ্ডি ও লাল মদ খাইয়ে গেছে।

সে আবার বলল, "কিন্তু আমি ঘুমলাম কখন? ভাসিলি ভাসিলিচ, তুমি একটি বুড়ো মাতাল, একটা বুড়ো মাতাল ও বুড়ো কুত্তা ছাড়া আর কিছু নও! তাই তুমি চৈতন্য হারিয়ে চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর!"

হঠাৎ সে বেশ ভাল বোধ করতে লাগল। হো-হো করে হেসে উঠল—মাতালের মত কাশতে কাশতে অট্টহাসি; তারপরেই একটা মোমবাতি তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রঙ্গালয় অন্ধকার, জনহীন। মঞ্চের পিছন থেকে, উইংসের ভিতর দিয়ে, আর দর্শকাসনের দিক থেকে ভেসে এল একটা মৃদু অথচ বোধযোগ্য হাওয়া। বাতাসের স্রোতগুলি যেন অবাধে সারা মঞ্চে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পরস্পর ঠোকাঠুকি করছে, পাক খাচ্ছে, মোমবাতির শিখাটা নিয়ে খেলা করছে, আর তার ফলে শিখাটা কাঁপতে কাঁপতে একবার এদিকে, একবার ওদিকে হেলছে। মোমবাতির মৃদু আলোটা এই পড়ছে সাজ-ঘরের দরজাগুলোর উপর, আবার পড়ছে লাল রংকরা উইংসের পাশে রাখা বালতির উপর, পরক্ষণেই পড়ছে মঞ্চের মাঝখানে পড়ে-থাকা মস্ত বড় একটা কাঠামোর উপর।

অভিনেতা হাঁক দিল, "ইয়ে গোর্কা! ইয়ে গোর্কা! মলো যা! পেত্রুশ্‌কা! শয়তানগুলো নির্ঘাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে; কিসের জন্য ওদের টাকা দেব! ইয়ে গোর্কা!"

"আ-আ-আ..." জবাব স্বরূপ এল একটা প্রতিধ্বনি।

তখন অভিনেতার মনে পড়ে গেল, এটা তার সাহায্য রজনী হবার দরুণ সে নিজেই মঞ্চের দু'জন কর্মীকে ভদ্‌কা খাবার জন্য তিন রুব্‌ল্‌ করে দিয়েছিল। আর সে রকম একটা উপহার পাবার পরেও তারা রঙ্গমঞ্চেই রাতটা কাটাবে সেটা তো হতেই পারে না।

সাঁই সাঁই শব্দ করতে করতে অভিনেতাটি মঞ্চের উপর টুল নিয়ে বসল আর মোমবাতিটাকে রেখে দিল পায়ের কাছে। মাথাটা মদে ভারী হয়ে আছে, শরীরটাও বীয়ার, মদ ও ব্র্যাণ্ডির মিশ্রণে জ্বলতে শুরু করেছে। তার উপর চেয়ারে ঘুমনোর জন্যও সে খানিকটা দুর্বল ও কমজোর হয়ে পড়েছে।

থুথু ফেলে সে নালিশের সুরে বলল, ''মনে হচ্ছে আমার মুখের ভিতর ড্রাগনের একটা গোটা সেনাদল ঢুকে পড়েছে। এতটা মদ গেলা তোমার উচিত হয় নি। বুড়ো গাধা মোটেই উচিত হয় নি। এখন তোমার পিঠ ব্যথা করছে, মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, সারা শরীর কাঁপছে...আসলে তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ!''

সে চোখ তুলে তাকাল। চোখে পড়ল শুধু স্মারকের আসনটি আর অর্কেস্ট্রার মঞ্চটা; সমগ্র প্রেক্ষাগৃহটা দেখাচ্ছে একটা কালো, অতলস্পর্শ গহ্বর, আর সেখান থেকে একটা ঠাণ্ডা, ভয়ংকর অন্ধকার যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে।...যে প্রেক্ষাগৃহ সাধারণত আরামদায়কই হয়ে থাকে, রাতের অন্ধকারে সেটাকে মনে হচ্ছে একটা সীমাহীন, শূন্য জায়গা, কবরের মত প্রাণহীন।...স্বেৎলোভিদভ সেই অন্ধকারের দিকে তাকাল, তারপর মোমবাতিটার দিকে, আর বক্‌বক্‌ করতে শুরু করল ঃ

'হুম, বার্ধক্য...তুমি মুখে সাহস ফুটিয়ে যত খুশি বোকার অভিনয় করতে পার, কিন্তু তুমি আটান্ন বছরের বুড়ো—সব কিছু তুমি পিছনে ফেলে এসেছ। জীবন তোমাকে ফেলে চলে গেছে, হ্যাঁ তা গেছে ভাসিলি...আজ পঁয়ত্রিশ বছর হল আমি মঞ্চে এসেছি, কিন্তু এই সর্বপ্রথম সেই মঞ্চকে রাতের বেলায় দেখছি...এ বড় মজার জায়গা...এই প্রথম। তাকে দেখে আমি ভয় পাচ্ছি, যত সব! ইয়েগোর্কা!'' পুনরায় হাঁক দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। ''ইয়েগোর্কা!''

''আ...আ...আ...'' জবাবে এল একটা প্রতিধ্বনি।

প্রতিধ্বনির সঙ্গে অনেক দূর থেকে, বুঝি বা সেই হা-করা গহ্বরের অতল গভীরতা থেকে, গির্জার ঘন্টাগুলি বেজে উঠল সকালের উপাসনার জন্য। ক্যাল্‌কাসও ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল।

সে ডাকল, ''পেত্রুশ্‌কা! তোমরা কোথায় গিয়েছ শয়তানরা? হা ঈশ্বর, কেন যে আমি শয়তানকে ডাকছি? ওহে বোকা, তার নাম করো না। আর মদ খাওয়া ছেড়ে দাও; তুমি বুড়ো হয়েছ। অচিরেই পটল তুলবে! আটান্ন বছর বয়সে মানুষ প্রাতঃকালীন প্রার্থনায় যোগ দেয় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে, কিন্তু তুমি...হা ঈশ্বর!

সে খুঁত্‌খুঁত্‌ করেই চলল, ''দয়া কর, আমার ভয় করছে! এখানে সারা

রাত বসে থাকলে তুমি ভয়েই মরে যাবে। এটাই তো ভূত নামানোর মত জায়গা!''

কিন্তু ভূতের কথা বলতেই সে আরও ভয় পেল...বাতাসেব ঝাপটা আর মোমবাতির কাঁপা আলোয় তার কল্পনা যেন উদ্দাম হয়ে উঠল....সে শিউরে উঠল, পিছিয়ে গেল, আর মোমবাতিটার দিকে হাত বাড়াতেই ছেলেমানুষী আতংকে শেষবারের মত প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকার গহ্বরের দিকে তার চোখ পড়ল। রূপসজ্জার ফলে বিকৃত মুখে ফুটে উঠল একটা অর্থহীন শূন্য দৃষ্টি। মোমবাতিটা হাতে নেবার আগেই সে লাফিয়ে উঠে এক দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। আধ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে অনিবার্য ত্রাসে সে মাথাটা চেপে ধরে পা ঠুকতে শুরু করল।

যেন অন্য কারো তীক্ষ্ণ গলায় সে চীৎকার করে উঠল, ''তুমি কে?''

প্রেক্ষাগৃহের পাশের একটা বক্সে একটি সাদা মনুষ্যমূর্তি বসেছিল। তার উপর আলোটা পড়লে সে পরিষ্কার দেখতে পেল তাব দু'খানি হাত ও মাথা, এমন কি তার সাদা দাড়িও।

স্বেৎলোভিদভ সভয়ে আবার বলল, ''তুমি কে?''

সাদা মূর্তি একটা পা আসনের উপর তুলে দিয়ে অর্কেস্ট্রার পাটাতনের উপব লাফিয়ে পড়ল; তারপব ছায়ার মত নিঃশব্দে মঞ্চের দিকে এগোতে লাগল।

মঞ্চের উপর উঠে মূর্তি বলল, ''আমি স্যার।''

এক পা পিছিয়ে ক্যাল্‌কাস চেঁচিয়ে বলল, ''কে?''

''আমি স্যার স্মারক নিকিতা আইভানিচ। ভয় পাবেন না।''

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অভিনেতাটি অসহায়ভাবে টুলের উপর বসে পড়ে মাথা নীচু করল।

তার পাশে গিয়ে স্মারক বলল, ''আমি স্যাব।'' নিকিতা আইভানিচের দেহ লম্বা ও পেশীবহুল, তার মাথায় টাক কিন্তু দাড়ি সাদা, খালি পা, পরনে শুধুমাত্র তলবাস। ''আমি স্যার। স্মারক স্যার!''

''হা আমাব ঈশ্বর!'' মিনিট খানেকের মধ্যে অভিনেতাটি এ ছাড়া আর কিছুই বলতে পাবল না। হাত দিয়ে ভুরু মুছে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। প্রশ্ন করল, ''নিকিতা, তুমি?....তু....তুমি এখানে কেন?''

''রাতে আমি এখানেই ঘুমোই স্যার, একটা বক্সে। আমার তো যাবার মত আব কোন জায়গা নেই...কিন্তু দয়া করে আলেক্সি ফোমিচকে বলবেন না স্যার, বলবেন না তো?''

কাঁপা হাতটা বাড়িয়ে ক্লান্ত ক্যালকাস চাঁপা গলায় বলল, ''তুমি নিকিতা....হা আমার ঈশ্বর! হা আমার ঈশ্বর! ষোলবার যবনিকা উঠল আর নামল, সকলে অবিরাম করতালি দিল, পেলাম তিনটে মালা, অনেক উপহার....সকলেই উচ্ছ্বসিত, কিন্তু একটি বৃদ্ধ মাতালকে জাগিয়ে তুলে বাড়ি নিয়ে যাবার কথা কারও মাথায় এল না। আমি বুড়ো হয়ে গেছি

নিকিতা। আমি অসুস্থ। আমার দুর্বল মনটা যন্ত্রণায় দীর্ণ!"

ক্যালকাস স্মারকের দিকে এগিয়ে গেল, মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপতে কাঁপতে তার হাতটা চেপে ধরল।

বিকারগ্রস্তের মত বলতে লাগল, "আমাকে ছেড়ে যেয়ো না, নিকিতা...আমি বৃদ্ধ, দুর্বল, এক পা কবরে দিয়ে বসে আছি....আমি ভয় পেয়েছি!..."

নিকিতা শান্তভাবে বলল, "ভাসিলি ভাসিলিচ, আপনার বাড়ি ফেরবার সময় হয়েছে!"

আমি বাড়িতে ফিরে যাব না! আমার বাড়িঘর নেই! কোন বাড়ি নেই!"

"হায় প্রভু যীশু! আপনি কোথায় থাকেন তাও ভুলে গেছেন?"

অভিনেতাটি পাগলের মতই বকতে লাগল, "আমি বাড়ি যেতে চাই না!....সেখানে আমি একা! সেখানে আমার কেউ নেই নিকিতা, আত্মীয় নেই, গৃহিণী নেই, ছেলেমেয়ে নেই....আমি একা, খোলা মাঠের উপরকার বাতাসের মত...একদিন আমি মরে যাব...আমাকে মনে রাখবার মত কেউ থাকবে না।"

অভিনেতাটির শিহরণ নিকিতার মধ্যেও সঞ্চারিত হল...উত্তেজিত মাতাল বুড়ো মানুষটি সজোরে তার হাতটা চেপে ধরল, মুখের রং আর চোখের জল মিশে তার হাতের উপর ঝরে পড়তে লাগল। নিকিতা শীতে কাঁপতে কাঁপতে কাঁধ ঝাঁকাল।

ক্যালকাস তখনও চাপা গলায় বলেই চলেছে, "নিজের কথা ভেবেই আমি আতংকিত হয়ে পড়েছি—আমাকে আদর-যত্ন করার কেউ নেই, সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। মাতাল হলে বিছানায় নিয়ে যাবার কেউ নেই, আমি কার? আমাকে কার দরকার আছে? আমাকে কে ভালবাসে? কেউ আমাকে ভালবাসে না নিকিতা!"

"সাধারণ মানুষ আপনাকে ভালবাসে ভাসিলি ভাসিলিচ!"

"সাধারণ মানুষরা তো বাড়িতে ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছে...না, আমাকে কারও দরকার নেই, আমাকে কেউ ভালবাসে না, আমার স্ত্রী নেই, সন্তান নেই।"

"তাতে দুঃখ করার কি আছে?"

"আমি একটা মানুষ, একটা জীবন্ত মানুষ...একটি বনেদী পরিবারের ছেলে, আর ভাল মানুষও বটে...এই গর্তে পড়ার আগে আমি ছিলাম গোলন্দাজ বাহিনীর একজন অফিসার। তখন কী মানুষটাই না ছিলাম, সুদর্শন, উদ্দীপনায় ভরপুর, সাহসী...তখন কী একখানা অভিনেতাই না ছিলাম। হায় প্রভু! হায় প্রভু! কোথায় গেল সে সব? সেই সময়টারই বা কি হল?"

স্মারকের কাঁধে ভর দিয়ে স্বেৎলোভিদভ উঠে দাঁড়াল আর এমনভাবে

চোখ মিট মিট করতে লাগল যেন হঠাৎ অন্ধকার থেকে একটা উজ্জ্বল আলোকিত ঘরে ঢুকে পড়েছে। চোখের জলের বড় বড় ফোঁটা তার গাল বেয়ে রূপসজ্জার ভিতর দিয়ে দাগ কেটে ঝরে পড়ছে...

সে বলেই চলল, "সে সব কী দিনই ছিল! এইমাত্র ওই অন্ধকারের দিকে তাকিয়েই আমার সব মনে পড়ে গেল!...ওই অন্ধকার গহ্বরটা আমার জীবনের পঁয়ত্রিশটা বছরকে গিলে খেয়েছে, আর সে কী জীবন নিকিতা! পিছন ফিরে সেদিকে তাকালে আজও আমি খুঁটিনাটি সমেত সব কিছু দেখতে পাই, ঠিক যেমনটি দেখতে পাচ্ছি তোমার মুখ...মনে পড়ে, তখন আমি একজন যুবক অভিনেতা, রঙ্গমঞ্চের আকর্ষণে তখন সবে জ্বলতে শুরু করেছি, আর আমার অভিনয় দেখে একটি মেয়ে আমার প্রেমে পড়েছে....মেয়েটি ছিল পপ্লার গাছের মত দীর্ঘদেহ ও কমনীয়; যুবতী, নিষ্পাপ ও বুদ্ধিমতী; গ্রীষ্মের ভোরের মত উজ্জ্বল! আমি সত্যি বিশ্বাস করতাম যে সূর্য ডুবে গেলেও পৃথিবীতে আলো থাকবে, কারণ, এমন কোন অন্ধকার ছিল না যা তার রূপকে পরাভূত করতে পাবে!"

মাথা নেড়ে হাত দুলিয়ে ক্যাল্‌কাস উত্তেজিতভাবে কথা বলতে লাগল...খালি পায়ে শুধুমাত্র তলবাস পরে নিকিতা তার সামনে দাঁড়িয়ে সব শুনল। বিকম্পিত মোমবাতির আলো সত্ত্বেও অন্ধকার তাদের দু'জ ঘিরে রেখেছিল। সে এক অসাধারণ বিচিত্র দৃশ্য, কোন রঙ্গমঞ্চে আগে কোন দিন সেরকম দৃশ্য দেখে নি, সে দৃশ্যের একমাত্র দর্শক রঙ্গমঞ্চের অন্ধকার, নিষ্প্রাণ প্রেক্ষাগৃহ....

ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ক্যাল্‌কাস বলতে লাগল, "সে আমাকে ভালবাসত। তুমি কতটুকু জান? মনে পড়ে, ঠিক যেমন আমি তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছি, তেমনই তার সামনে আমি দাঁড়াতাম...তখনই সে ছিল সব চাইতে সুন্দরী; এমনভাবে সে আমার দিকে তাকাত যা আমি কোন দিন ভুলব না, কবরে গিয়েও না! তার দুটি মখমল-কোমল চোখ ছিল আমার সান্ত্বনা, সে চোখে ছিল যৌবনের গভীরতা ও দীপ্তি! উচ্ছ্বসিত আনন্দে নতজানু হয়ে তাকে আমার করে নিতে চাইলাম...."

ক্যাল্‌কাস দম নেবার জন্য থামল; গলা নীচু করে আবার বলতে লাগল ঃ

"কিন্তু সে বলল ঃ থিয়েটার ছেড়ে দাও! তুমি কি এর অর্থটা বোঝ? সে একজন অভিনেতাকে ভালবাসতে পারে, কিন্তু তার স্ত্রী হতে—কখনও না। সেদিনের কথা মনে পড়ে—সেদিন আমি অভিনয় করেছিলাম একটা ভাঁড়ামিতে ভরা ভূমিকায়...অভিনয় করেছিলাম ভাঁড়ের ভূমিকায়, কিন্তু আমার অন্তর ছিল বেদনায় ভরা...থিয়েটার আমি ছাড়ি নি, না, কিন্তু আমার চোখ তখন খুলে গেছে।...বুঝতে পেরেছি আমি একটি ক্রীতদাস, অন্য লোকের আলস্যের খেলার পুতুল; বুঝতে পেরেছি আমি একটি ক্রীতদাস, অন্য লোকের আলস্যের খেলার পুতুল; বুঝতে পেরেছি পবিত্র শিল্প বলে

কিছু নেই, শুধুই প্রলাপ ও ফাঁকি। তখনই জনসাধারণকেও চিনে ফেললাম। তারপর থেকেই আমি হাততালি, মালা ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় বিশ্বাস হারালাম! হ্যাঁ, বন্ধু! মানুষ আমার প্রশংসা করতে পারে, এক রুবল্ দিয়ে আমার ফটোগ্রাফ কিনতে পারে, কিন্তু তার কাছে আমি একজন বিদেশী, তার পায়ের তলার ময়লা মাত্র, একটি মনোহারিণী বেশ্যার চাইতে বেশী কিছু নয়! সে আমার সঙ্গে পরিচিত হতে চায় নিজেরই অহংকারের জন্য, কিন্তু সে কখনই আমার সঙ্গে তার বোন বা মেয়েকে বিয়ে দিয়ে নিজেকে ছোট করবে না। আমি তাকে বিশ্বাস করি না, তাকে ঘৃণা করি, সেও আমার কাছে বিদেশী!''

স্মারক ভয়ে ভয়ে বলল, ''আপনার বাড়ি যাবার সময় হয়ে গেছে স্যার।''

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের দিকে ঘুষি পাকিয়ে ক্যাল্‌কাস চীৎকার করে বলল, ''ওঃ, তাদের সব্বাইকে আমি খুব ভাল করে চিনি! তখন থেকেই তাদের বুঝে নিয়েছি...। আমার চোখ খুলে গেল, সেই যৌবনকালেই আমি সত্যকে দেখতে পেয়েছিলাম....আর সেই অর্ন্তদৃষ্টির জন্য আমাকে অনেক দাম দিতে হয়েছে নিকিতা। সেই ঘটনার পরে...মেয়েটি যখন আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেল, তখন থেকেই আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে শুরু করলাম, শুরু হল আমার অকারণে বেঁচে থাকা, আর কোন দিন পিছন ফিরে তাকাই নি...ভাঁড়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছি, ঠাট্টামস্করার ঢেউ তুলেছি, নষ্ট মনের ভাব প্রকাশ করেছি...আমার জিভকে কলংকিত করেছি, তার পবিত্রতা নষ্ট করেছি, মনুষ্যত্বকেই হারিয়ে ফেলেছি. ও-ওঃ, সেই গহ্বরটা আমাকে গিলে খেয়েছে। আগে কখনও এটা বুঝতে পারি নি, কিন্তু আজ বুঝেছি...যখন জেগে উঠে পিছনে তাকালাম ঃ আমার পিছনে পড়ে আছে আটান্নটা বছর। আর এখনই অনুভব করলাম আমার বার্ধক্যকে। আমার গান শেষ হয়ে গেছে।

ক্যাল্‌কাস তখনও কাঁপছে, ঘন ঘন শ্বাস টানছে...একটু পরে স্মারক তাকে সাজঘরে নিয়ে পোশাক খুলতে লাগল। অভিনেতাটি একেবারেই ভেঙে পড়েছে ; কিছুতেই কথার স্রোত আর চোখের জল থামাতে পারছে না।

১৮৮৬

যাঁতাকলের একটি দৃশ্য

At The Mill



যাঁতাওয়ালা এলেক্সি বিরিউকভ বড়সড় স্থূলকায় মধ্যবয়সী মানুষ; তার শরীর ও মুখ দেখতে সেই সব অভদ্র, মোটা চামড়া ও ভারী পাওয়ালা নাবিকদের মত ছোট ছেলেরা জুল ভার্ন পড়ার পরে যাদের স্বপ্নের মধ্যে দেখে। এই ঘটনার সময় সে তার কুটিরের দরজার পাশে বসে আলস্যভাবে পাইপটা টানছিল, যদিও পাইপের আগুন অনেকক্ষণ আগেই নিভে গেছে। তার পরনে মোটা কাপড়ের ধূসর ট্রাউজার ও মস্ত বড় ভারী বুট; সময়টা হেমন্তকাল, বাতাস স্যাঁৎসেঁতে ও ঠাণ্ডা তথাপি তার গায়ে কোট, মাথায় টুপি ছিল না। তার বুক-খোলা শার্টের ভিতর দিয়ে অন্ধকার অবাধে ঢুকছে, কিন্তু যাঁতাওয়ালার বড়সড় দেহটা এতই কঠিন ও অনুভূতিশূন্য যে সে মোটেই ঠাণ্ডা বোধ করছে না। তার লাল মাংসল মুখে ফুটে উঠেছে একটা উদাসীন ও আলস্যের ভাব; মনে হচ্ছে সে বুঝি এখনও আধা ঘুমেই আছে; তার ফোলা ফোলা চোখ দুটি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাঁধের কাছ থেকে তার দুটো চালাঘর পর্যন্ত, অথবা নদীতীরের পুরনো, বিশ্রী উইলো গাছগুলি পর্যন্ত।

কাছাকাছি একটা মঠ থেকে সদ্য আগত দু'জন সন্ন্যাসী চালাঘর দুটির কাছে কিছু একটা কাজে ব্যস্ত ছিল ঃ দুই গুরু-ভাইদের মধ্যে একজনের নাম ক্লিওপা, একটি লম্বা পাকা চুলওয়ালা বৃদ্ধ, পরনে কাদামাখা জোব্বা আর তালি-মারা আঁটো টুপি; অপর জনের নাম দিওদর, কালো দাড়ি ও কালো রং, কোন জর্জিয়ান বংশে জন্ম, পরনে চাষীদের মত ভেড়ার চামড়ার সাধারণ একটা কোট। তারা গাড়ি থেকে একটা চালাঘরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে পেষাই করবার জন্য আনা রাইশস্যের বস্তাগুলি। তাদের কাছ থেকে একটু দূরে কালো ও নোংরা ঘাসের উপর বসে ছিল যুবক মজুর ও ইয়েভ্‌সি; তার থুতনিতে সবে দাড়ি গজিয়েছে; পরনে বহুছিন্ন ছোট মাপের একটা ভেড়ার চামড়ার কোট; তখন সে বদ্ধ মাতাল। হাতে একটা মাছ ধরা জাল নিয়ে সেটা মেরামত করার ভান করছিল।

যাঁতাওয়ালা অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে চারদিকে তাকাতে লাগল; পরে তার দৃষ্টি পড়ল সন্ন্যাসীদের উপর; তারা রাইশস্যের বস্তাগুলি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। গম্ভীর গলায় তাদের ডেকে সে বলল ঃ

"তোমরা সন্ন্যাসীরা নদীতে মাছ ধর কেন? কে বলেছে তোমাদের মাছ ধরার এক্তিয়ার আছে?"

সন্ন্যাসীরা কোন জবাব দিল না; এমন কি মাথা ঘুরিয়ে বক্তার দিকে

তাকালও না।

যাঁতাওয়ালা পাইপটা ধরিয়ে আবার বলতে শুরু করল ঃ

"তোমরা নিজেরা মাছ ধর ; এমন কি শহরের লোকদেরও সেখানে মাছ ধরতে দাও। তোমাদের ও শহরের কাছ থেকে মাছ ধবার অধিকার আমি কিনে নিয়েছি, তোমাদের যখন আমি টাকা দিয়েছি, তখন আমি মনে করি এ সব মাছ আমার, আর আমার নদীতে মাছ ধরার অধিকার অন্য কারও নেই। তোমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাটা তো ঠিকই কর, কিন্তু তোমরা তো দেখছি চুরিটাকে অপরাধ বলেই মনে কর না।"

যাঁতাওয়ালা হাই তুলল, আবারও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর গজর-গজর শুরু করল ঃ

"তোমরা কি মনে কর কাজটা ঠিক ? যেহেতু তোমরা সন্ন্যাসী, আর সন্ত হবার দিকে অর্ধেক পথ এগিয়েছে, তাই তোমরা কি মনে কর আমাদের আইন তোমাদের উপর প্রযোজ্য নয় ? আমি যদি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে নালিশ করি, তিনি তোমাদের জোব্বা দেখে ছেড়ে দেবেন না, সোজা জেলে ঠেলে দেবেন। অন্যদিকে, ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়াই তোমাদের সঙ্গে আমি একটা ফয়সালা করে ফেলতে পারি। নদীর ধারে-কাছে তোমাদের ধবতে পাবলে এমন ঠ্যাঙানি দেব যে "স্বর্গরাজ্য" না আসা পর্যন্ত তোমবা মাছের কথা মুখেও আনবে না!"

ক্লিওপা প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, "এমন কথা তোমার বলা উচিত নয় এলেক্সি দরোফেয়িচ! দয়াশীল, ঈশ্বরভীরু মানুষরা একটা কুকুরকেও এ সব কথা বলত না ; আর আমরা তো সন্ন্যাসী।"

যাঁতাওয়ালা ঠাট্টার সুরে বলল, "সন্ন্যাসী, তোমাদের কিছু মাছ চাই ? এই তো ? বেশ তো, এখানে এসে আমার কাছ থেকে কিনে নিও, কিন্তু চুরি করো না!"

কিওপা ভুরু কুঁচকে বলল, "হা প্রভু, আমরা কি চুরি কবেছি ? তুমি কেন বলছ আমরা চুরি কবি ? আমাদের শিক্ষানবীশরা নদীতে মাছ ধরে তা ঠিক, কিন্তু তারা তো বড় মহারাজের কাছ থেকে অনুমতি এনেছে। বড় মহারাজ ব্যাপারটাকে এই রকম চোখে দেখেন ঃ তুমি যে টাকাটা দিয়েছ গোটা নদীটার জন্য নয়, আমাদের তীবের দিকটায় জাল ফেলার জন্যই সে টাকাটা দিয়েছিলে। তোমাকে তো সমস্ত নদীটাই দিয়ে দেওয়া হয় নি...এটা তোমারও নয়, আমাদেরও নয়, এটা প্রভুর..."

যাঁতাওয়ালা বুটের উপর পাইপ ঠুকতে ঠুকতে গর্জন করে উঠল, "তোমাদের বড় মহারাজও তোমাদের চাইতে বেশী ভাল কিছু নয়। তোমাদের মতই তিনিও ঠকাতে চান! আমি কাউকে পরোয়া করি না ; আমার কাছে সকলেই সমান, তোমাদের বড় মহারাজ আমরা নিজেরা, আর ওই ইয়েভ্‌সি। তোমাদের যে কাউকে যদি নদীতে মাছ ধবতে দেখি, তাহলে তোমাদের বুঝিয়ে দেব...."

"দেখ, তুমি যদি সন্ন্যাসীদের মারধোর করতে চাও তো করো। ওপারে গিয়ে আমাদের তাতে ভালই হবে! ভিসারিয়ন এস্তিপিকে তুমি আগেই মেরেছ, এখন ইচ্ছা করলে বাকি সকলকেও মারতে পার।"

ক্লিওপার আস্তিন ধরে টেনে দিওদর বলল, "তুমি চুপ কর, ও যা বলে বলুক।"

ক্লিওপা থেমে গেল, আর কিছু বলল না, আবার বস্তা বইতে লাগল। কিন্তু যাঁতাওয়ালা তাদের বকতেই লাগল। পাইপ টানতে টানতে, প্রতিটা কথার পরে থুথু ফেলে সে একটানা তর্জন করতে লাগল। মাছের প্রসঙ্গটা ফুরিয়ে গেলে তার মনে পড়ে গেল এর আগে একবার সন্ন্যাসীরা তাকে দুটো বস্তা ফাঁকি দিয়েছিল, আর তাই নিয়ে সে সন্ন্যাসী দু'জনকে নতুন করে বকতে শুরু করল। তারপর যখন তার নজর পড়ল যে ইয়েভ্‌সি মাতাল হওয়ায় কাজকর্ম কিছুই করছে না, তখন সে মজুরটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বাছা বাছা সব গালি-গালাজে বাতাস ভরে তুলল।

প্রথমে সন্ন্যাসীরা তার কটূক্তির ভাষাটা সয়ে গেল এবং মাঝে মাঝে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল। কিন্তু ক্লিওপা বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারল না, সখেদে চেঁচিয়ে বলল ঃ

"সর্বশক্তিমান প্রভু, এই যাঁতাকলে এসে আমি মহাপাপ করেছি! এ তো নরককুণ্ড! সত্যিকারের নরক!"

যাঁতাওয়ালা পাল্টা জবাব দিল, "বেশ তো, এসো না।"

"প্রভু জানেন না আসতে হলে আমরা সুখীই হতাম, কিন্তু আর একটা যাঁতাকল পাচ্ছি কোথায়? আমাদের মত তুমিও জান যে এ জেলায় আর দ্বিতীয় কল নেই। অতএব হয় আমাদের না খেয়ে মরতে হবে, নয়তো অ-পেষাই শস্য খেতে হবে!"

কিন্তু যাঁতাওয়ালা ছাড়বার পাত্র নয়, সে চতুর্দিকেই গালাগালি ছুঁড়তে লাগল। বেশ বোঝা যায় তর্জন-গর্জন ও গালাগালি করাটা তার কাছে পাইপ টানার মতই একটা অভ্যাস হয়ে গেছে।

অবাক হয়ে চোখ পিটপিট কবতে করতে ক্লিওপা মিনতি করে বলল, "আর যাই কর, স্বয়ং শয়তানকে এনে হাজির করো না! দয়া করে চুপ কর!"

যাঁতাওয়ালা অচিরেই তার গালাগালির স্রোত থামিয়ে দিল, অবশ্য সেটা ক্লিওপার মিনতির জন্য নয়। সে দেখতে পেল একটা বুড়ি বাঁধের উপর দিয়ে আসছে; তার ছোটখাট গোলগাল চেহারা, ভাল মানুষের মত মুখ, আর এমন একটা ঢিলে জামা পরেছে যে তাকে একটা বড় মাপের গুবরে পোকার মত দেখাচ্ছে। সে হাটছে এক হাতে একটা ছোট লাঠিতে ভর দিয়ে আর অন্য হাতে একটা ছোট পুটুলি নিয়ে।

সন্ন্যাসীদের সামনে মাথা নত করে সে বলল, "শুভ দিন সন্ন্যাসীবাবারা। প্রভু আমাদের করুণা করুন। শুভ দিন এলেক্সি! শুভ দিন ইয়েভ্‌সি!"

ভুরু কুঁচকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে যাঁতাওয়ালা বলল, ''শুভদিন গো মা।''

হাসি মুখে সস্নেহে যাঁতাওয়ালার মুখের দিকে চেয়ে বুড়ি বলল, 'তোমাকে দেখতেই এসেছি বাবা। অনেক দিন তোমাকে দেখি নি। সেই কবে দেখা হয়েছিল উৎসবের সময়।....দেখ, এসেই যখন পড়েছি, তোমার একজন অতিথ্ বাড়ল! কিন্তু তুমি যেন বড়ই শুকিয়ে গেছ।''

বুড়ি যাঁতাওয়ালার পাশেই বসে পড়ল; সেই প্রকাণ্ড চেহারার পাশে বুড়িকে যেন আরও বেশী করে একটা গুবরে পোকার মতই দেখাচ্ছিল।

বুড়ি বলতে লাগল, ''হ্যাঁ, সেই উৎসবের সময়! অনেক দিন তোমাকে না দেখলে বুকটা যেন খা-খা করে বাবা, কিন্তু যতবার তোমার কাছে আসার উদ্যোগ করি ততবারই হয় বৃষ্টি হয়, না হয় তো আমারই অসুখ হয়...''

মুখ কালো করে যাঁতাওয়ালা শুধাল, ''তুমি কি শহর থেকে এসেছ?''

''শহর থেকে...সোজা বাড়ি থেকে....''

''তোমার অসুখ, তার উপর এই শরীরেব হাল, দেখা-সাক্ষাৎ করতে না বেরিয়ে তোমার বাড়িতে থাকাই উচিত। তা, কি জন্য এসেছ? জুতোর তলা ক্ষয় করতে?''

''তোমাকে দেখতেই এসেছি।'' তারপর সন্ন্যাসীদের দিকে তাকিয়ে বলল, ''আমার দুই ছেলে, এইটি, আর ভাসিলি, সে শহরে থাকে। কেবল এরাই দুটি! আমি বেঁচে আছি কি মরে গেছি তা নিয়ে ওদেব মাথা-ব্যথা নেই, কিন্তু ওরাতো আমারই রক্ত-মাংসে গড়া, আমার বুড়ো বয়সের ভরসা...আমাকে ছাড়া ওদের চলে, কিন্তু আমি তো ওদের ছাড়া একটা দিনও বেঁচে থাকতে চাই না....কিন্তু আমি এতই বুড়ো হয়েছি সন্ন্যাসীবাবারা যে শহর থেকে এতটা পথ হেঁটে আসা আমার পক্ষে কষ্টকর।''

কিছুক্ষণ কারও মুখে কথা নেই। সন্ন্যাসীরা শেষ বস্তাটি চালাঘরে রেখে এসে গাড়িতে বসল বিশ্রাম করতে...ইয়েভ্‌সি তখনও জাল মেরামতের ভান করে চলেছে আর মাথা নাড়ছে।

শেষ পর্যন্ত যাঁতাওয়ালা বলল, ''তুমি অসময়ে এসে পড়েছ মা। এখনই আমাকে করিয়াঝিনো যেতে হবে।''

বুড়ি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, ''চলে যাও! ঈশ্বর তোমাকে ভাল রাখুন। তোমার কাজে আমি বাধা হতে চাই না।...এখানে একটু বিশ্রাম নিয়েই আমি ফিরে যাব।...ভাসিলি ও তার ছেলেমেয়েরা তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে...''

''সে কি এখনও ভদ্‌কা খায়?''

''খুব বেশী খায় তা বলব না, কিন্তু খায়। আমি এটা অস্বীকার করতে পারি না, সে অবশ্যই খায়...তুমি তো জান, প্রচুর পরিমাণ ভদ্‌কা কেনার পয়সা তার নেই। কাজেই মাঝে-মধ্যে কেউ দয়া করে এক গ্লাস দিলে তবেই খায়।...এটা বড় লজ্জার কথা এলেক্সি, তার জীবনটাই লজ্জার। সে যেভাবে থাকে তা দেখে আমার বুকটা ফেটে যায়...খাবার কিছু নেই, ছেলেমেয়েরা

ছেঁড়া পোশাক পরে, আর ভাসিলি নিজে—তাকে দেখলে নিজেরই লজ্জা করে, ট্রাউজারে শতেক ছিদ্র, পায়ে জুতো নেই...একটা মাত্র ঘরে আমরা ছ'জন ঘুমোই। আমরা এতই গরিব, এতই গরিব ; এর চাইতে খারাপ কিছু তুমি ভাবতেই পার না...সেইজন্যই তো তোমার কাছে এসেছি, তুমি কিছু করতে পার কিনা সেটা জানতে...এলেক্সি, এই বুড়িকে দয়া কর, ভাসিলিকে সাহায্য কর...সে তোমার ভাই!''

যাঁতাওয়ালা কিছুই বলল না ; অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

''সে গরিব, কিন্তু তুমি—ঈশ্বরের দয়ায়—তুমি তো ভালই আছ। এই যাঁতাকলটা তোমার, তোমার সব্জি-বাগান আছে, তুমি মাছ বিক্রি কর, প্রভু তোমাকে সুবুদ্ধি দিয়েছেন, তুমি অনেকের চাইতে উপরে উঠেছ, তিনি তোমার পেট ভরিয়েছেন...আর তুমি তো একলা মানুষ কিন্তু ভাসিলির চারটি সন্তান, আমিও তার গলায় পাথরের বোঝা, আর সে মাইনে পায় মাত্র সাত রুব্‌ল্‌। কেমন করে সে প্রত্যেককে খাওয়াবে? তাকে সাহায্য কর এলেক্সি, সাহায্য কর!''

যাঁতাওয়ালা তবু কিছু বলল না ; সযত্নে পাইপ ভরতে লাগল।

''তুমি তাকে সাহায্য করবে কি?'' বুড়ি জিজ্ঞাসা করল।

যাঁতাওয়ালা তবু কথা বলল না দেখে বুড়ি দীর্ঘশ্বাস ফেলে একে একে ইয়েভ্‌সি ও সন্ন্যাসী দু'জনের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল ঃ

''বেশ, প্রভু তোমাকে ক্ষমা করুন, আমাদের সাহায্য করো না। আমি জানতাম তুমি সাহায্য করবে না।...আমি আসলে এসেছিলাম নাজার আন্দ্রেয়েভিচের জন্য....সে দিনরাত কাঁদে এলেক্সি! সে আমার দুই হাতে চুমো খেয়ে আমাকে মিনতি করে বলল তোমার কাছে এসে সব কথা বলতে...''

''সে কি চায়?''

''সে চায় তোমার কাছে তার যা প্রাপ্য আছে সেটা তুমি তাকে ফিরিয়ে দাও। সে বলছে, যাঁতায় পেষাই করার জন্য সে তোমাকে রাইশস্য দিয়েছিল, কিন্তু তুমি সেটা তাকে ফিরিয়ে দাও নি।''

''সে তো তোমার কোন ব্যাপার নয় মা। যেটা তোমার ব্যাপার নয় তার মধ্যে নাক গলিও না। তুমি শুধু প্রভুর কাছে তোমার প্রার্থনাটা জানিয়ে যাও।''

''প্রার্থনা তো আমি করি এলেক্সি, কিন্তু মনে হয় ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনতে পান না। ভাসিলি এত গরিব, আমাকে ভিক্ষে করতে হয়, আর এই অন্যের একটা জোব্বা আমার শরীরটা গরম রাখে। তুমি ভালভাবে বাস করছ, কিন্তু তোমার মন বড় কঠিন, প্রভুই আমার সাক্ষী। ওঃ এলেক্সি, তোমার লোভই তোমাকে নষ্ট করেছে। সব দিক থেকেই তুমি চমৎকার, তুমি বুদ্ধিমান, সুদর্শন, ভাল ব্যবসায়ী, একেবারে পয়লা নম্বর, কিন্তু তুমি সত্যিকারের মানুষ নও! তুমি অমিত্র, তুমি কখনও হাস না, কাউকে একটা

ভাল কথা বল না, তুমি বন্যজন্তুর মত অসভ্য। নিজের মুখের দিকেই তাকিয়ে দেখ! আর সকলে তোমার সম্পর্কে যা বলে, আমার বড় কষ্ট হয়! ওই সন্ন্যাসীবাবাদের জিজ্ঞাসা কর! সে কত কথা! তুমি গরিবের রক্ত চুষে খাও। তুমি যা চাও জোর করে সেটা আদায় কর; লোকে বলে, যে সব গুণ্ডা-বদমাস রাতেরবেলা মানুষকে লুঠ করে, ঘোড়া চুরি করে, তুমি তাদেরই দলে।...তোমার এই যাঁতাকলটা অভিশপ্ত—যুবকরা এখানে আসতে ভয় পায়; সব মানুষ, সব কিছু তোমার কাছ থেকে দূরে থাকে। লোকে তোমাকে ''কেইন'' বলে, ''হেরড'' বলে—''

''তুমি বড় বোকা মা!''

''যেখানেই তোমার পা পড়ে সেখানেই ঘাস গজায় না। যেখানেই তোমার নিঃশ্বাস পড়ে সেখানে একটা ফড়িংকেও উড়তে দেখবে না। আর আমি তো কেবলই শুনতে পাই ঃ 'ওঃ, কেউ যদি তাকে খুন করত, বা হাজতে পাঠাত!' এ সব কথা শুনতে একজন মার কেমন লাগে তা কি তুমি বোঝ? বেশ? তুমি আমার ছেলে, আমার নিজের রক্ত-মাংস!''

যাঁতাওয়ালা দাঁড়িয়ে উঠে বলল, ''আমার যাবার সময় হয়ে গেছে। বিদায় মা।''

যাঁতাওয়ালা চালা-ঘরের ভিতর থেকে একটা মালগাড়ি বের করল, একটা ঘোড়া আনল, যদিও সেটা একটা কুকুরের চাইতে বড় নয়, তারপর সেটাকে গাড়িতে জুড়ে দিল। বুড়ি তার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল; তার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ বুজে চোখের জল চেপে রাখল।

তার ছেলে যখন তাড়াহুড়ো করে লম্বা আঙরাখাটা গায়ে চাপাল তখন বুড়ি বলল, ''বেশ, বিদায়! ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন হোন বাবা; আর আমাদের ভুলে যেয়ো না...দাঁড়াও, তোমার জন্য একটা উপহার এনেছি...'' তারপর যে পুটুলিটা সঙ্গে করে এনেছিল সেটা খুলতে লাগল।

নিচু গলায় বলল, ''গতকাল ডিয়েকনের স্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে কিছু ভাল জিনিস খেতে দিয়েছিলেন, আর সেটা আমি তোমার জন্য লুকিয়ে নিয়ে এসেছি...''

কাঁপা হাতে বুড়ি একটা ছোট আদা-মেশানো রুটি তুলে ধরল।

''আমাকে একা থাকতে দাও!'' যাঁতাওয়ালা চীৎকার করে মায়ের হাতটা একপাশে সরিয়ে দিল।

লজ্জায় বুড়ি রুটিটা ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে বাঁধের দিকে এগিয়ে গেল।...এই দৃশ্যটা প্রত্যেককেই ভীষণভাবে নাড়া দিল; সন্ন্যাসীরা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে সভয়ে দুই হাত উপরের দিকে তুলে ধরল; মাতাল ইয়েভ্‌সি সেখানেই জমে গেল আর আতংকে মালিকের দিকে তাকিয়ে রইল। ইয়েভ্‌সি ও সন্ন্যাসীদের মুখের ভাব বুঝতে পেরেছে বলেই হোক, অথবা যে অনুভূতি এতকাল তার বুকের মধ্যে সুপ্ত ছিল এখন সেটা জেগে ওঠার দরুণই হোক, এটা নিশ্চিত যে ভয়ের মতই একটা ভাব ফুটে উঠল যাঁতাওয়ালার মুখে।

সে চীৎকাব করে ডাকল, "মা!"

বুড়ি চমকে চারদিকে তাকাল। যাঁতাওয়ালা অতি দ্রুত পকেটে হাত ঢুকিযে একটা বড় চামড়ার থলি বের করল...

থলিব ভিতর থেকে একমুঠো নোট ও রূপোর মুদ্রা বের করে নীচু গলায় বলল, "এই যে...এগুলি নাও!"

টাকাগুলি সমেত হাতটা উপুড় কবে চেপে ধরল, সন্ন্যাসীদের দিকে তাকাল, আবারও মুঠিতে চাপ দিল। নোট ও রূপোর মুদ্রাগুলো আঙুলের ফাঁক দিযে গলে একটা একটা কবে আবার থলিব ভিতবেই পড়তে লাগল; শেষ পর্যন্ত মাত্র একটা বিশ কোপেকের মুদ্রাই তার হাতে বযে গেল।...যাঁতাওয়ালা সেটাব দিকে একবার তাকাল, দুই আঙুল দিযে সেটাকে ঘসল, একবাব কাশল, তার মুখটা লাল হয়ে উঠল, তাবপব মুদ্রাটা মাকে দিয়ে দিল।

১৮৮৬

বক্তা

Orator



এক সুন্দব সকালে আমবা কলেজিয়েট এসেসব কিরিল আইভানিচ ভাভিলনভ্‌কে কবর দিতে গিযেছিলাম। আমাদের দেশে চলিত দুটি বোগে তাব মৃত্যু হয়েছে ঃ একটি খাণ্ডারনী স্ত্রী ও মদ। শোকযাত্রা যখন গির্জা থেকে বেবিয়ে কবরখানাব দিকে এগোচ্ছে তখন মৃতেব অন্যতম সহকর্মী পপলাভ্‌স্কি নামক একটি যুবক একটা ভাড়াটে গাড়ি নিযে ছুটল বন্ধু গ্রিগবি পেত্রভিচ জাপযকিনেব বাড়ি। বয়স অল্প হলেও জাপয়কিন মোটামুটি জনপ্রিয। অনেক পাঠকই জানেন, এই যুবক একটি বিরল গুণের অধিকারী; বিবাহ-বাসবে, জযন্তী অনুষ্ঠানে, বার্ষিক সভায়, অথবা শোকযাত্রায়—যেখানেই হোক না কেন সর্বত্রই সে চমৎকাব তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দিতে পাবে। যখনই দবকাব তখনই সে বক্তৃতা দিতে পাবে ঃ আধো ঘুমে, খালি পেটে, পাড় মাতাল অবস্থায, অথবা জ্বর গায়ে। তার বক্তৃতার স্রোত চলে একটানা, একভাবে, অপর্যাপ্তরূপে—ড্রেন-পাইপের জলের মত; তাব শব্দ-ভাণ্ডারে এত করুণ বসেব শব্দ আছে যা একটা সবাইখানার আরশোলাব চাইতেও সংখ্যায় বেশী। তাব বক্তৃতা যেমন উত্তেজক তেমনই দীর্ঘ; অনেক সময সেটা এত বেশী হযে পড়ে, বিশেষ কবে ব্যবসায়ীদের বিয়েতে যে তাকে থামাতে পুলিশ ডাকতে হয।

জাপযকিনকে বাড়িতে পেযে পাপলাভ্‌স্কি বলতে লাগল, "তোমার সঙ্গে দেখা কবতেই আমি এসেছি বন্ধু। এখনই কোটটা গায়ে দিযে আমার সঙ্গে

চল! আমাদের জনৈক সহকর্মী মারা গেছেন, আমরা তাকে পরলোকে পাঠাবার সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি ; এতএর একজনকে একটা বিদায় ভাষণ তো দিতেই হবে...আমরা সকলেই তোমার আশায় আছি। যদি নীচু স্তরের কেউ মারা যেত তাহলে তোমাকে টানতাম না, কিন্তু ইনি ছিলেন আমাদের সেক্রেটারি, আপিসের স্তম্ভস্বরূপই বলা যায়। একটা ভাল ভাষণ ছাড়া তাকে বিদায় দেওয়া যাবে না।''

''ওঃ, তোমাদের সেক্রেটারি!'' জাপয়কিন হাই তুলল। ''তিনি তো খুব মাতাল ছিলেন, তাই না?''

''হ্যাঁ, তা ছিলেন। কিন্তু সেখানে প্যান-কেক থাকবে, তোমার জন্য কিছু পানীয়ের ব্যবস্থাও থাকবে ; তোমার গাড়ি ভাড়াও আমরা দেব। কি বল? তার কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, সিসেরোর মত সময়-উপযোগী কিছু কথা বলবে, আর আমরা চিরদিনের মত তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব!''

জাপয়কিন সানন্দে প্রস্তাবটি গ্রহণ করল। চুলগুলো এলোমেলো করে দিল। মুখে একটা বিষণ্ণ ভাব ফুটিয়ে তুলল, তারপর পপ্লাভস্কির সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

গাড়িতে উঠতে উঠতে জাপয়কিন বলল, ''তোমাদের সেক্রেটারিকে আমি জানি। সে একটা দুর্বৃত্ত ও পাজি, ঈশ্বর তার আত্মাকে শান্তি দিন. তার মত লোক খুব কমই আছে।''

''দেখ, যে মারা গেছে তার নিন্দা করা উচিত নয়।''

''অবশ্য নয়। 'অটমর্টুইস নিহিল বেনে'! (যে মৃত তার সম্পর্কে হয় ভাল কথা বলো, না হয় কিছুই বলো না!) কিন্তু তাতে তো আসল সত্যটা বদলে যায় না যে সে ছিল একটি শয়তান।''

দুই বন্ধু শবযাত্রাটিকে ধরে ফেলে তাতে যোগ দিল। শবযাত্রাটি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

কবরখানায় শোক-বার্তা পড়া হল। মৃতের শাশুড়ি, স্ত্রী, স্যালিকা প্রথা অনুসারে অনেক কাঁদল। শবাধারটি যখন কবরে নামানো হল তখন তার স্ত্রী কেঁদে বলল, ''আমাকে ওর সঙ্গে যেতে দাও!'' কিন্তু সে তার সঙ্গে কবরে গেল না, সম্ভবত নিজের পেনসনের কথাটা তার মনে পড়ে গিয়েছিল। সব কিছু সাঙ্গ হবার পরে জাপয়কিন সামনে এগিয়ে এসে চারদিকে সকলকে দেখে নিয়ে বক্তৃতা শুরু করল ঃ

''আমার চোখ ও কানকে কি আমি বিশ্বাস করতে পারি? এ সবই কি একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন মাত্র নয়—এই শবাধার, এই অশ্রুসিক্ত মুখগুলি, এই আর্তনাদ ও বিলাপ। হায়, এটা স্বপ্ন নয়, আমাদের চোখ প্রতারণা করে না! যে মানুষটি সেদিনও দেখেছি কত প্রফুল্ল, কত যৌবনের শক্তিতে ভরপুর, এই তো সেদিনও আমাদের চোখের সামনে যে ক্লান্তিহীন মৌমাছির মত দেশের সম্পদরূপ মৌচাকের জন্য মধু বয়ে এনেছে, যে মানুষ...সেই মানুষটিই আজ ধূলায় পরিণত হয়েছে। অনিবার্য মৃত্যু তার শীতল হাতখানি

তার মাথায় রেখেছে এমন একটা সময়ে যখন পরিণত বয়স হওয়া সত্ত্বেও সে ছিল সামর্থ্যের একেবারে শীর্ষে, নব নব আশায় উজ্জ্বল। এ ক্ষতি অপূরণীয়! কে তার শূন্য স্থান পূর্ণ করবে? আমাদের অনেক ভাল ভাল অফিসার আছে, কিন্তু প্রোকফি ওসিপিস ছিল একম্ অদ্বিতীয়ম্! অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত সে ছিল স্বীয় কর্তব্যে আত্মনিবেদিত, নিজের শক্তি নিয়োগে সে কখনও কার্পণ্য করত না, রাতে ঘুমত না, কাউকে ভয় করত না, কারও অনুগ্রহ ভিক্ষাও করত না।....যারা তার জনকল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টাকে কিনে নিতে চেষ্টা করত, নানাবিধ প্রলোভন দেখিয়ে যারা তাকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করতে চেষ্টা করত, তাদের সে কত না ঘৃণা করত! আমাদের চোখের সামনেই প্রোকফি ওসিপিচ তার সামান্য উপার্জনের একটা বড় অংশ গরিব বন্ধুদের দান করত; আর আজ এইমাত্র আপনারাও শুনতে পেলেন সেই সব বিধবা ও অনাথ শিশুদের বিলাপ-ধ্বনি যারা তার দান নিয়েই এতদিন বেঁচে ছিল। সরকারী কর্তব্য ও সৎকর্মে অবিচল সেই মানুষটি জীবনের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল, এমন কি পারিবারিক জীবনের সুখ থেকেও সে ছিল চিরবঞ্চিত; আপনারাও জানেন যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে ছিল অবিবাহিত। আর বন্ধু হিসাবে কে তার বিকল্প হতে পারত? আমি তো এখনও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তার সেই হাসিভরা, পরিষ্কার করে কামানো মুখখানি। প্রোকফি ওসিপিচ, তুমি শান্তি লাভ কর। একটা মহৎ, সৎ পরিশ্রমী মানুষের যোগ্য শান্তিতে তুমি বিশ্রাম কর!''

জাপয়কিন এইভাবে বলেই চলল, আর তার শ্রোতারা ফিস্‌ফিস্ শুরু করে দিল। তার বক্তৃতা সকলেরই ভাল লাগছে, কয়েক ফোঁটা চোখের জলও পড়েছে, তবে অনেক কিছুই তারা বুঝতে পারে নি। প্রথমত, মৃত লোকটিকে অন্য সকলেই যখন কিরিল আইভানিচ বলে ডাকত তখন বক্তাটি কেন যে তাকে প্রোকফি ওসিপিচ বলে উল্লেখ করছে সেটা কেউ বুঝতে পারে নি। দ্বিতীয়ত, সকলেই জানে মৃত লোকটি সারা জীবন তার আইন মোতাবেক বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে দিনরাত ঝগড়া করেছে, সুতরাং তাকে অবিবাহিত বলা চলে না। তৃতীয়ত, আগাগোড়াই তার একটা ঘন লাল দাড়ি ছিল, আর জন্মের দিন থেকে সে কখনও দাড়ি-গোঁফ কামায় নি, সুতরাং বক্তা যে কেন তাকে পরিষ্কার কামানো মুখ বলে উল্লেখ করেছে সেটাও কেউ বুঝতে পারে নি। শ্রোতারা হতবুদ্ধি হয়ে এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর কাঁধ ঝাঁকাচ্ছে।

বক্তা তখন কবরের দিকে তাকিয়ে বলে চলেছে, ''প্রোকফি ওসিপিচ, তোমার মুখটা অসুন্দর, এমন কি কুৎসিতও হতে পারে, কিন্তু তুমি ছিলে বিষণ্ন ও কঠোর, কিন্তু আমরা সকলেই জানতাম যে এই মিথ্যার অন্তরালে বাস করত একটি সৎ, দয়ালু হৃদয়!''

একটু পরেই শ্রোতারা তার মধ্যেও একটা বিচিত্র ভাব দেখতে পেল। তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল, সে কাঁপতে শুরু করল, আর কেবলই কাঁধে

ঝাঁকুনি দিতে লাগল। হঠাৎ সে বক্তৃতা থামিয়ে দিল, তার চোয়াল ঝুলে পড়ল, তার পরেই পপ্‌লাভস্কির দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, "শোন, সে এখনও বেঁচে আছে!"

"কে?"

"কেন, প্রোকফি অসিপিচ! কবরের পাথরটার পাশেই তো সে দাঁড়িয়ে আছে!"

"কিন্তু সে তো মারা যায় নি; মারা গেছে তো কিরিল আইভানিচ!"

"কিন্তু তুমি তো বলেছিলে তোমাদের সেক্রেটারিকেই কবর দেওয়া হচ্ছে!"

"কিরিল আইভানিচই তো আমাদের সেক্রেটারি ছিলেন। তুমিই ভুলটা করেছ বুদ্ধুরাম! এটা সত্যি যে প্রোকফি ওসিপিচ একসময় আমাদের সেক্রেটারি ছিল, কিন্তু দু'বছর আগে তাকে আমাদের দ্বিতীয় বিভাগে বদলি করা হয়েছে।"

"ধুত্তেরি! সে কথা আমি জানব কেমন করে?"

"তুমি থামলে কেন? চালিয়ে যাও, নইলে সব গোলমাল হয়ে যাবে!"

জাপয়কিন কবরের দিকে ঘুরে আবার নতুন উদ্যমে বক্তৃতা শুরু করল। দাড়িগোঁফ কামানো বৃদ্ধ প্রোকফি ওসিপিচ সত্যি সত্যি কবরের পাথরের পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল বক্তার দিকে।

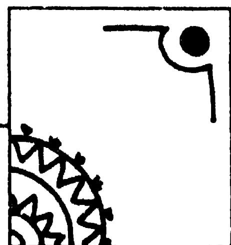
কবরখানা থেকে ফিরতে ফিরতেই মৃতের সহকর্মীরা চীৎকার করে উঠল, "এ কী কাণ্ড! জ্যান্ত মানুষকে কবর দেওয়া!"

প্রোকফি ওসিপিচ জাফয়কিনকে খেঁকিয়ে উঠল, "কাজটা ভাল কর নি যুবক। তোমার বক্তৃতা একজন মৃত মানুষের বেলায় ঠিক আছে, কিন্তু একজন জীবিত মানুষের পক্ষে সেটা পরিহাস ছাড়া কিছু নয়। আমাকে মাফ করো, তুমি তো বললে ঃ কাউকে ভয় করে না, কারও অনুগ্রহও চায় না, ঘুষ নেয় না। একজন জীবিত মানুষ সম্পর্কে এ কথাগুলি একমাত্র ঠাট্টা করেই বলা যায়। আর আমার মুখ নিয়ে কথা বলতে তো তোমাকে কেউ বলে নি। আমি অসুন্দর, কুৎসিত— তা হতে পারে; কিন্তু প্রকাশ্যে আমার মুখ দিয়ে সে কথা বলানো হবে কেন? এটা অত্যন্ত অসম্মানজনক!"

১৮৮৬

একটি শিল্প-কর্ম

A Work of Art



মাব একমাত্র ছেলে সাশা স্মার্নভ ''স্টক এক্সচেঞ্জ নিউজ''-এব ২৩ তাবিখেব সংখ্যাটা দিয়ে জড়ানো একটা প্যাকেট বগলে করে মুখটা বেঁকিয়ে ডাক্তাব কোশেনকভেব অস্ত্র চিকিৎসালয়ে ঢুকল।

ডাক্তাব তাকে সাদব অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, ''ও:, আমাব যুবক বন্ধু! আজ আমবা কেমন আছি বল? আশা কবি, ভালই?''

সাশা চোখ পিট-পিট করে বুকেব উপব হাত বেখে আবেগেব সঙ্গে বলতে শুরু কবল :

''আইভান নিকোলায়েভিচ, মামণি তাব সশ্রদ্ধ নমস্কাব জানিয়ে আমাকে বলেছে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে আমি তাব একমাত্র ছেলে, আব আপনি আমাব জীবন বক্ষা করেছেন আমাব একটা মাবাত্মক বোগ নিবাময় করেছেন, আব কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব তা আমবা দু'জনেই জানি না।''

খুশিতে ডগমগ হয়ে ডাক্তাব তাকে বাধা দিয়ে বলল, ''এ কথা বলে না যুবক। আমাব জায়গায় থাকলে অন্য যে কেউ যা কবত আমি শুধু সেইটুকুই করেছি।''

''আমি মাব একমাত্র ছেলে আমবা গবিব মানুষ, আপনাব এতবড় প্রচেষ্টাব উপযুক্ত মূল্য দিতে আমবা পাবব না আমবা খুবই লজ্জিত ডাক্তাব, যদিও, অবশ্য মামণি ও আমি আমি তাব একমাত্র ছেলে, আমাদেব একান্ত প্রার্থনা আমাদেব কৃতজ্ঞতাব এ নিদর্শনটি আপনি গ্রহণ করুন জিনিসটা খুবই ছোট যা এটা খুবই মূল্যবান জিনিস, ব্রোঞ্জেব পুবাবস্তু, একটি বিবল শিল্পকর্ম।''

''এব কোন দবকাব ছিল না।'' ডাক্তাব ভ্রূকুটি কবল।

''না, দয়া করে আপত্তি কববেন না,'' প্যাকেটটা খুলতে খুলতেই সাশা অবিবাম বকতে শুরু কবল। ''আপনি এটা গ্রহণ না কবলে মামণি ও আমি দু'জনেই মনে আঘাত পাব জিনিসটা খুব সুন্দব ব্রোঞ্জেব পুবাবস্তু আমাব স্বর্গত বাপু এটা দিয়ে গেছেন, আব আমবা এটাকে এতদিন বেখেছি অতিপ্রিয় স্মৃতি হিসাবে বাপু ব্রোঞ্জেব পুবাবস্তু পেলেই কিনতেন আব পুবাবস্তু সংগ্রহকাবীদেব কাছে বেচে দিতেন এখন মামণি ও আমি সেই ব্যবসাটাই চালাচ্ছি''

জড়ানো কাগজটা খুলে সাশা বস্তুটিকে সযত্নে টেবিলেব উপব বাখল। সেকেলে ব্রোঞ্জেব তৈবী ছোট একটা বাতিদান, অতি সূক্ষ্ম শিল্পকর্মেব

নিদর্শন। তাতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এমন দুটি ঈভের পোশাক-পরা নারী মূর্তি যার বর্ণনা দেবার মত দুঃসাহস বা মনোবৃত্তি কোনটাই আমার নেই। মূর্তি দুটি কটাক্ষের ভঙ্গী করে হাসছে আর দেখে মনে হচ্ছে বুঝি এখনই বেদী থেকে লাফিয়ে নেমে ওরা এমন হৈ হল্লা ও আমোদ-প্রমোদ শুরু করবে যা পাঠকের কাছে কল্পনারও অতীত কুরুচিপূর্ণ বলে মনে হবে; আরও মনে হচ্ছে, মোমবাতির হোল্ডারগুলিকে দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরে থাকতে বাধ্য হয়েছে বলেই তারা স্ব স্ব স্থান ত্যাগ করতে পারছে না।

ডাক্তার উপহারটিকে দেখল, ধীরে ধীরে কান চুলকাল, শাই শাই করে নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর নাক ঝাড়তে শুরু করল।

তো-তো করে বলল, ''হ্যাঁ, বস্তুটি সত্যিই সুন্দর। কিন্তু এটা আমি রাখি কোথায়...এটা তো...এটা তো রুচিসম্মত নয়...মানে গলা ও গর্দান খোলাই শুধু নয়, এটাকে যে ঠিক কি বলা যায় তা কেবলমাত্র শয়তানই জানে...''

'আপনি কি বলছেন?''

''যে সাপটা একদা ঈভকে ভুলিয়ে বিপথগামী করেছিল সেও এর চাইতে অশ্লীল কিছু ভাবতেই পারত না। ঐন্দ্রজালিকের অদ্ভুত চিত্রাবলীর অনুরূপ একটি শিল্পকর্মকে আমার টেবিলে রাখলে পুরো বাড়িটাই অপবিত্র হয়ে যাবে।''

আহত স্বরে সাশা বলল, ''শিল্পকে কী অদ্ভুত দৃষ্টিতে আপনি দেখেন ডাক্তার! এটি একটি শিল্প-কর্ম, একবার ভাল কর দেখুন। কী সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব, আপনার হৃদয় শ্রদ্ধায় ভরে উঠবে, চোখের জলে গলা আটকে আসবে। এমন সুন্দর কিছু দেখলে জাগতিক সব কিছু আপনি ভুলে যাবেন ঃ ভাল করে লক্ষ্য করুন, এই গতি, এই ভাব, এই প্রকাশভঙ্গী!''

ডাক্তার বাধা দিয়ে বলল, ''এ সবই আমি বুঝি বাছা, কিন্তু আমার একটা পরিবার আছে, বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে আছে, আর মহিলাবাও আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন।''

''অবশ্য আপনি যদি জনতার দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে দেখেন,'' সাশা বলল, ''তাহলে অবশ্য এ উঁচু মানের শিল্প-বস্তুটিকে একটা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হবে...কিন্তু ডাক্তার, নিজেকে জনতার ঊর্ধ্বে তুলে ধরুন, বিশেষ করে আপনার এই প্রত্যাখ্যান যখন আমাকে ও মামণিকে দুঃখ দেবে। আমি মার একমাত্র ছেলে...আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন...আমাদের সব চাইতে মূল্যবান বস্তুটি আমরা আপনাকে দিচ্ছি, এটা এক জোড়ার অন্যতম, অপরটি আমাদের কাছে নেই তাই আপনাকে দিতে পারছি না বলে আমরা দুঃখিত...''

''তোমাকে ধন্যবাদ বাছা, আমি খুবই কৃতজ্ঞ...আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা তোমার মামণিকে জানিও, কিন্তু, প্রভুর দোহাই, নিজেই ভেবে দেখ, আমার বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে আছে, মহিলারা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন...ওঃ, ঠিক আছে, এটা থাকুক! আমি তোমাকে বোঝাতে পারব

না।''

সাশা মনের সুখে বলল, ''কিন্তু এতে তো বোঝাবুঝির কিছু নেই। বাতিদানটিকে এই পাত্রটির পাশে ঠিক এইখানে রেখে দিন। এটা খুবই দুঃখেব যে পুরো জোড়াটা আমাদের কাছে নেই। কী দুঃখের কথা! আচ্ছা চলি ডাক্তার!''

সাশা চলে যাবার পরে ডাক্তার বাতিদানটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বইল, আর বিচলিতভাবে কান চুলকোতে লাগল।

নিজের মনেই বলতে লাগল, ''এটা একটা আশ্চর্য জিনিস, সেটা অস্বীকার করা যায় না, আর এটাকে ফেলে দিতে হলে সেটা খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে। কিন্তু আমি ওটা রাখতে পারি না।...হুম!...কী সমস্যা...ভেবেই পাচ্ছি না এটাকে উপহার হিসাবে কাকে দিতে পারি?''

অনেক ভেবেচিন্তে তার মনে পড়ল প্রিয় বন্ধু সলিসিটর উখভের কথা। তার কোন্ একটা ব্যাপারের দেখাশোনা করাব জন্য বন্ধুর কাছে সে ঋণী।

ডাক্তার সিদ্ধান্ত করল, ''এটাই ভাল। বন্ধু হিসাবে সে আমার কাছ থেকে টাকা নেবে না, অতএব একটা জিনিস দিয়ে ঋণ শোধ করলে সেটা উচিত কাজই হবে। সুতরাং এ শয়তানী বস্তুটি তাকেই দিয়ে আসা যাক। আর যাই হোক, সে অবিবাহিত আব মোটামুটি একটা উচ্ছৃংখল জীবনই যাপন করে...''

কালবিলম্ব না করে ডাক্তার কোটটা গায়ে চাপিয়ে বাতিদানটা সঙ্গে নিয়ে বন্ধু উকভের বাড়ি গেল।

সলিসিটরকে বাড়িতে পেয়ে বলে উঠল, ''হ্যালো বৃদ্ধ! তোমাকেই দেখতে এলাম...আমাব জন্য যে সব কাজ তুমি করেছ তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি।...আমি জানি তুমি টাকা নেবে না, এতএব অন্তত এই ক্ষুদ্র উপহারটি নাও...জিনিসটা ক্ষুদ্র, কিন্তু একটি চমৎকাব শিল্প-কর্ম!''

বাতিদানটা দেখেই সলিসিটর বর্ণনাতীত উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে উঠল।

হাসতে হাসতে বলল, ''কী একখানা জিনিস! একমাত্র শয়তানই এব কদর বোঝে। চমৎকার জিনিস! আশ্চর্য জিনিস! এই বিস্ময়কর বস্তুটি কোথায় পেলে?''

কিন্তু উচ্ছ্বাসটি শেষ হতেই সলিসিটর সভয় দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, ''কিন্তু বন্ধু, তোমার উপহার তুমি রেখ দাও। আমি এটা নিতে পারব না।''

''কেন পারবে না?'' ডাক্তার দুঃখের সঙ্গে প্রশ্ন করল।

''কারণ, দেখ...আমার মা মাঝে মাঝেই আমাব সঙ্গে দেখা করতে আসেন, আর আমার মক্কেলরাও আসে আর আমি চাই না যে চাকররা আমার বাড়িতে এসব জিনিস দেখে।''

ডাক্তার চীৎকার করে বলল, '' না না, এটা ফিরিয়ে দেবার কথা মনেও এনো না! তোমার দিক থেকে সেটা খুবই অভদ্র ব্যাপার হবে। এটা একটা

শিল্প-কর্ম...কী গতি, কী ভাবের প্রকাশ!..আমি কোন কথা শুনব না! তুমি কি আমাকে অপমান করতে চাও?''

''শুধু যদি তাদের শরীরে আবরণ থাকত, সামান্যমাত্র আবরণ, ধর তাদের দেহে কয়েকটা ডুমুরের পাতাও যদি থাকত...''

কিন্তু ডাক্তার বলতে গেলে একলাফে দরজাটা পার হয়ে গেল; উপহারের হাত থেকে যে রেহাই পাওয়া গেল তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে সে বাড়ি চলে গেল। সলিসিটর একা বসে বাতিদানটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। সেটার উপর আঙুল বুলাল এবং ডাক্তারের মতই অনেকক্ষণ ধরে মাথা ঘামাতে লাগল—জিনিসটাকে নিয়ে সে কি করবে।

ভাবতে লাগল, ''জিনিসটি সুন্দর। ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াটা লজ্জার ব্যাপার হবে কিন্তু ওটাকে নিজের কাছে রেখে দেওয়ার কথাও তো ভাবাই যায় না। এটা অন্য কাউকে দিয়ে দিলেই সব চাইতে ভাল হয়। ঠিক আছে, আজ সন্ধ্যায়ই এটা সঙ্গে নিয়ে কমেডিয়ান শাশ্‌কিন্‌কে দিয়ে আসব। লোকটা মহা বদ, এই সব জিনিসই ভালবাসে, আর তাছাড়া আজ সন্ধ্যায়ই একটা সাহায্য রজনী উপলক্ষ্যে সে অভিনয় করছে....''

সেই কাজই করা হল। বাতিদানটাকে সযত্নে জড়িয়ে নিয়ে সন্ধ্যায় সেটা উপহার দেওয়া হল হাস্যরসের অভিনেতা শাশ্‌কিনকে। সারা সন্ধ্যাটা অভিনেতাটির সাজ ঘরে ভিড়ে ভেঙে পড়ল; সকলেই হাজির হল উপহারটি দেখে নয়ন সার্থক করতে ঃ সপ্রশংস গুঞ্জনে অশ্বের হ্রেষার মত হাসির শব্দে সাজ ঘরটা অবিরাম ভরে থাকল। যদি কোন অভিনেত্রী দরজার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করত যে সে ঘরে ঢুকতে পারে কি না, তখনই হাস্যরসের অভিনেতাটি তাকে বলে দিতঃ

''আরে, না গো! আমার পোশাকই পরা হয় নি!''

নাটক শেষ হলে অভিনেতাটি অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল।

সে প্রশ্ন করতে লাগল, ''এই নোংরা জিনিসটা নিয়ে আমি কি করি? মানে আমি একটা রুচিসম্পন্ন পরিবারের সঙ্গে বাস করি! সেখানে অনেক অভিনেত্রীরা আসেন। এটা তো একটা ফটোগ্রাফ নয় যে দেরাজের মধ্যে লুকিয়ে রাখব!''

তার জামা খুলতে খুলতে নাপিত পরামর্শ দিল, ''কিন্তু স্যার, আপনি তো এটা বেচে দিতে পারেন। কাছেই একজন বৃদ্ধা থাকেন; তিনি ব্রোঞ্জের পুরাবস্তু কিনে থাকেন। আপনি গিয়ে স্মার্নভার খোঁজ করুন, সকলেই তাকে চেনে।''

অভিনেতাটি নাপিতের পরামর্শ শুনল...কয়েকদিন পরে ডাক্তার কোশেল্‌কভ তার অস্ত্র-চিকিৎসালয়ে বসে ছিল। কপালের উপর একটা আঙুল চেপে ধরে সে পিত্ত-অম্লের কথা ভাবছিল। হঠাৎ দরজা খুলে সাশা স্মার্নভ সবেগে ঘরে ঢুকল। তার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল, সারা শরীর থেকে যেন খুশি ঝরে পড়ছে...তার হাতে খবরের কাগজে মোড়া একটা জিনিস।

হাঁপাতে হাঁপতে সে বলল, ''ডাক্তার! আমার খুশির কথাটা ভাবুন! আপনি কত ভাগ্যবান, বাতিদানের জোড়ার অপরটি ভাগ্যক্রমে আমাদের হাতে এসে পড়েছে! মামণি খুব খুশি হয়েছে...আমি মার একমাত্র ছেলে...আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন...

কৃতজ্ঞতার আবেগে কাঁপতে কাঁপতে সাশা ডাক্তারের টেবিলের উপর বাতিদানটা রাখল। ডাক্তার হা করে কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু মুখ থেকে কোন শব্দ বের হল না; তার জিভটা অবশ হয়ে গেছে।

১৮৮৬

ভাংকা

Vanka



নয় বছরের ভাংকা জুখভ তিন মাস হল চর্মকার আলিয়াখিনের কাছে শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ করছে। খৃস্টমাস সন্ধ্যায় সে এখনও শুতে যায় নি! তাব মালিক ও তার বৌ এবং পুরনো শিক্ষানবীশরা গির্জায় চলে যাবার পরে সে দেয়াল-আলমারি থেকে কালিব বোতল ও মরচে-ধরা নিবওয়ালা একটা কলম নামিয়ে আনল, এক তা কুঁচকানো কাগজ টান করে বেঞ্চের উপর পাতল, তারপর লিখতে বসল। লেখা শুরু করার আগে সে বারকয়েক দরজা-জানালাব দিকে তাকাল, অন্ধকার বিগ্রহকে ভাল করে দেখল, বিগ্রহের দুই পাশে জুতোর 'লাস্ট' গুলো ছড়িয়ে রাখা হয়েছে; ভাংকা মেঝের উপব হাঁটু ভেঙে বসল।

সে লিখল, ''প্রিয় দাদু কনস্তান্তিন মাকারিচ, আমি তোমাকে চিঠি লিখছি। তোমাকে খৃস্টমাসের সাদর সম্ভাষণ জানাই; আশা করি ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ পাঠাবে। আমার বাবা নেই, মা নেই, একমাত্র তুমি আছ।''

ভাংকা অন্ধকার জানালার শার্সির দিকে তাকাল। শার্সির উপব মোমবাতির কম্পিত শিখার প্রতিবিম্ব পড়েছে। সে কল্পনায় তার দাদু কনস্তান্তিন মাকারিচকে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল। সে ছিল ঝিভারেভ নামক এক ভদ্রলোকের জমিদারির রাতের পাহাবাদার। পঁযষট্টি বছরের ছোটখাট চামড়াসর্বস্ব বৃদ্ধ মানুষ, কিন্তু যেমন জীবন্ত তেমনই কর্মচঞ্চল, হাসি-হাসি মুখ, মদের নেশায় ক্ষীণ দৃষ্টি। দিনের বেলায় হয় রান্নাঘরের পিছন দিকে পড়ে ঘুমায়, নয় তো রাঁধুনি ও রান্নাঘরের মেয়েদের সঙ্গে বসে হাসি-তামাসা করে, আর রাত হলে ভেড়ার চামড়ার বড় কোটটা গায়ে চাপিয়ে ডুগডুগিটা বাজিয়ে বাড়ির চারদিকে ঘুবে ঘুরে হাঁটে। তার পিছন পিছন মাথা নিচু করে চলে

বুড়ো কাশ্‌তাংকা ও একটা কুকুর : কাশ্‌তাংকার কালো কোট ও ভোঁদবের মত শরীবের জন্য তাকে ঈল্‌ বলে ডাকে। পবিচিত অপরিচিত সকলেব দিকেই সে কাতব দৃষ্টিতে তাকায়, কিন্তু কেউ তার উপর ভরসা করতে পারে না। চুবি কবতে, পায়ে একটা কামড় বসাতে, বরফ-ঘবে লুকিয়ে ঢুকতে, অথবা চাষীর মুবগিব বাচ্চা চুরি কবতে সে সমান ওস্তাদ। পিটিয়ে পিটিয়ে তাব পিছনেব ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েছে, দু'বার তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে তাকে চাবুক মেরে মেবে আধমবা করে ফেলা হয়েছে, কিন্তু সে সব ঝেড়ে ফেলে বহাল তবিয়তেই আছে।

সেই মুহূর্তে তাব বুড়ো দাদু হয়তো ফটকে দাঁড়িয়ে গির্জাব জানালা দিয়ে আসা উজ্জ্বল লাল আলোব দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আর বুটের শব্দ কবে ঘোবে। ডুগডুগিটা তাব কোমববন্ধের সঙ্গে বাঁধা আছে। হয় তো হাত দুটো বাড়িয়ে ঠাণ্ডা এড়াতে জড়সড় হয়ে থাকে, আব মুখ টিপে হেসে হেসে বাঁধুনি বা দাসীর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা কবে।

"এক টিপ নাও," নস্যির কৌটোটা মেয়েদের দিকে বাড়িয়ে বলে।

মেয়েরাও হয়তো এক টিপ নিয়ে হাঁচি দিতে থাকে। দাদু তাতে খুব মজা পায়, হো-হো করে হেসে চেঁচিয়ে বলে, "জমে যাওয়া নাকেব পক্ষে খুব ভাল!"

এমন কি সে কুকুব দুটোকেও নস্যি দেয়। কাশতাংকা হাঁচি দেয়, তারপব রাগ করে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে যায়। কিন্তু ঈল্‌টা ভদ্র, সে হাঁচি দেয় না, লেজটা নাড়তে থাকে, আবহাওয়া চমৎকাব, বাতাস স্থিব, পরিস্কার ও তাজা। অন্ধকার বাত। কিন্তু পুরো গ্রামটা, তার সাদা সাদা ছাদ, চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। গাছপালা, পাতার রূপোলি শিশিরবিন্দু, ধাবমান ববফের কুঁচি- সবই স্পষ্ট দেখা যায়। আকাশে ছড়িয়ে আছে তারাদের ঝিকিমিকি, আব ছায়াপথটা এত স্পষ্ট যে মনে হয় বুঝি উৎসব উপলক্ষে নতুন করে ঘসে-মেজে ববফ দিয়ে পালিশ করা হয়েছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাংকা কালিতে কলম ডুবিয়ে আবার লিখতে লাগল :

"আর গতকাল আমি খুব পিটুনি খেয়েছি। মালিক আমার চুল ধবে টানতে টানতে উঠোনে নিয়ে কোমরবন্ধটা দিয়ে আমাকে মেবেছে, কারণ তাদের খোকনের দোলনাটা দোলাতে দোলাতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। গত সপ্তাহে একদিন কর্ত্রীঠাকরুণ আমাকে একটা হেরিং মাছের নাড়িভুঁড়ি বের করতে দিয়েছিল, আমি কাজটা লেজের দিক থেকে শুরু করছিলাম বলে মাছের মাথাটাই আমার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। অন্য শিক্ষানবীশরা আমাকে নিয়ে মজা করে, আমাকে শুঁড়িখানায় পাঠায় ভদ্‌কা আনতে আব মালিকের কাঁকুড় চুরি করতে, আর মালিক হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে আমাকে পেটায়। এখানে খাবারও কিছু পাই না। সকালে রুটি দেয়, দুপুরে খিচুড়ি দেয়, সন্ধ্যায় আবার রুটি দেয়। কিন্তু একদিনও চা বা বাঁধাকপির ঝোল দেয় না, সেগুলো তারা নিজেরাই গেলে। তাবা আমাকে শুতে দেয়

ছোট পথটার পাশে আর তাদের খোকন যখন কাঁদতে থাকে তখন সারারাত আমি ঘুমতে পারি না, কারণ সারাক্ষণ তাকে দোলাতে হয়। দাদুগো, প্রিয় প্রভুর দোহাই, আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও, গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাও. আর আমি এখানে থাকতে পারছি না। ওঃ দাদুগো, তোমাকে মিনতি করছি, সব সময় তোমার জন্য প্রার্থনা করব, আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও, নইলে আমি মরে যাব।..."

ভাংকার ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল, কালি-লাগা হাত দিয়ে চোখ মুছল, তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সে লিখেই চলল, " আমি তোমার নস্যি গুঁড়ো করে দেব, তোমার জন্য প্রার্থনা করব, অন্যায় করলে আমাকে যেমন খুশি চাবুক মেরো। আর তুমি যদি মনে কর যে ওখানে আমার করবার মত কোন কাজ নেই তাহলে আমিই নায়েবমশায়কে বলব তিনি যেন দয়া করে জুতো পালিশ করার কাজটা আমাকে দেন, অথবা ফেদিযাব বর্দলি হিসাবে বাখালের কাজটাই আমি করব। দাদুগো, আমি আর সহ্য করেত পারছি না, এখানে থাকলে আমি মরে যাব। একবার ভেবেছিলাম পায়ে হেঁটেই পালিয়ে গ্রামে চলে যাব, কিন্তু আমার জুতো নেই, আব তুষারপাতকে আমি বড় ভয় করি। আর আমি যখন বড় হব তখন তোমার দেখাশোনা করব, কেউ যাতে তোমাকে আঘাত দিতে না পারে সেটা দেখব, আর তুমি যখন মরে যাবে তখন তোমার আত্মার জন্য আমি প্রার্থনা করব, ঠিক যেমনটি করি আমার মামণির জন্য।

"মস্কো ইয়া বড় শহব। এখানে কত ভদ্রলোকের বাড়ি আছে, অনেক ঘোড়া আছে, কিন্তু একটাও ভেড়া নেই, আর কুকুরগুলো তত হিংস্র নয়। খৃস্টমাসের সময় ছেলেরা 'তারকা' নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না, তারা তোমাকে গির্জাতে গান গাইতে দেবে না, আর একদিন আমি দেখেছি দোকানে বড়শি, ছিপ, সুতো সব বিক্রি হয়, যে কোন রকম মাছ ধরার মত ভাল ভাল সব জিনিস, একটা বড়শি দেখলাম যা দিয়ে দুই পুড ওজনের মাছও ধরা যায়। আবার অনেক দোকানে দেখেছি, বাড়িতে মনিবের যেমন আছে তেমনই অনেক রকমের বন্দুক আছে ; তার দাম নিশ্চয়ই একশ' রুব্‌ল্‌ করে হবে। কষাইয়ের দোকানে বিল-মোরগ ও বন-মোরগ আর খরগোস পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলো কোথায় শিকার করা হয়েছে তা বলে না।

"দাদুগো, একবার যখন বড় বাড়িতে খৃস্টমাসের গাছ বানানো হবে তখন আমার জন্য একটা গিল্টি-করা বাঁচি এনে সবুজ সিন্দুকটার মধ্যে রেখে দিও। মিস ওল্‌গার কাছ থেকে চেয়ে নিও, বলো যে ভাংকার জন্য এটা চাই।"

একটা গভীব দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ভাংকা আবার জানালার শার্সির দিকে তাকাল। তার মনে পড়ল, ভদ্রজনদের জন্য খৃস্টমাস গাছ আনতে যাচ্ছে তার দাদু, সঙ্গে চলেছে তার নাতি। আঃ, সে যে কী সুখের দিনই ছিল! দাদু একটা ডাক ছাড়ল, অমনি বরফ-ঢাকা জঙ্গলটাই তার প্রতিধ্বনি করল, আর

তাই দেখে ভাংকাও হাঁক দিল। ডুমুর গাছটা কেটে ফেলার আগে দাদু একবার পাইপ টানল, অনেকখানি নস্যি নাকে দিল, আর ভাংকাকে কাঁপতে দেখে হোহো করে হেসে উঠল।....ডুমুরের চারাগাছগুলি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, যেন তাদের মধ্যে কে আগে মরবে সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। হঠাৎ একটা খরগোস একলাফে বরফের স্রোতটাকে পার হয়ে তীর গতিতে ছুটে এল আর দাদু চেঁচিয়ে বলল ঃ

''ধর,ধর...ওটাকে ধর! তবে রে লেজকাটা শয়তান!''

দাদু গাছটাকে টানতে টানতে বড় বাড়িতে নিয়ে এল, আর তারাও গাছটাকে সাজাতে শুরু করল...ভাংকার প্রিয়জন মিস ওল্গাই সকলের চাইতে বেশী ব্যস্ত। ভাংকার মা পেলাগেয়া তখন বেঁচেছিল, বড় বাড়িতেই কাজ করত। মিস ওল্গা ভাংকাকে মিষ্টি দিত, মনের সুখেই তাকে পড়তে, লিখতে ও একশ' পর্যন্ত গুণতে শেখাত, এমন কি কোয়াড্রিল নাচও শেখাত। কিন্তু পেলাগেয়া মারা গেলে বাপ-মা-মরা ভাংকাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল পিছনের রান্নাঘরে তার দাদুর কাছে, আর সেখান থেকে মস্কোতে চর্মকার আলিয়াখিনের কাছে।...

ভাংকা লিখেই চলল, ''দাদুগো, আমার কাছে চলে এস। খৃস্টের নামে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি, এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাও। বাপ-মা-হারা এই দুঃখী ছেলেটাকে করুণা কর; ওরা সব সময় আমাকে মারে, আমি সব সময় ক্ষুধার্ত থাকি, এখানে আমি যে কত কষ্টে আছি তা তোমাকে বলতে পারি না, সারাক্ষণ আমি কেবল কাঁদি। একদিন মনিব আমার মাথায় 'লাঠি' দিয়ে মারল, আমি মাটিতে পড়ে গেলাম, ভাবলাম আর কোন দিন উঠতে পারব না। আমার এই দুঃখের জীবন কুকুরেরও অধম। আলিওনা, একচক্ষু ইয়েগর ও কোচোয়ানকে আমার ভালবাসা পাঠালাম; আমার বাজনাটা কাউকে দিও না। আমি তোমার নাতি আইভান ঝুকভ, দাদুগো তুমি এস।''

ভাংকা কাগজটাকে চার ভাঁজ করে একটা খামে ভরল; আগের দিন এক কোপেক দিয়ে খামটা কিনেছিল...তারপর একটু ভেবে দোয়াতে কলমটা ডুবিয়ে লিখল ঃ ''দাদু''; মাথাটা চুলকে আবার ভেবে যোগ করল ঃ

''কনস্তান্তিন মাকারিচ-এর গ্রামে''

কেউ তার খেলায় বাধা না দেওয়ায় খুশি হয়ে সে টুপিটা মাথায় দিল, তারপর শার্টের উপর কোটটা না পরেই ছুটে রাস্তায় নেমে গেল।

আগের দিন কষাইখানার দোকানিকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলেছিল সব চিঠি চিঠির বাক্সে ফেলতে হয়, আর সেই সব বাক্স থেকে চিঠিগুলি পৃথিবীর সর্বত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয় ডাক-গাড়িতে করে। ডাক-গাড়িগুলি তিন ঘোড়ায় টানে, মাতাল কোচোয়ান সেটা চালায়, আর তাতে টুং-টাং করে ঘণ্টা বাজে। ভাংকা সব চাইতে কাছের ডাক-বাক্সটা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে মহা মূল্যবান চিঠিটা তার ফাঁক দিয়ে ফেলে দিল।

এক ঘণ্টা পরে গোলাপি স্বপ্নের আবেশে সে গভীর ঘুমে ঢলে

পড়ল...স্বপ্নে দেখল একটা স্টোভ....স্টোভের তাকের উপব বসে আছে তার দাদু ; খালি পা দুটো ঝুলিয়ে একটা চিঠি পড়ে রাধুনিদেব শোনাচ্ছে...স্টোভের সামনে ঈল একবার এগোচ্ছে, একবার পেছুচ্ছে আর লেজটা নাড়ছে।

১৮৮৬

পথের দেখা

On the Road



এক খণ্ড সোনালী মেঘ ঘুমিয়েছিল পাহাড়ের কাঁধে মাথা রেখে।

—লার্মন্তভ

সেমিয়ন চিস্তোপ্লুই নামক জনৈক কসাক তাব সবাইখানাব একটা ঘরের নাম দিয়েছিল 'ক্ষণিকেব অতিথি.'' কাবণ সে ঘবটা নির্দিষ্ট থাকত কেবলমাত্র সেই পথে যাতায়াতকাবী পর্যটকদের জন্য। সেই ঘরেব বড় টেবিলের পাশে বসেছিল বছর চল্লিশ বয়সের একটি বৃষস্কন্ধ মানুষ। একটা হাতের উপর মাথা রেখে টেবিলের উপর ঝুঁকে লোকটি ঘুমিযে ছিল। একটা ছোট পমেটমের কৌটোয় বসানো চর্বিবাতির আলো পড়েছে তাব সুদৃশ্য দাড়িতে, চওড়া নাকে, রোদেপোড়া গালে, আর ঘুমে-বোজা চোখের উপর ঝুলে-পড়া ঘন, কালো ভুরুব উপব। তাব নাক, তার গাল, তার ভুরু, তার প্রতিটি অঙ্গই আলাদা করে দেখলে স্থূল ও ভারী, ''ক্ষণিকের অতিথি'' ঘরটার আসবাবপত্র ও স্টোভেব মতই, কিন্তু মিলিয়ে দেখলে বেশ সুসমঞ্জস, এমন কি সুন্দর বলেই মনে হয। আব এটা তো সব রুশ মুখেরই বৈশিষ্ট্য ঃ মুখ, নাক যত স্থূল ও ভাবী, ততই নরম ও সুন্দর দেখতে। লোকটির পরনে কচিসম্মত জ্যাকেট, কিছুটা পুবনো হলেও নতুন ও চওড়া পটি বসানো, একটা বিচিত্র রংয়েব ওয়েস্ট কোট. আব মস্তবড় বুট জোড়ার মধ্যে ঢোকানো ঢোলা কালো ট্রাউজাব।।

দেয়াল ববাবব যে লম্বা বেঞ্চিগুলো পাতা আছে তারই একটার উপর শেয়ালেব লোমেব লাইনিং দেওযা কোটটা পেতে ঘুমিয়ে আছে আট বছরের ছোট্ট মেয়েটি। তাব ম্লান মুখ শনেব মত চুল, সরু কাঁধ ; পরনে বাদামী পোশাক ও লম্বা কালো মোজা ; শরীরটা শুকনো ও দুর্বল, কিন্তু নাকটা মোটা, লোকটার নাকেব মতই বাজে দেখতে। সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, চিরুনীটা যে চুল থেকে খসে নিজেব গালেই আঘাত করছে সেটাও বুঝতে পারছে না।

সেদিন সন্ধ্যায ''ক্ষণিকের অতিথি'' ঘবটাতে উৎসবের আমেজ

লেগেছিল। মেঝেটাতে নতুন ঝাট দেওয়ার গন্ধ, কী আশ্চর্য, ঘরের কোণাকুনি টাঙানো দড়িতে কিছুই শুকোতে দেওয়া হয় নি। টেবিলের এক কোণে বিগ্রহের বাতিটা জ্বলছে, লাল আলো পড়েছে সেণ্ট জর্জের মূর্তির উপর। বিগ্রহের আসন থেকে শুরু করে ডাইনের ও বায়ের দেয়াল জুড়ে টাঙানো হয়েছে অনেকগুলি সম্প্রদায়ের ধারাবাহিক ছাপা-ছবি; তাতে অতিশয় যত্নসহকারে দেখানো হয়েছে স্বর্গ থেকে জগতে আসার পরিবর্তনের ধারা। অনেকটা পুড়ে-যাওয়া মোমবাতির এবং বিগ্রহের দীপের মৃদু আলোয় ছবিগুলো দেখাচ্ছে পর পর সাজানো কালো ছাপ-মারা কতকগুলি কাগজের টুকরোর মত; যাই হোক, আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে টালি বসানো স্টোভটার নাকে যখন বিলাপ-ধ্বনির সঙ্গে এক ঝলক বাতাস এসে লাগল, আর তার ভিতরকার কাঠের টুকরোগুলি সশব্দে জ্বলে উঠল এবং অনেকগুলি গোলাপি আলোর বিন্দু ঘুমন্ত মানুষটির মাথার উপরকার দেয়ালে নাচতে শুরু করল, তখনই হঠাৎ আবির্ভূত হল সন্ন্যাসী সেরাফিম, তারপর শাহ নাসিরউদ্দীন, এবং তার পিছনে স্থূলবপু বাদামী মদনদেব -বড় বড় চোখ করে আশ্চর্য রকমের ভাবলেশহীন মুখের একটি যুবতী নারীর কানে কানে কি যেন সে বলতে লাগল।

বাইরে প্রচণ্ড বরফ-ঝড় বইছে। মনে হচ্ছে, যেন কোন বিদ্বেষপরায়ণ ও বেপরোয়া দুঃখী জীব ভিতরে ঢোকার জন্য পাগলের মত সরাইখানাটার চারদিকে আছড়ে পড়ছে বন্য জন্তুর হিংস্রতায়। দরজায় সজোরে ধাক্কা মারছে, জানালা ও ছাদের উপর ঠক্-ঠক শব্দ করছে, দেয়ালগুলোকে নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে, এই শাসাচ্ছে, এই কাকুতি-মিনতি করছে, এক মুহূর্তের জন্য শান্ত হচ্ছে, আবার পরমুহূর্তে এক সানন্দ হিংস্র গর্জনে সজোরে ঢুকে পড়ছে চিমনির ভিতরে; কিন্তু ভিতর থেকে কাঠের গুঁড়িগুলো নতুন তেজে জ্বলে উঠল, আগুনের শিখা ক্রুদ্ধ কুকুরের মত শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল; শুরু হল সংগ্রাম, আর তার পরিণতি হল চাপা কান্না, আর্তনাদ ও তর্জন-গর্জনে। এই সব চাপা কান্না ও আর্তনাদের ভিতর দিয়ে যেন কানে এল এমন একটি মানুষের তিক্ত উৎকণ্ঠা, তীব্র ঘৃণা আর আহত অক্ষমতা যে একদিন অভ্যস্ত ছিল বিজয়ীর সম্মানে...

এই বর্বর, অমানুষিক সঙ্গীতে মন্ত্রমুগ্ধ ঘরটাও বুঝি চিরদিনের মত অবশ হয়ে গেছে। হঠাৎ ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল; নতুন ক্যালিকো শার্ট পরে বালক ভৃত্যটি ঘরে ঢুকল। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আর ঘুমের আবেশে চোখ পিট্-পিট্ করে সে আঙুল দিয়ে মোমবাতি পোড়া সলতেটা ছিঁড়ে দিল। আর স্টোভের মধ্যে আরও কিছু কাঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে গির্জায় মধ্যরাতের ঘণ্টা বাজতে লাগল। সরাইখানা থেকে গির্জার দূরত্ব তিনশ' পায়ের বেশী হবে না। সেই শব্দপ্রবাহ নিয়ে বাতাস যেন বরফ ছোঁড়ার খেলায় মেতে উঠল; শব্দপ্রবাহকে তাড়া করে বাতাস তাদের ছুঁড়ে দিতে লাগল প্রকাণ্ড খেলার মাঠটার চতুর্দিকে

ফলে সেই সব প্রবাহেব কিছু ভেঙে গেল বা দীর্ঘ কম্পিত সুবেব মত দূবে ছড়িয়ে পড়ল, আব বাকিগুলি সাধাবণ কল-গুঞ্জনেব মধ্যে হাবিয়ে গেল। একটা ঘণ্টাব শব্দ ঘরেব মধ্যেও এত স্পষ্ট শোনা গেল যে মনে হল সেটা বোধ হয় জানালাব বাইবেই বাজল! শেয়ালেব লোমেব উপব ঘুমিয়ে-পড়া মেয়েটি চমকে উঠে মাথাটা তুলল। মিনিটখানেক ফাঁকা দৃষ্টিতেই অন্ধকাব জানালাব দিকে তাকিয়ে বইল, তাবপব তাব চোখ পড়ল নাসিবউদ্দীনেব দিকে, স্টোভেব লাল আলোটা সবেমাত্র তাব মুখেব উপব এসে পড়েছে, আব সব শেষে তাব দৃষ্টি পড়ল ঘুমন্ত লোকটাব দিকে।

"বাবা!" সে ডাকল।

কিন্তু লোকটি নড়ল না। মেয়েটি আবাব শুয়ে পড়ে পা দুটি গুটিয়ে নিল। সবাইখানাব অন্য কোন জায়গা থেকে কাব যেন জোবালো একটানা হাই তোলাব শব্দ শোনা গেল। তাবপবেই বাইবেব দবজাব খিলটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ কবে খুলে গেল, আব নানা বকম গলাব স্বব অস্পষ্টভাবে শোনা গেল। কে যেন বাবান্দায় ঢুকে থপ থপ কবে পা ফেলে ববফ ঝেড়ে ফেলছে।

"তোমাব কি চাই?" অলস ভঙ্গীতে একটি নাবীকণ্ঠ প্রশ্ন কবল।

নবাগত উত্তব দিল, "মিস আইলোভাইস্কায়া এসেছেন?"

দবজাব খিলটা আবাব সশব্দে খুলে গেল। বাতাস যেন শব্দ কবে সব ছিঁড়েখুঁড়ে বাবান্দায় ঢুকে পড়ল। কে একজন, সম্ভবত খোঁড়া ছেলেটি, "ক্ষণিকেব অতিথি"-ব টানে আবাব দবজাটাব দিকে ছুটে এল, খিলটা তুলে দিল, আব সেবা কবাব মত সুবে গলাটা পবিস্কাব কবে দিল।

শোনা গেল একটি মহিলাব সুবেলা গলা, "এই দিকে আসুন মিস। এই ঘবটাই সুন্দব ও পবিস্কাব পবিচ্ছন্ন গো মেয়ে।"

দবজাটা ঠেলে ঘবে ঢুকল কোচোয়ানেব কাফতানপবা একটি দাড়িওয়ালা লোক, তাব কাঁধে একটা বড় সুটকেস, আব সাবা শবীব ববফে ঢাকা। তাব পিছনপিছন এল একটি নাবীমূর্তি, তাব আকৃতি কোচোয়ানেব প্রায় অর্ধেক, দেখতে অনেকটা চাদবে জড়ানো একটা পুটুলিব মত, আব সাবা শবীব ববফে ঢাকা। স্যাঁৎসেঁতে গন্ধেব যে ঝাপটা কোচোয়ান ও পুটুলিব শবীব থেকে আসছে ছোট মেয়েটি তাতেই থবথব কবে কাঁপছে, আব মোমবাতিব শিখাটাও কাঁপছে।

পুটুলি বিবক্ত স্ববে বলল, "যত সব! আমবা বেশ ভালভাবেই এগিয়ে যেতে পাবতাম। আব তো মাত্র বাবো ভার্স্ট যেতে হবে; পথটা বনেব ভিতব দিয়ে হলেও আমবা পথ হাবিয়ে ফেলতাম না।"

কোচোয়ান বলল, "আমবা পথ হাবাতাম না ঠিকই, কিন্তু ঘোড়া দুটো তো আব চলতে চাইছে না মিস্! হে উপবওয়ালা ভাল মানুষটি, এ সবও কি আমাব কীর্তি!"

"আব এ কোথায় এনে আমাকে তুললে? ঠিক আছে, তুমি চুপ কর... মনে হচ্ছে এখানে কে যেন ঘুমচ্ছে। চলে যাও..."

কোচোয়ান সুটকেসটা মেঝেতে নামিয়ে রাখতেই তার কাঁধ থেকে এক চাপড়া বরফ ঝরে পড়ল। নাক দিয়ে একটা নাকি শব্দ বের করে সে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ছোট মেয়েটির চোখের সামনে পুটুলির মাঝখান থেকে দুটো ছোট ছোট হাত বেরিয়ে উপরের দিকে উঠে রাগের সঙ্গে শাল, স্কার্ফ ও মাফলারের প্যাঁচ খুলতে লাগল। প্রথমে একটা বড় ধূসর রঙের শাল মেঝেতে পড়ল, তারপর একটা টুপিওয়ালা স্কার্ফ, আর তারও পরে একটা হাতে-বোনা সাদা শাল। মাথাটাকে মুক্ত করার পরে স্ত্রীলোকটি তার ঢিলে জামাটাও খুলে ফেলল, এবং হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এবার সে দাঁড়াল বড় বড় বোতাম ও ঝোলা পকেটওয়ালা একটা ধূসর ওভারকোট গায়ে দিয়ে। এক পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটা কি যেন বের করল, আর অন্য পকেট থেকে বড় বড় ভারী চাবির গোছা বের করে অন্যমনস্কভাবে টেবিলের উপর ফেলে দিল। সেই শব্দে ঘুমন্ত লোকটি নড়েচড়ে চোখ মেলল। মিনিট খানেক বোকার মত তাকিয়ে রইল, যেন সে কোথায় আছে সেটাই বুঝতে পারছে না, তারপর মাথাটা নেড়ে সরে ঘরের এক কোণে বসে পড়ল। মহিলাটিও ওভারকোটটা খুলে আধখানা হাঁপ ছেড়ে ভেলভেটের জুতোজোড়া খুলে বসে পড়ল।

এখন আর সে মোটেই পুটুলির মত দেখতে নেই। এ তো একটি ছোটখাট ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণা নারী—একহারা চঞ্চলা, ডিমের মত ফ্যাকাসে মুখ, মাথায় কোঁকড়ানো চুল। তার নাক লম্বা ও খাড়া, থুৎনিও লম্বা ও খাড়া, চোখের লোমগুলিও লম্বা মুখের কোণগুলি সুগঠিত। সব কিছুই এতটা খাড়া হবার দরুণ তাঁর মুখটা সাধারণভাবে একটু কাটা কাটা দেখায়। আঁটোসাটো কালো পোশাকে, গলায় ও কব্জিতে প্রচুর ফিতে লাগানোর ফলে, খাড়া কনুই ও লম্বা গোলাপ আঙুলগুলোর জন্য তাকে দেখাচ্ছে একটি ইংরেজ মহিলার মধ্যযুগীয় প্রতিকৃতির মত। তার মুখের গম্ভীর, আত্মমগ্ন ভাবটা সেই সাদৃশ্যকে আরও ফুটিয়ে তুলেছে।

সে ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল, লোকটির দিকে এবং ঘুমন্ত মেয়েটির দিকেও অপাঙ্গে তাকাল তারপর কাঁধে একটা ঝাকুনি দিয়ে উঠে গিয়ে জানালার কাছে বসল। পশ্চিমের ভিজে বাতাসে অন্ধকার জানালার শার্সিগুলো কাঁপছে। ঝকঝকে সাদা বড় বরফে টুকরোগুলি অন্ধকার শার্সির উপর পড়ছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। বাইরের উদ্দাম সঙ্গীত ক্রমেই উদ্দামতর হয়ে উঠছে

হঠাৎ ছোট মেয়েটি এপাশ ওপাশ করল, আর দীর্ঘ নিস্তব্ধতাকে ভেঙে প্রতিটি শব্দের উপর জোর দিয়ে সক্রোধে বলে উঠল :

"হে প্রভু! আমার অবস্থা কী শোচনীয়! পৃথিবীতে আমার চাইতে দুঃখী আর কেউ নেই!"

লোকটি উঠে তার বৃহৎ বপুর সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানানভাবে সভয়ে পা ফেলে দ্রুত মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেল।

ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গীতে বলল, "তুমি এখনও ঘুমও নি সোনা? তোমার কি কিছু চাই?"

"আমি কিচ্ছু চাই না! আমার ঘাড় ব্যথা করছে। তুমি খারাপ মানুষ বাপি, ঈশ্বর তোমাকে শাস্তি দেবে। তুমি দেখে নিও শাস্তি দেয় কিনা।"

"আহা, বেচারি সোনা মেয়ে আমার, আমি জানি তোমার ঘাড় ব্যথা করছে, কিন্তু আমি কি করতে পারি সোনা?" মাতাল স্বামী খাণ্ডারনী বৌয়ের সামনে যে সুরে কথা বলে লোকটি সেই সুরেই কথা বলতে লাগল। "পথযাত্রার নানান অসুবিধার জন্যই তোমার ঘাড়ে ব্যথা হয়েছে সাশা সোনা। কালই আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাব, তখন তুমি বিশ্রাম পাবে তোমার ঘাড়ের ব্যথাও সেরে যাবে।"

"কাল আর কাল ওই কথা তুমি প্রতিদিন শোনাচ্ছ। আর অন্তত এর কুড়ি কাল নির্ঘাৎ হবে।"

"কিন্তু সোনা, তোমার বাবার কথায় তোমাকে বিশ্বাস রাখতেই হবে। কালই আমরা সেখানে পৌঁছে যাব। আমি কখনও মিথ্যে বলি না বরফ ঝড়ে যে আমরা আটকে পড়েছি সেটা তো তোমার দোষ নয়।"

"আমি আর সহ্য করতে পারছি না। পারছি না। পারছি না।"

মেয়েটি ভীষণ বেগে গিয়ে একটা পা ছুঁড়তে লাগল, তারপর বিশ্রী নাকি সুরে কাঁদতে শুরু করল। তার বাবা অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে মিস আইলোভাইস্কায়ার দিকে করুণভাবে তাকাল। মহিলাটি ইতস্তত করেও ছোট মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল।

বলল, "দেখ সোনামণি, কাঁদতে নেই, তুমি তো বোঝ। তোমার ঘাড় ব্যথা হয়েছে সেটা খুবই দুঃখের। কিন্তু কে কি করবে বল?"

যেন ব্যাপারটা ভাল করে বোঝানো দরকার এমনিভাবে লোকটি বলল "দেখুন মাদাম, আমরা দুই রাত ঘুমই নি, একটা ভয়ংকর গাড়িতে চেপে এসেছি। অবশ্য খুকির শরীরটা ভাল নেই, আর স্বভাবতই বাড়ির জন্য ওর মন কেমন করছে। তাছাড়া, কি জানেন, কোচোয়ানটা ছিল মাতাল, আর আমাদের একটা সুটকেসও চুরি হয়ে গেছে আর সারাক্ষণ এই বরফ ঝড় কিন্তু বলুন তো মাদাম, তাই বলে কান্নার কি আছে? অবশ্য টেবিলে বসে ঘুমনো খুবই ক্লান্তিকর, আমারও মাথাটা ঘুরছে। সত্যি কথা বলতে কি সাশা, সমস্ত ব্যাপারটাই যথেষ্ট কষ্টকর, কিন্তু তুমি এভাবে কাঁদলে তো সেটা আরও কষ্টকর হয়ে পড়বে।"

দুঃখে মাথাটা নাড়তে নাড়তে সে বসে পড়ল।

মিস আইলোভাইস্কায়া সাশাকে বলল, "সত্যি তোমার কাঁদা উচিত নয়। কাঁদে তো ছোট্ট খুকিরা। আর যদি অসুস্থ বোধ কর তাহলে পোশাকটা খুলে ঘুমতে চেষ্টা কর এস তোমার জামা খুলে দেই তারপর আমরা"

মেয়েটিকে পোশাক ছাড়িয়ে শান্ত করার পরে আবার ঘরটা চুপচাপ হয়ে গেল। মিস আইলোভাইস্কায়া জানালার কাছে বসে ঘরটাকে, তার বিগ্রহ ও

স্টোভটাকে ভাল করে দেখতে লাগল। ঘরটা, টালিবসানো স্টোভটা মোটা নাক আর ছেলের পোশাক পরা ছোট মেয়েটি আর তার বাবা সব কিছুই তার কাছে কেমন যেন অদ্ভুত মনে হতে লাগল। ঘরের কোণে বসে লোকটি হতবুদ্ধির মত তার দিকে তাকিয়ে আছে আর হাত দিয়ে মুখটাকে ডলছে। চুপ করে বসে চোখ মিটমিট করছে, তাকে দেখে মনে হয় না সে শীঘ্র কথা বলবে। তবু সেই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল। গলাটা পরিস্কার করল একটু হাসল, তারপর বলল ঃ

''সত্যি কথা বলতে কি, এ যেন একটা প্রহসন চোখে দেখছি, কিন্তু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না ? কোন অপরাধে ভাগ্য আমাদের এই ভাগাড়ে এনে ফেলেছে ? কিসের জন্য ? জীবন অনেক সময় মানুষকে নিয়ে এমন খেলা খেলে যে হা করে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না আপনি কি অনেক দূরে যাবেন মাদাম ?''

মহিলাটি জবাব দিল, ''না, বেশী দূরে নয়। আমরা আসছি আমাদের জমিদারি থেকে, এখান থেকে প্রায় বিশ ভার্স্ট দূরে, আর ফিরে যাচ্ছি বাড়িতে, সেটাও আমাদের। বাবা ও ভাইয়ের সঙ্গে বাস করতে। আমার নাম আইলোভাইস্কায়া, আর আমাদের বাড়ির নামও আইলোভাইস্ক। এখান থেকে বারো ভার্স্ট দূরে। কী ভয়ানক আবহাওয়া।''

''একেবারে চরম।''

খোঁড়া ছেলেটি ঘরে ঢুকে পমেডের কৌটোতে আর একটা পোড়া মোমবাতি বসিয়ে দিল।

লোকটি তাকে বলল, ''আমাদের জন্য সামোভারটা একবার চাপাবে কি বাছা ?''

ছেলেটি হেসে বলল, 'এত রাতে কে আবার চা খায় ? ভোরের আগে চা খাওয়াটা পাপ।''

''ও নিয়ে তুমি ভেবো না বাছা, নরকে তো আমরা পুড়ব, তুমি নও. .''

চা খেতে খেতে তারা গল্প জুড়ে দিল। মিস্ আইলোভাইস্কায়া জানল, লোকটির নাম গ্রিগরি পেত্রভিচ লিখারেভ, যে লিখারেভ একজন মার্শাল ছিল তারই ভাই সে ; এক সময় গ্রিগরি পেত্রভিচও একজন জমিদার ছিল, কিন্তু ''যথারীতি দেউলে হয়ে পড়েছে।'' আর গ্রিগরি পেত্রভিচও জানতে পারল, মিস্ আইলোভাইস্কায়ার নাম মারিয়া মিখাইলভ্না, তার বাবার মস্ত জমিদারি ছিল, কিন্তু জমিদারি দেখাশোনার কাজটা তাকে একাই করতে হত, কারণ তার বাবা ও ভাই হেসে খেলেই দিন কাটাত, তারা ছিল অত্যন্ত নির্ঝঞ্ঝাট প্রকৃতির মানুষ, আর অতিমাত্রায় কুকুর-বিলাসী।

''বাড়িতে থাকে কেবল আমার বাবা ও দাদা'' মহিলাটি বলতে লাগল (কথা বলার সময় আঙুলগুলো মুখের সামনে ঘোরানো এবং প্রতিটি কথা বলার পরে একবার করে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটা তার একটা মুদ্রাদোষের

মত)। "তারা দু'জনই এত বেশী নির্ঝঞ্ঝাটভাবে বড় হয়েছে যে নিজেদের দরকারেও কখনও আঙুলটি তুলবে না। আমি কল্পনাতেই সেটা বুঝতে পারি! ক্ষিধে মেটাতে কে তাদের সামনে খাবার এনে দেবে? আমাদের মা নেই, আর চাকরগুলো এতই হতচ্ছাড়া যে আমি দেখিয়ে না দিলে যথাযথভাবে পরিবেশনটাও করতে পাবে না। এখন তাদের কী যে হাল হয়েছে তা তো বুঝতেই পারছেন! এই যে আমি রাতটা এখানে আটকা পড়ে গেলাম, তাব ফলে তাদেব কপালে প্রাতরাশটাও জুটবে না! সত্যি, বড় অদ্ভুত ব্যাপার!"

দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে এক চুমুক চা খেয়ে সে আবার বলতে শুরু করল, "প্রতিটি উৎসবেব দিনেবই একটা বিশেষ ঘ্রাণ আছে। ইস্টার, ট্রিনিটি ও খৃস্ট্মাসের সময় বাতাসে একটা বিশেষ ঘ্রাণ ভেসে বেড়ায়। এমনকি নাস্তিকরাও এই সব উৎসবকে ভালবাসে। যেমন আমার দাদা, সে সব সময়ই বলে ঈশ্বব বলে কেউ নেই, অথচ ইস্টারেব সময় সেই সকলের আগে মধ্যরাতের অনুষ্ঠানে গিয়ে হাজির হয়।"

লিখারেভ তার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

মহিলাটিও হেসে হেসে বলতে লাগল, "তারা তো বলে ঈশ্বর নেই, কিন্তু আপনিই বলুন তো তাহলে সব বিখ্যাত লেখক, পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান মানুষই জীবনের শেষ পর্বে গিয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে শুরু করে কেন?"

"না মাদাম, যে মানুষ যৌবনে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সে বৃদ্ধ বয়সেও ঈশ্বরে বিশ্বাস করবে না, তা সে যত বড় পণ্ডিতেব পণ্ডিতই হোক না কেন।"

লিখারেভের কাশি শুনলে মনে হয় তার গলার স্বর খুব ভারী, কিন্তু সে কথা বলছে মৃদুস্বরে; সেটা সম্ভবত মেয়ে জেগে উঠতে পারে এই ভয়ে, অথবা অতিরিক্ত লাজুক স্বভাবের জন্যও হতে পারে। একটু করে থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার বলতে লাগল:

"আমি যতটা বুঝি, বিশ্বাস করাটাও মনেব একটা ক্ষমতা। ঠিক প্রতিভার মতই, ওটাও জন্মগত। আমার জীবনে যত মানুষ দেখেছি, আমার চারদিকে যা সব চলেছে, তাতে আমার বিচারে এই ক্ষমতাটি রাশিয়ার মানুষদের মধ্যে খুব বেশী দেখা যায়। আমি তো রাশিয়ার জীবনযাত্রাতে দেখি বিশ্বাস ও মায়ামোহের একটি চলমান স্রোতের মত, আর অবিশ্বাসই বলুন বা অস্বীকৃতিই বলুন, রাশিয়াতে তার এতটুকু ঝাপটা পর্যন্ত নেই। রাশিয়ার কোন মানুষ যদি ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করে তাহলে বুঝতে হবে সে অন্য কিছুতে বিশ্বাস করে।"

মিস্ আইলোভাইস্কায়ার ঢেলে দেওয়া চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে লিখারেভ এক চুমুকেই তার অর্ধেকটা শেষ করে আবার বলতে শুরু করল:

"নিজের কথাই বলি। প্রকৃতি আমার মনকে দিয়েছে বিশ্বাস করার একটা অসাধারণ ক্ষমতা। জীবনের অর্ধেকটা সময় আমি ছিলাম একজন

সক্রিয় নিরীশ্বরবাদী ও সার্বিক অবিশ্বাসী, কিন্তু আমার জীবনে এমন একটি ঘণ্টাও কাটে নি যখন আমি বিশ্বাস করি নি। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, প্রতিভা আবিষ্কৃত হয় শৈশবকালে, আর আমার প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছিল যখন আমি সবে পা ফেলতে শিখেছি। আমার মা ছেলেমেয়েদের ভরপেট খাওয়াতে ভালবাসত, আর আমাকে চামচ দিয়ে খাওয়াবার সময় বলতঃ 'ঝোলটা সব খেয়ে ফেল! ঝোলটাই জীবনের রস চাইতে বড় জিনিস!' আমি সে কথা বিশ্বাস করতাম, এই ঝোলই খেতাম দিনে দশবার, তিমি মাছের মত গোগ্রাসে গিলতাম, খেতে খেতে মূর্ছা যেতাম! ন্যানি আমাদের রূপকথার গল্প শোনাত,আর সেই সব ভূত, প্রেত, বেঁটে বামন—সব আমি বিশ্বাস করতাম। কখনও হয় তো বাবার কাছ থেকে কিছু পবিত্র ধূলি পেতাম, তখনই মধু-মাখানো কেকের উপর সেটা ছড়িয়ে দিয়ে সেগুলিকে ছাদের উপর রেখে আসতাম যাতে বাস্তু-ভূতরা সেটা খেয়ে মরে যায়।

"আর যখন আমি পড়তে শিখলাম এবং যা পাড় তাই বুঝতে শিখলাম, তখন আর কার সাধ্যি আমাকে থামায়! পালিয়ে আমেরিকায় যাবার চেষ্টা করলাম, বড় রাস্তার লুঠেরা হবার আশায় বাড়ি থেকে চলে গেলাম, সন্ন্যাসী হবার বাসনা হল, এবং টাকা দিয়ে ছেলেদের ভাড়া করে আনলাম খৃস্টের জন্য আমাকে যন্ত্রণা দিতে। মনে সব সময়ই আমার বিশ্বাসটা ছিল সক্রিয়, কখনও নির্জীব নয়। যখন আমেরিকায় পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম তখন আমি একা যাই নি, আমার মতই আর একটা বোকা ছেলেকে ভুলিয়ে এ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গী করেছিলাম, আর শহরের বাইরে খোলা জায়গায় যখন ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছিলাম, যখন চাবুকের ঘা খেয়েছিলাম, তখন খুশিই হয়েছিলাম। আবার যখনই বড় রাস্তায় যেতাম লুঠেরা হতে তখন সব সময়ই বাড়ি ফিরতাম চোখের নীচে কালশিটে দাগ নিয়ে। আমি বলতে বাধ্য, আমার ছেলেবেলাটা ছিল খুবই নষ্টামি-দুষ্টামিতে ভরা।

"তারপর যখন স্কুলে যেতে শুরু করলাম, নতুন নতুন সব কথা বৃষ্টির মত মাথার উপর ঝরে পড়তে লাগল—যেমন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, সাদাটা সাদা নয়, আসলে সাতটা রংয়ের সমন্বয়, তখন আমার মাথা ঘুরে যেত! চারদিকের সব কিছুই উল্টোপাল্টা পাক খেয়ে ঘুরত। নতুন জ্ঞান আমাকে উত্তেজিত করে তুলল। পাগলের মত আমি সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, আস্তাবলে গেলাম, সকলের কাছেই আমার নতুন সত্যগুলো জাহির করতে লাগলাম। মানুষের অজ্ঞতা দেখে আতংকিত হলাম, আর যে কেউ সাদাকে কেবল সাদাই দেখত তার প্রতি ঘৃণায় জ্বলে উঠতাম...যাই হোক, এই সবই ছিল অর্থহীন, বালকসুলভ ঔদ্ধত্য...আমার মধ্যে মনুষ্যোচিত মোহ দেখা দিল যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলাম। আপনি কি প্রথাগত শিক্ষা পেয়েছেন মাদাম?"

"হ্যাঁ, নভোচের্কাস্ক্-এর মেয়েদের ভঙ্গকয় বোর্ডিং স্কুলে।"

"ওঃ, আপনি উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন নি, তাই না? তাহলে

তো বিজ্ঞানের ব্যাপারে কিছুই জানেন না। পৃথিবীতে যত বিজ্ঞান আছে সবারই একই উদ্দেশ্য, সেটা বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের কথা ভাবাই যায় না, আর সেটা হল ঃ সত্যের সন্ধান। প্রতিটি বিজ্ঞানের, এমন কি ভেষজতত্ত্ব বা অনুরূপ সব কিছুরই লক্ষ্য প্রয়োজন সাধন নয়, জীবনের আরাম বৃদ্ধিরও নয়, একমাত্র লক্ষ্য সত্য! আশ্চর্য! আপনি যখনই কোন বিজ্ঞান পড়তে শুরু করবেন তখন প্রথমেই আপনাকে বিস্মিত করবে তার সূচনাটি। আমি আপনাকে বলতে চাই, একটি বিজ্ঞানেব সূচনা-পর্বটির মত এত আকর্ষণীয় ও মহান আব কিছুই নেই, এমন কিছু নেই যা মানুষের মনকে স্তম্ভিত ও মন্ত্রমুগ্ধ কবে রাখতে পারে। পাঁচ-ছযটি বক্তৃতা শোনবার পরেই আপনার পাখা গজাবে, উজ্জ্বলতম আশায় আপনি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবেন, বিশ্বাস করতে শুরু কববেন যে সত্য আপনার কবতলগত হয়েছে, আপনি তাব মনিব হয়েছেন। মানুষ যে ভাবে তাব প্রিযতমাব কাছে আত্মনিবেদন কবে, আমিও সেই রূপ সর্বান্তঃকরণে প্রবল আবেগে বিজ্ঞানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলাম। আমি হয়েছিলাম বিজ্ঞানেব ক্রীতদাস, বিজ্ঞানই ছিল আমাব সূর্য, আর কিছুই আমি জানতে চাই নি।

"দিন বাত বই মুখস্থ কবলাম, বইয়েব পিছনে সর্বস্ব খোযালাম, যখনই দেখতাম মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিব জন্য বিজ্ঞানকে শোধন করছে তখন আমি কেঁদে ফেলতাম। কিন্তু আমার সে মোহ ক্ষণস্থায়ী! আসলে প্রতিটি বিজ্ঞানেরই শুরু আছে, কিন্তু শেষ নেই, অনেকটা আবর্তক দশমিকের মত। প্রাণীবিজ্ঞান পঁয়ত্রিশ হাজার প্রজাতির কীট-পতঙ্গ আবিস্কার করেছে, রসায়নবিজ্ঞান ষাট্‌টি মৌল উপাদানেব খবর জানে। কালক্রমে যদি এই সব সংখ্যাব সঙ্গে দশটা করে শূন্য যোগ হয়, তাহলে প্রাণীবিজ্ঞান ও বসাযনবিজ্ঞানকে তাদেব শেষ লক্ষ্যে পৌঁছতে ঠিক ততটা পথই অগ্রসর হতে হবে যতটা পথ তারা পার হয়ে এসেছে, অথচ আরও বেশী সংখ্যক শূন্য যোগ করাব সাধনাতেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক কর্মধারা আজ একান্তভাবে ব্যস্ত। পঁযত্রিশ হাজারের সঙ্গে যোগ করার মত আরও একটি প্রজাতি আবিষ্কার করার পরেই আমার সুবুদ্ধি ফিরে এল, সে কাজ নিয়ে আর সন্তুষ্ট থাকতে পারলাম না। কিন্তু হতাশার পাত্রটি পূর্ণ হবার আগেই আমি অন্য কিছু নিয়ে মেতে উঠলাম। ডুব দিলাম শূন্যবাদ ও তার ঘোষণাবলীর মধ্যে, জমি-বণ্টনের কালা আন্দোলনে, এবং অনুরূপ সব বিপ্লব-প্রচেষ্টার মধ্যে। হাজির হলাম জনসাধারণের মাঝখানে, কারখানায় কাজ করলাম, চর্বির ব্যবসা করলাম, ভল্‌গানদীর মাঝি হলাম। পরবর্তীকালে, সারা রাশিয়া ঘুরে যখন রুশ-জীবনকে চিনলাম, তখন সেই জীবনেরই পূজারী হয়ে গেলাম! অনেক দুঃখের ভিতর দিয়ে রাশিয়ার মানুষকে ভালবাসলাম; তাদের সৃষ্টিশীলতাকে...সে অনেক কথা। এক সময় স্লাভোফিলদের দলে ঢুকেছিলাম, আক্সাকভকে চিঠি লিখে লিখে হয়রান করেছি; তারপর হলাম ইউক্রেনফিল প্রত্নতত্ত্ববিদ ও লোকসঙ্গীত শিল্পী...নতুন ভাবনা-চিন্তা, নতুন

মানুষ, নতুন ঘটনা, নতুন জায়গা বার বার আমাকে টেনে নিয়েছে দূরে, দূরান্তরে... একটানা একটা কিছু অবিরাম আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে! পাঁচ বছর আগে আমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের সাধনা করেছি; আমার সর্বশেষ ধর্ম অন্যায়ের প্রতি অ-বিরোধ।''

ছোট মেয়েটি একটি কাঁপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নড়েচড়ে জেগে উঠল। লিখারেভ উঠে তার কাছে গেল।

বলল, ''একটু চা খাবে কি সোনা?''

''তুমি খাও!'' মেয়েটি রূঢ় গলায় জবাব দিল।

ইতর লোকের মত মুখ করে লিখারেভ টেবিলে ফিরে গেল।

মিস আইলোভাস্কায়া বলল, ''বুঝতে পেরেছি তুমি সুখেই জীবনটা কাটিয়েছ। মনে করে রাখবার মত কিছু পেয়েছ।''

''অবশ্য একজন সদয় শ্রোতার সঙ্গে বসে আপনি যদি চা খেতে খেতে গল্প-গুজবে সময় কাটাতে পারেন, তখন তো সেটা সুখের সময়ই বটে। কিন্তু ধরুন আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন এই সুখের জন্য আমাকে কী দাম দিতে হয়েছে? জীবনের এই বৈচিত্র্যের জন্য আমাকে কী দাম দিতে হয়েছে? কারণ কি জানেন মাদাম, আমি তো একজন জার্মান পণ্ডিতের মত পরিপাটি করে ধর্মাচরণ করি নি, আমি তো নির্জনে বাস করি নি, আমার প্রতিটি ধর্মবিশ্বাসই আমাকে তার ইচ্ছার কাছে অবনত করেছে, আমার দেহটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে। এখন আপনি নিজেই বিচার করুন। আমি আমার ভাইদের মতই ধনী ছিলাম, আর এখন আমি গরিবেরও অধম। নিজের মোহের বশে আমার সব সম্পত্তি আমি উড়িয়েছি, আমার স্ত্রীর টাকাও—স্তূপীকৃত টাকা যা আমার নয়। আমার বয়স বিয়াল্লিশ বছর, বার্ধক্য আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, কিন্তু রাতের অন্ধকারে মনিবের গাড়ির পিছনে পড়ে-থাকা দো-আঁসলা কুকুরের মতই আমি গৃহহীন। জীবনে কখনও শান্তি কাকে বলে জানলাম না। আমার মন সব সময় কি যেন চেয়েছে, সেই আশাই তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে...যে বেপরোয়া কঠোর পরিশ্রম আমি করেছি তার কষ্ট আমার সহ্যাতীত ছিল, অভাব-অনটনে কষ্ট পেয়েছি, চার পাঁচ দফায় জেল খেটেছি, সারা দেশ চষে বেড়িয়েছি...সে কথা মনে হলেও কষ্ট হয়! বেঁচে থেকেছি, কিন্তু জীবনের ঘূর্ণিপাকে পড়ে বাঁচা কাকে বলে বুঝি নি। আপনি কি বিশ্বাস করবেন, একটা বসন্তকালের কথাও আমি স্মরণ করতে পারি নি, স্ত্রীর ভালবাসা বা সন্তানদের জন্মকেও তাকিয়ে দেখি নি। আর কত আপনাকে বলব? যারা আমাকে ভাল বেসেছে তাদের প্রতিই আমি বিরূপ হয়েছি...আমার মা দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে আমার জন্য চোখের জল ফেলেছে, আমার গর্বিত ভাইরা যারা আমার জন্য দুঃখ পেয়েছে, লজ্জা পেয়েছে, প্রণাম করেছে, আমার জন্য দুই হাতে টাকা খরচ করেছে, তারাই শেষ পর্যন্ত বিষবৎ আমাকে ঘৃণা করেছে।''

লিখারেভ চেয়ার থেকে উঠে আবার বসে পড়ল।

মিস আইলোভাইস্কায়ার দিকে না তাকিয়ে সে আবার বলতে লাগল, "আমি যদি কেবল কষ্টই পেতাম তাহলে তো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতাম। যখনই মনে পড়ে মোহের বশে কতবার আমি হাস্যাস্পদ হয়েছি, সত্য থেকে দূরে সরে গিয়েছি, অন্যায় করেছি, নিষ্ঠুর হয়েছি, বিপজ্জনক হয়েছি, তখনই আমার নিজের দুঃখটা অনেক পিছনে সরে যায়। আমার যাকে ভালবাসা উচিত ছিল কতবার তাকেই সমস্ত মন দিয়ে ঘৃণা করেছি, এবং তার উল্টোটাও ঘটেছে। হাজারবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। আজ হয়তো বিশ্বাস করেছি, নতজানু হয়েছি, আবার কালই আমার দেবতার কাছ থেকে, বন্ধুদের কাছ থেকে ভীরুর মত পালিয়েছি, কাপুরুষের মত তাদের অপমানকে হজম করেছি। নিজের মোহগ্রস্ততার লজ্জায় কতবার যে চোখের জলে বালিশ ভিজিয়েছি তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। জীবনে কখনও স্বইচ্ছায় মিথ্যে বলি নি বা কারও ক্ষতি করি নি, কিন্তু আমার বিবেক পরিচ্ছন্ন নয়। এমন কি কারও মৃত্যু আমার বিবেকের উপর চেপে বসে নেই একথাও আমি বুক ফুলিয়ে বলতে পারি না, কারণ আমার স্ত্রী যে আমার চোখের সামনেই তিলে তিলে শুকিয়ে শেষ পর্যন্ত মরে গেল তার জন্য দায়ী আমারই বিবেকহীন আচরণ। হ্যাঁ আমার স্ত্রী। কি জানেন, আজকাল নারী জাতির প্রতি দুটি মনোভাব আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। একদলের কর্ণধাররা নারীর মাথার খুলিটার মাপজোক করে প্রমাণ করতে চায় যে নারী পুরুষ অপেক্ষা হীনতর, নারীকে নিয়ে ইচ্ছামত খেলা করার সুবিধার জন্য, তাদের সামনে নিজেদের মহত্বকে প্রকট করে তোলার জন্য এবং নিজেদের পাশবিক আচরণকে সমর্থন করার জন্যই তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে।

অপর দলের কর্ণধারগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করে নারী জাতিকে পুরুষের সমান স্তরে উন্নীত করতে, অন্য কথায় সেই সব তুচ্ছ কথাঃ তাদের বলতে ও লিখতে শেখায় যা তারা নিজেরাই বলছে ও লিখছে

লিখারেভের মুখটা কালো হয়ে উঠল।

টেবিলে একটা ঘুষি মেরে সে গম্ভীর গলায় বলতে লাগল, 'মাদাম, আমি আপনাকে এই কথাটাই বলতে চাই যে নারী চিরকাল পুরুষের ক্রীতদাসী ছিল এবং চিরকাল ক্রীতদাসী হয়েই থাকবে। নারী যেন একতাল নরম মোম পুরুষ তাকে যেমন ইচ্ছা গড়ে তুলতে পারে। উপরওয়ালা সাক্ষী, নারীরা তাদের চুল কেটেছে, নিজের বাড়ি ও পরিবারকে ছেড়েছে, বিদেশে গিয়ে মারা গেছে-সবই পুরুষের প্রতি সস্তা মোহের বশে। যে সব ধ্যান-ধারণা থেকে নারীরা আত্মদান করেছে তার মধ্যে একটিও নারীসুলভ ধারণা নেই আত্মাভিমানহীন, বিশ্বস্ত ক্রীতদাসীর দল। আমি কখনও, কারও খুলি মাপি নি, আমি কথা বলছি নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে, নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে। যে সব গর্বিতা, স্বাধীনচেতা নারীর কাছে আমার প্রেরণার কথা জানাতে পেরেছি, কোন রকম চিন্তা না করে প্রশ্ন না তুলে তারাই আমাকে অনুসরণ করেছে, যা করতে বলেছি তাই করেছে ঃ একটি

সন্ন্যাসিনীকে আমি শূন্যবাদী করে তুলেছিলাম ; পরে শুনেছি একজন সশস্ত্র সৈনিককে সে গুলিও করেছিল ; আমার ইতস্তত ভ্রমণের সময় আমার স্ত্রী এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে ছেড়ে যায় নি, দিক্‌প্রদর্শক মুরগির মত আমার পরবর্তী মোহের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে নিজের বিশ্বাসকে পাল্টেছে।''

লিখারেভ লাফ দিয়ে উঠে ঘরময় পায়চারি করতে শুরু করল।

সে চীৎকার করে বলে উঠল, ''মহান, উন্নত ক্রীতদাসীত্ব! আসলে সেটাই তো নারী-জীবনের মহান উদ্দেশ্য। নারীর সাহচর্যে এসে যে ভয়ানক পংকিলতা আমার মাথার মধ্যে জমে উঠেছে তার ভিতর থেকে আমার স্মৃতি ছাঁকনির মত অক্ষয় করে রেখেছে কোন ধারণা নয়, বড় বড় কথা নয়, দার্শনিক তত্ত্বও নয়, অক্ষয় করে রেখেছে ভাগ্যের হাতে নারীর অসাধারণ আত্মসমর্পণ, তার অসাধারণ হিতৈষা ও সার্বিক ক্ষমাশীলতা...''

দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে একাগ্র আবেগে সম্মুখে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে যেন প্রতিটি শব্দকে সযত্নে বেছে বেছে সে বলতে লাগল :

''সেই...সেই উদার সহিষ্ণুতা, কবরের প্রতি অনুরক্তি, সেই সব কাব্যময় হৃদয়...তাদের কাছে জীবনের অর্থই যে নিহিত আছে নির্বিচার আত্মদানে, সেই চোখের জলে যা পাহাড়কেও টলাতে পারে, তাদের সেই সীমাহীন, সর্বব্যাপী ক্ষমাশীল ভালবাসায় যা জীবনের অসঙ্গতি ও বিশৃংখলার মধ্যে ছড়িয়ে দেয় আলো ও উত্তাপ...''

মিস্ আইলোভাইস্কায়া ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, লিখারেভের দিকে এক পা এগিয়ে তার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার চোখের পলাশে অশ্রুর ফোঁটা চিকচিক করছে, তার কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপছে, তার দুটি গাল লাল হয়ে উঠেছে—এ সব কিছু থেকে লিখারেভ স্পষ্ট বুঝতে পারল যে তার কাছে নারী একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনার বিষয়মাত্র নয়। নারীজাতি তার সমস্ত মনটাকে ভরে রেখেছে ; তার নিজের ভাষায় বললে, এটাই তার নতুন ধর্ম। জীবনে এই প্রথম মিস্ আইলোভাইস্কায়া চোখের সামনে একটি মানুষকে দেখল যে আবেগের সঙ্গে, একান্তভাবে বিশ্বাস করতে জানে। অঙ্গভঙ্গী ও চোখের ঝলকানি দেখে মনে হয় সে বুঝি ক্ষিপ্ত, উত্তেজিত, কিন্তু তার চোখে, তার বক্তৃতায়, তার মস্ত বড় শরীরটার চালচলনের ভিতর দিয়ে যে অগ্নি-দীপ্তি ফুটে উঠেছে তার অপরূপ রূপ দেখে নিজের অজান্তেই মহিলাটি উচ্ছ্বসিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল।।

মহিলাটির দিকে দুই হাত বাড়িয়ে মুখে মিনতির ভাব ফুটিয়ে সে বলল, ''এবার আমার এই মাকে আপনি গ্রহণ করুন। আমি তার জীবনকে বিষময় করে তুলেছি, লিখারেভ পরিবারের অসম্মান ডেকে এনেছি—অন্তত সে তাই বলে, একমাত্র কোন মারাত্মক শত্রুই তাকে এত কষ্ট দিতে পারত ; এ বিষয়ে আপনি কি মনে করেন? আমার ভাইরা গির্জায় যাবার জন্য তাকে কিছু টাকা দিত, নিজের ভক্তিকে চেপে রেখে গোপনে সেই টাকা সে পাঠাত আমাকে, তার এই ছন্নছাড়া ছেলেটিকে! এই ছোট কাজটিই সমস্ত মতবাদ,

যে বড় বড় কথা ও পঁয়ত্রিশ হাজার প্রজাতির চাইতে অধিক কার্যকরীভাবে একটি মনকে উন্নত করতে পারে। আমি আপনাকে হাজারটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। নিজের কথাই ধরুন! এই বিশ্রী, প্রতিকূল রাত, বাইরে বরফ-ঝড়, আর তারই মধ্যে আপনি ছুটে চলেছেন আপনার বাবা ও ভাইয়ের কাছে উৎসব উপলক্ষে আপনার স্নেহের উত্তাপ নিয়ে, অথচ তারা হয়তো আপনার কথা একবারও ভাবে না। যেদিন আপনি কারও সঙ্গে প্রেমে পড়বেন সেদিন তাকে অনুসরণ করে আপনি উত্তর মেরুতেও পাড়ি দেবেন। অবশ্যই দেবেন, দেবেন না?''

''হ্যাঁ,...যদি...যদি আমি তাকে ভালবাসি।''

''তাহলে!'' লিখারেভ আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল; মাটিতে পা ঠুকতে লাগল। ''সত্যি বলছি, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বড় ভাল লাগছে। আমার প্রতি ভাগ্যের কত দয়া যে সব সময়ই আশ্চর্য সব মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়! এমন একটা দিনও নেই যেদিন এমন কোন মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হয় না যার জন্য আমার জীবনটা দিয়ে দিতে পারি! কি জানেন, এই পৃথিবীতে মন্দের চাইতে ভাল মানুষ অনেক বেশী। দেখুন তো, আমাদের দু'জনের মধ্যে কত প্রাণ-খোলা কথা হল, যেন একশ' বছর ধরে আমরা পরস্পরকে চিনি। একটা মানুষ দশ বছর মুখ বুজে থাকতে পারে, বন্ধুবান্ধব ও স্ত্রীর কাছ থেকে অনেক কিছু লুকিয়ে রাখতে পারে, তারপর হঠাৎ ট্রেনের মধ্যে একটি স্কুলের ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আর তার কাছেই মনের সব কথা উজার করে ঢেলে দিল। আজই প্রথম আপনার সঙ্গে দেখা হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, কিন্তু যেভাবে মনটাকে আপনার কাছে খুলে দিলাম এমন তো আগে কাউকে দিতে পারি নি। অবাক হয়ে ভাবি, কেন এমন হয়?''

মনের সুখে হাসতে হাসতে দুই হাত ঘষে ঘষে লিখারেভ ঘরময় খানিক পায়চারি করে আবার নারীদের প্রসঙ্গে ফিরে গেল। ইতিমধ্যে প্রাতঃকালীন প্রার্থনার জন্য গির্জার ঘণ্টাটা বাজতে শুরু করল।

সাশা বিরক্তগলায় বলল, ''হা প্রভু, এর বক্‌বকানির জন্য আমি তো ঘুমতেই পারছি না।''

''ওঃ, হ্যাঁ, অবশ্যই আমি দুঃখিত সোনা, তুমি ঘুমাও, ঘুমাও,'' লিখারেভ অপরাধীর মত মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে গলার স্বরকে নামিয়ে এনে বলল : ''এ ছাড়া আমার আরও দুটি সন্তান আছে, দুটি ছেলে। তারা কাকার কাছে থাকে, কিন্তু এটির বাবাকে না হলে চলে না। এখানে সে কষ্টে থাকে, তা নিয়ে মুখ গোমড়া করে, কিন্তু মাছি-মারা কাগজে মাছির মত আমার গায়েই লেপ্টে থাকে। আপনাকে এ সব কথা শোনাচ্ছি বলে আমি দুঃখিত মাদাম, কিন্তু আপনারওতো একটু ঘুমনো দরকার। আপনার বিছানাটা করে দেব কি?''

অনুমতির জন্য অপেক্ষা না করেই মহিলাটির ভেজা জোব্বাটাকে ঝেড়ে

বেঞ্চির উপর পেতে দিল. তার শাল ও স্কার্ফ তুলে নিয়ে ওভারকোটটা জড়িয়ে বালিশ বানিয়ে দিল। এ সবই সে করল নিঃশব্দ ও মুখে এমন একটা সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধার ভাব ফুটিয়ে যেন কোন পবিত্র বাসনপত্র নাড়াচাড়া করছে, মেয়েদের পোশাকপত্র নয়। তার সারা শরীরে একটা ভীরু ও লজ্জার ভাব ফুটে উঠেছে. মনে হচ্ছে যেন এই দুর্বল মানুষটির পাশে নিজের বিশাল বপু ও শক্তির জন্য সে লজ্জা বোধ করছে।

মিস্ আইলোভাইস্কায়া স্টোভটার দিকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে ফিস ফিস করে বলতে লাগল ঃ "এ রকমই হয় মাদাম। প্রকৃত রাশিয়ার মানুষকে দিয়েছে বিশ্বাস করার একটা অসাধারণ ক্ষমতা. সেই সঙ্গে দিয়েছে জিজ্ঞাসু মন ও বিমূর্ত চিন্তার শক্তি. কিন্তু তার অনবধানতা. আলস্য ও স্বপ্নময় প্রগল্ভতার কঠিন পাথরে আঘাত খেয়ে সে সব গুণ ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়...হ্যাঁ. সত্যিই তাই হয়..."

মিস্ আইলোভাইস্কায়া অন্ধকারের দিকে তাকাল. দেখতে পেল শুধু বিগ্রহের উপর লাল আলোর ছটা, আর লিখারেভের মুখে কাঁপা আলোর ঝিলিক। সেই অন্ধকার, গির্জার ঘণ্টা, বরফ-ঝড়ের গর্জন, খোঁড়া বালক-ভৃত্যটি, নালিশকারী সাশা, বেচারি লিখারেভ ও তার কথাবার্তা-সব একত্রে মিলেমিশে একটা দুর্দমনীয় ভাবের সৃষ্টি করল, তার কাছে জগৎটা হয়ে উঠল বিস্ময় ও যাদুর শক্তিতে পূর্ণ একটি অবাস্তব কল্পনা। এইমাত্র যা কিছু শুনেছে সবই তার কানে বাজছে, আর জীবনটাকে মনে হচ্ছে একটি সুন্দর, অলৌকিক রূপকথা যা কোন দিন শেষ হবে না। এই প্রবল ভাবটা বাড়তে বাড়তে এটা এক সময় তার সমগ্র চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলল আর হয়ে উঠল একটি মধুর স্বপ্ন। ঘুমের মধ্যেও সে দেখতে পেল বিগ্রহের বাতিটা এবং তার মোটা নাকটা যার উপর কম্পমান লাল আলোটা নাচছে। আর তখনই সে শুনতে পেল কান্নার শব্দ।

একটি শিশু-কণ্ঠ মিনতির সুরে বলল, "বাবা সোনা, চল আমরা কাকার কাছেই ফিরে যাই! কাকার বাড়িতে খৃস্টমাসের আসব বসবে! স্তিওপা আর কোলিয়াও সেখানে থাকছে!"

"কিন্তু সোনা, আমি কি করতে পারি? আমাকে বুঝতে চেষ্টা কর!" নীচু পুরুষ-কণ্ঠে প্ররোচনার সুর।

এবার শিশুর কান্নার সঙ্গে যুক্ত হল একটি পুরুষের কান্না। বরফ-ঝড়ের গর্জনের মধ্যে মানুষের দুঃখের এই আওয়াজ যুবতী নারীটির শ্রবণে এতই মধুর ও সুললিত মানবসঙ্গীত হয়ে বেজে উঠল যে তার উচ্ছ্বসিত আবেগ সে সহ্য করতে পারল না, সেও কান্নায় ভেঙে পড়ল। একটু পরে সে দেখল, একটি বিশাল কালোছায়া নীরবে তার বিছানার দিকে এগিয়ে এল, মেঝেতে পড়ে-থাকা শালটা তুলে নিয়ে তার পায়ের চারদিকে গুঁজে দিল।

একটা আশ্চর্য গর্জন শুনে সে জেগে উঠল। চমকে উঠে সে সভয়ে চারদিকে তাকাল। জানালায় দেখা দিল উষাকালের নীলাভা। সূর্যোদয়ের

ক্ষীণ আলোয় সে স্পষ্ট দেখতে পেল, স্টোভ, ঘুমন্ত ছোট মেয়েটি ও নাসিরউদ্দীনকে। স্টোভের আগুন আর বিগ্রহের বাতি নিভে গেছে। হাট করে খোলা দরজার ভিতর দিয়ে সে পান-ঘরটা দেখতে পেল; ঘরটার ঠিক মাঝখানে গলিত বরফের জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি মানুষ। তার জিপ্‌সি-মুখে অবাক বিস্ময়ে ভরা দুটি চোখ, হাতে লম্বা লাঠির মাথায় একটা বড় লাল তারা। বরফে ঢাকা একদল ছেলে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তারার উপরকার লাল কাগজের পিছনে বসানো মোমবাতির আলোয় তাদের সিক্ত মুখগুলিতে লালের আভা ছড়িয়ে পড়েছে। সকলে মিলে এতই বেসুরো একটা গান গাইছে যে মহিলাটি তার ভাষাই বুঝতে পারল না।

এককোণে দাঁড়িয়ে লিখারেভ খুশি মনে গায়কদের দেখছে আর পা দিয়ে তাল ঠুকছে। যখন সে দেখল মিস্ আইলোভাইস্কায়া জেগে উঠেছে, তখন তার সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সে মহিলাটির কাছে গেল। মহিলাটিও হাসল।

লিখারেভ বলল, "শুভ খৃস্ট্‌মাস! আপনি বেশ ভাল ঘুমিয়েছেন। আমি দেখেছি।"

মিস্ তার দিকে তাকাল, মৃদু হাসল, কিন্তু কিছুই বলল না।

সারা রাত কেঁদে কাটাবার পরে এখন আর তাকে ততটা বিশাল ও বৃষস্কন্ধ বলে মনে হচ্ছে না, ঠিক যেরকম সব চাইতে বড় জাহাজটা যখন সমুদ্র পার হতে থাকে তখন সেটা দেখলে আমাদের চোখে ছোট বলে মনে হয়।

মিস্ বলল, "দেখুন, আমার যাবার সময় হয়েছে। এবার আমাকে পোশাক পরতে হবে। আপনারা এখন কোথায় যাবেন বলুন?"

"কে, আমি? প্রথমে যাব ফ্রিনুশ্‌কি, সেখান থেকে সের্গিয়েভো, আর সের্গিয়েভো থেকে চল্লিশ ভার্স্ট গাড়ি চালিয়ে যাব কয়লা-খনিতে। কয়লা-খনির মালিক জনৈক মাথামোটা জেনারেল শাশ্‌ভ্স্কি। সেখানে আমার ভাইরা আমার জন্য ম্যানেজারের পদটি যোগাড় করেছে...আমি যাচ্ছি কয়লা কাটতে।"

"কিন্তু দেখুন, ওই কয়লা-খনিগুলো আমি চিনি। কি জানেন, শাশ্‌ভ্স্কি আমার খুড়ো। কিন্তু আপনি সেখানে যাচ্ছেন কেন?" বিষণ্ণ দৃষ্টিতে লিখারেভের দিকে তাকিয় মহিলা প্রশ্ন করল।

"তাদের ঠিক মত চালাতে।"

মহিলা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আপনি ওই কয়লা-খনিতে যাচ্ছেন। কিন্তু সেটা তো খোলা, নির্জন তৃণভূমি। সে নির্জনতার একঘেয়েমি একটা দিনও সহ্য করতে পারবেন না! কয়লাও খুব খারাপ, কেউ কেনে না, আর আমার খুড়ো একটি আধা-পাগল, অত্যাচারী, একটি দেউলে মানুষ...সে আপনাকে মাইনেটাও দেবে না।"

নিরাসক্ত গলায় লিখারেভ বলল, "ঠিক আছে। কয়লা-খনির জন্যই আমি কৃতজ্ঞ।"

মহিলা পুনরায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তেজিতভাবে ঘরময় পায়চারি শুরু করল।

তারপর বলল, "আমি বুঝতে পারছি না, কিছুতেই বুঝতে পারছি না! এটা অসম্ভব এবং...বোকামি! বুঝতে চেষ্টা করুন যে এটা নির্বাসনের চাইতেও খারাপ, একটা মানুষকে জীবন্তে কবর দেওয়ার সামিল। হে প্রভু," লিখারেভের আরও কাছে গিয়ে সে উত্তপ্ত গলায় বলতে লাগল। তার উপরের ঠোঁট কাঁপছে, মুখটা সাদা হয়ে গেছে। "সেই নির্জন তৃণ-ভূমিটা কল্পনা করুন আর ভাবুন সেখানে আপনি কত নিঃসঙ্গ হবেন!" সেখানে কথা বলারও কেউ নেই, আর আপনার মনের সবটাই তো দখল করে আছে নারী। কয়লা-খনি আর নারী!"

হঠাৎ নিজের সক্ষোভ প্রতিবাদে লজ্জিত হয়ে মহিলাটি জানালার কাছে সরে গেল।

তর্জনী দিয়ে জানালার শার্সিতে দ্রুত একটা বৃত্ত এঁকে বলল, "না, না, আপনি কিছুতেই সেখানে যাবেন না!"

কেবল মন দিয়ে নয়, নিজের পিঠ দিয়েও মহিলাটি বুঝতে পারছে যে তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে একটি ভীষণ দুঃখী, আশাহীন, অসহায় মানুষ, অথচ সেই মানুষটিই আবার মহিলাটির দিকে তাকিয়ে ভালমানুষের মত হাসছে, যেন নিজের দুর্ভাগ্যের কথাও সে ভুলে গেছে, যেন সারা রাত সে কেঁদে কাটায় নি। এর চাইতে যে তার কাঁদাই ভাল ছিল! মহিলাটি উত্তেজনায় বারকয়েক ঘরের এদিক-ওদিক হাঁটল, তারপর এক কোণে থেমে কি যেন ভাবতে লাগল। লিখারেভ কি যেন বলল, সেটা তার কানে গেল না। লিখারেভের দিকে পিঠ দিয়ে সে টাকার থলি থেকে একটা পঁচিশ রুবলের নোট বের করে অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাতের মুঠোয় চেপে রাখল, তারপর মুখটা ঘুরিয়ে লিখারেভের দিকে একবার তাকিয়ে মুখটা লাল করে নোটটাকে আবার পকেটে ভরল।

পান-ঘরে কোচোয়ানের গলা শোনা গেল। মহিলাটি নিঃশব্দে চিন্তান্বিত মুখে পোশাক পরে নিল। সে কাজে লিখারেভ তাকে সাহায্য করল, খুশি হয়ে কথাবার্তা বলল, কিন্তু প্রতিটি কথা মহিলার মনকে আরও ভারী করে তুলল। কোন দুর্ভাগা বা মুমূর্ষু মানুষের মুখে রসিকতার কথা শোনাও বেদনাদায়ক।

একটি জীবন্ত মানুষকে আকৃতিহীন পুটুলিতে পরিণত করার কাজ শেষ হলে মহিলাটি শেষবারের মত ঘরের চারদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে দু'এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। তাকে বিদায় জানাতে লিখারেভ তার পিছন পিছন গেল।

বাইরে শীত তখনও আগের মতই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, কেন তা ভগবানই

জানে। বড় বড় নরম বরফের চাঁইয়ের মেঘ মাটির উপর অস্থিরভাবে আছড়ে পড়ছে, কোথাও সুস্থির হয়ে বসতে পারছে না। ঘোড়া, স্লেজ, গাছপালা, খুঁটিতে বাঁধা মোষ-সব কিছুই সাদা হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে হাত ছোঁয়ালে বেশ নরম ও ফুলো-ফুলো লাগবে।

মহিলাকে স্লেজে উঠতে সাহায্য করে লিখারেভ ঠোঁট দুটো চেপে আস্তে আস্তে বলল, "আচ্ছা আপনার যাত্রা শুভ হোক। আমাকে মনে রাখবেন..."

মহিলা নীরব। ঘোড়া দুটো চলতে শুরু করল। স্লেজটা যখন একটা বড় সরফ-স্রোতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন মহিলাটি মুখ ফিরিয়ে লিখারেভের দিকে তাকাল, তার মুখের ভাব দেখে লিখারেভের মনে হল সে বুঝি তাকে কিছু বলল। সে ছুটে স্লেজের কাছে গেল, কিন্তু মহিলা একটা কথাও বলল না, শুধু বরফের টুকরোয় ঢাকা চোখের পাতার পলাশের ভিতর দিয়ে একবার তার দিকে তাকাল।...

হয় তো তার স্পর্শকাতর মন সেই দৃষ্টির ভাষা বুঝতে পেরেছিল, অথবা তার কল্পনাই তাকে ঠকিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল মহিলাটির জন্য নিজের যে ছবিটি সে এঁকেছে তাতে যদি আরও দু'তিনটে সার্থক, শক্তিশালী তুলির টান দিতে পারত, তাহলে হয়তো এই মেয়েটি তার ব্যর্থতা, তার বয়স, তার অসহায়তা, সব কিছুই ক্ষমা করত, বিনা প্রশ্নে, নির্বিচারে যে কোন স্থানে তাকে অনুসরণ করত। দীর্ঘ সময় সেখানেই সে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল স্লেজের চাকার দাগের দিকে। টুকরো টুকরো বরফ এসে জমতে লাগল তার চুলে, তার দাড়িতে, তার কাঁধের উপরে...দেখতে দেখতে চাকার দাগ বরফে ঢেকে গেল, সে নিজেও বরফে আবৃত হয়ে একটি পাহাড়ে পরিণত হল, কিন্তু তার চোখ দুটি তখনও একাগ্র দৃষ্টি মেলে বরফের মেঘের মধ্যেই কি যেন খুঁজে ফিরছে।

১৮৮৬

শ্যাম্পেন

Champagne



একটি দুর্জনের কাহিনী

যে বছরে আমার এই কাহিনীর সূচনা তখন আমি দক্ষিণ-পশ্চিম রেলপথের একটা হল্ট স্টেশনের ওভারসীয়ারের পদে কাজ করতাম। সে জীবনটা সুখের ছিল কি দুঃখের ছিল সেটা আপনারাই বিচার করবেন এই বাস্তব সত্যটুকু থেকে যে সেখানকার চারদিকের কুড়ি ভার্স্টের মধ্যে একটা মানুষের বসতি ছিল না, একটা মেয়েমানুষ ছিল না, সরাইখানা বলতে যা

বোঝায় সে রকম কিছুই ছিল না ঃ আর সে সময় আমি ছিলাম শক্তিমান যুবক, স্বভাবটা ছিল গরম আর খেয়ালি, আর বোকা। একমাত্র খুশির ব্যাপার ছিল যাত্রীবাহী ট্রেনের জানালার দিকে তাকিয়ে থাকা, আর বাজে ভদকা পান করা যার মধ্যে ব্যবসায়ীরা নেশার ওষুধ মিশিয়ে দিত। হয় তো একটা কামরায় একটা মেয়েমানুষের মুখ দেখতে পেলাম, আর অমনি স্থানুর মত সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লাম, নিঃশ্বাস পড়ে কি পড়ে না, হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম যতক্ষণ না ট্রেনটা দূর দিগন্তে একটা বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যায় ; অথবা সেই বাজে ভদ্‌কা আকণ্ঠ গিলে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকলাম, কোথা দিয়ে কেটে গেল ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন সে খেয়ালই থাকল না। উত্তরের অরণ্য অঞ্চলে যার জন্ম, দক্ষিণের দিগন্তবিস্তৃত, জনহীন তৃণভূমি তার কাছে তো তাতারদের পরিত্যক্ত কবরখানারই সমতুল। গ্রীষ্মকালে সেখানকার গম্ভীর কর্মহীন অবসর—ঝিঁ-ঝিঁ পোকার একঘেয়ে, একটানা ঝিঁ-ঝিঁ ডাক আর ছেদহীন স্বচ্ছজ্যোৎস্নার প্লাবন—আমার মনকে আশাহীন বিষণ্ণতায় ভরে তুলত ; আবার শীতকালে সেখানকার নিষ্কলংক শুভ্রতা, দূর-বিস্তার বরফের আবরণ, দীর্ঘ রাত ও নেকড়ের গর্জন ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মত আমাকে চেপে ধরত।

সেই হল্ট-স্টশনে বাস করত কয়েকটিমাত্র প্রাণী ঃ আমি ও আমার স্ত্রী, গলগণ্ডগ্রস্ত কালা তার-বাবু ও তিনটি পাহারাদার। আমার সহকারী যুবকটি ক্ষয়রোগী, চিকিৎসার জন্য প্রায়ই শহরে চলে যেত, মাসের পর মাস সেখানেই থাকত, আর তার সব কাজকর্মের ভার ও তার মাইনেটার সদ্ব্যবহার করার অধিকার আমার ঘাড়েই পড়ত। আমার কোন সন্তান ছিল না ; কোন অতিথি অভ্যাগতও সেখানে আসত না ; আমারও যাবার জায়গা রেলপথের এদিকে বা ওদিকে কোন সহকর্মীর আস্তানাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেটাও মাসে একবারের বেশী ঘটত না। এক কথায়, জীবনটা ছিল বড়ই একঘেয়ে, কষ্টকর।

মনে পড়ে, একবার নববর্ষের উৎসবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। স্ত্রীর সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলছিলাম, আর শুনতে পাচ্ছিলাম পাশের ঘরে কালা তার-বাবু তার যন্ত্রটাতে একঘেয়ে ঠক্-ঠক্ শব্দ করে যাচ্ছে। প্রায় পাঁচ গ্লাস মশলাদার ভদ্‌কা এর মধ্যেই শেষ করেছি, হাতের উপর ভারী মাথাটা রেখে এই অপরিহার্য ও দুর্জয় একঘেয়েমির কথাই ভাবছি ; আমার স্ত্রী পাশেই বসে ছিল, তার চোখ দুটি সারাক্ষণ আমার উপরেই নিবদ্ধ। সে আমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়েছিল যে ভাবে একমাত্র সেই নারীই তাকাতে পারে যার এ জগতে একমাত্র একটি সুন্দর স্বামী ছাড়া আর কেউ নেই। সে আমাকে ভালবাসত পাগলের মত, ক্রীতদাসীর মত ; শুধু যে আমার সুন্দর দেহ ও আমার মনকেই ভালবাসত তা নয়, সে ভালবাসত আমার পাপ, আমার ক্রোধ, আমার একঘেয়ে জীবন, এমনকি নেশার ঘোরে যখন তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতাম, মনের ঝাল ঝাড়বার মত আর কাউকে কাছে না

পেয়ে তাকেই গালমন্দ করে কষ্ট দিতাম।

একঘেয়েমি আমাকে কুরে-কুরে খেত। তবু তার মধ্যেই নববর্ষ উপলক্ষ্যে একটু বিশেষ আয়োজন করেছিলাম. অধৈর্য হয়ে মধ্যরাত্রির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। দুই বোতল শ্যাম্পেন—একেবারে আসল মাল "লা ভুভে ক্লিকোৎ" ছাপ-মারা—যোগাড় করে রেখেছিলাম। হেমন্তকালের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে বাজী ধরে এই মালটা আমি জিতেছিলাম। কখনও কখনও গণিতের পাঠ চলার সময়, বাতাসটাও যখন ভারী ও একঘেয়ে ঠেকে, তখন যদি একটা প্রজাপতি উড়ে এসে ক্লাসের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তখন ছেলেরা সব হৈহৈ করে মহা কৌতূহলে তার পিছনে ছুটতে শুরু করে, মনে হয় তারা যেন চোখের সামনে একটা প্রজাপতিকে দেখছে না, দেখছে একটা নতুন ও বিচিত্র কিছু। এই সাধারণ শ্যাম্পেনের বোতলকে নিয়ে আমাদের অবস্থাও তথৈবচ। বস্তুটা কোনক্রমে জুটে গেছে আমাদের এই একঘেয়ে হল্ট স্টেশনে, আর তাকে ঘিরেই আমরা মেতে উঠেছি। চুপচাপ বসে আছি, একবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি, আবার বোতল দুটোর দিকে তাকাচ্ছি।

ঘড়ির কাঁটা যখন বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিটের ঘরে তখন আমি ধীরে ধীরে একটা বোতল খুলতে শুরু করলাম। আজ আমি সঠিক বলতে পারব না, ভদ্‌কাই আমাকে দুর্বল করেছিল, না কি বোতলটাই ভিজে ছিল, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে কর্কটা যেই সশব্দে সিলিং-এর দিকে উড়ে গেল, আমার বোতলটাও হাত ফসকে মেঝেতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বোতলটাকে চেপে ধরে আঙুল দিয়ে তার ফেনাভর্তি মুখটাকে চেপে ধরলাম, ফলে এক গ্লাসের বেশী শ্যাম্পেন নষ্ট হতে পারে নি।

দুটো গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে আমি ঘোষণা করলাম, "এবার শুভ নববর্ষ, আমাদের সব বাসনা পূর্ণ হোক! পান কর!"

আমার স্ত্রী গ্লাসটা তুলে নিয়ে ভয়ার্ত চোখে আমার দিকে তাকাল। তার মুখে আতংকের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

"বোতলটা তুমি ফেলে দিলে?" সে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ, পড়ে গেল। তাতে কি হয়েছে?"

সে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল; তার মুখটা আরও সাদা হয়ে গেছে। বলল, "এটা খুব খারাপ। এটা খারাপ লক্ষণ। এর অর্থ এই বছরেই আমাদের একটা ভয়ংকর কিছু ঘটবে! তুমি দেখে নিও!"

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, "তোমার কুসংস্কার বড় বেশী। তুমি একটি বুদ্ধিমতী মেয়ে, অথচ কথা বলছ বুড়ি সন্ন্যাসিনীর মত। পান কর!"

"ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়, কিন্তু...আমি জানি, একটা কিছু ঘটবেই! তুমি দেখো!"

সে গ্লাসে একটা চুমুকও দিল না; উঠে জানালার কাছে গিয়ে নিজের চিন্তায় ডুবে দাঁড়িয়ে রইল। আমি কুসংস্কার সম্পর্কে কয়েকটা পুরনো বচন

আওড়ালাম, আধ বোতল ভদকা খেলাম, ঘরময় পায়চারি করলাম, তারপর বেরিয়ে গেলাম।

বাইরে শান্ত কুয়াশায় ঢাকা রাত ঠাণ্ডা, জনহীন, সুন্দর। ঠিক মাথার উপরে চাঁদ ও তুলোর মত দুই টুকরো মেঘ নিশ্চল হয়ে আকাশে ঝুলে আছে, কেউ যেন আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছে। তাদের গা থেকে একটা শান্ত, স্বচ্ছ আলো ছড়িয়ে পড়ছে, মনে হচ্ছে যেন কারও জন্য তারা অপেক্ষা করছে: ধীরে ধীরে একান্ত সন্তর্পণে নেমে এসে তারা পৃথিবীকে স্পর্শ করল, চারদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল : বরফের প্রবাহ, রেলপথের বাঁধ...একটি শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

বাঁধ ধরে হাঁটতে লাগলাম।

তারকাখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, "নির্বোধ নারী! যদি ধরেও নেই যে অশুভ লক্ষণগুলি কখনও কখনও সত্য কথাই বলে, তাহলেও এমন কি ভয়ংকর ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটতে পারে? আমাদের বর্তমান ও অতীত দুঃখের বোঝাটা এতই ভারী যে তার চাইতেও খারাপ কিছু ভাবাই শক্ত। যে মাছকে ধরা হয়েছে, ভাজা হয়েছে, এবং পাত্রে সাজিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে, তার আরও ক্ষতি তুমি কি করবে?"

বরফে ঢাকা একটা দীর্ঘ পপলার গাছ রাতের গাঢ় নীল আলোয় চোখে পড়ল; মনে হল একটা দৈত্য যেন শবাচ্ছাদন পরেছে। তীক্ষ্ণ, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে গাছটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন আমার মতই সেও নিজের একাকিত্বকে উপলব্ধি করছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত গাছটাকে দেখলাম।

আমার চিন্তার ধারা বয়েই চলল : "আমার যৌবন চলে গেছে, যৌবনের কোন চিহ্নই আজ আর আমার মধ্যে নেই! শৈশবেই আমার বাবা-মা মারা গেল, আর আমিও স্কুল ছাড়লাম। একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমার জন্ম হয়েছিল কিন্তু আমাকে ভালভাবে লালন-পালন করা হল না, লেখাপড়াও শেখানো হল না. একটি শ্রমিকের চাইতে বেশী লেখাপড়া আমি শিখি নি। আমার আশ্রয় নেই, আপনজন কেউ নেই, কোন উপার্জন নেই। কোন কিছু করার যোগ্যতাও আমার নেই। যখন বড় হয়ে উঠলাম, গায়ে জোর হল তখন হল্ট-স্টেশনের ওভারসীয়ারের পদে ঢুকে পড়াই হল আমার একমাত্র যোগ্যতা। ব্যর্থতা ও দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই জীবনে কোন দিন জানতে পারি নি। আমার জীবনে কি এত ভয়ংকর আরও কিছু ঘটতে পারে?

দূরে কতকগুলি লাল আলো দেখতে পেলাম। একটা ট্রেন আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। ঘুমন্ত তৃণভূমি কান পেতে শুনছে তার গম্ভীর গড়গড় শব্দ। আমার চিন্তা এতই তিক্ত হয়ে উঠেছিল যে মনে হল সেই চিন্তাই সরব হয়ে উঠেছে; টেলিগ্রামের তারের গুনগুন আর ট্রেনের গর্‌গর্‌ আওয়াজ যেন আমার চিন্তাকেই প্রকাশ করছে।

আরও কোন ভয়ংকর ঘটনা কি ঘটতে পারে?...তবে কি আমার স্ত্রীকে

হারাব?'' আমি নিজেকেই প্রশ্ন করলাম। ''সেটা খুব ভীষণ কিছু নয়। বিবেককে তো ফাঁকি দিতে পারি না ঃ স্ত্রীকে আমি ভালবাসি না। একেবারে বালক বয়সে আমি তাকে বিয়ে করেছিলাম। এখনও আমি যুবক, শক্তিমান, কিন্তু সে তো বুড়ি হয়ে গেছে, চামড়া কুঁচকে গেছে, একটা বোকার ডিম, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কুসংস্কারে ঠাসা। তার মিষ্টি আর রুগ্ন ভালবাসা দিয়ে, তার ঢলে-পড়া বুক নিয়ে, ম্লান চাউনি নিয়ে আমি কি করব? আমি তার সঙ্গে থাকি, কিন্তু তাকে ভালবাসি না। তাহলে কি ঘটতে পারে? আমার যৌবন বৃথাই ফুরিয়ে যাচ্ছে। মেয়েরা চকিতে দেখা দেয় একমাত্র ট্রেনের জানালায়, আকাশ থেকে ছিট্‌কেপড়া তারার মত। আজও পর্যন্ত ভালবাসা কাকে বলে আমি জানি না। আমার পৌরুষ মরণের পথে, আমার সাহস, আমাব উদ্যম...সব কিছু ধূলোর মত উড়ে যাচ্ছে; যা কিছু এখনও আছে এই শূন্য তৃণভূমিতে তার দাম একটা কানা কড়িও নয়।''

ট্রেনটা সগর্জনে আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আমার চারদিকে জ্বলে উঠল তার নির্বিকার লাল জানালাগুলো। হল্টের সবুজ আলোর কাছে এক মিনিট দাঁড়িয়ে ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করল। আরও ভার্স্ট দুই পথ হেঁটে আমি ফিবতে শুরু করলাম। বিষণ্ণ চিন্তাগুলি কিন্তু আমাকে রেহাই দিল না; মনে পড়ছে, চিন্তাগুলি আসলে যতটা বিষণ্ণ ও দুঃখদায়ক আমি চেষ্টা করেছিলাম সেগুলিকে তার চাইতেও বেশী বিষণ্ণ ও দুঃখদায়ক করে তুলতে। আপনাবাও জানেন, গর্বিত, অজ্ঞান মানুষদের জীবনে এমন সব মুহূর্তও আসে যখন নিজেদের দুঃখী বোধ করার মধ্যেও তারা এক ধরনের সন্তুষ্টি অনুভব করে, এমন কি তারা দুঃখবিলাসীও হয়ে ওঠে। আমার চিন্তার মধ্যে অনেকটাই সত্য ছিল, আবার অনেক কিছুই ছিল যা নির্বুদ্ধিতা ও অহংকারের ফল, আব ''এর চাইতেও ভয়ংকব কিছু কি আমার জীবনে ঘটতে পারে?'' এই প্রশ্নটির মধ্যে ছোট মাছের মত ছেলেমানুষীও কিছু ছিল।

বাঁধ ধরে ফিরবাব পথে একশ' বার আমি এই প্রশ্নটাই নিজেকে করলাম, ''কি এমন ঘটতে পাবে? সব কিছুর অভিজ্ঞতাই তো আমার আছে। আমি অসুখে ভুগেছি, টাকা উড়িয়েছি, বছরের প্রতিটা দিন উপরওয়ালার বকুনি খাই, আমি ক্ষুধার্ত, একটা হিংস্র বাঘ কতবার হল্ট-স্টেশনে হানা দিয়েছে! আর কি থাকতে পারে? আমি গালাগাল খেয়েছি, লাঞ্ছিত হয়েছি...কিন্তু মনে রাখবেন, আমার যখন সুদিন ছিল তখন আমিও গালাগাল কম করি নি। একমাত্র আমি কখনও কোন অপরাধ করি না, কিন্তু আমি মনে কবি না যে অপরাধ করার যোগ্যতা আমার আছে, আব তাও ধবা পড়াব ভয়ের জন্য নয়।''

এতক্ষণে মেঘের টুকরো দুটো চাঁদের কাছ থেকে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; দেখে মনে হচ্ছে চাঁদ যাতে শুনতে না পায় সেই ভাবে তারা চুপি চুপি কি যেন বলছে। একটা মৃদু বাতাস তৃণভূমি পার হয়ে বইতে শুরু করল, সেই সঙ্গে ভেসে এল দূরাগত ট্রেনের একটানা ঝিকঝিক শব্দ।

যখন বাড়ি ফিরলাম তখন আমার স্ত্রী দরজায় দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। তার দুই চোখে সুখের হাসি, তার সারা মুখ খুশিতে উজ্জ্বল।

সে চুপি চুপি বলল, ''তোমাকে একটা ভাল খবর দিচ্ছি। সোজা তোমার ঘরে গিয়ে নতুন জ্যাকেটটা গায়ে দাওগে। বাড়িতে একজন অতিথি এসেছে!''

''কে অতিথি?''

''আমার নাতাশা খুড়ি এই মাত্র ট্রেনে এসেছে।''

''কোন্ নাতাশা খুড়ি?''

''আমার কাকা সেমিয়নের স্ত্রী। অবশ্য তুমি তাকে চিনবে না। সে এত ভাল, এত সদয়...''

হয়তো আমার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল, কারণ আমার স্ত্রীর মুখটা বেশ গম্ভীর হয়ে গেল; সে ফিস্‌ফিস্ করে বলতে শুরু করল ঃ

''অবশ্য তার এভাবে আসাটা একটু কেমন যেন, কিন্তু নিকোলাই, তুমি রাগ করো না, একটু সহিষ্ণু হও। সে বড় দুঃখী। সেমিয়ন কাকা সত্যি খুব ভয়ংকর স্বেচ্ছাচারী, তার সঙ্গে মানিয়ে চলা সহজ নয়। খুড়ি বলছে মাত্র তিন দিনের জন্য সে এসেছে, তার ভাইয়ের কাছ থেকে একটা চিঠি না আসা পর্যন্ত এখানে থাকতে।''

আমার স্ত্রী একটানা বলে চলল তার স্বেচ্ছাচারী খুড়োব কথা, সাধারণভাবে মানুষের দুর্বলতার কথা, বিশেষ করে যুবতী স্ত্রীদের কথা, প্রত্যেককে আশ্রয় দেওয়া আমাদের কর্তব্য, এমন কি পাপীদেরও, ইত্যাদি ইত্যাদি। তার বক্তব্যের একটা কথাও আমি বুঝতে পারলাম না, তবু নতুন জ্যাকেটটা গায়ে দিয়ে নাতাশা খুড়ির সঙ্গে পরিচিত হতে গেলাম।

টেবিলের পাশে বসে ছিল একটি ছোটখাট স্ত্রীলোক। তার চোখ দুটি কালো ও টানা-টানা। আমার ডেস্ক, ধূসর দেয়াল, এমন কি অমসৃণ সেটিটা পর্যন্ত...মনে হল যেন সব কিছু শেষ, ধূলিকণাটি পর্যন্ত, এই প্রাণীটির উপস্থিতিতে হয়ে উঠল যৌবনদীপ্ত ও সুখময়—কারণ এই প্রাণীটি নিজেই নবীনা ও যৌবনবতী, তার দেহ থেকে নিসৃত হচ্ছে একটা অজানা সৌগন্ধ; সে সুন্দরী, অথচ অসংযত। আমাদের অতিথিটি যে অসংযত চরিত্রের নারী সে কথা আমি তার হাসি দেখে, তার দেহ-গন্ধ থেকে, তার চারদিকে তাকাবার ভঙ্গী দেখে, তার আঁখি-পলাশের নাচ দেখে, আর আমার সম্মানিত স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময় তার কণ্ঠস্বর শুনেই বলে দিতে পারি....সে যে তার স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে, তার স্বামী যে বৃদ্ধ ও স্বেচ্ছাচারী, সে নিজে হাসি খুশি ও সদয়া—এতকথা আমার স্ত্রীর বলার কোন দরকারই ছিল না। এক নজর দেখেই আমি সব বুঝতে পেরেছিলাম, আর গোটা ইউরোপে এমন কোন মানুষ নেই যে একটি বিশেষ মেজাজের মেয়েমানুষকে এক নজর দেখেই চিনতে পারে না।

মৃদু হেসে আমার দিকে হাতটা বাড়িয়ে নাতাশা খুড়ি বলে উঠল, ''ওঃ, আমার যে এত সুন্দর একটি ভাইপো আছে তাতো জানতাম না!''

আমি জবাবে বললাম, ''আর আমিও জানতাম না যে আমার এমন একটি চটকদার ছুড়ি আছে!''

আবার আমরা খেতে বসলাম। দ্বিতীয় বোতলের কর্কটা সশব্দে উড়ে গেল, আর নাতাশা খুড়ি এক চুমুকেই অর্ধেক গ্লাস সাবাড় করে দিল। পরে আমার স্ত্রী যখন একমুহূর্তের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তখন আমাদের অতিথি অসংকোচে পুরো গ্লাসটাই নিঃশেষে পান করল। মদ খেয়ে আমি তখন মাতাল হয়ে গেছি, আর মাতাল হয়েছি এ হেন নারীর উপস্থিতিতে। সেই গানটা কি আপনারা জানেন?

দুটি কালো হরিণ-চোখ আমাকে দগ্ধ করেছে।
দুটি কালো হরিণ চোখ আমাকে দুঃখ দিয়েছে!
আমার ভালবাসাকে নাও,
আমার ভয়কেও নাও!

সে রাতের পরে কি ঘটেছিল আমার মনে নেই। ভালবাসার শুরু কি ভাবে হয় তা যদি কেউ জানতে চান, তাহলে উপন্যাস পড়ুন, গল্প পড়ুন। আমি তাকে সামান্যই বলতে পারি। আর তাও ওই গানেরই কথায়

যেদিন তুমি আমার কাছে এসেছিলে,
সেটা ছিল বড়ই দুর্দিন...

সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেল। কেবল এইটুকু মনে আছে, একটা উদ্দাম, ভয়ংকর ঘূর্ণি-ঝড় আমাকে একটা পালকের মত পাক খাওয়াতে লাগল। সেই ঘূর্ণি-পাকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেল আমার স্ত্রী, নাতাশা খুড়ি স্বয়ং, আর আমার সব শক্তি। আর, দেখতেই পাচ্ছেন, সেই ঘূর্ণি-ঝড় তৃণভূমির রেলপথের হল্ট-স্টেশন থেকে আমাকে উড়িয়ে এনে ফেলেছে এই অন্ধকার পথের উপর।

এবার বলুন, এর চাইতে ভয়ংকর আর কিছু কি আমার জীবনে ঘটতে পারে?

১৮৮৭



শত্রুপক্ষ

Enemies

সেপ্টেম্বর মাসের রাত সাড়ে নটার সময় ডাক্তার কিরিলভের একমাত্র ছেলে ছয় বছরের আন্দ্রেই ডিপ্‌থেরিয়ায় মারা গেল। তার অসহায় মা যখন মৃত সন্তানের বিছানার পাশে নতজানু হয়ে হতাশার প্রথমে আক্ষেপে ভেঙে পড়ল ঠিক তখনই সামনের দরজার ঘন্টাটা কর্কশ শব্দে বেজে উঠল।

বাড়িতে ডিপ্‌থেরিয়ার আক্রমণ হওয়ায় ভোরবেলাতেই চাকর-বাকরদের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অগত্যা কিরিলভ নিজেই যেভাবে ছিলেন সেই অবস্থাতেই —কোটটা গায়ে না চাপিয়ে, ওয়েস্টকোটের বোতাম না এঁটে, এমন কি ভেজা মুখটাও না মুছে এবং কার্বলিক এ্যাসিডে পোড়া হাত নিয়েই—দরজাটা খুলে দিতে গেলেন। হল-ঘরটা অন্ধকার ; যে লোকটি ঘরে ঢুকল তার সম্পর্কে ডাক্তার শুধু এইটুকুই দেখতে পেল যে লোকটির উচ্চতা মাঝারি, পরনে একটা সাদা স্কার্ফ, আর বেশ বড় মুখখানা অসাধারণ পাণ্ডুর।

''ডাক্তার বাড়িতে আছেন ?'' লোকটি শুধাল।

''হ্যাঁ, আমি,'' f ভ উত্তর দিল। ''আপনার জন্য আমি কি করতে পারি ?''

''ওঃ, আপনি! খুব খুশি হলাম!'' লোকটিব কণ্ঠস্বরে আনন্দের উচ্ছ্বাস। অন্ধকারে হাতটা খুঁজে নিয়ে নিজের দুই হাতে চেপে ধরে সে বলতে লাগল, ''আমি খুব খুশি হয়েছি! কি জানেন, আমরা পূর্ব-পরিচিত। আমার নাম আরোগিন...এই গ্রীষ্মেই গ্নুচেভের বাড়িতে আপনাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আপনাকে বাড়িতে পেয়ে কত যে খুশি হয়েছি...ঈশ্বরের দোহাই, এখনই আমার সঙ্গে চলুন, আমার মিনতি....আমার স্ত্রী ভয়ংকর অসুস্থ...বাইরে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে...''

লোকটির কণ্ঠস্বর ও হাত-পা নাড়ানো দেখেই বোঝা যায় সে ভয়ংকর উত্তেজিত। বাড়িতে আগুন লাগলে অথবা পাগ্‌লা কুকুরে কামড়ালে ভয়ে মানুষের যেরকম অবস্থা হয়, এ লোকটির অবস্থাও সেই রকম ; নিজের ঘন ঘন নিঃশ্বাস বন্ধ করতে পারছে না, কাঁপা গলায় দ্রুতলয়ে কথা বলছে, কথা-বার্তার মধ্যে একটা সত্যিকারের আন্তরিকতা ও বালকসুলভ হৃদয়-দৌর্বল্য ফুটে উঠছে। ভীত, স্তম্ভিত মানুষের মতই সে কথা বলছে কেটে কেটে, অনেক অপ্রয়োজন ও অসংলগ্ন শব্দ ব্যবহার করছে।

সে বলতে লাগল, ''ভয় ছিল আপনাকে হয়তো বাড়িতে পাব না। গাড়ি চালিয়ে আসতে আসতে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছি...আমার

অনুরোধ, পোশাক পরে আমার সঙ্গে চলুন।...ব্যাপারটা এই। আলেক্সান্দার সেমিওনোভিচ পপ্‌চিনস্কি, তাকে আপনি চেনেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, এটা-ওটা অনেক কথা হল...তারপর আমরা চা খেতে বসলাম, আর হঠাৎ আমার স্ত্রী চীৎকার করে বুকটা চেপে ধরেই চেয়ারে এলিয়ে পড়ল। ধরাধরি করে তাকে বিছানায় নিয়ে গেলাম, আর...কী না করেছি?...তরল এমোনিয়া তার কপালে ঘসেছি, জল ছিটিয়েছি...সেই থেকে নিশ্চল হয়ে মরার মত পড়ে আছে...আমার ভয় হচ্ছে এটা ধমনীস্ফীতি....চলুন...দেখুন, ওর বাবাও ধমনীস্ফীতি রোগেই মারা গেছেন।...''

কিরিলভ নিশ্চুপ হয়ে সব কথা শুনল, যেন সে রুশ ভাষাই বোঝে না।

আবোগিন যখন পুনরায় পপ্‌চিনস্কির নাম বলল, তার স্ত্রী যে রোগে মারা গেছে তার নামটাও আবার উল্লেখ করল, আর অন্ধকারে ডাক্তারের হাতটা খুঁজতে লাগল, তখন কিরিলভ মাথাটা নেড়ে বিরূপ ভঙ্গীতে টেনে টেনে বলল ঃ

''আমি দুঃখিত, আমি যেতে পারব না...পাঁচ মিনিট আগে আমার ছেলেটি মারা গেছে।''

এক পা পিছিয়ে আবোগিন ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠল, ''ওঃ না! হে প্রভু, কী দুঃসময়েই আমি এসেছি! আজকের দিনটা কী বিস্ময়কর রকমের খারাপ! আর কী যোগাযোগ...আজকের দিনটাতেই...''

আবোগিন দরজার হাতলটা হাতড়াতে লাগল, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল। স্পষ্টতই, কি করবে সেটাই সে বুঝতে পারছে না ঃ চলেই যাবে, না ডাক্তারকে আরও অনুরোধ করবে।

কিরিলভের শার্টের আস্তিনটা চেপে ধরে বলে উঠল, ''দেখুন, আপনার মনের অবস্থাটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। ঈশ্বর সাক্ষী, এই রকম সময়ে আপনার মনকে অন্যদিকে সরাবার চেষ্টা করার জন্য আমি নিজেই লজ্জা বোধ করছি। কিন্তু এখন আমি কি করি? আপনিই বলুন, কার কাছে আমি যেতে পারি? এখানে তো আপনি ছাড়া আর কোন ডাক্তার নেই। ঈশ্বরের দোহাই, আপনি আসুন! নিজের জন্য আমি এভাবে বলছি না...অসুস্থ তো আমি নই!''

সে চুপ করল। কিরিলভ আবোগিনের দিকে পিঠ দিয়ে এক মিনিট দাঁড়াল, তারপর ধীরে ধীরে হলঘর থেকে বৈঠকখানায় গেল। তার পা ফেলার আড়ষ্ট ভঙ্গী, একটা নেভানো বাতির ঝালর দেওয়া আবরণকে সোজা করে দেবার গভীর মনোযোগ, টেবিলে রাখা একটা মোটা বইয়ের দিকে এক নজর তাকানো—এ সব কিছু থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এই মুহূর্তে তার ইচ্ছা বা বাসনা বলে কিছু নেই, কোন কিছুই সে সচেতনভাবে ভাবছে না, আর একটি অপরিচিত লোককে যে হল-ঘরে রেখে এসেছে সে কথাটাও বোধ হয় তার মনে নেই। গোধূলির অন্ধকার আর বৈঠকখানার নিস্তব্ধতা তার মানসিক

আঘাতকে তীব্রতর করে তুলেছে। বৈঠকখানা থেকে পড়ার ঘরে ঢুকতে নিজের ডান পাটাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উঁচু করে তুলল, দরজার বাজুটার খোঁজে এদিক-ওদিক হাতড়াতে লাগল, আর তার সমস্ত শরীরটাতে একটা বিমূঢ় ভাব ফুটে উঠল, যেন সে ভুল করে ভুল ঘরে ঢুকে পড়েছে, অথবা জীবনে এই প্রথম মদ খেয়ে অতি দুঃখে তার নতুন অনুভূতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। পড়ার ঘরের দেয়াল বরাবর একটা চওড়া আলোর রেখা বুক-কেসগুলোর উপর এসে পড়ল ঃ সেই আলো আর তার সঙ্গে কার্বলিক এ্যাসিডের ভারী শ্বাসরোধকারী গন্ধ আধ-খোলা দরজা দিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল।...পিছন দিককার হাতল-চেয়ারে ডাক্তার শরীরটাকে এলিয়ে দিল; তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে এক মিনিট বইগুলোর দিকে তাকাল, তারপর উঠে শোবার ঘরে ঢুকল।

সেখানে তখন মৃত্যুর শান্তি বিরাজ করছে। শোবার ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস যেন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে সাম্প্রতিক বিপদ ও চূড়ান্ত ক্লান্তির কথা; কিন্তু এখন সবকিছু শান্ত হয়ে গেছে। টুলের উপরে স্তূপীকৃত বোতল, বাক্স ও বয়ামের মাঝখানে দাঁড়ানো মোমবাতি আর দেরাজের উপরকার বড় বাতিটার উজ্জ্বল আলোয় সমস্ত ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠেছে। জানালাটার ঠিক নীচে তার নিজের বিছানায় ছেলেটি বিস্ফারিত চোখে শুয়ে আছে, সারা মুখে ফুটে উঠেছে বিস্ময়ের রেখা। সে নড়ছে না, কিন্তু প্রতিটি মিনিট পার হচ্ছে আর মনে হচ্ছে তার খোলা চোখ দুটি ক্রমেই অন্ধকারতর হয়ে খুলির মধ্যে বসে যাচ্ছে। তার মা বিছানার পাশে নতজানু হয়ে বসে আছে; দুটি হাত রেখেছে বালকের শরীরের উপর, আর মুখটাকে ঢেকে রেখেছে বিছানার চাদরের ভাঁজে। ছেলেটির মতই সেও নড়ছে না, কিন্তু তার শরীরের প্রতিটি রেখায়, তার দুই বাহুতে যেন কতনা জীবনের স্পন্দন! সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে সে বিছানাটাকে আঁকড়ে ধরেছে যেন তার একমাত্র ভয় শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহটার জন্য শেষ পর্যন্ত বিশ্রাম করার মত, আরাম করার মত যে অবস্থাটা সে খুঁজে পেয়েছে পাছে সেটাও বিপর্যস্ত হয়ে যায়। কম্বল, তোয়ালে, বেসিন, মেঝেতে জমে-থাকা জল, এখানে-সেখানে ছড়িয়ে থাকা বুরুশ, চামচে, চূণ-জলের সাদা বোতলটা, এমন কি থমকে-থাকা ভারী বাতাসটা পর্যন্ত যেন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।

ডাক্তার স্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল, ট্রাউজারের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে দিল, মাথাটাকে একদিকে কাত করে এক দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকাল। তার মুখটা নিষ্কম্প, উদাসীন, শুধু যে ছোট ছোট শিশিরবিন্দুগুলি তার দাড়িতে চিকচিক করছে তা দেখেই বোঝা যায় যে সে কাঁদছে।

মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত যে ত্রাস মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয় শোবার ঘরে তার চিহ্নমাত্র নেই। এই সার্বিক অচৈতন্য, জননীর দেহ-ভঙ্গিমা, আর ডাক্তারের মুখের উদাসীনতা—সব কিছুর ভিতরে এমন একটা আবেদন আছে যা অন্তরকে স্পর্শ করে; এ যেন মানুষের গভীর শোকের ঠিক সেই সূক্ষ্ম, ক্ষীণ

অনুভূতিগ্রাহ্য সৌন্দর্য যাকে বুঝতে, যাকে বর্ণনা করতে লেখকরা আজও শেখে নি, মনে হয় একমাত্র সঙ্গীতই তাকে প্রকাশ করতে জানে। সেই গম্ভীর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে যেন সে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করা যাচ্ছে ; কিরিলভ ও তার স্ত্রী কথা বলছে না, কাঁদছে না, মনে হয় যেন নিজের গভীর ক্ষতির বাইরে এই পরিস্থিতির গীতিময়তা সম্পর্কেও তারা সচেতন ঃ একদিন যেমন তাদের যৌবন সময়ের সাথে সাথে দূরে চলে গেছে, তেমনই আজও এই ছোট বালকটির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সন্তানলাভের অধিকারও চিরদিনের মত বিদায় নিয়েছে, কারও ডাকেই সে অধিকার আর ফিরে আসবে না! ডাক্তারের বয়স চুয়াল্লিশ, তার চুল পেকেছে, সে বুড়ো হয়েছে ; তার পাণ্ডুর রুগ্ন স্ত্রীর বয়স পঁয়ত্রিশ। আন্দ্রেই যে তাদের একমাত্র সন্তান কেবল সেটাই তো নয়, সে যে তাদেব শেষ সন্তানও বটে।

ডাক্তার তার স্ত্রীর মত নয়, স্বভাবগতভাবেই সে সেই সব মানুষদের একজন যারা আবেগের সংকট-মুহূর্তে স্থির থাকতে পারে না! স্ত্রীর পাশে পাঁচ মিনিটের মত দাঁড়িয়ে থেকে সে হাঁটিতে হাঁটিতে শোবার ঘরের পাশের ছোট ঘরটাতে গেল। ঘরের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে একটা মস্ত বড় চওড়া কোচ পাতা ; সব সময়ই ডান পাটা উঁচুতে তুলে সে রান্নাঘরে ঢুকল। সেটা ও রাঁধুনির বিছানার চারদিকে ঘুরল, তারপর যাতে লিন্টেলে মাথাটা ঠুকে না যায় সেইভাবে নীচু হয়ে ছোট দরজাটার ভিতর দিয়ে হল-ঘরে ঢুকল।

আর সেখানেই আবার দেখা হল সাদা স্কার্ফ ও পাণ্ডুর মুখের সঙ্গে।

দরজার হাতলটা হাতড়াতে হাতড়াতে আবোগিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "শেষ পর্যন্ত এলেন! দয়া করে এবার চলন!"

চমকে উঠে ডাক্তার লোকটির দিকে তাকাল ; তার মনে পড়ল...

একটু জোরের সঙ্গেই সে বলল, "শুনুন, আপনাকে তো আগেই বলে দিয়েছি আমি যেতে পারব না। কী আশ্চর্য, সত্যি!"

"ডাক্তার, আমি কাষ্ঠখণ্ড মাত্র নই, আপনার মনের অবস্থা আমি ভালই বুঝি...আপনার সঙ্গে আমিও শোক প্রকাশ কবছি।" তাব হাতটা নিজের সাদা স্কার্ফের উপর টেনে নিয়ে আবোগিন সাশ্রু নয়নে মিনতি জানাল ঃ "জানেন, আমার জন্য তো আপনাকে যেতে বলছি না...আমার স্ত্রী মরতে চলেছে! আপনি যদি তার কান্না শুনতেন, তার মুখখানি দেখতেন, তাহলে আমার এই পীড়াপীড়িটা বুঝতে পারতেন। আমি ভেবেছিলাম আপনি পোশাক পরতে গেছেন! ডাক্তার, নষ্ট করার মত সময় নেই। দয়া করে চলুন!"

"আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারব না," থেমে থেমে কথাগুলি বলে কিরিলভ বৈঠকখানায় ঢুকে গেল।

আবোগিন এগিয়ে গিয়ে তার আস্তিন চেপে ধরল।

"আপনি শোকে মুহ্যমান সেটা আমি বুঝি, কিন্তু একটা দাঁত বাঁচাতে বা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ দিতে তো আপনাকে বলছি না, আমি বলছি একটি

মানুষের জীবনকে বাঁচাতে!'' সে ভিখারীর মত মিনতি করতে লাগল। ''একটি মানুষের ব্যক্তিগত শোক যত বড়ই হোক, মানুষের জীবনের দাবীই সকলের আগে। আমার মিনতি, আপনি ধৈর্য ধরুন, একটা কাজের মত কাজ করুন! মানুষের প্রতি ভালবাসার দোহাই!''

বিরক্ত হয়ে কিরিলভ বলল, ''মানুষের প্রতি ভালবাসা তো দু'মুখো ছুরি, দু'দিক থেকেই কাটে। সেই একই মানুষের প্রতি ভালবাসার জন্যই আমি আপনাকে বলছি, আমাকে আপনার সঙ্গে যেতে বলবেন না। সত্যি কথা বলতে কি, এটা সত্যি আশ্চর্য! আমি পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, আর আপনি সেই মানুষের প্রতি ভালবাসার নামে আমাকে শাসাচ্ছেন. এখন আমাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না...না, পৃথিবীর কোন কিছুর জন্যই আমি আপনার সঙ্গে যাব না।... তাছাড়া, আমার স্ত্রীকে ফেলে রেখেই বা যাই কেমন করে? না, না....''

কিরিলভ সজোরে হাত নেড়ে আবোগিনকে চলে যেতে বলে নিজেই তার কাছ থেকে পিছিয়ে এল।

সভয়ে বলে উঠল, ''আমার...মিনতি রাখুন! আমি দুঃখিত...আইনমতে আপনার সঙ্গে যাওয়া আমার কর্তব্য, আর আমাব ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে যাবার অধিকারও আপনার আছে...বেশ তো, ইচ্ছা হলে টানতে টানতেই নিয়ে চলুন, কেবল...আমি সুস্থ নেই ..কথা বলতেও পাবছি না... দুঃখিত...।''

পুনরায় ডাক্তারের আস্তিন টেনে ধবে আবোগিন বলল, ''এ রকম সুরে আমার সঙ্গে কথা বলছেন কেন ডাক্তার? আইন যাই বলুক, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করার কোন অধিকার আমার নেই। আপনার যদি ইচ্ছা হয় তো চলুন, আর ইচ্ছা না হলে—তাই হোক। আপনার ইচ্ছার কাছে নয়, আমি আবেদন জানাচ্ছি আপনার অনুভূতির কাছে। একটি যুবতী নারী মরতে চলেছে! আপনি বললেন এই মাত্র আপনার ছেলেটি মারা গেছে, কাজেই আমার আতংক আপনার চাইতে বেশী আর কে বুঝবে?

আবোগিনের কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপছে; এই কাঁপন ও কথা বলাব সুব তার কথাগুলির চাইতে অনেক বেশী প্রত্যয়ী। আবোগিন অকপট, কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল সে যা কিছু বলেছে সবই হৃদয়হীন ও অপ্রাসঙ্গিক রকমের অলংকারবহুল শুনিয়েছে; যে ভাবেই হোক ডাক্তারের বাড়ির পরিমণ্ডলের প্রতি, এবং অন্য কোথাও মৃত্যুপথযাত্রী এক নারীর প্রতিও কথাগুলি অপমানজনক শুনিয়েছে। আবোগিন নিজেও সেটা বুঝতে পেরেছে, তাই পাছে তাকে ভুল বোঝা হয় সেই ভয়ে সে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল তার কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব নরম ও মোলায়েম করতে; মনে আশা, কথা দিয়ে না পারলেও অন্তত কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতা দিয়ে ডাক্তারের মনকে সে জয় করতে পারবে। বস্তুত যত সুন্দর ও জ্ঞানগর্ভই হোক কথা কেবলমাত্র নির্বিকার মানুষকেই প্রভাবিত করতে পারে, যারা সুখী বা দুঃখী সব সময়

তাদের সন্তুষ্ট করতে পারে না ; সেই কারণে নীরবতাই সুখের বা দুঃখের সেরা প্রকাশ ; প্রেমিকরা পরস্পরকে তখনই সব চাইতে ভাল করে বুঝতে পারে যখন কোন কথাই বলা হয় না, আর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে গরম গরম, আবেগপূর্ণ বক্তৃতা করলে তা বাইরেব লোকের হৃদয় স্পর্শ করলেও মৃতের বিধবা পত্নী ও সন্তানদের কাছে সে বক্তৃতা নিরস ও অর্থহীন মনে হয়।

কোন কথা না বলে কিরিলভ দাঁড়িয়ে রইল। আবোগিন ডাক্তারের মহৎ কর্তব্য, আত্মত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ে আরো কিছু কথা আওড়াল। তারপরই ডাক্তার বিষণ্ণ গলায় প্রশ্ন করল ঃ

''অনেক দূরে যেতে হবে কি ?''

আবোগিন উত্তরে বলল, ''তেবো চোদ্দ ভার্স্টের মত হবে। আমার ঘোড়াগুলো চমৎকার ডাক্তার। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, সমস্তটা পথ যাতায়াতে একঘন্টার বেশী লাগবে না। ঠিক এক ঘন্টা!''

এতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের প্রতি ভালবাসা আর ডাক্তারের মহৎ আদর্শ সম্পর্কে যত কথা বলা হয়েছে তার তুলনায় এই শেষের কথাগুলি ডাক্তারকে অনেক বেশী প্রভাবিত করল। এক মুহূর্ত ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল ঃ

''ঠিক আছে, চলুন।''

দ্রুত ও দৃঢ় পদক্ষেপে পড়ার ঘরে ঢুকে একটা লম্বা ফ্রক-কোট গায়ে দিয়ে ডাক্তার ফিরে এল। আবোগিন ব্যস্তসমস্তভাবে ওভারকোটটা পরতে ডাক্তারকে সাহায্য করে তাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বাইরে অন্ধকার, কিন্তু হল-ঘরের চাইতে কম। ডাক্তারের দেহ-রেখাটা এবার স্পষ্ট হল—শরীরটা লম্বা, ঈষৎ ঝুঁকে-পড়া, দীর্ঘ, অল্প দাড়ি, খাড়া, বাঁকা নাক। আর আবোগিনের পাণ্ডুর মুখ ছাড়া চোখে পড়ল তার মস্ত বড় মাথাটা আর তার উপরে বসানো একটা ছাত্রদের ছোট টুপি। সাদা স্কার্ফটা সামনের দিকেই দেখা যাচ্ছে, পিছন দিকে সেটা ঢাকা পড়েছে আবোগিনের লম্বা চুলের নীচে।

ডাক্তারকে হাত ধরে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করে আবোগিন বলল, ''বিশ্বাস করুন, আমার দিক থেকে কৃতজ্ঞতার কোন অভাব হবে না। অচিরেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাব। আর লুকা, তুমি যত জোরে পার গাড়ি চালাও। এই তো লক্ষ্মী ছেলে!''

কোচোয়ান লুকা গাড়ি ছুটিয়ে দিল। প্রথমেই চোখে পড়ল হাসপাতালের জমিতে সারিবদ্ধ অদ্ভুত সব বাড়ি ঘর ; সব কিছু অন্ধকার, কেবল উঠোনের একেবারে পিছন দিকে একটা জানালায় উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, আর হাসপাতালের একেবারে উপরতলার তিনটে জানালাকে বাতাসের চাইতেও বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। হাসপাতালের জমি পার হয়েই গাড়িটা ঘন অন্ধকারের মধ্যে ঢুকল ; সেখানে অরণ্যেব স্যাঁৎসেঁতে গন্ধ আর গাছগুলির ফিস্‌ফিস্ কথাবার্তা। চাকার ঘর্ঘর শব্দে জেগে উঠে কথাগুলো করুণ, ভয়ার্ত স্বরে

কা-কা করে ডাকতে লাগল, যেন তারা জানতে পেরেছে ডাক্তারের ছেলেটি মারা গেছে, আর আবোগিনের স্ত্রীটি অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছে। বনটা পাতলা হয়ে এল, একটানা ঝোপ-ঝাড়, একটা অন্ধকার পুকুরের বুকে বড় বড় কালো ছায়াগুলো ঘুমিয়ে আছে, আর গাড়িটা চলেছে সমতল প্রান্তরের বুক চিরে। কাকের ডাক অস্পষ্ট হতে হতে পিছনে মিলিয়ে গেল, একটু পরেই আর শোনা গেল না।

কিরিলভ ও আবোগিন চুপচাপ বসে আছে। মাত্র একবার আবোগিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল ঃ

"কী যন্ত্রণাদায়ক উৎকণ্ঠা! প্রিয়জনকে হারাবার ভয় যখন দেখা দেয় তখনই তার প্রতি ভালবাসা যেন উথলে ওঠে!"

একটা ছোট নদী পার হবার সময় কিরিলভ হঠাৎ চমকে উঠল, যেন জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দে সে ভয় পেয়েছে, সে অস্থির হয়ে উঠল।

শোচনীয়ভাবে বলে উঠল, "শুনুন, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি পরে আপনার বাড়ি যাব। জানেন তো, আমার স্ত্রী একেবারে একা আছে।"

আবোগিন সাড়া দিল না। পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে খট্‌খট শব্দ করে দুলতে দুলতে গাড়িটা বালুকাময় সৈকত পার হয়ে এগিয়ে চলল। দুঃখে জর্জরিত কিরিলভ চারদিকে তাকাতে লাগল। পিছনে তাকিয়ে তারার মৃদু আলোয় দেখতে পেল রাস্তাটাকে, আর অন্ধকারের বুকে মিলিয়ে যাওয়া নদীর তীরবর্তী উইলো গাছগুলিকে। ডান দিকে প্রসারিত আকাশের মতই মসৃণ সীমাহীন প্রান্তর; এখানে-ওখানে অনেকদূরে ছোট ছোট আবছা আলো জ্বলছে। বাঁ দিকে রাস্তা বরাবর চলে গেছে নীচু ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা একটা ছোট পাহাড়; পাহাড়ের মাথায় নিশ্চল হয়ে ঝুলে আছে একটা বড় লাল বাঁকা চাঁদ, কুয়াশায় ঈষৎ ঢাকা; ছোট ছোট মেঘগুলো তাকে ঘিরে ধরেছে, মনে হচ্ছে তারা যেন চারদিক থেকে তাকে পাহারা দিচ্ছে যাতে সে দূরে চলে না যায়।

সমস্ত প্রকৃতিকেই মনে হচ্ছে আশাহীন ও রুগ্ন, সেই পতিতা নারীর মত যে অন্ধকার ঘরে একা বসে থাকে আর অতীতকে ভুলে যেতে চেষ্টা করে; বসন্ত ও গ্রীষ্মকে স্মরণ করে মাটি যেন স্মৃতিভূক হয়ে পড়েছে আর বিরূপ অন্তরে অনিবার্য শীতের প্রতীক্ষা করছে। যেদিকেই তাকায় সেখানেই প্রকৃতিকে দেখতে পায় একটি অন্ধকার অতলস্পর্শ শীতল গহ্বরের মত, যার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ নেই—তার নিজের নেই, আবোগিনের নেই, এমন কি লাল চাঁদটারও নেই...

তারা যতই লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি হচ্ছে আবোগিন ততই উত্তেজিত হয়ে উঠছে। সে নড়াচড়া করছে, লাফাচ্ছে, কোচোয়ানের কাঁধের উপর দিয়ে সামনে তাকাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত গাড়িটা যখন দাগ-টানা সুন্দর একটা বড় তাঁবুওয়ালা সদর ফটকের সামনে এসে থামল, যখন আবোগিন দোতলার জানালার আলোগুলির দিকে তাকাল, আর ডাক্তার সত্যি সত্যি শুনতে পেল

তার কাঁপা নিঃশ্বাসের শব্দ।

ডাক্তারকে নিয়ে সে যখন হল-ঘরে ঢুকল তখন উত্তেজনায় দুই হাত ঘষতে ঘষতে সে বলে উঠল, "যদি কিছু ঘটে যায়...আমি মরে যাব। অবশ্য কোন হৈ-চৈ শুনতে পাচ্ছি না, অতএব সবই ঠিক আছে।"

এখানে হল-ঘরেও কারও গলা বা পায়ের শব্দ শোনা গেল না। উজ্জ্বল আলো জ্বললেও মনে হল সারা বাড়িটাই যেন গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে। ডাক্তার ও আবোগিন এতক্ষণ অন্ধকারেই কথা বলছিল, এবার তারা পরস্পরকে ভালভাবে দেখতে পেল। ডাক্তার বেশ উঁচু-লম্বা। একটু ঝুঁকে চলে, পোশাকপত্র অগোছালো, মুখটাও কুশ্রী। ঠোঁট দুটো পুরু, নাকটা বাঁকা, নিরাপদ নির্বিকার দৃষ্টিতে একটা অশোভন কঠোরতার আভাষ। তার এলোমেলো চুল, বসে-যাওয়া কপাল, অকালে পাকা লম্বা পাতলা দাড়ির ভিতর দিয়ে থুতনিটা দেখা যায়, চামড়ার ধূসর রং এবং যত্নবিহীন অদ্ভুত চাল-চলন—এই সব রুক্ষতা থেকেই মনে হয় প্রচণ্ড অভাব ও দুর্ভাগ্যের ভিতর দিয়ে তাকে চলতে হয়েছে, জীবন ও মানুষকে নিয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শুকনো কাঠির মত এই মানুষটিকে দেখে বিশ্বাসই হয় না যে তারও স্ত্রী আছে, ছেলের জন্য সেও কাঁদতে পারে। এদিকে আবোগিন তো সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। সুগঠিত, আকর্ষণীয় চেহারা, মাথাভর্তি চুল, চোখ-মুখ-নাক নরম, আধুনিক কেতায় সুসজ্জিত। চাল-চলনে, বোতাম আঁটা ফ্রক-কোটে, বড় বড় চুলে ও সুদৃশ্য মুখে ফুটে উঠেছে একটা মহৎ, সিংহসুলভ চরিত্র; সে হাঁটে মাথাটা সোজা রেখে ও বুকটা এগিয়ে দিয়ে, কথা বলে নরম গলায়, আর যে ভাবে স্কার্ফটা খুলল বা চুলটা আঁচড়াল তার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেল তার চরিত্রের একটি পরিচ্ছন্ন, প্রায় নারীসুলভ সুরুচির পরিচয়। এমন কি বাইরের পোশাকটা ছাড়তে ছাড়তে যেরকম পাণ্ডুর ও শিশুসুলভ চোখে সে বার বার সিঁড়ির উপর দিকে তাকাচ্ছিল তাতেও তার আচরণে কোন ত্রুটি ঘটে নি অথবা তার সমস্ত শরীর থেকে যে পরিপাটি স্বভাব, সুস্বাস্থ্য ও আত্মপ্রত্যয় ফুটে বের হচ্ছে তার কোনরকম বিচ্যুতি ঘটে নি।

উপরে উঠতে উঠতেই সে বলল, "কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই, কোন কথাও শুনছি না। কোন গোলমাল হচ্ছে না। ঈশ্বরই ভরসা।"

হল-ঘর থেকে ডাক্তারকে সঙ্গে করে একটা বড় নাচ-ঘরে ঢুকল। ঘরে একটা কালো বড় পিয়ানো এবং ঝাড়-বাতিটার উপর একটা সাদা চাদরের ঢাকনা দেখা গেল। সেখান থেকে তারা ঢুকল মনোরম আবছা গোলাপি আলোয় ভরা একটা ছোট, আরামদায়ক, সুন্দর বসার ঘরে।

আবোগিন বলল, "আপনি এখানে বসুন ডাক্তার, আমি এক মিনিটের মধ্যেই আসছি। কেবল একটিবার দেখে আসব, আর আমার স্ত্রীকে আপনার আসার কথাটা জানাব।"

কিরিলভ একা। বসার ঘরটার বিলাসবাহুল্য, নরম আবছা আলো, এমন

কি একটা অপরিচিত বাড়িতে প্রায় অভিযান করে আসার বিচিত্র অভিজ্ঞতা কিছুই তার মনে দাগ কাটে নি। একটা হাতল-চেয়ারে বসে কার্বলিক এসিডে পোড়া হাতটাকেই খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। আপনা থেকেই চোখ পড়ল উজ্জ্বল লাল বাতির ঢাকনাটা ও চেলোর বাক্সটাব উপর; আর ঘড়িটা কোথায় টিক্ টিক্ করছে বাঁকা চোখে সেটা দেখতে গিয়েই নজরে পড়ল একটা খড়-ভর্তি নেকড়ে বাঘ, আবোগিনের মতই সবল ও শোভন।

সব চুপচাপ। কাছেই একটা ঘরে জোবে নিঃশ্বাস ফেলল, একটা কাঁচের দরজা খুট্ করে বন্ধ হল, আবার সব নিশ্চুপ। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে কিরিলভ হাতের উপর থেকে চোখ সরিয়ে যে দরজা দিয়ে আবোগিন বেরিয়ে গেছে সেই দরজাটার দিকে তাকাল।

আর সেখানে, সেই দরজাতেই দাঁড়িয়েছিল আবোগিন, তবে ঠিক একই মানুষ নয়। সেই পরিপাটি চেহারা, সেই শোভন সুরুচি সবই উধাও হয়ে গেছে, এখন তার মুখ, তার হাত, তার ভঙ্গী সব কিছুই আতংকে ও চরম দৈহিক যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে। তার নাক, ঠোঁট, গোঁফ, চোখ-মুখ সব কিছুই এমনভাবে নড়ছে যেন মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাইছে, আর তার চোখ দুটি যেন বেদনায় হাসছে।

বড় বড় ভারী পা ফেলে আবোগিন বসবার ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল, একেবারে ঝুঁকে পড়ে আর্তনাদ করে দুটো হাতকেই মুঠো করে নাড়তে লাগল।

চীৎকার করে বলল, ''সে আমাকে ঠকিয়েছে! সে চলে গেছে। অসুখের ভান করে আমাকে পাঠিয়েছিল ডাক্তার আনতে, পাঠিয়েছিল ওই ভাঁড় পপ্‌চিন্‌স্কির সঙ্গে পালিয়ে যাবার মতলব করেই। হা ঈশ্বর!''

সে ডাক্তারের কাছে এগিয়ে গেল, সাদা নরম মুঠি দুটো তার মুখের দিকে বাড়িয়ে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ক্রমাগত আর্তনাদ করতে লাগল।

''সে চলে গেছে! আমাকে ঠকিয়েছে! কিন্তু এই মিথ্যা কথাটা কেন? হা ঈশ্বর! ঈশ্বর আমার! এই নোংরা জোচ্চুরিটা কেন করল? এই শয়তানী ফন্দির কী দরকার ছিল? তার প্রতি কি অন্যায় আমি করেছি? সে চলে গেল!''

তার দুই চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল। একটা পায়ের উপর ভর করে ঘুরে গিয়ে সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। এতক্ষণে তাকে সত্যি একটা সিংহের মত দেখাচ্ছে—পরনে খাটো কোট, কেতাদুরস্ত সরু ট্রাউজার যাতে দেহের তুলনায় পা দুটোকে বেশী সরু দেখাচ্ছে, মাথাটা বড়, আর চুল কেশরের মত লম্বা। ডাক্তারের নির্বিকার মুখে ফুটে উঠল কৌতূহলী দৃষ্টি। উঠে দাঁড়িয়ে সে আবোগিনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিল।

প্রশ্ন করল, ''আমার রোগী কোথায়?''

হাসতে-হাসতে, কাঁদতে-কাঁদতে দুটো মুঠি ঝাঁকিয়ে আবোগিন চেঁচিয়ে উঠল, ''রোগী! রোগী! সে রোগী নয়, একটা নীচাশয় ঠকবাজ! কী নীচতা!

স্বয়ং শয়তানও এর চাইতে নোংরা খেল্ দেখাতে পারত না। আমাকে বাইরে পাঠিয়েছিল যাতে একটা ভাঁড়, একটা বোকাপাঁঠা, একটা কোটনার সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারে! হা আমার ঈশ্বর, সে যদি মরে যেত সেও তো ছিল ভাল! এটা আমার সহ্যের বাইরে! একেবারে বাইরে!''

ডাক্তার সোজা হয়ে দাঁড়াল। চোখ দুটো দ্রুত পিট্‌পিট্ করতে লাগল, জলে ভরে উঠল, আর পাতলা দাড়িটা থুৎনির সঙ্গে সঙ্গে ডাইনে-বাঁয়ে দুলতে লাগল।

''কিন্তু আপনি আমার দিকে তাকান, আমি সত্যি কিছু বলতে চাই'', কৌতূহলের সঙ্গে চারদিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগল। ''আমার ছেলেটি সবেমাত্র মারা গেছে, আমার স্ত্রী যন্ত্রণায় কাটাচ্ছে, সারা বাড়িতে সে এখন একেবারে একা...আমিও পায়ের উপর দাঁড়াতে পারছি না, তিনটে রাত আমি ঘুমই নি...আর এখন? একটা নিদারুণ হাসির নাটকে অভিনয় করতে আমি বাধ্য হয়েছি—বাধ্য হয়েছি রঙ্গমঞ্চের একটি মৃত সৈনিকের ভূমিকায় নামতে! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না...কিচ্ছু না!''

একটা মুঠি খুলে আবোগিন একটা দুমড়ানো চিরকুট মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে পা দিয়ে মাড়াল, যেন একটা পোকাকে পিষে মারতে চাইল।

''আমিও পারছি না...আমি কিছুই দেখি নি, কিছুই বুঝি নি!'' দাঁতে দাঁত চেপে সে কথাগুলি বলল। মুখের সামনে একটা মুঠি নাড়তে নাড়তে এমনভাবে ব্যথায় কুঁকড়ে গেল যেন কেউ তার পায়ের আঙুলগুলো মাড়িয়ে দিয়েছে।'' সে তো প্রতিদিনই আসত, কিন্তু তা নিয়ে আমি কিছুই মনে করি নি, আর আজ যে সে একটা গাড়িতে চেপে এসেছিল সেটা খেয়ালই করি নি। একটা গাড়িতে কেন? আমি কিছুই দেখতে পাই নি! কী বোকার ডিম!''

''আমি বুঝতে পারছি না'', ডাক্তারও বলল। ''আসলে এসব কি? এ তো একটা বিরাট পরিহাস, মানুষের মর্যাদা নিয়ে রঙ্গরস, মানুষের যন্ত্রণাকে নিয়ে খেলা! এ অসহ্য!...আমার জীবনে কখনও এরকমটি দেখি নি!''

যে লোকটি এইমাত্র বুঝতে পেরেছে কী ভয়ংকরভাবে তাকে অপমান করা হয়েছে তারই মত নির্বাক বিস্ময়ে ডাক্তার কাঁধ ঝাঁকাল, একটা অসহায় ভঙ্গী করল, আর কি বলবে বা করবে বুঝতে না পেরে গভীর ক্লান্তিতে হাতল-চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

''ঠিক আছে, সে আর আমাকে ভালবাসে না, সে অন্যের প্রেমে পড়েছে, সে জাহান্নামে যাক, কিন্তু এই ফাঁকিবাজী কেন? কেন এই নোংরা চালাকি?'' আবোগিন সখেদে বলতে লাগল। ''কিসের জন্য? তার প্রতি কি অন্যায় আমি করেছি? ''শুনুন ডাক্তার,'' কিরিলভের কাছে গিয়ে সে উত্তেজিতভাবে বলল। ''একান্ত অনিচ্ছায় আপনি দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন, তাই প্রকৃত সত্যকে আপনার কাছে গোপন করব না। শপথ করে বলছি ঐ নারীকে আমি ভালবেসেছি, ক্রীতদাসের মত একান্ত নিষ্ঠায় ভালবেসেছি।

তার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিঃ আমার পরিজনের সঙ্গে ঝগড়া করেছি, চাকরি ছেড়েছি, গান-বাজনা ছেড়েছি, যে ব্যাপারে মাকে বা বোনকে ক্ষমা করতাম না, তার বেলায় তাও ক্ষমা করেছি...কখনও সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকাই নি...অথবা তাকেও সন্দেহ করার সুযোগই দেই নি! তবু কেন এই মিথ্যাচার? তার কাছে আমি ভালবাসা দাবী করছি না। তাহলে এ ভাবে সে আমাকে ফাঁকি দিল কেন? আমাকে যদি ভালবাসতে না পার, সে কথা আমাকে খোলাখুলি বলে দাও, বিশেষ করে এ বিষয়ে আমার মতামত তো তুমি জান..."

সাশ্রুনয়নে, কম্পমান দেহে আবোগিন আন্তরিকভাবে মনের সব কথা ডাক্তারকে খুলে বলল। দুই হাত বুকের উপর চেপে ধরে সে গরম গরম কথা বলল, তিলমাত্র ইতস্তত না করে বিবাহ-সম্পর্কিত গোপন কথাগুলিও প্রকাশ করল, আর এই ভেবে স্বস্তি বোধ করল যে সেই সব গুপ্ত কথা শেষ পর্যন্ত তার বুক ফেটে বাইরে ছড়িয়ে গেল। সে যদি এই ভাবে আরও দু'এক ঘন্টা কথা বলতে পারত এবং মনের মধ্যে যা কিছু গোপন ছিল সব বাইরে ঢেলে দিতে পারত, তাহলে নিঃসন্দেহে এই দুঃখজনক ঘটনাকে সহ্য করা তার পক্ষে সহজতর হত। ডাক্তার যদি তার সব কথা শুনত, বন্ধুর মত তাকে সহানুভূতি জানাত, তাহলে হয় তো—অনেক সময় এমন তো ঘটেই—আবোগিন বিনা প্রতিবাদে ও দুঃখটাকে মানিয়ে নিত, বোকার মত কোন কাজ করে বসত না...কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল অন্যরকম। আবোগিন যখন তার মনের কথাগুলি খুলে বলছিল, অপমানিত ডাক্তার তখন উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে যাচ্ছিল। একটু একটু করে তার মুখের নির্বিকার ও বিস্ময়ের ভাবটার বদলে ফুটে উঠতে লাগল তিক্ত আঘাত, ক্ষোভ ও ক্রোধের লক্ষণ। তার মুখমণ্ডল হয়ে উঠল আরও কঠোর, আরও কর্কশ, আর বিষণ্ণ। আর আবোগিন যখন তার চোখের সামনে তুলে ধরল একটি যুবতী নারীর সুন্দর মুখের ফটোগ্রাফ—যে মুখখানি তখন ছিল কুমারী সন্ন্যাসিনীর মুখের মত ভাবলেশহীন—আর জানতে চাইল এ-মুখ দেখে কেউ কি বিশ্বাস করবে যে সে মিথ্যা বলতে পারে, তখন হঠাৎই ডাক্তার লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, দুই চোখে আগুন ঝড়িয়ে প্রতিটি কথাকে কেটে কেটে বলে উঠল ঃ

"এ সব কি আপনি আমাকে বলছেন? আমি এসব শুনতে চাই না!" চীৎকার করে সে টেবিলের উপর একটা ঘুষি মারল। "আপনার এ সব নোংরা গুপ্ত কথা আমার কোন কাজে লাগবে না, ও সব উচ্ছন্নে যাক। কোন্ সাহসে এই সব জঘন্য কথা আমাকে বলছেন? না কি আপনি ভেবেছেন যে আমাকে যথেষ্ট অপমান করা হয় নি? আমি কি একটা তুচ্ছ চাটুকার যাকে যত ইচ্ছা অপমান করা যায়? আপনি কি তাই মনে করেন?"

কিরিলভের কাছ থেকে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে আবোগিন অবাক হয়ে

তার দিকে তাকিয়ে রইল।

দাড়ি নেড়ে ডাক্তার বলেই চলল, "কিসের জন্য আপনি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন? আপনি যদি পরিতৃপ্তির তাড়নায় বিয়ে করে থাকেন, তাহলে সেই পরিতৃপ্তির তাড়নায়ই পাগল হয়ে যান, আর এই সব নাটক করতে থাকুন, ঐ সব আমার কোন ব্যাপারই নয়। আপনার প্রেমের ব্যাপারে আমার কি করার আছে? আমাকে ছেড়ে দিন। আপনার সম্মানজনক ব্যবসাটা চালিয়ে যান, মানবিক ধ্যান ধারণাগুলি প্রচার করুন, (বাঁকা চোখে সেলোর বাক্সটার দিকে তাকাল)...ঐ সব বাদ্যযন্ত্র ও বাঁশী বাজান, খাসী মোরগের ভুঁড়ি বানিয়ে ফেলুন, কিন্তু কারও মর্যাদার প্রশ্ন নিয়ে ছেলেখেলা করবেন না। তা যদি না পারেন তাহলে দয়া করে অন্যকে আর এর মধ্যে টানবেন না!"

"থামুন, এভাবে বক্তৃতা করার অর্থটা কি?" মুখ লাল করে আবোগিন শুধাল।

"অর্থটা এই—মানুষকে নিয়ে এ রকম খেলা করাটা নিন্দনীয়, হেয় কাজ! আমি একজন ডাক্তার, আর আপনি তো ডাক্তারদের এবং যাদের গায়ে গন্ধ তেলের ও ব্যভিচারের দাগ নেই এমন সব শ্রমিককর্মীকেই আপনার খানসামার মত দেখেন। দেখুন, ইচ্ছা হয় তাদের সকলকেই হেয় করে দেখুন, কিন্তু একটি যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষকে রঙ্গমঞ্চের আসবাব বানাবার অধিকার কেউ আপনাকে দেয় নি!"

আবোগিন শান্ত গলায় শুধাল, "এ কথা আমাকে বলার মত সাহস আপনার হল কেমন করে?" রাগে তার মুখটা কুঁচকে উঠল।

"না, আমার পুত্রবিয়োগের কথা জেনেও আমাকে এখানে টেনে এনে এই সব জঘন্য কথা শোনাবার সাহস আপনারই বা হল কেমন করে?" ডাক্তার চীৎকার করে পুনরায় টেবিলে একটা ঘুষি মারল। "একজনের শোককে নিয়ে এ রকম ঠাট্টা করার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে?"

আবোগিনও এবার চেঁচিয়ে বলল, "নিশ্চয় আপনার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে! এ কী উদারতাহীনতা! আমি এ রকম ভয়ংকর দুঃখী, আর আপনি...আপনি..."

ডাক্তার খেঁকিয়ে উঠল, "আপনি দুঃখী? ঐ শব্দটাকে কলঙ্কিত করবেন না, ওটা আপনাকে মানায় না। যে সব বাউণ্ডুলেদের কেউ টাকা ধার দেয় না তারাও নিজেদের দুঃখী বলে। যে খাসী মোরগটা অতিরিক্ত চর্বির বোঝা বয়ে বেড়ায় সেটাও তো দুঃখী. কী অপদার্থ লোক!"

আবোগিন আর্তস্বরে বলে উঠল, "আহারে আমার ভালমানুষটি, আপনি দেখছি নিজেকেই ভুলে যাচ্ছেন। এতদূর না এগোলেও একটা মানুষের গালে চপেটাঘাত পড়তে পারে ...বুঝলেন?"

কোটের পকেট হাতড়ে সে টাকার থলিটা বের করল, এবং দুটো ব্যাংকনোট বের করে টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল।

নাকটা ফুলিয়ে বলল, ''আপনার ভিজিটটা নিন। আপনার প্রাপ্যটা দেওয়া হল।''

''আপনি আমাকে টাকা দেবার সাহস করলেন?'' ডাক্তার আর্তনাদ করে ব্যাংকনোট দুটোকে যেন ঝাঁটা মেরে সরিয়ে দিল। ''টাকা দিয়ে অপমানের দাম দেওয়া যায় না!''

আবোগিন ও ডাক্তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল আর রাগের বশে যার যা প্রাপ্য নয় সেই ভাবে পরস্পবকে অপমান করতে লাগল। সম্ভবত আগে কখনও বিকারের ঘোরেও এত সব অন্যায়, নিষ্ঠুর ও অর্থহীন কথা তারা কেউ বলে নি। দু'জনেব মধ্যেই প্রকাশ পেল দুঃখীজনের স্বার্থপবতা। যারা দুঃখী তারাই স্বার্থপর, বিদ্বেষপরায়ণ, অবিবেচক ও নিষ্ঠুর হয়ে থাকে, পরস্পরকে বোঝবাব ব্যাপারে তারা অতিনির্বোধদের চাইতেও অক্ষম। দুঃখ মানুষকে কাছে টানে না, দরে সরিয়ে দেয়, এমন কি যেখানে আশাকরা যায় যে দুঃখেব অংশীদার হলে দু'জনের মধ্যে মিলন ঘটবে, ও দেখা যায় সেখানেই এত বেশীমাত্রায় অবিচার নিষ্ঠুরতার ও ঘটনা ঘটে যা অপেক্ষাকৃত আত্মতুষ্ট বিবোধীদের মধ্যেও ঘটে না।

হাঁপাতে হাঁপাতে ডাক্তাব আর্তগলায় বলল, ''দয়া কবে আমাকে বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।''

আবোগিন অতিমাত্রায় কর্কশ শব্দ করে ঘন্টাটা বাজাল। কেউ যখন সাড়া দিল না তখন সে আবাব বাজিয়েই বেগে ঘন্টাটাকে মেঝের উপব ছুঁড়ে দিল; ঘন্টাটা কার্পেটের উপব আছড়ে পড়ে একটা করুণ আর্তনাদ কবল। একজন পবিচাবক হাজির হল।

''কোথায় লুকিয়ে ছিলে হতভাগার দল?'' পরিচাবককে শাপান্ত করে আবোগিন ঘুষি পাকাল। ''এই মাত্র কোথায় ছিলে? ওদের গিয়ে বল, এই ভদ্রলোকের জন্য ট্র্যাপটা নিয়ে আসুক, আব আমার জন্য গাড়িটা আনুক। না, দাঁড়াও,'' পবিচাবক পা বাড়াতেই সে চেঁচিয়ে বলল। ''আব...কাল যেন একটা বিশ্বাসঘাতকও এ বাড়িতে না থাকে! প্রত্যেককে গুলি কবে মারা দরকাব। আমি নতুন কাজেব লোক ভাড়া করব। বিশ্বাসঘাতক ইঁদুবেব দল!''

গাড়ির জন্য অপেক্ষা করে থাকার সময়ে আবোগিন বা ডাক্তার কেউ একটা কথাও বলল না। এর মধ্যেই আবোগিনের মধ্যে পবিচ্ছন্নতা ও তীক্ষ্ণ সুরুচির ভাবটা ফিবে এসেছে। সুন্দরভাবে মাথাটা দোলাতে দোলাতে সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল, আর মনে মনে একটা ফন্দি আঁটিতে লাগল। তার রাগ তখনও ঠাণ্ডা হয় নি, কিন্তু সে এমন ভান করতে লাগল যেন শত্রুকে দেখতেই পাচ্ছে না।....আব ডাক্তাব, একহাতে টেবিলেব কোণে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে আবোগিনেব দিকে তাকিয়ে আছে সেই রকম গভীব, কিছুটা মানবদ্বেষী ও অসুন্দব ঘৃণাব দৃষ্টিতে যে দৃষ্টিতে একমাত্র দুঃখ, দুর্ভাগ্যই তাকাতে পারে পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের দিকে।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার যখন ট্র্যাপে উঠে বসল আর ট্র্যাপটাও ছুটতে শুরু করল তখন তার চোখে সেই ঘৃণার দৃষ্টিই দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার হল, এক ঘন্টা আগের চাইতে বেশী অন্ধকার। লাল বাঁকা চাঁদটা পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে, যে মেঘগুলি এতক্ষণ চাঁদকে দেখছিল এবার তারা তারাদের কাছাকাছি কালো কালো ছোপ হয়ে আছে। আবোগিনের লাল আলো-জ্বলা গাড়িটা খটাখট্ শব্দ করে দ্রুত এগিয়ে ডাক্তারের ট্র্যাপটাকে ধরে ফেলল। আবোগিন প্রতিবাদ জানাতে এবং বোকার মত আরও অনেক কিছুই করতে যাচ্ছিল...

সারাটা পথ ডাক্তার তার স্ত্রীর কথা ভাবল না, মৃত ছেলের কথা ভাবল না, ভাবল কেবল আবোগিন ও এইমাত্র যে বাড়িটা সে ছেড়ে এসেছে সেখানকার অধিবাসীদের কথা। তার চিন্তাগুলো ছিল অন্যায় এবং অমানুষিক রকমের নিষ্ঠুর। সে দোষী সাব্যস্ত করল আবোগিনকে ও তার স্ত্রীকে, পাপ্‌চিন্‌স্কিকে, আর সেই গোলাপি, সুগন্ধি আলো-ছায়ায় যারা বাস করে তাদের প্রত্যেককে। বাড়ি ফেরার সারাটা পথই সে তাদের সব্বাইকে এত বেশী ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করতে লাগল যে তার নিজের মনই তাতে দুঃখ পেল।

সময় চলে যাবে, কিরিলভের দুঃখও দূর হবে, কিন্তু তার এই প্রত্যয়, মানব হৃদয়ের পক্ষে অন্যায় অযোগ্য এই প্রত্যয় কোন দিন কাটবে না, কবরে যাবার দিনটি পর্যন্ত ডাক্তারের অন্তরেই বাসা বেঁধে থাকবে।

১৮৮৭



অসতর্কতা

Incautionness

জনৈক কর্ণেলের বিধবা পত্নী মাদাম আইভানভনার বোন-পো পিওতর পেত্রভিচ স্ত্রিঝিন দীক্ষা-অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফিরল সকাল ঠিক দুটোর সময়। এক বছর আগে এই স্ত্রিঝিনেরই আনকোরা নতুন গ্যালোশ জোড়া পায়ে আটো হয়েছিল। যাতে বাড়ির কারও ঘুম ভেঙে না যায় তা সে সামনের হল ঘরেই রাস্তার পোশাকগুলি ছাড়ল, দম বন্ধ করে পা টিপে টিপে শোবার ঘরে গেল, এবং বাতিটা না নিভিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

স্ত্রিঝিন মিতাচারী, সুশৃংখল জীবন যাপন করে, তার মুখের ভাব শিক্ষাপ্রদ, সে পড়াশোনা করে ধর্মীয়-নীতিমূলক গ্রন্থাদি, কিন্তু লিদিয়া স্পিরিদোনভ্‌না নিরাপদে একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে জেনে খুশি হয়ে সে দীক্ষা-অনুষ্ঠানে চার গ্লাস ভদ্‌কা এবং ভিনিগার ও ক্যাস্টর ওয়েল মেশানো

পানীয়ের মত স্বাদের মদও এক গ্লাস খেয়ে ফেলেছে। এই জ্বালাময়ী পানীয়কে অবশ্য সমুদ্রের জল বা যশের সঙ্গে তুলনা করা চলে ঃ যত পাবে ততই তৃষ্ণা বাড়বে...এখনও পোশাক ছাড়তে ছাড়তে স্ত্রিঝিনের মনে এক চুমুক পান করার একটা অদম্য ইচ্ছা জেগে উঠল।

তার মনে পড়ল, ''আমার মনে হয় সাইড বোর্ডের ডান দিকে দাশেংকা এক বোতল ভদ্‌কা রেখে দিয়েছে। তার থেকে এক গ্লাস খেলে সে টের পাবে না।''

একটু ইতস্তত করে নিজের ভীরুতাকে বাগে এনে সে কাবার্ডের দিকে এগিয়ে গেল। সন্তর্পণে দরজাটা খুলে হাতড়াতে হাতড়াতে যথাস্থানেই বোতল ও গ্লাসটা পেয়ে গেল, একপাত্র ঢেলে নিল, বোতলটাকে যথাস্থানে রেখে দিল, ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল, তারপর সেটা গলায় ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে যা ঘটল সেটা অবাক হবারই মত। বোমার মত প্রচণ্ড বেগে কে যেন তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সিন্দুকটার দিকে। তার চোখ ঝল্‌সে গেল, দম আটকে এল, মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা ভয়ংকর অনুভূতি শির্ শির্ করে নামতে লাগল, মনে হল সে যেন এমন একটা ডোবার মধ্যে পড়ে গেছে যার জলে এক ঝাঁক জোঁক কিল্‌বিল্ করছে। সে ভাবল, ভদকার বদলে সে একটুকরো ডিনামাইট গিলেছে আর সেটাই ফেটে গিয়ে তাকে, তার বাড়িটাকে, গোটা রাস্তাটাকে উড়িয়ে দিয়েছে...তার মাথা, হাত পা, সব কিছু ছিঁড়ে-খুড়ে উড়িয়ে দিয়েছে নরকের পথে, মহাশূন্যে...

দু'তিন মিনিট সে সিন্দুকের উপরেই পড়ে থাকল, নড়াচড়া নেই, নিঃশ্বাস পড়ছে না ; তারপর উঠে বসে নিজেকেই প্রশ্ন করল ঃ

''আমি কোথায় ?''

আর সর্বপ্রথম যা স্পষ্ট করে বুঝতে পারল সেটা কেরোসিনের কড়া গন্ধ।

তখনই সভয়ে ভাবল, ''হায়রে, ভদ্‌কার বোতল বলে ভুল করে আমি যে কেরোসিন গিলেছি, হায় আমার পুণ্যবতী মাসি।''

নিজের হাতে বিষ খেয়েছি এই চিন্তাই তাকে পাগল করে তুলল। সত্যি সত্যি সে বিষ খেয়েছে। ঘরের মধ্যে কেরোসিনের গন্ধ ছাড়াও তার প্রমাণ সে পাচ্ছিল মুখের ভিতরকার জ্বালা থেকে, চোখের অস্থির দৃষ্টি থেকে, মাথার মধ্যে ঘন্টার শব্দ থেকে, আর পেট মোচড়ানো থেকে। মৃত্যু সন্নিকট বুঝতে পেরে এবং মিথ্যা আশায় নিজেকে না-ভুলিয়ে আপন জনদের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য সে দাশেংকার শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াল। (স্বয়ং বিপত্নীক হওয়ায় ঘর-সংসার দেখার জন্য এই অবিবাহিতা আত্মীয়টিকে বাড়িতে এনে রেখেছে।)

ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে ডাকল, ''দাশেংকা! প্রিয় দাশেংকা!''

অন্ধকারেই বিছানায় নড়াচড়া ও দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ কানে এল।

''দাশেংকা!''

''অ্যা? কে? তুমি, পিওতর দাশেংকা?'' আত্মীয়টি তাড়াতাড়ি সাড়া দিল। ''এরই মধ্যে ফিরে এলে? বেশ, তা কেমন হল? ছোট মেয়েটার কি নাম রাখল? ধর্মমাই বা কে হল?''

''নাতালিয়া আন্দ্রেয়েভ্না ভেলিকোস্তেৎস্কায়া হল ধর্ম-মা আর পাভেল আইভানিচ বেসোনিৎসিন হল ধর্ম-বাপ...আমি....আমি মরতে বসেছি দাশেংকা। ছোট মেয়েটার নাম দেওয়া হয়েছে অলিম্পিয়াড়া.... আমি...দাশেংকা আমি কেরোসিন খেয়েছি।''

''সে কি? তুমি কি বলতে চাও পানীয় হিসাবে তারা কেরোসিন দিয়েছিল?''

''সত্যি কথা বলতে কি তোমার অনুমতি না নিয়েই আমি এক গ্লাস ভদ্কা খেতে চেয়েছিলাম...তার শাস্তি ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন ঃ অন্ধকারে ভুল করে কেরোসিন খেয়ে ফেলেছি...এখন আমি কি করি?''

তার অনুমতি ছাড়াই কাবার্ডটা খোলা হয়েছে শুনেই আত্মীয়টির ঘুম ছুটে গেল। তাড়াতাড়ি মোমবাতিটা জ্বালিয়ে কেবলমাত্র রাত্রিবাসটা পরেই একলাফে সে বিছানা থেকে নামল—হাড়সর্বস্ব, ছুলি-পড়া একটা বুড়ি—খালি পায়েই কাবার্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

কাবার্ডের ভিতরটা ভাল করে দেখে নিয়ে বলে উঠল, ''কে তোমাকে অনুমতি দিল? ওখানে ভদ্কা রাখা হয়েছে কি তোমার জন্য?''

''কিন্তু দাশেংকা, বুঝে দেখ, আমি তো ভদ্কা খাই নি, খেয়েছি কেরোসিন,'' কপালের ঠাণ্ডা ঘাম মুছতে মুছতে স্ত্রিঝিন কোনমতে কথাগুলি বলল।

''আর কেরোসিনের বোতলটা ধরতেইবা কে তোমাকে বলেছিল? সেটাকে ওখানে রেখেছি কি তোমার গলায় ঢালবার জন্য? না কি তুমি ভাব যে কেরোসিনটা মাঙনায় পাওয়া যায়? আজকাল ও জিনিসটার কত দাম তা কি তুমি জান, না জান না? জবাব দাও!''

স্ত্রিঝিন আর্তনাদ করে উঠল, ''প্রিয় দাশেংকা, এটা জীবনমরণের কথা, আর তুমি টাকার কথা বলছ!''

''প্রথমে মাতাল হবেন, তারপর কাবার্ডে নাক গলাবেন!'' দাশেংকা চীৎকার করতে করতে কাবার্ডের দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল। ''আঃ, সব জানোয়ার, রাক্ষস! আর আমি খেটে মরছি, দিনে-রাতে এক মুহূর্তের জন্য শান্তি নেই! আঃ, যত সব সাপ, পিশাচ, নরকে গিয়ে থাকলেই তো পার! আর একটা দিনও এখানে থাকছি না! আমি কুমারী মহিলা, আর তুমি তলবাসমাত্র পরে আমার সামনে এসে দাঁড়াবে, তা চলবে না! আমি যখন যথেষ্ট পোশাক পরে নেই তখন কোন্ সাহসে তুমি আমার দিকে তাকাও!''

এই ভাবেই চলতে থাকল...স্ত্রিঝিন জানে, দাশেংকা যখন রেগে যায় তখন যতই অনুনয়-বিনয় কর, যতই কথা দাও, এমন কি বন্দুকও চালাও, তার বকুনির স্রোত কিছুতেই থামে না; তাই তাকে আর কিছু না বলে সে

পোশাক পরে বেরিয়ে গেল ডাক্তারের খোঁজে। আর ডাক্তারদের তো একমাত্র তখনই পাওয়া যায় যখন প্রয়োজন থাকে না। তিনটে বড় রাস্তার এ-মাথা ও-মাথা ছুটোছুটি করে, ডাক্তার চেপ্‌খারিয়ান্তের দরজার ঘন্টাটা পাঁচবার, এবং ডাক্তার বুল্‌তাইখিনের ঘন্টাটা সাতবার বাজিয়ে শেষ পর্যন্ত ছুটল ওষুধ-বিক্রেতার দোকানে ঃ সে যদি কিছুটা সাহায্য করতে পারে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওষুধ-বিক্রেতা দরজা খুলল—একটি ছোটখাট, শক্ত-সবল মানুষ, মাথায় কোঁকড়া চুল, পরনে ড্রেসিং-গাউন, চোখ ঘুমে ঢুলু-ঢুলু ; তার মুখটা এত গম্ভীর যে স্ত্রিঝিন সত্যি ভয় পেল।

ইহুদী-ধর্মে বিশ্বাসী কর্মকুশল ও মর্যাদাসম্পন্ন ভিষকদের যোগ্য কণ্ঠস্বরে লোকটি শুধাল, ''আপনার জন্য কি করতে পারি ?''

স্ত্রিঝিন ঢোক গিলে বলল, ''ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে দয়া করুন! আমাকে কিছু একটা দিন! আমি ভুল করে কেরোসিন খেয়ে ফেলেছি! আমি মরতে বসেছি!''

''আপনি শান্ত হোন, আমার সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিন। আপনার এত উত্তেজনার জন্যই আপনাকে বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আপনি কিছুটা কেরোসিন খেয়ে ফেলেছেন এই তো ?''

''হ্যাঁ, কেরোসিন! দয়া করে আমাকে বাঁচান!''

গম্ভীর ও নির্বিকার ভিষক ভিতরে গিয়ে এটা-ওটা বই খুলে পড়ায় ডুবে গেল। দুই পাতা পড়ে প্রথমে এক কাঁধ, পরে অপর কাঁধটা বাঁকাল, অদ্ভুত মুখভঙ্গী করল, একমুহূর্ত ভাবল, তারপর পাশের ঘরে ঢুকল। ঘড়িতে চারটে বাজল। চারটে বেজে দশ মিনিট হলে ভিষক আর একটা বই নিয়ে ফিরে এসে আবার এক মনে বইটা পড়তে শুরু করল।

খুবই বিচলিত হবার ভাব দেখিয়ে সে বলল, ''হুম, আপনি যে অসুস্থ বোধ করছেন তা থেকেই আপনার বোঝা উচিত ছিল যে আপনার যাবার কথা একজন ডাক্তারের কাছে, ওষুধ-বিক্রেতার কাছে নয়।''

''কিন্তু আমি তো দু'জন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম! দরজার ঘন্টার শব্দেও তারা সাড়াই দিল না।''

''হুম্...আমরা ওষুধ-বিক্রেতা, আমরা ভিষক, আমাদের কথা তো আপনারা ভাবেনই না ; আমরা তো মানুষই না, ভোর চারটেয় এসে আপনারা আমাদের বিরক্ত করেন অথচ কুকুর-বেড়ালকেও মানুষ ঘুমতে দেয়...আপনারা কিছুই বুঝতে চান না, আপনারা ভাবেন আমরা আপনাদের মত মানুষ নই, আমাদের স্নায়ুগুলো দড়ির মত মোটা।''

স্ত্রিঝিন ভিষকের সব কথা শুনল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর বাড়ি ফিরে গেল। মনে মনে ভাবতে লাগল, ''অতএব আমার মৃত্যু অনিবার্য।''

তার মুখ জ্বালা করছে, কেরোসিনের স্বাদ ও গন্ধ পাচ্ছে। পাকস্থলীতে বিষম ব্যথা হচ্ছে, মাথার ভিতরে রক্ত বুম-বুম করছে! প্রতি মুহূর্তে কল্পনা করছে মৃত্যু আরও কাছে এসেছে, হৃদ্‌স্পন্দন থেমে গেছে।

বাড়িতে পৌঁছেই সে একটা চিরকুটে লিখল ঃ ''আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।'' তারপর প্রার্থনা করল, বিছানায় শুয়ে লেপটা মাথার উপর টেনে দিল। মৃত্যুর প্রতীক্ষায় সারা রাত জেগে কাটাল, আর সারাক্ষণ একটা ছবিই তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল—তার কবরের উপর নতুন ঘাস গজিয়ে উঠছে আর ছোট ছোট পাখিরা কিচির-মিচির ডাকছে—

সকাল হলে বিছানার এক পাশে বসে সে হেসে হেসে দাশেংকাকে বলল, ''দিদি গো, যে মানুষ ধর্মময় সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করে পৃথিবীর কোন বিষ তাকে মারতে পারে না। আমার ব্যাপারটাই ধর। আমি তো মৃত্যুর তীরেই দাঁড়িয়েছিলাম, কত যন্ত্রণা ভোগ করলাম, এখন আমিই তো ভাল হয়ে গেলাম। এ কথা সত্য যে আমার মুখে একটা জ্বালা ধরেছিল, গলাটা টন্-টন্ করছিল, কিন্তু—প্রভুকে ধন্যবাদ—আমার বাকি শরীরটা তো এখন ভালই আছে। কেন বল তো ? কারণ আমি সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করি।''

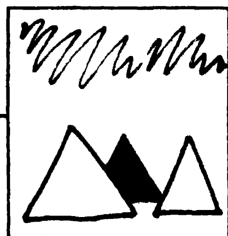
সংসারের খরচের কথা ভেবে পাথরের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দাশেংকা খেঁকিয়ে উঠল, ''না, এটা হয়েছে কেরোসিনটা খারাপ বলে। এর অর্থ দোকানী আমাকে সেরা কেরোসিন দেয় নি, দিয়েছে প্রতি পাউণ্ড দেড় কোপেক দামের মালটা। হা আমার পোড়া কপাল, আর তোমরা সব রাক্ষস আর পিশাচ, তোমরা নরকেই পচে মর, জাহান্নামে যাও...।''

সে দীর্ঘ বক্তৃতার তো কোন শেষ নেই...

১৮৮৭

ভেরা

Vera



সেই হেমন্ত সন্ধ্যার কথা আজও আইভান আলেক্সেয়েভিচ অগ্‌নেভের মনে আছে, তার মনে আছে সে যখন ফরাসী জানালাটা খুলে বাইরের বাঁধানো চত্বরে পা রেখেছিল তখন তার কাঁচটা কি রকম টুং-টাং শব্দ করে বেজে উঠেছিল। তার গায়ে ছিল কলার-তোলা হাল্কা ওভারকোট, আর মাথায় ছিল চওড়া কিনারাওয়ালা খড়ের টুপি, যে টুপিটা তার ওয়েলিংটন-বুটজোড়ার সঙ্গে এখন পড়ে আছে বিছানার নীচে ধূলোর মধ্যে। তার এক হাতে ছিল দড়ি দিয়ে বাঁধা বই ও নোটবইয়ের একটা বড় পুলিন্দা, অন্য হাতে একটা গিটওয়ালা মোটা লাঠি।

দরজার পিছনে পথ দেখাবার জন্য বাতিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল গৃহকর্তা গাভ্‌রীল পেত্রভিচ কুজ্‌নৎসভ, টাক-মাথা বুড়ো মানুষটি, মুখে লম্বা পাকা দাড়ি, পরনে বরফ-সাদা ফুলতোলা জ্যাকেট। সে মৃদু হেসে হেসে ঘাড় নাড়ছিল।

''বিদায় প্রিয় বন্ধু'', অগ্‌নেভ বলল।

কুজ্‌নেৎসভ বাতিটাকে একটা ছোট টেবিলের উপর রেখে বাইরে বেরিয়ে এল। দুটি লম্বা শীর্ণ ছায়া চত্বরের সিঁড়ি বেয়ে ফুলের কেয়ারির উপর পড়ল, একটু দুলে উঠল, তার পর তাদের মাথা দুটো লেবু গাছগুলোর মধ্যে ঢুকে গেল।

অগ্‌নেভ বলল, ''বিদায়, পুনরায় তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় বন্ধু। ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমার অভ্যর্থনা, সাহায্য ও দয়ার জন্য...জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমার আতিথেয়তার কথা আমি ভুলব না...তুমি বড় ভাল মানুষ, তোমার মেয়েও বড় ভাল, এখানে সকলেই দয়ালু, হাসি খুশি ও আতিথ্যপরায়ণ। তোমাদের এখানকার মানুষজন এত চমৎকার যে তা প্রকাশ করার মত আমার ভাষা নেই!''

আবেগে আপ্লুত হয়ে, এই মাত্র বাড়িতে তৈরী যে স্ফূর্তিদায়ক বস্তুটি তার পেটে পড়েছে তার জন্য আরো আতপ্ত হয়ে অগ্‌নেভ কথা বলছে একজন শিক্ষার্থীর সুরেলা কণ্ঠস্বরে ; এতই গভীরভাবে সে নাড়া খেয়েছে যে নিজের মনোভাবকে যত না কথায় তার চাইতেও বেশী প্রকাশ করছে চোখের চাউনিতে আর কাঁধের দোলানিতে। কুজ্‌নেৎসভও নেশার ঘোরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে ; যুবকের দিকে এগিয়ে তাকে চুমো খেল।

অগ্‌নেভ বলতে লাগল, ''আমি তো কুকুরের মতই তোমার ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম। প্রায় প্রতিদিনই এসেছি, অন্তত দশ দিন তোমার বাড়িতেই রাত কাটিয়েছি, আর তোমার নেশার বস্তুটি এত বেশী খেয়েছি যে কথায় বলা যায় না! কিন্তু যে জন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ গাভ্‌রীল পেত্রভিচ, সেটা তোমার সহযোগিতা ও সহায়তা। তুমি না থাকলে আমার সংখ্যাতত্ত্বের প্রতিবেদন নিয়ে আমাকে অক্টোবর মাস পর্যন্তই এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে হত। ভূমিকায় এটার স্বীকৃতি আমি জানাব, লিখব ঃ সদয় সহায়তার জন্য অমুক জেমস্ত্ভো-র সভাপতি গাভ্‌রীল পেত্রভিচ কুজ্‌নেৎসভকে আমার কৃতজ্ঞতা জানানোটা আমার কর্তব্য বলে মনে করি। সংখ্যাতত্ত্বের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। ভেরা গাভ্‌রিভনাকে আমার বিনীত শ্রদ্ধা জানিও, আর ডাক্তারদেরও দু'জন ইন্সপেক্টরকে, এবং তোমার সচিবকে বলো, তাদের সাহায্যের কথা আমি কোন দিন ভুলব না! এবার এসো প্রিয় বন্ধু, আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে বিদায়-চুম্বন করি।''

অগ্‌নেভ এতই ভাবালু হয়ে পড়েছিল যে বৃদ্ধকে আর একবার বুকে জড়িয়ে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। একেবারে নীচের ধাপে নেমে মুখটা ঘুরিয়ে বলল ঃ

''আর কোন দিন কি আমাদের দেখা হবে?''

''ঈশ্বর জানেন'', বুড়ো জবাব দিল। ''সম্ভবত হবে না।''

''হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ। পিতার্সবার্গের প্রতি তোমার কোন আকর্ষণ নেই, আর আমার কাজও আর কোন দিন আমাকে এ অঞ্চলে টেনে আনবে

না। তাহলে বিদায়!''

অগ্‌নেভের অপসৃয়মান পিঠের দিকে তাকিয়ে কুজ্‌নেৎসভ হাঁক দিয়ে বলল ''তোমার বইগুলো এখানে রেখে যেতে পারতে। ওগুলো বড় বেশী ভারী। কাল একটি চাকরকে দিয়ে ওগুলো পাঠিয়ে দিতে পারতাম!''

কিন্তু অগ্‌নেভ এত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল যে কথাগুলো তার কানে গেল না। তার সুরাতপ্ত অন্তরে তখন আনন্দ, উষ্ণতা ও আকুলতার খেলা চলছে। সে হাঁটছে আর ভাবছে, মানুষের জীবনে একটি ভাল মানুষের দেখা প্রায়শই ঘটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সব সাক্ষাৎকারের শুধু স্মৃতিটুকু ছাড়া আর কিছুই থাকে না। কখনও দিগন্তে এক ঝাঁক উড়ে আসে, মৃদু বাতাসে ভেসে আসে তাদের বিষণ্ণ উল্লাসের ধ্বনি, অথচ এক মিনিট পরে দিগন্তবিস্তৃত নীল আকাশে একটা বিন্দুও তুমি দেখতে পাবে না। একটি শব্দও শুনতে পাবে না; ঠিক সেই রকম কত মানুষের মুখ, তাদের কথা চকিতে ঝল্‌সে উঠেই অতীতের গর্ভে ডুবে যায়। একমাত্র আমাদের স্মৃতিতে একটি ক্ষীণতম চিহ্ন ছাড়া তাদের আর কিছুই পড়ে থাকে না। বসন্তের শুরু থেকেই সে এখানে বাস করছে, অতিথিবৎসল কুজ্‌নেৎসব-পরিবারের প্রায় প্রাত্যহিক অতিথি হয়েছে; ফলে আইভান আলেক্সেয়েভিচ বৃদ্ধ লোকটিব প্রতি, তার মেয়ের প্রতি, চাকরদের প্রতি খুবই অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল, সমস্ত বাড়িটার সঙ্গে মনোরম চত্বরটার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল, বাগানের পথটার প্রতিটি বাঁক, রান্নাঘর স্নানঘরের পিছনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিটি গাছের ছায়া-রেখা তার কত চেনা হয়ে গিয়েছিল; অথচ যে মুহূর্তে সে ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে সে সব কিছু তার কাছে একটি স্মৃতিমাত্র হয়ে গেল, তার সত্যিকারের তাৎপর্য তার কাছে হারিয়ে গেল; আরও দু'এক বছরের মধ্যেই এই সব প্রিয় ছবিগুলি তার মনেও অস্পষ্ট হয়ে যাবে, মনে হবে এ সবই বুঝি তার কল্পনামাত্র।

বাগানের পথে হাঁটিতে হাঁটিতে অগ্‌নেভের মনটা আবেগবিধুব হযে উঠল ঃ ''জীবনে মানুষ অপেক্ষা মূল্যবান আর কিছু নেই। কিচ্ছু না!''

বাগানটা তখনও আতপ্ত ও শান্ত। বাতাসে মিনিওনেট, তামাক-ফুল ও হেনিওট্রোপের মৃদু গন্ধ। গাছ ও ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যবর্তী জায়গাটা চাঁদের আলোয় ধোঁয়া পাতলা কুয়াশায় ভরে গেছে; কুয়াশার যে আঁটিগুলো ভূতের মত একের পর এক ভেসে চলেছে তারাই অগ্‌নেভের স্মৃতিতে অনেককাল বেঁচে থাকবে। চাঁদটা বাগানের মাথার উপরে ঝুলে আছে, তার নীচে স্বচ্ছ মেঘের টুকরোগুলি আকাশ-পথে পূর্বদিকে ভেসে চলেছে। গোটা পৃথিবীটাকেই মনে হচ্ছে কালো কালো রেখা-চিত্র ও ভ্রাম্যমান সাদা ছায়া দিয়ে গড়া, আর হয়তো জীবনে এই প্রথম অগস্ট মাসের এক সন্ধ্যায় কুয়াশা দেখে অগ্‌নেভ ভাবল, এটা নিশ্চয় একটা সাজানো রঙ্গমঞ্চ আর আতস বাজীর অযোগ্য কারিগররা বাংলা আলো দিয়ে বাগানটাকে সাজাতে গিয়ে আলোর সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়া ঢুকিয়ে বাতাসকে ভাসিয়ে দিয়েছে।

অগ্‌নেভ যখন বাগানের ফটকের কাছে এল তখন একটা কালো ছায়া নীচু বেড়ার ভিতর থেকে তার দিকে এগিয়ে গেল।

সে আনন্দে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আরে, ভেরা গাভ্‌রিলোভ্‌না! তুমি এখানে? বিদায় নেবার জন্য তোমাকে আমি আকাশ-পাতাল খুঁজেছি...শোন, আমি চলে যাচ্ছি, সুতরাং বিদায়।"

"এত সকালে? এখন তো সবে এগারোটা!"

"না, সময় হয়ে গেছে। আমাকে পাঁচ ভার্স্ট পথ হাঁটতে হবে। তারপর প্যাক করা আছে, কাল খুব ভোরে উঠতে হবে।..."

অগ্‌নেভের সামনে দাঁড়িয়ে কুজনেৎসভের মেয়ে ভেরা, বয়স একুশ বছর, বিষণ্ণ স্বভাব, অগোছালো সাজসজ্জা, প্রহেলিকাময়ী। যে সব তরুণী স্বপ্ন দেখে, অলসভাবে কোচে শুয়ে যে বই হাতে আসে তাই পড়ে সারাটা দিন কাটিয়ে দেয়, কেবল ভাবে আর দিবাস্বপ্ন দেখে, তারা সাধারণতই সাজ-পোশাকের ব্যাপারে উদাসীন হয়। তাদের মধ্যে যারা প্রকৃতিগতভাবে সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধের অধিকারী হয় তাদের সেই উদাসীনতার মধ্যেও একটা বিশেষ আকর্ষণ ফুটে ওঠে। যে কারণেই হোক, পরবর্তীকালেও এই সুন্দরী তরুণীটিকে অগ্‌নেভ ভুলতে পারে নি ; তার একটা ছবিই অগ্‌নেভের মনের পটে আঁকা হয়ে গেছে ঃ পরনে ঢিলে ব্লাউজ, কোমরের কাছে বড় বড় পটিতে ভাঁজ করা অথচ তার শরীরকে স্পর্শ করে না, উঁচু করে বাঁধা চুল থেকে একগুচ্ছ চুল ছড়িয়ে আছে কপালের উপর, উলের ছোট ছোট ফুল বসানো হাতে-বোনা লাল-রংয়ের শালটা সন্ধ্যায় ঝুলতে থাকে ভেরার কাঁধে পতাকার মত। আর দিনের বেলা গুটিয়ে রাখা হয় হল-ঘরের হ্যাট-স্ট্যাণ্ডে পুরুষদের টুপির সাথে, অথবা খাবার ঘরের সিন্দুকটার উপরে যেখানে বুড়ো বেড়ালটা আরামে ঘুমিয়ে থাকে। এই শাল আর ঢিলে ব্লাউজের ভাঁজে ভাঁজে যেন জড়িয়ে থাকে আলস্য, ঘরোয়া ভাব ও সৎ স্বভাবের একটা আমেজ। হয়তো বা অগ্‌নেভ ভেরাকে দেখে মোহিত হয়েছে বলেই তার প্রতিটি বোতাম ও ঝালড়ের মধ্যে খুঁজে পায় গরম, আরামপ্রদ সাদাসিদে কিছু জিনিস, যা সুন্দর ও কাব্যময়, যে সব গুণ আন্তরিকতাবিহীন, শীতলস্পর্শ ও সৌন্দর্যবিরূপ মেয়েদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না।

ভেরার দেহের গঠন সুন্দর, দেহ-রেখা প্রাচীন মূর্তির মত। মাথায় ঢেউ খেলানো চুলের রাশি। অগ্‌নেভ জীবনে মেয়েদের সংস্পর্শে আসে নি। তাই ভেরাকে সুন্দরী ভেবে নিয়েছে।

সে বলল, "আমি চলে যাচ্ছি। আমাকে মনে রেখো ; সব কিছুর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

যে ছাত্রসুলভ সুরেলা গলায় সে বুড়ো কুজ্‌নেৎসভের সঙ্গে কথা বলেছিল সেই একইভাবে পুনরায় চোখ নাচিয়ে ও কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে ভেরাকে ধন্যবাদ দিতে লাগল তার আতিথেয়তা, সুবিবেচনা ও সদয় ব্যবহারের জন্য।

সে বলতে লাগল, "প্রতিটি চিঠিতে আমার মাকে তোমার কথা

লিখেছি। পৃথিবীর সব মানুষ যদি তোমার ও তোমার বাবার মত হত তাহলে এ পৃথিবীতে জীবনটা কত আশ্চর্যেরই না হত, সারা জীবনটাই হত রবিবার। তোমাদের সব লোকজনই চমৎকার! সকলেই এত আন্তরিক, এত দিল খোলা।"

"এখান থেকে তুমি কোথায় যাবে?" ভেরা শুধাল।

"ওরেল-এ আমার মার কাছে, সেখানে সপ্তাহ দুই কাটিয়ে ফিরে যাব পিতার্সবার্গে, কাজের জগতে।"

"তারপর?"

"তারপর? সেখানে সারা শীতকালটা কাজ করব, আর বসন্তকালে কোন না কোন জেলায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করব। আচ্ছা, সুখে থাক, একশ' বছর বেঁচে থাক আর আমাকে মনে রেখো। আর কোনদিন আমাদের দেখা হবে বলে তো মনে হয় না।"

অগ্নেভ নীচু হয়ে ভেরার হাতে চুমো খেল। তারপর উত্তেজিত হয়ে কোটটাকে টেনে সোজা করল, বইয়ের পুলিন্দাটাকে আরও একটু আরাম করে ধরল, এবং একটু চুপ করে থেকে বলল, "কত কুয়াশা পড়েছে!"

"হ্যাঁ। এখানে কোন জিনিস ফেলে যাও নি তো?"

"না, সে রকম তো মনে হয় না।"

অদ্ভুতভাবে নীরব হয়ে সে আরো কয়েক সেকেণ্ড সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর হঠাৎই মুখটা ঘুরিয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে বাগানের বাইরে চলে গেল।

তার পিছন-পিছন এসে ভেরা বলল, "দাঁড়াও, জঙ্গলটা পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

তারা রাস্তা ধরে চলতে লাগল। এখানে কোন গাছপালা নেই, তাকালেই আকাশটা এবং সামনে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। স্বচ্ছ, ধোয়ার ঘোমটার ভিতর দিয়ে সুন্দর দৃশ্যটা চোখে পড়ে; মনে হয় সেটা যেন লজ্জায় ও সুখে লুকিয়ে আছে। কুযাশাটা যেখানে ঘন ও সাদা হয়ে তুষের স্তূপ ঝোপ-ঝাড়ের উপর জমে আছে, অথবা পাকিয়ে পাকিয়ে রাস্তা বরাবর ঘুরে বেড়াচ্ছে, না হয় যাতে দৃষ্টিতে বাধা না পড়ে সেজন্য মাটিকে আঁকড়ে ধরেছে। সেই ঘোমটার ভিতর দিয়ে একেবারে বন পর্যন্ত পুরো রাস্তাটা দেখা যায়, দেখা যায় রাস্তার দুই পাশের খানা-খন্দ ও ঝোপ-ঝাড়। কুজ্‌নেৎসভদের জঙ্গলটা প্রায় আধ ভার্স্ট দূরে অন্ধকারে ঢেকে আছে।

অগ্নেভ সখেদে ভাবল, "কেন সে আমার সঙ্গে এল? তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে আমাকে তো আবার হাঁটিতে হবে।" কিন্তু ভেরার দিকে তাকাতেই তার মুখে হাসি ফুটল। সে বলতে লাগল:

"দিনটা এত সুন্দর যে যেতে ইচ্ছা করছে না। সন্ধ্যাটা সত্যি রোমান্টিক, চাঁদ, স্তব্ধতা, সব কিছু নিয়ে সুসম্পূর্ণ! তুমি কি জান ভেরা গাভ্‌রিলভ্‌না? উনত্রিশ বছর ধরে আমি এই পৃথিবীতে বাস করছি, আর আজও পর্যন্ত

কারো প্রেমে পড়ি নি। সারা জীবনে একটাও রোমান্টিক ঘটনা ঘটে নি, কাজেই অভিসারের কথা, প্রেমিকার দীর্ঘশ্বাস ও চুম্বনের কথা আমি জেনেছি শুধুমাত্র লোকের মুখে শুনে। অস্বাভাবিক, তাই না? শহরে তুমি যখন হোটেলের ঘরে বন্দী থাক, তখন এ সব তোমার খেয়াল হয় না, কিন্তু এখানে, এই গ্রামাঞ্চলে এই অভাবটা মনে বড় ব্যথা দেয়...তখন নিজের মনেই কেমন যেন একটা দুঃখ জাগে।"

"কিন্তু তুমি এ রকম আছ কেন?"

"জানি না। আমার মনে হয়, তার কারণ সারা জীবনই আমি বড় বেশী কর্মব্যস্ত, অথবা হতে পারে এমন কোন মেয়ের সঙ্গে আমার কখনও দেখাই হয় নি যে...আমার পরিচিত জনের সংখ্যা খুবই কম, আর আমি মোটেই বাইরে যাই না।"

দু'জনে নীরবে কিছুক্ষণ হাঁটল। অগ্নেভ বারে বারেই ভেরার খোলা মাথা ও তার লাল শালটার দিকে তাকাতে লাগল, আর অতীতের সব বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের দিনগুলি একের পর এক তার স্মৃতিতে ভেসে উঠল। এটা সেই সময়ের কথা যখন হোটেলের নোংরা ঘর থেকে অনেক দূরে ভালমানুষদের সদয় ব্যবহার পেয়েছে এই গ্রামাঞ্চলে নিজের মনের মত কাজ নিয়ে মনের আনন্দে দিন কাটিয়েছে, পরম সুখে দেখেছে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আসা-যাওয়া, শুনেছে গ্রীষ্মকালের অবসান আসন্ন জেনে পাখিরা গান বন্ধ করেছে, প্রথমে নাইটিঙ্গেল, তারপরে ভারুই, আর তার কিছু পরে সারস পাখিরা...সময় যেন উড়ে চলেছে, তার অর্থ জীবন ছিল সুন্দর, সহজ...মনের কথাগুলিকেই উচ্চারণ করে সে বলতে লাগল এখান থেকে চলে যেতে সে কত অনিচ্ছুক—সে অল্প আয়ের মানুষ, ভ্রমণে অনভ্যস্ত, নতুন মানুষের সঙ্গে চলতে পারে না—এপ্রিলের শেষ ভাগে তাকে যেতে হবে কোন অপরিচিত জেলায় যেখানে সে পাবে একঘেয়েমি, নির্জনতা, ও সংখ্যাতত্ত্বের প্রতি জনসাধারণের উদাসীনতা। এন. -এর ছোট শহরে পৌঁছে তাকে থাকতে হয়েছিল রিয়াবুখিনের সরাইখানায়; সেখানে দৈনিক বিশ কোপেকের বিনিময়ে তাকে দেওয়া হয়েছিল একটি মনোরম, পরিচ্ছন্ন ঘর, তবে একটা শর্ত ছিল সে-বাড়িতে ধূমপান করতে পারবে না। পথশ্রমের পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে কিছু খোঁজ-খবর নিয়েই সে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়েছিল "জেমস্তভো পরিষদ"-এর সভাপতি গাভ্রিল পেত্রভিচ কুজনেৎসভের সঙ্গে দেখা করতে। ঝকঝকে প্রান্তর ও ছোট ছোট নতুন কুঞ্জের ভিতর দিয়ে চার ভার্স্ট পথ তাকে হাঁটতে হয়েছিল। মেঘের নীচে ভরত পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছিল, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল রূপালি শব্দের বন্যা, আর দাঁড়কাকের দল ধীরে ধীরে পাখা দুলিয়ে নবোদ্গত গমের ক্ষেতের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল।

"ঈশ্বর, এখানকার মানুষ কি সব সময় এমন বাতাসে শ্বাস নেয়, অথবা আমি এসেছি বলেই বাতাসে এত সৌরভ?" অগ্নেভ অবাক হয়ে

ভেবেছিল।

একটা শুকনো গতানুগতিক অভ্যর্থনার প্রত্যাশা নিয়েই সে কুজনেৎসভের সামনে হাজির হয়েছিল, ভয়ে ভয়ে, সলজ্জ ভঙ্গীতে দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে, আর চোখ দুটিকে নীচু করে তার সামনে দাঁড়িয়েছিল। বৃদ্ধ লোকটি প্রথমে বিভ্রান্ত হয়ে ভুরু কুঁচকেছিল এই যুবককে দেখে ও তার সংখ্যাতত্ত্ব এবং জেমস্তভো পবিষদেব মধ্যে কোন যোগ-সূত্র দেখতে না পেয়ে; কিন্তু অগ্নেভ যখন অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে তার কাজের স্বরূপ এবং কোথায় কি ভাবে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয় সে সব বুঝিয়ে বলল, তখন সে সহাস্য আগ্রহে সাড়া দিল এবং শিশুসুলভ কৌতূহলের সঙ্গে সংখ্যাতাত্ত্বিকের নোট-বইগুলো দেখতে লাগল...সেদিন সন্ধ্যায়ই দেখা গেল অগ্নেভ কুজনেৎসভদের বাড়িতে ডিনার খাচ্ছে, ঘরে তৈরী ফূর্তিদায়ক জোরালো সরবৎ খেয়ে নেশায় ঢুলছে, আব নতুন বন্ধুদেব প্রশান্ত মুখ ও অলস গতিবিধি দেখে সমস্ত শরীরে একটা মধুর স্বপ্নের আবেশ অনুভব করছে; আলস্যভরে পা ছড়িয়ে তার ঘুমাতে ইচ্ছা করছে, হাসতে ইচ্ছা করছে। নতুন বন্ধুবা সরলভাবে তার কাছ থেকে সব খুঁটিনাটি জানতে চাইল, তার বাবা-মা বেঁচে আছে কিনা, প্রতি মাসে সে কত উপার্জন করে, আর ঘন ঘন থিয়েটারে যায় কিনা।

অগ্নেভের মনে আছে, সে ''ভলস্ত''-এর সর্বত্র ঘুরেছে, পিকনিক করেছে, মাছ, ধরেছে, নানা জায়গা দেখতে গেছে—সব সময় একটা বড় দলের সঙ্গে গেছে—বড় মাতাঠাকুরাণী মারফার সঙ্গে দেখা করেছে, তিনি প্রত্যেক অতিথিকে একটা কবে গুটির থলে দিয়েছিলেন; আর দেখেছে রাশিয়ানদের তর্ক-যুদ্ধ; ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে তর্কাতর্কি, ঝগড়াঝাটি, রাগারাগি, এমন কি টেবিলের উপর ঘুষোঘুষি পর্যন্ত; এই ভাবে দুই তিন ঘন্টা লাঠালাঠির পরে শুরু হয় হাসাহাসির পালা; একে অন্যকে হেসে বলে ঃ

''কি নিয়ে যে তর্কটা শুরু হয়েছিল সেটাই তো ভুলে গেছি!''

বনের কাছাকাছি পৌঁছে আইভান আলেক্সেয়েভিচ ভেবাকে বলল ঃ

''তোমার কি মনে পড়ে তুমি, ডাক্তার ও আমি, তিনজনে মিলে ঘোড়ায় চেপে শেস্তোভো গিয়েছিলাম? আর সেখানেই দেখা হয়েছিল সেই সাধু ভিখারির সঙ্গে? আমি তাকে একটা পাঁচ-কোপেকের মুদ্রা দিলে সে তিনবার ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে মুদ্রাটাকে রাই-ফসলেব ক্ষেতে ছুঁড়ে দিয়েছিল। ঈশ্বর জানেন, কী এক স্মৃতি-সম্পদ সঙ্গে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি! সব কিছুকে যদি মিলিয়ে-মিশিয়ে এক করা যেত তাহলে একটা বড় মাপের সোনার বাট তৈরী হত! আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, বুদ্ধিমান, স্পর্শকাতর মানুষগুলি এখানে এসে বসবাস না করে শহরে গাদগাদি করে থাকে কেন? 'নেভস্কি প্রসপেক্ত'-এর বড় বড় স্যাঁতসেঁতে ঘরগুলিতে এখানকার চাইতে বেশী জায়গা আর বেশী আরাম আছে? আমি যে বাড়িটাতে ছিলাম সেটা তো চিত্রকর,

ছাত্র, ও সাংবাদিকে আকণ্ঠ বোঝাই হয়ে আছে ; আমার কাছে তো বাড়িটাকে বড় বেশী উদ্ধত মনে হয়।''

বনটা বিশ পা দূরে থাকতেই তারা একটা ছোট সংকীর্ণ সেতুর উপর থামল। সান্ধ্য ভ্রমণের সময় কুজ্‌নেৎসভ পরিবারের লোকজন ও তাদের অতিথিরা সাধারণত বিশ্রাম নেবার জন্য সেখানেই থামে। সেখান থেকেই জোরে হাঁক দিলে বনের মধ্যে তাব প্রতিধ্বনি শোনা যায়, আর সেখানে দাঁড়িয়ে দেখা যায় রাস্তাটা গাছগুলোর অন্ধকারে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

অগ্‌নেভ বলল, ''আমাদের ছোট সেতুটার কাছে আমরা এসে গেছি। এবার তুমি ফিরে যাও...''

ভেরা থামল ; একটা গভীর শ্বাস টানল।

''এস, এখানে এক মিনিট বসি'', সেতুর একটা ছোট খুঁটির উপর বসে ভেরা বলল। ''চলে যাবার আগে এখানে একবার বসাটাই রীতি।''

অগ্‌নেভ তার পাশেই বইয়ের পুলিন্দাটার উপর বসে কথা বলতে লাগল। হেঁটে আসার পরিশ্রমে ভেরা ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে লাগল, আর এমনভাবে দূরের দিকে তাকিয়ে রইল যাতে অগ্‌নেভ তার মুখটা দেখতে না পায়!

অগ্‌নেভ বলেই চলল; ''আজ থেকে দশ বছর পরে ঘটনাচক্রে হঠাৎ যদি আবার আমাদের দেখা হয় তো কেমন হয়? তুমি ততদিনে গিন্নি হয়েছ, একটা পরিবারের মা হয়েছ, আর আমি নিরেট সংখ্যা-তত্ত্ব সংগ্রহের লেখক হয়ে চল্লিশ হাজার খণ্ডের একটা মোটা বই লিখে ফেলেছি। দু'জনের দেখা হল, সুন্দর পুরনো দিনগুলি আমাদের মনে পড়ল...এখন আমাদের যে অনুভূতি সেটা বর্তমানকে নিয়ে, সেটাই আমাদের নাড়া দিচ্ছে, তাকে নিয়েই আমরা পুরোপুরি ব্যস্ত ; কিন্তু এত বছর পরে আবার যখন আমাদের দেখা হবে তখন হয় তো আমরা মনেই করতে পারব না এই সেতুটার উপর ঠিক কখন আমাদের শেষ বাবের মত দেখা হয়েছিল, আমরা হয়তো ভুলেই যাব এই দিন, মাস, এমন বছরটাকেও, তুমিও বদলে যাবে বলেই তো আমার ধারণা...তুমি কি খুব বদলে যাবে?''

ভেরা চমকে উঠে তার মুখোমুখি হল।

''কি?''

''আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম...''

''আমি দুঃখিত, আমি শুনতে পাই নি।''

আর তখনই অগ্‌নেভ ভেরার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করল। সে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, শ্বাস টানতে হাঁপাচ্ছে, আর শ্বাস-প্রশ্বাসের কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ছে তার হাতে, তার ঠোঁটে, তার মাথায়, একটার জায়গায় দুই গুছি চুল তার খোঁপা থেকে খুলে পড়েছে।... সরাসরি অগ্‌নেভের চোখের দিকে না তাকাবার চেষ্টাই সে করছে, আর উত্তেজনার বশে এমনভাবে কলারটা ধরে টানছে যেন সেটা তার গলায় বসে গেছে, অথবা লাল

শালটাকে এ-কাঁধ থেকে ও-কাঁধে টানাটানি করছে...

''তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে, তাই তো,'' অগ্‌নেভ বলল। ''এখানে এই কুয়াশার মধ্যে বসে থাকাটা ভাল নয়। এস, তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।''

ভেরা সাড়া দিল না।

অগ্‌নেভ হেসে ফেলল। ''কি হল? তুমি কথাও বলছ না, আমার প্রশ্নের জবাবও দিচ্ছ না। তোমার কি অসুখ করেছে? না কি তুমি রাগ করেছ? কোন্‌টা?''

ভেরা মুখের এক পাশে হাতটা চেপে ধরে অগ্‌নেভের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তখনই হাতটা নামিয়ে নিল।

মুখের উপর তীব্র যন্ত্রণার ভাব ফুটিয়ে সে ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল, ''ভয়ংকর পরিস্থিতি! ভয়ংকর!''

অগ্‌নেভ সভয়ে শুধাল, ''কি ভয়ংকর? এ সব কি বলছ?'

তখনও বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে ও ঘাড় ঝাঁকিয়ে ভেরা তার দিকে পিছন ফিরে এক মিনিট আকাশের দিকে তাকাল, তারপর বলল ঃ

''তোমাকে আমার কিছু বলার আছে আইভান আলেক্সেয়েভিচ।''

''আমি কান পেতেই আছি।''

''তোমার কাছে এটা আশ্চর্য মনে হতে পারে...তুমি বিস্মিত হবে, কিন্তু তাতে আমার কি...''

অগ্‌নেভ কাঁধ ঝাঁকিয়ে তার কথা শোনার জন্য তৈরী হল।

মাথা নীচু করে শালের ফুলগুলো টানতে টানতে ভেরা বলতে শুরু করল, ''দেখ...তোমাকে কিছু বলতে চাই...তুমি এটাকে আশ্চর্য ও বোকামি ভাবতে পার, কিন্তু আমি পারি না...আমি আর সহ্য করতে পারছি না...''

তার কথাগুলি একটা অব্যক্ত তোতলামিতে পরিণত হল; হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। শাল দিয়ে মুখটা ঢাকল, মাথাটা আরও নীচু করল, তারপর সমানে চোখের জল ফেলতে লাগল। আইভান আলেক্সেয়েভিচ বিমূঢ়ের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে অসহায়ভাবে চারদিকে তাকাতে লাগল। চোখের জল সে দেখতে পারে না, এ সব দেখে তার নিজের চোখ জ্বালা করতে শুরু করল।

সে ঠোঁট চেপে বলল, ''শোন, শোন, ভেরা গাভ্‌রিলভ্‌না, তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কি অসুস্থ? কেউ কি তোমার মনে আঘাত দিয়েছে? আমাকে বল...হয় তো আমি...তোমাকে সাহায্য...''

তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য অগ্‌নেভ যেই ভেরার মুখের উপর থেকে তার নিজেরই হাতটা সরিয়ে দিল, তখন ভেরা চোখের জলের ভিতর দিয়ে হাসতে হাসতে বলল ঃ

''আমি...আমি তোমাকে ভালবাসি!''

এই সরল, সাধারণ ক'টি কথা অতি সরল মানুষের ভাষায়ই বলা হল,

কিন্তু বিহ্বলতার যন্ত্রণায় অগ্নেভ ভেবার মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, আর তখনই তার মনে ভয় জেগে উঠল।

সকরুণ বিদায়-পর্ব ও সরবতের প্রভাবে যে সাগ্রহ, আতপ্ত ও আবেগপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল মুহূর্তের মধ্যে সেটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, তার জায়গায় গড়ে উঠল একটা কঠিন, দুঃখময় অবস্থা। সহসা অগ্নেভের হৃদয়েরই পবিবর্তন ঘটল; বাঁকা চোখে সে তাকাল ভেরার দিকে, আর যেহেতু ভেরা তার ভালবাসার কথাটা ঘোষণা করে ফেলেছে তাতেই যেন তার অপ্রাপনীয়তার আবরণটা খসে পড়ে গেছে, কেন কে জানে সে হয়ে উঠেছে অনেক ছোট, অনেক সাধারণ, আর অনেক খোর।

অগ্নেভ সভয়ে ভাবল, ''আমার এ কী হল? আমি তো তাকে ভালবাসি... তাই তো?''

এদিকে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কথাটা বলতে পারায় ভেরার শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ ও হাল্কা হয়ে এসেছে। সে উঠে দাঁড়িয়েছে, আইভান আলেক্সেয়েভিচের মুখের দিকে তাকিয়ে দ্রুত, খোলাখুলি, আবেগেব সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে। অথচ ভেরা যে ঠিক কি বলছে তার অর্থ যেন অগ্নেভ বুঝতে পারছে না। তাব শুধু মনে আছে ভেরার কথাগুলির অর্থ স্বয়ং ভেরাকে এবং তার কথার প্রতিক্রিয়ায় তার মনে যে অনুভূতি জেগেছিল তাকে। অত্যধিক আবেগে অস্পষ্ট ফ্যাঁসফেসে কণ্ঠস্বর, তার অসাধারণ সুর—সে সব তার মনে আছে। হেসে, কেঁদে, চোখের জলে আঁখি-পলাশকে ভিজিয়ে ভেরা বলতে লাগল—প্রথম থেকেই তার মৌলিক মানসিকতা, তার বুদ্ধিদীপ্ত সদয় দুটি চোখ, তার কর্মব্যস্ত জীবন এ সবই তাকে আকর্ষণ করেছে, তাকে সে ভালবেসেছে গভীর আবেগে, উন্মাদের মত, গভীরভাবে; গ্রীষ্মকালে বাগান থেকে বাড়ি ফিরে সে যখন অগ্নেভের কোটটাকে হল-ঘরে দেখতে পেয়েছে, অথবা দূর থেকে তার গলার স্বর শুনতে পেয়েছে, তখনই তার হৃদয়ের মধ্যে ঠাণ্ডার একটা স্রোত বয়ে গিয়েছে, সুখের একটা প্রত্যাশা জেগেছে তার মনে; এমন কি তার স্থূল রসিকতা শুনেও সে হেসেছে, তার নোট-বইয়ের প্রতিটি সংখ্যার মধ্যে সে দেখেছে অসাধারণ জ্ঞানগর্ভ ও চমৎকার কিছু, আর পৃথিবীর কোন গাছকেই তার চোখে অগ্নেভের গিটিওয়ালা লাঠির চাইতে বেশী সুন্দর মনে হয় নি।

দূরের বন, কুয়াশার কুণ্ডুলি, এমন কি রাস্তার ধারের অন্ধকার নালাগুলিও যেন রুদ্ধশ্বাসে তার কথা শুনছিল, আর ওদিকে অগ্নেভের মনের মধ্যে একটা খারাপ ও আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে যাচ্ছিল। ভেরা যখন তাকে তার প্রেমের কথা বলছিল তখন ভেরাকে দেখাচ্ছিল মোহময়ী সুন্দরী, সব কথাই সে বলছিল সুন্দর করে, আবেগের সঙ্গে, কিন্তু অগ্নেভের অনুভূতিতে সেই উল্লাস ও আনন্দ ছিল না যা সে আশা করেছিল, ছিল কেবল ভেরার প্রতি সমবেদনা, আর সেই যন্ত্রণা ও করুণা যা একটি ভালমানুষকে সইতে হচ্ছে ভেরারই জন্য। তার মনের এই নিস্পৃহতার জন্য

কে দায়ী—তার বই-পোকা হবার মানসিকতা অথবা সব কিছুকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার জন্মগত স্বভাব, তাও সে জানে না—সেটা যাই হোক না কেন, ভেরার এই উচ্ছ্বাস ও যন্ত্রণা তার কাছে বড়ই আন্তরিকতাহীন বলে মনে হল, কিন্তু সেই সঙ্গে কে যেন ক্ষোভের সঙ্গে তার কানে কানে বলে দিল, ব্যক্তিগত সুখের দিক থেকে দেখলে এই মুহূর্তে যা কিছু সে শুনছে সেটা যে কোন সংখ্যাতত্ত্ব, পুথিপত্র বা সত্যের চাইতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ...আসল সত্যটা বুঝতে না পারার এই অক্ষমতার জন্যই সে নিজেও বিরক্তি বোধ কবতে লাগল।

তবু সে বলার মত কথা খুঁজে না পাওয়ায় অবস্থাটা আরও বিভ্রান্তিকর হয়ে যাচ্ছে, অথচ সে বুঝতে পারছে যে একটা কিছু বলা দরকার। "আমি তোমাকে ভালবাসি না।" এ কথাটা সোজাসুজি বলে দেবার মত মনের জোর তার ছিল না, আর সে ভেরাকে ভালবাসে একথাটাও বলতে পারছে না কারণ নিজের অন্তরটাকে যতই খুঁজে দেখুক ভালবাসার একটি স্ফুলিঙ্গও সে আবিষ্কার করতে পারবে না...

সে চুপ করে রইল, আর ভেরা বলেই চলল যে তাকে একটু চোখের দেখা, এখনই এই মুহূর্তে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়া তা সে যেখানে হোক, তার স্ত্রী ও সাহায্য-সঙ্গিনী হতে পারা—এ সবের চাইতে বড় সুখ আর তার কাছে নেই, আর অগ্নেভ যদি এখন তাকে ছেড়ে চলে যায় তাহলে সেই দুঃখেই সে মরে যাবে...

দুই হাত মোচড়াতে মোচড়াতে ভেরা বলতে লাগল, "এখানে থাকতে আমি পারব না। এই বাড়ি, এই বন, এমন কি এখানকার বাতাস পর্যন্ত আমার কাছে বিষ হয়ে উঠেছে। এই চিরস্থায়ী প্রশান্তি, এই উদ্দেশ্যহীন জীবন আমার কাছে অসহ্য, এই বর্ণহীন, আনন্দহীন মানুষজন যারা সকলেই দুটি মটরদানার মত হুবহু একরকম তাদের আমি সহ্য করতে পারছি না! তারা সকলেই অকপট, ভাল মানুষ। কারণ তারা আত্মতৃপ্ত, তারা দুঃখ ভোগ করে না, সংগ্রাম করে না...আমি চাই সেই সব বড় বড় স্যাঁৎসেঁতে বাড়ি যেখানে মানুষ কষ্ট ভোগ করে, পরিশ্রমে ও অভাবে তিক্ত হয়ে ওঠে..."

এ কথাগুলিও অগ্নেভের কানে আন্তরিকতাহীন উচ্ছ্বাস বলেই মনে হল। ভেরার কথা শেষ হল, তখনও সে বুঝতে পারল না কি বলবে; তবু সে আর চুপ করে থাকতে পারল না, মুখ চেপে বলতে শুরু করল :

"তোমার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ ভেরা গাভ্‌রিলভ্‌না, যদিও আমি জানি এমন কিছু আমি করি নি যাতে তোমার এত...এতখানি ভালবাসা আমি পেতে পারি। দেখ, সৎ মানুষ হিসাবেই আমার বলা উচিত যে মানুষের সুখ নির্ভর করে এক ধরনের ভারসাম্যের উপর, বলতে পারি, যখন উভয় পক্ষই...সমানভাবে ভালবাসে..."

নিজের কথা বলার তো-শামিতে লজ্জা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে চুপ করে

গেল। যখন কথা বলছিল তখন তার মুখটাকে নিশ্চয় বোকা-বোকা, দোষীর মত, ভাবশূন্য ও টান-টান দেখাচ্ছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, তার মুখের এই সত্যটা ভেরাও ধরতে পেরেছে, কারণ হঠাৎ সে বিবর্ণ ও গম্ভীর হয়ে গেল, তার মাথাটা ঝুলে পড়ল।

অগ্‌নেভ তো-তো করে বলল, ''দয়া করে আমাকে ক্ষমা কর। তোমাকে আমি এতই মান্য করি যে... আমার মনটা ব্যথায় টন্‌টন্‌ করছে!''

ভেরা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল, তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা বাড়াল। অগ্‌নেভ তাকে অনুসরণ করল।

হাত নেড়ে তাকে ফিরে যাবার ইসারা করে ভেরা বলল, ''না, এস না। আমার সঙ্গে এস না, আমি একাই বাড়ি ফিরে যেতে পারব।'

''ওঃ, না সত্যি বলছি...আমি তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবই...''

প্রতিটি কথা নিজের কানেই বিরক্তিকর ও ফাঁকা শোনাল। প্রতিটি পদক্ষেপেব সঙ্গে সঙ্গে তার অপরাধবোধ বাড়তে লাগল। নিজের উপর রাগেই সে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করল, মেয়েদের ব্যাপারে নিজের উত্তাপহীনতা ও অনুপযুক্ততাকে শাপ-শাপান্ত করল। নিজেকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার চেষ্টায় ভেরার মনোহর দেহ-রেখা, তার সুন্দর কেশরাশি ও ধূলোর উপরে তার ছোট ছোট পায়ের চিহ্নগুলিব দিকে সে তাকাল, স্মরণ করল তার কথা ও চোখের জল, কিন্তু কিছুতেই তার আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল না।

''যত কিছুই কর না কেন, মানুষ তো জোর করে প্রেমে পড়তে পারে না,'' সে নিজেকেই বোঝাতে চেষ্টা করল, আবার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভাবল : ''কিন্তু আমি যদি নিজের উপর জোর না খাটাই, তাহলে কবে আর প্রেমে পড়ব? আমার বয়স তো প্রায় ত্রিশ বছব হল। ভেরার চাইতে সুন্দরী মেয়ে আমি দেখি নি, কোন দিন দেখবও না।... এই বুড়োটে ভাব উচ্ছন্নে যাক...ত্রিশ বছরেই বার্ধক্য!''

ভেরা আগে আগে হাঁটছে, ক্রমেই সে দ্রুততর পা ফেলছে, পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না, মাথা নীচু করে আছে। মনে হচ্ছে তার পিঠটা যেন ব্যথায় কুঁকড়ে গেছে।

ভেরার পিঠের দিকে তাকিয়ে সে ভাবল, ''আমি কল্পনা কবতে পারি ওর মনের মধ্যে এখন কি চলেছে! হয়তো সে এত আহত ও অপমানিত বোধ করছে যে সে মরতে চাইছে! হা ঈশ্বর, এ সবের মধ্যে এত জীবনের স্পর্শ, এত রোমান্স, এত অর্থ আছে যাতে পাথরও গতি পায়, আর আমি এখানে এত অচঞ্চল, এত হাস্যকর!''

ফটকে পৌঁছে ভেরা অল্পক্ষণের জন্য তার দিকে তাকাল, তারপর শালটাতে মুখ ঢেকে দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

আইভান আলেক্সেয়েভিচ একা বনে ফিরে গিয়ে সে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল, প্রতিটি মিনিটে থামছে আর ফটকের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে, তার সারা দেহে বিহ্বলতার ছাপ ফুটে উঠেছে। তার চোখ দুটি ধূলোতে ভেরার

পদচিহ্ন খুঁজছে ; আর কী অবিশ্বাস্য কাণ্ড, যে মেয়েকে সে এত ভালবাসে সে নিজমুখে বলল সেও তাকে ভালবাসে, অথচ সে কিনা এমন জঘন্যভাবে সরাসরি তাকে ''ফিরিয়ে'' দিল। জীবনে এই প্রথম নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই সে জানল যে মানুষের শুভেচ্ছার উপরে কিছুই নির্ভর করে না, আর একটি ভদ্র, হৃদয়বান মানুষ যখন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপর একজনেব অকারণ নিষ্ঠুর যন্ত্রণার কারণ হয়ে পড়ে তখন তার বুকে সে ব্যথা কত তীব্র হয়ে বাজে।

বিবেক তাকে যন্ত্রণায় দীর্ণ করছে। ভেরা যখন চোখের আড়ালে চলে গেল তখন তার মনে হল বড় প্রিয়, বড়ই মূল্যবান কিছু সে হারাল, তাকে আর কোনদিন সে ফিরে পাবে না। সে অনুভব করল, ভেরার সঙ্গে তার যৌবনের একটা অংশও দূরে চলে গেল, আর যে মুহূর্তগুলিকে সে হেলায় নষ্ট করেছে তারা আর কোনদিন তার কাছে ফিরে আসবে না।

ছোট সেতুটার কাছে পৌঁছে একটু চিন্তা করার জন্য সে থামল। তাব এই অদ্ভুত নিস্পৃহতার কারণটা বোঝার চেষ্টা করল। একটা কথা সে পরিষ্কার বুঝতে পারল যে সে কারণ নিহিত আছে তার অন্তরের মধ্যে, বাইবে নয়। নিজেব কাছে সে স্বীকাব করল, তার এই শীতলতা সেই যুক্তিসিদ্ধ শীতলতা নয় যা নিয়ে বুদ্ধিমান মানুষ গর্ব বোধ করে, বা কোন অহংকারী মূর্খের শীতলতাও নয়। এটা নেহাৎই একটা আবেগময় অক্ষমতা, সৌন্দর্যকে গভীবভাবে উপলব্ধি করার অক্ষমতা, শিশুকাল থেকে অর্জিত এক অকাল বার্ধক্য, একটা শৃংখলাহীন জীবন-সংগ্রাম, আর একটা হোটেলের ঘরে নিরাসক্ত জীবনযাপনের ফল।

ছোট সেতুটা থেকে সে ধীবে ধীরে, একান্ত অনিচ্ছায়, বনেব দিকে হাঁটিতে লাগল। বনের মধ্যে ঘন অন্ধকারের পটভূমিতে চাঁদের আলোর ছোট ছোট ছোপগুলি স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ছে, সেখানে নিজের চিন্তা ছাড়া আব কিছুই অনভব করার নেই ; এই পরিবেশে যা সে হারিয়েছে তাকেই ফিবে পাবার একটা প্রবল বাসনা হঠাৎ তার মনে জেগে উঠল।

আইভান আলেক্সেয়েভিচের মনে হল ফিরে যাবাব কথা। স্মৃতি রোমন্থন করতে এবং কল্পনায় ভেরার একটা ছবি আঁকাব চেষ্টা করতে সে দ্রুতপায়ে কুজনেৎসভদের বাগানের দিকে হাঁটিতে লাগল। রাস্তার উপর বা বাগানে এখন আর কুয়াশা নেই, একটা ধবধবে চাঁদ আকাশ থেকে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে, কেবলমাত্র আকাশের পূবদিকটাই কুয়াশায় ঢেকে আছে।...অগনেভের মনে পড়ল তাব সতর্ক পদক্ষেপ, অন্ধকার জানালা, হেলিওট্রোপ ও মিনিওনেট ফুলের ঘন গন্ধ। কুজনেৎসভদের পোষা কুকুর কারো বন্ধুর মত লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল, তাব হাতটা শুঁকল...এই একটিমাত্র জীবিত প্রাণীই সে দেখতে পেল, বাড়িটার চারদিকে দু'বার হাঁটল, ভেরাব অন্ধকার জানালাটার নীচে কিছুক্ষণ দাঁড়াল, তারপর অসহায় ভঙ্গীতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাগান ছেড়ে চলে গেল।

এক ঘণ্টা পরে ক্লান্ত দেহ-মনে সে এসে সরাইখানার ফটকের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, গরম মুখটাকে কাঠের উপর চেপে ধরল, তারপর খট্‌খট্‌ করে কড়াটা নাড়ল। ছোট শহরটার কোথাও একটা কুকুর ঘুমের মধ্যেই ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠল, আর বুঝিবা অগ্নেভের কড়া নাড়াতে সাড়া দিয়েই পাহারাদারটি কাছাকাছি কোন গির্জার ধাতব ঘণ্টাটাকে ঢং ঢং করে বাজিয়ে দিল।

সরাইওয়ালা মেয়েদের মত দেখতে একটা লম্বা শার্ট পরে ফটক খুলে দিতে এসে গজ গজ করে বলল, "সারা রাত অকারণে আড্ডা মেরে...আড্ডা না মেরে একটু প্রার্থনা করলেও তো হয়..."

নিজের ঘরে ঢুকে আইভান আলেক্সেয়েভিচ বিছানায় বসে পড়ল, অনেক—অনেকক্ষণ ধরে অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে জিনিসপত্র প্যাক করতে শুরু করল...

১৮৮৭

একটি গরিব অসহায় জীব

A Poor Defenceless Creature



রাতে ছিল গেঁটেবাতের তীব্র ব্যথা, তারপর ছিল স্নায়ুশূলের টান-টান ব্যথা, তা সত্ত্বেও কিস্তুনভ সকালে যথারীতি কাজে গেল এবং যথাসময়ে আবেদনকারী ও ব্যাংকের মক্কেলদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিল। তার চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ ও ক্লান্ত, কথা বলে আস্তে আস্তে, মুমূর্ষু মানুষের মত।

"আপনার জন্য কি করতে পারি?" সে পরবর্তী আবেদনকারীকে জিজ্ঞাসা করল। আবেদনকারিণী একজন মহিলা, একটা জীর্ণ ঢোলা জামা পরা, পিছন থেকে দেখলে একটা বড় মাপের গুবড়ে পোকা বলে মনে হয়।

সে অবিরাম বলে যেতে লাগল, "দেখুন ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমার স্বামী কলেজিয়েট এসেসর শুকিনা পাঁচ মাস অসুস্থ ছিল; সে যখন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিল তখন কোন রকম কারণ ছাড়াই তাকে বরখাস্ত করা হয় ইয়োর এক্সেলেন্সি; তারপর আমি যখন তার বেতন আনতে গেলাম তখন তারা বেতন থেকে চব্বিশ রুবল্‌ ও ছত্রিশ কোপেক কেটে নিল! আমি শুধালাম কিসের দরুন? তারা আমাকে বলল অন্য কর্মচারীদের জামিনের জন্য তাদের পারস্পরিক কল্যাণ তহবিল থেকে ওই টাকাটা সে ধার হিসাবে নিয়েছিল। তা কি করে হতে পারে? আমার সম্মতি ছাড়া সে টাকা ধার করবে কেমন করে? আমি গরিব মেয়েমানুষ, ভাড়াটেরাই আমার বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল...আমি একজন দুর্বল

অসহায় মেয়েমানুষ...সকলেই আমার প্রতি অবিচার করে, কেউ একটা দয়ার কথা বলে না...''

চোখ দুটো দ্রুত পিট্ পিট্ করে সে তার ঢোলা জামার ভিতরটা হাতড়াতে লাগল রুমালের জন্য। কিস্তুনভ তার কাছ থেকে দরখাস্তটা নিয়ে পড়তে শুরু করল।

''আমি দুঃখিত, কিন্তু এ সব কি?'' সে কাঁধ ঝাঁকাল। ''আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন মাদাম। আপনার দরখাস্তের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আপনার স্বামী যেখানে চাকরি করতেন আপনাকে সেই বিভাগে দরখাস্ত করতে হবে।''

শুকিনা বলল, ''ওঃ স্যার, এর মধ্যেই আমি পাঁচ জায়গায় ঘুরেছি, কেউ আমার দরখাস্ত নেয় নি। আমার তো মাথা খারাপ হবার যোগাড়, কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমার বোরিস মাৎভিচ, তার ভাল হোক, আপনার সঙ্গে দেখা করতে পরামর্শটা আমাকে দিল। বলল, 'আপনি যান, মিস্টার কিস্তুনভের সঙ্গে দেখা করুন। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন।' ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমাকে সাহায্য করুন!''

''মাদাম শুকিনা, আপনার জন্য আমরা কিছুই করতে পারি না...বুঝতে চেষ্টা করুন ঃ আমি যতদূর বুঝতে পারছি, আপনার স্বামী সামরিক চিকিৎসা বিভাগে চাকরি করতেন, আর এটাতো সম্পূর্ণ বেসরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, এটা একটা ব্যাংক। এটা বোঝা তো খুবই সহজ!''

আর একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে কৃস্তিনভ গাল-ফোলা এবং স্বভাবতই দাঁতের ব্যথার রোগী জনৈক ইউনিফর্মধারী ভদ্রলোকের দিকে মুখ ফেরাল।

শুকিনা সকরুণভাবে বলে উঠল, ''ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমার স্বামী যে অসুস্থ ছিল তার মেডিক্যাল সার্টিফিকেট আমার কাছে আছে! এই তো সেটা, দয়া করে একবার দেখুন!''

''কী আশ্চর্য! আপনার কথা আমি বিশ্বাস করছি, কিন্তু আবার বলছি, আমাদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই,'' কৃস্তিনভ বিরক্ত গলায় বলল। ''সত্যি, ব্যাপারটা হাস্যকর। কোথায় দরখাস্ত করতে হবে সেটাও কি আপনার স্বামী জানেন না?''

''ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমার স্বামী কিছুই জানে না। সব কথাতেই বলে ঃ 'এটা তোমার কোন ব্যাপার নয়! তুমি যাও!' আর এই তো তার ফল....এটা তাহলে কার ব্যাপার, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি? তারা সকলেই কার দয়ায় খেয়ে-পরে বেঁচে আছে? আমার! আমার!''

কিস্তুনভ পুনরায় তার দিকে ঘুরে সামরিক চিকিৎসা বিভাগ ও বেসরকারী ব্যাংকের তফাৎটা বোঝাতে লেগে গেল। মহিলা মন দিয়ে সব কথা শুনল, সম্মতিসূচক ঘাড়ও নাড়ল, তারপর বলল ঃ

''হুঁ, হুঁ, হুঁ,...বুঝতে পেরেছি। তাই যদি হয়, ইয়োর এক্সেলেন্সি, তাহলে ক্যাসিয়ারকে হুকুম করুন, এখন আমাকে মাত্র পনেরো রুবল্ দি-

দিক। সব টাকা আমি একবারে চাইছি না।''

কিস্তুনভ মাথাটা পিছনে হেলিয়ে সরবে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

''আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে আপনার মত একটা অনুরোধ নিয়ে আমাদের কাছে আসা আর বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্ত নিয়ে কোন ওষুধ-বিক্রেতার দোকানে অথবা ওজন ও মাপজোপের ব্যুরোতে যাওয়া—দুইই সমান যুক্তিহীন? আপনাকে পুরো টাকাটা দেওয়া হয় নি, কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের কি করার থাকতে পারে?''

''ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমাকে দয়া করুন, আপনার কাছে আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব'', নীরবে কাঁদতে কাঁদতে মহিলাটি বলল। ''আমি একটি অসহায় মেয়েমানুষ... আমার শক্তিতে আর কুলোয় না. ভাড়াটের সঙ্গে মামলা-মোকর্দমা—আমার দায়, স্বামীর জন্য দরখাস্ত করা—সেটাও আমার দায়, সাংসারিক ঝামেলায় আমি একেবারে জেরবার হয়ে গেলাম, এখন তো না খেয়ে দিন কাটছে, ওদিকে জামাইটির কোন কাজকর্ম নেই, খাওয়াদাওয়া যে করি সেও নামেই, শরীরের যা অবস্থা দাঁড়াতেই পারি না। সারা রাত ঘুমতে পারি না।''

কিস্তুনভের বুকের মধ্যে ঢেউয়ের দোলা জাগল। বিষণ্ণ মুখে, হাতটা বুকের উপর চেপে ধরে সে আবার শুকিনাকে ব্যাপারটা বুঝাতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার গলা দিয়ে স্বর বের হল না...

''না, আমি দুঃখিত, আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না।'' অসহায়ভাবে সে বলল। ''সত্যি আমার মাথা ঘুরছে। আপনি আমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন, আবার আপনার সময়ও নষ্ট করছেন।'' একজন কেরাণীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, ''আলেক্সি নিকোলাইচ, দয়া করে মাদাম শুকিনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিন তো।''

কিস্তুনভ উপস্থিত সব দরখাস্তকারীর সঙ্গে কথা বলল, তারপর অফিসে বসে ডজনখানেক কাগজপত্র সই করল, আর আলেক্সি নিকোলাইচ সারাক্ষণ শুকিনা নিয়েই কাটিয়ে দিল। নিজের পড়ার ঘরে বসে কিস্তুনভ অনেকক্ষণ পর্যন্ত দু'জনের গলা শুনল: আলেক্সি নিকোলাইচের একঘেয়ে, সংযত গম্ভীর গলা, আর মাদাম শুকিনার কর্কশ, ফ্যাঁসফেসে গলা।

''আমি একটি দুর্বল, অসহায়, রুগ্ন মেয়েমানুষ,'' শুকিনা বলছে। ''দেখতে শক্তপোক্ত হলে কি হবে, শরীরে একেবারে কিচ্ছু নেই। দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেই পারি না। খিধে তো একেবারেই নেই। ...আজ সকালে কফি খেতেও ভাল লাগল না...''

আর আলেক্সি নিকোলাইচ তাকে বুঝিয়েই চলেছেন সরকারী বিভাগগুলি এবং দরখাস্তের জটিল ব্যবস্থার মধ্যে তফাৎটা কি। অচিরেই সেও ক্লান্ত হয়ে পড়ল আর হিসাব-সরকার নিজেই কাজটার ভার নিল।

''কী অদ্ভুত বাজে 'মেয়েমানুষ'!'' কিস্তুনভ রেগে বলল। আর

উত্তেজনায় নিজের আঙুল ফোটাতে লাগল আর সারাক্ষণ জলেই চুমুক দিয়ে চলল। ''বোকা, নাছোড়বান্দা! আমাকে পাগল করে দিয়েছে, এবার ওদেরও পাগল করে ছাড়বে। ফুঃ...এই বুক-ধড়ফড়ানিটা আমি পছন্দ করি না!''

আধ ঘন্টা পরে কিস্তুনভ ঘন্টাটা বাজাল। ঘরে ঢুকল আলেক্সি নিকোলাইচ।

ক্ষীণ কণ্ঠে কিস্তুনভ শুধাল, ''ওখানে কি হচ্ছে?''

''ওকে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না পিওতর আলেক্সান্দ্রিচ! অবস্থা ভয়াবহ।''

''ওর গলার শব্দই আমাব সহ্য হচ্ছে না...আমি অসুস্থ বোধ করছি...অসহ্য লাগছে...''

''দারোয়ানকে ডাকব কি? সে ওকে বের করে দিক?''

''না, না'', কিস্তুনভ প্রতিবাদ করল। ''উনি তো চীৎকার শুরু করবেন। এই বাড়িতে অনেকগুলি ফ্ল্যাট আছে, তারা আমাদের সম্পর্কে কি ভাববে উপরওয়ালাই জানে...যে ভাবে পার ওকে বোঝাতে চেষ্টা কর, লক্ষ্মী ছেলে।''

এক মিনিট পরে আলেক্সি নিকোলাইচের গুনগুনানি আবার শোনা গেল। প্রায় সিকি ঘন্টা ধরে চলল সেই গুনগুন শব্দ, তারপর হিসাববাবুর তারস্বর তার জের টেনে ঝি-ঝি পোকার ডাক শুরু করে দিল।

''একটি অতি-বিশিষ্ট রকমের বাজে মেয়েমানুষ!'' কাঁধ ঝাঁকিয়ে কিস্তুনভ রেগে বলল। ''খচ্চরের মত বোবা, গুলি মার। ভয় হচ্ছে আমার গেঁটেবাত বুঝি আবার থাবা বসাবে...''

অন্য ঘরে বেচাবা আলেক্সি নিকোলাইচ পুরোপুরি ক্লান্ত হয়ে প্রথমে টেবিলের উপর একটা আঙুল ফোটাল, তারপর কপালের উপর আর একটা।

''এক কথায় আপনার ঘাড়ের উপব যেটা আছে সেটা মাথা নয়, সেটা এই... ''

''এবার সোজা, খুব সোজা,'' রুষ্ট হয়ে শুকিনা বলে উঠল। আপনার স্ত্রীর কপালে ঠুকুনগে। ...আপনি তো মাটির ভিতরকার গর্তবিশেষ। আর অত অঙ্গভঙ্গী করবেন না!''

আর তখনই আলেক্সি নিকোলাইচ হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, যেন তাকে জীবন্ত গিলে খাবে, আর নীচু ধরা গলায় বলল ঃ

''বেরিয়ে যান!''

''কী?'' মাদাম শুকিনা আর্তনাদ কবে উঠল। ''এত সাহস আপনার? আমি একজন গরিব, অসহায় মেয়েমানুষ, তাই বলে আপনি আমাকে অপমান করবেন তা হবে না। আমার স্বামী একজন কলেজিয়েট এসেসর। মাটির ওই গর্তটার কথা শুনুন! আমি আইনজীবী দিমিত্রি কার্লিচের কাছে যাচ্ছি, যে শোচনীয় পদে আছেন সেটাও হারান কিনা দেখুন। আইনের

ব্যাপারটা আমার তিনজন ভাড়াটের হাতে ছেড়ে দিয়েছি, আর আপনার কথা, আপনার এই উদ্ধত আচরণের জন্য একদিন আপনাকে আমার পায়ে পড়তে আমি বাধ্য করব! আপনাদের সর্বোচ্চ সেনানায়কের কাছে যাবার পথ আমি করে নেব! ইয়োর এক্সেলেন্সি!'' সে আবার আর্তনাদ করে উঠল।

''বেরিয়ে যাও এখান থেকে, ডাইনি কোথাকার'' আলেক্সি নিকোলাইচ হিস্‌হিসিয়ে বলল।

কিস্তনভ নিজের দরজা খুলে মাথাটা বের করল।

অশ্রুভেজা গলায় বলল, ''কি হচ্ছে?''

শুকিনা চিংড়ি-রঙা মুখে ও উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে বাতাসের দিকে আঙুল বাড়িয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। কেরাণীরা তার কাছে দূরে দাঁড়িয়ে অনুরূপ রাঙা মুখ করে পরস্পর বিহ্বল দৃষ্টি-বিনিময় করছে।

কিস্তনভের দিকে ছুটে গিয়ে শুকিনা বলল, ''ইয়োর এক্সেলেন্সি! ঐ লোকটা (সে আলেক্সি নিকোলাইচকে দেখাল) একবার কপালে, তারপর টেবিলে আঘাত করেছে...আপনি তাকে হুকুম করলেন আমার কেসটা দেখতে, আর সে আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে! আমি একটি অসহায় মেয়েমানুষ. আমাকে রক্ষা করার কেউ নেই... আমার স্বামী একজন কলেজিয়েট এসেসর, আমি নিজেও একজন মেজরের মেয়ে!''

কিস্তনভ করুণ স্বরে বলল ''ঠিক আছে মাদাম, আমি ব্যাপারটা দেখব...যা করা দরকার তা করব... এখন চলে যান...পরে কথা হবে!''

'কিন্তু আমি টাকাটা কখন পাব ইয়োর এক্সেলেন্সি? আজই যে আমার টাকার দরকার!''

কিস্তনভ কাঁপা হাতটা কপালের উপর বুলিয়ে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর নতুন করে ব্যাপারটা বোঝাতে বসল ঃ

''আগেই তো আপনাকে বলেছি মাদাম, এটা একটা ব্যাংক, একটা বেসরকারী বাণিজ্যিক উদ্যোগ...তাহলে আপনি আমাদের কি করতে বলেন? আর এটা বুঝতে চেষ্টা করুন যে আপনি আমাদের কাজে বাধা দিতে পারেন না।''

মহিলা সব কথা শুনল, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

''হ্যাঁ, অবশ্য অবশ্য'' সে এ কথায় সম্মতি জানাল। ''ইয়োর এক্সেলেন্সি, আপনি শুধু একটু দয়া করুন, চিরকালের মত আমাকে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে দিন, আপনার পিতৃসম আশ্রয়টকু আমাকে দিন। এই স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট যদি যথেষ্ট না হয়, তাহলে পুলিশের কাছ থেকে আর একটি সার্টিফিকেট এনে দিতে পারি...আপনার ক্যাশিয়ারকে আমার টাকাটা দেবার হুকুম করুন!''

কিস্তনভের চোখের সামনে সব কিছু ভাসতে লাগল। তার ফুসফুসে যত বাতাস ছিল সবটা এক নিঃশ্বাসে বের করে দিল। সে একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়ল।

ক্ষীণ কণ্ঠে সে জানতে চাইল, "কত টাকা?"

"চব্বিশ রুব্‌ল্ এবং ছত্রিশ কোপেক।"

টাকার থলিটা বের করে সে একটা পঁচিশ রুবলের নোট বের করে সেটা শুকিনার হাতে দিল।

"এ নিয়ে...চলে যাও।"

মহিলা নোটটাকে রুমালে বেঁধে নিরাপদ স্থানে গুঁজে রেখে একটা মিষ্টি, শান্ত এমন কি ছেনালী হাসি হাসল। তারপর প্রশ্ন করল ঃ

"ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমার স্বামী কি তার চাকরিটা ফিরে পেতে পারে না?"

"আমি চলে যাচ্ছি..আমি অসুস্থ...আমার হৃৎপিণ্ডটা ভীষণভাবে টিপ্‌-টিপ্ করছে..." মূর্ছাহিতের মত গলায় কিস্তুনভ বলল।

সে চলে গেলে আলেক্সি নিকোলাইচ চাকরটাকে বাইরে পাঠাল ওষুধের দোকান থেকে খানিকটা জয়পত্রের জল আনতে, আর সেই জল প্রত্যেকে বিশ ফোঁটা করে খেয়ে যার যার কাজে গেল, আর শুকিনা আরও দুই ঘন্টা হল-ঘরে বসে দারোয়ানের সঙ্গে গল্প-গুজব করে কিস্তুনভের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

পরের দিনও সে এসেছিল।

১৮৮৭

শয়তানী

Villainy



"কে ওখানে?"

কোন উত্তর নেই। পাহারাদাব কিছুই দেখতে পেল না, কিন্তু বাতাসের শব্দ আর গাছপালার আছড়ে পড়ার শব্দের ভিতর দিয়ে সে স্পষ্ট শুনতে পেল কে যেন তার সম্মুখ দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মার্চ মাসে যেমন হয়ে থাকে, রাতটা মেঘে ঢাকা ও কুয়াশায় আচ্ছন্ন; পাহারাদারের মনে হল, পৃথিবী, আকাশ, আর চিন্তাভাবনাগুলো সমেত সে নিজেও যেন মিলেমিশে একটা প্রকাণ্ড, দুর্ভেদ্য কালো পদার্থে পরিণত হয়েছে। হাঁটিতে হলেই হাতড়াতে হাতড়াতে চলতে হবে।

"কে ওখানে?" সে আবার হাঁক দিল; মনে হল একটা ফিস্‌ফিসানি ও চাপা হাসি যেন শুনতে পেল। "কে ওখানে?"

"আমি?" একটি বৃদ্ধের কাঁপা কণ্ঠস্বর জবাব দিল।

"আমি কে?"

''এক পথিক।''

নিজের ভয়কে ঢাকতে পাহারাদার রেগে চেঁচিয়ে উঠল, ''পথিক মানেটা কি? এখানে তুমি কি করছ? রাতের বেলায় কবরখানায় ঘুরে বেড়াচ্ছ, আচ্ছা লোক তো?''

''কেন? এটা কি কবরখানা না কি?''

''তাছাড়া কি? নিশ্চয় কবরখানা। দেখতে পাচ্ছ না?''

বুড়ো লোকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুঃখের সঙ্গে বলল, ''ওঃ বাবা, ঈশ্বর তোমার ভাল করুন! আমি চোখে দেখি না, কিছুই দেখতে পাই না...কী অন্ধকার! এত অন্ধকার যে কিছুই দেখতে পাই না! আহা, বাবারে...''

''কিন্তু তুমি কে?''

''আমি একজন তীর্থযাত্রী, পথে পথে ঘুরে বেড়াই।''

''রাতের পাখি, যত সব তীর্থযাত্রী, না আমার মাথা...মাতালের বেহদ্দ, তাছাড়া কি'', পাহারাদার বলল; বুড়ো মানুষটার কথা ও দীর্ঘশ্বাস শুনে তার ভয়টা কেটে গেছে। ''যত সব! সারা দিন মদ গিলবে, আর রাত হলেই আড্ডাবাজী। আচ্ছা, তুমি তো একা নও, মনে হল আমি যেন দু'তিনজনকে কথা বলতে শুনলাম।''

''আমি একা...একেবারে নিঃসঙ্গ...বাবা, বাবাগো, প্রভু আমাদের আত্মার কল্যাণ করুন...''

পাহারাদার একলাফে এগিয়ে গিয়ে আগন্তুককে থামিয়ে দিল।

''আমি জানতে চাই, তুমি এখানে এলে কেমন করে?''

''আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। মিত্রির কল-ঘর যাচ্ছিলাম, কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলেছি।''

''তুমি যাচ্ছিলে? ওহে মাথামোটা, এটা কি মিত্রির কল-ঘরে যাবার রাস্তা? মিত্রির কল-ঘরে যেতে তো বাঁ দিকের রাস্তা ধরতে হয় তার জন্য শহর থেকেই তোমার বড় রাস্তা ধরা উচিত ছিল। মাতাল হয়েছ বলেই তুমি তিন ভার্স্ট পথ ফালতু হেঁটেছ। মনে হচ্ছে শহরে একেবারে আকণ্ঠ গিলেছ, কি বল?''

''তা তো বটেই, সেখানে তো...একটু আধটু তো খেয়েছি বটেই, খাই নি তা তো বলছি না। কিন্তু এখন আমি কোন্ পথে যাব?''

''ওই পথ ধরে নাকবরাবর চলে যাও যতদূর যেতে পার, তারপর বাঁ হাতে মোড় নিয়ে পুরো কবরখানাটা পেরিয়ে ফটক পর্যন্ত যাও। সেখানেই ফটকটা পাবে। সেটা খুললেই সোজা স্বর্গে পৌঁছে যাবে। কেবল খেয়াল রেখো যেন খানার মধ্যে না যাও। আর কবরখানাটা পার হয়েই সোজা মাঠের ভিতর দিয়ে হাঁটতে শুরু কর। হাঁটতে হাঁটতেই একসময় বড় রাস্তায় পড়বে।''

''প্রভু তোমাকে সুস্বাস্থ্য দান করুন। ঈশ্বর-জননী তোমাকে আশীর্বাদ করুন। তুমি কি কিছুটা পথ আমার সঙ্গে যাবে? দয়া করে আমাকে ফটক

পর্যন্ত পৌঁছে দাও।''

তুমি কি ভেবেছ আমার হাতে অঢেল সময় আছে। নিজেই চলে যাও।''

''দয়া কর, প্রতি রাত্রে আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করব। আমি দেখতে পাই না, কিচ্ছু দেখতে পাই না, কী অন্ধকার। কিছুটা পথ লক্ষ্মীছেলের মত আমার সঙ্গে চল।''

''তোমাকে নিয়ে বেড়াবার মত সময় আমার নেই। যারাই তোমার মত এসে হাজির হবে তাদের সকলকে নিয়েই যদি আমাকে মেতে উঠতে হয় তাহলে তো আমিই বাতিল হয়ে যাব।''

''খৃস্টের নামে আমি তোমাকে মিনতি করছি। আমি চোখে দেখি না একা একা কবরখানায় হাঁটিতে আমার ভয় করে। ওরা আমাকে ভয় দেখায় সত্যি। আমার ভয় করছে, লক্ষ্মী হয়ে চল।''

পাহারাদার নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ''তুমি আমার মাথা ধরিয়ে দিলে উঃ, ঠিক আছে, চল।''

দু'জন একসঙ্গে যাত্রা করল। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা হাঁটিতে লাগল মুখে কথা নেই। একটা ক্ষুরধার বাতাস সোজা এসে মুখে লাগছে। অদৃশ গাছগুলি অন্ধকারে সর্‌-সর্‌ কড়্‌-কড়্‌ করে বড় বড় জলের ফোঁটায় তাদের ভিজিয়ে দিচ্ছে। সারা পথটা জল কাদায় মাখামাখি।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে পাহারাদাব বলল, ''একটা ব্যাপারে আমার বড় খট্‌কা লাগছে। তুমি ভিতরে ঢুকলে কেমন করে? তুমি তো জান ফটকে তালা দেওয়া ছিল। তুমি কি পাচিল ডিঙিয়েছিলে? তা যদি করে থাক, তাহলে সেটা তোমার মত বুড়োর পক্ষে খুবই অন্যায় কাজ হয়েছে!''

''হতে পারে, হতে পারে, আমি নিজেই জানি না কেমন করে ভিতরে ঢুকেছিলাম। আমাকে যেন শয়তানে পেয়েছিল। প্রভু আমাকে শাস্তি দিয়েছেন। নির্ঘাৎ শয়তান আমার উপর ভর করেছিল। আর তুমি, দয়াল বন্ধু তুমি এখানকার পাহারাদার, তাই তো?''

''হ্যাঁ, তাই।''

''একা একা গোটা কবরখানাটা তুমি পাহারা দাও?''

হু-হু করে বাতাসের একটা প্রচণ্ড ঝাপটা আসায় এক মুহূর্তের জন্য দু'জনই থেমে গেল। বাতাস পড়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে পাহারাদার জবাব দিল ঃ

''না, আমরা তিনজন আছি, কিন্তু একজন জ্বরে শয্যাশায়ী, আর একজন ঘুমুচ্ছে। আমরা দু'জনই পালা করে পাহারা দেই।''

''তাই বুঝি! হে প্রভু, কী প্রচণ্ড হাওয়া! মৃতরা কবরে শুয়ে শুনতে পেলে অবাক হবার কিছু নেই। বুনো জন্তুর মত গর্জন করছে...বাপরে বাপ!...''

''তুমি আসছ কোত্থেকে?''

''অনেক দূর থেকে। আমি নিজে ভলোগদার মানুষ, সে অনেক দূরের পথ। আমি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াই আর ভাল মানুষদের জন্য প্রার্থনা করি। হে প্রভু, আমাদের কৃপা কর!''

পাহারাদার পাইপটা ধরাবার জন্য থামল। আগন্তুকের আড়ালে বসে একটার পর একটা দেশলাই জ্বালাতে লাগল। প্রথম কাঠিটা মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠতেই চোখে পড়ল পথের ডান দিকে একটুখানি জায়গা, দেবদূত বসানো একটি সাদা কবরের পাথর ও একটা কালো ক্রুশ; দ্বিতীয় কাঠিটা বেশ জোরে জ্বলে উঠল আর বাতাসে সেটা নিভে যাবাব আগেই বিদ্যুৎচমকের মত একটা আলোর রেখা বাঁদিক বরাবব ছড়িয়ে পড়ল, আর তাতে চোখে পড়ল রেলিংয়ের একটা কোণ; তৃতীয় কাঠির আলোয় ডান ও বাঁ দুই দিকই আলোকিত হওয়ায় দেখা গেল একটা সাদা কবরপাথর, একটা কালো ক্রুশ, এবং একটি শিশুর কবরের চারদিককার রেলিং।

সশব্দে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আগন্তুক চাপা গলায় বলল, ''ওরা ঘুমুচ্ছে, বড় আদরের স্বর্গতরা গভীর ঘুমে শুয়ে আছে। ধনী ও দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ, ভাল ও মন্দ সকলেই কী সুন্দর ঘুমিয়ে আছে। সকলেই এখন সমান হয়ে গেছে। শিঙা না বাজা পর্যন্ত ওরা সকলেই ঘুমিয়ে থাকবে। ওদের সকলেরই স্বর্গে যাবার পথ সুগম হোক, সকলেই শান্তিতে বিশ্রাম করুক।''

পাহারাদাব বলল, ''এখানে আমবা হেঁটে বেড়াচ্ছি, কিন্তু এমন দিন আসবে যখন আমবাও কবরে শুয়ে পড়ব।''

''খুব সত্যি। আমরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়ব। এমন মানুষ নেই যার মৃত্যু হবে না। ...আমাদের কাজকর্ম খারাপ, আমাদের চিন্তা-ভাবনায় অনেক ফাঁকি। আমরা পাপী, সকলেই পাপী। হায় আমাব দুর্ভাগা আত্মা, আমার অতৃপ্ত, ভোজনসর্বস্ব পেট! প্রভু আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন, এ জগতে অথবা পর-জগতে কেউ আমাকে বাঁচাবে না। কীট যেমন মাটির নীচে থাকে আমিও তেমনিই পাপে ডুবে আছি।''

''কিন্তু একদিন না একদিন তোমাকে তো মরতেই হবে'', পাহারাদার বলল।

''আমি কি তা জানি না?''

পাহারাদার বলল, ''আমার ধারণা আমাদের মত লোকদের চাইতে তীর্থযাত্রীদের পক্ষে মরাটা সহজতর।''

''তীর্থযাত্রী আছে নানা রকমের। কিছু আসল তীর্থযাত্রী আছে যারা ঈশ্বরকে ভর করে আর নিজেদের অমর আত্মাব কথা ভাবে, আবার কিছু আছে যারা রাত হলে কবরে কবরে ঘুরে বেড়ায় কোন শয়তানী মতলব নিয়ে। এমন তীর্থযাত্রীর সঙ্গেও তোমার দেখা হতে পারে যে ইচ্ছা করলে তোমার মাথায় কুড়ুলের আঘাত হানবে আর তাতেই তোমার দেহের শেষ গতি হয়ে যাবে।''

''তুমি কেন এমন ভয়ের কথা আমাকে বলছ?''

''কথাব কথা আব কি...এই যে, এটাই বোধ হয় ফটক। হ্যাঁ, তাই। ফটকটা খোল।''

ছিটকিনিটা খুঁজে পেয়ে পাহারাদার ফটকটা খুলে তীর্থযাত্রীর আস্তিন ধরে বাইরে নিয়ে বলল ঃ

''কবরখানাটা এখানেই শেষ। এই মাঠটা পেরিয়ে সোজা চলে যাও বড় রাস্তা পর্যন্ত। সেখানে কিন্তু একটা খানা আছে, দেখো তার মধ্যে যেন পড়ে যেয়ো না।... বড় রাস্তায় পড়ে ডান দিকে মোড় নিয়ে হাঁটিতে থাকলেই কলঘরটা পাবে...''

''বেশ বাবা, বেশ'', তীর্থযাত্রী একটা দীর্ঘঃশ্বাস ফেলল। ''ভেবে দেখলাম এখনই আমার মিত্রির কাছে যাবার কোন দরকার নেই। কিসের জন্য সেখানে যাব? তার চাইতে বরং এখানে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গেই কিছুটা সময় কাটিয়ে দেব বন্ধু...''

''কিসের জন্য?''

''তোমার সঙ্গে থাকাটাই তো বেশী মজার...''

''তুমি কি নিজেকে একটা ভাঁড় বা ঐ রকম কিছু মনে কর নাকি? বুঝেছি, তুমি সেই রকম তীর্থযাত্রী যারা তামাসা করাটা পছন্দ করে।''

সশব্দে নাক ঝেড়ে আগন্তুক বলল, ''নিশ্চয় পছন্দ করি। আর ভাল মানুষ এই বিশেষ তীর্থযাত্রীটিকে অনেক, অনেক দিন মনে রাখবে।''

''আমি কেন মনে রাখতে যাব?''

''কেন, কারণ কেমন চালাকি করে তোমাকে এমন বুদ্ধু বানিয়েছি। তুমি কি ভেবেছ আমি তীর্থযাত্রী? দূরতম কল্পনাতেও তা নই।''

''তাহলে তুমি কি?''

''একটা মৃত মানুষ...এইমাত্র কবর থেকে উঠে এসেছি...জলকলের মিস্ত্রি গুবারেভ যে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল তাকে মনে আছে? দেখ, আমিই সেই গুবারেভ!''

''আর একটা ভূতের গল্প বলনা!''

পাহারাদার তার কথা বিশ্বাস করল না, কিন্তু এত বেশী ভয় পেল যে পিছন দিকে ছুটে ফটকটাকে হাতড়ে খুঁজতে লাগল।

পাহারাদারের হাতটা চেপে ধরে আগন্তুক বলল, ''কোথায় যাচ্ছ? এক মিনিট দাঁড়াও। তুমিও তো একা। আমাকে একলা ফেলে তুমি যেতে পাবে না।''

হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করে পাহারাদার আর্তনাদ করে উঠল, ''আমাকে ছেড়ে দাও!''

''চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক! আমি যখন বলছি দাঁড়িয়ে থাক, তখন দাঁড়িয়েই থাকবে...টানাটানি করো না চামড়ি-পড়া কুকুর। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক, ঠিক যেমনটি বলেছি...এই মুহূর্তে রক্তপাত করতে ইচ্ছা করছে না, নইলে তোমাকে শেষ করে ফেলতাম...চুপ

করে দাঁড়াও!''

পাহারাদারের হাঁটুদুটো ভেঙে পড়তে চাইছে। ভয়ে চোখ বুজে কম্পিত দেহে সে বেড়াটাকে আঁকড়ে ধরল। চেঁচাতে চাইল, কিন্তু সে জানত তার চীৎকার কোন বাড়িতেই পৌঁছবে না...এই আগন্তুক তো এখানে আছেই...নিঃশব্দে কয়েকটা মিনিট কেটে গেল।

আগন্তুক চেপে-চেপে বলতে লাগল, ''একজন জ্বরে শয্যাশায়ী, দ্বিতীয়-জন ঘুমচ্ছে, আর তৃতীয়জন এক তীর্থযাত্রীকে নিয়ে ফটক পর্যন্ত হেঁটে বেড়াচ্ছে। চমৎকার পাহারাদার সব, আবার বেতনও পাচ্ছে! ওঃ, নাহে ভাই, চোররা সর্বদাই পাহারাদের আগে আগে চলে। চুপ করে দাঁড়াও, নড়ো না, আমি বলছি...''

হয়তো পাঁচ, হয়তো দশ মিনিট নীরবে কেটে গেল। হঠাৎ বাতাসে ভেসে এল একটা কর্কশ শিসের শব্দ।

পাহারাদারের হাত ছেড়ে দিয়ে আগন্তুক বলল, ''বেশ, এবার তুমি যেতে পার। চলে যাও আর প্রভুকে ধন্যবাদ দাও যে তুমি প্রাণে বেঁচে আছ।''

আগন্তুকও একটা কর্কশ শিস দিল, তারপর ফটক ছেড়ে দৌড় দিল। পাহারাদার শুনতে পেল, একলাফে সে খানাটা পার হয়ে গেল। অতি ভয়ংকর বিপদের আশংকা করে সে কাঁপতে কাঁপতে ইতস্তত করে ফটকটা খুলে, দুই চোখ বুজে কবরখানার ভিতর দিয়ে দৌড়তে শুরু করল। পথটা যেখানে মোড় ঘুরে বড় রাস্তায় পড়ল সেখানে কার যেন দ্রুত পায়ের শব্দ আর একটা হিস্ হিস্ শব্দের জিজ্ঞাসা তার কানে এলঃ

''কে তিমোফি? আর মিৎকা কোথায়?''

রাস্তা ধরে দৌড়তে দৌড়তেই অন্ধকারে একটা ছোট আবছা আলো সে দেখতে পেয়েছিল। সে যত আলোর কাছাকাছি এসেছে ততই তার ভয় বেড়েছে, ততই একটা শয়তানীর আশংকা জোরদার হয়েছে তার মনে।

সে নিজের মনেই বলল, ''আলোটা গির্জার ভিতরেই আছে বলে মনে হচ্ছে। আলোটা ওখানে কি কাজে লাগছে? ঈশ্বরজননী আমাকে কৃপা করুন। এ যে যা ভেবেছিলাম তাই।''

একটা মিনিট ভাঙা জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে সে ভজনালয়ের দিকে হা করে তাকিয়ে রইল। যে সরু চর্বি-বাতিটা চোররা নিভিয়ে রেখে যেতে ভুলে গিয়েছিল জানালার ভিতর দিয়ে সবেগে ছুটে-আসা বাতাসের ঝাপটা গেলে তার শিখাটা কেঁপে কেঁপে জ্বলছে আর একটা লাল আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে ছড়ানো-ছিটনো জামা, কাপড়, ওল্টানো সিন্দুক এবং বড় টেবিল ও বেদীর চারদিকের অসংখ্য পদচিহ্নের উপর।

আরও কয়েক মিনিট কেটে গেল। এতক্ষণে বাতাসের গর্জনের সঙ্গে কবরখানার উপর দিয়ে ভেসে এল বিপদ-ঘন্টার অবিরাম দ্রুত শব্দ।

১৮৮৭

ঘরোয়া

At Home



"কয়েকটা বই বা অন্য কিছু নিতে গ্রিগরিয়েভদের বাড়ি থেকে একজন বার্তাবাহক এসেছিল, আমি তাকে বলে দিয়েছি আপনি বাড়ি নেই। ডাক-পিয়ন কিছু কাগজপত্র ও দুটো চিঠি দিয়ে গেছে। আর একটা কথা ইয়েভ্‌গেনি পেত্রভিচ, আমি চাই যে আপনি সেরিওঝার সঙ্গে একবার কথা বলুন। গত পরশু আমি তাকে ধূমপান করতে দেখেছি, আজও আবার দেখেছি। তাকে বকুনি শুরু করতেই সে দুই কানে আঙুল দিয়ে এত গলা ফাটিয়ে গান গেয়ে উঠল যে আমার গলার স্বর তাতে ডুবে গেল।"

জেলা আদালতের উকিল ইয়েভ্‌গেনি পেত্রভিচ বাইকভস্কি সবেমাত্র আদালত থেকে ফিরে পড়ার ঘরে বসে হাতের দস্তানা খুলতে খুলতে গভর্নেসের প্রতিবেদনটি শুনল। তার দিকে একবার তাকিয়ে হেসে উঠল।

উকিলবাবু কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "সেরিওঝা ধূমপান করছে...ছবিটা যেন আমিও দেখতে পাচ্ছিঃ একটা সিগারেট মুখে দিয়ে সে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করছে। আরে, তার বয়সটা কত হল?"

"সাত। আপনি ব্যাপারটাকে হাল্কাভাবে নিচ্ছেন, কিন্তু তার বয়সে ধূম্‌পান করা ক্ষতিকর বদ অভ্যাস, আর সব বদ অভ্যাসকেই অংকুরে বিনাশ করা উচিত।"

"ঠিক কথা। কিন্তু সে তামাক বস্তুটি পায় কোথায়?"

"আপনার ডেস্কে।"

"সত্যি! সেক্ষেত্রে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

গভর্নেস চলে গেল। ডেস্কের পিছনে নিজের হাতল চেয়ারে বসে বাইকভ্‌স্কি চিন্তায় ডুবে গেল। কল্পনায় একটা ছবি তার চোখের সামনে ফুটে উঠল ঃ গজখানেক লম্বা একটা সিগারেট মুখে দিয়ে তার সেরিওঝা হেঁটে চলেছে। এই হাস্যকর ছবি দেখে সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল; সেই সঙ্গে গভর্নেসের গম্ভীর, চিন্তাগ্রস্ত মুখটা দীর্ঘ অতীতের অর্ধবিস্মৃত স্মৃতির কয়েকটি পাতা তার চোখের সামনে মেলে ধরল। সেকালে স্কুলে ধূমপান করাটাকে শিক্ষক ও বাবা-মা সকলেই একটা অদ্ভুত দুর্বোধ্য ত্রাসের চোখে দেখত। ব্যাপারটা সত্যি সেই রকম ছিল ঃ ত্রাস! ছেলেদের নির্দয়ভাবে বেত মারা হত, স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হত, তাদের জীবনের গতিটাকেই দুমড়ে-ভেঙে দিত, যদিও শিক্ষকবৃন্দ অথবা পিতাঠাকুর মহাশয়রা কেউই বুঝত না ধূমপান করার মধ্যে ক্ষতি ও অপরাধটা ঠিক কোথায়। এমন কি অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোকরাও অপরাধের স্বরূপটা না জেনেই তার বিরুদ্ধে প্রাণপণ

সংগ্রাম করত। ইয়েভ্‌গেনি পেত্রভিচের মনে পড়ল, তার নিজের স্কুলের অধ্যক্ষ, যিনি উচ্চ শিক্ষিত এবং ভাল স্বভাবের বৃদ্ধ লোক ছিলেন, তিনিও একটি ছাত্রকে ধূমপানের সময় হাতেনাতে ধরে ফেলে এতই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন যে সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক পরিষদের জরুরী সভা ডেকে দোষী ছাত্রটিকে বহিষ্কারের শাস্তি দিয়েছিলেন। মানব সমাজের এটাই বোধ হয় বিধি ঃ একটা অপরাধ যত অল্প বোধগম্য তার বিরুদ্ধে লড়াই করা হয় ততবেশী রূঢ় ও পাশবিকতার সঙ্গে।

আরও দু'তিনটি বহিষ্কৃত ছাত্র ও তাদের পরবর্তী জীবনের কথা তার মনে পড়ল, আর এ কথা না ভেবে সে পারল না যে অপরাধটা তাদের যতটা ক্ষতি করতে পারত তার তুলনায় অনেক বেশী ক্ষতি তাদের হয়েছিল সেই শাস্তির ফলে। একটি জীবিত প্রাণী খব তাড়াতাড়ি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, যে-কোন পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে; অন্যথায় মানুষ অনবরতই অনুভব করবে যে তার অনেক যুক্তিসঙ্গত কাজের সঙ্গেই জুড়ে থাকে কিছু অসঙ্গত ফলাফল, আর শিক্ষকতা, আইন প্রয়োগ এবং লেখাপড়ার মত কার্যকলাপ যার ফলাফল অনেক সময়ই ভয়াবহ রূপ ধারণ করে—তার মধ্যেই বা কতটুকু সচেতন ন্যায়বোধ ও আত্মবিশ্বাস থাকে।

এই রকম আরও অনেক কুয়াশাচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট চিন্তা ইয়েভ্‌গেনি পেত্রভিচের মাথার মধ্যে আসা-যাওয়া করতে লাগল। তারা কোথা থেকে আসে, কেন আসে তা বোঝা যায় না, অথচ তারা কিছু সময়ের জন্য তার মাথার মধ্যে বাসা বাঁধে, যেন মস্তিষ্কের উপরতলায়ই এঁকে-বেঁকে চলে, কিন্তু গভীরে ঢোকে না।

আটটা বেজে গেল। উপরতলায় কে যেন ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে, তারও উপরের তলায় চারজন মিলে পিয়ানো বাজাচ্ছে। লোকটির হাঁটার ধরন থেকেই বোঝা যাচ্ছে হয় সে কোন দুশ্চিন্তায় পীড়িত হচ্ছে, নয়তো ভয়ংকর দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে ; আর পিয়ানোর একঘেয়ে স্বর-লহরী শান্ত সন্ধ্যাটার উপর একটা মনোরম তন্দ্রার আমেজ ছড়িয়ে দিয়েছে ; পরিবেশটাই হয়ে উঠেছে অলস চিন্তার জাল বোনার পক্ষে একান্ত উপযোগী। দুটো ঘর পরের নার্সারি থেকে সেরিওঝা ও গভর্নেসের গলা শোনা যাচ্ছে।

ছেলেটি গাইছে, "পাপা এসেছে! পাপা এসেছে! পা-পা-পা!"

ভয়ার্ত পাখির মত কিচির-মিচির করে গভর্নেস চেঁচাচ্ছে, Votre pere vous appele, allez vite আমার কথা কানে ঢুকল?"

ইয়েভ্‌গেনি পেত্রভিচ অবাক হয়ে ভাবল, ওকে আমি কি বলব?

কোন কিছু ভাবার আগেই ঘরে ঢুকল সেরিওঝা। সে ছেলে না মেয়ে সেটা বোঝা যাচ্ছে কেবল তার পোশাক-পত্র দেখে—একটি দুর্বল, ফ্যাকাসে, ক্ষীণপ্রাণ মুখ...শরীরটা গরম-ঘরের তরকারির মত নম্রতায় জড়ানো; তার সব কিছুই কেমন যেন অসাধারণ শান্ত ও নরম ঃ তার গতিবিধি, তার কোঁকড়া চুল, তার দৃষ্টি, তার ভেল্‌ভেটের জ্যাকেট, সব কিছু।

লাফিয়ে বাবার কোলে উঠে নরম গলায় সে বলল, ''শুভ সন্ধ্যা পাপা,'' তারপর তার গলায় চুমো খেল। ''তুমি নাকি আমাকে দেখা করতে বলেছ?''

''এক মিনিট, এক মিনিট সবুর কর হে যুবক'', সেরিওঝাকে সরিয়ে দিয়ে তার বাবা বলল। ''চুমো খাওয়া পরে হবে, প্রথমে আমাদের মধ্যে একটা কথা হোক, গুরুতর কথা। আমি তোমার উপর রাগ করেছি, তোমাকে আর ভালবাসিনা। কথাটা হচ্ছে ঃ আমি তোমাকে ভালবাসি না, আর তুমি আমার ছেলে নও...বাস।...''

সেরিওঝা এক দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকাল, তারপর মুখ ফিরিয়ে টেবিলের দিকে তাকিয়ে দুই কাঁধ ঝাঁকাল। হতবুদ্ধিতে চোখ পিট্ পিট্ করে শুধাল, ''কিন্তু আমি কী দোষ করেছি? আজ তো আমি একবারও তোমার পড়ার ঘরে ঢুকি নি, কোন কিছুতেই হাত দেই নি।''

''নাতালিয়া সেমিওনভ্না এইমাত্র আমাকে বলে গেল যে তুমি ধূমপান কর...সে কথা কি সত্যি? তুমি ধূমপান কর?''

''ওঃ, একদিন করেছিলাম...কথাটা সত্যি...''

''তাহলেই দেখ তুমি মিথ্যে কথাও বলছ,'' ইয়েভ্গেনি পেত্রভিচ হাসি লুকোবার জন্য ভ্রূকুটি করে কথাগুলি বলল। ''নাতালিয়া সেমিওনভ্না তোমাকে দু'বার ধূমপান করতে দেখেছে। তার অর্থ তুমি তিনটে বদ অভ্যাস করেছঃ ধূমপান করা, মালিকের বিনা অনুমতিতে তামাক তুলে নেওয়া, এবং মিথ্যা কথা বলা। তিনটে অপরাধ!''

''ওঃ হ্যাঁ, অবশ্যই,'' সেরিওঝার মনে পড়ল, তার চোখ দুটি হাসিতে ঝিলমিল করে উঠল। ''ঠিক কথা! আমি দু'বার ধূমপান করেছিঃ আজ ও তার আগে।''

''তাহলেই বোঝ, একবার নয়, দু'দুবার আমি তোমার প্রতি খুব, খুব অসন্তুষ্ট হয়েছি। আগে তো তুমি ভালছেলেই ছিলে, কিন্তু এখন দেখছি তুমি খারাপ ছেলে হয়ে গেছ।''

ইয়েভগেনি পেত্রভিচ সেরিওঝার কলারটা সোজাকরে দিয়ে ভাবল ঃ এছাড়া আর কি তাকে বলতে পারি?

সে বলতে লাগল, ''হ্যাঁ, এটা সত্যি খুব খারাপ। তোমার কাছ থেকে এটা আমি আশা করি নি। প্রথম, যে তামাকটা তোমার নয় সেটা নেবার কোন অধিকার তোমার নেই। কেবলমাত্র নিজের জিনিস ব্যবহার করার অধিকারই প্রত্যেক মানুষের আছে, আর সে যদি অন্যের জিনিস নেয় তাহলেই সে একটি খারাপ লোক। (এ কথাটা বলা আমার পক্ষে মোটেই উচিত নয়! ইয়েভ্গেনি পেত্রভিচ ভাবল)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নাতালিয়া সেমিওনভ্নার একটা সিন্দুক আছে যার মধ্যে সে তার পোশাকপত্র রাখে। এটা তার সিন্দুক, আর আমরা, মানে তুমি আর আমি, এটাতে হাত দিতেই সাহস করি না, কারণ এটা আমাদের নয়। কথাটা সত্যি, তাই না? এখন,

তোমার খেলনা ঘোড়া আছে, কত ছবি আছে...আমি তো সেগুলো নেই না, নেই কি? হয় তো সেগুলো নেবার ইচ্ছা আমার হয়, কিন্তু সেগুলো আমার নয়, বুঝলে, সেগুলো তোমার!''

দুই ভুরু তুলে সেরিওঝা বলল, ''ইচ্ছা হলে তুমি সেগুলো নিও। দোহাই তোমার পাপা, লজ্জা করো না, সেগুলো নিয়ো! এখন তোমার টেবিলের উপর যে ছোট হলদে কুকুরটা বসে আছে সেটা আমার তা তুমি জান, কিন্তু আমি তো কিছু মনে করছি না...ওটা এখানেই থাকুক!''

ইয়েভ্‌গেনি পেত্রভিচ বলল, ''তুমি আমার কথা বোঝ নি। তুমি আমাকে এই ছোট কুকুরটা দিয়েছ, কাজেই ওটা এখন আমার, আর ওটাকে নিয়ে আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি, কিন্তু আমি তো তোমাকে কোন দিন কোন রকম তামাকই দেই নি, আর সে তামাকটা আমার! (এভাবে তাকে কথাটা বোঝানো আমার উচিত হয় নি! ইয়েভ্‌গেনি পেত্রভিচ ভাবল। এভাবে নয়, মোটেই এভাবে নয়!) এখন, আমাকে যদি অন্য কারও তামাক নিয়ে ধূমপান করতে হয় তাহলে প্রথমেই আমাকে সেই লোকটির অনুমতি নিতে হবে...''

ধীরে সুস্থে পংক্তির পর পংক্তি জুড়ে দিয়ে এবং একটি শিশুও বুঝতে পারে এমন সব সরল শব্দ বেছে নিয়ে সে ছেলেকে মালিকানার তাৎপর্য বোঝাতে শুরু করল। সেরিওঝা বাবার বুকের দিকে তাকিয়ে মন দিয়ে তার কথাগুলি শুনতে লাগল (বাবার সঙ্গে এই ভাবে সান্ধ্য আলোচনায় যোগ দিতে সে ভালবাসত), তারপর টেবিলের কানার উপর ভর দিয়ে স্বল্প-দৃষ্টি লোকের মত টেরা চোখে টেবিলের উপরকার কাগজপত্র ও কালির দোয়াতের দিকে তাকাতে লাগল। তার চোখ দুটো গোটা টেবিলের উপর ঘুরতে ঘুরতে আঠার পাত্রটার উপর গিয়ে থেমে গেল।

পাত্রটাকে চোখের কাছে এনে সে হঠাৎ শুধাল, ''বাবা, আঠা কি দিয়ে তৈরী হয়?''

পাত্রটাকে তার হাত থেকে নিয়ে যথাস্থানে রেখে বাইকভ্‌স্কি পুনরায় বলতে লাগল ঃ

''দ্বিতীয়. তুমি ধূমপান কর এটা খুব খারাপ। আমি ধূমপান করি তার অর্থ এই নয় যে ধূমপান করাটা অপরাধ। আমি ধূমপান করি কিন্তু আমি জানি যে এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, আর এ জন্য আমি নিজেকে তিরস্কার করি, অপছন্দ করি...(আমি কি একজন ধূর্ত গুরুমশায় নই! সে ভাবল।) ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব খারাপ; যারা ধূমপান করে তারা অকালে মারা যায়। ধূমপান তোমার মত ছোট ছেলেদের পক্ষে বিশেষ করে খারাপ। তোমার বুকটা দুর্বল, তুমি এখনও পুরোপুরি শক্তিশালী হয়ে ওঠ নি, আর যারা দুর্বল তাদের ক্ষেত্রেই ধূমপান থেকে ক্ষয়রোগ ইত্যাদি দেখা দেয়। যেমন ধর, ইগ্‌নাতি খুড়ো ক্ষয়রোগেই মারা গেলেন। সে যদি ধূমপান না করত তাহলে হয় তো আজও পর্যন্ত বেঁচে থাকত।''

সেরিওঝা স্বপ্নালু চোখে বাতির দিকে তাকাল, আঙুল বাড়িয়ে ঢাকনাটা স্পর্শ করল, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

বলল, ''ইগ্‌নাতি খুড়ো ভাল বেহালা বাজাত। তার বেহালাটা এখন গিগোব্রিয়েভদের বাড়িতে আছে।''

পুনরায় টেবিলের কানায় হেলান দিয়ে সে চিন্তায় ডুব দিল। ম্লান মুখটা সম্পূর্ণ স্থির হয়ে গেল, যেন সে কান পেতে নিজের ভাবনাগুলিই শুনছে, অথবা তাদের গতিবিধি অনুসরণ করছে; হঠাৎ তার দুটি বড় বড় চোখে দুঃখ এবং ভয়ের মত একটা ভাব ফুটে উঠল। যে মৃত্যু সম্প্রতি তার মা ও ইগ্‌নাতি খুড়োকে নিয়ে গেছে, সম্ভবত তার কথাই সে ভাবছিল। মৃত্যু মাদের ও খুড়োদের অন্য জগতে নিয়ে যায়, অথচ তাদের সন্তানরা, তাদের বেহালাগুলো এই জগতেই পড়ে থাকে। মৃতরা আকাশে তারাদের কাছেই বাস করে, আর সেখান থেকে পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকে। বিয়োগ-ব্যথায় তারা কি খুব কষ্ট পায়?

ইয়েভ্‌গেনি উঠে পায়চারি শুরু করল।

সে ভাবতে লাগল, আমার সময়ে আশ্চর্য সরলভাবে এই সমস্যাগুলির সমাধান করা হত। একটা ছেলে ধূমপান করে ধরা পড়লে তাকে বেত মারা হত। দুর্বলহৃদয় ও ভীরুরা তারপরেই ধূমপান ছেড়ে দিত, কিন্তু যাদের সাহস বেশী, যারা বেশী চালাক, তারা তারপর থেকেই বুটের মধ্যে সিগারেট লুকিয়ে রেখে গোলাবাড়িতে গিয়ে ধরিয়ে টানত। যখন সেখানেও ধরা পড়ে চাবুক খেত তখন নদীর ধারে গিয়ে ধূমপান করত আর এইভাবেই ছেলেরা বড় হয়ে উঠত। আমি যাতে ধূমপান না করি সেজন্য মা আমাকে অঢেল টাকা ও মিষ্টি দিত। এখনকার দিনে এসব উপায়গুলোকে মূল্যহীন ও অনৈতিক বলে মনে করা হয়। একজন আধুনিক শিক্ষক চেষ্টা করে যাতে ছোট ছেলেমেয়েরা সুনীতিগুলোকে গ্রহণ করে সত্যি সত্যি তাতে বিশ্বাস করে বলে, ভয়ে নয়, লোক দেখাবার জন্য নয়, অথবা পুরস্কারের লোভেও নয়।

সে যতক্ষণ পায়চারি করতে করতে এই সব ভাবছে, ততক্ষণে সেরিওঝা টেবিলের পাশের চেয়ারটাতে উঠে ছবি আঁকতে শুরু করেছে। একগাদা কাগজ ও একটা নীল পেন্সিল বিশেষ করে তার জন্যই সেখানে রাখা আছে যাতে সে দরকারী কাগজপত্রে হাত না দেয় বা কালি ব্যবহার না করে।

ভুরু কুঁচকে একটা বাড়ি আঁকতে আঁকতে সেরিওঝা বলল, ''বাঁধাকপি কাটতে গিয়ে রাঁধুনি আঙুল কেটে ফেলেছে। সে এমন চীৎকার করে উঠেছিল যে আমরা ভয় পেয়ে রান্নাঘরে ছুটে গেলাম। কী বোকা মেয়েমানুষ! নাতালিয়া সেমিওনভ্‌না তাকে ঠাণ্ডা জলে আঙুলটা চোবাতে বলল, আর সে গিয়ে আঙুলটা চুষতে লাগল...নোংরা আঙুলটাই মুখে পুরে দিল, কি করে দিতে পারল? সেটা তো বিশ্রী কাজ, তাই না পাপা?''

তারপর সে বাবাকে বলল, লাঞ্চের সময় একজন অর্গানবাদক তার ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে তাদের উঠোনে এসেছিল, আর মেয়েটি তার বাজনার

সঙ্গে গান গেয়ে নেচেছিল।

ইয়েভ্‌গেনি পেত্রভিচ ভাবতে লাগল, ওর চিন্তা-ভাবনাগুলি ওর নিজের পথেই তো চলবে! ওর মাথায় থাকে নিজের ছোট জগৎটা আর নিজের মত করেই ও জানে কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ। আমি যদি ওর মনোযোগ আকর্ষণ করতে এবং ওর মনকে প্রভাবিত করতে শুধুমাত্র আমার বলার ধরণটাকে বদলে ওর সঙ্গে কথা বলি তাহলে সেটা যথেষ্ট হবে না, ওর মত করেই চিন্তা করতেও আমাকে শিখতে হবে। ওর সিগারেট খাবার ব্যাপারে সত্যি সত্যি যদি আমার আপত্তি থাকত, আর সে আপত্তিটা যদি চীৎকার করে জানাতাম তাহলে সে আমাকে ঠিক মত বুঝতে পারত...

এই জন্য ছেলেমেয়ে মানুষ করার ব্যাপারে মায়েরা অপরিহার্য—তারা জানে কি ভাবে ছেলেমেয়েদের ঠিক মত বুঝতে হয়, তাদের সঙ্গে হাসতে হয়, কাঁদতে হয়...যুক্তি দিয়ে, নীতিকথা শুনিয়ে কিছুই করা যায় না। এখন, আমি ওকে আর কি বলতে পারি? কি?

কী আশ্চর্য ও হাস্যকর কথা যে নিজে একজন অভিজ্ঞ আইনজীবী হয়ে, জীবনের অধিকাংশ সময় সর্ব প্রকার দমনমূলক কাজ, সতর্ক-বাণী ও দণ্ডবিধানের অনুশীলন করার পরেও সে এখন হতবুদ্ধি হয়ে বুঝতেই পারছে না এই ছোট ছেলেটিকে কি বলবে।

বলল, "শোন, তুমি আমাকে কথা দাও যে আর কখনো ধূমপান করবে না।"

"কথা দেব!" শেরিওঝা সুর করে বলে উঠল; পেন্সিলটাকে আরও জোরে চেপে ধরে ছবিটার উপর ঝুঁকে পড়ে যেন গেয়ে উঠল, "কথা দেব! ক-থা! ক-থা?"

কিন্তু কথা দেওয়া কাকে বলে তা কি ও জানে? ইয়েভ্‌গেনি পেত্রভিচ নিজেকেই প্রশ্ন করল। না, আমি একটি উপদেষ্টা। কোন শিক্ষক বা আমাদেরই কোন একজন উকিল যদি এই মুহূর্তে আমার মাথার ভিতরটা দেখতে পেত তাহলে আমাকে একটা দুর্বল লোক ভাবত, আর হয়তো আমিই অকারণে বাকচাতুরি ফলাচ্ছি বলে সন্দেহ করে বসত।...কিন্তু স্কুলে এবং আদালতে এই সব জটিল সমস্যারই সমাধান করা হয়ে থাকে বাড়ির তুলনায় অনেক বেশী সহজ, সরলভাবে; এখানে যাদের নিয়ে কাজ করতে হয় তাদের তুমি পাগলের মত ভালবাস, আর সেই ভালবাসাই সমস্যাটিকে জটিল করে তোলে। এখানে এই বালকটি যদি আমার ছেলে না হত, সে যদি আমার ছাত্র বা মক্কেল হত তাহলে আমি এতটা ভীরু হতাম না, আর আমার ভাবনাগুলিও এত বিক্ষিপ্ত হত না...

সে টেবিলে বসে পড়ে সেরিওঝার একটা আঁকা ছবি টেনে নিল। আঁকা হয়েছে বাঁকা ছাদওয়ালা একটা বাড়ি, চিমনির ভিতর থেকে একটা ধোঁয়া বিদ্যুতের মত এঁকেবেঁকে সোজা উঠে গেছে কাগজটার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। বাড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি সৈন্য, তার মুখে চোখের বদলে দুটো

ফোঁটা বসানো আর হাতে একটা বেয়নেট যেটা দেখতে ইংরেজি চার সংখ্যার মত।

সে সেরিওঝাকে বলল, ''একটা মানুষ একটা বাড়ির থেকে বেশী লম্বা হতে পারে না। তাকিয়ে দেখ, ছাদটা উঠেছে সৈনিকটির মাত্র কাঁধ পর্যন্ত।''

সেরিওঝা তার কোলেব মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আরাম পাবার জন্য অনেকক্ষণ নড়াচড়া করতে লাগল।

আঁকাটার দিকে তাকিয়ে বলল, ''না পাপা, তুমি যদি সৈনিকটিকে ছোট কর তাহলে তার চোখ দুটো তো দেখাই যাবে না।''

এ কথায়ও সে কি আপত্তি করবে? প্রতিদিন ছেলের চাল-চলন দেখে ইয়েভ্গেনি পেত্রভিচ বুঝতে পেরেছে যে অসভ্য মানুষদের মত ছোটদেরও শিল্পকলা সম্পর্কে নিজস্ব মৌলিক মতামত ও নির্দিষ্ট মান থাকে, আর সেটা বয়স্ক মানুষদের বুদ্ধির অতীত। সেরিওঝাকে কাছে থেকে দেখলে একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মনে হতে পারে যে তার সম্পর্কে সেইটুকুই যথেষ্ট জানা নয়। ঘর থেকে উঁচু একটা মানুষকে আঁকাটা তার কাছে সম্ভবপর ও বুদ্ধিগ্রাহ্য বলে মনে হয়েছে, আব সে পেন্সিল দিয়ে যা এঁকেছে সেটা বাস্তব সত্য না হলেও তার নিজের অনুভূতি সত্য। এই ভাবেই একটা পিতলের বাদ্যযন্ত্রের শব্দকে সে এঁকেছে বর্তুলাকার ধোঁয়ার দাগের মত—একটা পাকানো সুতোর মত...তার কাছে শব্দের সঙ্গে আকার ও বর্ণের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, আর তাই সে যখন বর্ণমালার এক একটি অক্ষরকে রং দিয়ে লিখেছে তখন এল্‌কে হলুদ রংয়ে, এম্‌কে লাল রংয়ে, এ-কে কালো রং-এ এঁকেছে।

ছবি আঁকার আগ্রহ কমে গেলে সেরিওঝা আবার কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক নড়েচড়ে তার বাবার দাড়ির দিকে মন দিল। প্রথমে দাড়িটাকে সযত্নে মসৃণ করে দিল, তারপর দুই ভাগে ভাগ করে দুটো শেষ প্রান্তকে বুরুশ দিয়ে তুলে দিল ঠিক জুলফির মত।

''তোমাকে ঠিক আইভান স্তেপানভিচের মত দেখাচ্ছে'', সে মুখ টিপে হেসে বলল। ''এবার তোমাকে দেখাবে ঠিক আমাদের দারোয়ানেব মত। আচ্ছা পাপা, দারোয়ানরা আছে কিসের জন্য? চোরদের তাড়াতে?''

ইয়েভ্গেনি পেত্রভিচের মুখের উপর ছেলের নিঃশ্বাস পড়ছে, ছেলের চুল উড়ে পড়ছে তার গালের উপর, আর তার বুকটা এতই গরম ও নরম যেন তার হাত দুটো কেবল যে সেরিওঝার ভেলভেটের জ্যাকেটটাকে স্পর্শ করছিল তাই নয়, স্পর্শ করছিল তার বুকভরা ভালবাসাকে। ছেলের বড় বড় দুটি কালো চোখের গভীরে তাকিয়ে তার মনে হচ্ছিল বুঝি তার মা, তার স্ত্রী, তার অন্য সব প্রিয়জনই তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

সে ভাবল, এবার তাকে চাবুক মারার চেষ্টা করেই দেখ। তাকে কি শাস্তি দেওয়া যায় সেটা ভাবার চেষ্টা করেই দেখ। না, আমরা কেউ শিক্ষাব্রতী নই। আগেকার দিনে মানুষ ছিল সহজ, সরল, তারা ভাবনা-চিন্তা করত কম, তাই

সাহসের সঙ্গে তাদের সমস্যার মোকাবিলা করত। আমরা বড় বেশী ভাবি, আর আছে এক বিরক্তিকর যুক্তির বহর...একটা মানুষ যত বেশী উন্নত, সে যত বেশী যুক্তির পথ ধরে আর সূক্ষ্মতর বিষয় নিয়ে ভাবে, সে তত বেশী অস্থিরচিত্ত হয়, ততবেশী সন্দিগ্ধ ও ভীত হয়ে পড়ে। একবার ভেবে দেখ, শিক্ষকতা, বিচার অথবা একটা মোটা উপন্যাস লেখার কাজ করতে হলে একটা মানুষকে কত সাহসী ও আত্মপ্রত্যয়ী হতে হয়...

ঘড়িতে দশটা বাজল।

বাবা বলল, "শুয়ে পড়ার সময় হয়েছে বাবা। আমাকে শুভরাত্রির চুমো খেয়ে শুতে যাও।"

"ওঃ, না পাপা, আমি আরও কিছুক্ষণ থাকব", সেরিওঝা গো ধরল। "আমাকে একটা গল্প বল।"

"ঠিক আছে, কিন্তু গল্প শেষ হলেই সোজা বিছানায়!"

সন্ধ্যাবেলায় হাতে কাজ না থাকলে ইয়েভ্‌গেনি পেত্রভিচ নিয়ম করেই সেরিওঝাকে ঘুম-পাড়ানি গল্প শোনায়। সব কর্মব্যস্ত মানুষের মতই একটা কবিতাও সে মুখস্ত বলতে পারে না অথবা একটা রূপকথার গল্পও তার মনে থাকে না, তাই প্রতিবারই তাকে গল্পটা বানিয়ে বলতে হয়। সাধারণত সেই একই বাঁধা-ধরা গৎ দিয়েই সে গল্প শুরু করে ঃ "কোন এক কালে" আর তারপরে যত সব নির্দোষ অর্থহীন কথার পর কথার স্তূপ, অথচ তখনও সে নিজেই জানে না গল্পটা যে ভাবে আরম্ভ করেছে সেটা কি ভাবে গড়ে উঠবে এবং শেষ হবে। খুশিমত কতকগুলি চরিত্র ও পরিস্থিতি বেছে নেয়, আর তার পরে গল্পের প্লট ও নীতি-উপদেশ স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে, কথকের ইচ্ছার তোয়াক্কা করে না। এই সব বানানো গল্পগুলি সেরিওঝা খুব পছন্দ করে ; তার বাবাও লক্ষ্য করেছে যে গল্পের প্লটটা যত বেশী সরল হয় এবং কল্পনার মাত্রাটা যত অল্প হয়, বালকটির কল্পনা তত বেশী উদ্দীপ্ত হয়।

সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে সে গল্প বলতে শুরু করল, "কোন এক কালে এক বুড়ো, খুব বুড়ো জার বাস করত। তার ছিল লম্বা সাদা দাড়ি আর প্রকাণ্ড গোঁফ। তারপর, এই জার বাস করত একটা স্ফটিকের প্রাসাদে...সূর্যের আলো পড়ে প্রাসাদটা পরিষ্কার বরফের মত ঝলমল করত। কি জান, প্রাসাদ ঘিরে ছিল মস্ত বড় বাগান ; সেখানে ছিল কমলা লেবু, নাসপাতি ও চেরি ফলের গাছ...আর ছিল টিউলিপ, গোলাপ, শাপলা, আরও কত রকম ফুলের গাছ...রং-বেরংয়ের পাখিরা মিষ্টি মিষ্টি গান করত...গাছে গাছে ঝুলে থাকত ছোট ছোট স্ফটিকের ঘণ্টা...বাতাস বইলে সেই ঘণ্টাগুলো এমন মধুর সুরে বেজে উঠত যে কান পেতে চিরকাল তা শুনতে তোমার ইচ্ছা করবে। কি জান, স্ফটিকের আওয়াজ ধাতুর আওয়াজের চাইতে বেশী মধুর ও মৃদু...আচ্ছা, তারপর, সেখানে আর কি ছিল ? ওঃ হ্যাঁ, আর ছিল ফোয়ারা...তোমার মনে আছে সোনিয়া মাসির গ্রীষ্মাবাসে আমরা একটা ফোয়ারা দেখেছিলাম ? হ্যাঁ, ঠিক সেই রকম অনেক

ফোয়ারা ছিল জারের বাগানে, তবে সেগুলো ছিল আরও অনেক বড়, সে সব ফোয়ারার জল ছিটকে উঠত সব চাইতে উঁচু পপলার গাছের মাথা ছাড়িয়ে।''

''এই বুড়ো জারের ছিল একমাত্র ছেলে ও উত্তরাধিকারী—তোমার মতই একটি ছোট্ট ছেলে। ছেলেটি খুব ভাল। একটুও দুষ্টুমি করত না, সকাল সকাল শুতে যেত, বাবার টেবিলের কোন জিনিসে হাত দিত না...আর সব মিলিয়ে একটি চালাক চতুর ছেলে। তার একটাই দোষ ছিল—ধূমপান করত...

সেরিওঝা একমনে শুনত, চোখ মেলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত বাবার দিকে। তারপর কি হল সেটা মনে মনে ভেবে নিয়ে ইয়েভ্‌গেনি পেত্রভিচ আবার কথা বলতে শুরু করল। গল্পের প্লটটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে শেষ পর্যন্ত এই কথা দিয়ে শেষ করল ঃ

''ধূমপানের ফলে যুবক প্রিন্সেব ক্ষয়রোগ হল আর মাত্র বিশ বছর বয়সে রোগেই মারা গেল। বাবা তখন খুব বুড়ো ও রুগ্ন হয়ে পড়ল; তাকে দেখার আর কেউ রইল না। রাজ্য শাসন ও রাজপ্রাসাদ রক্ষা করার মতও কেউ রইল না। শত্রু এসে দেশটা আক্রমণ করল, বুড়ো জারকে মেরে ফেলল, রাজপ্রাসাদটা ধ্বংস করল; আর সেই বাগানে এখন আর কোন চেরি গাছ নেই, সেখানে কোন পাখি গান করে না, কোন স্ফটিকের ঘন্টা বাজে না...আর এখানেই ইতি...''

গল্পের উপসংহারটা ইয়েভ্‌গেনি পেত্রভিচের নিজের কানেই বড় ছেলেমানুষী ও ফাঁকা শোনাল, কিন্তু পুরো গল্পটাই সেরিওঝার খুব ভাল লাগল। আবার তাব দুই চোখে ফুটে উঠল বিষণ্নতা ও ভয়ের মত একটা ভাব; চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে এক মিনিট অন্ধকার জানালাটার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ শিউরে উঠে সে নীচু গলায় বলল ঃ

''আর কোন দিন আমি ধূমপান করব না...''

বাবাকে শুভরাত্রির চুমো খেয়ে সে শুতে চলে গেল।

ইয়েভ্‌গেনি পেত্রভিচ ধীরে ধীরে পায়চারি কবতে করতে একটু হাসল, ভাবল ঃ যে ফলটা পাওয়া গেল তার কৃতিত্ব গল্পটার সৌন্দর্য ও কলাকুশলসম্মত গঠন-রীতিরই প্রাপ্য। হয় তো তাই, কিন্তু তাতে আর কতটুকু সান্ত্বনা মিলবে। যতই হোক, এটাতো সঠিক পথ নয় নীতিকথা ও সত্যকে কেন স্বরূপে কোন ভেজাল না দিয়ে উপস্থিত করা যাবে না, কেন সর্বদাই তাকে গিল্টি করতে হবে, ওষুধের বড়ির মত চিনি লাগিয়ে দিতে হবে? এটা তো অস্বাভাবিক। মিথ্যা, চালাকি, প্রতারণা...

সে ভাবল জুরিদের কথা, যাদের একটা তৈরী ''বক্তৃতা'' শোনাতেই হবে, ভাবল সাধারণ মানুষের কথা যারা ইতিহাস শেখে উপকথা ও উপন্যাস পড়ে আর ভাবল নিজের কথা যে জীবনের অর্থ জেনেছে, সুভাষিতাবলী ও আইনের কাছ থেকে নয়, শিখেছে উপকথা, উপন্যাস ও কবিতার কাছ

থেকে....

''ওষুধ মিষ্টি হতে হবে, আর সত্যকে হতে হবে সুন্দর...'' এই অর্থহীন কথাকে মানুষ বিশ্বাস করে আসছে আদমের কাল থেকে...সে যাই হোক...হয়তো এটাই স্বাভাবিক ও সঠিক...প্রকৃতিই তো উপযোগী প্রতারণা ও বিভ্রান্তিতে পূর্ণ, তাই তো...''

সে কাজে মন দিল, কিন্তু এই অলস, ঘরোয়া চিন্তাটাই অনেক সময় পর্যন্ত তার মাথায় অবিরাম আসা-যাওয়া করতে লাগল। পিয়ানোর বাজনাটা আর তার কানে আসছে না, কিন্তু উপরকার মানুষটি তখনও ঘরময় পায়চারি করছে...

১৮৮৭

কুমারী এন-এর কাহিনী

The Story of Miss N.



প্রায় নয় বছর আগে ফসল কাটার মরশুমের এক বিকেলে কার্যকরী বিচারক পিয়োতর সের্গেয়েভিচ ও আমি ঘোড়ায় চেপে স্টেশনে গিয়েছিলাম ডাকের চিঠিপত্র আনতে।

আবহাওয়া ছিল চমৎকার, কিন্তু ফেরবার পথে আকাশে ঝড়ের গর্জন শোনা গেল ; আমরা তাকিয়ে দেখলাম একটা ক্রুদ্ধ কালো মেঘ আমাদের দিকেই ধেয়ে আসছে। কালো মেঘটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে, আর আমরাও ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছি মেঘের দিকেই।

মেঘের পটভূমিতে আমাদের বাড়ি ও গির্জাটাকে সাদা দেখাচ্ছে, আর দীর্ঘ পপলার গাছগুলির উপর পড়েছে একটা রূপালি আভা। বাতাসে বৃষ্টি আর সদ্য কাটা খড়ের গন্ধ। আমার সঙ্গীর মেজাজ ছিল তুঙ্গে ঃ সে হাসছে আর যত রাজ্যের অর্থহীন বকুনি ঝাড়ছে। সে বলল, হঠাৎ যদি এমন ঘটে যে বৃষ্টির জন্য আশ্রয়ের খোঁজে আমরা একটা মধ্যযুগীয় দুর্গে ঢুকে পড়লাম—সে দুর্গে গম্বুজ আছে, শেওলা-ঢাকা প্রাচীর আছে, বাদুড় আছে—আর শেষ পর্যন্ত বাজ পড়ে মারা গেলাম, তো মন্দ হয় না।...

দেখতে দেখতে রাই ও যই-এর ক্ষেতের উপর দিয়ে প্রথম ঢেউটা খেলে গেল, বাতাসের একটা ভয়ংকর ঝাপ্টা উঠে এল, আর ধূলোর ঝড় বাতাসে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। পিয়োতর সের্গেয়েভিচ অট্টহাসি হেসে ঘোড়ার পেটে নালের খোঁচা মারল।

''চমৎকার!'' সে চেঁচিয়ে উঠল। ''আশ্চর্য!''

তার উচ্ছ্বাস সংক্রামিত হয়ে এবং যে কোন মুহূর্তে আমিও কাক-ভেজা ভিজতে পারি এবং বিদ্যুতের স্পর্শে মারাও যেতে পারি এই চিন্তায়

উত্তেজিত হয়ে হেসে উঠলাম।

সেই ঘূর্ণি ঝড়ের মধ্যে সবেগে ঘোড়া চালিয়ে যখন তুমি হাঁপিয়ে ওঠ অথচ নিজেকে একটা পাখি বলে ভাবতে পার, তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড শিহরণ আছে। আমরা যখন উঠোনে ঢুকলাম তখন বাতাস পড়ে গেছে, আর বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে ঘাসের বুকে, ছাদের উপরে। আস্তাবলের কাছাকাছি একটা প্রাণীও চোখে পড়ল না।

পিয়োতর সের্গেয়েভিচ নিজেই ঘোড়ার জিন খুলে ঘোড়া দুটোকে আস্তাবলে নিয়ে গেল। তার জন্য অপেক্ষা করে দরজায় দাঁড়িয়ে আমি বৃষ্টির তির্যক ফোঁটাগুলির দিকে তাকিয়ে ছিলাম; খড়ের গন্ধটা এখানে বাইরের তুলনায় অনেক বেশী উগ্র; কালো মেঘ ও বৃষ্টির দরুণ জায়গাটাতে আলো খুব কম।

আকাশটাকে দু' ফালা করে ছিঁড়ে ফেলে একটা ভয়ংকর বাজ ডেকে উঠল; তারপরেই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পিয়োতর সের্গেয়েভিচ বলে উঠল, ''কোথায় যেন বাজ পড়ল। তাই না?''

দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আসার জন্য সে হাঁপাতে হাঁপাতে আমার পাশেই দাড়িয়ে এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখে ফুটে উঠল আমারই বন্দনা।

বলল, ''নাতালিয়া ভ্লাদিমিরভ্না, এইভাবে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে অনন্তকাল তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে পাবলে আমি সবকিছু দিতে পারি। আজ তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে।''

তার চোখ দুটি আনন্দে উচ্ছ্বসিত, আবেদনে আনত; মুখখানি বিবর্ণ; দাড়িতে ও গোঁফে চিকমিক করছে যে জলের ফোঁটাগুলো তারাও যেন ভালবাসার চোখে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

সে বলতে লাগল, ''আমি তোমাকে ভালবাসি; তোমাকে দেখতে পেয়ে আমার সুখের সীমা নেই। আমি জানি তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার না, কিন্তু আমি তো কিছু চাই না, আমার কোন দাবী নেই, আমি শুধু চাই যে তুমি জান আমি তোমাকে ভালবাসি। কিছু বলো না, কোন জবাব দিওনা, কোন দিকে তাকিও না, শুধু জান যে আমি তোমাকে ভালবাসি, আর শুধু এইটুকু দিও—আমি যেন তোমাকে দেখতে পাই।''

তার উচ্ছ্বাস আমাকেও নাড়া দিল। তার বিহ্বল মুখের দিকে তাকালাম, তার কথা শুনলাম, তার কণ্ঠস্বরে মিশে গেছে বৃষ্টির শব্দ, আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম, এক পাও নড়তে পারলাম না।

আমারও ইচ্ছা হ'ল, তার উজ্জ্বল চোখ দুটির দিকে তাকিয়েই থাকি, চিরকাল শুনি তার মুখের কথা।

পিয়োতর সের্গেয়েভিচ বলল, ''তুমি নীরব হয়ে আছ—তাই ভাল! এ নীরবতা ভেঙো না।''

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। খুশিতে হেসে উঠলাম। বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ির

দিকে ছুট দিলাম। সেও হাসতে হাসতে আমার পিছু নিল, লাফিয়ে লাফিয়ে রাস্তায় জমা জল পার হতে লাগল।

ছোট ছেলেমেয়েদের মত হল্লা করতে করতে বৃষ্টিতে কাক-ভিজে হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়িতে জুতোর খুট্-খুট্ শব্দ করে আমরা সবেগে বসার ঘরে ঢুকে পড়লাম। আমার বাবা ও ভাই আমাকে কখনও এত জোরে আর এত খুশিতে হাসতে দেখে নি; অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে তারাও হো-হো করে হেসে উঠল।

ঝড়ে মেঘ উড়ে গেছে, বাজ পড়ার শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না. কিন্তু পিয়োতর সের্গেয়েভিচের দাড়িতে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো এখনও চিক্‌চিক্ করছে। রাতের খাবার সময় পর্যন্ত সারাটা সন্ধ্যা সে গান করল, শিস্ দিল, আমাদের কুকুরটার সঙ্গে হৈ-চৈ করে খেলল, এ-ঘর থেকে সে-ঘরে এমনভাবে তাকে তাড়া করতে লাগল যে আর একটু হলেই সামোভার হাতে নিয়ে আসার সময় চাকরটিকেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত। খেতে বসে সে একগাদা খেল, আজেবাজে বকল আর বলল-শীতকালে যদি কাঁচা শসা খাও তাহলে তোমার নিঃশ্বাসে বসন্তের ঘ্রাণ ছড়াবে।

শোবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আমি মোমবাতিটা ধরালাম, জানালাটা সপাটে খুলে দিলাম, আর আমার মন-প্রাণ এক অনির্বচনীয় আবেগে ভরে উঠল। আমি মুক্ত, আমার স্বাস্থ্য ভাল, আমার মর্যাদা আছে, অর্থ আছে। আমি ভালবাসা পেয়েছি, আর সব চাইতে বড় কথা আমার মর্যাদা আছে, অর্থ আছে—মর্যাদা ও অর্থ হে ঈশ্বর, কী যে ভাল লাগছে! তারপর—হিম পড়ার দরুণ বাগান থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসায় বিছানায় শুয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমি বুঝতে চেষ্টা করলাম পিয়োতর সের্গেয়েভিচের প্রতি আমার অনুভূতির স্বরূপটা কি—আমি কি তার প্রেমে পড়েছি? কিন্তু কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে বিছানার উপর কাঁপা-কাঁপা রোদ আর লেবু গাছের ছায়া দেখেই গত রাতের স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে মনের সামনে ভেসে উঠল। জীবনটাকে মনে হ'ল কত সমৃদ্ধ, কত বৈচিত্র্যপূর্ণ, কত জাদুতে ভরা। একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে তাড়াতাড়ি পোশাক পরে ছুটে চলে গেলাম বাগানে...

তারপর কি হল? তারপর কিছুই হ'ল না। শীতকালে আমরা যখন শহরে বাস করছিলাম, তখন পিয়োতর সের্গেয়েভিচ বারকয়েক আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। গ্রামে থাকতে যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় তারা শুধু গ্রামেই মনকে টানে, আর তাও গ্রীষ্মকালে, কিন্তু শহরে এবং শীতকালে তাদের আকর্ষণ অর্ধেক কমে যায়। শহরে তুমি যখন তাদের চা দাও তখন তোমার চোখ পড়ে তাদের ফ্রক-কোটের উপর, মনে হয় সেগুলো ধার-করা; আর কাপের চিনিটা নাড়তে তারা বড় বেশী সময় নষ্ট করে। শহরে এসেও পিয়োতর সের্গেয়েভিচ মাঝে মাঝে ভালবাসার কথা বলত, কিন্তু সেটা মোটেই আগেকার মত করে নয়। শহরে দু'জনের মাঝখানের দেয়ালটাকে

বড় বেশী চোখে পড়তঃ আমার মর্যাদা আছে, অর্থ আছে, আর সে গরীব, সম্ভ্রান্ত মানুষও নয়, এক ছোট যাজকের ছেলে, একজন কার্যকরী বিচারক, বাস—ঐ পর্যন্তই। আর আমরা দু'জনই —আমি আমার যৌবনের জন্য, আর ঈশ্বর জানেন সে কিসের জন্য—ভাবলাম যে এই দেয়ালটা বড় বেশী উঁচু ও নিরেট; শহরে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে হয় সে উঁচু সমাজের সমালোচনা করত অথবা অন্য লোক উপস্থিত থাকলে মুখ গোমড়া করে চুপচাপ বসে থাকত। এমন কোন নিরেট দেয়াল নেই যাকে ভাঙা যায় না, কিন্তু আমাদের আধুনিক প্রেমিকরা—আমি যতটা তাদের চিনি—বড় বেশী ভীরু, নিস্তেজ, অলস ও বিশ্বাসের অযোগ্য; বড় বেশী দ্রুত তারা এই ধারণার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে যে প্রেমের ব্যাপারে তারা ব্যর্থ হয়েছে, সেক্ষেত্রে জীবন তাদের প্রতারণা করেছে। তারা সংগ্রাম করে না, কেবলই জগৎটাকে নীচতার অভিযোগে সমালোচনা করে; তারা ভুলে যায় তাদের এই সমালোচনাই ধীরে ধীরে হীন পরশ্রীকাতরতায় পরিণত হয়।

আমি ভালবাসা পেয়েছিলাম, সুখ ছিল আমার হাত পেতে নেবার অপেক্ষায়, মনে হয়েছিল ভালবাসা আমার গলা ধরে দাঁড়িয়েছিল; পৃথিবীতে আমি নিশ্চিন্তে বাস করছিলাম, নিজেকে বোঝার চেষ্টা পর্যন্ত করি নি, কিসের জন্য প্রতীক্ষা করেছিলাম বা জীবনের কাছে কি প্রত্যাশা ছিল তাও জানতাম না। সময় কিন্তু থেমে থাকল না, বয়েই চলল...আমার অবস্থা দাঁড়াল অন্য অনেকেরই মতঃ যারা আমাকে ভালবাসত, রৌদ্রোজ্জ্বল দিনগুলি আর আতপ্ত রাতগুলি, সঙ্গীতমুখর নাইটিঙ্গেল পাখিরা, সদ্য-কাটা খড়ের সুঘ্রাণ, যার স্মৃতিও সতত সুখের, বড়ই প্রিয়—সবই অতি দ্রুত দূরে চলে গেল, কুয়াশার মত নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল।...তারা সব কোথায় গেল?

আমার বাবা মারা গেল; আমার বয়স বাড়ল। এতদিন যা কিছু ভালবাসতাম, যা কিছু আমার কানে মধু ঢালত, আমাকে আশা দিত—সশব্দ বর্ষণ, বজ্রের গর্জন, সুখের স্বপ্ন, ভালবাসার কথা—সবই আজ একটি স্মৃতিমাত্র...সামনে দেখছি কেবল একটি সমতল জনহীন পথ, আর দূর দিগন্তে ভয়ংকর অন্ধকার...।

দরজায় ঘণ্টা বাজল...হয়তো পিয়োতর সের্গেয়েভিচ এসেছে। শীতকালে যখন গাছগুলির দিকে তাকাই আর মনে পড়ে গ্রীষ্মকালে আমার জন্যই গাছে নতুন পাতা গজিয়েছিল, তখন চুপি চুপি বলি ঃ "ওঃ, আমার আদরের ধন!" আর যে সব মানুষের সঙ্গে আমার জীবনের বসন্তকালটা কাটিয়েছি তাদের দেখলে আমি দুঃখ পাই, বিচলিত হই, আর চুপি চুপি ঐ একই কথা বলি।

আমাব বাবার পৃষ্ঠপোষকতায় পিয়োতর সের্গেইচ অনেক দিন আগেই শহরে বদলি হয়েছে। তাকে কিছুটা বড় দেখাচ্ছে, মুখটা সামান্য শুকিয়ে গেছে। অনেক দিন হয়ে গেল সে আব বলে না যে সে আমাকে ভালবাসে, সে আর আজেবাজে কথা বলে না, নিজের কাজকর্মও তার ভাল লাগে না,

কিসের যেন দুঃখ তার মনে, কিসের ভ্রান্তি যেন তার ঘুচে গেছে ; জীবনের কাছে তার কোন প্রত্যাশা নেই, সে বেঁচে আছে গতানুগতিকভাবে। সে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসল, নিঃশব্দে এক দৃষ্টিতে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল। কি বলব বুঝতে না পেরে শুধালাম ঃ

''কি হয়েছে ?''

''কিছু না...''

আমরা দু'জনই আবার চুপ। অগ্নিকুণ্ডের লাল আলোটা তার বিষণ্ণ মুখের উপর লাফাতে শুরু করল।

অতীতকে মনে পড়ল, আর হঠাৎই আমার কাঁধ দুটো কেঁপে উঠল, মাথাটা ঢলে পড়ল, আমি তিক্ত কান্নায় ভেঙে পড়লাম। নিজের জন্য, এই মানুষটির জন্য একটা অসহ্য দুঃখ বুকের মধ্যে গুমরে উঠল ; যে ভালবাসা চলে গেছে, যে ভালবাসা থেকে জীবন আমাদের বঞ্চিত করেছে, একান্তভাবে তাকেই পেতে চাইলাম। আমার মর্যাদা, আমার অর্থ—সে সব চিন্তা আজ মন থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।

উচ্চস্বরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাথাটা চেপে ধরে ভেঙে ভেঙে বলে উঠলাম ঃ

''হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, জীবনটা ধ্বংস হয়ে গেল, ধ্বংস হয়ে গেল...''

একটি কথাও না বলে সে বসে রইল ; আমাকে বলল না ঃ ''কেঁদো না।'' সে বুঝতে পেরেছে, আমাকে কাঁদতেই হবে, কাঁদার সময় হয়েছে। তার চোখ বলল, আমার জন্য সে দুঃখিত ; আমিও তার জন্য দুঃখিত ; আমার জন্য বা তার নিজের জন্য সে যে একটা জীবন গড়ে তুলতে পারে নি তার এই ভীরু পরাজয়ের জন্য আমি বিরক্ত।

তবে যাবার সময় হলে আমার মনে হল, হল-ঘরে ওভারকোটটা পরে নিতে সে ইচ্ছা করেই দেরী করেছে। মুখে কিছু না বলে সে দু'বার আমার হাতে চুমো খেল, আমার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। হয়তো তারও মনে পড়েছিল সেই বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়, সেই তীর্যক বারিধারা, দু'জনের একসঙ্গে হেসে ওঠা, আব আমার তখনকার মুখটা। আমাকে কিছু বলতেও চেয়েছিল, বলতে পারলে সে খুশিই হত, কিন্তু কিছুই সে বলল না, কেবলই মাথা নাড়ল,আর শক্ত করে আমার হাত ঝাঁকুনি দিল। তার কথা এখানেই শেষ।

তাকে বিদায় করে দিয়ে পড়ার ঘরে ফিরে এলাম। আবার আগুনের সামনে বসলাম। লাল কয়লাগুলো ছাইয়ের আবরণে ঢাকা পড়েছে, ধীরে ধীরে নিভে আসছে। বাইরে আরও তীব্রবেগে বরফ পড়ছে, চিমনির মুখে শুরু হয়ে গেছে বাতাসের বিষণ্ণ সঙ্গীত।

পরিচারিকা ঘরে ঢুকল ; আমি ঘুমিয়ে পড়েছি মনে করে আমাকে ডাকল...

১৮৮৭

জ্বরবিকার

Typhus



পিতার্সবার্গ থেকে মস্কোযাত্রী মেল ট্রেনের ধূমপান-কামরায় লেফ্‌টেন্যাণ্ট ক্লিমভ একজন যাত্রী। তার মুখোমুখি বসে ছিল একটি বয়স্ক মানুষ; জাহাজী নাবিকের মত পরিষ্কার করে কামানো মুখ; দেখেই বোঝা যায় কোন ফিনল্যাণ্ড অথবা সুইডেনের অধিবাসী কোন ধনবান লোক। জাহাজটা পিতার্সবার্গ থেকে ছাড়ার পর থেকেই সে একটানা পাইপ টানছে আর একই বিষয় নিয়ে কথা বলছে।

''তাহলে...তাহলে তুমি একজন অফিসার। আমার ভাইও অফিসার, তবে সে একজন নাবিক মাত্র...সে একজন নাবিক, কাজ করে ক্রন্সতাদ-এ। মস্কোতে যাচ্ছ কেন?''

''সেখানেই আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে।''

''বটে...তুমি বিয়ে করেছ?''

''না, আমার মাসি ও বোনকে নিয়ে থাকি।''

''আমার ভাইও অফিসার। একজন নাবিক, তবে সে বিবাহিত, তার স্ত্রী ও তিনটি সন্তান আছে। তাহলে...''

ফিন্ ভদ্রলোকটি সব সময় সব কিছুতেই যেন অবাক হয়ে যায়। আবার যখনই বলে ওঠে ''তাহলে!'' তখনই একটি অর্থহীন বিস্ফারিত হাসিতে তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আর মিনিটে-মিনিটে চুরুটে টান দিতে থাকে। ক্লিমভ অসুস্থ, এত সব প্রশ্নের উত্তর দিতে তার কষ্ট হচ্ছে; তাছাড়া ফিন্ লোকটিকে সে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে ঘৃণা করতে শুরু করেছে; তার ইচ্ছা হচ্ছিল লোকটার হাত থেকে জ্বলন্ত চুরুটটাকে কেড়ে নিয়ে সিটের নীচে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আর লোকটিকে অন্য কোন কামরায় জোর করে তাড়িয়ে দেয়।

সে ভাবছিল, ''এই সব ফিন্‌রা আর...গ্রীকরা বড় বাজে লোক। একেবারেই ফালতু, কারও কোন কাজে লাগে না, যত সব বাজে লোক। অথচ জগতের অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসে আছে! তারা কোন্ কাজটা করে?''

ফিন্ ও গ্রীকদের চিন্তায় তার সারা দেহ কেমন যেন গুলিয়ে উঠল। তুলনা করার জন্য সে ফরাসী ও ইতালীয়দের কথা ভাবল, কিন্তু যে কারণেই হোক তার মনের সামনে ভেসে উঠল অর্গান-বাদকের দল, উলঙ্গিনী নারী, বিদেশী তৈলচিত্রকরদের সেই সব ছবি যা তার মাসির ঘরের দেরাজ-আলমারির উপর ঝোলানো থাকে।

মোদ্দা কথা, যুবক অফিসারটি কেমন যেন অস্বাভাবিক বোধ করছে।

পুরো সিটটাই তার, কিন্তু তার হাত-পাগুলো যেন তার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না ; মুখটা শুকনো ও চটচটে লাগছে, মাথাটা ভারী কুয়াশায় ভরে উঠেছে ; মনে হচ্ছে তার চিন্তা-ভাবনাগুলি যেন কেবল তার মাথার মধ্যেই নয়, তার বাইরে আসনগুলি ও যাত্রীদের মাঝখানে কোথাও রাতের অন্ধকারে ঘোরাফেরা করছে। মাথার ভিতরকার কুজ্‌ঝটিকার ভিতর দিয়ে সে যেন ঘুমের মধ্যেই শুনতে পেল বহুকণ্ঠের অস্পষ্ট আওয়াজ, চাকার ঘর্ঘর শব্দ, দরজা বন্ধ করার খট্‌খট্‌ আওয়াজ। ঘণ্টার ধ্বনি, কণ্ডাক্টরের বাঁশী, প্লাটফর্মের উপর যাত্রীদের ব্যস্ত আসা-যাওয়া, সবই অস্বাভাবিক ঘন ঘন কানে আসছে। সময় দ্রুত উড়ে চলেছে সকলের অলক্ষ্যে ; তাই তার মনে হতে লাগল ট্রেনটা যেন প্রতি মিনিটেই থেমে যাচ্ছে আর ধাতব কণ্ঠগুলি বেজে উঠছে ঃ

''মেলগাড়ি প্রস্তুত ?''

''প্রস্তুত।''

মনে হচ্ছে, চুল্লীর লোকটি ঘন ঘন কামরায় ঢুকছে থার্মোমিটারটা দেখতে, আর চলমান ট্রেনের গর্জন ও সেতুর উপর চাকাগুলির ঘর্ঘর শব্দ অবিরাম বেজে চলেছে। হৈ-হট্টগোল, হুইসল, ফিন্‌ লোকটি তামাকের গন্ধ—এই সব কিছু কতকগুলি ভ্রূকুটিকুটিল ভীতিপ্রদ অস্পষ্ট মূর্তির সঙ্গে মিলে মিশে একটি অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক দুঃস্বপ্নের রূপ ধারণ করেছে। ভয়ংকর যন্ত্রণায় ক্লিমভ ভারী মাথাটা তুলল, লণ্ঠনটার দিকে তাকাল, জল চাইবার ইচ্ছাও হল, কিন্তু তার শুকনো জিভটা একতিল নড়ল না, আর ফিন্‌ লোকটির প্রশ্নের উত্তর দেবার শক্তিও তার হল না। আরও একটু আরামদায়ক অবস্থায় শুয়ে ঘুমতে চেষ্টা করল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। ফিন্‌ লোকটি বারকয়েক ঘুমোল, জাগল, পাইপটা ধরাল, ''তাহলে'' বলে ক্লিমভের দিকে মুখ ঘোরাল, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ল, আর এদিকে ক্লিমভের পা দুটি কিছুতেই আসনের সঙ্গে খাপ খেল না, আর সেই ভীতিপ্রদ মূর্তিগুলো তখনও তার দিকে তাকিয়েই রইল।

স্পিরেভো স্টেশনে পৌঁছে সে রেস্তোরাঁয় ঢুকল একটু জল খেতে। কয়েকটি লোক একটা টেবিলে বসে অতি দ্রুত খেয়ে চলেছে।

বাতাসে ভাজা মাছের গন্ধ সে খেয়াল করল না, চর্বণরত চোয়ালগুলোর দিকে ফিরেও তাকাল না, কারণ দুই-ই তার কাছে সমান বিবমিষার কারণ স্বরূপ ; ভাবল, ''এরা খেতে পারে কেমন করে!''

একটি সুন্দরী মহিলা উচ্চ কণ্ঠে জনৈক অফিসারের সঙ্গে আলাপ করছে আর নিজের সুন্দর দাঁতগুলি দেখিয়ে হাসছে। কিন্তু তার হাসি, তার দাঁত, মহিলাটি স্বয়ং-সব কিছুই শূকর-মাংস ও ভাজা মাংসের বলের মতই অস্বস্তিকর। তার পাশে বসে থাকতে, তার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে অফিসারটি কি ভয় পাচ্ছে না ?

জল খেয়ে ট্রেনে এসে ওঠার পরেও সে দেখল, ফিন্‌ লোকটি বসে বসে ধূমপান করছে। তার পাইপ থেকে হুস্‌-হুস্‌ হাস্‌-হাস্‌ শব্দ হচ্ছে, ঠিক বর্ষার

দিনের ছেঁড়া রবারের জুতোর শব্দের মত।

"তাহলে!" হঠাৎ লোকটি অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "এটা কোন্ স্টেশন?"

"আমি জানি না", ক্লিমভ শুয়ে শুয়েই জবাব দিল; পাছে তামাকের ধোঁয়ার কটু গন্ধ নাকে যায় তাই সে মুখটা বন্ধ করে রাখল।

"কখন আমরা 'তিভের' পৌঁছব?"

"আমি জানি না। আমি দুঃখিত, কিন্তু আমি উত্তর দিতে পারছি না। আমি অসুস্থ। আজ সকালেই আমার সর্দি হয়েছে।"

ফিন্ লোকটি জানালার ফ্রেমে পাইপটা ঠুকে তার নাবিক ভাইয়ের গল্প বলতে শুরু করল। ক্লিমভ মোটেই সে সব শুনছে না, বরং গভীর আবেশে স্মরণ করছে তার নরম, আরামদায়ক বিছানা, তার পাশে টেবিলের উপর রাখা ঠাণ্ডা জলের কাঁচের পাত্রটি, আর তার বোন কাতিয়ার কথা; তার মনে পড়ল, অসুখ করলে কাতিয়া তার গায়ে কত নরম করে হাত বুলিয়ে দিত, আরামের ব্যবস্থা করত, জলের গ্লাসটাও হাতের কাছে এগিয়ে দিত...এমন কি আর্দালি পাভেল যে মনিবের পা থেকে ভারী বুটজোড়া খুলে দিত, বিছানার পাশে টেবিলের উপর ঠাণ্ডা জলের কাঁচের পাত্রটা রেখে দিত, সে কথা মনে করেও মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। সে ভাবল, আহা, এ সময় নিজের বিছানায় শুয়ে সে যদি এক গ্লাস জল খেতে পারত, তাহলেই এই দুঃস্বপ্নটা কেটে যেত, গভীর ঘুমে সে ডুবে যেতে পারত।

দূর থেকে ভেসে এল একটা চাপা কণ্ঠস্বর, "মেল কি প্রস্তুত?"

"প্রস্তুত!" মনে হল ঠিক যেন জানালার নীচ থেকেই কেউ জবাবটা দিল।

স্পিরোভোব পরে আরও দু'তিনটে জায়গায় এরই মধ্যে ট্রেনটা থেমেছে।

সময় দ্রুত উড়ে চলেছে, মনে হচ্ছে ঘণ্টার শব্দ, হুইসল, ট্রেনের বিরতি—এ সব যেন অনন্ত কাল ধরে চলবে। হতাশ হয়ে ক্লিমভ বার্থের এক কোণে মুখ গুঁজল, দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরল, আবার ভাবতে লাগল বোন কাতিয়া ও আর্দালি পাভেলের কথা; কিন্তু বোন ও আর্দালির মুখ অন্য সব অস্পষ্ট ছবির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে এক সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার গরম নিঃশ্বাস আসনের পিছনে পড়ে ছিটকে এসে তার মুখটাকেই পুড়িয়ে দিচ্ছে, পা দুটো আবার অস্বস্তিকর লাগছে, জানালা দিয়ে ঢুকে ঠাণ্ডা বাতাস লেগে তার পিঠটা কনকন করছে, কিন্তু যত খারাপই লাগুক এখন আর সে পিঠটা সরাতেই চাইল না। একটু একটু করে ভারী দুঃস্বপ্নের আবেশ তাকে ঘিরে ধরল, তার হাত-পাগুলোকে অবশ করে ফেলল।

আবার যখন কোন রকমে মাথাটা তুলল, তখন সারা কামরায় দিনের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। যাত্রীরা ওভারকোট পরে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ট্রেনটা থেমে আছে। ব্যাজ-লাগানো সাদা এপ্রন-পরা কুলিরা যাত্রীদল ও তাদের

মালপত্র ঘিরে জটলা করছে। ক্লিমভও গ্রেটকোটটা গায়ে দিয়ে আপনা থেকেই অন্য যাত্রীদের পিছন-পিছন কামরা থেকে নেমে পড়ল; তার মনে হল প্যাসেজ দিয়ে সে নিজে হাঁটছে না, তার বদলে হাঁটছে অপরিচিত কেউ; জ্বর, তৃষ্ণা, আর সেই সব দুষ্ট ছবি যা তাকে সারা রাত জাগিয়ে রেখেছিল, সে সব কিছুই যেন তার সঙ্গে কামরা থেকে নেমে এসেছে। যন্ত্রের মতই মালপত্র নিয়ে সে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করল। ট্যাক্সিওয়ালা জানাল, পোভার্স্কায়া স্ট্রীটে যেতে সওয়া রুবল্ লাগবে; ক্লিমভ দরদাম না করেই স্লেজে উঠে বসল। তখনও সে একটা ছবি থেকে আরেকটা ছবিকে আলাদা করে চিনতে পারছে, কিন্তু এখন আর তার কাছে টাকার কোন দামই নেই।

বাড়িতে পৌঁছে মাসি ও ষোল বছরের বোন কাতিয়া তাকে স্বাগত জানাল। কাতিয়ার হাতে এক্সারসাইজ খাতা ও একটা পেন্সিল। তার মনে পড়ল, কাতিয়া শিক্ষক-শিক্ষণের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাদের প্রশ্নের ও স্বাগত সম্ভাষণের কোন জবাব না দিয়ে গরমে হাঁস-ফাঁস করতে করতে সে উদ্দেশ্যহীনভাবে সবগুলি ঘরের ভিতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে নিজের বিছানা পর্যন্ত পৌঁছেই বালিশের উপর এলিয়ে পড়ল। ফিন্ লোকটি, স্টেশন রেস্তোরাঁর অফিসারটি, সাদা দাঁতওয়ালা মহিলাটি, ভাজা মাংসের গন্ধ, ইতস্তত ছড়ানো আলোর বৃত্তগুলি—সব এসে ভিড় করল তার মনে, সে যে কোথায় আছে সেটাও বুঝতে পারছে না, চারদিকের আতংকগ্রস্ত কণ্ঠস্বরও তার কানে ঢুকল না।

যখন চেতনা ফিরে এল তখন দেখল, ঠিকমত পোশাক ছেড়ে সে নিজের বিছানাতেই শুয়ে আছে, কাঁচের জলের পাত্র ও পাভেলকেও দেখতে পেল, কিন্তু ঠাণ্ডা বা আরাম কোনটাই বোধ করল না। হাত-পাগুলোকে যেন কোনভাবেই ঠিক মত রাখা যাচ্ছে না, মুখের তালুতে জিভটা আটকে আছে, আর ফিন্ লোকটির পাইপের শব্দ তখনও কানে বাজছে। কালো দাড়িওয়ালা শক্ত-সমর্থ ডাক্তারটি চওড়া পিঠ দিয়ে পাভেলকে ঠেলে তার বিছানার পাশে নড়াচড়া করছে।

চাপা গলায় ডাক্তার বলল, "সব ঠিক আছে। চমৎকার, চমৎকার... দেখি, দেখি, গুতনিটা তোল তো ছেলে..."

ডাক্তারের দ্রুত অর্থহীন বকবকানি, তার ফুলো-ফুলো মুখ আর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে তাকে "ছেলে" বলে ডাকা, ক্লিমভকে ভীষণভাবে তিতিবিরক্ত করে তুলল।

সখেদে বলল, "আপনি কি আমাকে "ছেলে" বলেই ডাকবেন? এত মাখামাখি কিসের জন্য? যত সব!"

নিজের কণ্ঠস্বর শুনে ক্লিমভ নিজেই ভয় পেল। তার গলার স্বরটা কত শুকনো, ক্ষীণ ও কাঁপা—এতই বদলে গেছে যে চেনাই যায় না।

মোটেই অসন্তুষ্ট না হয়ে ডাক্তার বলতে লাগল, "চমৎকার, চমৎকার। রাগ করো না...ঠিক আছে, ঠিক আছে..."

ট্রেনের মতই বাড়িতেও সময় যেন উড়ে চলল। তার শোবার ঘরে কখনও আলো, কখনও অন্ধকার। ডাক্তার একবারও তার বিছানা ছেড়ে গেল না, ক্লিমভকে অনবরত শুনতে হল তার মুখের বাজে কথাটা ঃ ''দেখি...দেখি।'' লোকজন সীমাহীন লাইন করে ঘরের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করছে। সে দলে আছে পাভেল, ফিন্ লোকটি, ক্যাপ্টেন ইয়ারোশেভিচ, সার্জেন্ট-মেজর ম্যাক্সিমেংকো, স্টেশন-রেস্তোরাঁর অফিসার, সাদা দাঁতের মহিলা, আর শক্ত-সমর্থ ডাক্তার। সকলেই কথা বলছে, হাত-পা নাড়ছে, ধূমপান করছে, খাচ্ছে। দিনের আলোয় ক্লিমভ একবার সেনাবাহিনীর পুরোহিত ফাদার আলেক্সান্দারকেও দেখেছিল ; তার পরনে পুরোহিতের আলখাল্লা, হাতে প্রার্থনা—পুঁথি ; বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলে গেল ; তার মুখে তখন এমন একটা গম্ভীর ভাব ফুটে উঠল যেটা আগে সে কখনও দেখে নি। ক্লিমভের মনে পড়ল, ফাদার আলেক্সান্দার সব ক্যাথলিক অফিসারকেই বন্ধুত্বপূর্ণ ঠাট্টার ছলে ''প্যাপিস্ট'' বলে ডাকত, আর এখন তাকে হাসাবার জন্য ক্লিমভ চীৎকার করে বলল ঃ

''ফাদার, ঐ প্যাপিস্ট ইয়ারোশেভিচ জঙ্গলের দিকে পালিয়েছে।''

ফাদার আলেক্সান্দার স্বভাবতই হাসিখুশি মানুষ, ঠাট্টা-তামাসাতে সহজেই হেসে ওঠে কিন্তু এখন একটু মৃদু হাসি তো দূরের কথা, উল্টে বরং আরও বেশী গম্ভীর হয়ে সে ক্লিমভের উপর ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতে লাগল। রাত হলে দুটি ছায়ামূর্তি একের পর এক নিঃশব্দে আসা-যাওয়া করতে লাগল। তার মাসি ও বোনটি। যে ছায়ামূর্তিটি তার বোনের সে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করল ঃ বিগ্রহের সম্মুখে মাথা নোয়াল, তার কালো ছায়াটাও নত হল ; দুটি ছায়ামূর্তি একসঙ্গে প্রার্থনা করতে লাগল। ভাজা মাংস আর ফিনের পাইপের গন্ধ তখনও ছিল ; একবার ধূপের একটা কড়া গন্ধ ক্লিমভের নাকে এল। বমির উদ্রেক হওয়ায় বিছানার এপাশ-ওপাশ করে সে আর্তনাদ করে উঠল ঃ

''ধূপটা সরিয়ে নাও ! সরিয়ে নাও !''

কেউ সাড়া দিল না! সে শুধু শুনতে পেল, পুরোহিতরা কোথাও শান্ত গলায় গান করছে, আর কে একজন সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করছে।

যখন চেতনা ফিরল তখন ঘরে কেউ ছিল না। জানালার নামানো পর্দার ভিতর দিয়ে সকালের সূর্যের আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে ; কম্পিত সূর্যরশ্মি কাঁচের জলপাত্রটির উপর নাচছে। বাইরে গাড়ির চাকার খট্-খট্ আওয়াজ কানে এল—তার অর্থ এখন আর বরফ পড়ছে না। নৃত্যরত সূর্যরশ্মি, পরিচিত আসবাবপত্র ও দরজাটার দিকে তাকিয়ে সে হেসে উঠল। সেই মনের মত, খুশিভরা সুড়সুড়ি লাগা হাসিতে তার বুক ও পেট কাঁপতে লাগল। তার সমগ্র সত্ত্বা আপাদমস্তক প্রচণ্ড সুখের বেঁচে থাকার আনন্দের বন্যায় ডুবে গেল ; সে সুখের স্বাদ ইতিপূর্বে হয়তো পেয়েছিল এই পৃথিবীর প্রথম মানুষটি যেদিন সে এই পৃথিবীকে প্রথম দেখেছিল। ক্লিমভ আগ্রহভরে চাইল গতি, চাইল মানুষ, চাইল কথা বলতে। তার শরীর নিশ্চল, চিৎ হয়ে

শুয়ে আছে, কেবল হাত দুটি নড়ছে, কিন্তু এ সব তার নজরে পড়ল না, তার মনোযোগ আটকে রইল ছোট ছোট জিনিসে। শ্বাস-প্রশ্বাসে আনন্দ, হাসিতে আনন্দ, কাঁচের জলের পাত্রটিতে আনন্দ, আনন্দ সিলিংয়ে, সূর্যরশ্মিতে, পর্দার দড়িটাতে। পৃথিবীটা সুন্দর, উত্তেজনাময়, মহান, চার দেয়ালে ঘেরা ছোট ঘরটার এই বৃদ্ধ পরিবেশেও। ডাক্তার যখন এল ক্লিমভ তখন ভাবছে ওষুধ বস্তুটি কী আশ্চর্য, ডাক্তারটি কত ভাল ও দয়ালু, আর মানুষ মাত্রই কত ভাল আর আগ্রহের বস্তু।

"দেখি, দেখি...চমৎকার, চমৎকার...এখন আমরা সকলেই ভাল... দেখি, দেখি,..." ডাক্তার যথারীতি তার কথাগুলি আউড়ে গেল।

ক্লিমভ কান পেতে শুনল আব প্রাণভরে হাসল। তার মনে পড়ল, ফিন্ লোকটি সাদা দাঁতের মহিলাটি, শূকর মাংসের কথা ; সেও যেন অনুভব করল ধূমপানের ইচ্ছা আর কিছু খাবার ইচ্ছা!

"ডাক্তার দয়া করে আমার আর্দালিকে বলুন না, আমাকে একটুকরো নুন মাখানো যইয়ের রুটি ও কিছু সার্ডিন এনে দিক।"

ডাক্তার কিছু বলল না। পাভেলও খাবার আনতে গেল না। এটা অসহ্য। ক্লিমভ বখে-যাওয়া ছেলের মত কাঁদতে শুরু করল।

"কাঁদুনে খোকা।" ডাক্তার হেসে বলল।

ক্লিমভও হেসে উঠল। আর ডাক্তার যখন চলে গেল তখন সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তার ঘুম ভাঙল সেই একই আনন্দ ও সুখের অনুভূতি নিয়ে। বিছানার পাশে তার মাসি বসে ছিল।

মাসিকে দেখে খুশি হয়ে সে বলল, "ওঃ, মাসি তুমি! আচ্ছা মাসি, আমার কি হয়েছে?"

"জ্বরবিকার।"

"বটে! এখন আমি ভাল আছি, খুব ভাল। কাতিয়া কোথায়?"

"সে বেরিয়ে গেছে। পরীক্ষার পরে বাড়ি ফেরার পথে নিশ্চয় আর কোথাও গেছে।"

এই কথা বলে মাসি আবার মাথা নীচু করে সোজা বোনায় মন দিল। তার ঠোঁট কাঁপছে, সে সরে গেল, তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল! অসহায় শোকে ডাক্তারের নির্দেশ ভুলে গিয়ে কেঁদে কেঁদে বলল ঃ

"ওঃ কাতিয়া! কাতিয়া সোনা! আমাদের স্বর্গের পরীটি আর নেই! নেই!"

বোনাটা তার হাত থেকে পড়ে গেল ; উপুড় হয়ে সেটা তোলার চেষ্টা করতেই তার বনেটটা মাথা থেকে খুলে পড়ে গেল। মাসির পাকা চুলের দিকে তাকিয়ে কিছুই বুঝতে না পেরে ক্লিমভ কাতিয়ার জন্য ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করল ঃ

"কিন্তু সে কোথায় মাসি?"

বোন-পোটিকে রেহাই দেবার কথা ভুলে গিয়ে এবং নিজের ভয়ংকর

কথাটিকেই মাত্র মনে রেখে সে তাকে বলল ঃ

"তোমার ছোঁয়া থেকেই সে রোগটা পেল...আর মারাও গেল। গত পরশু দিনই তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।"

এই ভয়াবহ প্রাণঘাতী সংবাদটি ক্লিমভের মন পুরোপুরিই বুঝতে পারল, কিন্তু সংবাদটা যত ভয়ানকই হোক না কেন তার এত শক্তি ছিল না যাতে রোগমুক্তির যে আনন্দে যুবকের মনটা কানায় কানায় ভরে উঠেছে তাকে পরাভূত করতে পারে। সে কাঁদল, সে হাসল, আর একটু পরেই তাকে কিছু খেতে না দেওয়ায় শাপ-শাপান্ত শুরু করল।

এক সপ্তাহ পরে ড্রেসিং-গাউন পরে পাভেলের কাঁধে ভর দিয়ে সে হেঁটে হেঁটে জানালাটার কাছে গেল, মেঘে ঢাকা বসন্তের আকাশের দিকে তাকাল, আর তার কানে এল বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়া গাড়ি-বোঝাই পুরনো লোহা-লক্কড়ের ঝড়ঝড়ে আওয়াজ, তখনই তার হৃৎপিণ্ডটা ব্যাথায় মুচড়ে উঠল, কান্নায় ভেঙে পড়ে সে কপালটাকে চেপে ধরল জানালার ফ্রেমের উপর।

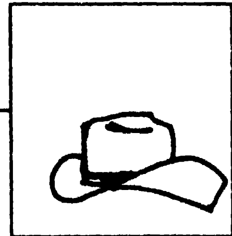
চাপা গলায় বলল, "আমি হতভাগ্য! হে প্রভু, একটা মানুষ এত বড় দুর্ভাগা কেমন করে হতে পারে!"

আর তার সুখের অনুভূতিকে ছাপিয়ে তার সাধারণ বিরক্তি ও অপূরণীয় ক্ষতির বেদনাই তার কাছে বড় হয়ে উঠল।

১৮৮৭

গোয়েন্দা

The Criminal Investigator



বসন্তকালের একটি সুন্দর দিনে আঞ্চলিক ডাক্তার ও জনৈক গোয়েন্দা একত্রে গাড়ি হাঁকিয়ে একটি গ্রামে যাচ্ছিল ময়নাতদন্তে। গোয়েন্দার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ঘোড়াগুলির দিকে তাকিয়ে সে ডাক্তারকে বলল ঃ

"প্রকৃতিতে এমন অনেক কিছু আছে যা রহস্যময় ও দুর্বোধ্য, কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনেও প্রায়ই এমন কিছু ঘটে যাকে ব্যাখ্যা করাই যায় না। আমি বেশ কয়েকটি অদ্ভুত, হতবুদ্ধিকর মৃত্যুব কথা জানি যার কারণ কেবলমাত্র অতীন্দ্রিয়বাদীরা অথবা যোগীরাই ব্যাখ্যা করতে পারে, আর যে কোন সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই সে চেষ্টা করলে ব্যর্থ হতে বাধ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,— আমি এমন একটি সংস্কৃতিবতী মহিলাকে জানতাম যে তার নিজেব মৃত্যু দিনটি আগেই ঘোষণা করেছিল, আর কোন আপাত কারণ ছাড়াই সেই ঘোষিত দিনেই তার মৃত্যু হয়। সে বলেছিল সে অমুক দিন মারা যাবে, আর

সেই দিনটাতেই সে মারা গেল।''

ডাক্তার বলল, ''কারণ ছাড়া কোন কার্য হয় না। যদি সে মারা গিয়ে থাকে তো তার একটা কারণ থাকতেই হবে। আর সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করাটাও যে অসাধারণ কিছু নয় তাও আপনি জানেন! রাশিয়ার সব নারী, মহিলা ও গ্রাম্যবধূরাই ভবিষ্যদ্বাণী ও পূর্ববোধের ক্ষমতার অধিকারিণী।''

''তা হতে পারে, কিন্তু ডাক্তার, আমার এই মহিলার ব্যাপারটা একটু বিশেষ ধরনের। তার ভবিষ্যদ্বাণী ও তার মৃত্যুর মধ্যে গ্রাম্য বধূর পূর্বাভাষ অথবা একটি মহিলার উদ্ভট কল্পনার কোনটাই ছিল না। এই মহিলাটি ছিল যুবতী, স্বাস্থ্যবতী, বুদ্ধিমতী ও পূর্বসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তার চোখ দুটি ছিল সতর্ক, স্পষ্ট ও সৎদৃষ্টিসম্পন্ন;তার মুখখানি ছিল খোলামেলা ও অর্থবহ, চোখে ও ঠোঁটে ছিল রুশসুলভ মৃদু হাসি। নারী হিসেবে তার একটিমাত্র ত্রুটি ছিল...যদি সেটাকে ত্রুটি বলতে চান—সেটা হল তার রূপ। সে ছিল দূরের ওই বার্চ গাছটার মতই ক্ষীণতনু ও সুগঠনা, তার কেশরাশি ছিল আশ্চর্য! যাতে সে আপনার কাছে একটা হেঁয়ালি না হয়ে ওঠে তাই আপনাকে বলছি, তার প্রসন্নতার প্রাচুর্য ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকার ক্ষমতা ছিল অনুকরণযোগ্য; আর সেরকম বুদ্ধিদীপ্ত, সুখী হাল্কা-মানসিকতা আপনি খুঁজে পাবেন কেবলমাত্র চিন্তাশীল, সরল-হৃদয়, আমোদ প্রবণ মানুষের মধ্যে। কাজেই অতীন্দ্রিয়বাদ, অলৌকিকতাবাদ, ভবিষ্যদ্বাণীর গুণ অথবা ঐ ধরনের ক্ষমতা দিয়ে সে কি করবে? সে সব কিছুকে সে হেসে উড়িয়ে দিত।''

ডাক্তারের ট্র্যাপ একটা কূয়োর পাশে থামল। ডাক্তার ও গোয়েন্দা প্রাণভরে জল খেয়ে শরীরের আড়মোড়া ভেঙে অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে কোচোয়ান ঘোড়া দুটোকে জল খাওয়ানো শেষ করবে।

ট্র্যাপ পুনরায় চলতে আরম্ভ করলে ডাক্তার শুধাল, ''আচ্ছা, সেই মহিলা তাহলে কিসে মারা গেল?''

''সে মারা যায় খুব অদ্ভুতভাবে। একদিন তার স্বামী মহিলাটির ঘরে ঢুকে বলল, তাদের পুরনো গাড়িটা বেচে দিয়ে আগামী বসন্তকালের জন্য একটা ভাল ও হাল্কা গাড়ি কিনলে কেমন হয়; তাদের পিছনের ঘোড়াটাকে বদলে দিয়ে এবং বব্‌চিন্‌স্কিকে (তাদের আর একটা ঘোড়ার নাম) সামনে জুতে দিলেই-বা কেমন হয়।''

সব কথা শুনে মহিলাটি বলল ঃ

''তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর,-কোনটাতেই আমার কিছু যায় আসে না। গ্রীষ্মকাল আসার আগেই আমি মরে কবরে যাব।''

স্বামী অবশ্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটু হাসল।

মহিলাটি বলল, ''আমি ঠাট্টা করছি না। সত্যি বলছি, অচিরেই আমি মারা যাব।''

''ঠিক কত দিনের মধ্যে?'

''সন্তান প্রসবের পরেই। এই শিশুর জন্ম দিয়েই আমি মরে যাব।''

স্বামী কিন্তু তার কথাকে কোন গুরুত্বই দিল না। পূর্বাভাষ অথবা পূর্বজ্ঞান এর কোনটাতেই তার বিশ্বাস ছিল না ; তাছাড়া স্বামীটি ভালভাবেই জানত যে তার অবস্থায় সব নারীই খামখেয়ালি হয়ে ওঠে এবং দুঃখের চিন্তায় ডুবে থাকতে ভালবাসে। একটা দিন কেটে গেল। স্ত্রী আবার তাকে বলল যে সন্তান জন্মাবার পরেই সে মারা যাবে। তারপর থেকে প্রতিদিনই সে ঐ একই কথা বলে চলল। স্বামীও কথাটা হেসে উড়িয়ে দিত, আর স্ত্রীকে বলত বোকা, মূর্ছারোগী ও ডাইনী-বিদ্যায় বিশ্বাসী। এদিকে আসন্ন মৃত্যুটা স্ত্রীর কাছে একটা অবিচল প্রত্যয়ে দাঁড়িয়ে গেল। স্বামী তার কথায় কান দিল না বলে সে রান্নাঘরে গিয়ে ধাই ও রাঁধুনিকেই তার আসন্ন মৃত্যুর কথাটা শোনাতে লাগল।

''ধাই-মা গো, আমি আর বেশী দিন বাঁচব না। যে মুহূর্তে আমার প্রসব হবে সেই মুহূর্তেই আমি মরে যাব। এত তাড়াতাড়ি মরবার ইচ্ছা আমার ছিল না, কিন্তু নিয়তির বিধান তো পাল্টানো যাবে না।''

স্বভাবতই ধাই ও রাঁধুনি কান্না শুরু করে দিত। বাড়িতে কোন অতিথি এলে—সে পুরোহিতের স্ত্রী হোক আর প্রতিবেশী জমিদার-বাড়ির গিন্নিই হোক—তাকেই সে এক কোণে ডেকে নিয়ে মনের কথা খুলে বলে—আর সেটা সব সময়েই তার আসন্ন মৃত্যুর কথা। কথাটা সে এতই গম্ভীর হয়ে, বিষণ্ণ হাসি হেসে রাগত মুখে বলে যে সেখানে কোনরকম যুক্তি-তর্কই চলে না। সে আগাগোড়াই বেশ কেতাদুরস্ত ছিল, কিন্তু এখন আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে সে আর নিজের চেহারা নিয়ে মাথা ঘামায় না, সব সময়ই নোংরা হয়ে থাকে ; সে গলা ছেড়ে হাসে না, পড়ে না, এমন কি স্বপ্নও দেখে না। তার চাইতেও বড় কথা, সে মাসিকে সঙ্গে নিয়ে কবরখানায় গেল, সেখানে নিজের কবরের জন্য একটা জায়গা পছন্দ করল, আর প্রসবের নির্দিষ্ট দিনের পাঁচ দিন আগেই একটা উইলও করল। অথচ ভেবে দেখুন, এ সবই করা হল যখন তার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল, অসুস্থতার তিলমাত্র চিহ্ন বা বিপদের ইঙ্গিতটুকুও ছিল না। সন্তান প্রসব একটা জটিল ব্যাপার, অনেক সময় মারাত্মকও হয়,কিন্তু যে মহিলাটির কথা বলছি সে বেশ ভালই ছিল আর ভয় পাবার মত কিছুই ছিল না। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কথা শুনে শুনে স্বামীর কান ঝালাপালা হয়ে উঠল এবং একদিন ডিনারে বসে মেজাজ গরম করে সে বলে উঠল ঃ

''দেখ নাতাশা, এই বাজে কথাগুলি বড় বেশীদিন ধরে চলছে না কি ?''

''এটা বাজে কথা নয়। আমি ভেবে-চিন্তেই বলছি।''

''রেখে দাও ! আমি বলছি, এই বোকার ভূমিকা বন্ধ কর, নইলে পরে এ নিয়ে তুমিই লজ্জাবোধ করবে।''

প্রসবকাল উপস্থিত হল। স্বামী শহর থেকে একজন ভাল ধাত্রী নিয়ে এল, এবং এটা তার স্ত্রীর প্রথম প্রসব হলেও সব কিছুই বেশ ভালভাবে

চলল। প্রসব হয়ে গেল। প্রসৃতি নবজাত শিশুটিকে দেখতে চাইল। শিশুটিকে দেখার পর বলল ঃ

"বেশ, এবার আমি মরতে পারি।"

"সে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিল, দুই চোখ বুজল, আর আধ ঘণ্টা পরেই দেহ রাখল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার জ্ঞান ছিল। সে যাই হোক, যখন তাকে জলের বদলে এক গ্লাস দুধ খেতে দেওয়া হল তখন সে চুপিচুপি বলল ঃ

"জল না দিয়ে আমাকে দুধ দিলে কেন?"

"তার পরে যা ঘটার তাই ঘটল। নিজের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই মহিলাটি মারা গেল।"

গোয়েন্দা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ঃ

"এবার এই মৃত্যুর একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করুন। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, এটা আমি বানাই নি, সত্যি সত্যি এটা ঘটেছিল।

ডাক্তার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ

"মহিলাটির শব-ব্যবচ্ছেদ করা উচিত ছিল।"

"কিসের জন্য?"

"মৃত্যুর কারণটা জানবার জন্য। আসলে সে তার ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যই মরে নি। খুব সম্ভব সে বিষ খেয়েছিল।"

"আমার জানতে ইচ্ছা করছে আপনি এ রকম একটা সিদ্ধান্তে এলেন কেমন করে?"

"আমি কোন সিদ্ধান্তে আসি নি, একটা অনুমান করছি মাত্র। স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা কি ভাল চলছিল?"

"হুম...খুব ভাল নয়। বিয়ের পর থেকেই তাদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি চলছিল। ঘটনাচক্রেই দুর্ভাগ্যজনক ষড়যন্ত্র বলা যেতে পারে। কি জানেন, স্বামীকে সে একটি বিশেষ মহিলার সঙ্গে হাতেনাতে ধরে ফেলে ...আবার এটাও সত্য যে মহিলাটি খুব তাড়াতাড়ি স্বামীকে ক্ষমাও করেছিল।"

"কোন্‌টা প্রথম ঘটেছিল, স্বামীর অবিশ্বস্ততা, না স্ত্রীর আসন্ন মৃত্যুর ধারণা?"

যেন এই প্রশ্নের আড়ালে কি লুকিয়ে আছে সেটা বোঝার চেষ্টাতেই গোয়েন্দা স্থিরদৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকাল।

একটু থেমে জবাব দিল, "দেখছি, মনে করার চেষ্টা করে দেখছি..." মাথার টুপিটা খুলে সে নিজের কপাল ঘষল। "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা, সেই গণ্ডগোলের কিছুদিন পর থেকেই সে আসন্ন মৃত্যুর কথা বলতে শুরু করে। হ্যাঁ, সেটা সত্যি।"

"তাহলেই বুঝুন, খুব সম্ভব তখনই সে বিষ খাবার সিদ্ধান্তটি নিয়েছিল, কিন্তু শিশুটিকে সে মারতে চায় নি, তাই সে আত্মহত্যার দিনটাকে নিরাপদ

প্রসব পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছিল।''

''না, তা হতে পারে না...সেটা অসম্ভব। আপনি তো জানেন,স্বামীকে সে ক্ষমা করেছিল।'

নিজের উত্তেজনাকে ঢাকবার জন্য গোয়েন্দা জোর করে হাসবার চেষ্টা করে একটা সিগারেট ধরাল।

সে আবার বলল, ''তা হতে পারে না, পারে না...এ সম্ভাবনাটা তো আমার মাথায়ই কোন দিন আসে নি...আর তাছাড়া...স্বামীর অপরাধটা শুনতে যত ভয়ংকর আসলে তা নয়...সে স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বস্ত হতে চায় নি, আসলে ব্যাপারটা ঘটে গেল আর কি ঃ সে বাড়ি ফিরছিল অনেক রাতে, একটু নেশাও ধরেছিল, মনটাও নরম ছিল, আর স্ত্রীটি আগে থেকে খাপ্পা হয়েই ছিল...বাড়িতে তিন দিনের জন্য অতিথি হয়ে এসেছিল একটি মহিলা, বাচাল ও নির্বোধ একটি তরুণী, আর দেখতেও ভাল নয়। বস্তুত, ব্যাপারটাকে অবিশ্বস্ততা বলাই যায় না। স্ত্রীও ব্যাপারটাকে নাকচ করে দিয়েছিল, শীঘ্রই তাকে ক্ষমাও করেছিল, আর কখনও কথাটা ওঠেও নি।''

''বিনা কারণে তো মানুষ মরে না,'' ডাক্তার বলল।

''সে কথা সত্য, কিন্তু তবু...এটা যে আত্মহত্যা তা আমি মনে করি না। কী আশ্চর্য, সে যে এভাবে মরতে পারে সেটা কখনও আমার মনে হয় নি। অন্য কারও মনে হয় নি। তার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হওয়াতে সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এটা যে আত্মহত্যা হতে পারে এটা কারও দূরতম কল্পনাতেই আসে নি। না, সে নিজের হাতে বিষ খেতে পারে না, কিছুতেই না!''

গোয়েন্দাটি বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। শব-ব্যবচ্ছেদ চলার সময়ও মহিলাটির আশ্চর্য মৃত্যুর চিন্তাটা তার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। ডাক্তার যা যা বলে যাচ্ছিল সেটা লিখতে লিখতে সে ভুরু কুঁচকে কপাল ঘষতে লাগল।

ডাক্তার যখন খুলিটা কেটে দুই ভাগ করে ফেলেছে তখন সে প্রশ্ন করল, ''একটা মানুষকে ধীরে ধীরে বিনা কষ্টে পনেরো মিনিটের মধ্যে মেরে ফেলতে পারে এমন বিষ কি আছে?''

''হ্যাঁ আছে, যেমন ধরুন মরফিন।''

''হুম...আশ্চর্য...মনে পড়ছে সেরকম একটা শিশি সে কাছে রাখত...কিন্তু তবু...''

ফেরবার পথে গোয়েন্দাটিকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, উত্তেজনায় সে নিজের গোঁফ কামড়াচ্ছিল, কোন কথাই বলতে চাইছিল না।

তারা এক শ' পাও হাঁটে নি তখনই ডাক্তার দেখল, গোয়েন্দাটি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে, যেন সে একটা উঁচু পাহাড় বেয়ে উপরে উঠছে। এক সময় থেমে গিয়ে অদ্ভুত, মাতালের মত চোখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে সে বলল ঃ

''হা ঈশ্বর, আপনার অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে...তাহলে এটা বড়ই

নিষ্ঠুর, অমানুষিক! স্বামীকে শাস্তি দিতে নিজেকে খুন! কিন্তু স্বামীর অপরাধ কি এতই প্রচণ্ড ছিল? হে ভগবান! আর এই ভয়ংকর ধারণাটাই বা আপনি আমার মাথায় কেন ঢোকালেন ডাক্তার?"

হতাশায় মাথাটা চেপে ধরে সে বলতে লাগল :

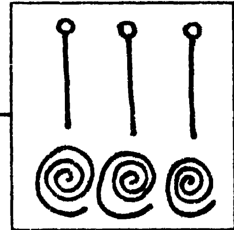
"আমি আপনাকে বলেছি আমার স্ত্রীর এবং আমার নিজের কথা। হে আমার ঈশ্বর! ঠিক আছে, আমি ভুল করেছি, তাকে অপমান করেছি, কিন্তু মরে যাওয়াটা তো ক্ষমা করার চাইতে সহজতর ছিল না? মেয়েদের তো ওই একটাই যুক্তি, নিষ্ঠুর, নির্দয় যুক্তি। ওঃ, সব সময়ই তাব মধ্যে একটা নিষ্ঠুরতার ছোপ ছিল, আগেও ছিল। এখন সব কিছুই মনে পড়ছে। এখন সব ব্যাপারটাই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।"

কথা বলতে বলতে সে হয় কাঁধে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল, না হয় তো মাথাটা চেপে ধরছিল, এই ট্রাপে উঠল তো আবার হাঁটিতে শুরু করল। ডাক্তার যে ইংগিতটা করেছে তার চিন্তাই তাকে স্তম্ভিত করেছে, তাব মনকে বিষাক্ত করে তুলেছে। সে একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, নৈতিক ও দৈহিক উভয় দিক থেকেই দুর্বল হয়ে পড়েছে। শহরে পৌঁছে ডাক্তারের সঙ্গে বসে একত্রে ডিনার খাবে বলে যে কথা দিয়েছিল সেটা রাখতে পারবে না বলে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে গোয়েন্দাটি সহযাত্রী ডাক্তারকে একলা রেখেই চলে গেল।

১৮৮৭

ভলোদিয়া

Volodya



কোন এক রবিবারের বিকেল পাঁচটা নাগাদ ভলোদিয়া নামে একটি রোগা, দুবল সতেরো বছরের অতি সাধারণ ছেলে শুমিখিনের গ্রীষ্মাবাসের কুঞ্জবনে বসে চোখের জল মুছছিল। তার বিষণ্ণ চিন্তাগুলি তিনটে ধারায় বয়ে যাচ্ছিল। প্রথম, আগামীকাল সোমবার তাকে অংকের পরীক্ষায় বসতে হবে; সে জানে যে সব সমস্যা তাকে দেওয়া হয়েছে সেগুলো সমাধান করতে না পারলে তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হবে, কারণ এর আগে সে ষষ্ঠ শ্রেণীতে দু'বছর কাটিয়েছে, আর এ বছরও বীজগণিতে খুবই কম নম্বর পেয়েছে। দ্বিতীয়, শুমিখিন পরিবারটি ধনী ও সম্ভ্রান্ত মানুষদের মতই অহংকারী; তাদের সঙ্গে বাস করাটা তার গর্বে বাধে। সে মনে করে মাদাম শুমিখিনা ও তার বোন-ঝিরা তাকে ও মামনকে গরিব আত্মীয় ও বোঝা বলে মনে করে, তারা মামনকে সম্মান করে না, তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। একদিন সে আড়াল থেকে শুনে ফেলেছে মাদাম শুমিখিনা বেদীর উপর বসে তার বোন আন্না ফিওদরোভনার সঙ্গে গল্পচ্ছলে বলছে যে মামন এখনও

বয়সের তুলনায় ছোট সাজবার চেষ্টা করে এবং সুন্দরীর মত সাজগোজ করে, তাস খেলায় হেরে গেলে বাজীর টাকা দেয় না, অন্য মহিলাদের জুতো ও সিগারেটের ব্যাপারেও তার দুর্বলতা আছে। ভলোদিয়া প্রতিদিন মাকে বলে সে যেন আর কখনও শুমিখিনদের বাড়ি না যায়, সেই ধনীদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য সে যে দিনের পর দিন নিজেকে ছোট করে তুলছে সে কথা তাকে অনেক বুঝিয়েছে, তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, কঠোর কথা শুনিয়েছে, কিন্তু সে-এক নির্লজ্জ বেহিসাবী নারী, যে জীবনে দুটো সম্পত্তি—তার নিজের ও স্বামীর—উড়িয়েছে, উঁচু সমাজের প্রতি যার চিরকালের আকর্ষণ, সে তার কথাগুলি বুঝতেই চায় না। আর প্রতি সপ্তাহে দু'বার করে তার সঙ্গে ভলোদিয়াকে এই ঘৃণ্য গ্রীষ্মাবাসে আসতেই হয়।

তৃতীয়, তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন সেই বিচিত্র ও অপ্রীতিকর অনুভূতিটাকে সে এক মিনিটের জন্যও মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। সে বিশ্বাস করে মাদাম শুমিখিনার সম্পর্কিত বোন আন্না ফিওদরোভ্‌নাকে সে ভালবাসে; সেও এই বাড়িতেই থাকে। এই চটপটে, বাচাল, বছর ত্রিশ বয়সের মহিলাটি স্বাস্থ্যবতী, শক্ত-সমর্থ, গোলাপি; তার কাঁধ দুটো গোল, ভারী ও গোল থুৎনি, ঠোঁটে সব সময়ই হাসির ঝিলিক। সে সুন্দরী নয়, যুবতীও নয়—ভলোদিয়া সেটা ভাল করেই জানে, তবু যে কারণেই হোক তার কথা না ভেবে, বা নানা বিচিত্র পরিবেশে তার দিকে না তাকিয়ে সে থাকতে পারে না। সে বিবাহিতা। তার স্বামী ধীর, স্থির, একজন স্থপতি। সপ্তাহে একদিন সে গ্রীষ্মাবাসে আসে, রাতটা আরামে ঘুমিয়ে কাটায়, তারপর শহরে ফিরে যায়। স্থপতিকে দেখলেই ভলোদিয়ার মনে হঠাৎ জেগে ওঠে তার প্রতি ঘৃণা, আর সে শহরে ফিরে গেলেই সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

আর এখন কুঞ্জবনে বসে আসন্ন পরীক্ষার কথা, এবং মামনের গায়ে পড়ে হাস্যাস্পদ হওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে নিউতাকে (শুমিখিনরা ঐ নামেই আন্না ফিওদরোভ্‌নাকে ডাকে) দেখার, তার হাসি ও ঘাঘরার খসখস্ শব্দ শোনার জরুরী বাসনা জেগে উঠল...উপন্যাসে যে পবিত্র কাব্যময় ভালবাসার কথা পড়েছে এবং প্রতিদিন বিছানায় শুয়ে যে ভালবাসার স্বপ্ন সে দেখে, এ বাসনা তেমনটি নয়ঃ এ এক আশ্চর্য, অপরিচিত অনুভূতি যার জন্য সে লজ্জাবোধ করে, অত্যন্ত খারাপ ও অপবিত্র বলে যাকে সে ভয় করে, যাকে নিজের কাছেও স্বীকার করতে ঘৃণা করে...

নিজেকেই বলে, "এ তো ভালবাসা নয়। ত্রিশ বছর বয়সের বিবাহিতা নারীর প্রেমে কেউ পড়ে না...এটা নিছক গোপন প্রণয়...হ্যাঁ, রীতিমত গোপন প্রণয়..."

এই প্রণয়ের কথা চিন্তা করতেই তার মনে পড়ে যায় তার নিজের আসার লাজুকতা, গামময় ফুট্‌ফুট্ দাগ, ছোট ছোট চোখ, গোঁফের অভাবের কথা ...আর নিউতার পাশে নিজেকে কল্পনা করেই সে ভাবে যে এ জুটি বাঁধা অসম্ভব! তারপর সে নিজেকে কল্পনা করে একটি সুদর্শন, সাহসী,

বুদ্ধিমান যুবক ভদ্রলোক রূপে, আধুনিক পোশাকে সুসজ্জিত...

কুঞ্জবনের একটি অত্যন্ত অন্ধকার কোণে বসে সে যখন এই রকম দিবাস্বপ্নে বিভোর তখনই হঠাৎ সে শুনতে পেল ধীরে পা ফেলে এগিয়ে আসা কারও পায়ের শব্দ। শব্দ থেমে গেল ; ফটকের পাশে কি যেন একটা সাদা কিছু ঝিলিক দিল।

''ওখানে কে বসে আছে ?'' একটি নারী-কণ্ঠের প্রশ্ন।

ভলোদিয়া গলাটা চিনল ; সভয়ে মাথাটা তুলল।

কুঞ্জবনে ঢুকে নিউতা শুধাল, '' কে এখানে ? ওঃ তুমি ভলোদিয়া! এখানে কি করছ ? ভাবছ ? কেউ কি সারাক্ষণ কেবল ভেবে ভেবে সারা হয়ে পাগল না হয়ে পারে !''

ভলোদিয়া উঠে দাঁড়াল। নিউতার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হকচকিয়ে উঠল। নিউতা নদী থেকে স্নান করে ফিরছে। তার এক কাঁধে স্নানের তোয়ালে, অন্য কাঁধে স্নানের চাদর ; ভেজা চুলের রাশি মাথায় জড়ানো, সাদা রেশমী ওড়নার নীচ দিয়ে এসে কপালের উপর সেঁটে বসেছে। তার গায়ে স্নান-ঘরের ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে গন্ধ, সেই সঙ্গে বাদামী সাবানের গন্ধও। দ্রুত হেঁটে আসার জন্য সে হাঁপাচ্ছে। ব্লাউজের উপরের বোতামটা খোলা ; তার গলা ও বুকের ডোল সে দেখতে পাচ্ছে।

ভলোদিয়াকে উপর-নীচ ভাল করে দেখে নিউতা শুধাল ''তুমি কিছু বলছ না কেন ? কোন মহিলা যখন তোমার সঙ্গে কথা বলে তখন চুপ করে থাকাটা অভদ্রতা। সত্যি, তুমি কী অভদ্র ভলোদিয়া ! সব সময় তুমি এখানে ওখানে বসে থাক, একটা কথা বল না, আর এত ভাব যেন তুমি একজন দার্শনিক বা ঐ রকম কিছু ! তোমার মধ্যে জীবনের স্ফুলিঙ্গ বা আগুন নেই। তুমি মোটেই ভাল নও...তোমার মত বয়সে একটি যুবক বাঁচবে, লাফাবে, অবিরাম কথা বলবে, মেয়েদের তাড়া করবে, আর তাদের প্রেমে পড়বে।''

নিউতা তার ফুলো-ফুলো সাদা হাত দিয়ে যে স্নানের চাদরটা যথাস্থানে চেপে ধরে আছে সেটার দিকে তাকিয়ে ভলোদিয়া কি যেন ভাবতে লাগল।

নিউতা অবাক হয়ে বলল, ''তবু সাড়া নেই। সত্যি আশ্চর্য...দেখ, মানুষ হও ! ওহে বাজে দার্শনিক ! অন্তত একটু হাস। তুমি কি জান ভলোদিয়া, কেন তুমি এত অভদ্র ? কারণ তুমি মেয়েদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি কর না। কেন কর না ? অবশ্য এখানে কোন যুবতী মেয়ে নেই, কিন্তু বিবাহিতা নারীদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করতে কে তোমাকে বারণ করেছে ? ধর, তুমি আমার সঙ্গে ভাব-সাব করছ না কেন ?''

ভলোদিয়া কথাগুলি শুনল, তারপর কষ্টকর গভীর চিন্তায় মাথার পাশটা রগড়াতে লাগল।

তার হাতটাকে মাথা থেকে নামিয়ে দিয়ে নিউতা বলল, ''অত্যন্ত অহংকারী লোকরাই নির্জনতা ও নীরবতা পছন্দ করে। তুমি বড় বেশী অহংকারী ভলোদিয়া। তোমার দৃষ্টি এত বিষণ্ণ কেন ? দয়া করে আমার মুখের

দিকে তাকাও। এই তো, এবার...''

ভলোদিয়া কথা বলাই স্থির করল। হাসবার চেষ্টা করে নীচের ঠোঁটটা নাড়ল, চোখ পিট্‌পিট্‌ করল, তারপর আবার হাত তুলে মাথাব পাশটা রগড়াতে লাগল।

বলল, ''আমি....আমি তোমাকে ভালবাসি!''

নিউতা দুই ভুব তুলে হেসে উঠল।

ভয়ংকর কিছু শুনলে অপেরা-গায়করা যে ভাবে গান গেয়ে ওঠে সেইভাবে নিউতা বলে উঠল, ''এসব কী শুনছি? কি? কি বললে তুমি? আবার বল, কথাটা আর একবার বল।''

''আমি আমি তোমাকে ভালবাসি,'' ভলোদিয়া পুনরায় বলল।

তারপর ইচ্ছা করে নয়, কিছুই না বুঝে, একান্ত বিস্ময়ে সে নিউতার দিকে এক পা এগিয়ে তার হাতটা জড়িয়ে ধরল। তার চোখের সামনে সব কিছু ভাসতে লাগল, চোখে জল এল, সমগ্র জগৎটা তার কাছে হয়ে উঠল স্নান-ঘরের গন্ধে ভরা একখানি স্নানের তোয়ালে।

''সাবাশ! সাবাশ!'' নিউতার খুশির হাসি সে শুনতে পেল। তুমি কথা বলছ না কেন? আমি চাই যে তুমি কথা বল! আচ্ছা?''

ভলোদিয়া যখন দেখল নিউতা তাকে নিজের হাতটা ধরতে দিল, তখন সে নিউতার হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে দুই হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল যে তার হাত দুটি নিউতার পিঠের উপর একত্র হয়ে গেল। ভলোদিয়া এইভাবে তাকে জড়িয়ে ধরতেই নিউতা দুই হাত তুলে রেশমী ওড়নাব নীচেকার চুলগুলি পরিপাটি করে নিয়ে শান্ত গলায় বলল ঃ

''ভলোদিয়া, একটি যুবককে হতে হবে কর্মচঞ্চল, সাহসী ও অমায়িক, আর এ সব কিছুই সে হতে পারে কেবলমাত্র একটি নারীর প্রভাবে। হায়রে, তোমার মুখটা কত নীচ... কী ঘৃণ্য। তোমাকে কথা বলতে হবে, হাসতে হবে। সত্যি ভলোদিয়া, এত কঠিন হয়ো না, তুমি যুবক, দার্শনিকতার সময় পরে অনেক পাবে। এবার আমাকে যেতে হবে, আমাকে ছেড়ে দাও! যেতে দাও!''

বিনা চেষ্টায় সে নিজেকে মুক্ত করে নিল, একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে গেল। ভলোদিয়া এবার একা। চুলটা পরিপাটি করে নিয়ে সে একটু হাসল, কুঞ্জের এদিক থেকে ওদিকে দু'তিনবার হাঁটল, তারপর কোণের বেঞ্চিটাতে বসে আবার একটু হাসল। তার এমন অসহ্য লজ্জা বোধ হতে লাগল। যে মানুষের লজ্জা যে এত তীব্র ও সর্বগ্রাসী হতে পারে সেটা বুঝতে পেরে সে সত্যি অবাক হয়ে গেল। আর লজ্জিত হবার জন্যই সে হাসল, ভাষাহীন ফিস্ ফিস্ করল, অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল।

সে লজ্জা পেয়েছে কারণ তার সঙ্গে একটা বোকা ছোকরার মত ব্যবহার করা হয়েছে, সে লজ্জা পেয়েছে নিজের ভীরুতার জন্য, আর সব চাইতে বেশী লজ্জা পেয়েছে একটি সম্মানিত বিবাহিতা মহিলাকে জড়িয়ে ধরার মত

সাহসের জন্য, কারণ তার যৌবন, তার চোখের দৃষ্টি, তার সামাজিক মর্যাদা, কোনটাই তাকে এ হেন কাজ করার অধিকার দেয় নি।

সে কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে গেল, একবারের জন্যও পিছনে না তাকিয়ে বাগানের আরও ভিতরে—বাড়ি থেকে যতদূরে সম্ভব—এগিয়ে গেল।

মাথাটা চেপে ধরে ভাবতে লাগল : "ওঃ, এখনই যদি এখান থেকে চলে যেতে পারতাম! হে প্রভু, সেটা কতদিনে হবে!"

যে ট্রেনে ভলোদিয়া ও মামনকে ফিরে যেতে হবে সেটা ছাড়ে ৮টা ৪০মিনিটে। আরও তিন ঘণ্টা তাকে কষ্ট সইতেই হবে, তবু মামনের জন্য অপেক্ষা না করে এই মুহূর্তে স্টেশনে যেতে পারলে সে কত খুশিই না হত!

সাতটার পরে সে হাঁটিতে হাঁটিতে বাড়ি ফিরে গেল। তার সারা দেহে স্থির সংকল্পের দৃঢ়তা : যা হবার তা হবে! সে স্থির করেছে সাহসের সঙ্গে হাঁটিবে, প্রত্যেকের মোকাবিলা করবে, এবং যাই ঘটুক না কেন গলা চড়িয়ে কথা বলবে।

বেদী পার হয়ে মস্ত বড় অভ্যর্থনা-ঘর পেরিয়ে বসবার ঘরে একটু থামল শ্বাস নেবার জন্য। শুনতে পেল পাশের খাবার ঘরে মহিলারা চা খাচ্ছে। মাদাম শুমিখিনা, মামন ও নিউতা কথা বলছে আর হাসছে। ভলোদিয়া কান পাতল।

নিউতা বলছে, "সত্যি, নিজের চোখকেই আমি বিশ্বাস করতে পারি নি! সে যখন বলল সে আমাকে ভালবাসে আর সত্যি সত্যি আমাকে জড়িয়ে ধরল, আমি তো তাকে চিনতেই পারি নি! আর জান, তার ধরণ-ধারণই ওই রকম। সে যখন বলল সে আমাকে ভালবাসে তখন তার মুখে একটা পাশবিক ভাব ফুটে উঠেছিল, ঠিক যেন কোন সাকাসিয়ার মানুষের মুখ।"

"সত্যি!" ঢোক গিলে মামন হো-হো করে হেসে উঠল। "সত্যি! একেবারে ঠিক ওর বাবার মতই।"

ভলোদিয়া এক দৌড়ে ঘরগুলো পার হয়ে বাইরের খোলা বাতাসে বেরিয়ে গেল।

দুই হাত মুচড়ে হা করে আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বড় দুঃখে ভাবতে লাগল, "এ রকম গলা ছেড়ে এসব কথা তারা আলোচনা করে কেমন করে! তাও এমন ঠাণ্ডা মাথায়...আর মামনও হাসছে...মামন! হে প্রভু, এমন মা তুমি আমাকে কেন দিলে? কেন?"

অথচ আবার তাকে সেই বাড়িতেই ফিরে যেতে হবে। সে বাগানেই হাঁটিতে লাগল; তারপর মন একটু শান্ত হলে বাড়িতে ঢুকল।

মাদাম শুমিখিনা কঠোর স্বরে শুধাল, সময় মত চা খেতে আস নি কেন?"

চোখ না তুলেই সে বলল, "আমি দুঃখিত...আমাদের ফিরে যাবার সময় হয়ে গেছে। মামন, আটটা যে বেজে গেছে।"

মামন আলস্যভরে বলল, "তুমি যাও বাছা। আমি আজ রাতটা লিলির

কাছেই থাকব। বিদায়, বাছা...তোমাকে আশীর্বাদ করছি..."

ছেলের মাথার উপর সে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল; তারপর নিউতার দিকে ফিরে ফরাসীতে বলল ঃ

"তাকে দেখতে ঠিক ছোটবেলার লার্মান্তভ-এর মত।...তাই না?"

কোন মহিলার দিকেই না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। দশ মিনিট পরে দেখা গেল সে স্টেশনের দিকে চলেছে। বাড়ির পথে নামতে পেরে সে বেশ খুশি।

এখন আর তার ভয় নেই, লজ্জা নেই, সে সহজে খোলা বাতাসে শ্বাস নিতে পারছে।

স্টেশনের আধ ভার্স্ট আগে পথের ধারে একটা পাথরের উপর বসে সে সূর্যের দিকে তাকাল; সূর্যের বেশীর ভাগটাই তখন বাঁধের আড়ালে চলে গেছে! স্টেশনের এখানে-ওখানে আলো জ্বলে উঠেছে, অনেক দূরে একটা ক্ষীণ সবুজ আলো কাঁপছে, কিন্তু তখনও ট্রেনের কোন চিহ্ন নেই। এখানে চুপচাপ বসে থাকা আর ধীরে ধীরে নেমে-আসা রাতকে দেখা—বেশ ভালই লাগছে। বাগানের ভিতরকার অন্ধকার, অনেক পায়ের শব্দ, স্নান-ঘরের গন্ধ, মহিলাটির উচ্চ হাসি ও তার দেহ—সবই তার স্পষ্ট মনে আছে; এখন আর এ সব আগের মত ভীতিপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না।

"এ সব কিছু না...সে তো তার হাতটা টেনে নেয় নি, আমি যখন তাকে জড়িয়ে ধরলাম তখন সে তো হাসছিল, সুতরাং নিশ্চয় তার ভালই লেগেছিল। সে যদি বিরক্ত হত তাহলে তো রাগই করত..."

এতক্ষণে বাগানের মধ্যে নিজের সাহসের অভাবের জন্য ভলোদিয়ার অনুশোচনা হল। এমন বোকার মত চলে আসার জন্য তার দুঃখ হল; তার নিশ্চিত ধারণা হল, আবার যদি সেরকম সুযোগ আসে তাহলে সে আরও বেশী সাহসের সঙ্গে যা করার তা করবে, সমস্ত ব্যাপারটাকেই আরও সহজভাবে নেবে।

সেরকম একটা সুযোগ তো সহজেই আবার আসতে পারে। শুমিখিনদের বাড়িতে প্রত্যেকেই আহারাদির পরে অনেক রাত পর্যন্ত বাগানে থাকে। ভলোদিয়া যদি নিউতাকে সঙ্গে করে অন্ধকার বাগানে বেড়াতে যায় তাহলেই তো তার সুযোগ আসবে!

নিজের মনেই বলল, "ফিরে যাব। তারপর সকালের ট্রেনটা ধরব। তাদের বলব, এ ট্রেনটা ধরতে পারি নি।"

সত্যি সে ফিরে গেল। মাদাম শুমিখিনা, মামন, নিউতা এবং মাদাম শুমিখিনার বোন-ঝিরা বেদীতে বসে তাস খেলছিল। ভলোদিয়া যখন তাদের বলল সে ট্রেনটা ধরতে পারে নি তখন তারা পরীক্ষা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তাকে পরামর্শ দিল, সে যেন কাল খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে যাতে আবার দেরি না হয়। তারা যখন তাস খেলছিল তখন সে এক পাশে বসে ক্ষুধার্ত চোখে নিউতার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল.. একটা ফন্দি

সে এর মধ্যেই এঁটে ফেলেছে ঃ অন্ধকারে সে নিউতার কাছে যাবে, তার হাতটা চেপে ধরে তাকে জড়িয়ে ধরবে, মুখে কিছু বলারই দরকার হবে না, কারণ দু'জনই বুঝতে পারবে।

যাই হোক, রাতের খাওয়া হলে মহিলারা বাগানে বেড়াতে না গিয়ে তাসই খেলতে লাগল। সকাল একটা পর্যন্ত তারা তাস খেলল, তারপর যার যার শোবার ঘরে ঢুকে গেল।

বিছানায় শুতে গিয়ে ভলোদিয়া মনের দুঃখে ভাবল ঃ ''কী বোকার মত ধপাস্ হলাম। ঠিক আছে, কালও থেকে যাব...কাল আবার এই বাগানে...ঠিক আছে।''

সে ঘুমের চেষ্টাই করল না, বিছানার উপর বসে হাঁটু দোলাতে দোলাতে ভাবতে বসল। আগামী কালের পরীক্ষার কথা ভাবতেই তার ঘৃণা হয়। সে ধরেই নিয়েছে স্কুল থেকে সে বহিষ্কৃত হবেই, আর সেটাকে খুব ভয়ানক কিছু বলেও সে মনে করে না। বরং এই তো ভাল, এর চাইতে ভাল আর কি হতে পারে। কাল থেকে সে হবে পাখির মত মুক্ত, নাগরিকদের পোশাক পরবে, স্কুলের ইউনিফর্ম নয়। প্রকাশ্যে ধূমপান কববে, আর যখনই ইচ্ছা হবে এখানে এসে নিউতার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করবে ঃ তখন তো সে আর স্কুলের ছেলে থাকবে না, ''এক ভদ্র যুবক'' হবে। আর বাদ বাকি, মানে তার জীবিকা ও ভবিষ্যৎ, সে সব তো একেবারে পরিষ্কার ঃ স্বেচ্ছাসৈনিক হিসাবে সামরিক চাকরিতে ঢুকবে, অথবা তার বাবু হবে, আর নিদেনপক্ষে ওষুধ-বিক্রেতার সহকারী হয়ে কাজকর্ম করতে করতে ফার্মাসিউটিস্ট পর্যন্ত উঠবে...যা হোক একটা কিছু হবেই। এই ভাবে দু'এক ঘণ্টা কেটে গেল; তখনও সে বিছানায় বসে ভেবেই চলল...

দুটো বাজার কিছুক্ষণ পরে আকাশ যখন বিবর্ণ হয়ে এসেছে, সন্তর্পণে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল মামন।

হাই তুলে বলল, ''তুমি জেগে আছ। ঘুমোও বাবা, ঘুমোও, আমি এক মিনিটও থাকব না। আমার ফোঁটার ওষুধটা নিতে এসেছি।''

''কেন বল তো? সেটা দিয়ে কি হবে?''

''বেচারি লিলি, আবার তার হাঁপানি দেখা দিয়েছে। তুমি ঘুমিয়ে পড়, কাল তোমার পরীক্ষা আছে...''

কাবার্ডের ভিতর থেকে ওষুধের বোতলটা বের করে সে জানালার কাছে গেল লেবেলটা পড়ার জন্য, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

''মারিয়া লিওন্তিয়েভ্না,তুমি ভুল ওষুধ নিয়ে এসেছ'', এক মিনিট পরেই ভলোদিয়া একটি নারী কণ্ঠ শুনতে পেল। ''এগুলো 'কন্‌ভালামারিন' ফোঁটা, লিলি চাইছে মরফিন। তোমার ছেলে কি ঘুমিয়ে পড়েছে? তাকেই মরফিনটা খুঁজে দিতে বল...''

গলার স্বর নিউতার। ভলোদিয়া কাঠ হয়ে গেল। ট্রাউজারটা পরে গ্রেটকোটটা কাঁধের উপর ফেলে সে দরজার কাছে গেল।

নিউতা চুপি চুপি বলছে, ''মরফিন, বুঝলে তো? লেবেলে লাতিন ভাষায় লেখা থাকবে। ভলোদিয়াকে ডেকে তোল; সে খুঁজে দেবে...''।

মামন দরজাটা খুলতে ভলোদিয়া নিউতাকে দেখতে পেল। যে ব্লাউজটা পরে সে স্নান করতে গিয়েছিল সেটাই তার গায়ে আছে। চুল বাঁধা হয় নি, দুই কাঁধের উপর এলিয়ে পড়েছে; আবছা ঘরে মুখটা ঘুম-ঘুম ও ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে...

মামন বলল, ''এই তো ভলোদিয়া, সে ঘুমোয় নি। ভলোদিয়া, লক্ষ্মী ছেলে, কাবার্ডের ভিতর থেকে মরফিনটা খুঁজে দাও তো। লিলি খুব কষ্ট পাচ্ছে...সব সময়ই তার একটা না একটা গোলমাল লেগেই আছে...''

মামন বিড়বিড় করে কি যেন বলল, হাই তুলল, তারপর বিছানায় ফিরে গেল। নিউতা ভলোদিয়াকে বলল, ''যাও না, খুঁজে দেখ। এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেক না।''

ভলোদিয়া কাবার্ডের সামনে ঝুঁকে ভিতরকার শিশি-বোতলগুলি হাতড়াতে লাগল। তার হাত কাঁপছে; মনে হল, তার সারা শরীরে যেন ঠাণ্ডা স্রোত বইছে। ইথার, কার্বলিক, এবং অন্য নানা রকম ওষুধের গন্ধে তার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল।

সে ভাবল, ''আমার মনে হয় মামন চলে গেছে। ভালই হল...খুব ভাল...''

আলস্যভরা গলায় নিউতা শুধাল, ''ওষুধটা পেয়েছ কি?''

একটা বোতলের উপর ''মরফ্'' লেখা পড়েই ভলোদিয়া বলল, ''এক মিনিট...এই তো পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে। এই নাও।''

নিউতা দরজায় দাঁড়িয়ে, তাব এক পা বারান্দায়, অন্য পা ঘরের মধ্যে। চুলটাকে কোন রকমে বেঁধে নেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার চুল এত ঘন ও লম্বা যে কাজটা সহজ নয়। উদাস নয়নে সে ভলোদিয়ার দিকেই তাকিয়ে আছে। আকাশ সাদা হয়ে এলেও এখনও রৌদ্রস্নাত নয়; সেই স্বল্প আলোয় ঢিলে ব্লাউজ পরা, ঘুম-ঘুম চোখ ও এলোমেলো চুলেব জন্য তাকে মনোমুগ্ধকর একটি ঝলমলানো নারীর মত দেখাচ্ছে। মুগ্ধ চোখে, কম্পিত দেহে, এই কমনীয় দেহটিকে বাহুপাশে বদ্ধ করার স্মৃতির আবেশে ভলোদিয়া ফোঁটার ওষুধটা তার হাতে দিয়ে বলল ঃ

''তুমি এমন...''

''কি?''

কোন কথা না বলে সে নিউতাকে বাহুপাশে বাঁধল, ঠিক যেমনটি করেছিল কুঞ্জবনে। আর নিউতাও হেসে হেসে, এর পরে কি ঘটে সেটা দেখার প্রতীক্ষায় তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

''আমি তোমাকে ভালবাসি'', ভলোদিয়া ফিস্‌ফিস্ করে বলল।

নিউতা হাসি থামিয়ে এক মুহূর্ত কি ভেবে বলল ঃ

''দাঁড়াও, কে যেন আসছে। ওঃ, এই সব স্কুলের ছেলেরা!'' দরজার

দিকে এগোতে এগোতেই সে চাপা গলায় বলল। না, কেউ কোথাও নেই।''

নিউতা ফিলে এল...

আর তখনই ভলোদিয়ার মনে হল, এই ঘর, নিউতা, ভোরবেলা, আর সে নিজে—সব যেন এক হয়ে মিশে গেছে এমন এক তীব্র, অসাধারণ, কল্পিত সুখের অনুভূতিতে যার জন্য মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারে, সইতে পারে অনন্ত যন্ত্রণা। কিন্তু হঠাৎ আধ মিনিটের মধ্যেই সে সব কিছু শূন্যে মিলিয়ে গেল। সম্মুখে দেখতে পেল একটি মোটাসোটা কুদর্শন মুখ উৎকট ভঙ্গীতে তাকিয়ে আছে; আর সঙ্গে সঙ্গে এইমাত্র যা ঘটে গেল তার জন্য সে নিজেই বিরক্ত হয়ে উঠল।

ঘৃণার দৃষ্টিতে ভলোদিয়ার দিকে তাকিয়ে নিউতা বলল, ''আমি চলে যাচ্ছি। কী দুঃখী-দুঃখী চেহারা একটা কুৎসিত হাঁসের বাচ্চা!''

এলোমেলো চুলে আর ঢিলে ব্লাউজ গায়ে মহিলাটিকেও কী কুৎসিত দেখাচ্ছে, তার পায়ের শব্দ তার গলার স্বর কত ঘৃণ্য মনে হচ্ছে!''

মহিলাটি চলে গেলে সে ভাবল, ''একটা কুৎসিত হাঁসের বাচ্চা। সত্যি আমি কুৎসিত ও ঘৃণ্য...সব কিছুই বিরক্তিকর।''

সূর্য উঠেছে। পাখিরা গলা ছেড়ে গান করছে, বাইরে মালীর একচাকার গাড়িটার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ কানে আসছে। একটু পরে শোনা গেল গরুর হাম্বা রব আর মেষপালকদের বাঁশীর সুর। এই সূর্যের আলো, এই বাঁশীর সুর যেন বলে দিচ্ছে এই পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও একটি নিষ্কলুষ, সুন্দর, কাব্যময় জীবন অবশ্যই আছে। কিন্তু সে কোথায়? না মামন, না চারপাশের কোন মানুষ, কেউ কোন দিন ভলোদিয়াকে সে কথা বলে দেয় নি।

সকালের ট্রেন ধরার জন্য তাকে ঠিক সময়ে জাগিয়ে দিতে যখন পরিচারক এল তখন সে ঘুমের ভান করে বিছানায় পড়ে রইল।

''সব জাহান্নামে যাক!''

যখন বিছানা ছেড়ে উঠল তখন দশটা বেজে গেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বুরুশ করতে করতে বিনিদ্র রাতের পর নিজের ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে সে ভাবল ঃ

''সে তো সঠিক কথাই বলেছে। আমি তো একটা কুৎসিত হাঁসের বাচ্চাই বটে!''

তাকে দেখেই সে যে পরীক্ষা দিতে যায় নি সেটা বুঝতে পেরে মামন হতাশায় ঢোঁক গিলল। ভলোদিয়া কিন্তু শান্ত গলায় বলল ঃ

''আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মামন...কিন্তু তুমি চিন্তা করো না, আমি একটা অসুস্থতার সার্টিফিকেট যোগাড় করে নেব।''

মাদাম শুমিখিনা ও নিউতা দুপুরের পরেও ঘুমিয়ে কাটাল। ভলোদিয়া শুনতে পেল, জেগে উঠে মাদাম শুমিখিনা জানালা খুলে কড়া গলায় কাকে যেন কি বলল, আর নিউতা প্রচণ্ড হেসে তার জবাব দিল। সে দেখল, খাবার

ঘরের দরজাটা খুলে গেল, আর বোন-ঝিরা ও আশ্রিত জনরা (মামনও তাদেরই একজন) দল বেঁধে প্রাতরাশ খেতে ঘরে ঢুকল ; বারকয়েকের জন্য নিউতার রাত-জাগা হাসি-হাসি মুখটাও তার চোখে পড়ল ; আর তার পাশেই দেখতে পেল সদ্য আগত কালো ভুরু ও দাড়িওয়ালা তার স্থপতি স্বামীটিকে।

নিউতার পরনে ইউক্রেনীয় পোশাক ; সেটা তাকে মোটেই মানায় নি, বরং বিশ্রী দেখাচ্ছে ; স্থপতিটি মোটা দাগের সস্তা রসিকতা করছে ; আর প্রাতরাশের জন্য পরিবেশিত মাংসের বলগুলো বড় বেশী পেঁয়াজের গন্ধ ছড়াচ্ছে। ভলোদিয়া আরও ভাবল, নিউতা ইচ্ছা করেই এত প্রাণ খুলে হাসছে, তার দিকে কটাক্ষে তাকাচ্ছে ; সে যেন তাকে বলতে চাইছে, গত রাতের ঘটনার স্মৃতি তাকে মোটেই বিচলিত করছে না, এবং কুৎসিত হাঁসের বাচ্চাটি যেন প্রাতরাশের টেবিলে মোটেই না আসে।

তিনটের একটু পরে ভলোদিয়া ও তার মা স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হল। নোংরা স্মৃতি, বিনিদ্র রাত, স্কুল থেকে অনিবার্য বহিষ্কার, বিবেকেব দংশন—সব কিছু মিলে ভলোদিয়ার মনটাকে তীব্র বিদ্বেষে ভরে তুলল। মামনের দেহরেখা, তার ছোট নাক ও নিউতার দেওয়া ওয়াটারপ্রুফ কোটের দিকে তাকিয়ে সে ক্ষোভের সঙ্গে বলল ঃ

''তুমি মুখে পাউডার মাখ কেন ? তোমার বয়সে এটা মানায় না। তুমি সব সময় সুন্দরী সেজে থাকতে চাও, তাস খেলায় হারলে টাকা দাও না, অন্য লোকের সিগারেট খাও...কী দুঃখের কথা! আমি তোমাকে পছন্দ করি না, করি না!''

সে মামনকে অপমান করতে লাগল, আর মামন ভয়ে চোখ গোল-গোল করে দুই হাত দুলিয়ে অস্ফুট আর্তস্বরে বলে উঠল ঃ

''থাম বাছা, থাম। হে প্রভু, কোচোয়ান যে তোমার কথাগুলি শুনতে পাচ্ছে। থাম, নইলে কোচোয়ান সব শুনে ফেলবে। সে সব শুনতে পাচ্ছে।''

হাঁপাতে হাঁপাতে ভলোদিয়া তবু একই কথা বলতে লাগল ঃ

''আমি তোমাকে অপছন্দ কবি...অপছন্দ করি। তুমি নীতিহীন, তোমার হৃদয় বলে কিছু নেই...এই ওয়াটারপ্রুফটা পরার দুঃসাহস যেন তোমার না হয়, শুনতে পাচ্ছ ?...যদি পর তাহলে আমি ওটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব!''

মামন কেঁদে ফেলল। মিনতি করে বলল, ''ঠাণ্ডা হও। কোচোয়ান শুনতে পাচেছ।''

''কোথায় গেল আমার বাবার ধন-দৌলত ? তোমার ধন-দৌলতই বা কোথায় ? সব তুমি উড়িয়েছ! দারিদ্র্যের জন্য আমার লজ্জা নেই, আমার লজ্জা তোমার মত মাকে নিয়ে...স্কুলের বন্ধুরা যখন তোমার কথা বলে তখন আমি বড় বিচলিত হয়ে পড়ি।''

যে ট্রেনে তারা শহরে এসেছিল সেটা দুটো স্টেশনে থামল। ভলোদিয়া

সারাক্ষণ খোলা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে কাটাল ; ঠাণ্ডায় তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। কামরার ভিতরে তার ঢুকতে ইচ্ছা করছে না, কারণ তার মা সেখানে বসে আছে, তাকে সে ঘৃণা করে। সে আরও ঘৃণা করছে নিজেকে, কাণ্ডাক্টরদের, ট্রেনের ধোঁয়াকে, এমন কি যে ঠাণ্ডায় সে কাঁপছে তাকেও।...যত তার অন্তর ভারী হয়ে উঠছে ততই সে অনেক ব্যথা অনুভব করছে, এই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও কিছু মানুষ এমন জীবন যাপন করছে যা নিষ্কলুষ, শ্রদ্ধেয়, আতপ্ত, সুন্দর, ভালবাসায়, দয়ায়, প্রফুল্লতায় ও মুক্তিতে পরিপূর্ণ...তার এই অনুভূতি এতই তীব্র আর তার যন্ত্রণা এতই সুস্পষ্ট যে জনৈক যাত্রী তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ঃ

''দাঁতের ব্যথা, তাই না?''

শহরে মামন ও ভলোদিয়া মারিয়া পেত্রভ্‌নার বাড়িতে থাকে। ভদ্রমহিলাটি একটা বড় ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে ঘর-ঘর ভাড়া দেয়। তারা দুটো ঘর নিয়ে থাকেঃ বড় ঘরটায় মামন থাকে, সেখানে তার একটা খাট আছে আর দেয়ালে ঝোলানো আছে গিল্টি-করা ফ্রেমের দুটো ছবি ; ভলোদিয়া থাকে পাশের ছোট, অন্ধকার ঘরটায় ; ঘরে আসবাব বলতে শুধু একটা কোচ যাতে সে শোয়, ঘরের বাকি অংশে স্তূপ করে রাখা হয়েছে প্যাটরা, টুপির বাক্স, আর যত রাজ্যের পুরনো জিনিসপত্র ; মামন যে কেন সেগুলো জমিয়ে রেখেছে ভলোদিয়া বুঝতে পারে না। সে তার বাড়ির কাজগুলো করে মার ঘরে নয় তো তথাকথিত বড় ''কমন-রুম''-এ বসে, যেখানে সব বাসিন্দারা ভিড় জমায় ডিনার খেতে বা সন্ধ্যাটা কাটাতে।

বাড়িতে পৌঁছেই ভলোদিয়া তার কোচে শুয়ে আপাদ-মস্তক কম্বলটা টেনে দিল কাঁপুনি থামাবার জন্য। টুপির বাক্স, প্যাটরা আর টুকি-টাকি জিনিসের স্তূপ তাকে মনে করিয়ে দিল যে তার নিজস্ব কোন ঘর নেই, এমন কোন আশ্রয় নেই যেখানে মামনের কাছ থেকে,অভ্যাগতদের কাছ থেকে, আর ''কমন রুম'' থেকে যে সব কণ্ঠস্বর তার কানে আসছে, তা থেকে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। স্কুলের ব্যাগটা এবং ইতস্তত ছড়ানো স্কুলের বই তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে সে পরীক্ষায় বসে নি...অকারণেই তার মনে পড়ে গেল মেন্টোন-এর কথা যেখানে সাত বছর বয়সে সে বাবার সঙ্গে বাস করত ; তার মনে পড়ল বিয়ারিজ ও অপর দুটি ইংরেজ মেয়েকে যাদের সঙ্গে সে সমুদ্রের তীরে খেলা করত...আর স্মরণ করতে ইচ্ছা করল তখনকার আকাশ ও সমুদ্রের রং, ঢেউয়ের উচ্চতা আর মেজাজের কথা, কিন্তু শুধু দুটি ইংরেজ মেয়ের ছবিই তার কল্পনায় জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠেই চকিতে মিলিয়ে গেল, আর বাকি সব কিছু মিলে-মিশে একাকার হয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেল...

ঘরের ভিতরটা বড় ঠাণ্ডা ; ভলোদিয়া উঠে গ্রেটকোটটা গায়ে দিয়ে ''কমন রুম''-এ গিয়ে ঢুকল।

তখন চায়ের সময়। টেবিলের উপর সামোভারটা রেখে চারদিকে বসে

ছিল তিনটি মানুষ ঃ মামন, একটি ছোটখাট বৃদ্ধ মহিলা যে পিয়ানো শেখায়, যার চোখে কচ্ছপের খোলের ফ্রেমের পিঁস্‌নে, আর অগাস্তিন মিখাইলোভিচ, একটি বয়স্ক, পেট-মোটা ফরাসী ভদ্রলোক যে একটা আতরের কারখানায় কাজ করে।

মামন বলল, ''আজ আমার ডিনার খাওয়া হয় নি। মনে হচ্ছে পরিচারিকাকে ডেকে আমাকেই বলতে হবে কিছু রুটি কিনে আনার কথা।''

''দুনিয়াশা!'' ফরাসি লোকটি পরিচারিকার উদ্দেশে হাঁক দিল। অবশ্য জানা গেল যে বাড়ির মালকিন তাকে কোন কাজে পাঠিয়েছে।

ঠোঁট ফাঁক করে হাসতে হাসতে ফরাসী লোকটি বলল, ''ওঃ, এতো সামান্য কাজ। আমি নিজেই গিয়ে রুটি কিনে আনছি। এতো সামান্য কাজ!''

একটা পছন্দমত জায়গায় সাজিয়ে রাখা ছাইদানিতে কড়া, সুগন্ধি চুরুটটা নিভিয়ে রেখে দিয়ে সে টুপিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। সে চলে যেতেই মামন পিয়ানো-শিক্ষককে বলতে শুরু করল শুমিখিনদের বাড়িতে তার থাকার কথা, সেখানে সে কতটা আদর-আপ্যায়ন পায় সেই সব কথা।

সে বলল, '' জানেন তো, লিলি শুমিখিনা আমার আত্মীয়। তার প্রয়াত স্বামী জেনারেল শুমিখিন ছিলেন আমার স্বামীর সম্পর্কে ভাই। আর সে নিজেও জন্মসূত্রে ব্যারনেস, ব্যারনেস কোল্‌ব্‌।''

ভলোদিয়া বিরক্ত হয়ে বলল, ''মামন, কথাটা সত্যি নয়। মিথ্যে বল কেন?''

সে ভালভাবেই জানে যে মামন সত্যি কথাই বলছে, আবার সে এটাও অনুরূপভাবেই বোঝে যে সে মিথ্যা বলছে। তার বলার ধরণ, মুখের ভাব, তার দৃষ্টি সব কিছুতেই যেন মিথ্যা জড়িয়ে আছে।

''তুমি মিথ্যে কথা বলছ'', পুনরায় কথাটা বলে ভলোদিয়া এত জোরে টেবিলের উপর একটা ঘুষি মারল যে তাব উপরকার চায়েব সরঞ্জামগুলি খট্‌-খট্‌ করে নড়ে উঠল, আর সামনের কাপ থেকে চা উছলে পড়ল। ''জেনারেল ও ব্যারনেসদের সম্পর্কে এ সব কথা তুমি কেন বল? এ সবই তো মিথ্যে!''

যেন কিছু গলায় আটকে গেছে এ রকম ভাব দেখিয়ে পিয়ানো-শিক্ষক কাশতে শুরু করল, আর মামন কান্না শুরু করল।

ভলোদিয়া ভাবতে লাগল, এখন আমি কোথায় যাই?''

সে তো ইতিমধ্যেই স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে; তাই স্কুলের কোন বন্ধুর কাছে যেতে লজ্জা করছে। আবার ইংরেজ মেয়ে দুটির কথা মনে পড়ল...''কমন রুমে'' কিছুক্ষণ পায়চারি করে অগাস্তিন মিখাইলোভিচের ঘবে গেল। ঘরটাতে উদ্বায়ী তেল ও গ্লিসারিন সাবানের উগ্র গন্ধ। টেবিলের উপর, জানালার গোবরাটে, এমন কি চেয়ারের উপরেও অনেক বোতল, সরু মুখ মদের বোতল ও নানা রংয়ের তরল পদার্থে ভর্তি গ্লাস সাজানো রয়েছে।

টেবিল থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে ভলোদিয়া পাতা খুলে পড়ল ''ফিগারো''...কাগজটা থেকে একটা কড়া অথচ প্রীতিপ্রদ বিচিত্র গন্ধ নাকে এল। তারপর টেবিল থেকে রিভলবারটা তুলে নিল।

সে শুনতে পেল পিয়ানো শিক্ষক সান্ত্বনা দিয়ে বলছে, ''কান্নাকাটি করো না, এ নিয়ে মাথা ঘামিও না, সে তো যুবক। এ বয়সে যুবকরা সব সময়ই কিছুটা বেচাল হয়। সেটা মেনে নিতেই হবে।''

মামন ক্ষোভের সঙ্গে বলল, ''না, না, ও একেবারে বখে গেছে। ওর বাবা নেই, শাসন করার মত বুড়ো মানুষ কেউ নেই, আর আমিও দুর্বল, কিছুই করতে পারি না। না, না, আমাকে সান্ত্বনা দিও না, আমি দুখিনী, বড়ই দুখিনী...''

ভলোদিয়া রিভলবারের নলটা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল ; তারপর হাতের নীচে একটা কি যেন— হয় তো ঘোড়া পেয়ে আঙুল দিয়ে সেটাকে নীচে চেপে ধরল...তারপর হাত বাড়িয়ে আর একটা খাঁজ পেয়ে আবার সেটাতে চাপ দিল। এবার নলটাকে মুখ থেকে বের করে নিজের কোট দিয়ে মুছে আবার মুখে ঢোকাল, আর ঘোড়াটাকে ভাল করে দেখে নিল ; জীবনে সে কোন দিন রিভলবার ছোঁয়ও নি...

''এটাই তো একটু উঁচু মনে হচ্ছে'' সে ভাবল। ''হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস এটাই হবে...''

অগাস্তিন মিখাইলোভিচ ''কমন রুমে'' ফিরে এসে হাসতে হাসতে মহিলাদের এটা-সেটা বলতে শুরু করে দিল। ভলোদিয়া আবার রিভলবারটা মুখে ঢুকিয়ে দাঁত দিয়ে চেপে ধরল এবং একটা আঙুল দিয়ে কিছুতে চাপ দিল। সশব্দে একটা গুলি ছুটে গেল। মারাত্মক জোরে কিছু একটা তার মাথার পিছন দিকটাতে আঘাত করল, আর সে টেবিলের উপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল, তার মুখটা থুবড়ে পড়ল বোতলগুলোর উপর। আর তখনই সে বাবাকে দেখতে পেল—মাথায় চওড়া কালো ব্যাণ্ড দেওয়া একটা রেশমী টুপি, মেন্টোনে থাকার সময় একটি মহিলার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে এই টুপিটাই বাবা পরেছিল। হঠাৎ বাবা দুই বাহু দিয়ে ভলোদিয়াকে জড়িয়ে ধরল, আর দু'জনই একসঙ্গে পড়ে গেল একটা অত্যন্ত অন্ধকার গভীর গহ্বরের মধ্যে।

তারপর সব কিছু মিলেমিশে কোথায় মিলিয়ে গেল...

১৮৮৭

পাপের বেতন

The Wages of Sin



কলেজিয়েট এসেসর মিগুয়েভ সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়ে একটা টেলিগ্রাফ-থামের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। সখেদে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এক সপ্তাহ আগে সান্ধ্য ভ্রমণের শেষে যখন বাড়ি ফিরছিল তখন ঠিক এই জায়গাতেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাড়ির আগেকার পরিচারিকা আগ্নিয়ার সঙ্গে, আর সেই মেয়েটি তাকে জঘন্য রকমের ভয় দেখিয়েছিল :

"আর একটু সবুর করুন না! আপনার মাথায় আমি ঘোল ঢেলে ছাড়ব; নির্দোষ মেয়েদের সর্বনাশ করার উচিত শিক্ষা আপনাকে দেব। আপনার দরজায় বাচ্চাকে ফেলে যাব, আপনার নামে মামলা করব, সব কথা আপনার বৌকে বলে দেব...."

তারপরেই সে দাবী করেছিল, তার নামে পাঁচ হাজার রুবল্ ব্যাংকে জমা করে দিতে হবে। কথাটা মনে পড়তেই মিগুয়েভ পুনরায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে যে সাময়িক মোহের বশে আজ তাকে এত হেনস্তা ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে তার জন্য আন্তরিক অনুশোচনায় নিজেকেই তিরস্কার করতে লাগল।

নিজের পল্লীভবনে পৌঁছে একটু বিশ্রাম নেবার জন্য সে বারান্দাতেই বসে পড়ল। ঠিক দশটা বাজে; মেঘের আড়াল থেকে একটুকরো চাঁদ উঁকি দিল। রাস্তায় কেউ কোথাও নেই, কারণ গ্রীষ্মকালীন বয়স্ক বাসিন্দারা সকাল-সকাল শুয়ে পড়ে, আর যুবকরা অনেক রাত পর্যন্ত কুঞ্জবনেই কাটায়। মিগুয়েভ যখন সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাইয়ের খোঁজে কোটের এ-পকেট সে-পকেট হাতড়াতে লাগল তখন কি যেন একটা নরম কিছু তার হাতে ঠেকল; কৌতূহলবশত ডান কনুইয়ের নীচে তাকাতেই হঠাৎ তীব্র আতংকে তার মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল, যেন সে পায়ের কাছে একটা সাপ দেখতে পেয়েছে। সামনের দরজার একেবারে নিচে বারান্দার উপর একটা পুটুলি পড়ে আছে। হাত দিয়েই বুঝতে পারল ছোট লেপ দিয়ে জড়ানো একটা আয়তাকার বস্তু। পুটুলির একটা দিক ঈষৎ খোলা, তার ভিতর দিয়ে হাত ঢোকাতেই কেমন যেন গরম ও ভিজে-ভিজে লাগল। আতংকে লাফিয়ে উঠে সে সভয়ে চারদিকে তাকাল, ঠিক যে ভাবে বন্দী আসামী রক্ষীদের হাত থেকে পালাবার সময় চারদিকে তাকায়।

দাঁতে দাঁতে চেপে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সে হিস্-হিস্ করে বলে উঠল, "তাহলে সেই এটাকে আমার দোরগোড়ায় ফেলে গেছে! আমার সামনেই সেটা শুয়ে আছে—আমার পাপের বেতন! হা প্রভু!"

ভয়ে, ক্ষোভে, লজ্জায় সে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল। এখন সে কি

করবে? এ কথা জানলে তার স্ত্রীই বা কি বলবে? আপিসের লোকরাই বা কি বলবে? হিজ এক্সেলেন্সি হয় তো পেটে একটা থাপ্পড় মেরে মুচকি হেসে বলবে : "অভিনন্দন...মুচকি হাসি...মুচকি হাসি...চুলে পাক ধরলেই ভীমরতিতে ধরে, কী বজ্জাৎ লোক, সেমিয়ন এরাস্তোভিচ!" সারা গ্রীষ্মাবাসে টি-টি পড়ে যাবে, সম্ভ্রান্ত গৃহিণীরা তাকে দেখলেই দরজা বন্ধ করে দেবে। সব খবরের কাগজেই অনাথ শিশুদের কথা লেখা হয়, অতএব মিগুয়েভের দীন নামটা সারা রাশিয়াতে ছড়িয়ে পড়বে...

খাবার ঘরের জানালাটা খোলা, সে স্পষ্ট শুনতে পেল তার স্ত্রী আন্না-ফিলিপভ্না রাতের খাবারের আয়োজন করছে। ফটকের ঠিক পিছনে উঠোনে বসে খানসামা ইয়েমোলাই একটা করুণ সুর বাজাচ্ছে... শিশুটি যদি জেগে উঠে কাঁদতে শুরু করে, তাহলেই তো সব গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাবে। মিগুয়েভের মনে দুর্বার বাসনা জাগল, ছুটে পালিয়ে যাবে।

"তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি", সে চুপি চুপি বলল। "সময় থাকতে থাকতে পালানোই ভাল। ওকে তুলে নিয়ে আর কারও বারান্দায় রেখে আসব।"

এক হাতে পুটুলিটা তুলে নিয়ে সে ধীর, স্থিরভাবে পথ চলতে লাগল, যাতে কারও মনে সন্দেহ না জাগে।

নির্বিকার হবার চেষ্টায় নিজের মনেই সে বলে উঠল, "কী ভয়ংকর পরিস্থিতি! একজন কলেজিয়েট এসেসর একটি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে হেঁটে চলেছে! হে প্রভু, কেউ যদি আমাকে দেখে ফেলে আর আসল ব্যাপারটা অনুমান করতে পারে তাহলে তো আমি শেষ হয়ে যাব! এখানে এই বারান্দার উপরেই একে রেখে যাই...না, সেটা ঠিক হবে না, জানালাগুলি খোলা, কেউ যদি দেখে ফেলে। তাহলে একে কোথায় নিয়ে যাব, ঠিক আছে, একে মেল্‌কিনের বাড়িতে নিয়ে যাই। ব্যবসায়ীরা ধনী লোক, সহৃদয়ও বটে, তারা হয় তো এজন্য আমার কাছে কৃতজ্ঞ হবে আর একে ছেলের মত পালন করবে।"

সে মনস্থির করে ফেলল। মেল্‌কিনের বাড়িতেই যাওয়া যাক, যদিও তার গ্রীষ্মাবাসটি রাস্তার একেবারে শেষপ্রান্তে নদীর উপরে।

মিগুয়েভ ভাবতে লাগল, "ইনি এখন চীৎকার করে কম্বল থেকে বেরিয়ে না পড়েন! কী একটা অবাক করে দেওয়া মজার ব্যাপার! আমি বগলের নিচে বয়ে নিয়ে চলেছি একটি জ্যান্ত মানুষকে, ঠিক যেন একটা ব্রিফ-কেস। অন্য সব মানুষের মতই এই জ্যান্ত মানুষটির মন আছে, অনুভূতি আছে। ...ধরুন, মেল্‌কিনরা যদি একে দত্তক নেয়, তারপর সে যদি সমাজের উপরতলার মানুষ হয়ে ওঠে, তাহলে তো অবাক হবার কিছু নেই। সে একজন অধ্যাপক হতে পারে, অথবা অন্য কিছু, একজন সেনাপতি, বা একজন লেখক...এ জগতে সবই সম্ভব! আজ আমি তাকে বয়ে নিয়ে চলেছি একটা জঞ্জালের মত, আর ত্রিশ চল্লিশ বছর পরে হয় তো আমাকেই

তার সামনে দাঁড়াতে হবে...''

সংকীর্ণ জনহীন গলিতে লেবু গাছের ঘন, কালো ছায়ায় ঢাকা বেড়ার পাশ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ একটা নতুন চিন্তা তাকে একেবারে পেয়ে বসল ঃ তার মনে হল... একটা নিষ্ঠুর অপরাধের কাজ সে করতে চলেছে।

সে ভাবতে লাগল, ''এটা সত্যি জঘন্য...মানুষের পক্ষে একটা জঘন্যতম কাজ... একটা অসহায় শিশুকে এক বারান্দা থেকে আর এক বারান্দায় ছুঁড়ে দেওয়া...সে যে জন্মেছে এটা কি তার দোষ? তার কি দোষ? পাষণ্ডের দল, আমরা তো তাই...আমরা একটু ফূর্তি করি, আর তার দায়টা তুলে দেই এই সব নিরীহ শিশুদের মাথায়...পুরো ব্যাপারটাকে সঠিকভাবে বিচার করা যাক। খারাপ কাজটা তো করেছি আমি, আর এই শিশুটির ভাগ্যে জুটেছে একটা দুঃখের জীবন...আমি তাকে নিয়ে যাচ্ছি মেল্‌কিনের বাড়ি, মেলকিন্‌রা তাকে দিয়ে আসবে একটা অনাথ আশ্রমে, সেখানে অপরিচিত লোকজনের মধ্যে সে বড় হয়ে উঠবে। সেখানে কে কাকে দেখে, আদর করার কেউ নেই, ভালবাসার কেউ নেই, পেট ভরে খাওয়াবারও কেউ নেই... তারপর তাকে পাঠানো হবে মুচির কাজ শিখতে...ক্রমে সে মদ খেতে শিখবে, অশ্লীল কথাবার্তা রপ্ত করবে, দিন এনে দিন খাবে। বড় বংশের মানুষ এক কলেজিয়েট এসেসরের ছেলে হয়েও সে হবে এক মুচির শিক্ষানবীশ... আমার নিজের রক্ত ও মাংস...''

লেবু গাছের অন্ধকার পেরিয়ে মিগুয়েভ জ্যোৎস্না-ধোঁয়া উজ্জ্বল রাজপথে নামল। পুটুলিটার আবরণ খুলে শিশুটির দিকে একবার তাকাল।

নিচু গলায় বলতে লাগল, ''ও ঘুমচ্ছে। তাকিয়ে দেখ, বাবার মতই বাঁকা নাকটা পেয়েছে! গভীর ঘুমে অচেতন, জানতেও পাচ্ছে না তার বাবা তার দিকে তাকিয়ে আছে...কী একখানা নাটক...তা বেশ তো, আমি দুঃখিত, এ কথাটা বলা ছাড়া আমি আর কি করতে পারি...বাছারে, আমাকে ক্ষমা কর্‌...এই তোর কপাল, আহারে...''

মিগুয়েভের চোখ বুজে এল; তার দুই গাল বেয়ে কি যেন নেমে এল...শিশুটিকে জড়িয়ে নিয়ে পুটুলিটাকে বগোলদাবা করে আবার হাঁটিতে শুরু করল। মিল্‌কিনের বাড়ি পর্যন্ত সারাটা পথ কত রকম সামাজিক সমস্যা তার মনের মধ্যে ভিড় করল, আর বিবেক তার মনটাকে কুরে কুরে খেতে লাগল।

''আমি যদি সৎ ভালমানুষ হতাম, তাহলে জনমতকে কলা দেখিয়ে এই শিশুটিকে বাড়িতে আন্না ফিলিপভ্‌নার কাছে নিয়ে যেতাম, তার সামনে নতজানু হয়ে বলতাম ঃ 'আমি পাপ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর! আমি তোমাকে কেবল যন্ত্রণাই দিয়েছি, কিন্তু এই নির্দোষ শিশুটির জীবন যেন আমরা নষ্ট না করি। আমাদের তো কোন ছেলেমেয়ে নেই, অতএব আমরা ওকে দত্তক নিতে পারি!' আমার স্ত্রীর দয়ার শরীর, সে এতে সম্মতি দেবে আর তাহলেই আমার ছেলে আমার কাছেই থাকবে।''

সে মেল্‌কিনের বাড়িতে পৌঁছে গেল, ইতস্তত করে সেখানেই দাঁড়াল। কল্পনা কাল, সে যেন বসবার ঘরে বসে একটা খবরের কাগজ পড়ছে, এমন সময় একটা বাঁকা নাকওয়ালা ছোট ছেলে তার হাঁটু ধরে উঠে দাঁড়িয়ে তার ড্রেসিং-গাউনের বেল্টের ঝোপ্পা ধরে খেলা করতে লাগল। কিন্তু একই সময়ে তার কল্পনায় আরও একটা ছবি আপনা থেকেই ফুটে উঠল ঃ সহকর্মী কেরাণিদের বিকৃত মুখভঙ্গী, এক্সেলেন্সির মুচ্‌কি হাসি ও তার পেটে একটা থাপ্পড় মারা...তবু বিবেকের দংশনের পাশাপাশি তার মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে একটা সুকোমল, আতপ্ত ও ব্যাকুল অনুভূতি।

পুটুলিটাকে সে সযত্নে বারান্দার উপর রাখল, আর একান্ত নিরাশায় হাতটা নেড়ে চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। হঠাৎ তার দুই গাল বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল।

অস্পষ্ট গলায় বলে উঠল, ''আমি একটা শয়তান, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার প্রতি বিরূপ হয়ো না।''

বারান্দা থেকে নিচে নেমেই সঙ্গে সঙ্গে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে স্থির গলায় বলে উঠল ঃ

''যা হয় হোক! সব কিছু জাহান্নামে যাক! আমি ওকে নিয়ে যাব, তাতে লোক যা ইচ্ছা হয় তাই বলুক।''

পুটুলিটা তুলে নিয়ে সে দ্রুত পায়ে বাড়ির পথে হাঁটিতে লাগল।

তখনও সে ভাবছে ঃ ''লোকে যা ইচ্ছা হয় বলুক। আমি বাড়িতে ফিরে যাবই, নতজানু হয়ে বলব ঃ 'আন্না ফিলিপভ্‌না!' সে বড় ভাল মেয়ে, সে বুঝবে, ওকে আমরা দত্তক নেব। ও যদি ছেলে হয় আমরা নাম রাখব ভ্লাদিমির আর যদি মেয়ে হয় রাখব আন্না...বৃদ্ধ বয়সে আমাদের একটা আশ্রয় তো হবে।''

সেই সংকল্প...অনুযায়ী কাজই সে করল। সে কাঁদল, ভয়ে ও লজ্জায় কুঁক্‌ড়ে গেল, তবু আশা ও সংজ্ঞাতীত আনন্দে পবিপূর্ণ অন্তরে সে হাঁটিতে হাঁটিতে বাড়িতে পৌঁছেই সোজা স্ত্রীর কাছে গিয়ে নতজানু হল।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পুটুলিটাকে মেঝের উপর রেখে বলল, ''আন্না ফিলিপভ্‌না! আমাকে দয়া কর। আমার সব কথা শোন। আমি পাপ করেছি। এটি আমার সন্তান।...আমাদের পরিচারিকা আগ্নিয়াকে তোমার মনে আছে, কি জান একটা মুহূর্তের ভুল...''

ভয়ে ও লজ্জায় আত্মহারা হয়ে স্ত্রীর রায় শোনার জন্য অপেক্ষা না করেই সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল এবং বেত্রাহত কুকুরের মত দৌড়তে শুরু করল।

মনে মনে বলল, ''যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাকে না ডাকবে ততক্ষণ আমি এখানেই থাকব। এই ধাক্কাটা সামলে নিয়ে আমার যুক্তিটা বোঝবার মত সময় তো তাকে দিতেই হবে।''

ইয়েরমোলাই বাদ্যযন্ত্রটা হাতে নিয়ে তার পাশ দিয়ে যাবার সময় তার

দিকে তাকিয়ে কাঁধটা ঝাঁকাল...এক মিনিট পরে আবার মিগুয়েভকে পাশ কাটিয়ে গেল এবং আবারও কাঁধ ঝাঁকাল।

দাঁতে দাঁত চেপে সে তো-তো করে বলল, "আমি তোমাকে বলছি, এ এক আচ্ছা মুস্কিলের ব্যাপার! ধোপানি আক্সিনিয়া কিছুক্ষণ আগেই এই বাড়ির পাশ দিয়ে গেল, আর মূর্খ মেয়েমানুষটা এই বারান্দায় প্রায় রাস্তাটার উপরে বাচ্চাটাকে রেখে আমার কাছে এল, একটু বসল, আর সেই ফাঁকে কে যেন এসে বাচ্চাটাকে নিয়ে সরে পড়ল! কী সব গণ্ডগোলের ব্যাপার!"

মিগুয়েভ তারস্বরে চেঁচিয়ে বলল, "কি ? কি বলছ তুমি ?"

ইয়েরমোলাই মনিবের রাগত ভাবটাকে ভুল বুঝে বিচলিতভাবে মাথা চুলকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

মুখে বলল, "দুঃখিত সেমিয়ন এরাস্তোভিচ। কিন্তু সারা জীবনটাই এখানে কাটাবারই ফল এটা...আমি বলতে চাই, একটা পুরুষ মানুষ...মানে...একটা পুরুষ মানুষ মেয়েমানুষ ছাড়া থাকতেই পারে না..."

মুখ তুলে মনিবের বিস্মিত, ঠেলে-ওঠা চোখের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা চাওয়ার সুরে আবার বলল ঃ

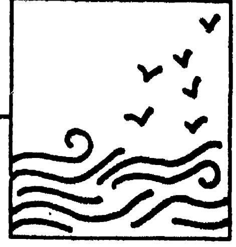
"এটা যে পাপ তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি কি করতে পারি...তোমার হুকুম ছিল কোন অপরিচিত মেয়েমানুষকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া চলবে না, সেটা আমি জানি, কিন্তু আমাদের নিজের কোন মেয়েমানুষ তো এখানে থাকে না। আগ্নিয়া যখন এখানে থাকত তখন কোন অপরিচিত মানুষকে বাড়িতে ঢুকতেই দিতাম না, কারণ তখন তো আমার নিজের মেয়েমানুষ ছিল, কিন্তু এখনকার অবস্থাটা তো তুমি নিজের চোখেই দেখছ...বাইরের মেয়েমানুষ না হলে তো থাকতে পারি না, পারি কি ? তবে একথা ঠিক যে আগ্নিয়া যখন এখানে থাকত তখন কোন অসুবিধাই ছিল না, কারণ..."

"আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা, শুয়ার কোথাকার!" মাটিতে পা ঠুকে চীৎকার করে কথাগুলি বলে মিগুয়েভ বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

বিস্মিত, ক্রুদ্ধ আন্না ফিলিপভ্‌না যেখানে ছিল সেখানেই বসে আছে; চোখের জলের ভিতর দিয়ে এক দৃষ্টিতে বাচ্চাটার দিকেই তাকিয়ে আছে।

ম্লান মুখে হাসি ফুটিয়ে মিগুয়েভ তো-তো করে বলল, "ওগো, শোন, শোন...আমি তো ঠাট্টা করছিলাম, বাচ্চাটা আমার নয়, ও তো ধোপানি আক্সিনিয়ার বাচ্চা...আমি তো ঠাট্টা করছিলাম মাত্র...ওকে ইয়েরমোলাইর কাছে দিয়ে এস, বুঝলে তো।"

১৮৮৭



জনক

The Father

''আমি স্বীকার করছি আমার একটু নেশা হয়েছে...দুঃখিত...কিন্তু, কি জান, দিনটা বড়ই গরম, তাই পথে আসতে আসতে বীয়ারের দোকানে একটু থেমেছিলাম, সেখানে দুটো বোতল শেষ করেছি। বুঝতেই পারছ, দিনটা বড়ই গরম।''

বুড়ো মুসাতভ ছেঁড়া ন্যাকড়াটাকেই রুমালের মত ব্যবহার করতে পকেট থেকে বের করে গোঁফ-দাড়িহীন শুকনো মুখটাকে মুছল।

ছেলের দিকে না তাকিয়েই সে বলল, ''বরিয়া সোনা, লক্ষ্মী ছেলে, আমি মাত্র এক মিনিটের জন্য এসেছি, আর কাজটাও খুব জরুরি। অসময়ে এসেছি বলে আমি দুঃখিত। বাপধন, আমাকে দশটা রুব্‌ল্‌ ধার দিতে পারবে? মঙ্গলবারেই শোধ করে দেব। কি জান, আমি কথা দিয়েছিলাম গতকালই বাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দেব; কিন্তু হাতে একটা টাকাও নেই। ছুরি দেখিয়েও একটা পয়সাও জোটাতে পারি নি!''

যুবক মুসাটভ নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে বাড়ির মালিক ভদ্রমহিলার সঙ্গে এবং অন্য যে কয়জন সহকর্মী কেরাণির সঙ্গে একত্রে সে এই গ্রীষ্মাবাসটি ভাড়া নিয়েছে তাদের সঙ্গে চুপি-চুপি কিছু কথাবার্তা বলল। তিন মিনিটের মধ্যেই সে ঘরে ফিরে এসে নিঃশব্দে তার বাবার হাতে একটা দশ রুব্‌লের নোট দিল। বুড়ো লোকটি নোটটা না দেখেই সেটাকে পকেটে ভরে বলল ঃ

''ধন্যবাদ। তারপর তুমি কেমন আছ? অনেকদিন আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি।''

হ্যাঁ, অনেকদিন। সেই ইস্টার-সপ্তাহ থেকে।''

''পাঁচ-পাঁচবার এখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু প্রতিবারই কোন না কোন বিঘ্ন দেখা দিয়েছে। এই একাজ, এই সে-কাজ...এই করতে করতেই আমার জানটা যাবে। অবশ্য এ সবই মিথ্যে কথা...আমি মিথ্যাবাদী। আমাকে বিশ্বাস করো না বোরিয়া সোনা। এই দশ রুব্‌ল্‌ মঙ্গলবারেই ফিরিয়ে দেব বললাম তো, কিন্তু সেটাও মিথ্যে কথা। আমি যা বলি তার এক বর্ণও বিশ্বাস করো না। আমার কোন কাজকর্ম নেই, একমাত্র আলসেমি, মাতলামি আর এই রকম ছেঁড়া পোশাকে কোথাও যাবার অনিচ্ছাই একমাত্র কারণ। বোরিয়া সোনা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। একটি ছোট মেয়েকে তিনবার তোমার কাছে পাঠিয়েছি টাকার জন্য, অনেক করুণ চিঠিও তোমাকে লিখেছি। টাকাটার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু চিঠিগুলোর

কথা তুমি বিশ্বাস করো না; তাতেও আমি মিথ্যে কথা লিখেছি। লক্ষ্মী ছেলে, তোমাকে লুটেপুটে খাচ্ছি বলে আমি দুঃখিত; আমি জানি, তোমাকেও টানাটানি করেই খরচ চালাতে হয়, পোকা-মাকড় আর বনের মধু খেয়েই তোমার দিন কাটে, কিন্তু আমারও তো নির্লজ্জ হওয়া ছাড়া পথ নেই। তুমি আমাকে ক্ষমা কর বোরিয়া সোনা। আমি তোমাকে পুরোপুরি সত্য কথাই বলছি, কারণ তোমার সোনা মুখখানি দেখলেই আমার মনে পড়ে যায় আমি কত নীচ।''

এক মিনিট চুপচাপ। বুড়ো লোকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলতে লাগল :

''তুমি যদি একটু বীয়ার বা অন্য কিছু খাওয়াতে...''

ছেলেটি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। পুনরায় দরজার পিছনে ফিস্‌ফাস্‌ শোনা গেল। একটু পরে যখন বীয়ার এসে হাজির হল তখন বুড়োর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হঠাৎ তার কথার সুর পাল্টে গেল।

সে অর্থপূর্ণভাবে বলতে লাগল, ''সেদিন রেসের মাঠে গিয়েছিলাম। আমরা তিনজনই একটা করে তিন রুব্‌লের টিকিট কেটেছিলাম। কপাল ভাল! প্রতিটি রুব্‌লে আমরা পেলাম বত্রিশ রুব্‌ল্‌। তুমি তো জান বাবা, রেসে না গিয়ে আমি বাঁচতে পারি না। এটা আমার বড় নেশা। এর জন্য আমার বুড়ি অনেক বকা-ঝকা করে, তবু আমি রেসে যাই। যত যাই ঘটুক, রেসকে আমি ভালবাসি।''

বোরিয়া যুবক। মাথাভর্তি চুল, বিষণ্ণ স্থির মুখ। ধীরে ধীরে পায়চারি করতে করতে সে বাবার কথাগুলি নীরবে শুনল। বুড়ো যখন গলাটা পরিষ্কার করে নেবার জন্য একটু থামল। তখন বোরিয়া তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল :

''জান পাপা, এই তো সেদিন একজোড়া বুট কিনলাম, কিন্তু সেটা আমার পায়ে ছোট হয়ে গেল। তুমি কি বুটজোড়া নেবে? আমি তোমাকে সস্তায় দিয়ে দেব।''

বুড়ো কিছুটা খুঁৎখুঁৎ করে বলল, ''আমি নিতে পারি, যদি তুমি ন্যায্য মূল্য নাও, কোন রকম মূল্যহ্রাস করা চলবে না!''

''ঠিক আছে। দামটা তাহলে ধার হিসাবেই নেব।''

বিছানার তলা থেকে নতুন বুটজোড়া বের করে বাবার হাতে দিল পায়ে পরে দেখার জন্য। বুড়ো নিজের বিশ্রী, বিবর্ণ, পুরনো বুটজোড়া ছেড়ে নতুন জোড়া পায়ে দিল।

বলল, ''একেবারে মাপমত হয়েছে, ঠিক আছে। এটা তাহলে আমারই রইল। মঙ্গলবার পেন্সন পেলে তোমাকে টাকাটা পাঠিয়ে দেব।'' হঠাৎ নিজের সেই পুরনো করুণ স্বরে ফিরে গিয়ে বলতে লাগল, ''অবশ্য আবারও মিথ্যে কথাই বলছি। রেসের ঘোড়ার কথাটাও মিথ্যে বলেছি, পেন্সনের কথাটাও মিথ্যে বললাম। কিন্তু বোরিয়া, তুমিও তো ঠিক কথাটি

বল নি। আমি জানি, এটা তোমার উদারতা, আমি তো তোমাকে ভালভাবেই চিনি! বুটজোড়া মাপে ছোট হল কারণ তোমার হৃদয়টা অনেক বড়! ওঃ, বোরিয়া, বোরিয়া, আমি সব বুঝি, সব কিছুই আমার মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়!''

বিষয়টা বদলাবার জন্য ছেলে প্রশ্ন করল, ''তুমি কি আবার বাড়ি পাল্টেছ?''

''ওঃ হ্যাঁ, পাল্টেছি। প্রতি মাসেই পাল্টাই। আমার মাদামটি এতই ঝগড়াটি যে মানুষের সঙ্গে বেশীদিন মানিয়ে চলতে পারে না।''

''জান, তোমার পুরনো বাড়িতে গিয়েছিলাম, আমার সঙ্গে কয়েকটা দিন এখানে কাটিয়ে যাবার আমন্ত্রণ জানাতে। তোমার স্বাস্থ্যের যা অবস্থা তাতে একটু হাওয়া বদলালে ভালই হবে।''

''না, আমার মাদাম আমাকে আসতে দেবে না, আর আমি নিজেও সেটা চাই না। একশ' বার তুমি আমাকে সেই গর্তের ভিতর থেকে টেনে বের করতে চেয়েছ, আমিও বের হতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাতে কোনই ফল হয় নি। ও সব ভুলে যাও! গর্তই আমার বাঁচার জায়গা, মরার জায়গাও বটে। এই তো এখানে তোমার পাশে বসে আছি। তোমার সোনা মুখখানি দেখছি। কিন্তু সারাক্ষণ আমাকে টানছে ঐ বাড়িটা, ঐ গর্তটা। হয়তো এটাই আমার বিধিলিপি। একটা গুব্‌রে পোকাকে তুমি গোলাপের ফুলে জোর করে বসাতে পার না। কিছুতেই পার না। যাই হোক, আমার যাবার সময় হয়ে গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে।''

''দেখ, আমি তোমার সঙ্গে যাব। আজ আমাকেও একবার শহরে যেতে হবে।''

বাবা ও ছেলে ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটা গাড়িতে চেপে তারা যখন শহরের পথে চলতে শুরু করল তখন অন্ধকার নেমে এসেছে, দুই পাশের জানালায় আলো জ্বলছে।

বুড়ো আমতাআমতা করে বলল, ''বোরিয়া সোনা, আমি তোমাকে ফতুব করে দিচ্ছি। আমার সন্তানদের কী দুর্ভাগ্য! আমার মত বাবা থাকা নিশ্চয় এক ভয়ংকর দুর্ভাগ্য। তোমার মুখের দিকে তাকালে আমি মিথ্যে বলতে পারি না। আমাকে ক্ষমা কর! একটা মানুষ কত নীচে নামতে পারে! এখানে এইমাত্র তোমার কাছ থেকে কিছু খসালাম, আমার মাতাল চোখের চাউনি দিয়ে তোমাকে বিব্রত করলাম, তোমার ভাইদেরও আমি লুটপাট করি, বিব্রত করি, অথচ তোমরা তো আমাকে আগেও দেখেছ! আমি তো কিছুই লুকোই না। কাল রাতে কয়েকজন প্রতিবেশী আর একদল বাজে মেয়েমানুষ আমার মাদামের বাড়িতে এসে জুটেছিল, তাদের সঙ্গে নেশা করলাম, তোমাদের সব ক'টি ভাইয়ের বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় বইয়ে দিলাম; বললাম, তোমরাই আমাকে ত্যাগ করেছ। আসলে আমি চেয়েছিলাম নিজে একটি দুঃখী বাবা সাজতে। আমার ধরণই ঐ রকম ঃ যখনই নিজের পাপ ঢাকতে

চাই তখনই আমার সব দুঃখ-কষ্টের বোঝা চাপিয়ে দেই সন্তানদের ঘাড়ে। বোরিয়া সোনা, তোমার কাছে আমি মিথ্যে বলতে পারি না, তোমার কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রাখতেও পারি না। নিশ্চিত হয়েই আমি তোমার কাছে এসেছিলাম কিন্তু যে মুহূর্তে তোমার ভদ্রতা, তোমার দানশীলতা চোখে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে সব কথা আমার গলায় আটকে গেল, বিবেক আমাকে দংশন করতে লাগল।''

''পাপা, অন্য কোন কথা বল।''

ছেলের কথায় কান না দিয়ে বুড়ো নিজের কথাই বলে চলল, ''ঈশ্বর-জননী, আমার সন্তানরা কত ভাল! প্রভু আমাকে কী আশ্চর্য উপহার দান করেছেন! আমার মত বাউণ্ডুলে মানুষকে এ রকম সন্তান দেওয়া উচিত হয় নি, এদের পাঠানো উচিত ছিল হৃদয়বান কোন মহৎ মানুষের ঘরে। আমি জানি, আমি এর যোগ্য নই।''

ছোট টুপিটা মাথা থেকে খুলে সে বার বার ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটি বিগ্রহের খোঁজে চারদিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগল, ''উপরওয়ালার জয় হোক। আশ্চর্য, বিরল সব সন্তান! আমার চারটি ছেলে, সকলেই চমৎকার। ধীর, স্থির, বাস্তবতাসচেতন ও মেধাবী! কী মাথা! গ্রিগরির একটা মাথাই তো দশটা মাথার সমান। অনর্গল ফরাসী ও জার্মান ভাষা বলতে পারে, আর বাগ্মিতা, একটা উকিলও তার সামনে মোমবাতি ধরার যোগ্যতা রাখে না।...আহা, কী সব ছেলে, তারা যে আমার ছেলে তা বিশ্বাসই হয় না! আমি বিশ্বাস করতে পারি না। বোরিয়া, তুমি তো আমার শহিদ ছেলে। আমি তোমাকে ধ্বংস করেছি, আর ধ্বংস করেই যাব...তোমার টাকাটা নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে জেনেও তুমি আমাকে টাকা দিয়ে যাচ্ছ। এই তো সেদিন একটা অশ্রুভরা চিঠিতে তোমাকে আমার অসুখের কথা লিখেছিলাম, কিন্তু কথাটা মিথ্যে ঃ টাকাটা চেয়েছিলাম রাম কেনার জন্য। আর তুমি আমাকে টাকাটা দিয়েই যাচ্ছ, কারণ টাকাটা না পাঠিয়ে আমাকে আঘাত দিতে তুমি ভয় পাও। সব আমি জানি, অন্তর দিয়ে অনুভব করি। গ্রিগরিও শহিদ। বৃহস্পতিবার তার আপিসে গিয়েছিলাম তাকে দেখতে। তখন আমি মাতাল, নোংরা, পরনে ছেঁড়া পোশাক, গায়ে ভদকার গন্ধ। সোজা ভিতরে ঢুকে গেলাম, একে তো এই চেহারা, তার উপর মুখে লাগাম-ছাড়া কথাবার্তা, আর সে সবই তার সহকর্মী, উপরওয়ালা ও দরখাস্তকারীদের সম্মুখে। তার তো অপমানের একশেষ। কিন্তু সে মোটেই লজ্জা দেখাল না, কেবল মুখটা একটু বিবর্ণ হল; সে হেসে এগিয়ে এসে আমাকে অভ্যর্থনা করল, এমন কি তার সহকর্মীদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর সে আমাকে নিয়ে বাড়ি ফিরল, কিন্তু পথে একটি বারও আমাকে বকা-ঝকা করল না! তোমার চাইতেও তার টাকাই তো আমি বেশী নষ্ট করি। এবার তোমার আর এক ভাই সাশার কথা ধর। সেও তো আর এক শহিদ। তুমি তো জান সে বিয়ে করেছে সম্ভ্রান্ত বংশের এক

কর্ণেলের মেয়েকে, আর বিয়েতে প্রচুর যৌতুকও পেয়েছে...তোমরা ভাবতে পার সে আমার কথা মোটেই মনে রাখবে না। সে রকম ছেলেই সে নয়। বিয়ের পরে বৌকে নিয়ে প্রথমেই সে আমার কাছেই এসেছিল...আমার গর্তে...শপথ করে বলছি এটা খাঁটি কথা।''

একবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেই পরমুহূর্তে বুড়ো হো-হো করে হেসে উঠল।

''আর এমনই কপাল ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা কাবাস দিয়ে চাক-চাক করে কাটা মূলো খাচ্ছিলাম আর মাছ ভাজা হচ্ছিল। তখন ফ্ল্যাটে যা দুর্গন্ধ তাতে স্বয়ং শয়তানও ক্ষেপে যেত! আমি মাতাল হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলাম, আমার মাদাম ছুটে গেল নববিবাহিত দম্পতিকে স্বাগত জানাতে, তার সেই ছোপ-ধরা মুখ এক কথায় বিরক্তিকর; কিন্তু সাশা সে সব কিছু সহ্য করেছিল।''

''তা ঠিক, আমাদের সাশা খুব ভাল মানুষ'', বোরিয়া বলল।

''একেবারে সেরা মানুষ! আমার সব সন্তানই খাঁটি সোনা—তুমি, গ্রিগরি, সাশা ও সোনিয়া। আমি তোমাদের যন্ত্রণা দেই, শহিদ বানাই, অপমান করি, লুঠ করি, অথচ সারা জীবন তোমাদের কারও মুখ থেকে আমাকে তিরস্কারের একটা কথাও শুনতে হয় নি, একটি বারও কারও চোখের বাঁকা চাউনি দেখতে হয় নি। তাও যদি তোমাদের বাবা একটি ভদ্র মানুষ হত, কিন্তু আমি তো অপদার্থ...তোমাদের ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু করি নি। আমি খারাপ, আমি অতি হীন...এখন তো আমি অনেক শান্ত হয়েছি, অন্তত সেজন্যও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ; আর আমি চরিত্রের কঠোরতা হারিয়েছি, কিন্তু অতীতে যখন তোমরা ছোট ছিলে তখন আমার চরিত্র ছিল কঠোর। আমি যা করতাম বা বলতাম সবই আমার কাছে উচিত বলে মনে হত। রাতে ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরতাম মাতাল হয়ে, বদ মেজাজ নিয়ে, আর সারা রাত তোমাদের স্বর্গত মাকে বকতাম সংসারের টাকা বেশী খরচ করার জন্য। সারা রাত ধরে এই বকুনি চলত, আর আমি ভাবতাম আমি ঠিকই করছি; অনেক সময় সকালে তোমরা স্কুলে যাবার পরেও তার উপর সেই একই মেজাজ দেখাতাম। উপরওয়ালা জানেন, কী বকাটাই না বকেছি তাকে, সেই শহিদটিকে! আর তোমরা যখন স্কুল থেকে ফিরতে তখনও আমি ঘুমে বিভোর হয়ে থাকতাম, আর আমার ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত তোমরা ডিনার খেতেও সাহস করতে না। আবার ডিনার খেতে বসেও সেই একই কেচ্ছার পুনরাবৃত্তি হত। হয় তো তোমাদেরও মনে আছে। আমার সেই অপরাধের জন্যই প্রভু তোমাদের এমন অসাধারণ করে গড়ে তুলেছেন। হয়তো প্রভু তোমাদের দীর্ঘ জীবনও দান করবেন। কোচোয়ান, গাড়ি থামাও!''

বুড়ো মানুষটি একলাফে গাড়ি থেকে নেমে বীয়ার-হলের দিকে ছুটে গেল। ফিরে এল আধঘণ্টা পরে বেশ মাতাল হয়ে। ছেলের পাশেই বসে পড়ল।

শুধাল, ''সোনিয়া এখন কোথায়? এখনও বোর্ডিং-স্কুলেই আছে?''

"না, মে মাসে স্কুলের পড়া শেষ করে এখন সে সাশার শাশুড়ির কাছে থাকে।"

"তাই নাকি!" বুড়ো খুশি হয়ে বলল। "ভাল মেয়ে, দাদাদের মতই হয়েছে। আঃ বোরিয়া, আজ তোমার মা নেই, এ কথা শুনে সে কত খুশি হত। আচ্ছা বোরিয়া, সোনিয়া...সে কি জানে আমি কেমন আছি?"

বোরিস জবাব দিল না। নীরবে পাঁচ মিনিটের মত সময় কেটে গেল। বুড়ো একটু ফুঁপিয়ে উঠল, ছেঁড়া রুমাল দিয়ে নাক মুছল, তারপর বলল :

"আমি তাকে বড় ভালবাসি বোরিয়া সোনা! সে আমার একমাত্র মেয়ে। মেয়েই তো বৃদ্ধ বয়সে মানুষের সেরা আশ্রয়। যদি তাকে একবার দেখতে পেতাম। তার সঙ্গে দেখা হতে পারে কি বোরিয়া?"

"তুমি চাইলেই হতে পারে।"

"সত্যি? সে কিছু মনে করবে না?"

"নিশ্চয়ই না। সে নিজেই তোমার খোঁজ করছিল!"

"সত্যি? কী সব ছেলে মেয়ে, কি বল কোচোয়ান? বোরিয়া সোনা, তুমি ব্যবস্থা করে দাও। সে এখন একজন তরুণী মহিলা, তার মর্যাদার সঙ্গে তাল রেখেই সব ব্যবস্থা ভালভাবে করতে হবে। এই রকম নোংরাভাবে তার সঙ্গে দেখা করতে চাই না। সব ব্যাপারটা এই ভাবে করতে হবে। দু'তিন দিন আমি বীয়ার খাব না, যাতে আমার মুখের ফোলা ভাবটা কেটে মানুষের মুখের আকৃতি ধরতে পারে; তারপর আমি তোমার কাছে যাব আর তোমার এক প্রস্থ সুট আমাকে ধার দেবে; আমি দাড়ি কামাব, চুল ছাঁটব, তারপর তুমি গিয়ে তাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে আসবে। ঠিক আছে?"

"খুব ভাল হবে।"

"কোচোয়ান, এখানে থামাও।"

বুড়ো আবার এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে ছুটে পাশের বীয়ার-হলে ঢুকল। নিজের ফ্ল্যাটে পৌঁছবার আগে এই রকম আরও দুই-তিনবার সে বীয়ার খাবার জন্য থামল। বোরিয়া গাড়িব ভাড়া মিটিয়ে দেবার পরে তারা যখন একটা দীর্ঘ, নোংরা চত্বর পেরিয়ে "মাদাম"-এর ফ্ল্যাটের দিকে হাঁটছিল তখন বুড়ো মানুষটি অত্যন্ত বিব্রত ও ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বার বার ঠোঁট চাটতে লাগল।

কৃপাপ্রার্থনার ভঙ্গীতে বলল, "বোরিয়া সোনা, আমার মাদাম যদি তোমাকে অশোভন কিছু বলেও তাতে তুমি কান দিও না আর...তার সঙ্গে যতদূর সম্ভব অমায়িক ব্যবহার করো। সে লেখাপড়া জানে না, তার স্বভাবটাও ঝগড়াটে, কিন্তু মানুষ হিসাবে ভাল। তার বুকের তলে যে অন্তরটা দুক্-দুক্ করে চলে সেটা যেমন দয়ালু তেমনই আতপ্ত!"

চত্বরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে বোরিয়া অন্ধকার ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকল। দরজাটা সশব্দে খুলে যেতেই রান্নার ও সামোভারের ধোঁয়ার একটা দুর্গন্ধ নাকে এল, আর কানে ঢুকল নানা জনের কর্কশ কণ্ঠস্বর। রান্নাঘরের পাশ

দিয়ে হাঁটার সময় সে দেখল কেবল কালো ধোঁয়া, দড়িতে ঝুলছে শুকোতে দেওয়া পোশাকপত্র, আর সামোভারের চিমনির ফাটল দিয়ে বিচ্ছুরিত সোনালী অগ্নিশিখা।

''এই আমার কুঠরি'', মাথাটা একটু নুইয়ে নীচু সিলিংয়ের ছোট ঘরটায় ঢুকতে ঢুকতে বুড়ো কথাগুলি বলল। রান্নাঘরের পাশে বলে ঘরটা অসহ্য রকমের গুমোট।

তিনটি স্ত্রীলোক টেবিলে বসে খানা-পিনা করছিল। একটি অপরিচিত যুবককে দেখে তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চিবনো বন্ধ করল।

তিন নারীর একটি—বোঝা গেল সেই স্বয়ং মাদাম—রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করল, ''সেটা পেয়েছ কি ?''

''হ্যাঁ, পেয়েছি, পেয়েছি'', বুড়ো কোনরকমে জবাব দিল। ''এস বোরিয়া, বস। দেখ যুবক, এখানে আমরা লৌকিকতার ধার ধারি না, সরল জীবন যাপন করি।''

সে অর্থহীন কথাবার্তা বলতে শুরু করল। ছেলের কাছে লজ্জাবোধ করছে, আবার সেই সঙ্গে এই সব মেয়েদের মহলে পুরুষালি ঢং দেখাবার শখটাও যেমন আছে, তেমনই আছে এক অসহায়, পরিত্যক্ত জনকের ভূমিকায় অভিনয় করার শখও।

সে তো-তো করে বলতে লাগল, ''হ্যাঁ যুবক, আমরা সরল জীবন যাপন করি, শৌখিন জিনিসপত্রের ধার ধারি না। আমরা সকলেই সরল মানুষ...তোমাদের মত আমরা নিজেদের জাহির করায় বিশ্বাস করি না। না স্যার...এক গ্লাস ভদ্‌কা পাব কি ?''

একটি স্ত্রীলোক (একজন অপরিচিত লোকের উপস্থিতিতে পান করাটা তার কাছে উচিত মনে হল না) দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল ঃ

''এই সব নোনা ব্যাঙের ছাতার জন্যই আমি আর এক গ্লাস নেব, এখানকার এই সব ব্যাঙের ছাতার জন্য নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তোমাকে পান করতে হবে! আইভান গেরাসিমিচ, এই যুবকটিকে জিজ্ঞাসা কর, সেও হয় তো আমাদের সঙ্গে একটু পান করবে।''

ছেলেদের দিকে না তাকিয়েই বাবা বলল, ''একটু পান কর হে যুবক। আমাদের কাছে মদও নেই, লিকারও নেই যুবক, আমরা সরল জীবন যাপন করি।''

বুড়োর ''মাদাম'' বলল, ''আমাদের সঙ্গ ওর পছন্দ হচ্ছে না।''

''বিরক্ত হয়ো না, ও আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই পান করবে।''

যাতে বাবা মনঃক্ষুণ্ণ না হয় তাই বোরিয়া গ্লাসটা হাতে নিয়ে নীরবে তাতে চুমুক দিল। সামোভার এলে বাবার খাতিরে মুখটা কালো করে চুপচাপ দুই কাপ নিরেস চা খেয়ে নিল। সেই একইভাবে নীরবে কান পেতে শুনল বাবার ''মাদাম''-এর কথাগুলি যখন সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে লাগল সেই সব নিষ্ঠুর ও নাস্তিক ছেলেমেয়েদের কথা যারা আজকের জগতে বৃদ্ধ

বাবা-মাকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বাস করে।

ভদ্‌কার নেশায় মশগুল হয়ে বুড়ো বলল, "এই মুহূর্তে কি ভাবছ তা আমি জানি। তুমি ভাবছ আমি একেবারে গাড্ডায় পড়ে গেছি, শোচনীয় অবস্থার মধ্যে ডুবে গেছি, কিন্তু আমার তো মনে হয় এই সরল জীবন তোমাদের জীবনের চাইতে অনেক বেশী স্বাভাবিক। আমার কাউকে দরকার নেই, আর...বুকে হেঁটে চলার ইচ্ছাও আমার নেই...কোন বাচ্চা ছাগল আমাকে করুণার চোখে দেখবে সেটাও আমি ঘৃণা করি।"

চায়ের পাট চুকলে সে নিজের হাতে হেরিং মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে তাতে কুঁচনো পেঁয়াজ ছড়িয়ে এমনভাবে সমাদরে সাজাতে বলল যে আবেগে তার দুই চোখ জলে ভরে উঠল। আবার সে শুরু করল রেসের ঘোড়া, তার বাজী জেতা ও পানামা খড়ের তৈরী একটা টুপির কথা যার জন্য আগের দিনই সে ষোল রুব্‌ল্ ব্যয় করেছে। যেরকম মৌজ করে সে হেরিং মাছ খেল আর ভদ্‌কা গিলল, একই রকম মৌজ করে মিথ্যে কথাটাও বলল। তার ছেলে একটা ঘণ্টা চুপ করে সব শুনল, তারপর যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

বুড়ো উদ্ধত স্বরে বলল, "তোমাকে ধরে রাখার সাহস আমার নেই। আমি দুঃখিত যুবক, তুমি যে রকম চাও সে রকমভাবে আমি জীবনটাকে চালাতে পারছি না।"

সে সগর্বে মাথা নাড়ল, ঘৃণার সঙ্গে নাক ঝাড়ল, স্ত্রীলোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ টিপল।

রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলল, "বিদায় যুবক। অ রিভোয়া।"

দরজার মুখে অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ সে ছেলের আস্তিনে মুখটা লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "শুধু সোনিয়াকে যদি দেখতে পেতাম! লক্ষ্মী ছেলে বোরিয়া, সেই ব্যবস্থাটা করো! আমি দাড়ি-গোঁফ কামাব, তোমার একটা সুট পরে...গম্ভীর হয়ে থাকব...মেয়ের সামনে চুপচাপ থাকব...সত্যি বলছি!"

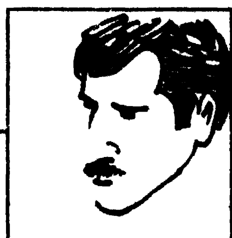
ভীরু চোখে সে একবার পিছন ফিরে তাকাল। দরজার ও পাশ থেকে স্ত্রীলোকদের উঁচু কর্কশ গলা ভেসে এল, ঢোক গিলে একটা চাপা কান্নাকে থামিয়ে বুড়ো উঁচু গলায় আবার বলল ঃ

"বিদায় যুবক। অ রিভোয়া।"

১৮৮৭

শেষ বেশ

A Happy Ending



কোন এক সাপ্তাহিক ছুটির দিনে হেড কণ্ডাক্টর নিকোলাই নিকোলায়েভিচ স্তাইচ্‌কিন তার নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে আনল লুবভ গ্রিগরিয়েভ্‌না নাম্নী জনৈকা মহিলাকে একটা কাজের কথা বলার জন্য। লুবভ গ্রিগরিয়েভ্‌না বছর চল্লিশ বয়সের একটি বড়সর, শক্ত-সমর্থ মহিলা ; সে ঘটকালি আর এমন সব কাজকর্ম করে যা নিয়ে ভদ্রসমাজে আলোচনাটা ফিস্‌ফিস্‌ করেই বলা হয়ে থাকে। স্তাইচ্‌কিন সব সময়েই গুরু-গম্ভীর, ধীর-স্থির, একটি বেরসিক মানুষ ; সে বিচলিত ভাবে ঘরময় হাঁটছে, চুরুট টানছে, আর কথা বলে যাচ্ছে ঃ

"আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হয়েছি। সেমিয়ন আইভানোভিচ আমাকে বলেছে, এমন একটা স্পর্শকাতর গুরুতর বিষয়ে আপনিই পারবেন আমাকে সাহায্য করতে যার সঙ্গে আমার জীবনের সুখটাই জড়িত। কি জানেন লুবভ গ্রিগরিয়েভ্‌না, আমার বয়সটা বাহান্ন বছর হয়ে গেল, এই বয়সে অনেকেরই বড় বড় ছেলেমেয়ে থাকে। আমি একটা ভাল পদে চাকরি করি। আমার টাকা-পয়সা বেশী নেই, কিন্তু একটি প্রিয়তমা স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতিপালন করার মত ক্ষমতা আমার আছে। নিজেদের মধ্যেই বলছি, মাইনে ছাড়াও ব্যাংকে আমার কিছু টাকা আছে, আর সেটা আমি সৎপথে থেকেই সঞ্চয় করেছি। আমি নিজে ধীর, স্থির, বিচক্ষণ মানুষ। আর সন্মানার্হ ও আইনসঙ্গতভাবে জীবন যাপন করি বলে আমি অপরের দৃষ্টান্তস্বরূপও বটে। আমার যে জিনিসের অভাব সেটা হচ্ছে নিজের সংসার ও একটি স্ত্রীর আতপ্ত পরিবেশ ; একজন ফেরিওয়ালা এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানো মানুষের মতই আমার কোথাও কোন টান নেই, একটা নিরানন্দ জীবন নিয়ে বেঁচে আছি, আমার সমস্যা বইবার কেউ নেই, অসুস্থ হলে এক ফোঁটা জল মুখে দেবারও কেউ নেই। আরও একটা কথা লুবভ গ্রিগরিয়েভ্‌না, সমাজে একজন অবিবাহিত লোকের চাইতে একজন বিবাহিত মানুষের গুরুত্ব অনেক বেশী।

...আমি শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ, আমার টাকা আছে, কিন্তু সেদিক থেকে দেখলে আমি কি ? একটি কৌমার্যব্রতধারী বা ঐ রকম কিছু। তাই সব কিছু বিবেচনা করে আমার ইচ্ছা হয়েছে, একটি যোগ্য নারীর সঙ্গে পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হব।"

"খুবই ভাল হবে," ঘটকী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল।

"আমি তো অবসর নিতে চলেছি, আর এ শহরে আমি কাউকে চিনি

না। দেখছেন তো এখানে সকলেই আমার কাছে সমান অপরিচিত, এ অবস্থায় আমি কোথায় যাব, কার কাছে আবেদন জানাব? সেইজন্যই সেমিয়ন আইভানভিচ আমাকে পরামর্শ দিয়েছে এমন একজনের কাছে আবেদন জানাতে যে এসব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ এবং মানুষের সুখের ব্যবস্থা করাটাকেই বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে। তাই আপনাকে আমি মিনতি জানাচ্ছি লুবভ গ্রিগরিয়েভ্না, আমার ভবিষ্যতের একটা বিধি-ব্যবস্থা করার কাজে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আপনি তো এ শহরের সব বিবাহযোগ্যা কনেদের খবর রাখেন, তাই আপনি সহজেই একটা ব্যবস্থা পাকা করতে পারবেন...''

''তা করা যেতে পারে...''

''দয়া করে কিছু পান করুন...''

স্বভাবগত একটা অঙ্গভঙ্গী করে সে গ্লাসটা মুখে তুলল, আর চোখের পলক না পড়তেই সবটা শেষ করে ফেলল।

সে আবার বলল, ''করা যেতে পারে। আচ্ছা নিকোলাই নিকোলায়েভিচ, কি ধরনের কনের কথা আপনি ভাবছেন?''

''আমি? ভাগ্য যে রকম পাঠাবে।''

''খুব সত্যি কথা, এ ব্যাপারটাই ভাগ্যেব হাতে। তবু প্রত্যেক মানুষেরই একটা রুচি আছে। একজন গৌরবর্ণা পছন্দ করে, আরেকজন আবার পছন্দ করে পিঙ্গলবর্ণা...''

একটা আত্মতুষ্ট নিঃশ্বাস ছেড়ে স্তাইচ্কিন বলল, ''দেখুন লুবভ গ্রিগরিয়েভ্না, আমি একজন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, চরিত্রবানও বটে। আমার কাছে রূপ ও বাইরের চেহারাটা গৌণ ব্যাপার, কারণ আপনি নিজেও ভাল করেই জানেন যে একটা মুখ শুধু মুখই, আর একটি সুন্দরী স্ত্রী থাকা মানেই হাজার ঝামেলা। আমাব তো মনে হয়, একটি নারীর বেলায় আসল জিনিসটা তাব বাইরের কিছু নয়, তাব ভিতরে যা আছে সেটাই আসল; আমি বলতে চাই তার একটা মন থাকা চাইই, আর আনুষঙ্গিক গুণগুলিও থাকা চাই। দয়া করে আরেকটু পান করুন....অবশ্য একটি সুন্দরী মোটাসোটা স্ত্রী পাওয়া তো খুবই সুখের কথা, কিন্তু পারস্পরিক কল্যাণের জন্য সেটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়ঃ আসল জিনিসটি হচ্ছে মস্তিষ্ক। কিন্তু অন্যদিকে মস্তিষ্কেরও খুব দরকার নেই, কারণ একটি নারী যদি অতিমাত্রায় বুদ্ধিমতী হয় তাহলে সে নিজের কথাই বেশী করে ভাববে আর নানা রকম চিন্তা-ভাবনা তাব মাথায় ঢুকবে। আজকালকার দিনে শিক্ষা না থাকলে চলে না সেটা বলাই বাহুল্য, কিন্তু শিক্ষাব তো অন্ত নেই। আপনাব স্ত্রী যদি অনর্গল ফরাসী ও জার্মান ভাষায় কথা বলতে পারে এবং অন্য নানা ভাষাও বলতে পারে, সেটা তো খুবই ভাল কথা; কিন্তু সে যদি ধরুন একটা বোতাম লাগাতেও না জানে, তাহলে কি লাভ হবে? আমি শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ, আমি বলতে পারি প্রিন্স কানিতেলিনেব সঙ্গে আমি কথা বলেছি, ঠিক যেরকম এখন কথা বলছি আপনার সঙ্গে, কিন্তু আমাব মতে আমি একটি সরল মানুষ। আমি চাই

একটি সরল মেয়ে। আসল কথাই হল, সে আমাকে শ্রদ্ধা করবে এবং মনে প্রাণে বুঝবে যে তার সব সুখের জন্যই সে আমার কাছে ঋণী।''

''খুবই স্বাভাবিক কথা।''

''আচ্ছা, এবার তাহলে আসল কথায় আসা যাক। ...একটি ধনবতী কনে আমি চাই না। টাকাকে বিয়ে করার মত অত নীচে আমি নামব না। আমার স্ত্রীর রুটি খাবার ইচ্ছা আমার নেই, আমি চাই সেই আমার রুটি খাবে, আর সেটা মনে রাখবে। কিন্তু তাই বলে একটি গরিব কনেও আমি চাই না। যদিও আমার কিছু সঙ্গতি আছে এবং আমি বিয়ে করছি ভালবাসার জন্য, অর্থের জন্য নয়, তবু একটি গরীব স্ত্রী আমার চলবে না, কারণ আপনি নিজেও জানেন সব জিনিসের দাম কি রকম বেড়ে গেছে ; তাছাড়া ছেলেমেয়েতো হবে।''

''একটি যৌতুকসম্পন্না কনেও আমি খুঁজে দিতে পারি,'' লুবভ গ্রিগরিয়েভ্না বলল।

''আরও একটু পান করুন, দয়া করে...''

পাঁচ মিনিটের মত দু'জনই চুপ। তারপর ঘটকী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কণ্ডাকটারের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ঃ

''আচ্ছা...চিরকুমাররা যে রকম করে থাকে সে সম্পর্কে...আপনার কি সে রকম কাউকে চাই ? আমার কাছে কিছু ভাল মাল আছে। একটি হল ফরাসী নারী, অপরটির ধমনিতে আছে গ্রীক রক্ত। দুটিই ভাল, আপনি ঠকবেন না।''

একটু ভেবে স্তাইচ্‌কিন বলল ঃ

''না, ধন্যবাদ। এবার, মক্কেলের প্রতি যখন আপনার এত দরদ, তখন একটা প্রশ্ন করতে পারি কি ঃ আপনি পারিশ্রমিক কত নেবেন ?''

''সেটা বেশী কিছু নয়। আমাকে দেবেন পঁচিশ রুবল্, আর যেমন হয়ে থাকে, একটা জামার কাপড় ; তাহলেই আপনাকে ধন্যবাদ দেব।...যদি যৌতুকের ব্যাপার থাকে তাহলে অবশ্য অন্য কথা, আরও কিছু বাড়তি দেবেন...''

দুই হাত বুকের উপর ভাঁজ করে স্তাইচ্‌কিন নীরবে একটু ভাবল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঃ

''ফি-টা বড় বেশী...''

''ওঃ, মোটেই বেশী নয়। আরে, আগেকার দিনে অনেক বিয়েতেই আমরা অল্প টাকা নিতাম, কিন্তু এখন যা অবস্থা, এ কাজ করে আমরা কতই বা পাই ? এক মাসে যদি দুটো পঁচিশ রুবলের নোট পাই তাহলেই নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করি। কি জানেন, বিয়ে থেকে এখন আর তেমন আয় হয় না।''

বিষণ্ণ চোখে ঘটকীর দিকে তাকিয়ে স্তাইচ্‌কিন একবার ঘাড় বাঁকাল।

''আপনি কি মনে করেন মাসে পঁচিশ রুবল্ কম উপার্জন হল ?'' আমি

প্রশ্ন করলাম।

"খুবই কম। আগেকার দিনে অনেক সময় একশ'র বেশীও পেতাম।"

"হুম...আমার ধারণা ছিল না আপনার মত কাজ করে একটি স্ত্রীলোক এত টাকা আয় করতে পারে। পঞ্চাশ রুব্‌ল্‌! অনেকেই তো এত টাকা উপার্জনই করে না। আর এক ফোঁটা চলবে কি?"

ঘটকী সে গ্লাসটাও শেষ করল। স্তাইচ্‌কিন তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল ঃ

"পঞ্চাশ রুব্‌ল্‌...তার অর্থ, বছরে ছয় শ'...গ্লাসটা ভরে নিন....আচ্ছা লুবভ গ্রিগরিয়েভ্‌না, আপনার উপার্জনটা যখন এত ভাল তখন আপনি তো অনায়াসেই নিজের জন্য একটা ঘটকালি করতেই পারেন।..."

"নিজের জন্য?" মহিলা হেসে উঠল। "আমি তো বুড়ি.."

"মোটেই না...আপনার চেহারাখানা এত আকর্ষণীয়, মুখখানাও বেশ ফুলো-ফুলো ও তাজা, আপনার সব কিছুইতো ভাল।

ঘটকী সচেতনভাবে রাঙা হয়ে উঠল। স্তাইচ্‌কিনও বিব্রতভাবে তার পাশেই বসে পড়ল।

বলল, "আপনি এখনও খুবই মনোহারিণী। আপনি যদি ধীব, স্থির ও মিতব্যয়ী কাউকে বিয়ে করেন, তাহলে তার বেতন আর আপনার উপার্জন মিলিয়ে তার তো আপনাকে খুবই ভাল লাগার কথা; সে ক্ষেত্রে আপনারা বাকি দিনগুলি বেশ সুখেই কাটাতে পারবেন..."

"ওঃ, নিকোলাই নিকোলায়েভিচ, আপনি কি বলছেন..."

"কেন? আমি তো কথার কথা বলেছি মাত্র..."

দু'জনই আবার চুপচাপ। স্তাইচ্‌কিন সশব্দে নাকটা ঝাড়ল, আর লুবভ গ্রিগরিয়েভ্‌নার মুখ লজ্জায় লাল ও গরম হয়ে উঠল; সলজ্জ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে শুধাল ঃ

"মাসে আপনি কত টাকা পান নিকোলাই নিকোলায়েভিচ?"

"কে, আমি? পঁচাত্তর রুব্‌ল্‌, বোনাস না ধরেই...তাছাড়া, চর্বি-বাতি ও খরগোস থেকেও কিছু টাকা আসে।"

"শিকারের কথা বলছেন?"

"আরে না, বিনা টিকিটের যাত্রীদের আমরা খরগোস বলি।"

আরও একটা মিনিট চুপচাপ কেটে গেল। স্তাইচ্‌কিন উঠে দাঁড়াল; মানসিক উত্তেজনায় মেঝেতেই পায়চারি শুরু করল।

বলল, "আমি যুবতী স্ত্রী চাই না। আমি মধ্যবয়স্ক লোক, আমি চাই এমন একটি স্ত্রী যে কিছুটা আপনার মতই হবে ধীর, স্থির, মর্যাদাসম্পন্ন...আর স্বাস্থ্যও ভাল হবে, ঠিক আপনার মতই..."

মুখের লালিমা রুমালে ঢেকে লুবভ গ্রিগরিয়েভ্‌না মুচকি হেসে বলল, "আহা! কী যে বলেন আপনি।"

"এতে বলাবলির কি আছে? আপনিই আমার মনের মত, যে সব গুণ

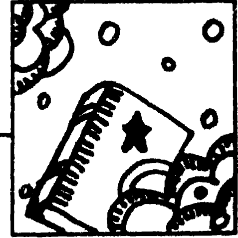
আমি চাই সে সবই আপনার মধ্যে আছে। আমি একজন সৎ, বিবেচক মানুষ ; আপনার যদি আমাকে পছন্দ হয়, তাহলে এর চাইতে ভাল আর কি হতে পারে ? অনুমতি করেন তো আমার পাণিগ্রহণ করুন।''

লুবভ গ্রিগরিয়েভ্না‌র চোখে খুশির অশ্রুজল ঝরল, সে হাসল, আর তার প্রস্তাবের সমর্থনে স্তাইচ্‌কিনের গ্লাসের সঙ্গে নিজের গ্লাসটা ছোঁয়াল।

হবু স্বামীটি মহাসুখে বলল, ''এবার তাহলে অনুমতি করুন, আপনার কাছ থেকে কি ধরনের আচরণ ও জীবনযাত্রা আমি আশা করব সেটা বুঝিয়ে বলি।... আমি একটু কড়া ধাতের মানুষ, ধীর-স্থির ও সৎ ; সব কিছুকেই আমি ভদ্রলোকের মতই বুঝতে চেষ্টা করি, আর তাই আমি চাই যে আমার স্ত্রীও সেই রকম কড়া ধাতেরই হবে এবং বুঝতে চেষ্টা করবে যে আমি তার হিতকারী, পৃথিবীতে আমিই তার কাছে প্রথম পছন্দের মানুষ।''

লোকটি বসে পড়ল, একটা গভীর নিঃশ্বাস ছাড়ল, তারপর বিবাহিত জীবন সম্পর্কে এবং স্ত্রীর কর্তব্য সম্পর্কে নিজের মতামত বোঝাতে শুরু করল।

১৮৮৭



ডাক-গাড়িতে এক রাত

Travelling With The Mail

সকাল তিনটে বাজে। টুপি ও ওভারকোট পরে, পুরনো, মরচে-ধরা তলোয়ারটা হাতে নিয়ে ডাক-হরকরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সে অপেক্ষা করছে, কতক্ষণে কোচোয়ান ডাক-ঘরের সামনে দাঁড়ানো ট্যারান্টাস গাড়িতে ডাকের বস্তাগুলি তোলা শেষ করবে। কাউন্টারের মত দেখতে টেবিলের পিছনে বসে ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে কেরাণিটি একটা ফর্ম পূরণ করতে করতে বলল ঃ

''আমার ছাত্র ভাগ্নেটি স্টেশনে যেতে চাইছে। তাকে তোমার সঙ্গে ট্যারান্টাসে চড়িয়েই নিয়ে যাও ইগ্‌নাতেভ। অবশ্য ডাকের সঙ্গে বাইরের লোক নেওয়া বারণ, কিন্তু তুমি তার কি করবে? তার জন্য আলাদা ঘোড়া ভাড়া করার চাইতে তাকে বিনা পয়সাতেই গাড়িতে তুলে নিয়ে যাও।''

উঠোন থেকে কোচোয়ান হাঁক দিল, ''সব ঠিক আছে।''

কেরাণি বলল, ''তোমরা তাহলে বেরিয়ে পড়। তোমার সঙ্গে কোচোয়ান কে যাচ্ছে ?''

''সেমিয়ন গ্লাজভ।''

''এস, এখানে সই কর।''

ডাক-হরকরা নাম সই করে বেরিয়ে গেল। ডাক-ঘরের সামনে অন্ধকারেই ত্রয়কা ও ট্যারান্টাস দুটোই চোখে পড়ল। ঘোড়াগুলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ; কেবল সামনের ঘোড়াটা অস্থিরভাবে পা ঠুকছে ও মাথা নাড়ছে, আর তার ফলে গাড়ির ঘন্টাটা টুং-টাং করে বাজছে। ডাকের বস্তায় বোঝাই ট্যারান্টাসটাকে দেখাচ্ছে একটা আকৃতিহীন কালো বস্তুর মত, তাকে ঘিরে নড়াচড়া করছে দুটি ছায়া-মূর্তি—সুটকেস হাতে ছাত্রটি, আর কোচোয়ান। শেষের জন একটা বেঁটে পাইপ টানছে ; তার ছোট শিখা অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ছে, কখনও জ্বলছে, কখনও নিভ্‌ছে : ক্ষণিকের জন্য তার আস্তিন, অথবা তামা-রং বড় নাকের নীচেকার ঘন গোঁফ, বা ঝুলন্ত ভুরু সেই আলোতে ঝলসে উঠছে।

ডাক-হরকরা হাত দিয়ে থলেগুলোকে চেপে তলোয়ারটা তাব উপরে রেখে একলাফে ট্যারান্টাসে উঠে গেল। তার পিছন-পিছন ছাত্রটিও সসংকোচে উঠে গেল, আর হঠাৎই তার গায়ে কনুইয়ের খোঁচা লাগায় সভয়ে বিনীতভাবে বলে উঠল : "দুঃখিত"। ততক্ষণে কোচোয়ানের পাইপটা নিভে গেছে। ওয়েস্টকোট ও চটি পরে কেরাণি বেরিয়ে এল, কাঁপতে কাঁপতে ট্যারান্টাসকে ঘিরে একটু হাঁটল, তারপ' বলল :

"আচ্ছা, ভগবানকে স্মরণ করে যাত্রা কর। তোমার মা মিখাইলোকে আমার শ্রদ্ধা জানিও। অন্য সকলকেও জানিও। আর তুমি ইগ্‌নাতিয়েভ, পুলিন্দাটা বাইস্ত্রেৎসভকে দিতে যেন ভুলো না। এবার গাড়ি ছেড়ে দাও!"

কোচোয়ান এক হাতে রাশ তুলে নিল, নাকটা ঝাড়ল, বসাব আসনটাকে স্থির করে নিল, জিভ দিয়ে চুক চুক্ শব্দ করে ঘোড়াগুলিকে ছুটতে বলল।

কেরাণি আবার বলল, "সব্বাইকে আমার শ্রদ্ধা জানিও।"

বড় ঘন্টাটা ঠুং-ঠাং করে ছোট ঘন্টাগুলোকে কি যেন বলল, আর তারাও মিষ্টি টুং-টাং শব্দে সাড়া দিল। ট্যারান্টাসটা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে চলতে শুরু করল, বড় ঘন্টাটা ফোঁপাতে লাগল, আর ছোট ঘন্টাগুলো কেঁপে কেঁপে বাজতে শুরু করল। কোচোয়ান আসন থেকে উঠে দাঁড়াল, সামনের অশান্ত ঘোড়াটাকে দু'ঘা চাবুক মারল, আর ত্রয়কাটা ধূলো-ঢাকা পথে সশব্দে ছুটে চলল। ছোট শহরটা ঘুমে আচ্ছন্ন। দু'পাশের গাছপালা, ঘর-বাড়ি সরে সরে যেতে লাগল, কোন জানালাতেই একটা আলোও জ্বলছে না। তারকাখচিত আকাশে দু'একটা মেঘের ফালি ভেসে বেড়াচ্ছে, আর পূব আকাশে, যেখানে অচিরেই ঊষা এসে হাজির হবে, একটা সরু বাঁকা চাঁদ ঝুলছে ; কিন্তু অনেক তারারা মিলে অথবা প্রায় সাদা নতুন চাঁদ কেউই রাতের অস্পষ্টতাকে দূর করতে পারছে না। ঠাণ্ডা বাতাসে শীতের গন্ধ।

ছাত্রটি বলল, "গ্রীষ্মকালে এই সময়ে আলো ফোটে, আর এখন ঊষার কোন লক্ষ্মণই নেই। হায়, গ্রীষ্ম তো শেষ হয়ে গেল।"

আকাশের দিকে তাকিয়ে সে আরও বলতে লাগল : "এমন কি আকাশের দিকে তাকিয়েই বলে দেওয়া যায় যে হেমন্ত এসে গেছে।

ডানদিকে তাকাও। তিনটে তারা পরপর দাঁড়িয়ে আছে—দেখতে পাচ্ছ? ওটাই কালপুরুষ, ওই নক্ষত্রপুঞ্জকে আমাদের গোলার্ধে একমাত্র সেপ্টেম্বর মাসেই দেখা যায়।''

আস্তিনের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে আর ওভারকোটের মধ্যে গুড়িসুড়ি মেরে ডাক হরকরা একটুও নড়ল না, আকাশের দিকেও তাকাল না। স্পষ্টতই কালপুরুষের প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই। তারা দেখে সে অভ্যস্ত, দেখে দেখে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটু থেমে ছাত্রটি আবার বলল ঃ

''ঠাণ্ডা, তাই না? বুঝি ভোর হবার সময় হয়েছে। তুমি কি জান, সূর্য কখন ওঠে?''

''কি?''

''এখানে সূর্য কখন ওঠে?''

''পাঁচটার পরে,'' কোচোয়ান জবাব দিল।

শহর পিছনে ফেলে ত্রয়কা এগিয়ে চলল। রাস্তার দুই ধারে সব্জি-বাগান ঘিরে ভাঙা-চোরা কঞ্চিব বেড়া দেওয়া; মাঝে মাঝেই উইলো গাছ দাঁড়িয়ে আছে। সামনে সব কিছুই কুয়াসায় ঢাকা। এখানকার খোলা জায়গায় বাঁকা চাঁদটাকে আরও বড় দেখাচ্ছে, তারাগুলো উজ্জ্বলতর। বাতাস এখন স্যাঁৎসেঁতে ও ঠাণ্ডা; ডাক-হরকরা কোটের কলারেব মধ্যে আবও ঢুকে গেল, আব ছাত্রটির মনে হল একটা কষ্টকর কনকনে ঠাণ্ডা তার পায়েব উপর দিয়ে চলে গেল, তারপর ডাকের থলেগুলোব উপর দিয়ে তার হাতে ও মুখে এসে লাগল। ঘোড়াগুলোর গতি আরও শ্লথ হল; বড় ঘন্টাটা এতই নীরব যেন ঠাণ্ডায় জমে গেছে। জলের একটা ছলাৎ হল, আর তারাগুলি সেই জলে প্রতিবিম্বিত হয়ে ঘোড়ার পা ও গাড়ির চাকাকে ঘুরে নাচতে শুরু করল।

আরও দশ মিনিটের মধ্যেই এত অন্ধকার হয়ে এল যে তারা বা বাঁকা চাঁদ কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। তাবা বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ফার গাছের কাঁটাওয়ালা ডালগুলো ছাত্রটির টুপিতে আঘাত করছে, মাকড়শার জাল জড়িয়ে যাচ্ছে তাব মুখে। সবগুলো চাকা ও ঘোড়ার ক্ষুর গাছের গুঁড়িব গায়ে ধাক্কা খেয়ে খট্ খট্ শব্দ করছে, আর ট্যারান্টাসটা মাতালের মত এঁকে বেঁকে টলতে টলতে চলেছে।

ডাক-হরকরা রেগে গিয়ে কোচোয়ানকে বলল, ''রাস্তার মাঝখান দিয়ে চালাও, এক ধার দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছ কেন? গাছের ডালে আমার মুখটাই যে ছড়ে গেল। আরও ডাইনে, শুনতে পাচ্ছ?''

এই সময় তাদের প্রায় ছিট্‌কে পড়ে যাবার উপক্রম হল। হঠাৎ ট্যারান্টাস্‌টা লাফিয়ে উঠে দুলতে লাগল, আর তারপরেই ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে একবার বায়ে, একবার ডাইনে টাল খেতে খেতে ঘড়-ভাঙা তীব্র গতিতে রাস্তা ধরে ছুটে চলল। কোন কিছুর জন্য ভয় পেয়ে ঘোড়াগুলো লাফাতে শুরু করল।

''হোয়া! হোয়া!'' কোচোয়ান আর্তনাদ করে উঠল। ''হোয়া, শয়তানের

দল!''

যাতে ছিটকে ট্যারান্টাস থেকে পড়ে না যায় সেই জন্য শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে ছাত্রটি শুয়ে পড়ে একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করল; কিন্তু ডাকের চামড়ার থলেগুলি তখন ভয়ংকর পিছল হয়ে গেছে, তাই নিরুপায় হয়ে সে যখন কোচোয়ানের কোমরবন্ধটা চেপে ধরল তখন সে তার আসনের উপর এমনভাবে লাফাচ্ছে যে যেকোন সময় নিজেই ছিট্‌কে নীচে পড়ে যেতে পারে। চাকার খটাখট আওয়াজ আর ট্যারান্টাসের ক্যাঁচর-ক্যাঁচর শব্দকে ছাপিয়ে ছাত্রটি শুনতে পেল তলোয়ারটা সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল, আর পরমুহূর্তেই একটা কিছু ট্যারান্টাসের উপর বার বার আছড়ে পড়তে লাগল।

পিছন দিকে হেলে কোচোয়ান মর্মভেদী চীৎকারের সঙ্গে বলে উঠল, ''হোয়া! হোয়া!''

ছাত্রটি কোচোয়ানের আসনের উপর সপাটে পড়ে গেল, তার কপালটা কেটে গেল, কিন্তু পরের ধাক্কাতেই তার শরীরটা অন্য দিকে বেঁকে গেল, আর লাফিয়ে ওঠার দরুণ তার পিঠটা সজোরে ধাক্কা খেল ট্যারান্টাসের পিছন দিকটাতে। বিদ্যুৎগতিতে তার মাথার মধ্যে এই চিন্তাটাই খেলে গেল যে সে গাড়ি থেকে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঠিক পর মুহূর্তেই ত্রয়কাটা বন ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় পৌঁছে গেল, ডান দিকে খাড়া বাঁক নিয়ে খটাখট্‌ শব্দে একটা কাঠের সেতু পার হয়ে এত হঠাৎই থেমে গেল যে ছাত্রটি আবার ছিট্‌কে গাড়ির সামনে পড়ে গেল।

কোচোয়ান ও ছাত্র দু'জনই তখন হাঁপাচ্ছে। ডাক-হরকরাকে গাড়ির মধ্যেও দেখা গেল না। তলোয়ার, ছাত্রটির সুটকেস একটা ডাকের থলের সঙ্গে সে গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে গেছে।

বনের ভিতর থেকে ডাক-হরকরার চীৎকার ভেসে এল, ''থাম হে বদমাস! থাম! তুমি জাহান্নামে যাও!'' তার কণ্ঠস্বরে বেদনা ও ক্রোধ দুই-ই সমান প্রকট। কোচোয়ানের দিকে ছুটে এসে ঘুষি পাকিয়ে সে বলে উঠল, ''শুয়োরের বাচ্চা! তোমাকে আজ কা-কা ডাকিয়ে ছাড়ব।''

ঘোড়াগুলোর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কোচোয়ান সখেদে তো-তো করে বলতে লাগল, ''হায় দয়ালু প্রভু, এ কী ঘটে গেল! আর সব দোষ ঐ সামনের ঘোড়াটার! একেবারে বাচ্চা, সবে এক সপ্তাহ হল ওটাকে গাড়িতে বাঁধা হয়েছে। ও যখন সমতলে চলে তখন সব ঠিক আছে, কিন্তু একবার যদি উৎরাই পায়—তাহলেই ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়। নাকের ডগায় গোটা দুই আচ্ছা চাপড় কসালেই ওর শিক্ষা হয়ে যাবে...হোয়া! শয়তান!''

কোচোয়ান যখন ঘোড়াগুলোর দেখাশোনা করে সুটকেস, ডাকের থলে ও তলোয়ারের খোঁজ করতে গেল, তখনও ডাক-হরকরা সাশ্রু নয়নে তারস্বরে তাকে গালমন্দ করতে লাগল। কোচোয়ান মালপত্র তুলল তারপর প্রায় পঞ্চাশ গজ পথ ঘোড়াগুলোকে অপ্রয়োজনেই হাঁটিয়ে নিয়ে গেল, এবং শেষ

পর্যন্ত নিজের আসনে উঠে বসল।

বিপদ কেটে যাবার পরে ছাত্রটির মনে হল, এ সবই বেশ মজার ব্যাপার। জীবনে এই প্রথম সে রাতের ডাক-গাড়িতে যাচ্ছে ; ঘোড়াগুলোর লাফালাফি, ডাক-হরকরার গাড়ি থেকে ছিটকে পড়া, আর তার পিঠের ব্যথা—এ সবই একটা উত্তেজনাপূর্ণ অ্যাডভেঞ্চারের অংশ স্বরূপ। একটা সিগারেট ধরিয়ে সে হাসতে হাসতে বলল ঃ

''আরে, এ ধরনের ঝাঁকাঝাঁকিতে একজনের ঘাড় তো সহজেই ভেঙে যেতে পারত! আমি তো প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম, আর তুমি যে কখন পড়ে গেলে সেটা টেরও পাই নি। হেমন্তকালে এ ধরনের ভ্রমণ যে কি রকম হতে পারে সেটাও কল্পনা করতে পারছি।''

ডাক-হরকরা কিছুই বলল না।

ছাত্রটি শুধাল, ''তুমি কি অনেক দিন ডাক বইছ?''

''এগারো বছর।''

''এত বেশী দিন! আর প্রত্যেক দিন?''

''প্রত্যেক দিন। ডাক পৌঁছে দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসি। কেন বল তো?''

এগারো বছর ধরে প্রতিদিন যাতায়াত করলে নিশ্চয় অনেক আকর্ষণীয় অ্যাডভেঞ্চারের অভিজ্ঞতা হয়েছে। পরিষ্কার গ্রীষ্মকালের রাতে এবং হেমন্তকালের মেঘাচ্ছন্ন রাতে, আবার শীতের রাতে গর্জনমান বরফ-ঝড়ে ঘোড়াগুলো যখন দিক হারিয়ে ফেলে, তখন অবস্থাটা অবশ্যই ভীতিপ্রদ ও রোমহর্ষক। তার জীবনেই অনেকবার হয়তো ঘোড়ারা দাপাদাপি করেছে, ট্যারান্টাসের ঢাকা মাটিতে আটকে গেছে, ডাকাতরা তার উপর হামলা করেছে, সে বরফ-ঝড়ে পথ হারিয়েছে...

ছাত্রটি বলল, ''এই এগারো বছরে তোমার যে কত রকম অসমসাহসিক অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটাও আমি কল্পনা করতে পারি! আমি তো মনে করি ডাক বয়ে নিয়ে যাওয়াটা খুব ভয়ের কাজ। তাই না?''

ডাক-হরকরা তার কিছু অভিজ্ঞতার কথা শোনাবে এই আশায় সে অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু লোকটি একবারও মুখ খুলল না, বরং ক্রমেই কোটের কলারের মধ্যে বেশী করে ডুবে গেল। ইতিমধ্যে দিনের আলো ফুটতে শুরু করল। আকাশের রং কিছু বদলাল না, যেমন অন্ধকার ছিল তেমনই থাকল, কিন্তু ঘোড়া, কোচোয়ান, এবং রাস্তাটাকে বেশ বোঝা যেতে লাগল। বাঁকা চাঁদটা ক্রমেই আরও সাদা হচ্ছে, মেঘের কোলেও যেন ঈষৎ হলুদের ছোপ লেগেছে। ডাক-হরকরার মুখটাও দেখা যাচ্ছে। শিশিরে ভিজে মুখটা হয়ে উঠেছে মৃত মানুষের মুখের মত ধূসর ও নিশ্চল। একটা একঘেয়ে, বিষণ্ণ ঘৃণা যেন তার মুখের উপর জমাট বেঁধে আছে, বুঝিবা এখনও কোচোয়ানের উপর সে বিরক্ত বোধ করছে, ক্ষেপে আছে।

সেই জমাট ঘৃণা-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে ছাত্রটি বলে উঠল, ''ঈশ্বরকে

ধন্যবাদ, আলো ফুটে উঠছে। আমি শীতে একেবারে কাঠ হয়ে গেছি। সেপ্টেম্বরের রাত ঠাণ্ডাই হয়, কিন্তু সূর্য উঠলেই ভুলে যেতে হয় এখানে কখনও শীত পড়েছিল! আর বোধ হয় বেশী পথ বাকি নেই, কি বল?''

ডাক-হরকরা এঁকে-বেঁকে কেঁদে ফেলার মত মুখ করল। ''সত্যি, এত কথা বলতেও তুমি ভালবাস। বক্ বক্ না করে কি তুমি গাড়িতে চলতে পার না?'' সে বলল।

ছাত্রটি অপ্রস্তুত হল, বাকি পথটা লোকটিকে সম্পূর্ণ একা থাকতে দিল। বেশ তাড়াতাড়ি দিনের আলো বাড়তে লাগল। বাঁকা চাঁদটা ম্লান হতে হতে ধূসর আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেল, তার নীচের মেঘটা হলুদ হয়ে উঠল, তারারা নিভু নিভু হয়ে এল, কিন্তু পূর্ব দিগন্ত তখনও শীতার্ত, তার রংটাও বাকি আকাশের মতই, সূর্যটা যে তার পিছনেই লুকিয়ে আছে সেটা যেন বিশ্বাসই হয় না।...

প্রাতঃকালের শীত আর ডাক-হরকরার বিষণ্ণতা ক্রমেই কম্পিতদেহ ছাত্রটির মধ্যেও সঞ্চারিত হতে লাগল। বিরূপ অন্তরে সে দৃশ্যটার দিকে তাকাল, আতপ্ত সূর্যের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, আর ভাবল এমন শীতের রাতে গাছপালা ও ঘাসদের না জানি কত কষ্ট ভোগ করতে হয়। সূর্য উঠলেও তাকে কেমন যেন ঘুম-ঘুম, অস্পষ্ট ও ঠাণ্ডা দেখাল। লোকে বইতে যে রকম লিখে থাকে উদীয়মান সূর্যের সে রকম কোন সোনালী আভা গাছের মাথায় মাথায় ছড়িয়ে পড়ল না, সূর্যের কিরণমালাও মাটির বুকে পা ফেলে ফেলে হাঁটল না, সদ্য ঘুম-ভাঙা পাখিদের উড়ে চলার মধ্যেও কোন আনন্দের রেশ দেখা গেল না। রাতেব মতই উদিত সূর্যও যেন শীতের চাদরে মোড়া...

গাড়িতে যেতে যেতে ছাত্রটি নিদ্রাতুর বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল গ্রামাঞ্চলেব বড় বড় বাড়ির পর্দা-ঢাকা জানালার দিকে। সে ভাবল, জানালাগুলোর ওপারে মানুষগুলি সব গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, ঘন্টার আওযাজ তারা শুনতে পাচ্ছে না, এই শীতে কষ্ট পাচ্ছে না, ডাক-হরকরার কালো মুখটাও তাদের দেখতে হচ্ছে না, আর ঘন্টার টুং টাং শব্দে যদি কোন যুবতী কুমারীর ঘুম ভেঙেও যায়, তাহলেও সে পাশ ফিরে শুয়ে মধুর আরামে ও শান্তিতে একটু হাসবে, তারপর দুই পা ভেঙে একটা হাতের উপর মুখটা রেখে মধুরতর ঘুমে ঢলে পড়বে...

বড় বাড়ির অনতিদূরের ঝিল-মিল করা পুকুরটার দিকে তাকিয়ে ছাত্রটি সেই মাছদের কথা ভাবতে লাগল যারা ঠাণ্ডা জলে বাস করে...

অপ্রত্যাশিতভাবে ডাক-হরকরা বলে উঠল, ''এ গাড়িতে যাত্রী নেবাব হুকুম নেই! সেটা নিষিদ্ধ! আর যেহেতু সেটা চলবে না, তাই বাইরের লোকরা এ গাড়িতে চড়তে চাইবেন না।...আমার দিক থেকে তাতে কোন ফারাক নেই, তবু আমি সেটা পছন্দ কবি না, চাইও না।''

''এটা যদি তোমার এতই অপছন্দ তাহলে আমাব বেলায় তুমি আপত্তি

কর নি কেন?"

ডাক-হরকরা এপ্রশ্নের কোন জবাব দিল না, কিন্তু সে আগের মতই অমিত্রসুলভ ঘৃণার ভাবই পোষণ করে থাকল। কিছুক্ষণ পরে রেল স্টেশনে ঢোকার মুখে যখন ত্রয়কাটা থামল তখন ছাত্রটি ডাক-হরকরাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে পড়ল। মেল ট্রেনটা তখনও এসে পৌঁছয় নি। পাশের লাইনের উপর একটা লম্বা মাল বোঝাই ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে; ইঞ্জিনের চালক ও তার সহকারী শিশিরে ভেজা মুখেই একটা নোংরা টিনের কেট্‌লি থেকে চা খাচ্ছে। কামরাগুলো, প্ল্যাটফর্মটা, বেঞ্চিগুলো সবই ভেজা ও ঠাণ্ডা। ডাক-গাড়িটা না আসা পর্যন্ত ছাত্রটি প্রতীক্ষালয়ের ভিতরেই বসে থাকল, দোকানে গিয়ে চা খেল; আর ডাক-হরকরা আস্তিনের ভিতর হাত ঢুকিয়ে, মুখের উপর ঘৃণার দৃষ্টিটা অক্ষুণ্ণ রেখে একা একা প্ল্যাটফর্মে হাঁটিতে লাগল সম্মুখের জায়গাটার উপরে চোখ রেখে।

সে কার উপর রাগ করে আছে? মানুষজন, দারিদ্র্য, না হেমন্তের বাত?

১৮৮৭



পলাতক

The Fugitive

ব্যাপারটা দীর্ঘমেয়াদী। প্রথমে পাশ্‌কা মায়ের সঙ্গে হাঁটিল ফসল-কাটা মাঠের ভিতর দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে, তাবপর হাঁটিল বনের পথ ধরে যেখানে হলুদ পাতা সেটে গেল তাব বুটের তলায়, আর তারপরেও তারা হেঁটেই চলল একেবারে ভোর পর্যন্ত। তারপর অন্ধকারে একটা ঢাকা বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে থাকল দু'ঘন্টার কম নয়, কখন দরজাটা খোলে তারই প্রতীক্ষায়। এ জায়গাটা বাইরের মত ততটা ঠাণ্ডা ও স্যাঁৎসেঁতে নয়, কিন্তু মাঝে মাঝেই বাতাসে জলের ঝাপটা আসছিল। জায়গাটাতে যখন মানুষের ভিড় জমে গেল আর সকলে তাকে এমন ভাবে চেপে ধরল যে পাশ্‌কা নড়াচড়াই করতে পারছিল না তখন সে একজনের ভেড়ার চামড়ার কোটে মুখটা চেপে ধরল; কোট থেকে নোনা মাছের তীব্র গন্ধ নাকে আসায় সে একটু ঢুলতে শুরু করল। হঠাৎ দরজাটা সশব্দে খুলে যেতেই পাশ্‌কা ও তার মা প্রতীক্ষালয়ের ভিতরে ঢুকে গেল। সেখানে আবার দীর্ঘ প্রতীক্ষা। সব রোগীই বেঞ্চিতে বসে আছে, কেউ নড়াচড়া করছে না, কথা বলছে না। পাশ্‌কাও তাদের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল, যদিও অনেক অদ্ভুত ও মজার জিনিস তার চোখে পড়ল। কেবল একবার যখন একটি যুবক এক পায়ে ভর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকল তখন পাশ্‌কা মুচকি হেসে মাকে খোঁচা দিয়ে বলল:

"মা, দেখ, একটা চড়ুই পাখি!"

"কথা বলে না বাবা, চুপ কর," মা বলল।

অপর একটা দরজায় একটা ছোট জানালা ছিল। এবার স্বাস্থ্য-কর্মীর ঘুম-ঘুম্ মুখটা সেখানে দেখা দিল।

গম্ভীর স্বরে সে বলল, "এগিয়ে এস, নাম নথিভুক্ত কর।" লাফিয়ে-চলা মজার লোকটি সহ সকলেই জানালা পর্যন্ত 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। স্বাস্থ্য-কর্মী প্রতিটি রোগীকেই তার নাম, ধাম, বয়স, কতদিন অসুখ হয়েছে, এই সব প্রশ্ন করল। মা যে ডাকে সাড়া দিল তা থেকেই পাশ্‌কা বুঝতে পারল তার আসল নাম পাভেল গালাক্‌তিওনভ, তার বয়স সাত বছর, সে লিখতে বা পড়তে জানে না, আর তার অসুখ চলছে গত ইস্টারের সময় থেকে।

নাম নথিভুক্ত হবার পরে সাদা এপ্রণের উপর তোয়ালে জড়িয়ে ডাক্তার যখন ঘরের ভিতর দিয়ে অস্ত্রোপচার-ঘরে ঢুকল তখন প্রত্যেককেই উঠে দাঁড়াতে হল। লাফিয়ে চলা যুবকটির পাশ দিয়ে যাবার সময় ডাক্তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঁচু সুরেলা গলায় বলল ঃ

"কী বোকা হে তুমি! বল, এটা বোকামী নয়? তোমাকে আসতে বলেছিলাম সোমবার, আর আজ শুক্রবার। আমি যতদূর বুঝতে পারছি, তোমার আর এসেই দরকার নেই, তবে তোমার পাটি যাবে, বোকার হদ্দ!"

যুবকটি এমন করুণ মুখে তাকাল যেন ভিক্ষা চাইছে; দ্রুত চোখ পিট্‌পিট্ করে সুর করে বলল,

"দয়া করুন আইভান নিকোলাইচ, দোহাই!"

"আইভান নিকোলাইচ দয়া করুন," ডাক্তার যুবকটির সুর নকল করে বলল। "তোমাকে সোমবার আসতে বলা হয়েছিল, আর যা বলা হবে তাই তোমাকে করতে হবে। তুমি একটা আস্ত বোকা..."

এবার ডাক্তার রোগীদের নাম ধরে ডাকতে শুরু করল। ছোট অস্ত্রোপচাব ঘর থেকে মর্মভেদী চীৎকার ভেসে এল; একটি শিশু কাঁদছে আর ডাক্তার ক্রুদ্ধ গলায় বলছে ঃ

"চেঁচিয়ে" না! মনে হচ্ছে আমি বুঝি তোমার গলাটাই কেটে ফেলছি! চুপ'করে বস!"

এবার পাশ্‌কার পালা।

"পাভেল গালাক্‌তিওনভ," ডাক্তার হাঁক দিল।

তার মার তো মূর্ছা যাবার মত অবস্থা, যেন ডাকটা যে আসবে তা সে জানতই না। পাশ্‌কার হাত ধরে সে ঢুকল। ডাক্তার টেবিলে বসে অন্যমনস্কভাবে একটা ছোট হাতুড়ি দিয়ে সামনের মোটা বইটাকে ঠুকছিল।

পাশ্‌কা ও তার মার দিকে না তাকিয়েই ডাক্তার শুধাল, "কি হয়েছে?"

"ছেলের কনুইতে একটা ঘা হয়েছে স্যার," পাশ্‌কার মা এমন্ দুঃখী

মুখ করে উত্তরটা দিল যেন পাশ্কার কনুইয়ের ঘা নিয়ে সে ভয়ংকর চিন্তিত।

"পোশাকটা খোল।"

হাঁসফাঁস করতে করতে পাশ্কা গায়ে জড়ানো শালটা খুলে ফেলল, ভেড়ার চামড়ার ছোট কোটের আস্তিনে নাকটা মুছল, তারপর কোটটা টেনে খুলতে লাগল।

ডাক্তার রাগ করে বলল, "দেখ মেয়ে, তুমি তো এখানে চা খেতে আস নি! তাড়াতাড়ি কর। তুমি তো একমাত্র রোগী নও।"

পাশ্কা তাড়াতাড়ি কোটটাকে মেঝের উপর ছুঁড়ে দিল, আর মার সহায়তায় শার্টটাও টেনে খুলে ফেলল। ডাক্তার তার দিকে এক নজর তাকিয়ে খোলা পেটটায় হাত বুলোতে লাগল।

"পেটটাকে তো বেশ ভালই ফাঁপিয়ে তুলেছ হে পাশ্কা?" কথাটা বলে ডাক্তার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। "ঠিক আছে, এবার তোমার কনুইটা দেখাও।"

পাশ্কা বাঁকা চোখে বেসিনের রক্তের ছোপের দিকে তাকাল, ডাক্তারের এপ্রণটা দেখল, তারপর কাঁদতে শুরু করল।

"ভ্যাঁ-ভ্যাঁ-ভ্যাঁ" ডাক্তার তাকে ঠাট্টা ক'রে বলল। "তোমার তো বিয়ের বয়স হয়ে গেছে, আর তুমি ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদছ! তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।"

চোখের জলটা এক ঢোকে গিলে নিয়ে ইসারায় মাকে জানিয়ে দিল : "তুমি বাড়িতে কাউকে বলো না যে আমি ডাক্তারের কাছে কেঁদেছি।"

ডাক্তার কনুইটা পরীক্ষা করল, ঘাটা টিপল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আপত্তির ভঙ্গীতে ঠোঁট দিয়ে চুক্‌চুক্ শব্দ করল, তারপর আর একবার টিপল।

বলল, "তোমাকে আচ্ছা করে পেটানো দরকার গো মেয়ে। একে আরও আগে আন নি কেন? ওর হাতটা তো সারবে না। এই দেখ, বোকা মেয়ে, হাড়ের জোড়টাই পচে গেছে।"

পাশ্কার মা বলল, "আপনি যা ভাল বোঝেন স্যার!"

"তোমারা ঘায়ে পোকা ফেলবে আর এখানে এসে বলবে 'আপনি যা ভাল বোঝেন।' হাতটা গেলে ও কাজ করবে কেমন করে? নিজের নাকে একটা ফুস্কুরি হলে হাসপাতালে ছুটবে, আর বাচ্চাটার অসুখ নিয়ে হেলাফেলা করবে দু' মাস ধরে। তোমরা সবাই সমান।"

ডাক্তার একটা সিগারেট ধরাল। সিগারেট টানতে টানতেই সে মাকে বকতে লাগল। কোমর পর্যন্ত উলঙ্গ পাশ্কা তার সামনে দাঁড়িয়ে বকুনিটা শুনল আর সিগারেটের ধোঁয়া দেখল। সিগারেটটা শেষ করে ডাক্তার একটু নড়েচড়ে বসে নীচু গলায় বলল :

"শোন গো মেয়ে, মলম বা ফোটা দিয়ে এখানে কিছু ফল হবে না। ওকে হাসপাতালে রেখে যেতে হবে।"

''আপনি যদি বলেন তো রেখেই যাব।''

''আমরা ওর হাতে অস্ত্রোপচার কবব। তুমি থেকে যাও পাশ্‌কা'', পাশ্‌কার কাঁধে চাপড় দিয়ে ডাক্তার বলল। ''তোমার মা বাড়ি চলে যাক, তুমি আর আমি এখানেই থাকব। এখানে তোমার ভাল লাগবে, বেশ আরামে থাকবে। জান পাশ্‌কা, কনুইয়ের ঝামেলাটা মিটে গেলেই আমরা দু'জনে উড়াল পাখি ধরতে যাব ; তোমাকে একটা শেয়াল দেখাব। আর দু'জনে মিলে অনেক জায়গায় বেড়াব। ভাল হবে না? তোমার মা কাল আবার আসবে। ঠিক আছে ?''

পাশ্‌কা মার দিকে তাকাল।

''থেকে যাও বাবা'', মা বলল।

ডাক্তার সানন্দে চেঁচিয়ে বলল, ''ও থেকে যাবে, ও থেকে যাবে। আর কিচ্ছু বলতে হবে না। ওকে একটা জ্যান্ত শেয়াল দেখাব। দু'জন এক সাথে মেলায় যাব, ভাঁপা পিঠে কিনব। মারিয়া ডেনিসভ্‌না ওকে উপরে নিয়ে যাও।''

ডাক্তাবকে দেখে সদাশয ও সদানন্দ মানুষ বলেই মনে হয় ; পাশ্‌কাকে কাছে পেয়ে সে খুশিই হল। পাশ্‌কাও তাকে খুশি রাখতেই চায়, তাব বড় কারণ সে কখনও মেলা দেখে নি আর একটা জ্যান্ত শেয়াল দেখতে পাওয়াটাও কম কথা নয়। কিন্তু মাকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে তো? মুহূর্তের জন্য সে ভেবেছিল ডাক্তারকে বলবে তার মাকেও যেন হাসপাতালে রেখে দেওয়া হয়, কিন্তু মুখে সে কথা বলার আগেই মারিয়া ডেনিসভ্‌না তাকে নিয়ে সিঁড়িতে পা দিল। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতেই সে হা হয়ে গেল। সিঁড়ি, মেঝে, দরজার ফ্রেম সব কিছুই খুব বড় মাপের, সোজা ও ঝকমকে, সুন্দর হলুদ রং-করা, সূর্যমুখী তেলের সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে। সর্বত্র ঝোলানো বাতি, দেযাল থেকে বের-কবা তামার জলের কল। কিন্তু পাশ্‌কার সবচাইতে ভাল লেগেছে বিছানাটা, যার উপর তাকে বসতে বলা হয়েছে আর তার ধূসব মোটা কম্বলটা। সে বালিশে ও কম্বলে আঙুল বুলাল, ঘবের চারদিকটা দেখল, আর বুঝতে পারল, ডাক্তারের জীবনযাত্রাটা মোটেই খারাপ নয়।

ওয়ার্ডটা বড় নয়, মাত্র তিনটে শয্যা। একটা খালি, অপরটা পাশ্‌কার দখলে, আর তৃতীয়টাতে বসে আছে চোখের অসুখ নিয়ে একটি বুড়ো মানুষ ; সে বারবার কাশছে আর একটা মগে থুথু ফেলছে। নিজের বিছানায় বসে খোলা দরজা দিয়ে পাশকা আর একটা ওয়ার্ডের কিছু অংশ দেখতে পাচ্ছে। দুটো শয্যা তার চোখে পড়ল ঃ একটাতে শুয়ে আছে একটি খুব বিবর্ণ শুক্‌নো লোক ; তার মাথায় একটা রবারের থলি ; মনে হল সে ঘুমিয়ে আছে ; অপরটিতে মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একটি লোক বসে আছে, তাকে ব্যাণ্ডেজের জন্য একটি মেয়েমানুষের মত দেখাচ্ছে।

পাশ্‌কাকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে মারিয়া ডেনিসভ্‌না বেরিয়ে গেল এবং

একটু পরেই হাত-ভর্তি পোশাকপত্র নিয়ে ফিরল।

''এগুলো তোমাব জন্য'', সে পাশ্‌কাকে বলল। ''পবে নাও।''

পাশ্‌কা গায়ের পোশাক খুলে খুশি মনে নতুন পোশাক পরতে লাগল। প্যান্ট, শার্ট ও একটা খাটো ধূসর রংয়ের ড্রেসিং-গাউন পরে সে সগর্ব দৃষ্টিতে নিজেকেই দেখতে লাগল; তার ইচ্ছা হল, এই পোশাকে যদি একটিবার গ্রামের পথে বেড়িয়ে আসতে পারত! সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল, তাদের শুয়োরের খাবার জন্য কিছুটা বাঁধাকপির পাতা আনতে সে নদীর ধারের সব্জি ক্ষেতে চলেছে, আর সব ছেলেমেয়ে তাকে ঘিরে ধরে ঈর্ষাকাতর চোখে তার ড্রেসিং-গাউনটাকে দেখছে।

দুটো টিনের বাটি, দুটো চামচ ও দুই টুকরো রুটি নিয়ে নার্স ঘরে ঢুকল। একটা বাটি বুড়োর সামনে রাখল, অন্যটা পাশ্‌কার সামনে।

''খাও'', নার্স তাকে বলল।

পাশ্‌কা দেখল, বাটিতে আছে বাঁধাকপির মসলাদার ঝোল, তার মধ্যে একটুকরো মাংস ভাসছে। পাশ্‌কা ভাবল, ডাক্তারেব জীবনটা মোটেই মন্দ নয়, আর সেও আগে যতটা ভেবেছিল ততটা বিপদে পড়ে নি। প্রতিবার গিলবার পবে চামচটাকে চেটেপুটে ধীরে ধীরে সে ঝোলটা খেয়ে ফেলল, তারপর একটুকরো মাংস ছাড়া আর কিছুই যখন বাটিতে রইল না তখন সে চোরা চাউনিতে বুড়ো লোকটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল, তার বাটিতে তখনও কিছুটা ঝোল অবশিষ্ট আছে। একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে পাশ্‌কা মাংসের টুকরোটার দিকে তাকাল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও অচিরেই মাংসের টুকরোটাও অদৃশ্য হয়ে গেল। পড়ে রইল কেবল একটুকরো রুটি। সঙ্গে কিছু না থাকলে শুধু রুটিটা খাওয়া কিছু সুখের ব্যাপার নয়, কিন্তু রুটিটাই তো পড়ে আছে। অগত্যা পাশ্‌কা রুটিটাও চিবিয়ে চিবিয়ে খেযে ফেলল। ঠিক তখনই নার্স আরও দুটো বাটি নিযে ফিরল। এবার বাটিতে ছিল ঝল্‌সানো গো-মাংস ও আলু।

সে পাশ্‌কাকে জিজ্ঞাসা করল, ''তোমার রুটি কোথায গেল?''

উত্তরে পাশ্‌কা গাল ফুলিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ল।

নার্স খুঁৎখুঁৎ করে বলল, ''তুমি আবার ওটা গিলতে গেলে কেন? এখন ঝল্‌সানো মাংসটা কি রুটি ছাড়া খাবে, না কি?''

সে বেরিয়ে গিয়ে আর একটুকরো রুটি নিয়ে এল। পাশ্‌কা জীবনে কখনও ঝল্‌সানো গো-মাংস খায় নি, এবার খেয়ে বুঝল স্বাদটা খুব ভাল। সে বাঘের মত মাংসটা খেয়ে ফেলল, কিন্তু রুটির বড় টুকরোটা রয়েই গেল। বুড়ো খাওয়া শেষ করে রুটিটাকে রেখে দিল বিছানার পাশের টেবিলের টানার মধ্যে। পাশ্‌কাও তাই করতে চেয়েছিল, কিন্তু কি মনে করে সেটাও খেয়ে ফেলল।

তারপর ভরাপেটে একটু বেড়াতে বের হল। পাশের ওয়ার্ডেই দেখতে পেল, খোলা দরজা দিয়ে দেখা দু'জন ছাড়া সেখানে আরো চারটি রোগী

আছে। পাশ্‌কার দৃষ্টি কেবল একজনের উপরই পড়ল। ঠেঙার মত শুট্‌কো একটা লোক, বিষণ্ন ও চুলভর্তি মুখ ; বিছানায় বসে মাথা দোলাচ্ছে আর ডান হাতটা নাড়ছে। পাশ্‌কা লোকটার দিক থেকে চোখ ফেরাতেই পারল না। প্রথমে সে ভাবল, এই দোলানো ও নাড়ানোটা মজার ব্যাপার, লোককে হাসাবার জন্যই করা হচ্ছে, কিন্তু লোকটির মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে বুঝতে পারল সে খুব কষ্ট পাচ্ছে আর ভয় পেয়েছে। পাশ্‌কা তৃতীয় ওয়ার্ডে ঢুকল। সেখানে দেখল দুটি লোক চুপচাপ বিছানায় বসে আছে, তাদের কাল্‌চে-লাল মুখ দেখলে মনে হয় বুঝি কেউ কাদা মাখিয়ে দিয়েছে। চোখ-মুখ ভাল করে দেখাই যায় না, দেখে মনে হয় মাটির পুতুল।

নার্সকে জিজ্ঞাসা করল, ''ওদের দেখতে এ রকম কেন ?''

''ওদের বসন্ত হয়েছে বাছা।''

ওয়ার্ডে ফিরে এসে সে বিছানায় বসে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল ; সে কখন এসে তাকে নিয়ে যাবে উড়াল পাখি ধরতে বা মেলা দেখতে। কিন্তু ডাক্তারের দেখা নেই। মুহূর্তের জন্য স্বাস্থ্য-কর্মীটি একবার পাশের ওয়ার্ডে এল। রবারের আইস-ব্যাগ মাথায় দেওয়া ছেলেটার উপর ঝুঁকে চীৎকার করে ডাকল :

''মিখাইলো !''

ঘুমন্ত ছেলেটি একবারও নড়ল না। একটা নৈরাশ্যপূর্ণ অঙ্গভঙ্গী করে স্বাস্থ্য-কর্মী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পাশ্‌কা ডাক্তারের জন্য বসে বসে অপর বিছানার বুড়োকে দেখতে লাগল। সে এক নাগাড়ে কাশছে আর মুখের মধ্যে থুথু ফেলছে। তার কাশিটা একটু অদ্ভুত ধরনের। সে যখন কাশতে কাশতে শ্বাস গ্রহণ করে তখন তার বুকের ভিতর একটা সুরেলা শিসের মত শব্দ হয় ; সেটা শুনতে পাশ্‌কার খুব ভাল লাগে।

পাশ্‌কা তাকে জিজ্ঞাসা করল, ''খুড়ো, তোমার বুকের মধ্যে কিসে শিস দেয় ?''

বুড়ো জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পরে পাশ্‌কা আবার জিজ্ঞাসা করল :

''খুড়ো, শেয়ালটা কোথায় থাকে ?''

''কোন্ শেয়াল ?''

''জ্যান্ত শেয়াল।''

''বনের মধ্যে। আর কোথায় থাকবে।''

অনেক সময় কেটে গেল, তবু ডাক্তার এল না। নার্স তাদের জন্য চা নিয়ে এল, আর রুটিটা রেখে দেয় নি বলে পাশ্‌কাকে বকল।

স্বাস্থ্য-কর্মী আবার এসে মিখাইলোর ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করল। বাইরে অন্ধকার নেমেছে, ওয়ার্ডে-ওয়ার্ডে আলো জ্বলছে, তবু ডাক্তারের দেখা নেই। উড়াল পাখি ধরতে যাবার বা মেলা দেখতে যাবার সময় হয়ে গেল যে। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পাশ্‌কা ভাবতে লাগল। তার মনে পড়ল, ডাক্তার তাকে ভাঁপা মিষ্টি খাওয়াবে বলেছিল, মনে পড়ল মার মুখ ও কণ্ঠস্বর,

বাড়ির রাত, তার খিটখিটে দিদিমার কথা ; হঠাৎ তার খুব কষ্ট হল, বাড়ির জন্য মন কেমন করতে লাগল। তখনই তার মনে পড়ে গেল, পরের দিনই মা তাকে নিতে আসবে। এবার সে হেসে চোখ বুজল।

লোক চলাচলের শব্দে সে জেগে উঠল। পাশের ওয়ার্ডে লোকজন হাঁটছে আর ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে, বিগ্রহের বাতি আর ছোট ছোট রাত-জাগা বাতির মৃদু আলোয় সে দেখতে পেল, তিনটি মূর্তি মিখাইলোর বিছানার চারদিকে ঘোরাঘুরি করছে।

তাদের একজন প্রশ্ন করল, "ওকে কি বিছানাশুদ্ধ বয়ে নিয়ে যাও, না কি ?"

"না, বিছানা ছাড়াই। বিছানাটা দরজা দিয়ে বের হবে না। মরার জন্য বড় ভাল সময়টা সে বেছে নিয়েছে। ঈশ্বর তার আত্মাকে শান্তি দিন।"

একজন মিখাইলের দুই বগলের নীচ দিয়ে তাকে ধরল, দ্বিতীয় জন ধরল তার দুই পা, তারপর তাকে তুলে ধরল : মিখাইলোর দু হাতও ড্রেসিং-গাউনের তলার দিকটা ঝুলে পড়ল। তৃতীয় জন—মাথায় ব্যাণ্ডেজ থাকার দরুণ যাকে মেয়ে-মানুষের মত দেখাচ্ছিল—বার বার ক্রুশ চিহ্ন আঁকল এবং তিনজন মিলে মিখাইলোকে ওয়ার্ডের বাইরে নিয়ে গেল।

বুড়ো লোকটির বুকের মধ্যে আবার সেই শিস ও গান শুরু হল। পাশ্‌কা কান পেতে শুনল, অন্ধকার জানালা দিয়ে তাকাল, এবং আতংকে হতবুদ্ধি হয়ে এক লাফে বিছানা থেকে নেমে গেল।

"মা !" সে আর্তস্বরে ডেকে উঠল।

কোন সাড়া নেই। ছুটে সে পাশের ওয়ার্ডে ঢুকল। রাত-জাগা বাতির ক্ষীণ আলো ঘন অন্ধকারকে ঈষৎ পাতলা করেছে মাত্র। মিখাইলোর মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে রোগীরা যার যার বিছানায় বসে আছে। আলো-আঁধারিতে তাদের ছায়াগুলো অনেক বড় ও দীর্ঘ দেখাচ্ছে। ঘরের দূর কোণের ঘন অন্ধকারের মধ্যে বসে আছে সেই লোকটি যে অনবরত মাথা ও হাত দোলাচ্ছে।

অন্ধের মত পাশ্‌কা ছুটে গেল বসন্তের ওয়ার্ডে, তারপর বারান্দায়, আর গোলার মত ঢুকে গেল একটা বড় ঘরের মধ্যে যেখানে বুড়িদের মত লম্বা চুল ও মুখওয়ালা সব ভয়ংকর মূর্তি বিছানার উপর শুয়ে বা বসে আছে। মেয়েদের ওয়ার্ডের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে সে আবার একটা বারান্দায় পড়ল ; সেখানে চেনা সিঁড়িটা দেখতে পেয়ে সেটা বেয়ে অতি দ্রুত নীচে নেমে সকাল বেলাকার প্রতীক্ষালয়টা পেয়ে গেল। ওই তো সদর দরজা। খিলটাকে টানতেই হু-হু করে ভিতরে ঢুকল এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া, আর তাতে ধাক্কা খেয়েও পাশ্‌কা ছুটে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে গেল। তার মাথায় তখন একটিমাত্র চিন্তা—তাকে পালাতে হবেই, পালাতে হবেই ! সে পথ চেনে না, কিন্তু নিশ্চিত জানে ছুটতে ছুটতেই এক সময় সে বাড়িতে তার মার কাছে পৌঁছে যাবে। মেঘাচ্ছন্ন রাত, কিন্তু মেঘের ওপারে চাঁদকে দেখা যাচ্ছে।

পাশ্‌কা দৌড়ে উঠোন পার হল, একটা গোলাবাড়িকে পাশ কাটিয়ে শুকনো ডালপালার একটা বেড়ায় বাধা পেল। একটু থেমে কি যেন ভাবল, আর ছুটল হাসপাতালের দিকে। বাড়িটাকে ঘুরে পিছন দিকে গিয়ে আবার বাধা পেল ঃ তার সামনে একটা কবরখানা, সাদা ক্রুশ চিহ্নগুলো অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে।

"মা!" আর্তনাদ করে সে পিছনে সরে গেল। ভয়ংকর, অন্ধকার হাসপাতাল-বাড়িটার পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে সে একটা আলোকিত জানালা দেখতে পেল।

অন্ধকারের মধ্যে সেই উজ্জ্বল, লাল আলোটাকেও কেমন যেন ভূতুড়ে মনে হল, তবু ভয়ে হতবুদ্ধি পাশ্‌কা কোথায় যাবে বুঝতে না পেরে সেই আলোর দিকেই ছুটল! আলোকিত জানালাটার পাশেই একটা বারান্দা ও একটা দরজায় একটা সাদা নাম-পত্র লাগানো। এক লাফে বারান্দায় উঠে পাশ্‌কা জানালা দিয়ে ভিতরে তাকাল, আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে তার দম আটকে গেল। জানালা দিয়ে সে দেখল, সদানন্দ ও সদাশয় ডাক্তারটি টেবিলে বসে একটা বই পড়ছে। মহাসুখে হাসতে হাসতে পাশ্‌কা পরিচিত মানুষটির দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দিল, তাকে ডাকতে চেষ্টা করল, কিন্তু কোন্‌ এক অজ্ঞাত শক্তি তার গলাটা চেপে ধরল, তার দুই পায়ে আঘাত হানল ঃ সে মূর্ছিত হয়ে সিঁড়ির উপরেই পড়ে গেল।

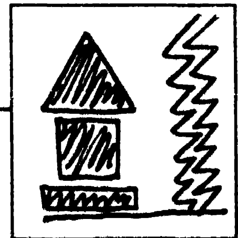
যখন তার জ্ঞান ফিরে এল তখন অনেক বেলা হয়েছে ; একটি অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর যা তাকে মেলা, উড়াল পাখি ও জ্যান্ত শেয়াল দেখাবে বলে কথা দিয়েছিল, পাশ থেকে বলছে ঃ

"কী বোকা তুমি পাশ্‌কা! আরে, তুমি বোকা নও? তোমার দরকার একটা আচ্ছা রকমের পিটুনি, হ্যাঁ তাই।"

১৮৮৭

একটি পুরনো বাড়ি

An Old House



এক বাড়িওয়ালার গল্প

একটা পুরনো বাড়িকে ভেঙে ফেলতে হবে যাতে তার জায়গায় একটা নতুন বাড়ি বানানো যায়। ঘুরে ঘুরে স্থপতিকে ফাঁকা ঘরগুলো দেখালাম, এবং যেতে যেতেই প্রাসঙ্গিক নানা গল্প তাকে বললাম। ছেঁড়া দেয়াল-কাগজ, ময়লাধরা জানালা, না-জ্বালানো স্টোভ—সব কিছুতেই সাম্প্রতিক জীবনযাত্রার চিহ্ন রয়েছে ; তারা অনেক স্মৃতির স্মারক। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একদা একদল মাতাল একটা শবাধার বয়ে নিয়ে এই সিঁড়ি দিয়ে নামছিল ; কোন

কিছুতে হোঁচট খেয়ে শবাধারশুদ্ধ তারা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ল; জ্যান্ত মানুষরা ভয়ানক রকম আঘাত পেল, কিন্তু মৃত লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে আঘাতটা সামলে নিল; আবার যখন তাকে মেঝে থেকে তুলে নিয়ে শবাধারে শুইয়ে দেওয়া হল, তখন সে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে মাথাটা নাড়তে লাগল। এখানে, এক সারিতে এই তিনটে দরজা দেখুন : এখানে যে তিনটি যুবতী মহিলা বাস করত তাদের কাছে প্রায়ই অভ্যাগতরা আসত, আর সেই কারণেই অন্য ভাড়াটেদের তুলনায় তারা বেশী সেজেগুজে থাকত, আর ভাড়াটাও নিয়মিত দিত। বারান্দার শেষের দরজা দিয়ে ধোপাখানায় যাবার পথ; দিনের বেলায় সেখানে পোশাকপত্র ধোয়া হত, আর রাত হলে চলত বীয়ার পানের হট্টগোল। এখানে এই ছোট তিন-ঘরের ফ্ল্যাটটা ব্যাক্টেরিয়া ও ব্যাসিলাইতে একেবারে কিলবিল করছে। খুব খারাপ জায়গা। অনেক ভাড়াটে এখানে মারা গেছে, আর আমি স্পষ্টই জানাচ্ছি, এক সময়ে এই ফ্ল্যাটের উপর অভিশাপ ছিল, সব সময়ই একটা অদৃশ্য কেউ ভাড়াটের সঙ্গে একত্রে এখানে বাস করত। একটা পরিবারে কি ঘটেছিল সেটাই স্মরণ করা যাক। কল্পনা করুন, একটি খুবই সাধারণ ও বৈশিষ্ট্যহীন ছোট মানুষ; তার মা, বৌ ও চারটি সন্তান। তার নাম পুতোখিন, একজন নোটারির কাছে মহুরির কাজ করে মাসে পঁয়ত্রিশ রুব্‌ল্ মাইনে পেত। ধীর, স্থির, ঈশ্বর-ভীরু, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষটি। যতবার সে ভাড়া দিতে আসত ততবার নিজের অপরিচ্ছন্ন চেহারার জন্য ক্ষমা চাইত; পাঁচদিন দেরী হলেও ক্ষমা চাইত, আর আমি যখন টাকার রসিদটা দিতাম তখন ভাল মানুষের মত হেসে বলতঃ "এটা কি দিতেই হবে? এই সব রসিদ-টসিদ আমার না হলেও চলে।" তাদের ফ্ল্যাটটা ছিল অতি দীন, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো। চারটে বাচ্চা ও তাদের ঠাকুরমা থাকত মাঝখানের ঘরটাতে; এখানেই পরিবারের রান্না-বান্না হত, অতিথি অভ্যাগতরা বসত, এমন কি নাচও হত। আর এটা ছিল পুতোখিনের ছোট ঘর; তার টেবিল ছিল যেখানে বসে সে নাটকের সংলাপ, প্রতিবেদন প্রভৃতি নকল করে কিছু বাড়তি উপার্জন করত। এই ছোট ঘরটাকে পুতোখিন আবার ভাড়া দিয়েছিল ইয়োগোরিচকে; লোকটি ছিল ধাতুর কারিগর, মদ খেলেও ধীরস্থির প্রকৃতির। ইয়েগোরিচ সব সময়ই গরম বোধ করত, তাই খালি পায়ে, শার্ট গায়ে, কেবল একটা ভেস্ট চাপিয়ে বাইরে বের হত। তালা, পিস্তল, ছোটদের বাইসাইকেল মেরামত করা ছাড়াও পঁচিশ কোপেক মজুরি নিয়ে সস্তাদামের ঘড়ি অথবা একজোড়া স্কেট মেরামতের কাজও করত; কিন্তু এই সব কাজ করতে তার ভাল লাগত না, সে নিজেকে বাদ্যযন্ত্র মেরামতের একজন বিশেষজ্ঞ বলে মনে করত। টেবিলের উপর ভাঙা-চোরা ধাতুদ্রব্যের স্তূপের মধ্যেও ভাঙা ভাল্‌বের একটা একর্ডিয়ন অথবা একটা দোমড়ানো ভেঁপু থাকবেই। তার ঘরটার জন্য সে পুতোখিনকে মাসে দুই রুব্‌ল্ পঞ্চাশ কোপেক দিত; কাজের বেঞ্চিটার পাশেই তাকে সর্বক্ষণ দেখা যেত, ভিতরের

ঘরে ঢুকাত কেবল টুকরো লোহা নিয়ে স্টোভের মধ্যে ঠেলে দেবার সময়।

সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঢুকলেই—যদিও সেটা কদাচিৎ ঘটত—এই একই দৃশ্য চোখে পড়তঃ পুতোখিন তার টেবিলে বসে কিছু নকল করছে, তার মা ও চামড়াসর্বস্ব ক্লান্তমুখ বৌ বাতির খুব কাছে বসে সেলাই করছে, আর ইয়োগোরিচ রেত দিয়ে কিছু একটা ঘসছে। জ্বলন্ত স্টোভ থাকায় ঘরটা গরম ও গুমোট, বাতাসে বাঁধাকপির ঝোল, জমা-কাপড় ও ইয়েগোরিচের গায়ের গন্ধ; কিন্তু তা সত্ত্বেও কর্মব্যস্ত লোকদের মুখ, স্টোভ-বরাবর ঝোলানো বাচ্চাদের ছোট ছোট প্যাণ্ট, আর ইয়েগোরিচের ভাঙা-চোরা ধাতুর টুকরো থেকে বেরিয়ে আসতে শান্তি, স্নেহ ও সন্তুষ্টির একটা মধুর আমেজ। ... পরিষ্কার পোশাক পরে, ভালভাবে চুল ব্রাশ করে ছেলেমেয়েরা মহাসুখে বারান্দায় ছুটে বেড়াচ্ছে; তারা ভাল করেই জানে পৃথিবীটা বড় সুখের জায়গা, আর যতদিন তারা সকালে ঘুম থেকে উঠে আর রাতে ঘুমতে যাবার আগে প্রার্থনা করবে ততদিন পর্যন্ত সুখের জায়গাই থাকবে।

এবার কল্পনা করুন, ঘরের মাঝখানে আছে পুতোখিনের স্ত্রীর শবাধার স্টোভ থেকে হাতখানেক দূরে! পৃথিবীতে এমন কোন স্বামী নেই যার স্ত্রী চিরদিন বেঁচে থাকে, কিন্তু এই মৃত্যুর মধ্যে কিছু বিশেষত্ব ছিল। শেষকৃত্যের সময় লোকটির গম্ভীর মুখ ও কঠিন চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে বলেছিলাম ঃ "এ দুঃখ তো তোমার সঙ্গেই ছিল ভাই।"

আমি কল্পনা করলাম, লোকটি স্বয়ং, তার ছেলেমেয়ে, মা ও ইয়েগোরিচ—সকলের উপরেই নজর ছিল সেই অদৃশ্য প্রাণীর যে তাদের সঙ্গেই ফ্ল্যাটটায় বাস করত। আমি গভীরভাবে সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ, তার কারণ হয় তো আমি বাড়ির মালিক, চল্লিশ বছর ধরে নানা রকম ভাড়াটে নিয়ে দিন কাটাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, খেলার শুরুতেই যদি তোমার তাসের ভাগ্য খারাপ হয় তাহলে তুমি শেষ পর্যন্তই হারতে থাকবে; আমি বিশ্বাস করি, নিয়তি যদি তোমাকে ও তোমার পরিবারকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে চায়, তাহলে অনিবার্য ধারাতেই সে তার উদ্দেশ্য সাধন করে যাবে, আর প্রথম দুর্ভাগ্যটিই হবে একটা দীর্ঘ শৃংখলের সূচনা মাত্র। ...প্রকৃতি বিচারে, দুর্ভাগ্যকে প্রস্তরখণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা যায়। একটা খাড়া পাড় থেকে একটা পাথর গড়িয়ে পড়ুক, অমনি আরও অনেক আল্‌গা পাথর পর পর গড়িয়ে পড়তে থাকবে। এক কথায়, শেষকৃত্য থেকে আমি বাড়ি ফিরে গেলাম পুতোখিন ও তার পরিবারের জন্য ভবিষ্যৎ বিপদের চিন্তা মাথায় নিয়ে।

আর—যা আশংকা করেছিলাম তাই হল—এক সপ্তাহ পরেই নোটারি অপ্রত্যাশিতভাবে পুতোখিনকে বরখাস্ত করল এবং তার জায়গায় একটি তরুণীকে কাজে বহাল করল। আর তারপর? নিজের চাকরি হারানোর চাইতেও পুতোখিন বেশী ক্ষুব্ধ হল তার জায়গায় পুরুষের বদলে একটি মেয়েকে কাজটা দেওয়া হয়েছে বলে। একটি যুবতী কন্যাকে কেন? সে এত

ভয়ানক রেগে গেল যে বাড়ি ফিরেই প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে চাবুক মারল, মাকে গালাগালি দিল, আর বসে বসে মদ গিলল। তার সঙ্গী হবার জন্য ইয়েগোরিচও মদ খেল।

পুতোখিন ভাড়াটা এনে দিল, কিন্তু আঠারো দিন পরে হলেও এবার আর ক্ষমা চাইল না, আর আমি যখন রসিদটা দিলাম তখন আপত্তিও জানালো না। পরের মাসে টাকাটা এনে দিল তার মা, তাও ভাড়ার অর্ধেকটামাত্র, কথা দিল বাকিটা সাত দিনের মধ্যে দিয়ে যাবে। তৃতীয় মাসে পুতোখিনদের কারও কাছ থেকেই ভাড়াটা পেলাম না আর আমার দরোয়ান নালিশ করতে শুরু করল যে ২৩ নম্বরের ভাড়াটেরা "কুরুচিপূর্ণ" ব্যবহার করছে। এ সবই তো খারাপ লক্ষণ।

এবার এই দৃশ্যটা কল্পনা করুন। নোংরা জানালার ওপারে পিতার্সবার্গের সকাল ধীরে ধীরে চোখ মেলছে। বুড়িটা স্টোভের পাশে ছোটদের চা দিচ্ছে। একমাত্র সকলের বড় ছেলেটি গ্লাস থেকে চা মুখে দিয়েছে, অন্যরা সবে ডিসে চা ঢেলেছে। খোলা উনুনের সামনে বসে ইয়েগোরিচ একটুকরো লোহা আগুনের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আগের রাতে বেশী মদ গেলার ফলে তার মাথাটা ধরে আছে, চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছে; সে অনবরত কাশছে আর কাঁপছে।

সে বিড় বিড় করে বলল, "কাল রাতে সেই আমাকে ডুবিয়েছে। নিজে সারাক্ষণ মদ খাবে, আর অন্যকে লোভ দেখাবে।"

পুতোখিন তার ঘরে বিছানার উপর বসে আছে। অনেক দিন হয়ে গেল বিছানায় কম্বল, চাদর, বালিশ কিছুই নেই। মাথার চুল চেপে ধরে সে পাথরের দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। পোশাক শতচ্ছিন্ন, চুল এলোমেলো, সে অসুস্থ।

ঠাকুরমা ভাসিয়াকে বলল, "চা খাওয়া শেষ কর, নইলে স্কুলে যেতে দেরী হয়ে যাবে। আর—আমারও কাজে যাবার সময় হয়ে গেছে।"

এই ফ্ল্যাটের একমাত্র এই বুড়িই ভেঙে পড়ে নি। পুরনো দিনের কথা স্মরণ করে সে নতুন করে পরিচারিকার কাজ নিতে শুরু করল: প্রতি শুক্রবারে সে ইহুদিদের বন্ধকী দোকানের মেঝেটা ঘষে, শনিবারে কোন ব্যবসায়ীর বাড়িতে পোশাকপত্র ধোয়, আর রবিবার হলেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গোটা শহরে চক্কর দিয়ে বেড়ায় আর কিছু বাড়তি উপার্জনের আশায় ঠিকে কাজের খোঁজ করে। প্রতিদিনই কিছু ঠিকে কাজ তার আছেই। সে মেঝে ঘষে, লোকের পোশাকপত্র ধোয়, সন্তান প্রসব করায়, ঘটকীর কাজ করে, আর ভিক্ষে করে। সত্যি কথা বলতে কি, নিজের দুঃখ ভুলবার জন্য সে মদও খায়, কিন্তু মাতাল হলেও কর্তব্য-কাজে কখনও অবহেলা করে না। রাশিয়াতে এ রকম অনেক শক্ত-সমর্থ বুড়ি আছে, আর যে সব পরিবার নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাদের উপরেই নির্ভর করে তাদের সংখ্যাও গুণে শেষ করা যায় না।

চা খেয়ে ভাসিয়া বইপত্তর গুছিয়ে নিয়ে স্টোভের পিছন দিকে চলে গেল। সেখানেই ঠাকুরমার পোশাকের পাশে তার ওভারকোটটাও ঝোলানো থাকে।

"আমার ওভারকোট কোথায় গেল?" এক মিনিট পরেই সে প্রশ্ন করল।

ঠাকুরমা ও অন্য ছেলেমেয়েরা ওভারকোট খুঁজতে শুরু করল, উপরে, নীচে সর্বত্র খুঁজল, কিন্তু ওভারকোটটা হাওয়া হয়ে গেছে। ভাসিয়া ও তার ঠাকুরমা ভয় পেয়ে গেল। ইয়েগোরিচও বিচলিত হয়ে পড়ল। একমাত্র পুতোখিনেরই কোন ভাবান্তর নেই, যেন এ বিষয়ে তার কিছু বলার নেই। সাধারণত কোনরকম গোলযোগ ঘটলে সেটা সকলের আগে তার চোখেই পড়ে, কিন্তু এ সময় সে যেন বোবা ও কানা বনে গেল। আর সেটাই খুব সন্দেহজনক।

"মদ কেনার জন্য উনি সেটা বেচে দিয়েছেন," ইয়েগোরিচ বলে উঠল।

পুতোখিন কোন কথাই বলল না, কারণ কথাটা সত্যি। ভাসিয়া তো ভয়ে কাঠ। তার ওভারকোট, মার পোশাকের কাপড় থেকে যে চমৎকার ওভারকোটটা বানানো হয়েছে, যে ওভারকোটে চমৎকাব নতুন লাইনিং দেওয়া হয়েছে, ভদ্‌কার বিনিময়ে সেটাকে শুঁড়িখানায় ঝেড়ে দেওয়া হয়েছে! অতএব কোটের সঙ্গে বুকপকেটে রাখা নীল পেন্সিলটা এবং সোনার অক্ষরে "বিশেষ দ্রষ্টব্য" লেখা নোটবইটাও গেছে! সেখানে তো আরও একটা পেন্সিল ছিল, রবারের টুপি পরানো একটা কালো পেন্সিল নোটবইটাতে আটকানো ছিল; তাছাড়া কিছু কাগজপত্রও ছিল।

একটু চোখের জল ফেলতে পারলে ভাসিয়া খুশি হত, সেটা তার সাহসে কুলোল না। বাবার মাথা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে, তাকে কাঁদতে শুনলেই বাবা পা ঠুকতে ঠুকতে এসে তাকে পেটাতে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত এমনভাবে মারবে যে ঠাকুরমা লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে; বাবা তখন ঠাকুরমাকেও পেটাবে; তখন ইয়োগোরিচও যুদ্ধে নেমে পড়বে, বাবাকে জড়িয়ে ধরে দু'জনই মেঝেতে গড়াগড়ি যাবে। হিংস্র, মাতাল জন্তুর মত তারা মেঝেময় গড়াবে আর লড়াই করবে; তখন ঠাকুরমা কাঁদতে থাকবে, ছোট ছেলেরা চেঁচামেচি করবে, প্রতিবেশীরা দারোয়ানকে ডাকতে যাবে। না বাবা, না কাঁদাই ভাল।

আর যেহেতু ভাসিয়া কাঁদতেও পারছে না, রাগটা প্রকাশ করতেও পারছে না, তাই সে দুই হাত মোচড়াতে লাগল, নিজের দুই পা ঝাঁকাতে লাগল, নিজের জামার আস্তিনটাকে কামড়াতে কামড়াতে ছিঁড়ে ফেলল, ঠিক যেমন একটা কুকুর একটা খরগোসকে নিয়ে করে। তার দুই চোখ পাগলের মত দেখাচ্ছে, হতাশায় তার মুখটা বিকৃত হয়ে উঠেছে। তাকে দেখে দেখে ঠাকুরমা হঠাৎ নিজের মাথার শালটা ছিঁড়ে ফেলল, হাত-পাকে পাগলের মত ছুঁড়তে লাগল, আর নিঃশব্দে একদিকে তাকিয়ে রইল। মনে

হল, সেই মুহূর্তে সেই বালক ও সেই বৃদ্ধা দু'জনই নিশ্চিন্তভাবে বুঝে ফেলেছে যে তাদের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের আর কোন আশাই নেই...

পুতোখিন কারও কান্না শুনতে পায় নি, কিন্তু তার ঘর থেকেই সব কিছু দেখতে পেয়েছে। আধ ঘণ্টা পরে ঠাকুরমার শালটা গায়ে জড়িয়ে ভাসিয়া যখন স্কুলে চলে গেল, তার তখনকার মুখের বর্ণনা দেবার মত ভাষা আমার নেই, আর তখনই পুতোখিনও তাকে অনুসরণ করল। সে ছেলেটিকে ডাকতে চেয়েছিল, তাকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল, স্বর্গতা মায়ের স্মৃতির নামে শপথ করতেও চেয়েছিল, কিন্তু তার গলা দিয়ে কোন কথা বের হল না, বের হল কেবল চাপা কান্না। সকালটা ঠাণ্ডা ও রুক্ষ। স্কুলের কাছাকাছি পৌঁছে ভাসিয়া ঠাকুরমার শালটা মাথা থেকে খুলে ফেলল যাতে অন্য ছেলেরা তাকে বুড়ি বলে টিটকারি করতে পারে; শুধুমাত্র জ্যাকেট পরেই সে স্কুলে ঢুকল। এদিকে পুতোখিন বাড়িতে ফিরে থেমে থেমে ফুঁপিয়ে কাঁদল, বিড় বিড় করে কি সব বলল, এবং নত মস্তকে মার কাছে, ইয়েগোরিচের কাছে ও ইয়েগোরিচের কাজের বেঞ্চিটার কাছে ক্ষমা চাইল। তারপর কিছুটা শান্ত হয়ে ছুটে আমার কাছে এল, খৃস্টের দোহাই দিয়ে যেকোন একটা কাজ আমার কাছে চাইল। আমি অবশ্য আশাও দিলাম।

সে বলল, "শেষ পর্যন্ত আমার সুবুদ্ধি ফিরেছে! অনেক দেরীতেই ফিরেছে। আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল—যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে—যথেষ্ট।"

তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আমাকে ধন্যবাদ দিল। আর আমি এই বাড়িব মালিক হয়ে বসার পর থেকে কত বিচিত্র ধরনের ভাড়াটেই তো দেখলাম—তার দিকে তাকালাম; বড়ই ইচ্ছা হল তাকে বলি :

"বড় দেরী হয়ে গেছে বাবা। তুমি তো মরেই গেছ।"

তখন সে দৌড়ে স্কুলে গেল; স্কুলের সামনে পায়চারি করতে করতে ভাসিয়াব জন্য অপেক্ষা কবতে লাগল।

ভাসিয়া বেরিয়ে আসতেই খুশি মনে বলল, "জানিস্ ভাসিয়া, একজন আমাকে চাকরি দেবে বলেছে। একটু অপেক্ষা কর্, তোকে একটা সেরা শীতেব কোট কিনে দেব, তোকে গ্রামার স্কুলে ভর্তি করে দেব। গ্রামার স্কুল কাকে বলে জানিস্ তো? তোকে আমি ভদ্দরলোক বানাব, দেখে নিস! আমিও আর মদ খাব না। আমি তোকে কথা দিলাম, আমার মাথার দিব্যি!"

সত্যি সত্যি সে বিশ্বাস করত সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ একদিন আসবে। কিন্তু তারপরেই সন্ধ্যা নেমে এল। তার বুড়ি মা ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে মাত্র কুড়ি কোপেক পকেটে নিয়ে বাড়িতে ফিরেই ছোটদের পোশাকপত্তর ধুতে বসে গেল। ভাসিয়া অংক কষতে লাগল। ইয়েগোরিচের হাতে কোন কাজ ছিল না। পুতোখিন'কে ধন্যবাদ, সে তখন পাড় মাতাল, ভদ্কার দুর্নিবার তেষ্টায় হাঁক-পাঁক করছে। ঘরের ভিতরটা গরম ও গুমোট। বুড়ি যে টবে

পোশাকপত্তর ধুচ্ছিল তা থেকে একটা গরম ধোঁয়া বের হচ্ছে।

"এবার যাওয়া যাক, বিল?" ইয়েগোরিচ বিষণ্ণ গলায় পুতোখিনকে বলল।

আমার ভাড়াটে কোন জবাব দিল না। সাময়িক উত্তেজনা কেটে যাবার পরে তার অবস্থা অসহ্য রকমের কাহিল হয়ে পড়ল। মদের তেষ্টাকে চেপে রাখতে চাইছে, মন খারাপ হবার বিরুদ্ধে লড়ছে, কিন্তু সবই হারের লড়াই। সেই সঙ্গে একই কাহিনী...

ইয়েগোরিচ ও পুতোখিন একসঙ্গে বেরিয়ে গেল। সকালে ভাসিয়া দেখল, ঠাকুরমার শালটাও উধাও।

এই ফ্ল্যাটটাতে এই সবই ঘটত আর কি। শালটা বেচে দেবার পরে পুতোখিন আর কোন দিন এ বাড়িতে ফেরে নি। সে যে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল জানি না।

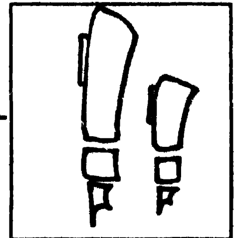
তারপর থেকে বুড়িও মদ ধরল, আর কিছুদিনের মধ্যেই বিছানা নিল। বুড়িকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল, কোন আত্মীয়া এসে বাচ্চাদের নিয়ে গেল। আর ভাসিয়া এখানেই একটা লন্ড্রিতে কাজ পেল। সে দিনের বেলায় ইস্ত্রি গরম করে, আর রাত হলে তাকে পাঠানো হয় বীয়ারের খোঁজে। একদিন তাকে যখন লাথি মেরে বের করে দিল, তখন সে এই বাড়িরই একটি মহিলার চাকর হয়ে গেল, রাত হলে তারই কোন খবর নিয়ে বেরিয়ে যেত, সকলের কাছেই তার নাম হয়ে গেল "খোজারু!" তারপর তার যে কি হল আমি জানি না।

আর এখানে এই ঘরটাতে থাকত এক গরিব গায়ক। সে দশ বছর ছিল। সে ছিল কপর্দকহীন, কিন্তু মৃত্যুর পরে তার পালকের বিছানার নীচে বিশ হাজার রুব্‌ল্ পাওয়া গিয়েছিল।

১৮৮৭

দামী পাঠ

Expensive Lessons



একজন শিক্ষিত লোকের পক্ষে বিদেশী ভাষা না জানাটা খুবই অসুবিধাজনক। ভরোতভ যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানের ডিগ্রি নিয়ে একটা ছোটখাট গবেষণার কাজ শুরু করল তখন এই অসুবিধাটা বেশ ভালভাবেই টের পেল।

একদিন সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল (যদিও তার বয়স মাত্র ছাব্বিশ, শরীর মোটাসোটা ও ভারী, একটু শ্বাস-কষ্টও আছে), "এ তো ভারী বিপদ! ভাষা না জানায় আমি তো এক ডানাবিহীন পক্ষীর মত! কাজ চালানোই

মুস্কিল!''

সে স্থির করল, এই আলসেমির স্বভাব তাকে ছাড়তেই হবে, ফরাসী ও জার্মান ভাষা অকে শিখতেই হবে, এই ভাবে মনস্থির করে শিক্ষকের খোঁজ শুরু করল।

এক শীতের দিন ভরোতভ পড়ার ঘরে বসে কাজ করছিল এমন সময় পরিচারক এসে খবর দিল, একটি তরুণী মহিলা তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

''তাকে ভিতরে নিয়ে এস'', ভরোতভ বলল।

যুবতী ঘরে ঢুকল। হাল ফ্যাশানের কেতায় সুসজ্জিত। জানাল, সে ফরাসী ভাষার শিক্ষিকা, নাম এলিস্ ওসিপভ্না আংকেতে, ভরোতভের এক বন্ধু তাঁকে পাঠিয়েছে।

নাইট-শার্টের গলাটা হাত দিয়ে ঢেকে (সহজে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্য সব সময়ই সে নাইট শার্ট পরেই কাজ করে) ভরোতভ বলল, ''আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম। দয়া করে বসুন। পিওতর সেগেইচ কি আপনাকে পাঠিয়েছে? আমি তাকে বলেছিলাম...খুব খুশি হলাম...''

খুঁটিনাটি বিষয়ে কথা বলতে বলতেই সে সলাজ কৌতূহলের সঙ্গে মাদ্‌ময়জেল আংকেতের দিকে বার বার তাকাচ্ছিল। একটি সত্যিকারের ফরাসী নারী, খুবই মনোরমা, বয়সও খুবই অল্প। তার বিবর্ণ, বিষণ্ণ মুখ, ছোট কোঁকড়া চুল আর অসাধারণ ক্ষীণ কঁটি দেখে মনে হবে তার বয়স বড় জোর আঠারো, কিন্তু তার চওড়া, পুরুষ্টু কাঁধ, তার সুন্দর পিঠ ও কঠিন চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে ভরোতভের মনে হল তার বয়শ তেইশের কম হবে না, এমন কি পুরোপুরি পঁচিশও হতে পারে। কিন্তু আবারও তার মনে হল, তার বয়স আঠারোর বেশী নয়। তার নির্বিকার, ব্যবসায়ীসুলভ মুখের দিকে তাকালেই মনে হয় সে বুঝি টাকা-পয়সার কথা বলতেই এসেছে। সে একবারও হাসল না, বা ভ্রূকুটি করল না, কিন্তু সে যখন শুনল ছোট ছেলেমেয়েদের শেখাবার জন্য তাকে ডাকা হয় নি, শেখাতে হবে এই বয়স্ক মোটা লোকটিকে, তখন মুহূর্তের জন্য তার মুখের উপর একটা বিষণ্ণতার ছায়া পড়ল।

''তাহলে এলিস ওসিপভ্না'' ভরোতভ বলতে লাগল, ''প্রতি দিন সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত আমাদের পাঠ চলবে। আর পারিশ্রমিক—প্রতি পাঠের জন্য এক রুব্‌ল্—তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। এক রুব্‌লই হবে।''

সে অবিরাম কথা বলতে লাগল—ওসিপভ্না চা বা কফি খাবে কিনা, আবহাওয়া ভাল না খারাপ, আর খুশির হাসি হাসতে হাসতে ডেস্কের দামী পশমী কাপড়ের ঢাকনার উপর হাত ঠুকতে ঠুকতে বন্ধুর মত প্রশ্ন করতে লাগল সে কে, কোন্ স্কুলে পড়েছে, তার আয়-উপার্জন কি রকম।

সেই একই নির্বিকার ব্যবসায়ীসুলভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে যুবতী জবাব দিল,

মেয়েদের একটি বেসরকারী বোর্ডিং স্কুলে সে পড়াশোনা করেছে, ব্যক্তিগতভাবে শেখবার মত বিদ্যা সে অর্জন করেছে, তার বাবা সম্প্রতি মসৃরিকা জ্বরে মারা গেছেন, তার মা নকল ফুল তৈরীর কাজ করে সংসার চালান, সে নিজে সকালে একটা বোর্ডিং স্কুলে পড়ায় এবং ডিনারের পর থেকে অনেক রাত পর্যন্ত সম্ভ্রান্ত বাড়িতে প্রাইভেট টুইশনি করে।

যুবতী চলে গেল, রেখে গেল মেয়েদের পোশাকের একটা মৃদু মিষ্টি গন্ধ। সে চলে যাবার পরে ভরোতভ অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কাজ না করে দু হাত দিয়ে সবুজ রেশমী ঢাকনাটাকে বাজাতে লাগল।

সে ভাবতে লাগল, ''যে সব যুবতী মহিলারা নিজেদের রুটি নিজেরাই রোজগার করে তাদের দেখতে খুব ভাল লাগে। কিন্তু, অপর দিকে, প্রয়োজন যে এলিস ওসিপভ্‌নার মত মেয়েদেরও রেহাই দেয় না, তাদেরও জীবন-সংগ্রামে নামতে বাধ্য করে, এটা মোটেই ভাল লাগে না। খারাপ, খুব খারাপ।''

যেহেতু সে কখনও পুণ্যবতী ফরাসী দেখে নি, তাই সে আরও ভাবল, সুগঠিত কাঁধ ও অতীব ক্ষীণ কটি সম্পন্না এলিস ওসিপভ্‌নাও সম্ভবত প্রাইভেট পড়ানো ছাড়াও অন্য কিছু করে।

পরদিন সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিট আগে মহিলাটি ঠাণ্ডায় মুখ লাল করে এল। যে মার্গৎ পাঠ্য বইটা সে সঙ্গে করে এনেছিল সেটা খুলেই সে কোন রকম ভূমিকা না করে পড়াতে শুরু করল ঃ

''ফরাসী বর্ণমালায় ছাব্বিশটি অক্ষর আছে। প্রথম অক্ষরকে বলে A, দ্বিতীয় অক্ষরকে B....''

ভরোতভ হেসে বাধা দিল, ''মাফ করবেন। আপনাকে জানানো দরকার মাদ্‌ময়জেল যে আমার ক্ষেত্রে আপনার শিক্ষাদানের পদ্ধতিটাকে বদলাতে হবে। ব্যাপার হল, রুশ, লাতিন ও গ্রীক এই তিনটে ভাষা আমি ভালই জানি...আমি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব পড়েছি। আমি মনে করি, মার্গাৎকে ডিঙিয়ে আমরা সোজা কোন উপন্যাস দিয়েই পাঠ শুরু করতে পারি।''

তারপরেই সে তার শিক্ষিকাকে বোঝাতে শুরু করল, কেমন করে বয়স্করা ভাষা শিখে থাকে।

''আমার এক বন্ধু তো এই ভাবে শিখেছিল। ফরাসী, জার্মান ও লাতিন ভাষায় লেখা ''খৃস্টের উপদেশ'' টেবিলের উপর রেখে প্রতিটি শব্দকে সযত্নে বিশ্লেষণ করে প্রত্যেকটি বই থেকে একই পংক্তি ধরে ধরে পড়েছিল। আর তার ফল কি হতে পারে বলে মনে করেন? এক বছরের মধ্যেই সে তিনটে ভাষা শিখে ফেলেছিল। আসুন, আমরাও তাই করি। একটা বই নিয়ে একসঙ্গে পড়তে থাকি।''

মহিলা সন্দেহের চোখে তাকাল। বোঝা গেল, ভরোতভের প্রস্তাবকে সে অতিশয় সরল ও অর্থহীন মনে করছে। এই অদ্ভুত প্রস্তাবটি যদি কোন শিশু করত তাহলে হয়তো তার মেজাজ বিগড়ে যেত, তাকে ধমক দিত, কিন্তু

যেহেতু প্রস্তাবটি তুলেছে একজন বয়স্ক লোক, আবার বেশ মোটা-সোটাও বটে, তাকে তো আর ধমকানো যায় না, তাই ঈষৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে বলল ঃ

"আপনার যেমন ইচ্ছে..."

নিজের বইয়ের আলমারি খুঁজে ভরোতভ একখানা ছেঁড়া ফরাসী বই বের করল।

"এটা দিয়ে হবে তো ?" সে প্রশ্ন করল।

"মনে তো হয়।"

"তাহলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে শুরু করা যাক। শিরোনাম দিয়েই শুরু করছি...Memoires।"

ভাল মানুষের মত হেসে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে ভরোতভ ঐ একটি শব্দ নিয়েই পনেরো মিনিট কাটিয়ে দিল, তারপরে আর একটা শব্দ নিয়েও ওই একই সময় কাটাল। এলিস ওসিপভ্না তাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলল। আর প্রশ্ন করার সময় ভরোতভ ভাবতে লাগল ঃ

"তার চুল স্বাভাবিকভাবে কোঁকড়ানো নয়, সে নিজে চুলে ঢেউ খেলিয়েছে। আশ্চর্য! দিনরাত যে কাজ করে সে চুলে ঢেউ তোলার মত সময় পায় কেমন করে!"

ঘড়িতে আটটা বাজলে মহিলা উঠে দাঁড়াল এবং 'অ রিভোয়া, মঁসিয়ে" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, পিছনে রেখে গেল সেই একই মিষ্টি, কোমল উত্তেজক সুবাস। আর তার ছাত্রটিও অনেক সময় ধরে টেবিলেই বসে রইল কোন কাজ না করে, কেবলই চিন্তা করে।

কয়েকদিনের মধ্যেই সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে তার শিক্ষিকাটি সুন্দরী, গম্ভীর ও সময়ানুবর্তী হলেও তার শিক্ষা-দীক্ষা অতি সামান্য আর বয়স্কদের শেখাবার কাজে একেবারেই অনুপযুক্ত। তাই সে স্থির করল, আর সময় নষ্ট না করে তার মাইনেপত্তর চুকিয়ে দেবে এবং অপর একজন শিক্ষক খুঁজে নেবে। সপ্তম দিন সে যখন বাড়িতে এল, তখন ভরোতভ সাতটা রুব্‌ল্ ভর্তি খামটা পকেট থেকে বের করে সেটাকে হাতে নিয়ে অত্যন্ত বিচলিতভাবে বলতে শুরু করল ঃ

"আমি ভীষণ দুঃখিত এলিস ওসিপভ্না, কিন্তু আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি...দুর্ভাগ্যবশত এ ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই..."

খামের দিকে তাকিয়েই মেয়েটি বুঝতে পারল তার মধ্যে কি আছে, আর সারা সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম তার মুখে কি যেন কাঁপতে লাগল, তার নির্বিকার, ব্যবসাসুলভ ভাবটা শিথিল হল। ঈষৎ রক্তিম হয়ে চোখ দুটি নামিয়ে সে উত্তেজনাবশে সরু সোনার চেনটাকে নাড়তে শুরু করল। তার এই বিচলিত ভাবই ভরোতভকে বলে দিল, তার কাছে প্রতিটি রুব্‌ল্ই কত দামী, আর এই সাপ্তাহিক উপার্জনটা হারানো তার পক্ষে কত কঠিন।

"আপনাকে বলতেই হচ্ছে .." আরও বেশী বিচলিত বোধ করায় সে থেমে গেল, বুকের মধ্যে যেন একটা মোচড় অনুভব করল ; তাড়াতাড়ি খামটাকে পকেটে ভরে বলল ঃ "আমি দুঃখিত, কয়েক মিনিটের জন্য আমাকে যেতে হবে..."

যেন বেতনটা মিটিয়ে দেবার ইচ্ছা তার ছিল না এই রকম একটা ভাব দেখিয়ে সে আর একটা ঘরে চলে গেল এবং প্রায় দশ মিনিট সময় সেখানে কাটাল। কিন্তু পাছে মেয়েটি তাকে ভুল বোঝে এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি ফিরে এল।

নতুন করে পাঠ শুরু হল। ভরোতভ সেখানে হাজির থাকে, কিন্তু অনেকটাই অনিচ্ছায়। সে জানে এ সব পাঠের কোন অর্থ হয় না, তাই এখন সে তার শিক্ষিকাকে একটানা পড়িয়ে যেতে দেয়, কোন প্রশ্ন করে না, বা কোথাও বাধা দেয় না। শিক্ষিকার যেমন খুশি পুরো দশটা পাতাই ভুল ভাষান্তরিত করে— তাতে সে কোন আপত্তি জানায় না। কারণ সে তো মন দিয়ে শোনেই না। সে বসে বসে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে, অলস ভঙ্গীতে মেয়েটির কোঁকড়া চুলে ভর্তি মাথা, তার গলা, তার নরম সাদা দু'খানি হাতের দিকে চেয়ে থাকে, আর তার পোশাকের সুরভি প্রশ্বাসের সঙ্গে টেনে নেয়...

এক সময় তার খেয়াল হল সে আজেবাজে চিন্তা করছে, আর তাতে বেশ লজ্জা বোধ করল। ক্রমেই তার আবেগ বাড়তে লাগল ; এই ভেবে সে দুঃখ পেত, কেন মেয়েটি তার প্রতি এত নির্বিকার ও ব্যবসায়িক, কেন সে তাকে শুধু একজন ছাত্রের মতই দেখে, কেন সে কখনও হাসে না বা ভয়ে সরে যায় না যাতে সে হঠাৎই তাকে ছুঁয়ে ফেলতে পারে। সে আরও ভাবে ঃ কি করলে মেয়েটি তাকে বিশ্বাস করতে পারবে, কেমন করে তারা দু'জন বন্ধু হয়ে উঠতে পারবে, যাতে পরবর্তীকালে সে মেয়েটিকে সাহায্য করতে পারবে, তাকে বোঝাতে পারবে শিক্ষিকা হিসাবে সে কত অযোগ্য।

একদিন সন্ধ্যায় এলিস ওসিপভ্না পড়াতে এল গলা-খোলা একটা গোলাপী পার্টি-ড্রেস পরে, আর একটা সুবাস যেন মেঘের মত তাকে জড়িয়ে ছিল ; ভরোতভের মনে হল, তার দিকে ফুঁ দিলেই সে আকাশে উড়ে যাবে, অথবা ধোঁয়ায় মিলিয়ে যাবে। শিক্ষিকা জানাল, পড়ার পরেই তাকে একটা বল-নাচে যেতে হবে, তাই মাত্র আধা ঘন্টা সময় দিতে পারবে বলে সে দুঃখিত।

ভরোতভ তার গলার দিকে তাকাল, পোশাকের দৌলতে তার পিঠটা একেবারেই খোলা। তার মনে হল এবার সে বুঝতে পেরেছে কেন ফরাসী নারীদের লজ্জাহীনা হবার খ্যাতি আছে ; যুবতীটির গন্ধ, রূপ, ও অনাবৃত দেহের মেঘাবরণের তলে সে যেন ধীরে ধীরে ডুবে যেতে লাগল ; আর যুবতীটি সে সব খেয়াল না করে দ্রুত পাতার পর পাতা উল্টে গেল আর অনুবাদ চালাল রেসের ঘোড়ার মতঃ

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটি পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল ; তিনি বললেন ঃ 'এত তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছেন, আপনার মলিন মুখ দেখলে আমি মনে ব্যথা পাই।'

অনেকদিন আগেই প্রথম বইটা পড়া শেষ হয়ে গেছে ; এলিস এখন অন্য একটা বই অনুবাদ করছে। একদিন সে পড়াতে এসেছিল এক ঘন্টা আগে, কারণ সাতটার সময় তাকে ম্যালি থিয়েটারে যেতে হবে। পড়া শেষ হলে ভরোতভ তাকে বিদায় জানাল, তারপর পোশাক পরে সেও থিয়েটারে গেল। তার বিশ্বাস, সে শুধু চেয়েছিল মনকে একটু বৈচিত্র্যের স্বাদ দিতে, এলিসের কথা তার বিন্দুমাত্রও মনে ছিল না। এটা তো অসম্ভব যে তার মত একটি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, পড়াশুনা নিয়েই যার দিন কাটে, যে কিছুটা ঘরকুনোও বটে, সে এভাবে কাজকর্ম ফেলে থিয়েটারে চলে গেল কেবল একটি মেয়ের সঙ্গে সেখানে দেখা করতে যাকে সে ভাল করে চেনেই না, আর যে না বুদ্ধিমতী, না সংস্কৃতির ধার ধারে।

তাহলে বিরতির সময় তার বুকের ভিতরটা উত্তেজনায় টিপ্ টিপ্ করল কেন? নিজের অজান্তে থিয়েটারের লবিতে ও বারান্দায় একটা ছোকরার মত ছুটাছুটি করে সে কাউকে খুঁজতে লাগল কেন? বিরতির পরেই বা নাটকটা তার কাছে এত একঘেয়ে মনে হল কেন? আর শেষ পর্যন্ত যখন পরিচিত গোলাপী পোশাক ও যুবতীটির সুন্দর গ্রীবাটি দেখতে পেল, তখনই সুখের প্রত্যাশায় তাব হৃৎপিণ্ডটা যেন কুঁকড়ে গেল, সে খুশিতে হেসে উঠল, এবং জীবনে এই প্রথম তার মনে ঈর্ষার অনুভূতি জাগল।

এলিসের সঙ্গে ছিল দুটি সাধারণ চেহারার ছাত্র ও একটি অফিসার। যুবতীটি হাসছিল, জোর গলায় কথা বলছিল, আর স্পষ্টতই ঢলাঢলি করছিল। ভরোতভ কখনও তাকে এ রকম দেখে নি। স্পষ্ট বোঝা গেল, সে সুখী, পরিতুষ্ট, ঐকান্তিক, আর মোটেই নির্বিকার নয়। কেন? তারা সকলেই একই দলের লোক বলেই কি তাদের মধ্যে এই মিল? ভরোতভ বুঝতে পারল, তার এবং এই ধরনের লোকদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। শিক্ষিকাকে দেখে সে মাথা নোয়াল, যুবতীও উত্তরে নির্বিকার ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল, তারপর দ্রুত পায়ে তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল ঃ বেশ বোঝা গেল এই সাহসিক সঙ্গীদের সে জানাতে চায় না যে সে ছাত্র পড়ায় জীবিকা অর্জনের জন্য।

থিয়েটারে দেখা হবার পরেই ভরোতভ বুঝতে পারল সে প্রেমে পড়েছে...পরবর্তী পাঠের সময় দুই চোখ দিয়ে সে শিক্ষিকাকে গিলতে শুরু করল, অন্তর্বিরোধের বেড়া ভেঙে ফেলে তার পরিচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন সব চিন্তাই স্বাধীনভাবে চলতে লাগল। এলিসের মুখ আগের মতই নির্বিকার ; প্রতি সন্ধ্যায় আটটা বাজলেই সে শান্ত গলায় ''অ রিভোয়া, মঁসিয়ে'' বলে, আর তাতেই সে বুঝতে পারে এলিস তার প্রতি কতটা উদাসীন আছে এবং সর্বদাই থাকবে, আর তার অবস্থা কত নিরাশায় পূর্ণ।

কখনও কখনও পাঠ চলার সময়ই সে দিবাস্বপ্নে জাল বুনতে থাকে, আশা করে, পরিকল্পনা করে, মনে মনে প্রেম-প্রকাশের ঘোষণা বাণী রচনা করে। কিন্তু যুবতীর মুখের দিকে এক নজর তাকালেই তার সব স্বপ্ন, সব চিন্তা ঝড়ের বাতাসে নিভে যাওয়া মোমবাত্তির মত মুহূর্তে বিলীন হয়ে যায়। একদিন তার আত্মসংযমের বাঁধ ভেঙে গেল, সে যেন অপ্রকৃতিস্থ, বিকারগ্রস্ত উন্মাদ হয়ে উঠল। পাঠ সাঙ্গ হবার পরে এলিস যখন চলে যাচ্ছিল তখন সে তার পথ আটকে দাঁড়াল। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে সে তো তো করে প্রেমের বাণীটি শোনাল ঃ

''আমার কাছে তুমি কত বড়! আমি...আমি তোমাকে ভালবাসি। আমাকে বলতে দাও!''

এলিসের মুখটা কাগজের মত সাদা হয়ে গেল—হয়তো এই ভয়ে যে এই ঘোষণার পরে সে আর এখানে আসতে পারবে না, প্রতি পাঠের দরুন রুবল্‌টিও হাত পেতে নিতে পারবে না। নকল আতংকে ভরোতভের দিকে তাকিয়ে সে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল ঃ

''ওঃ, না, একথা বলবেন না! দয়া করে কিছুই বলবেন না! কিছুতেই বলবেন না!''

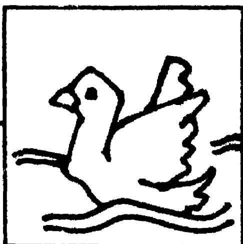
সে রাতে ভরোতভ একবিন্দুও ঘুমতে পারল না ; লজ্জায় ছটফট করল, নিজেকে অভিশাপ দিল, কত কী ভাবতে লাগল। সে ভাবল, ভালবাসার কথা বলে সে এলিসকে অপমান করেছে, আর কোনদিন সে আসবে না। সকালে উঠেই তার প্রথম কাজই হবে ঠিকানা-সংস্থার কাছ থেকে তার ঠিকানা জেনে নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে একটা চিঠি লেখা। কিন্তু তার কোন দরকার হল না। পরদিন সন্ধ্যায় এলিস যথারীতিই এল। প্রথমে একটু বাঁধ-বাঁধ বোধ করলেও বইটা খুলে সর্‌-সর্‌ করে অনুবাদ করতে লাগল ঃ

''হে ভদ্র যুবকগণ, আমার বাগানের এই সুন্দর ফুলগুলি তোমরা ছিঁড়ো না ; এ ফুল আমার রুগ্ন মেয়েটিকে আমি দিতে চাই...''

সে পাঠ আজ অবধি চলেছে। এলিস ইতিমধ্যেই ভরোতভের জন্য চারখানা বই অনুবাদ করে ফেলেছে, কিন্তু একমাত্র memoires শব্দটি ছাড়া আর কিছুই সে শেখে নি ; কেউ যখন তার গবেষণার কাজের কথা বলে তখন হাতটা দুলিয়েই সে বিষয়টিকে সে বাতিল করে দেয় এবং আবহাওয়া নিয়ে কথা বলতে শুরু করে।

১৮৮৭

চুম্বন



The Kiss

শে মে সন্ধ্যা আট ঘটিকার সময় এন. সংরক্ষিত গোলন্দাজ বাহিনীর ামানবাহী সেনাদলই গ্রীষ্মকালীন শিবিরে যাবার পথে মেস্তেস্কি গ্রামে মত যাত্রাবিরতি ঘটাল। তখন গোলযোগ একেবারে চরমে উঠেছে, াফিসার কামানগুলোর চারদিকে ঘোরাফেরা করছে, অন্য অফিসাররা ায়ারে সমবেত হয়ে সৈন্যদের বাসস্থান সংক্রান্ত ঘোষণা শুনছে, এমন কটা বিচিত্রদর্শন ঘোড়ায় চড়ে একটি অসামরিক পোশাকপরা লোক পিছন দিক থেকে এসে হাজির হল। কালো কেশর, কালো বেঁটে সুন্দর গর্দানওয়ালা ছোট ঘোড়াটা সরল রেখায় না এগিয়ে এমনভাবে । হয়ে ছোট ছোট নাচের তালে পা ফেলে এগিয়ে এল যে দেখে মনে র পায়ের উপর বুঝি চাবুকের ঘা পড়ছে। বেসামরিক লোকটি দের সামনে এসে টুপিটা তুলে বলল ঃ

ানীয় জমিদাব হিজ্ এক্সেলেন্সি লেফ্টেন্যান্ট-জেনারেল ভন রাবেক তেই চায়ের আসরে যোগ দিতে অফিসারদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।''

চর তালে ঘোড়াটি অভিবাদন জানাল, অশ্বারোহী পুনরায় টুপিটা তুলে ঘাড়াসহ গির্জার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফসাররা যার যার নির্দিষ্ট বাসস্থানের দিকে পা বাড়াল, আর কিছু ক্ষোভের সঙ্গে বলল ঃ

ী আপদ রে বাবা! ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে, আব এদিকে কে এক বক চা নিয়ে হাজির! তার মানেটা যে কি তা আমরা জানি।''

া সেনাদলের অফিসারদেরই স্পষ্ট মনে আছে, আগের গ্রীষ্মে সৈন্য নার পথে তাদের সকলকে এবং সঙ্গী একটি কসাক সেনাদলের রদেরও ঠিক একইভাবে স্থানীয় জমিদার চা খেতে ডেকেছিলেন। ছিলেন কাউন্ট এবং অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। এই অতিথিপরায়ণ ভালবাসা ও দয়া দেখিয়েছিলেন প্রচুর, স্তূপাকার করেছিলেন খাদ্য য়, রাতের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে তাদের যেতেই দেন নি। রাতটা তার কাটাবার অনুরোধও জানিয়েছিলেন। ব্যবস্থাদি অবশ্য খুবই ভাল তার চাইতে ভাল ব্যবস্থা তারা আশাই করতে পারে নি; কিন্তু লটা হল, এই অবসরপ্রাপ্ত অফিসারটি যুবকদের সাহচর্য বড় বেশী করে বসলেন, দিনের আলো ফোটা পর্যন্ত তাদের জাগিয়ে রাখলেন, র মধুর দিনগুলির অনেক কাহিনী শোনালেন, ঘরে-ঘরে ঘুরিয়ে তাদের ন নিজস্ব সংগ্রহের মূল্যবান সব তৈলচিত্র, পুরনো ছবির ছাপাই।

বিরল সব অস্ত্রশস্ত্র, উঁচু মহলের মানুষদের লেখা চিঠিপত্র পড়ে শোনাতে লাগলেন, আর ক্লান্ত, বিরক্ত অফিসাররা, একটু শোবার আশায় মুখ-চাওয়া-চাওই করতে করতে আস্তিনের আড়ালে হাই তুলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত গৃহস্বামীটি যখন তাদের রেহাই দিলেন তখন আর বিছানায় যাবার সময়ই ছিল না।

এই ভন রাবেকও কি সেই রকমই একজন? হোন বা নাই হোন, তাতে কিছু যায় আসে না। অফিসাররা তড়িঘড়ি তৈরী হয়ে জমিদার-বাড়িতে যাবার জন্য ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়ল। চার্চ স্কোয়ারে তাদের বলা হয়েছিল : তারা হয় নীচের রাস্তাটা দিয়ে যেতে পারে—গির্জার ঠিক পিছনে নদীর ধার দিয়ে পথটা চলে গেছে জমিদারের বাগানের ভিতর দিয়ে সোজা রাজবাড়িতে, অথবা তারা যেতে পারে উপরের রাস্তাটা দিয়ে—গির্জা থেকে আধ ভার্স্ট পথ গেলেই জমিদারের গোলাবাড়ি। অফিসাররা স্থির করল, দ্বিতীয় পথেই যাবে।

হাঁটিতে হাঁটিতে তারা কথা বলতে লাগল : "এই ভন রাবেকটি কে? প্লেভ্না-র এন. অশ্বারোহী সেনাদলের যিনি সেনাপতি ছিলেন সেই রাবেক কি?"

"না, তিনি ভন রাবেক নন, তিনি ছিলেন শুধুই রাবেক, তার নামের আগে ভন ছিল না।"

"চমৎকার আবহাওয়া, তাই না!"

জমিদারের গোলাবাড়িতে এসে রাস্তাটা দুই ভাগ হয়ে গেছে : একটা সোজা সামনে চলে গিয়ে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেছে, অপরটা ডাইনে ঘুরে জমিদার বাড়িতে পৌঁছে গেছে। অফিসাররা ডাইনে বাঁক নিয়ে গলার স্বর কিছুটা খাদে নামিয়ে আনল...রাস্তার দুই ধারে লাল ছাদওয়ালা পাথরের গোলাবাড়ির সারি, দেখতে অনেকটা ছোট শহরের সেনা-ব্যারাকের মত। অনেক দূরে জমিদার বাড়ির আলোকিত জানালাগুলি দেখা যাচ্ছে।

একজন অফিসার বলল, "ভদ্রমহোদয়গণ, একটা শুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে! আমাদের ব্যবস্থাপকটি সকলের আগে চলেছেন। তার অর্থ তিনি শিকারের গন্ধ পেয়েছেন।"

ব্যবস্থাপক হচ্ছে লেফটেন্যান্ট লবিৎকা। লম্বা, হৃষ্টপুষ্ট যুবক (বয়স পঁচিশের উপরে, কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় তার গোল মুখে এখনও গোঁফ-রেখাটি পর্যন্ত নেই) ; লোকটি তার ঘ্রাণশক্তির জন্য বিখ্যাত, অনেক দূর থেকেই সে মেয়েছেলের গন্ধ পায়। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল :

"হ্যাঁ, এখানে নির্ঘাৎ মেয়েমানুষ আছে। আমি তার গন্ধ পাচ্ছি।"

ভন রাবেক স্বয়ং এক সুদর্শন পুরুষ, বছর ষাটেক বয়স, পরনে অসামরিক পোশাক। বাড়ির ফটকেই তিনি অফিসারদের স্বাগত জানালেন। অতিথিদের সঙ্গে কর-মর্দন করার সময়ই জানালেন, তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে তিনি খুবই খুশি ও আনন্দিত হয়েছেন, কিন্তু তার বাড়িতে অতিথিদের রাত্রিযাপনের আমন্ত্রণ জানাতে পারছেন না বলে তাদের কাছে ক্ষমা

চাইছেন। তার দুই বোন ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছে, তার ভাইরা ও জনাকয় প্রতিবেশীও এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে, তাই আর কোন বাড়তি ঘর তার বাড়িতে নেই।

তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে কর-মর্দন করলেন, হেসে হেসে ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু তার মুখ দেখেই বোঝা গেল, গত গ্রীষ্মকালে কাউন্টটি তাদের পেয়ে যতটা খুশি হয়েছিলেন ইনি ততটা খুশি হতে পারেন নি; নেহাৎ সৌজন্যবশতই তিনি সকলকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করেছেন। আর নরম কার্পেট পাতা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে অফিসাররাও গৃহকর্তার কথাবার্তা থেকেই বুঝতে পারল যে পাছে কোন অভদ্রতা প্রকাশ পায় কেবলমাত্র সেই কারণেই তিনি তাদের আমন্ত্রণ করে এনেছেন ; তারা যখন আরও দেখল যে পরিচারকটি তাড়াতাড়ি সদর ফটকের নীচ তলার আলোগুলি এবং উপরতলার হল-ঘরের আলোগুলি নিভিয়ে দিল, তখনই তাদের মনে সন্দেহ জাগল যে তারা এসে সংসারে একটা গোলমাল ঘটিয়ে দিয়েছে। দুই বোন ও তাদের ছেলেমেয়ে এবং ভাইরা ও প্রতিবেশীরা হয় তো কোন পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষেই আমন্ত্রিত হয়ে এ বাড়িতে এসেছে, আর উনিশজন অপরিচিত অফিসারের উপস্থিতি নিশ্চয় তাদের পক্ষে সুখকর হবে না। দোতলায় উঠেই খাবার ঘরের দরজায় অফিসারদের স্বাগত জানালেন একটি দীর্ঘদেহ, সুগঠনা বৃদ্ধ মহিলা ; দেখতে অনেকটাই সাম্রাজ্ঞী ইউজেনির মত। রাজকীয় অমায়িক হাসি হেসে তিনি জানালেন, নিজের বাড়িতে সকলকে স্বাগত জানাতে পেরে তিনি খুবই খুশি হয়েছেন, আর সেই সঙ্গে ভয়ানক দুঃখিতও হয়েছেন, কারণ তিনি ও তার স্বামী তাদের সকলকে রাতটা কাটিয়ে যেতে বলতে পারছেন না। যে মুহূর্তে তিনি অন্য অনেক কাজে মন দেবার জন্য অতিথিদের কাছ থেকে সরে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখের রাজকীয় হাসিটি যে ভাবে মিলিয়ে গেল তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা গেল যে জীবনে অনেক অফিসার তিনি দেখেছেন, এই মুহূর্তে তাদের নিয়ে মাথা ঘামাবার মত সময় তার নেই, আর একমাত্র তার শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিক মর্যাদাই তাকে বাধ্য করেছে সকলকে এই আমন্ত্রণটি জানাতে।

বড় খাবার ঘরটাতে ঢুকেই তারা দেখতে পেল বৃদ্ধ ও যুবক মিলিয়ে জনদশেক ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক লম্বা খাবার টেবিলের এক প্রান্তে বসে চা খাচ্ছে। তাদের চেয়ারের পিছনে চুরুটের ধোঁয়ার স্বচ্ছ কুণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একদল লোক ; তাদের মধ্যে লালচে জুলফিওয়ালা একটি একহারা যুবক উচ্চ গলায় ইংরেজিতে কি যেন বলছে। সেই দলটির পিছনের খোলা দরজা দিয়ে হাল্কা নীল রংয়ের আসবাবপত্রে সাজানো একটা উজ্জ্বল আলোকিত ঘর চোখে পড়ে।

গলা চড়িয়ে, কণ্ঠস্বরে খুশির আমেজ আনার চেষ্টা করে জেনারেল বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা সংখ্যায় এত বেশী যে প্রত্যেককে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা একেবারেই অসম্ভব। তাই পরিচয়-পর্বটিকে

আনুষ্ঠানিক করে তুলতে চাই না, কি বলেন ?''

অফিসারদের কারও কারও মুখ বেশ গম্ভীর ও কঠিন হয়ে উঠল, কারও মুখে চেষ্টাকৃত হাসির রেখা দেখা দিল, আর সকলেই ভয়ংকর রকমের আত্মসচেতন ভঙ্গীতে মাথা নুইয়ে চায়ের টেবিলে বসে পড়ল।

জুনিয়র ক্যাপ্টেন র‍্যাবোভিচের চেহারাটা ছোটখাট, গলাটা গোলগাল, চোখে চশমা, আর বনবিড়ালের মত জুলফি ; অন্য সবার চাইতে সে বেশী আত্মসচেতন ; অন্য সহকর্মীদের মধ্যে কারও মুখ গম্ভীর, কারও মুখে চেষ্টাকৃত হাসি, কিন্তু তার মুখ, তার বনবিড়ালের মত জুলফি, তার চশমা, সব কিছুই যেন বলতে চাইছে ঃ ''আমি সব চাইতে ভীরু, সব চাইতে বিনয়ী এবং এই সেনাদলের সব চাইতে বৈশিষ্ট্যহীন একজন অফিসার !'' সে যখন প্রথম খাবার ঘরে ঢুকে টেবিলে বসল তখন সে কিছুতেই কোন একটা বস্তু বা মুখের উপর মনোযোগ স্থির রাখতে পারছিল না। নানা মুখ, মহিলাদের গাউন, ব্র্যাণ্ডিভর্তি কাট-গ্লাসের ছোট ছোট পানপাত্র, চায়ের কাপ থেকে ওঠা ধোঁয়া, সিলিংএর চারদিককার কারুকার্য—সব কিছু মিলেমিশে এমন একটা গুরুগম্ভীর পরিবেশ গড়ে উঠল যে র‍্যাবোভিচ ঘাবড়ে গেল, তার ইচ্ছা হল বালির মধ্যে মাথাটা লুকিয়ে ফেলে। একটি মানুষ যখন প্রথমবার প্রকাশ্যে কিছু আবৃত্তি করে তার তখনকার অবস্থার মতই সে চোখের সামনে সব কিছুই দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু কোন কিছুই ঠিকমত বুঝতে পারছে না। (শারীরতত্ত্ববিদ্‌রা একে বলেন মানসিক অন্ধত্ব)। অবশ্য একটু একটু করে র‍্যাবোভিচের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল, সে আবার সব কিছু দেখতে পেল। এই লাজুক ও অসামাজিক লোকটিকে যে জিনিস সর্বপ্রথম নাড়া দিল সেটা হল তার নবপরিচিত মানুষগুলোর অসাধারণ সাহস, যে সাহস তার নিজের কোন দিনই ছিল না। ভন র‍্যাবেক ত তার স্ত্রী, দুটি বয়স্কা মহিলা, ফিকে নীল রংয়ের পোশাক পরা একটি যুবতী আর লালচে জুলপিওয়ালা যুবকটি (সে আবার র‍্যাবেকের ছোট ছেলে) এমন সুকৌশলে, যেন আগে থেকেই মহড়া দিয়ে রেখেছিল, অফিসারদের মাঝখানে বসে সঙ্গে সঙ্গে একটা তুমুল বিতর্ক শুরু করে দিল যে অতিথিরা তাতে যোগ না দিয়ে পারল না। ফিকে নীল রংয়ের পোশাক পরা মেয়েটি আবেগের সঙ্গে তার এই প্রত্যয়কে সমর্থন জানাল যে অশ্বারোহী সৈনিক অথবা পদাতিক সৈনিকদের তুলনায় গোলন্দাজ সৈনিকদের জীবন অনেক বেশী আরামের ; আবার ওদিকে র‍্যাবেক ও বর্ষীয়সী মহিলা দুটি সমান আবেগে তাদের প্রতিবাদ ঘোষণা করল। শুরু হল চাপান-উতোরের এক তুমুল বাক-যুদ্ধ। যে নীলবর্ণা কুমারীটি এমন একটা বিষয়ের সমর্থনে উত্তাল হয়ে উঠেছে যে ব্যাপারে তার তিলমাত্র আগ্রহও নেই, র‍্যাবোভিচ তার দিকেই তাকিয়ে তার আন্তরিকতাবিহীন হাসির আসা-যাওয়াটাই লক্ষ্য করতে লাগল।

ভন রাবেক ও তার পরিবারের লোকেরা বেশ কায়দা করে অফিসারদের সেই বাকযুদ্ধে লড়িয়ে দিল, আর নিজেরা কড়া নজর রাখল অতিথিদের

পেয়ালা ও ঠোঁটের দিকে—প্রত্যেককে চা দেওয়া হয়েছে কিনা, তারা যথেষ্ট চিনি নিয়েছে কিনা, কেনই বা কেউ বিস্কুট খাচ্ছে না অথবা ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিচ্ছে না। র্যাবোভিচ যতই দেখছে আর শুনছে ততই এই আন্তরিকতাবিহীন অথচ সুশৃঙ্খল পরিবারটিকে তার ভাল লাগছে।

চায়ের পরে অফিসাররা নাচঘরে ঢুকল। লেফ্‌ট্‌ লবিৎকোর সহজাত প্রবৃত্তি তাকে ঠকায় নি; অনেক মেয়ে আর যুবতী নারী সেখানে ছিল। তার ঠিক পাশেই ছিল একটি যুবতী সু-বর্ণা মেয়ে; একটা কালো গাউন পরে এমন আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে যেন একটা অদৃশ্য তলোয়ারের উপর ভর দিয়ে আছে; মাঝে মাঝেই হাসছে, আর কাঁধ দুটোকে কেমন যেন গায়ে-পড়া ভাবে দোলাচ্ছে। লেফ্‌ট্‌. হয় তো কোন অর্থহীন মজার কথা বলছে, আর নীলবর্ণা মেয়েটি তার মুখের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাঝে মাঝেই নির্বিকারভাবে বলছে ঃ "সত্যি!"

কে একজন পিয়ানো বাজাতে শুরু করল। আবেগমথিত ওয়াল্‌জের সুর খোলা জানালা-পথে ভেসে গেল বাইরের বাগানে, সকলেরই মনে পড়ল বসন্ত এসেছে, এই তো মে মাস, পপলারের, গোলাপের, আর লিলাকের নতুন পাতার গন্ধ বাতাসে ভেসে ভেসে সকলের কানে এসে লাগল। র্যাবোভিচের পেটে অনেকটা ব্র্যাণ্ডি পড়েছে; এতক্ষণে সুরের আবেশে তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে; জানালার দিকে তাকিয়ে সে হেসে হেসে মেয়েদের চলাফেরা দেখতে লাগল; তার মনে হল, গোলাপের, পপলার গাছের নতুন পাতার এবং লিলাক ফুলের সুবাস বাগান থেকে আসে নি, এসেছে নারীদের মুখ থেকে, তাদের গাউন থেকে।

রাবেকের ছেলে একটি শুট্‌কো মেয়েকে তার সঙ্গে নাচতে বলল, আর সেও দুই দফায় তার সঙ্গে ওয়াল্‌জ্‌ নাচল। কাঠের মেঝের উপর দিয়ে যেন উড়ে গিয়ে লবিৎকো সেই নীলবর্ণা মেয়েকে নিয়ে ঘরময় পাক খেতে লাগল। শুরু হয়ে গেল নাচ...র্যাবোভিচ অন্য অনেকের সঙ্গে দরজাব পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জীবনে কোন দিন সে নাচে নি, আজ পর্যন্ত একটিও সম্ভ্রান্ত নারীর গলা জড়িয়ে ধরে নি। একটি লোক যখন সকলের চোখের সামনে একটি অপরিচিত মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরে এবং তার হাতের দিকে নিজের গলাটাও বাড়িয়ে দেয়, তখন সে দৃশ্য দেখতে তার প্রচণ্ড ভাল লাগে, কিন্তু নিজেকে সেই লোকটির ভূমিকায় সে কল্পনাও করতে পারে না। একসময়ে সহকর্মীদের সাহস ও শক্তিকে সে ঈর্ষা করত, কিন্তু মনে ব্যথাও পেত। সে যে ভীরু, তার কাঁধ দুটি যে গোলাকার, সে যে বৈশিষ্ট্যহীন, তার শরীরটা যে বেঢপ রকমের লম্বা আর তার জুল্‌পি দুটো বনবিড়ালের মত, এই সচেতনতাই তার অহংবোধকে গভীরভাবে অপমানিত করে; কিন্তু যতই সে বড় হতে লাগল ততই এই সচেতনতা তার অভ্যাসগত হয়ে উঠল। এখন আর মানুষকে নাচতে দেখলে বা জোর গলায় গভীর প্রত্যয়ে কথা বলতে শুনলে সে ঈর্ষা বোধ করে না, বোধ করে একটা সতৃষ্ণ বিস্ময়।

কোয়াড্রিল নাচ শুরু হয়ে গেলে তরুণ ভন রাবেক পা-নাচিয়ে দলের কাছে হেঁটে গিয়ে দু'জন অফিসারকে বিলিয়ার্ড খেলতে ডাকল। তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তার পিছনে নাচঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নাচঘর থেকে তারা বসবার ঘরে গেল, তারপর একটা লম্বা বারান্দা ও কয়েকটা ঘর পার হয়ে তারা বিলিয়ার্ডের ঘরে ঢুকল। খেলতেও শুরু করল।

র‍্যাবোভিচ কোন দিন তাস ছাড়া কিছু খেলে নি। বিলিয়ার্ড-টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে সে উদাসীন দৃষ্টিতে খেলোয়াড়দের দেখতে লাগল। বোতাম-খোলা কোট পরে হাতে 'কু' নিয়ে তারা টেবিলের চারদিকে ঘুরছে, ঠাট্টা-মস্করা করছে, অদ্ভুত সব শব্দ উচ্চারণ করছে। র‍্যাবোভিচের দিকে তারা নজরই দিল না। প্রথম গেমটা শেষ হতেই সে বিরক্ত বোধ করল, সেখানে নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে করে বিলিয়ার্ড-খেলোয়াড়দের ছেড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

নাচঘরে যাবার পথে সে একটা ছোট এ্যাড্‌ভেঞ্চার করে বসল। নাচঘরের অর্ধেক পথ যেতেই সে বুঝতে পারল, তার পথ ভুল হয়েছে। সে কিছুটা পিছু হটল, ডাইনে মোড় নিল, এবং একটা অন্ধকার পড়ার ঘরে ঢুকে পড়ল। বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে যাবার সময় তো এ ঘরটা চোখে পড়ে নি। সেখানে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে প্রথম যে দরজাটা চোখে পড়ল সেটাকেই সজোরে ধাক্কা দিয়ে খুলে একটা সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়ল। একেবারে সোজা সামনের দিককার দরজার ফাঁক দিয়ে একটা উজ্জ্বল আলোর ঝলক দেখতে পেল। সেই দরজার ওপার থেকে ভেসে এল একটা করুণ মাজুর্কার চাপা সুর। নাচঘরের মত এখানেও জানালাগুলো সপাটে খোলা এবং পপলার, গোলাপ ও লিলাকের গন্ধ ভেসে আসছে।

কোনদিকে যাবে বুঝতে না পেরে র‍্যাবোভিচ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। হঠাৎ তার কানে এল দ্রুত পায়ের শব্দ, রেশমী ঘাঘরার খস্‌খস্ আওয়াজ, আর তার পরেই একটি দমবন্ধকরা নারীকণ্ঠের অস্ফুট কথা ; "শেষ পর্যন্ত!" আর সঙ্গে সঙ্গে দুটি নরম, সুগন্ধী নারী-বাহু তার গলা জড়িয়ে ধরল ; একটি আতপ্ত গাল তার গালের উপর চেপে বসল, সে একটি চুম্বন অনুভব করল। কিন্তু ঠিক তখনই যে নারী তাকে চুমো খেয়েছিল সে আর্তস্বরে চীৎকার করে এক লাফে বুঝি বা বিতৃষ্ণায় পিছনে সরে গেল। র‍্যাবোভিচও প্রায় চেঁচিয়ে উঠে দরজার দিকে ছুটে গেল।

সে যখন নাচঘরে ফিরে গেল তখন তার বুকের ভিতরটা দ্রুত টিপ্‌টিপ্ করছে, দুটো হাত এত বেশী কাঁপছে যে সে তাড়াতাড়ি হাত দুটোকে পিছনে নিয়ে চেপে ধরল। প্রথমে সে লজ্জায় ও ভয়ে একেবারে ভেঙে পড়ল, তার মনে হল এই মাত্র একটি নারী যে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েছে সেটা এখানকার সকলেই জেনে গেছে, সে ভ্যাবাচেকা খেয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল, কিন্তু একবার যখন সে নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারল যে নাচ ও গল্প-গুজব আগের মতই চলছে, তারপর থেকেই সেই সম্পূর্ণ নতুন,

অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতির মধ্যে সে একেবারে বুঁদ হয়ে রইল। তার মধ্যে একটা বিচিত্র কিছু ঘটে চলেছে...তার মনে হল, এইমাত্র দুটি নরম, সুগন্ধী বাহু তার যে গলাটা জড়িয়ে ধরেছিল সেখানে যেন খানিকটা মাখন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ; তার বাঁ গালের যেখানে সেই বিচিত্র নারী চুমো খেয়েছিল সে জায়গাটা কী সুন্দর ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে, কেউ যেন সেখানে পুদিনা পাতার রসের ফোঁটা ফেলেছে ; সে জায়গাটা যত ঘষছে ততই যেন আরও বেশী ঠাণ্ডা লাগছে ; তার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে একটা বিচিত্র নতুন অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে, আর সেটা ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে...তার ইচ্ছা হল নাচবে, কথা বলবে, দৌড়ে বাগানে চলে যাবে, হো-হো করে হেসে উঠবে...সে সম্পূর্ণ ভুলে গেল যে তার গর্দানটা গোল, তার কোন বৈশিষ্ট্যই নেই, তার জুল্‌পি দুটো বনবিড়ালের মত, সে এক সম্পূর্ণ ''সৃষ্টিছাড়া'' জীব (একদিন সে আড়াল থেকে মহিলাদের বাক্যালাপ শুনেছিল ; তার চেহারা সম্পর্কে ঐ বিশেষণটিই তারা প্রয়োগ করেছিল)। ভন রাবেকের স্ত্রী সেখানে এলে র‍্যাবোভিচ তার দিকে তাকিয়ে একটি বিস্ফারিত মধুর হাসি হাসল, ভদ্রমহিলাও বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকালেন।

গ্লাসটা তুলে ধরে সে বলল, ''আপনাদের বাড়িটা আমার ভয়ংকর ভাল লেগেছে!''

ভদ্রমহিলাও হাসলেন, তারপর বললেন, বাড়িটা ছিল তার বাবার ; তিনি আরও জানতে চাইলেন তার বাবা-মা বেঁচে আছেন কি না, সে কতদিন সেনাবাহিনীতে আছে, সে এত শুকনো কেন, ইত্যাদি সব প্রশ্নের জবাব পাবার পরে মহিলাটি সেখান থেকে এগিয়ে গেলেন, আর র‍্যাবোভিচ আরও বেশী বিস্ফারিত মধুর হাসি হাসল ; এমন সব চমৎকার মানুষ জনের সান্নিধ্য তার বড়ই ভাল লেগে গেল।

আহারে বসে র‍্যাবোভিচকে যা কিছু দেওয়া হল সবই সে খেয়ে নিল, পান করল। তার সম্পর্কে কেউ কিছু বলছে না দেখে তার সাম্প্রতিক এ্যাডভেঞ্চারের একটা ব্যাখ্যা সে খুঁজতে লাগল। ব্যাপারটা যেমন রহস্যময়, তেমনই রোম্যান্টিক, অথচ তার ব্যাখ্যাটাও সহজ। হয় তো কোন যুবতী মেয়ে অথবা বিবাহিত নারী কারও সঙ্গে এই অন্ধকার ঘরে মিলিত হবার ব্যবস্থা করেছিল, মহিলাটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করেই ছিল, আর স্নায়বিক উত্তেজনাবশে র‍্যাবোভিচকেই তার প্রেমিক বলে ভুল করেছিল। এটা আরও বেশী সম্ভবপর এই কারণে যে সেই অন্ধকার ঘরের ভিতর দিয়ে যাবার সময় র‍্যাবোভিচ কি যেন ভেবে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিল, আর তাই মনে হয়েছিল যে সেও কারও জন্য অপেক্ষা করছে...এই ভাবেই র‍্যাবোভিচ তার চুম্বনটির ব্যাখ্যা করে ফেলল।

মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে ভাবল, ''কিন্তু সে কে হতে পারে? সে নিশ্চয় একটি যুবতী, কারণ বৃদ্ধারা অভিসারে যায় না। আর সে অবশ্যই একটি মহিলা, তার ঘাঘরার খস্‌-খস্‌ শব্দ, তার সুগন্ধ, তার

গলার স্বর থেকেই আমি সেটা বলে দিতে পারি...''

তার চোখ পড়ল নীলবর্ণা মেয়েটির উপর, আর তাকে খুবই ভাল লেগে গেল ; তার কাঁধ দুটি সুডৌল, তার বাহু দুটিও সুন্দর, মুখখানি বুদ্ধিদীপ্ত, আর কন্ঠস্বর মনমাতানো। তার দিকে তাকিয়েই অফিসারটি মনে মনে বলল, এই মহিলাই তো তাকে চুমো খেয়েছে, হ্যাঁ সেই, আর কেউ নয়...কিন্তু তার হাসিটা এতই আন্তরিকতা বিহীন আর তার লম্বা নাকটা এত বেশী কুঁচকানো যে দেখতে খুবই বিশ্রী। এবার তার নজর পড়ল একটি কালো গাউন পরা সুবর্ণার দিকে। এ মেয়েটির বয়স আরও কম, আরও সরল এবং আরও আন্তরিক, কপালটি মনোরম, আর মদের গ্লাস থেকে পান করার ভঙ্গীটিও খুবই সুন্দর। সে মনে মনে খুবই কামনা করল, এই মেয়েটিই যেন সেই নারী হয়। অবশ্য অচিরেই তার মনে মনে হল এর মুখটা বড় বেশী সমতল ; পাশের মেয়েটির দিকে তার নজর ঘুরে গেল...

সে যেন স্বপ্নের ঘোরে ভাবল, ''এটা বলা খুবই কঠিন। নীলবর্ণা মেয়েটির ঘাড় ও বাহু দুটি নিলে, সুবর্ণার ভুরু এবং লবিৎকোর বাঁ দিকে বসে থাকা মেয়েটির চোখ দুটি যোগ করলে, তবে...''

মনে মনে একটা অঙ্গের সঙ্গে অন্য অঙ্গ যোগ করে সেই মেয়েটির মূর্তি সে গড়ে তুলল যে তাকে চুমো খেয়েছে, কিন্তু টেবিলে উপবিষ্ট কোন মেয়ের সঙ্গেই সে মূর্তিটা মিলছে না।

আহারের পবে প্রাণভরে পান ও ভোজন পর্ব সমাধা করে অফিসাররা চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী দু'জনই পুনরায় দুঃখ প্রকাশ করলেন রাতটা তাদের বাড়িতে কাটিয়ে যাবার আমন্ত্রণ না জানাতে পারার দরুণ এবং সেজন্য সকলের কাছেই ক্ষমা চাইলেন।

''কত, কত যে খুশি হলাম ভদ্রমহোদয়গণ,'' জেনারেল বললেন, আর এবার বেশ আন্তরিকভাবেই বললেন (হয়তো অতিথিদের স্বাগত জানাবার সময় থেকে বিদায় জানাবার সময়েই মানুষ অধিকতর সদয় ও আন্তরিক হয়ে ওঠে)। ''খুব খুশি হয়েছি। ফেরবার পথে দয়া করে অবশ্যই আবার আসবেন। কোন ওজর-আপত্তি শুনব না! সে কি, আপনারা উপরের রাস্তাটা ধরতে চাইছেন কেন? বরং বাগানের ভিতর দিয়ে নদীর তীর বরাবর চলে যান, সেটা অনেক কাছে হবে!''

অফিসাররা বাগানে ঢুকল। উজ্জ্বল আলো ও হৈ-হট্টগোলের পরে বাগানটাকে খুবই স্তব্ধ ও অন্ধকার মনে হল। ফটক পর্যন্ত সারাটা পথ তারা নিঃশব্দে হাঁটল। তারা কিছুটা নেশাগ্রস্ত, সুখী ও তৃপ্ত, কিন্তু এই অন্ধকার ও স্তব্ধতা তাদের ঈষৎ চিন্তামগ্ন করে তুলল। র‍্যাবোভিচের মতই তারা সকলে একই কথা ভাবছে : রাবেকের মত এমন দিন কি তাদের জীবনেও কখনও আসবে যখন তাদেরও একটা বড় বাড়ি, একটা পরিবার ও একটা বাগান থাকবে ; আন্তরিকভাবে না হলেও তারাও অতিথিদের স্বাগত জানাবে এবং এই রকম ভাবেই তাদের সকলকেও ভূড়িভোজনে তৃপ্ত, নেশায় মত্ত ও

পরিতুষ্ট করতে পারবে।

ফটক থেকে বেরিয়েই তারা অকারণে কথা বলতে ও উচ্চ হাসি হাসতে লাগল। তারা এখন চলেছে নদীতে যাবার পথটা ধরে, তারপর হাঁটবে নদীর তীর ঘেঁষে ঝোপ-ঝাড়, খানাখন্দ ও উইলো গাছের হেলে-পড়া ডালপালার পাশ দিয়ে। পথটা ভাল দেখা যাচ্ছে না, অপর তীরটা তো অন্ধকারে ঢাকা। কালো জলের এখানে-ওখানে তারাদের ছবি ভাসছে, বেঁকে বেঁকে ছড়িয়ে পড়ছে, আর তাতেই বোঝা যাচ্ছে নদীতে খুব স্রোত। চারদিক নিস্তব্ধ। নদীর ও-পারে কয়েকটা কাদাখোঁচা পাখি ঘুমের মধ্যেই কাঁদছে, আর এ-পারে একটা নাইটিঙ্গেল পাখি ঝোপের মধ্যে বসে তারস্বরে ডাকছে, অফিসারদের ভিড়কে একটুও তোয়াক্কা করছে না। সকলে দাঁড়িয়ে ঝোপটার গায়ে হাত রাখল, কিন্তু নাইটিঙ্গেলের ডাক থামল না।

একজন তো সবিস্ময়ে বলেই উঠল, "কী মনের জোর! আমরা একেবারে পাশেই দাঁড়িয়ে আছি, সেদিকে পাখিটার খেয়ালই নেই!"

এবার পথটা তীর থেকে উপরে উঠে গির্জার কাছে বড় রাস্তায় মিশেছে। উৎরাই বেয়ে ওঠাটা বেশ ক্লান্তিকর, অফিসাররা উপরে উঠে একটু বিশ্রাম নিল, ধূমপান করল। ও-পারে একটা আবছা লাল আলো দেখা গেল; কথা বলার মত আর কিছু না থাকায় অনেকক্ষণ যাবৎ তারা সেই আলোটা নিয়েই আলোচনা করল—ওটা কি বহ্নি-উৎসব, না আলোকিত জানালা, না অন্য কিছু। র‍্যাবোভিচও আলোটার দিকে তাকিয়ে রইল; সে কল্পনা করল, আলোটা হেসে হেসে সলাজ ভঙ্গীতে চোখ টিপছে, যেন তার চুম্বনের খবরটা জানে।

নিজের জন্য নির্দিষ্ট কটেজে পৌঁছেই র‍্যাবোভিচ তাড়াতাড়ি পোশাক ছেড়ে শুয়ে পড়ল। ঐ একই কটেজে তার সঙ্গী হয়েছে লবিৎকো ও লেফ্‌ট্‌ মের্জলিয়াকভ; তাদের দলের মধ্যে এই লোকটিই ভাল লেখাপড়া জানে; সর্বদাই এক কপি "ইউরোপ হেরাল্ড" সঙ্গে রাখে আর যখন যেখানে সুযোগ পায় সেখানেই কাগজটা খুলে পড়ে। লবিৎকো পোশাক ছেড়ে মুখটা ভার করে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘরের মধ্যে পায়চারি করল এবং শেষ পর্যন্ত আর্দালিকে পাঠাল বীয়ারের খোঁজে। মের্জলিয়াকভ বিছানায় শুয়ে মোমবাতিটাকে মাথার কাছে রেখে কাগজটা পড়ার জন্য তৈরী হল।

"সে কে হতে পারে?" ধোঁয়ায় কালো সিলিং-এর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে র‍্যাবোভিচ নিজেকেই প্রশ্ন করল।

তখনও তার মনে হচ্ছে গলায় যেন মাখন ছড়ানো হয়েছে, গালের সেই জায়গাটায় যেন পুদিনাপাতার ঠাণ্ডা রসের ফোঁটা পড়ছে। সে কল্পনায় দেখতে পেল নীলবর্ণার কাঁধ ও বাহু, কালো গাউন পরা মেয়েটির ভুরু ও চোখ; আর দেখতে পেল নানা ধরনের কোমর, গাউন ও ব্রুচের জগাখিচুরি। এই সব ছবিকে সে মনের সামনে ধরে রাখার চেষ্টা করল, কিন্তু ছবিগুলি লাফিয়ে, কেঁপে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। চোখ বুজলে মানুষ যেরকম

একটা কালো পটভূমি দেখতে পায় তার মধ্যে যখন এই সব মূর্তি একেবারে মিলিয়ে গেল তখন সে শুনতে পেল সেই দ্রুত পায়ের শব্দ, রেশমী শাড়ির খস্‌-খস্‌ আওয়াজ, চুমো খাবার শব্দ, আর একটা অকারণ প্রবল উল্লাস তাকে একেবারে পেয়ে বসল। সেই উল্লাসের মধ্যেই সে শুনতে পেল, আর্দালিটি ফিরে এসে বলছে যে কোথাও বীয়ার পাওয়া গেল না। লবিৎকো ক্ষোভে ফেটে পড়ল ; আবার ঘরময় পায়চারি শুরু করল।

একবার র‍্যাবোভিচের কাছে, একবার মের্জলিয়াকভের কাছে দাঁড়িয়ে সে বলতে লাগল, "আচ্ছা, লোকটা খুব বোকা তাই না? একেবারে হাঁদারাম না হলে কেউ বলে যে বীয়ার পাওয়াই যাচ্ছে না! অ্যাঁ? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, সে কি একটা বুদ্ধু নয়?"

কাগজ থেকে চোখ না তুলেই মের্জলিয়াকভ বলল, "নিশ্চয়ই এখানে বীয়ার পাওয়া যায় নি।"

"পাওয়া গেল না? তুমি তাই মনে কর?" লবিৎকো প্রশ্ন করল, "হায় উপরওয়ালা, আমাকে তুমি চাঁদে পাঠিয়ে দাও, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে এনে দেব যত বীয়ার চাও, যত মেয়েমানুষ চাও! তাকিয়ে দেখ, আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি... যদি বীয়ার আনতে না পারি আমাকে পাজি বলে ডেকো!"

সাজ-পোশাক পরতে ও বুট পায়ে গলাতে সে অনেক সময় কাটাল, নিঃশব্দে একটা সিগারেট শেষ করল, তারপর পা বাড়াল।

দরজায় দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে বলল, "রাবেক, গ্রাবেক, লাবেক, একা-একা যেতে আমি ঘৃণা বোধ করি। আমি বলি, র‍্যাবোভিচ, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে? কি বল?"

র‍্যাবোভিচের কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে সে ফিরে এল, পোশাক ছেড়ে শুয়ে পড়ল। মের্জলিয়াকভ একটা নিঃশ্বাস ফেলে খবরের কাগজটাকে পাশে রেখে ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল।

অন্ধকারেই একটা সিগারেট ধরিয়ে লবিৎকো বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা।"

মাথার উপর কম্বলটা টেনে দিয়ে র‍্যাবোভিচ পাশ ফিরে হাত-পা গুটিয়ে কল্পনায় দেখা মূর্তিগুলো দিয়ে একটা মূর্তি গড়তে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই তাদের একত্র করা গেল না। অচিরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল ; তার সর্বশেষ ভাবনায় ধরা দিল —কেউ একজন তার সঙ্গে মধুর ব্যবহার করেছে, বোকা-বোকা হলেও অসাধারণ, ভয়ংকর সুন্দর ও আনন্দদায়ক কিছু তার জীবনে ঘটেছে। ঘুমের মধ্যেও সে সব চিন্তা তাকে ছেড়ে গেল না।

ঘুম যখন ভাঙল তখন গলায় মাখন ছড়ানো এবং গালের উপর ঠাণ্ডা রসের ফোঁটার অনুভূতি—দুটোই কেটে গেছে, কিন্তু গত রাতের সেই আনন্দের উচ্ছ্বাসটা তখনও তার মনেব মধ্যে ঢেউয়ের মত দুলছে। উদয়-সূর্যের আলোয় সোনা-রং জানালার দিকে তাকিয়ে তার খুব ভাল লাগল ; বাইরে লোক-চলাচলের শব্দও কানে এল। জানালার ঠিক নীচেই

দুটি লোক কথা বলছে। তাদের একজন র‍্যাবোভিচের ব্যাটারি কম্যাণ্ডার লেবেদেৎস্কি; সে সবে এখানে এসে পৌঁচেছে; আর অপর জন তারই সার্জেণ্ট-মেজর। লেবেদেৎস্কি আস্তে কথা বলতে পারে না; সে চেঁচিয়ে বললঃ

"আর কি ঘটল?"

"গতকাল আমরা যখন ঘোড়ার পায়ে নতুন করে নাল পরাচ্ছিলাম, তখন গোলুব্‌চিক আঘাত পায়। ডাক্তার কাদা ও ভিনিগারের একটা পুল্‌টিস বানিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে, আর গোলুব্‌চিককে এখন অন্য ঘোড়া থেকে আলাদা করে নিয়ে যাওয়া হবে। তাছাড়া, কাল রাতে আর্তেমিয়েভ মাতাল হয়ে গিয়েছিল, তাই লেফটেন্যাণ্ট হুকুম দিয়েছেন, সংরক্ষিত কামানের গাড়ির সামনে তাকে বসিয়ে দেওয়া হবে।"

সার্জেণ্ট-মেজর আরও জানাল, কারপভ ভেরীর নতুন দড়ি আর তাঁবু খাটাবার খোটা আনতে ভুলে যাওয়ায় আগের সন্ধ্যাটা অফিসাররা জেনারেল ভন রাবেকের বাড়িতেই কাটিয়েছেন। লেবেদেৎস্কির লালদাড়িওয়ালা মুখটা জানালায় দেখা দিল। অফিসারদের ঘুমন্ত মুখগুলির দিকে মাইওপিয়াগ্রস্ত চোখের বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে শুভ-সকাল জানাল।

প্রশ্ন করল, "সব কিছু ঠিক আছে?"

লবিৎকো হাই তুলতে তুলতে কি যেন একটা জবাব দিল।

কম্যাণ্ডার দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে এক মিনিট কি যেন ভাবল, তারপর জোর গলায় বলল ঃ

"আলেক্সান্দ্রা ইয়েভ্‌গ্রাফোভ্‌নার সঙ্গে একবার দেখা করতে যাব ভাবছিলাম। তিনি কেমন আছেন দেখে আসব। আচ্ছা, তাহলে বিদায়। রাত হবার আগেই তোমাদের ধরে ফেলব।"

পনেরো মিনিট পরে সেনাদলটি যাত্রা করল। তারা যখন ভন রাবেকের গোলাবাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তখন র‍্যাবোভিচ ডান দিকে চোখ ফিরিয়ে বাড়িটার দিকে তাকাল। সংসারের সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আগের রাতে যে মহিলাটি তাকে চুমো খেয়েছিল সেও ঘুমিয়ে পড়েছে। তার ঘুমন্ত অবস্থা সে কল্পনা করতে চেষ্টা করল। শোবার ঘরের জানালাটা হাট করে খোলা, সবুজ ডালপালাগুলি জানালায় উঁকি মারছে, সকলের তাজা ভাব, পপলারের পাতা, লিলাক ও গোলাপের সুবাস, একটা বিছানা, একটা চেয়ার, তার উপরে রাখা আছে গত রাতে খস্‌খস্ করা পোশাকটা, একজোড়া চটি, টেবিলের উপর একটা সুন্দর ঘড়ি—এ সবই সে ঠিক ঠিকই কল্পনা করতে পারল, কিন্তু তার চোখ-মুখ, মিষ্টি ঘুম-ঘুম হাসি, এমন অনেক কিছু যা কেবল তারই আছে—সে সব তার কল্পনাকে এড়িয়ে গেল, আঙুলের ছোঁয়া লেগে ছুটে যাওয়া পারদের মত। আধ ভার্স্টের মত পথ চলার পরে সে পিছন ফিরে তাকাল ঃ সবুজ গির্জা, বাড়িটা, নদী ও বাগান সূর্যের আলোয় ঝল্‌মল্ করছে; উজ্জ্বল সবুজ দুই তীরের মাঝখানে নদীর বুকে নীল আকাশের ছায়া পড়েছে; রোদ পড়ে এখানে ওখানে রূপোলি ঝিলিক

ফুটে উঠছে; সব কিছুই বড় সুন্দর। র‍্যাবোভিচ শেষবারের মত মেস্তোস্কির দিকে তাকাল; তার খুব কষ্ট হতে লাগল, যেন কোন প্রাণের প্রিয়জনের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে।

তারা পথ চলতে লাগল; যা কিছু চোখে পড়ছিল সবই একঘেয়ে, অতিপরিচিত...ডাইনে ও বায়ে দূরবিস্তার ফসলের ক্ষেতে অংকুর গজিয়েছে, পাখিরা লাফিয়ে বেড়াচ্ছে; সামনে তাকালে চোখে পড়ছে কেবল ধূলো ও মানুষের পিঠ, আর পিছনে তাকালে—সেই একই ধূলো ও মুখ...প্রত্যেকের সামনে চারজন করে অসিধারী মার্চ করে চলেছে—তারা অগ্রগামী রক্ষীদল। তাদের পিছনে চলেছে একদল গায়ক, তারপর ঘোড়ার পিঠে ভেরীবাদকের দল। অগ্রগামী রক্ষীদল আব গায়করা—শোকযাত্রার মশালধারীদের মতই—নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখার কথা বার বার ভুলে যাচ্ছে আর অনেক বেশী এগিয়ে যাচ্ছে। র‍্যাবোভিচের স্থান ছিল পঞ্চম কামানবাহিনীর প্রথম কামানের পাশে। বাকি চারটে কামান-বাহিনীকেই সে সম্মুখে দেখতে পাচ্ছিল। যে কোন অসামরিক লোকের কাছেই মানুষ, ঘোড়া ও কামানের গাড়ির এই দীর্ঘ সারিকে এমন একটা জটিল ব্যাপার বলে মনে হবে যাকে সহজে বোঝা যায় না। যেমন, একটা কামানকে ঘিরে এতগুলি লোক থাকার দরকার হয় কেন, এতগুলি ঘোড়াকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়েই বা সেটাকে টেনে নেওয়া হয় কেন যাতে মনে হতে পারে যে টেনে নেওয়ার পক্ষে কামানটা ভয়ংকর রকমের ভারী। কিন্তু র‍্যাবোভিচের কাছে এ সবই অত্যন্ত পরিস্কার আর তাই একঘেয়ে। প্রতিটি ব্যাটারির সম্মুখে অফিসারের পাশে একজন মর্যাদাসম্পন্ন সনদবিহীন অফিসারকে ঘোড়ায় চড়ে চলতে হয়, আর কেনই বা তাকে অগ্রবর্তী অশ্বারোহী বলা হয়—এ সব কথা সে দীর্ঘদিন ধরে জেনে এসেছে।

র‍্যাবোভিচ নিস্পৃহ চোখে সম্মুখের সৈন্যদের মাথার পিছন দিক এবং পিছনের সৈন্যদের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে চলেছে; অন্য সময় হলে সে হয়তো জিনের উপর বসে ঝিমুত, কিন্তু এখন সে তার মধুময় নতুন চিন্তা-ভাবনার মধ্যেই মসগুল হয়ে আছে। সেনাদল যাত্রা শুরু করলে প্রথমে সে নিজেকে বোঝাতে চেয়েছিল যে চুম্বনের ব্যাপারটা নিছকই একটা ছোটখাট বিভ্রান্তিকর অ্যাডভেঞ্চার মাত্র, কিন্তু আসলে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন অর্থই হয় না; কিন্তু অচিরেই তার মন সব বিচার-বিবেচনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে দিবাস্বপ্নে ডুবে গেল...এই কল্পনা করছে ভন রাবেকের বসবার ঘরে সেই মেয়েটির পাশে সে বসে আছে যাকে দেখতে নীলবর্ণা ও কৃষ্ণবসনা দুটি মেয়েরই মত; পরক্ষণেই দুই চোখ বন্ধ করে সে নিজেকে দেখছে এমন আর একটি মেয়ের পাশে যে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং যার মুখখানা একেবারেই অস্পষ্ট; নিজের মনেই সে তার সঙ্গে কথা বলছে, তাকে আদর করছে, তার কাঁধে মাথা রাখছে, স্বপ্ন দেখছে যুদ্ধের ও বিচ্ছেদের, এবং তার পরে তার প্রত্যাবর্তন এবং স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে নৈশাহার...।

যতবার উৎরাই বেয়ে নামতে হচ্ছে ততবারই হুকুম হচ্ছে ''ব্রেক কসো!'' সেই একই হুকুম তাকেও চীৎকার করে শোনাতে হচ্ছে, আর তার ভয় হচ্ছে যে এই চীৎকার তার দিবাস্বপ্নকে ভেঙে খান খান করে দিয়ে তাকে কঠিন মাটিতে টেনে নামাবে।

কোন একজনের জমিদারীর পাশ দিয়ে যাবার সময় র‍্যাবোভিচ গাছ-গাছালির বেড়ার উপর দিয়ে ভিতরের বাগানটার দিকে তাকাল। তার চোখে পড়ল একটা দীর্ঘ সোজা পথ, তাতে হলুদ বালি ছড়ানো আর দুই ধারে ছোট বার্চ গাছের সারি। দিবাস্বপ্নের শান দেওয়া তার কল্পনায় ভেসে উঠল—একটি ছোটখাট নারীর যুগল চরণ সেই হলুদ বালিব উপর পা ফেলে হেঁটে চলেছে, আর একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তার সামনে দেখা দিল সেই নারীর ছবি যে তাকে চুমো খেয়েছিল, আগের দিন সারা সন্ধ্যা যার পরিচয় অনুমান করেই সে কাটিয়েছে। এখন থেকে সেই নারীমূর্তি তার মনে স্থায়ী আসন করে নিল, কখনও সেখান থেকে নড়ল না।

দুপুর বেলা পিছন থেকে হুকুম ঘোষিত হল ঃ

''মনোযোগ! চোখ বায়ে ঘোরাও!''

দুটি সাদা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে তাদেব বিগ্রেড জেনারেল পাশ দিয়ে চলে গেল! দ্বিতীয় ব্যাটারির পাশে থেমে সে চীৎকার করে এমন কিছু বলল যা কেউ বুঝতে পারল না। র‍্যাবোভিচসহ কয়েকজন অফিসার ঘোড়া ছুটিয়ে তার কাছে গিয়ে হাজির হল।

রক্ত-মাখা চোখ দুটি পিট্‌পিট্ করে জেনারেল শুধাল, ''সব কিছু ঠিক আছে কি? কেউ কি অসুস্থ হয়ে পড়েছে?''

জেনারেল ছোটখাট দুর্বল মানুষ। সকলের জবাব শুনে সে ঠোঁট কামড়ে কি যেন ভাবল, তারপব একজন অফিসারকে বলল ঃ

''তোমাব তৃতীয় কামানের জনৈক অশ্বারোহী তার হাটুবন্ধনটা খুলে গাড়িব সামনে ঝুলিয়ে রেখেছে—বাস্কেল। তাকে সতর্ক করে দিও।''

র‍্যাবোভিচের দিকে চোখ তুলে বলল ঃ

''তোমার ব্রীচেসের ফিতেগুলি বড়ড বেশী লম্বা মনে হচ্ছে...''

জেনারেল আবও কয়েকটি বিরস মন্তব্য করল, তারপর লবিংকোর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

''আরে লেফ্‌টেন্যান্ট লবিংকো, আজ তোমাকে বড়ই মন-মরা দেখাচ্ছে। মাদাম লোপুখোভার জন্য হা-হুতাশ করছ নাকি? এ্যা? শোন হে তোমরা, ও তো মাদাম লোপুখোভাব জন্য হেদিয়ে মরছে।''

মাদাম লোপুখোভা বেশ ঠাসা গড়নের উঁচু-লম্বা মহিলা, অনেক আগেই চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। যে কোন বয়সের বড়সড় মেয়েমানুষের প্রতি জেনারেলের নিজেরই একটা টান আছে, তাই নিজের অফিসারদের সম্পর্কেও সেই সন্দেহটা তার আছে। সকলেই সশ্রদ্ধ ভঙ্গীতে হেসে উঠল। একটা খুব রসের কথা বলতে পারার সুখে জেনারেল উচ্ছ্বাসিতে ফেটে পড়ল।

কোচোয়ানের পিঠে একটা টোকা মেরে সকলকে অভিবাদন জানাল। গাড়িটা চলতে শুরু করল...

জেনারেলের গাড়ির পিছনে ধাবমান ধূলোর মেঘের দিকে তাকিয়ে র‍্যাবোভিচ ভাবতে লাগল ঃ "আমি যা কিছু স্বপ্ন দেখছি, যা কিছু এখন আমার কাছে অসম্ভব ও স্বর্গীয় বলে মনে হচ্ছে, আসলে সবই অতি সাধারণ। খুবই সাধারণ, এ রকমটা সকলের জীবনেই ঘটে থাকে...এই জেনারেলের কথাই ধরা যাক, তিনি যখন যুবক ছিলেন তখন তিনিও ভালবেসেছেন, কিন্তু এখন তিনি বিয়ে করেছেন, তার ছেলেমেয়ে আছে। ক্যাপ্টেন ওয়াচারও বিবাহিত, স্ত্রী তাকে ভালবাসে, কিন্তু তার গর্দানের পিছনটা কুৎসিত ও লাল, আর কোমর বলে কিছুই তার নেই...সাল্‌মানভ রুক্ষ প্রকৃতির লোক, একটা তাতার বিশেষ, তারও তো একটা প্রেমের ব্যাপার ছিল যা শেষ পর্যন্ত বিয়ে পর্যন্ত গড়িয়েছিল...আমিও তো আর দশ জনেরই মত, আগে হোক আর পরে হোক, অন্য সকলের পথেই তো আমাকেও চলতে হবে..."

সে একজন সাধারণ মানুষ, তার জীবনটাও সাধারণ, এই চিন্তাই তাকে খুশিতে ও উৎসাহে ভরিয়ে তুলল। এখন সে তার প্রেমিকার ও নিজের সুখের ব্যাপারে যা খুশি তাই ভাবতে পারে, তার কল্পনা যেমন খুশি উদ্দাম হয়ে উঠতে পারে।

সেদিন সন্ধ্যায় সেনাবাহিনীটি যখন লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেল এবং অফিসাররা যার যার তাঁবুতে বিশ্রাম নিতে গেল, তখন র‍্যাবোভিচ, মের্জলিয়াকভ ও লবিৎকো একটা ট্রাংককে টেবিল বানিয়ে তার চারপাশে গোল হয়ে বসে খেতে বসেছে। মের্জলিয়াকভ খাচ্ছে ধীরে সুস্থে ভাল করে চিবিয়ে চিবিয়ে আর হাঁটুর উপরে প্রিয় খবরের কাগজখানা বিছিয়ে পড়ে চলেছে। লবিৎকো সারাক্ষণ কথা বলেছে আর একের পর এক গ্লাসটা ভর্তি করে চলেছে। এদিকে র‍্যাবোভিচ সারাটা দিন দিবাস্বপ্নের ঘোরে কাটিয়ে নিঃশব্দে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। তিন গ্লাসের পরেই তার নেশা ধরল, আর নেশার ঘোরেই নিজের নতুন অনুভূতির কথাটা বন্ধুদের জানাবার লোভটা সংবরণ করতে পারল না।

"রাবকের বাড়িতে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে, বুঝলে। আমি তো বিলিয়ার্ডের ঘরে ঢুকলাম, বুঝলে..."

চুম্বনের গল্পটা সবিস্তারে বলে এক মিনিটের মধ্যেই সে নিশ্চুপ হয়ে গেল...এক মিনিটেই সম্পূর্ণ গল্পটা বলা হয়ে যাওয়ায় সে ভীষণ অবাক হয়ে গেল। সে ভেবেছিল গল্পটা শেষ হতে রাত কেটে সকাল হয়ে যাবে। লবিৎকো নিজে অনেক মিথ্যাই বলে, তাই কারও কথাই বিশ্বাস করে না, সব কথা শুনে সে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে কপট হাসি হাসল। মের্জলিয়াকভ এক মুহূর্তের জন্য ভুরু দুটি কুঁচকাল, তারপর কাগজ থেকে চোখ না তুলেই শান্ত গলায় বলল ঃ

"তাকে এভাবে জড়িয়ে ধরার আগে মহিলাটির উচিত ছিল একবার তার নাম ধরে ডাকা...নিশ্চয় মাথার কোন গোলমাল আছে, অথবা .."

"হ্যাঁ", র‍্যাবোভিচ স্বীকার করল, "নিশ্চয় তাব মাথার গোলমাল আছে।"

নাটকীয় ভঙ্গীতে তাকিয়ে লবিৎকো বলল, "এই রকম একটা ব্যাপার একবার আমার জীবনেও ঘটেছিল। গত বছর আমি কভ্‌নো যাচ্ছিলাম...একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটেছিলাম...গাড়িটা এত বেশী যাত্রী বোঝাই ছিল যে ঘুমনো অসম্ভব। কণ্ডাক্টারকে পঞ্চাশ কোপেক দিলাম, সে আমার মালপত্র তুলে আর একটা কামরায় নিয়ে গেল...আমি শুয়ে পড়ে মাথাটা ঢাকলাম।...কামরাটা অন্ধকার। হঠাৎ বুঝলাম কে যেন আমার কাঁধে হাত রাখল, তার নিঃশ্বাস পড়ল আমার মুখে, হাতটা তুলতেই একজনের কনুইতে লাগল...চোখ মেলে দেখলাম আমার সামনে একটি নারী। কল্পনা করতে পার! কালো চোখ, নোনা সামন মাছের মত লাল ঠোঁট, গভীব আবেগে তার নাসারন্ধ্র কাঁপছে, বুকটা দেয়ালের মত..."

মের্জলিয়াকভ তার কথায় বাধা দিল, "মাফ কর, বুকের ব্যাপারটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু অন্ধকারে তুমি তার ঠোঁট দেখলে কেমন করে?"

নিজের মিথ্যার জাল কেটে বের হবার জন্য লবিৎকো মের্জলিয়াকভের ক্ষীণ বুদ্ধির দরুণ হো-হো করে হেসে উঠল। তার এই বিদ্রূপে আহত হয়ে র‍্যাবোভিচ দু'জনের কাছ থেকেই দূরে সরে গিয়ে শুয়ে পড়ল, প্রতিজ্ঞা করল আর কখনও নিজের গোপন কথা কাউকে বলবে না।

শুরু হল তাঁবুর জীবন...একটা দিন অবিকল আর একটা দিনেরই মত। সর্বক্ষণ র‍্যাবোভিচ একটি প্রেমে-পড়া পুরুষের মতই ভাবনা, চিন্তা, কাজকর্ম করতে লাগল। প্রতিদিন সকালে আর্দালি যখন তাকে প্রাতঃকৃত্যের জিনিসপত্র এসে দিত তখনই সে মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালত, সর্বদাই মনে করত তার জীবনেও শুভ ও আতপ্ত কিছু আছে।

সন্ধ্যায় সহকর্মীরা যখন ভালবাসা ও নারী'কে নিয়ে কথাবার্তা শুরু করত, তখন সে কান পেতে শুনত, তাদের আরও কাছে গিয়ে বসত, আর মুখে এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলত যেন একটি সৈনিক সেই যুদ্ধেরই বিবরণ শুনছে যাতে সে নিজে যুদ্ধ করেছে। আর যে সব সন্ধ্যায় অফিসাররা অতিরিক্ত মাত্রায় মদ খেয়ে লবিৎকোর নেতৃত্বে গ্রামে গিয়ে ভালবাসার হামলা চালাত, র‍্যাবোভিচও সেই হামলায় যোগ দিত, কিন্তু প্রতিবারই নিজেকে ভীষণ দোষী মনে করত আর সেই ক্ষণিকের প্রিয়ার কাছে অনুতপ্ত অন্তরে ক্ষমা চেয়ে নিত।...কোন অলস প্রহরে অথবা নিদ্রাহীন রাতে যখন তার মনে পড়ত তার শৈশব, বাবা, মা ও প্রিয়জনের কথা তখনই অনিবার্যভাবে তার মনে পড়ে যেত মেস্তেস্কি, পাশ কাটিয়ে চলা ঘোড়াটি, ভন রাবেক ও তার স্ত্রী যাকে দেখতে সম্রাজ্ঞী ইউজেনির মত, একটা অন্ধকার ঘর ও দরজায় এক ঝিলিক আলোর স্মৃতি...

৩১শে আগস্ট সে শিবির থেকে ফিরছিল ; এবার নিজের ব্রিগেডের সঙ্গে নয়, মাত্র দুটি ব্যাটারি নিয়ে। সারাটা পথ সে এতই উত্তেজিত ছিল যেন নিজের বাড়িতেই ফিরছে। গভীর আবেগে তার বড়ই ইচ্ছা হল যেন আর একবার দেখতে পায় সেই বিচিত্র ঘোড়াটি, গির্জা, আন্তরিকতাবিহীন র‍্যাবেক পরিবার, আর সেই অন্ধকার ঘরটিকে ; মানুষ প্রেমে পড়লে ভিতরকার যে কণ্ঠস্বর তাকে প্রায়শই ঠকায় সে যেন তার কানে কানে বলল, প্রেমিকার দেখা সে পাবেই। তাই তার মনে অনেক প্রশ্ন জাগল : কেমন করে সে তার দেখা পাবে? তার সঙ্গে কি বিষয় নিয়ে কথা বলবে? সেই চুম্বনের কথা কি সে ভুলে গেছে? যদি শোচনীয় থেকেও শোচনীয়তর কিছু ঘটে, এমন কি সেই মহিলার দেখা যদি নাও মেলে, তাহলেও সেই অন্ধকার ঘরে ঢুকে স্মৃতি-রোমন্থন করতেও কত না সুখ সে পাবে...

সন্ধ্যা নাগাদ সেই পরিচিত গির্জা ও সাদা গোলাবাড়িটা দূর দিগন্তে দেখা দিল। র‍্যাবেভিচের বুকের ভিতরটা ঢিপ্‌ঢিপ্ করতে লাগল...পাশের অশ্বারোহী অফিসারটি তাকে কি যেন বলল তা সে শুনতে পেল না, সে জগৎ-সংসার ভুলে গেল, সাগ্রহে দেখতে লাগল দূরে নদীর জল ঝিলমিল করছে, দেখতে পেল জমিদার বাড়ির ছাদ, পায়রা-খোপে কত পায়রা, অস্ত-সূর্যের আলোয় তাদের পাখনায় সোনা-রং ঝরে পড়ছে।

তারা গির্জায় পৌঁছে গেল ; কোয়ার্টার মাস্টারের ঘোষণা শেষ হল ; সে আশা করে আছে গির্জার পিছন থেকে একজন অশ্বারোহী এসে তাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করবে, কিন্তু কোয়ার্টার মাস্টারের প্রতিবেদন শেষ হল, অফিসাররা ঘোড়া থেকে নেমে যার যার বাসস্থানে চলে গেল, কোন সংবাদবাহক এল না।

''ভন র‍্যাবেক তার চাকরদের কাছে শুনবেন যে আমরা এসে গেছি, আর অমনি আমাদের ডেকে পাঠাবেন,'' নির্দিষ্ট ঘরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে র‍্যাবোভিচ এই কথাই ভাবছিল ; কেন যে তাঁর সহকর্মীরা মোমবাতি ধরাচ্ছে, আর কেনই যে আর্দালিরা সামোভার গরম করছে তার মাথামুণ্ডু কিছুই তো সে বুঝতে পারছে না!...

তীব্র দুশ্চিন্তায় সে ছটফট করতে লাগল। বিছানায় শুয়ে পড়ল, আবার তখনই জানালা দিয়ে তাকাল, সংবাদবাহক আসছে কিনা দেখতে। কিন্তু কেউ এল না। সে আবার শুয়ে পড়ল, আধ ঘণ্টা পরে উঠে বসল, অস্থিরতার জন্য চুপচাপ বসে থাকতেও পারল না, ঘর থেকে বেরিয়ে গির্জার দিকে হাঁটতে লাগল। সম্মুখের স্কোয়ারটা অন্ধকার ও নির্জন। নদীতে নামবার পথের ঠিক মাথায় তিনটি সৈন্য নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। র‍্যাবোভিচকে দেখে চমকে উঠে তারা স্যালুট করল। সেও স্যালুট করে পরিচিত পথ ধরে নেমে গেল।

নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত আকাশে লালের বন্যা বয়ে যাচ্ছে ; চাঁদ উঠছে ; দুটি গ্রাম্য স্ত্রীলোক সব্জীবাগানে ঘুরে ঘুরে বাঁধাকপির পাতা ছিঁড়ছে

আর উঁচু গলায় কথা বলছে ; সব্জীবাগানের পিছনে কয়েকটা কুঁড়েঘরের কালো ছায়া মাথা তুলে আছে...নদীর এপারে সব কিছুই মে মাসের মত একই আছে ; পথ, ঝোপ-ঝাড়. জলের উপর নুয়েপড়া উইলো গাছ...কেবল সেই সাহসী নাইটিঙ্গেলের ডাক শোনা যাচ্ছে না, আর নেই পপলারের নতুন পাতা ও নতুন ঘাসের গন্ধ।

বাগানে পৌঁছে দেখল সেটাও অন্ধকার নিস্তব্ধ। তার চোখ পড়ল কেবল বার্চ গাছের সাদা কাণ্ডগুলি আর পথটার শুরু ; তার ওপারে সব কিছুই ডুবে আছে নিরেট কালোর মধ্যে। সে সাগ্রহে কান পাতল, চোখের দৃষ্টিকে প্রসারিত করল, একটি শব্দ শোনার বা একটি আলো দেখবার আশায় প্রায় পনেরো মিনিট এই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর পা টানতে টানতে এগিয়ে গেল...

নদীতে পৌঁছে গেল। সেখানেই পরিবারের স্নান-ঘর ; বড় বড় তোয়ালে ছোট সেতুটার রেলিং-এ শুকোতে দেওয়া হয়েছে। সেতুর উপর উঠে এক মিনিট সেখানে দাঁড়াল। অলসভাবে একটা তোয়ালে নিয়ে নাড়াচাড়া করল। নীচে জলের দিকে তাকাল ; নদীটি কল্‌কল্ শব্দে খরস্রোতে বয়ে চলেছে। লাল চাঁদের প্রতিচ্ছবি পড়েছে বাঁদিকের তীরের কাছে। ছোট ছোট ঢেউয়ের আঘাত লেগে সে ছবি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে বুঝি ছবিটা টুকরো টুকরো হয়ে স্রোতের টানে ভেসে চলেছে...

দ্রুত চলমান জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে র‍্যাবোভিচ ভাবল, "কী নির্বোধ! কী নির্বোধ! কত বড় নির্বোধ!"

যেহেতু এখন আর তার আশা করার কিছুই নেই, তাই চুম্বনের ঘটনা, তার ধৈর্যহীনতা, তার অস্পষ্ট আশা ও হতাশা—সব কিছুই যেন নতুন অর্থ নিয়ে তার সামনে হাজির হল। ভন রাবেকের কাছে থেকে যে কোন দূত এল না, ভুলক্রমে যে নারী তাকে চুম্বন করেছে তার সঙ্গে যে আর কোন দিন দেখা হবে না, এটা আর তার কাছে আশ্চর্য বলে মনে হচ্ছে না ; উপরন্তু, যদি কখনও সে তার দেখা পায় তো সেটাই হবে আশ্চর্য ঘটনা ..

নদীর জল কেন ছুটে চলেছে, কিসের জন্য—তা কেউ জানে না। মে মাসেও এই জল ঠিক এই ভাবেই ছুটে যাচ্ছিল ; মে মাসে সব জল গিয়ে পড়েছিল একটা বড় নদীতে, তারপর সমুদ্রে, তারপর সেই জল বাষ্প হয়ে বৃষ্টিতে পরিণত হল ; হয় তো আজ সেই একই জল দেখছে...এ জল কোথায় ছুটে চলেছে ? কিসের জন্য ?

সমস্ত জগৎ আর সমস্ত জীবনটাই মনে হল যেন একটা দুর্বোধ্য, অর্থহীন পরিহাস...জলের উপর থেকে চোখ দুটিকে সরিয়ে সে এবার আকাশের দিকে তাকাল ; আবার তার মনে পড়ল কেমন করে নিয়তি সেই বিচিত্র নারীর রূপ ধরে ভুল করে তাকে সোহাগ করেছিল ; মনে পড়ল সারাটা গ্রীষ্মকাল সে দিবাস্বপ্ন দেখেই কাটিয়েছে, কত ছবিই সে মনে মনে এঁকেছে ; সে আরও ভাবল তার জীবনটা কী ভয়ংকর দুর্ভাগ্যে ভরা, কত নিঃস্ব, কত বর্ণহীন...

নিজের নির্দিষ্ট বাড়িতে পৌঁছে কোন অফিসারকেই সেখানে দেখতে পেল না। তার আদালি জানাল, তারা সকলেই জেনারেল "ফন্ত্রিয়াব্‌কিন"-এর বাড়িতে গেছে; সেখান থেকে একটি অশ্বারোহী দূত এসে তাদের নিয়ে গেছে। মুহূর্তের জন্য তার অন্তরটা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সে ঔজ্জ্বল্যকে সে নিভিয়ে দিল, বিছানায় শুয়ে পড়ল, নিয়তিকে হিংসা করতে লাগল, আর বুঝি বা নিয়তির উপর প্রতিশোধ নিতেই ভন রাবেকের বাড়ি যেতে অস্বীকার করল...

১৮৮৭

কাশ্‌তাংকা

Kashtanka



অধ্যায় এক

খারাপ আচরণ

একটা অল্পবয়সী দো-আঁস্‌লা কুকুর—যার নাক ও চিবুক দেখতে শেয়ালের মত —বাঁধানো পথ ধরে এদিক-ওদিক ছুটছে আর চিন্তিত মুখে কার দিকে কি যেন খুঁজছে। এই থেমে গিয়ে নাকি সুরে কাঁদছে, একবার একটা ঠাণ্ডা পা উঁচুতে তুলছে, আবার অন্য একটা, যেন বুঝতে চেষ্টা করছে এ রকমটা ঘটল কেমন করে। কুকুরটা হারিয়ে গেছে।

তার পরিষ্কার মনে পড়ছে সারাটা দিন কি ভাবে কেটেছে, কেমন করে শেষ পর্যন্ত অপরিচিত বাঁধানো পথে এসে পৌঁচেছে।

দিনের শুরুতেই তার মনিব ছুতোর লুকা আলেক্সান্দ্রিচ টুপিটা মাথায় দিয়ে লাল কাপড়ে মোড়া একটা কাঠের জিনিস কাঁধে ঝুলিয়ে হাঁক দিয়েছিল : "চলে এস কাশ্‌তাংকা।"

ডাক শুনেই সেই দো-আঁসলা জীবটি বেঞ্চির তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আরাম করে আড়মোড়া ভেঙেই মনিবের পিছন পিছন ছুটতে শুরু করল। লুকা আলেক্সান্দ্রিচের খদ্দেররা সকলেই থাকে ভীষণ দূরে দূরে; কাজেই তাদের কারও বাড়িতে পৌঁছবার আগেই ছুতোরকে বেশ কয়েকবার শুঁড়িখানায় ঢুকতে হল গায়ের জোরটা বাড়িয়ে নেবার জন্য। কাশ্‌তাংকার মনে পড়ছে তার মনিব খুবই খারাপ আচরণ করেছে। মনিব তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে বলে কুকুরটা আনন্দে অধীর হয়ে ছোটাছুটি করেছে, কখনও এগিয়ে গিয়ে ঘোড়ায় টানা ট্রাম দেখে ঘেউ-ঘেউ করেছে, অনেকের ভিতরের উঠোনে ঢুকে অন্য কুকুরদের তাড়া করেছে। তাকে

কাছাকাছি দেখতে না পেয়ে ছুতোর মিস্ত্রি দাঁড়িয়ে পড়েছে, রাগী গলায় তাকে ডেকেছে। একবার তো মুখে বেশ মৌজের ভাব ফুটিয়ে কুকুরটার শেয়াল-কানটাকে মুঠিতে ধরে তাকে বার বার ঝাঁকুনি দিয়েছে আর টেনে টেনে বলেছে ঃ

"তোমার...মরে..যাওয়াই উচিত...ছুঁচো কোথাকার।"

খদ্দেরদের বাড়ি-বাড়ি ঘোরা শেষ করে লুকা আলেক্সান্দ্রিচ এক মিনিটের জন্য বোনের বাড়িতে ঢুকে তার সঙ্গে চা-বিস্কুট খেল; বোনের বাড়ি থেকে গেল এক পরিচিত বই-বাঁধাইওয়ালার বাড়ি, সেখান থেকে একটা শুঁড়িখানায়, শুঁড়িখানা থেকে তার স্ত্রীর এক আত্মীয়ের বাড়ি; এই ভাবে একের পর এক চলল। এক কথায়, কাশ্‌তাংকা যখন এই অপরিচিত পথটাতে এসে পড়ল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আর ছুতোরটি মাতাল হয়ে একেবারে নবাব বনে গেছে। অনবরত হাত নাড়ছে, বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, আর নিজের মনেই বলছে ঃ "কোন্ পাপে যে মায়ের গর্ভে জন্মেছিলাম! হায় কী পাপ, কী পাপ! এখন আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, রাস্তার আলোগুলি দেখছি, কিন্তু যখন মরে যাব তখন তো নরকের আগুনে পুড়ব..."

আবার মেজাজ ভাল থাকলে কাশ্‌তাংকাকে নিজের কাছে ডেকে নেবে, আদর করে বলবে, "দেখ কাশ্‌তাংকা, তুই তো একটা উকুন ছাড়া কিছু না। একজন সূত্রধরের তুলনায় একটা ছুতোর যতটুকু, একজন মানুষের তুলনায় তুই তো তার বেশী কিছু নস্।"

সে যখন কাশ্‌তাংকার সঙ্গে এই ভাবে কথা বলছে, তখন হঠাৎ একটা বাজনার শব্দ কানে এল। কাশতাংকা চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, একদল সৈন্য রাস্তা দিয়ে মার্চ করতে করতে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। বাজনার শব্দ সে সহ্য করতে পারে না, তার স্নায়ুগুলি কেমন যেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, সে ছুটাছুটি শুরু করে আর ডাকতে থাকে। কিন্তু কী আশ্চর্য, ছুতোর কিন্তু ভয় পেল না, চমকেও উঠল না, বরং বিস্ফারিত হাসি হেসে এটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সেলাম ঠুকল। মনিবকে কোনরকম প্রতিবাদ করতে না দেখে কাশ্‌তাংকা আরও জোরে ভেউ-ভেউ করতে লাগল; তার বুঝি মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল; এক ছুটে রাস্তার এ-পার থেকে ও-পারে চলে গেল।

তার বুদ্ধিশুদ্ধি যখন ফিরে এল, ততক্ষণে বাজনা থেমে গেছে, সেনাদলও অদৃশ্য হয়েছে। সে রাস্তা বরাবর ছুটে গেল যেখানে তার মনিব দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মনিব তো সেখানে নেই। সামনে ছুটে গেল, আবার ফিরে এল, কিন্তু ছুতোরকে কোথাও পেল না। কাশতাংকা পথটা শুঁকতে লাগল যদি মনিবের গন্ধটা কোথাও পাওয়া যায়, কিন্তু কোন বদমাশ লোক রবারের নতুন গালোশ পায়ে দিয়ে এইমাত্র সেই পথ দিয়ে চলে গেছে; অন্য সব রকম সুন্দর গন্ধ রবারের পচা গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে; তাদের মধ্যেকার কোন ফারাক সে ধরতেই পারল না।

কাশ্‌তাংকা যতক্ষণ ধরে মনিবের খোঁজে বৃথাই ছুটাছুটি করল ততক্ষণে অন্ধকাব নামতে শুরু করেছে, বাস্তাব দুই ধাবের আলোগুলি জ্বলে উঠেছে। ঘবে ঘরেও আলো জ্বলেছে। পালকের মত হাল্কা বড় বড় বরফের টুকরো পড়তে শুরু করেছে। রাস্তাঘাট সাদা হয়ে যাচ্ছে, ঘোড়ার পিঠ আর কোচোযানের টুপিও সাদা হয়ে গেছে, আর চারদিকটা যত বেশী কালো হচ্ছে, জিনিসপত্রগুলি তত বেশী সাদা দেখাচ্ছে। যে সব খদ্দেরকে কাশ্‌তাংকা আগে কখনও দেখে নি তারাই এদিক-ওদিক চলাফেরা করছে, তাব চোখের সামনে আড়াল সৃষ্টি করছে আব তাকে লাথি মারছে। (কাশ্‌তাংকা গোটা মানব সমাজকে দুটো অসমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছে : মনিব ও খদ্দের। দুই দলের মধ্যে একটাই মূল ফারাক আছেঃ প্রথম দলটির আছে তাকে পেটাবার অধিকার, আর অপর দলের পা কামড়ে দেবার অধিকারটা সে রেখেছে নিজের জন্য)। খদ্দেরদের সকলেরই কাজের তাড়া : তাব দিকে নজর দেবাব সময় তাদের নেই।

অন্ধকার ঘন হয়ে এলে কাশ্‌তাংকা হতাশায় ও আতংকে ভেঙে পড়ল। একটা দরজার সামনে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে তীক্ষ্ণ গলায় কাঁদতে শুরু করল। সাবাটা দিন লুকা আলেক্সান্দ্রিচের সঙ্গে ঘুবে ঘুরে সে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাব দুই কান ও থাবা জমে গেছে, আর, সব চাইতে বড় কথা, তাব ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে। সারা দিনে মাত্র দুই কামড় খাবার সে খেয়েছে। বই-বাঁধাইওযালাব বাড়িতে একটা ছোট মাছের চামড়া চেটেছে, আর শুড়িখানায় পেয়েছিল একটুকরো সসেজের চামড়া। বাস, ঐ পর্যন্ত। সে যদি মানুষ হত তাহলে হয় তো ভাবতঃ "না, এভাবে আর বাঁচা চলে না। এর চাইতে নিজেকে গুলি করাও ভাল!"

অধ্যায় দুই

রহস্যজনক আগন্তুক

সে কিন্তু কোন কিছুই ভাবছে না। সে কেবল হাঁসফাঁস করছে। তার মাথা ও পিঠ নরম, পালকের মত বরফে ডুবে গেল, গভীর ক্লান্তিতে সে তন্দ্রায ঢলে পড়ল, এমন সময় ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল, আব তাব পাঁজবায় আঘাত লাগল। সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। খোলা দবজা দিযে যে লোকটি বেরিযে এল সে খদ্দেরদের দলের একজন। যেহেতু কাশ্‌তাংকা কুঁই-কুঁই কবে পথেব মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল তাই সে তাব নজর এড়াতে পাবল না। সে নীচু হয়ে শুধাল : "তুমি কোথা থেকে এসেছ কুকুবেব ছানা? আমি কি তোমাকে লাথি মারলাম? আহা, বেচারি বাচ্চা কুকুবটা . না, না, তুমি রাগ করো না, রাগ করো না—আমি দুঃখিত।"

ববফে ভেজা চোখ তুলে কাশ্‌তাংকা আগন্তুকের দিকে তাকাল; দেখল, তার সম্মুখে দাঁড়িযে আছে একটি বেঁটে, শক্ত-সমর্থ, ছোট মানুষ; পরিষ্কার

কামানো মুখ, মাথায় টপ হ্যাট, গায়ে লোমের কোট—সামনের সবগুলো বোতাম খোলা।

আঙুল দিয়ে কুকুরটার পিঠ থেকে বরফের টুকরোগুলো সরিয়ে দিতে দিতে সে বলল, "তুমি এমন হাঁসফাঁস করছ কেন? তোমার মনিব কোথায়? তুমি হারিয়ে গেছ, তাই না? আহা, বেচারি কুকুরের বাচ্চাটা! এখন আমরা কি করি?"

আগন্তুকের গলার স্বরে সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়ে কাশ্‌তাংকা তার হাত চাটতে চাটতে আরও জোরে কুঁই-কুঁই করতে লাগল।

আগন্তুক বলল, "কী সুন্দর মজার বাচ্চাটা! একটা ছোটখাট শেয়াল যেন! তারপর? আমার সঙ্গে চলে এস। হয় তো তুমি অনেক কাজে লাগবে। তাহলে—হাইয়াপ্!"

দুই ঠোঁট দিয়ে সে এমন একটা ইঙ্গিত করল যার মাত্র একটাই অর্থ হতে পারে ঃ "চলে এস!"

আর কাশতাংকাও চলতে শুরু করল।

আধা ঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেল, একটা আলোকিত বড় ঘরের মেঝেতে সে বসে আছে; মাথাটা এক পাশে কাত করে অনুরাগে ও কৌতূহলে সে তাকিয়ে আছে আগন্তুকের দিকে। সে তখন টেবিলে বসে ডিনার খাচ্ছে, আর এঁটো-কাঁটাগুলো ছুঁড়ে দিচ্ছে তার দিকে। ...প্রথমে সে তাকে দিল খানিকটা রুটি ও পনিরের একটা সবুজ ছিল্‌কা, তারপর একটুকরো মাংস, অর্ধেকটা মটর এবং কিছু মুরগির হাড়; ক্ষিধের জ্বালায় কুকুরছানাটা এত তাড়াতাড়ি সে সব গিলে খেয়ে ফেলল যে তার স্বাদটা বুঝবার মত সময়ই পেল না। যত খেল ততই তার ক্ষিধের বোধটা বাড়তে লাগল।

কোন কিছু না চিবিয়ে যে রকম পাগলের মত কুকুরছানাটা সব কিছু খেয়ে ফেলল তা দেখে আগন্তুক বলল, "বাড়িতে তারা তোমাকে খুব কম খাবার দিত, তাই তো! কী হাড়-জিরজিরে শরীর তোমার! চামড়া আর হাড় ছাড়া কিচ্ছু নেই।"

অনেক কিছু খেয়েও কাশ্‌তাংকার ক্ষিধে মিটল না। তাকে খাবার নেশায় পেল। ডিনারের পরে সে ঘরের মেঝেতে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল; সর্ব অঙ্গে একটা মধুর আরামের অনুভূতিতে লেজটা নাড়তে লাগল। তার নতুন মনিব যখন হাতল-চেয়ারে হেলান দিয়ে চুরুট টানতে লাগল, সে তখন লেজ নাড়তে নাড়তে ভাবতে লাগল। কোথায় সে বেশী ভাল ছিল—এখানে এই আগন্তুকের বাড়িতে, না কি ছুতোরের বাড়িতে? আগন্তুকের সব আসবাবপত্রই নোংরা আর বাজে দেখতে। হাতল-চেয়ার, সোফা, বাতি ও কম্বল ছাড়া আর কিছুই নেই; ঘরটাকে বেশ ফাঁকা লাগে; অপর পক্ষে, ছুতোরের বাড়িটা জিনিসপত্রে ঠাসা; একটা টেবিল, একটা বেঞ্চি, একগাদা ছুতোর মিস্ত্রির যন্ত্রপাতি...আগন্তুকের বাসায় বিশেষ কোন গন্ধই নেই, অথচ ছুতোরের বাড়িটা যেন সব সময়ই ধোঁয়ায় ঢাকা থাকে, আঠা, বার্নিশ ও

করাতের গুঁড়োর গন্ধে ভরপুর থাকে। আবার আগন্তুকের বাসায় একটা খুব বড় সুবিধা আছে—এখানে প্রচুর খাবার পাওয়া যায়; তার স্বপক্ষে আরও বলার আছে—কাশ্‌তাংকা সারাক্ষণ টেবিলের পাশে বসে মনিবের দিকে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু সে একবারও তাকে লাথি মারে নি বা তাকে পায়ে মাড়ায় নি; একবারও চেঁচিয়ে বলে নি ঃ "পালা এখান থেকে ব্যাটা..."

চুরুট শেষ করে নতুন মনিব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; দু'এক মিনিট পরে একটা ছোট তোষক নিয়ে ফিরে এল।

ঘরের এক কোণে সোফার পাশে তোষকটা দিয়ে ডাকল, "আয়, আয়রে কুকুরছানা, এখানে চলে আয়। এখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়্।"

তার আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল। কাশ্‌তাংকা ছোট তোষকটার উপর পা ছড়িয়ে শুয়ে চোখ বুজল; রাস্তা থেকে কুকুরের ডাক ভেসে এল; উত্তরে সেও ডাকতে যাচ্ছিল এমন সময় হঠাৎ তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। তার মনে পড়ে গেল লুকা আলেক্সান্দ্রিচ, তার ছেলে ফেদিয়া আর বেঞ্চির তলাকার আরামের কোণটির কথা। তার মনে পড়ে গেল। কত দীর্ঘ শীতের সন্ধ্যায় ছুতোর যখন কাঠে র‍্যাঁদা ঘষত অথবা গলা ছেড়ে খবরের কাগজ পড়ত তখন ফেদিয়া তার সঙ্গে খেলা করত। সে এসে পিছনের ঠ্যাং ধরে তাকে বেঞ্চির তলা থেকে টেনে বের করত, আর তাকে নিয়ে এমন টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করে দিত যে তার চোখে সবুজ ফুল ফুটে উঠত, তার সারা অঙ্গ ব্যথায় টন্ টন্ করত। তাকে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে হাঁটাত, তাকে একটা ঘণ্টা মনে করে তার লেজ ধরে এমনভাবে টানতে থাকত যে সে ঘেউঘেউ, কেউকেউ করে উঠত। তার নাকে নস্যি গুঁজে দিত। আর একটা খেলা ছিল সব চাইতে কষ্টকর ঃ দড়ি দিয়ে একটুকরো মাংসকে বেঁধে সেটা কাশ্‌তাংকাকে খেতে দিত; যেই সে মাংসটা গিলে ফেলত অমনি তার পেটের ভিতর থেকে মাংসটাকে টেনে বের করত আর হোহো করে হাসত। এই সব স্মৃতি যত স্পষ্ট হতে লাগল, কাশ্‌তাংকার কাঁইকাঁই কান্না ততই জোরাল হতে লাগল।

অবশ্য ক্রমে ক্লান্তিতে ও আরামে মনের দুঃখটা কেটে গেল। সে ঘুমিয়ে পড়ল। তার চোখের উপর ভাসতে লাগল ঃ অনেকগুলি কুকুর ইতস্তত ছুটে বেড়াচ্ছে; সেদিনই রাস্তায় বড় বড় চোখ ও নাকের চারদিকে একগুচ্ছ লোমওয়ালা যে লোমশ কুকুরটাকে দেখেছিল সেটাও তার মধ্যে ছিল। একটা বাটালি হাতে নিয়ে ফেদিয়া কুকুরটাকে তাড়া করছে, তার পরই হঠাৎ ফেদিয়া নিজেই লোমেঢাকা হয়ে গেল, আর মনের সুখে ঘেউ-ঘেউ করে ডাকতে ডাকতে কাশ্‌তাংকার একেবারে পাশে এসে দাঁড়াল। কাশতাংকা আর সে আদর করে পরস্পরের নাক শুঁকতে শুঁকতে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

অধ্যায় তিন

একটি নতুন ও অতি মনোরম বন্ধুত্ব

কাশ্‌তাংকার যখন ঘুম ভাঙল তখন চারদিকে আলো ফুটেছে. বাস্তা থেকে ভেসে আসছে দিনের বেলাকার নানান শব্দ। ঘরের মধ্যে একটি প্রাণীও নেই। কাশ্‌তাংকা শরীরটাকে টান-টান করল, হাই তুলল, খিট্‌খিটে বিষণ্ণ মেজাজে ঘরটাকে একবার চক্কর দিল। ঘরের কোণগুলি ও আসবাবগুলি শুঁকল, হল-ঘরে উঁকি দিল, কিন্তু সেখানেও মনের মত কিছু দেখতে পেল না। হল-ঘরের দরজাটা ছাড়া পাশেই আরও একটা দবজা ছিল। কাশতাংকা এক মুহূর্ত ইতস্তত করে দুই থাবা দিয়ে সেটাকে আঁচড়ালো, তারপর ঠেলে দরজাটা খুলে পাশের ঘরটাতে ঢুকল। সেখানে ফ্ল্যানেলের কম্বলের তলায় একজন খদ্দের ঘুমিয়েছিল ; সে চিনতে পারল এই লোকটি গতকালের সেই আগন্তুক।

''গররর...'' বাচ্চাটা চাপা গর্জন করে উঠল, কিন্তু গতরাতের খাবার কথাটা মনে পড়তেই লেজ নাড়তে নাড়তে শুঁকতে শুরু কবল।

সে আগন্তুকের বুটজোড়া ও পোশাকাদি শুঁকেই বুঝল তাতে ঘোড়াব পায়ের কড়া গন্ধ লেগে আছে। আরও একটা বন্ধ দরজা চোখে পড়ায় কাশ্‌তাংকা সেটাকেও আঁচড়ালো, তার গায়ে ঠেসান দিল, দরজাটা খুলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত সন্দেহজনক গন্ধ টের পেল। একটা অবাঞ্ছিত সংঘর্ষের আঁচ পেয়ে কাশ্‌তাংকা গর-গর করে চারদিকে চোখ রেখে হাঁটতে হাঁটতে আর একটা ছোট ঘরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সভয়ে পিছিয়ে এল। একটা অপ্রত্যাশিত ও ভয়ংকর কিছু সে দেখতে পেয়েছে। গলা ও মাথা মাটির সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে দিয়ে দুই পাখা ছড়িয়ে হিস হিস্ করতে করতে একটা ধূসর রাজহাঁস সোজা তার দিকেই এগিয়ে আসছে। এক ধারে একটা ছোট তোষকের উপর শুয়ে ছিল একটা সাদা বিড়াল ; কাশ্‌তাংকাকে দেখেই বিড়ালটা লাফিয়ে উঠল, পিঠটা বাঁকালো, লেজটা তুলল, তাব সারা শরীরের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল, বিড়ালটাও হিস্‌হিসিয়ে উঠল। কুকুরটাও ভয় কিছু কম পায় নি, কিন্তু সেটা চাপা দিতেই সে ঘেউ-ঘেউ করে ডাকতে ডাকতে বিড়ালটাকে তাড়া করল...বিড়াল পিঠটা আরও উঁচু করে, থুথু ছিটিয়ে কাশ্‌তাংকার মাথায় থাবার একটা আঘাত করে বসল। কাশ্‌তাংকা পিছিয়ে গেল, চার থাবার উপর ভর দিয়ে ছুব্‌নি পাতল, আর থুৎনিটাকে বিড়ালের দিকে বাগিয়ে ধরে জোর গলায় ঘেউ-ঘেউ করে ডাকতে লাগল ; ইতিমধ্যে রাজহাঁসটা পিছন থেকে এসে তার পিঠের উপর সজোরে ঠোকরাতে লাগল। কাশ্‌তাংকা ঘুরে দাঁড়িয়ে রাজহাঁসটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

''এ সব কি হচ্ছে ?'' একটা ক্রুদ্ধ, জোরালো কণ্ঠ শোনা গেল। ড্রেসিং-গাউন পরে দাঁত দিয়ে একটা চুরুট চেপে ধরে আগন্তুক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকল। ''তোমরা ভেবেছটা কি ? যার যার জায়গায় ফিরে যাও !''

বিড়ালটার কাছে গিয়ে তার পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে সে বলল :

''ফিয়দর তিমোফিচ, এর মানে কি? তুমি কি লড়াই শুরু করেছ? বুড়ো পাজি! শুয়ে পড়!''

রাজহাঁসটাকে চেঁচিয়ে বলল, ''আইভান আইভানিচ, নিজের জায়গায় ফিরে যাও!''

তার কথামত বিড়ালটা তার তোষকের উপর শুয়ে চোখ বুজল। তার মুখ ও গোঁফের ভাব দেখেই বোঝা যায় সাত-তাড়াতাড়ি এই লড়াইতে যোগ দেবাব জন্য সে নিজেই দুঃখিত হয়েছে। কাশ্‌তাংকা নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করতে কুঁই-কুঁই করতে লাগল আব রাজহাঁসটা গলাটা বাড়িয়ে উত্তেজিত অথচ স্পষ্ট গলায় অতি দ্রুত কি যেন বলে গেল তার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা গেল না।

মনিব হাই তুলতে তুলতে বলল, ''ঠিক আছে। ঠিক আছে! একসঙ্গে বাস করাটা তোমাদের শিখতেই হবে।'' কাশ্‌তাংকার পিঠটা চাপড়ে দিয়ে সে বলল ''আর তুমি. আদা ভয় পেয়ো না—এরা সবাই খুব ভাল। তোমার কোন ক্ষতি করবে না। তোমাকে আমরা কি বলে ডাকব বল তো? তুমি তো নামহীন থাকতে পার না বুড়ো মেয়ে।''

আগন্তুক এক মুহূর্ত ভাবল।

''পেয়েছি! তুমি হলে আন্টি! বুঝেছ? আন্টি!''

বারকয়েক ''আন্টি'' কথাটা বলতে বলতে সে বেরিয়ে গেল। কাশ্‌তাংকা বসে পড়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। বিড়ালটা তোষকের উপর চুপচাপ বসে ঘুমের ভান করছে। রাজহাঁসটি গলা বাড়িয়ে উত্তেজিতভাবে অতি দ্রুত কি যেন বলেই চলেছে। দেখেই মনে হয়, সে খুব চালাক-চতুর; প্রতিটি জোর বক্তৃতার পরে সে অবাক হয়ে কয়েক পা পিছিয়ে যাচ্ছে, আর নিজের ভাষণ নিয়ে নিজেই খুশি হবার ভান করছে। ...তার সব কথা কান পেতে শুনে কাশ্‌তাংকা একটি মাত্র ''গররর'' শব্দে তার জবাব দিয়ে ঘরের কোণগুলি শুঁকতে শুরু করল। ঘরের এক কোণে একটা গামলায় ছিল ভেজানো মটর আর যইয়ের রুটির কয়েকটা টুকরো। মটরটা মুখে দিয়ে দেখল সেগুলি খুব স্বাদের নয়; তাই রুটির টুকরোই খেতে শুরু করল। একটা অপরিচিত কুকুর এসে তার খাবারটা খেল বলে রাজহাঁসটা মোটেই রাগ করল না। বরং সে আরও জোরে কথা বলতে লাগল এবং নিজে থেকেই গামলার কাছে এসে কয়েকটা মটর মুখে দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে সে রাগ করে নি।

অধ্যায় চার

আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য

কিছুক্ষণ পরে আগন্তুক আবার ঘরে ঢুকল; সঙ্গে নিয়ে এল একটা অদ্ভুত জিনিস—দেখতে একটা ফটকের মত। কাঠের ফটকটার এড়ো কাঠটা থেকে ঝুলছে একটা ঘণ্টা আর সেই কাঠটার সঙ্গে বাঁধা আছে একটা পিস্তল; ঘণ্টার ঘুণ্টিটা থেকে এবং পিস্তলের ঘোড়াটি থেকে দড়ি ঝোলানো

রয়েছে। আগন্তুক সেই ফটকটাকে ঘরের মাঝখানে রাখল, কিছু বাঁধন খুলতে এবং কিছু বাঁধন দিতে বেশ কিছু সময় কাটাল, তারপর রাজহাঁসের দিকে তাকিয়ে বলল, ''আইভান আইভানিচ, দয়া করে এগিয়ে এস তো!''

রাজহাঁসটা তার কাছে এগিয়ে গিয়ে একটা প্রত্যাশার ভঙ্গীতে দাঁড়াল।

আগন্তুক বলল, ''তাহলে স্যার, আমরা গোড়া থেকেই শুরু করি। প্রথমেই সকলকে অভিবাদন কর। বেশ ভাল করে!''

আইভান আইভানিচ গলাটা বাড়িয়ে চারদিক ঘুরে নাড়াতে লাগল আর চামড়াঢাকা পা দিয়ে তালি বাজাবার ভঙ্গী করল।

''ঠিক হয়েছে! লক্ষ্মী ছেলে! এবার মরার ভান কর তো!''

রাজহাঁস চিৎ হয়ে শুয়ে পা দুটো আকাশে তুলল। এই রকম কয়েকটা ছোটখাট খেলা দেখাবার পরে আগন্তুক হঠাৎ দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে মুখে একটা আতংকের ভাব ফুটিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল: ''বাঁচাও! বাঁচাও! বাড়িতে আগুন লেগেছে!''

আইভান আইভানিচ তৎপরতার সঙ্গে ছুটে গেল ফটকটার কাছে, ঠোঁট দিয়ে দড়িটা চেপে ধরে ঘণ্টাটা বাজাতে লাগল।

তা দেখে আগন্তুক খুব খুশি হল। রাজহাঁসের গলায় টোকা দিয়ে বলল: ''লক্ষ্মী ছেলে আইভান আইভানিচ! এখন কল্পনা কর তুমি একজন স্বর্ণকার, সোনা ও হীরে বিক্রি কর। কল্পনা কর সবেমাত্র দোকানে ঢুকেই তুমি একটা চোরকে দেখতে পেলে। তখন তুমি কি করবে?''

অপর দড়িটা ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে রাজহাঁস সেটাতে টান দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কান-ফাটা গুলির শব্দ শোনা গেল। ঘণ্টার শব্দটা কাশতাংকার ভাল লেগেছিল, এবার পিস্তলের শব্দ শুনে সে এতই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ল যে ঘেউ-ঘেউ করে ডাকতে ডাকতে ফটকটার চারদিকে ঘুরতে লাগল।

আগন্তুক চেঁচিয়ে বলল, ''বসে পড় আণ্টি, বসে পড়! চুপ!''

গুলি ছোঁড়ার পর্বের সঙ্গেই আইভান আইভানিচের কাজ শেষ হল না। আরও একটি ঘণ্টা ধরে আগন্তুক চাবুকের ফটাফট্ শব্দ করে তাকে বৃত্তাকারে ঘোরাতে লাগল, আর রাজহাঁসটি কখনও একটা বেড়া লাফ দিয়ে পার হল কখনও একটা চাকার ভিতর দিয়ে গলে গেল, আবার কখনও বা লেজের উপর বসে পা নাড়াল। কাশ্‌তাংকা তো আইভান আইভানিচের উপর থেকে চোখ ফেরাতেই পারল না। সে আনন্দে কুঁই-কুঁই করে উঠল, বারকয়েক তো ঘেউ-ঘেউ করে তার পিছন পিছন ছুটল। রাজহাঁস ও স্বয়ং—দু'জনই ক্লান্ত হয়ে পড়ার পরে আগন্তুক কপালের ঘাম মুছে ফেলে চীৎকার করে ডাকল, ''মারিয়া, খাভ্রোনিয়া আইভানভ্‌নাকে নিয়ে এস!''

এক মিনিট পরে একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শোনা গেল। কাশতাংকা গর-গর্ শব্দে গর্জে উঠল, চোখে-মুখে সাহসের ভাব আনল, আগন্তুকের আরও কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দরজাটা খুলে গেল, একটি বুড়ি ঘরের ভিতরটা দেখে

নিয়ে কি যেন বলল, তারপর একটা কালো কুৎসিত শূকরীকে ভিতরে ছেড়ে দিল। কাশ্‌তাংকার গজরানিকে আমল না দিয়ে শূকরী নাকটাকে উঁচু করে খুশি মনে ডেকে উঠল। স্পষ্টতই, মনিবকে, বিড়ালটাকে ও আইভান আইভানিচকে দেখে সে ভারী খুশি হয়েছে। সে বিড়ালটার কাছে গেল, নাক দিয়ে তার পেটে একটা খোঁচা মারল, তারপর রাজহাঁসের সঙ্গে একটু কথা বলল ; তার চাল-চলন, তার গলার স্বর ও লেজ নাড়া দেখেই বোঝা যায় সে বেশ খোশমেজাজেই আছে। কাশ্‌তাংকাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল, এ হেন ব্যক্তিকে দেখে গর্‌—গর্‌ করা বা ঘেউ ঘেউ করা বৃথা।

ফটকটা সরিয়ে নিয়ে মনিব ডাকল ঃ "ফিয়দর তিমোফিচ, এবার দয়া করে তুমি এস!"

বিড়ালটা উঠে দাঁড়াল, গা-ঝাড়া দিল আলস্যভরে এবং কাউকে যেন কৃপা করছে তেমনই মহা অনিচ্ছায় শূকরীর কাছে হেঁটে গেল।

মনিব ঘোষণা করল, "এবার 'মিশরের পিরামিড' শুরু করা যাক।"

বিস্তারিত ব্যাখ্যার পরে মনিব হুকুম জারী করল ঃ "এক, দুই, তিন!" "তিন" বলার সঙ্গে সঙ্গে আইভান আইভানিচ দুই পাখা মেলে শূকরীর পিঠে লাফিয়ে উঠল। তারপর সে যখন পাখা ও গলার ভর দিয়ে নিজের ভারসাম্য রেখে শূকরীর খাড়া খাড়া লোমওয়ালা পিঠের উপর শক্ত করে পা দুটি রাখল, তখন ফিয়দর তিমোফিচ ধীরেসুস্থে, একান্ত আলস্যভরে, পরিষ্কারভাবে ঘৃণা প্রকাশ করে এবং নিজের কর্মকুশলতাকে তিলমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে শূকরীর পিঠে লাফিয়ে উঠল, এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজহাঁসের পিঠে চড়ে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর তার সংযুক্ত ফল দাঁড়াল, যাকে আগন্তুক বলল, "একটা মিশরের পিরামিড"। কাশ্‌তাংকা খুশিতে কুঁই-কুঁই করে উঠল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বুড়ো বিড়ালটা হাই তুলল, নিজের ভারসাম্য হারিয়ে রাজহাঁসের পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে গেল। আইভান আইভানিচও পা পিছলে নীচে পড়ে গেল। আগন্তুক চীৎকার করে, দুই হাত নেড়ে আবার কি যেন বোঝাতে শুরু করল। পিরামিড নিয়ে একটা পুরো ঘন্টা কাটিয়ে অক্লান্ত মনিবটি আইভান আইভানিচকে বিড়ালের পিঠে চড়ে চলতে শেখাল, তারপর বিড়ালকে ধূমপান করা শেখাল, এবং এমনি আরও অনেক শিক্ষাই চলল।

শিক্ষাকর্ম শেষ করে আগন্তুক কপালের ঘাম মুছে বেরিয়ে গেল। ফিয়দর তিমোফিচ ঘৃণায় হাত-পা ছুঁড়ল, তারপর তোষকের উপর শুয়ে চোখ বুজল। আইভান আইভানিচ গামলাটার কাছে গেল, আর বুড়িটা এসে শূকরীকে নিয়ে গেল। এই রকম সব নতুন নতুন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে দিনটা যে কি ভাবে কেটে গেল কাশ্‌তাংকা সেটা টেরই পেল না ; সন্ধ্যা হলে ময়লা দেয়াল-কাগজে মোড়া গুমোট ঘরটাতেই ছোট তোষকটায় শুয়ে ফিয়দর তিমোফিচ ও রাজহাঁসের সঙ্গী হয়েই রাতটাও কাটিয়ে দিল।

অধ্যায় পাঁচ

প্রতিভা! কী প্রতিভা!

একটা মাস কেটে গেল।

প্রতি সন্ধ্যায় সুস্বাদু খাবার খেতে আর ``আন্টি`` ডাক শুনতে কাশতাংকা অভ্যস্ত হয়ে উঠল। আগন্তুকের সঙ্গে এবং নতুন সঙ্গীদের সঙ্গেও তার পরিচয় হয়ে গেল। জীবনটা বেশ খুশিতেই ভেসে চলেছে।

প্রতিটি দিন একইভাবে শুরু হয়। সাধারণত প্রথমে জাগে আইভান আইভানিচ। সঙ্গে সঙ্গে সে আন্টির কাছে অথবা বিড়ালের কাছে যায়, গলাটা বাড়িয়ে দেয়, আর উত্তেজিতভাবে ও জোরের সঙ্গে হবরব করে কী সব বলতে থাকে যা আগের মতই সমান দুর্বোধ্য। কখনও বা মাথাটাকে অনেক উঁচুতে তুলে দীর্ঘ একক ভাষণ চালাতে থাকে। পরিচয়ের পরে প্রথম কয়েকদিন কাশতাংকা ভেবেছিল, বেশ চালাক-চতুর বলেই সে এত কথা বলতে পারে, কিন্তু অচিরেই তার প্রতি সব ভক্তি-শ্রদ্ধা উবে গেল; যখনই সে লম্বা ভাষণ শোনাতে তার কাছে আসে কাশতাংকা এখন আর আগের মত লেজটা নাড়ে না, বরং তাকে মনে করে একটা অক্লান্ত বাচাল যে কাউকে ঘুমতে দেয় না, আর ইদানিং তার সব কথার জবাবে সেই একই একঘেয়ে জবাব দেয়—গর র্র্..।

অবশ্য ফিয়দর তিমোফিচ একটি ভিন্ন জাতের ভদ্র জীব। ঘুম ভাঙার সময় সে কখনও শব্দ করে না, নড়াচড়া করে না, এমন কি চোখও খোলে না। মনে হয়, না জাগলেই বুঝি সে খুশি হত, সে আর আগের মত জীবনটাকে ভালবাসে না। কিছুই তার ভাল লাগে না। সে আলস্যপরায়ণ ও উদাসীন, সব কিছুতেই তার ঘৃণা, এমন কি সুস্বাদু খাবার মুখে দিয়েও সে ঘৃণায় মুখ বাঁকিয়ে নেয়।

ঘুম থেকে উঠেই কাশতাংকা ঘরটার চারদিকে এক পাক ঘুরে সবগুলি কোণ শুঁকে বেড়ায়। কেবলমাত্র তাকে আর বিড়ালটাকেই সারা বাড়িটাতে চলাফেরা করতে দেওয়া হয়। রাজহাঁসের তো ময়লা দেয়াল-কাগজে মোড়া ঘরটার চৌ-কাঠ পার হবার অধিকারই ছিল না। আর খাভ্রেনিয়া আইভানভ্‌না বাইরের উঠোনে একটা চালা-ঘরেই থাকে আর একমাত্র শিক্ষা-পর্বের সময়ই এসে হাজির হয়। মনিব অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়, হাল্কা প্রাতরাশ খেয়েই খেলা দেখাবার কাজ শুরু করে দেয়। প্রতিটি দিনই সেই ফটক, চাবুক ও চাকাগুলিকে ঘরের মধ্যে আনা হয় আর প্রতিদিন সেই একই কর্মসূচীর ভিতর দিয়ে সব্বাইকে চলতে হয়। শিক্ষণ-কর্মটি চলে তিন থেকে চার ঘন্টা; যখন শেষ হয় তখন ফিয়দর তিমোফিচ অনেক দিনই প্রচণ্ড ক্লান্তিতে মাতালের মত টলতে থাকে, আইভান আইভানিচ ঠোঁট দুটো ফাঁক করে শ্বাস টানতে থাকে, আর মনিবের মুখটা লাল হয়ে যায়, তার কপাল বেয়ে দর্ দর্ করে ঘাম ঝরে আর সে বার বার হাত দিয়ে সেটা মুছে ফেলে।

শেখানোর ব্যাপারটা আর ডিনারটাই দিনের বেলাটাকে আকর্ষণীয় করে

রাখে, কিন্তু সারা সন্ধ্যাটা বড়ই একঘেয়ে লাগে। অধিকাংশ সন্ধ্যায় মনিব যেন কোথায় যায়, রাজহাঁস ও বিড়ালকেও সঙ্গে নেয়। একা একা আন্টি তার তোষকে শুয়ে মন মরা হয়ে থাকে। কোথা থেকে বিষণ্নতা গুটি গুটি পায়ে চুপি চুপি এসে হাজির হয়, একটু একটু করে তাকে একেবারে পেয়ে বসে, ঠিক যেরকমভাবে অন্ধকার এসে ঘরটাকে ঘিরে ধরে। তার ফলে ডাকাডাকি করা, খাওয়া, ঘরময় ছুটে বেড়ানো, এমনকি কোন দিকে তাকাবার ইচ্ছাটাই চলে গেল; তারপর তার কল্পনায় দেখা দিতে লাগল অস্পষ্ট সব মূর্তি, সেটা কুকুরের বা মানুষেরও হতে পারে, তাদেব মুখগুলি আপনজনের মত, ভালবাসার যোগ্য, কিন্তু বড়ই অদ্ভুত। তারা যখন দেখা দেয় আন্টি তখন লেজ নাড়তে থাকে, তার মনে হয় সে যেন আগে কোথাও তাদের দেখেছে, একদিন তাদের ভালবাসত...আর ঘুমিয়ে পড়লে তার নাকে এসে লাগত সেই সব মূর্তির শরীর থেকে বেরিয়ে-আসা আঠা, কাঠের গুঁড়ো আর বার্ণিশের গন্ধ।

একদিন—সে তখন নতুন জীবনে বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, হাড়-জিরজিরে আধ-পেটা খাওয়া কুকুরছানার বদলে হয়ে উঠেছে একটি চিকণ-চাকণ, ঘসা-মাজা পোষা কুকুর,—খেলা শেখাবার আগে মনিব তার পিঠ চাপড়ে বলল ঃ "এবার তো কাজে নামার সময় হয়েছে আন্টি। পায়ে পায়ে তাল তো অনেক দিন ঠুকলে, এবার আমি তোমাকে খেলোয়াড় বানাতে চাই। তুমি কি শিল্পী হতে চাও?"

মনিব তাকে নানারকম খেলা শেখাতে শুরু করে দিল। প্রথম পাঠেই সে পিছনের পায়ে দাঁড়াতে ও হাঁটিতে শিখে ফেলল; তাতে খুব মজাও পেল। দ্বিতীয় পাঠে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠে তাকে ছিনিয়ে আনতে হল মনিবের হাতে উঁচুতে ঝোলানো একটা মিছরির টুকরো। পরবর্তী পাঠগুলিতে সে নাচতে শিখল, রিং-মাষ্টারের দড়ির শেষ পর্যন্ত দৌড়ে যাওয়া শিখল, বাজনার তালে তালে গজরাতে শিখল, ঘন্টা বাজাল, পিস্তল ছুঁড়ল, এবং এক মাস পরে "মিশরের পিরামিড"-এ ফিয়দর তিমোফিচের আসনটা দখল করে নিল। সে খুব ইচ্ছাসহকারে অনুশীলন করত, আর সাফল্যে উৎফুল্ল হত; জিভটা বের করে লম্বা দড়িটার শেষ পর্যন্ত দৌড়ে যেতে, একটা চাকার ভিতর দিয়ে লাফিয়ে যেতে এবং বুড়ো ফিয়দর তিমোফিচের পিঠে চড়ে দৌড়তেই তার সব চাইতে বেশী ভাল লাগল। প্রতিটা সফল খেলার পরেই সে বার বার জয়সূচক ঘেউ-ঘেউ শব্দে ডেকে উঠত, আর তার শিক্ষকও বিস্মিত হত, আনন্দিত হত, দুই হাত ঘষতে শুরু করত।

সে বলে উঠত, "প্রতিভা! কী প্রতিভা! এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই! "তুমি সফল হবেই—সেটা একেবারে নিশ্চিত!"

আর আন্টিও "প্রতিভা" কথাটা শুনতে এতই অভ্যস্ত হয়ে উঠল যে মনিব যখনই কথাটা উচ্চারণ করে তখনই সে লাফিয়ে উঠে চারদিকে তাকায়, যেন এটাই তার নাম।

অধ্যায় ছয়

একটি দুর্যোগের রাত

আন্টি একটা কুকুরের স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্ন দেখছিল একটা দরোয়ান তাকে ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করেছে, আর অমনি ভয়ে তার ঘুম ভেঙে গেল।

ছোট ঘরটা চুপচাপ, অন্ধকার, বড়ই গুমোট। মাছিগুলো কামড়াচ্ছে। আন্টি কোনদিন অন্ধকারকে ভয় করে নি, কিন্তু যে কারণেই হোক এখন সে ভয় পেয়েছে, তার ঘেউ-ঘেউ করতে ইচ্ছে করছে। পাশের ঘরে মনিব বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে, একটু পরে শূকরীটা তার চালা-ঘরে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল, আবার সব চুপ হয়ে গেল। খাবার কথা ভাবলে মনের অবস্থাটা সহজতর হয়ে ওঠে ; আন্টিও ভাবতে লাগল সেদিন সে কেমন করে একটা মুরগির ঠ্যাং ফিয়দর তিমোফিচের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল, আর লুকিয়ে রেখেছিল বসবার ঘরে কাবার্ড ও দেয়ালের মাঝখানে যেখানে প্রচুর মাকড়সার জাল ও ধূলো জমে আছে। একবার গিয়ে দেখে এলেও মন্দ হয় না এখনও সেটা সেখানেই আছে কি না। এটা তো খুবই সম্ভব যে মনিব সেটা দেখতে পেয়ে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু সকাল হবার আগে তো তাকে এ ঘর ছেড়ে যেতে দেওয়া হবে না—এটাই নিয়ম। ঘুম আসার জন্য আন্টি চোখ বুজল, কারণ অভিজ্ঞতা থেকেই সে জেনেছে যে যত তাড়াতাড়ি সে ঘুমিয়ে পড়বে তত তাড়াতাড়িই সকাল হবে। কিন্তু হঠাৎ কাছাকাছি থেকেই একটা অদ্ভুত চীৎকার ভেসে আসায় সে চমকে উঠে চার পায়ে লাফ দিল। চীৎকারটা করেছিল আইভান আইভানিচ, আর এ চীৎকার তার স্বাভাবিক বকবকানি ও জোরালো কথাবার্তার অংশ নয়, এ চীৎকার উদ্দাম, মর্মভেদী ও অস্বাভাবিক, একটা বড় ফটক খোলার কেঁচোর-কেঁচোর শব্দের মত। অন্ধকারে কিছুই বুঝতে না পেরে আন্টি আরও বেশী ভয় পেল এবং গর্জে উঠল ঃ গর্-র্-র্...

আরও সময় কাটল, একটা প্রমাণ-মাপের হাড় চিবুতে যতটা সময় লাগে প্রায় ততটা সময় ; কিন্তু চীৎকারটা আর শোনা গেল না। আন্টি একটু একটু করে শান্ত হয়ে তন্দ্রায় ঢলে পড়ল। দুটো কালো কুকুরকে স্বপ্নে দেখল ; তাদের উরুতে ও পাছায় গত বছরের গুচ্ছগুচ্ছ লোম ; একটা বড় গামলা থেকে তারা গপ্‌ গপ্‌ করে কি যেন খাচ্ছে, গামলাটা থেকে সাদা ধোঁয়া ও স্বাদু গন্ধ বের হচ্ছে ; মাঝে মাঝেই আন্টির দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে যেন বলছে ঃ

"তোমাকে কিচ্ছু দেব না!" ভেড়ার চামড়া গায়ে একটা লোক ছুটে এসে চাবুক মেরে তাদের তাড়িয়ে দিল ; আন্টি তখন গামলার কাছে গিয়ে খেতে শুরু করল, কিন্তু লোকটি ফটকের কাছে যেতেই কালো কুকুর দুটো আবার এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর ঠিক তখনই সেই মর্মভেদী চীৎকার আবার তার কানে এল।

"খেঃ! খেঃ —হে!" আইভান চেঁচাচ্ছে।

আন্টির ঘুম ভেঙে গেল। একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে তোষকের উপর থেকেই একটানা ডাকতে শুরু করল। এতক্ষণে তার মনে হল চীৎকারটা আইভান আইভানিচের নয়, বাইরে থেকে অন্য কেউ চেঁচাচ্ছে। যে কারণেই হোক, শূকরীটাও তার চালার নীচে বসেই আবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করতে লাগল।

তারপর শোনা গেল চটির খস্ খস্ আওয়াজ; মনিব ঘরে ঢুকল ড্রেসিং-গাউন গায়ে দিয়ে আর হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে। কাঁপা আলোটা ময়লা দেয়াল-কাগজ ও সিলিংয়ের উপর নাচতে নাচতে অন্ধকারকে তাড়িয়ে দিল। আন্টি দেখল, অপরিচিত কেউ ঘরে ঢোকে নি। আইভান আইভানিচ মেঝেতে বসে আছে, ঘুমোয় নি। তার পাখ্না দুটো ছড়ানো আর ঠোঁটটা হাঁ করে আছে, দেখে মনে হচ্ছে সে খুব ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত। বুড়ো ফিয়দর তিমোফিচও ঘুমোয় নি। হয়তো সেই চীৎকার শুনেই তার ঘুম ভেঙে গেছে।

মনিব রাজহাঁসকে শুধাল, "ব্যাপার কি আইভান আইভানিচ? তুমি চেঁচাচ্ছ কেন? তুমি কি অসুস্থ?"

রাজহাঁস সাড়া দিল না। মনিব তার গলায় হাত দিয়ে দেখল, পিঠটা চাপড়ে দিল।

মনিব বলল, "তুমি এক আজব চিজ। নিজে তো ঘুমবেই না, অপরকেও ঘুমতে দেবে না।"

তারপর সে আলোটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। আবার অন্ধকার ফিরে এল। আন্টি ভয় পেল। রাজহাঁস আর একবারও চেঁচাল না, কিন্তু আন্টি যেন আবার দেখতে পেল, অপরিচিত কেউ অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। সবচাইতে ভয়ংকর কথা হল, এই অপরিচিত ব্যক্তিটিকে কামড়ানোও যাবে না, কারণ সে অদৃশ্য, তার কোন আকার নেই। আর অকারণেই তার নিশ্চিত মনে হল, আজ রাতে খুব খারাপ একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ফিয়দর তিমোফিচও বিচলিত বোধ করছে। আন্টি শুনতে পেল, সে তোষকের উপরেই নড়াচড়া করছে, হাই তুলছে আর মাথাটা নাড়ছে।

রাস্তায় একটা ফটকে কে যেন ঠক্ঠক্ শব্দ করছে। চালা-ঘরে শূকরীটা আবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল। আন্টি কুঁই-কুঁই করে সামনের পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে তার উপর মাথাটা রাখল। ফটকে খট্খট্ শব্দ, নিদ্রাহীন শূকরীর ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ, চারদিকের নিস্তব্ধ অন্ধকার—সব কিছু থেকেই আন্টি এমন একটা কিছুর আঁচ পেল যা আইভান আইভানিচের চীৎকারের মতই দুঃখ ও ভয়ের কারণ। সব কিছুতেই যেন গোলমাল ও আতংকের ছোঁয়া। কিন্তু কেন? এই অপরিচিতকে দেখাই বা যাচ্ছে না কেন? মুহূর্তের জন্য আন্টির পাশে দুটো সবুজ স্ফুলিঙ্গ ঝিলিক দিল। সেটা ফিয়েদর তিমোফিচ, দু'জনের পরিচয় হবার পরে কয়েক মাসের মধ্যে এই তার কাছে এসেছে। সে কি চায়? আন্টি তার থাবাটা চেটে দিল; সে কেন এসেছে জিজ্ঞাসা না করেই নানান সুরে কুঁই-কুঁই করতে লাগল।

''খেঃ।'' আইভান আইভানিচ আর একবার আর্তনাদ করে উঠল। ''খেঃ—হে!''

আবার দরজাটা খুলে গেল, মোমবাতি নিয়ে ঘরে ঢুকল মনিব। রাজহাঁসটা আগেকার ভঙ্গীতেই বসে আছে—ঠোঁট ফাঁক করে, ডানা মেলে দিয়ে। তার চোখ দুটো বোজা।

''আইভান আইভানিচ।'' মনিব ডাকল।

রাজহাঁসটা নড়ল না। মনিব তার সামনে বসে এক মিনিট নীরবে তাকে দেখল, তারপর বলল ঃ

''আইভান আইভানিচ! এ সব কি হচ্ছে? তুমি কি মরতে বসেছ, নাকি?''

তারপর হঠাৎ দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে মনিব বলে উঠল ঃ ''ওঃ, এবার মনে পড়েছে! আমি তো জানতাম কি হয়েছে। আজ একটা ঘোড়া তোমাকে মাড়িয়ে দিয়েছে! ওঃ হা ঈশ্বর!''

মনিবের কথাগুলি আন্টি বুঝতে পারল না, কিন্তু তার মুখ দেখেই বুঝতে পারল একটা ভয়ংকর কিছু ঘটবে বলে সে আশংকা করছে। তার মনে হল, অপরিচিত কেউ অন্ধকার জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে; তাই সেইদিকে নাকটা বাড়িয়ে সে ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠল।

''ও মরতে বসেছে আন্টি!'' বলেই মনিব দুই হাত চেপে ধরল। ''হ্যাঁ, ও মরছে! মৃত্যু আমাদেব দরজা পার হয়ে ঘরে ঢুকেছে! এখন আমরা কি করি?''

দুশ্চিন্তায় মুখ কালো করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথাটা দোলাতে দোলাতে মনিব শোবার ঘরে ফিরে গেল। অন্ধকারে একা থাকার ভয়ে আন্টিও তার পিছন-পিছন গেল। বিছানায় বসে মনিব বার বার বলতে লাগল ঃ ''হা ঈশ্বর, আমি এখন কি করব?''

আন্টি মনিবের অগোচরে তার পায়ের কাছে চলে গেল, সে নিজেই বা কেন এত উদ্বেগ বোধ করছে আর অন্য সকলেই বা এত বিচলিত হয়ে পড়েছে কেন, কিছুই বুঝতে না পেরে সে মনিবের সব গতিবিধির উপর নজর রেখে তাকে বুঝতে চেষ্টা করছে। ফিয়দর তিমোফিচ কদাচিৎ তার তোষক ছেড়ে ওঠে; সেও মনিবের শোবার ঘরে ঢুকে তার পা দুটো মালিশ করতে লাগল। মাঝে মাঝেই মনিবও মাথাটা নাড়ছে, যেন খারাপ চিন্তাটাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে, আর সন্দেহজনক দৃষ্টিতে বিছানার তলাটা দেখছে।

মনিব একটা ডিস হাতে নিল, তাতে জল ভরে রাজহাঁসের কাছে গেল।

ডিসটা তার মুখের সামনে ধরে মনিব আদর করে বলল, ''জলটা খেয়ে নাও আইভান আইভানিচ! একচুমুক খাও বুড়ো ছেলে।''

কিন্তু আইভান আইভানিচ নড়ল না, চোখও খুলল না। মনিব তার মাথাটা ধরে ডিসের উপর নামিয়ে ঠোঁটটাকে জলে ডুবিয়ে দিল, কিন্তু

রাজহাঁস তবু জল খেল না, কেবল পাখা দুটো আরো ছড়িয়ে দিল, তার মাথাটা কিন্তু ডিসের উপরেই পড়ে থাকল।

মনিব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ''কিছুতেই কিছু হবে না। সব শেষ। আইভান আইভানিচ খতম হয়ে গেল।''

তার দুই গাল বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল, বৃষ্টির সময় জানালার নীচে যেমনভাবে জল ঝরে পড়ে। ব্যাপারটা কি বুঝতে না পেরে আন্টি ও ফিয়দর তিমোফিচ মনিবের আরও কাছে গিয়ে সভয়ে রাজহাঁসের দিকে তাকাল।

সখেদে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মনিব বলল, ''বেচারী আইভান আইভানিচ। এদিকে আমি ভাবছিলাম, এবার বসন্তকালে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গিয়ে বাস করব, সকলে মিলে সবুজ ঘাসেব উপর হেঁটে বেড়াব। আদরের জীবটি আমার, পুরানো বন্ধু আমার, তুমি আর ইহজগতে নেই! তুমি ছাড়া কি করে আমাদের চলবে?''

আন্টির মনে হল, তার কপালেও এই ঘটবে, কোন অজ্ঞাত কারণে সেও একদিন চোখ বুজবে, থাবাগুলো ছড়িয়ে দেবে, দাঁত বের করবে, আর সকলেই আতংকে তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। ফিয়দর তিমোফিচও নিশ্চয় এই একই চিন্তা করছিল। বুড়ো বিড়ালটা আর কোন দিন এখানকার মত গম্ভীর ও বিষণ্ণ হয় নি।

ভোর হয়ে আসছে। যে অদৃশ্য অপরিচিত ব্যক্তিটি আন্টিকে এত ভয় দেখিয়েছে সে আর এখন ঘরে নেই। আরও বেশী আলো ফুটলে দরোয়ান ঘরে ঢুকল, রাজহাঁসটাকে দুই ঠ্যাং ধরে তুলে নিয়ে চলে গেল। আরও একটু পরে বুড়ি এসে গামলাটা নিয়ে চলে গেল।

আন্টি বসবার ঘরে গেল। কাবার্ডের পিছনে উঁকি মারল। মনিব মুরগির ঠ্যাংটা খায় নি। ধূলো ও মাকড়সার জালের মধ্যে যেমন ছিল তেমনই পড়ে আছে। কিন্তু আন্টির মনটা ভেঙে গেল, তার দুঃখ হল, তার কাঁদতে ইচ্ছা করল। হাড়খানাকে একবার শুঁকল না পর্যন্ত। তার বদলে সোফার নীচে গিয়ে বসল, আর সূক্ষ্ম উঁচু পর্দায় একমনে কুঁই-কুঁই শুরু করল।

অধ্যায় সাত

ব্যর্থ আবির্ভাব

এক সুন্দর সন্ধ্যায় ময়লা দেয়াল-কাগজে মোড়া ঘরে ঢুকে দুই হাত কচলে মনিব বলল ঃ ''এবার তাহলে!''

সে যেন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তা না বলে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পাঠ নেবার সময় থেকেই আন্টি মনিবের মুখ ও গলার স্বর ভাল করে চিনে ফেলেছে, তা সে অনুমান করল মনিব উত্তেজিত, চিন্তিত এবং হয় তো বিরক্তও হয়ে আছে। একটু পরেই সে ফিরে এসে বলল ঃ ''আন্টি, আজ আমি তোমাকে ও ফিয়দর তিমোফিচকে সঙ্গে নিয়ে

বের হব। "মিশরের পিরামিড" খেলাটাতে আজ তুমি, আন্টি তুমিই খেলবে মৃত আইভান আইভানিচের জায়গায়। কিন্তু কী অবস্থা আজ। কিছু তৈরী হয় নি, ঠিকমত অনুশীলনও করা হয় নি। মহরা যা দেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। আজ আমরাই আমাদের ডোবাব ; পুরোপুরি ঝাড় খাব।"

তারপরই সে বেরিয়ে গেল ; এক মিনিট পরেই ফিরে এল নিজের লোমের কোট ও টপহ্যাটটা নিয়ে। সামনের দুই পা ধরে বিড়ালটা তুলে নিয়ে নিজের কোটের তলায় ঢুকিয়ে দিল। ফিয়োদর তিমোফিচকে মনে হল একান্তই উদাসীন, কবার চোখ মেলে তাকিয়েও দেখল না। আজ সে সব ব্যাপারেই উদাসীন, শুয়েই থাকুক আর দুই সামনের পা ধরে তাকে তুলেই নেওয়া হোক, তোষকে আরাম করুক আর মনিবের কোটের তলায় বুকের কাছে পড়ে থাক—সবই তার কাছে সমান।

মনিব বলল, "চলে এস আন্টি।"

পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়েও লেজটা নাড়তে নাড়তে আন্টি মনিবের পিছু নিল। এক মিনিট পরেই দেখা গেল, একটা স্লেজ-গাড়িতে মনিবের পায়ের নীচে বসে সে এক মনে শুনছে—শীতে ও দুশ্চিন্তায় কাঁপতে কাঁপতে মনিব নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলছে ঃ

"আজ আমরাই আমাদের ডোবাব! পুরোপুরি ঝাড় খাব!"

স্লেজ থামল একটা মস্ত বড় অদ্ভুত বাড়ির সামনে। বাড়িটা দেখতে অনেকটা ওল্টানো গামলার মত। তিনটে দরজা বসানো লম্বা প্রবেশ-পথে এক ডজন উজ্জ্বল রাস্তার আলো জ্বলছে। দরজাগুলো সশব্দে খুলে গেল আর তার প্রকাণ্ড চোয়ালের মধ্যে চারদিকে জটলারত লোকগুলিকে যেন হা করে গিলে ফেলল। চারদিকে অনেক মানুষের ভিড়, অনেক ঘোড়া দুল্‌কি চালে ফটক পর্যন্ত আসা যাওয়া করছে। কিন্তু কোথাও একটা কুকুরের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

মনিব আন্টিকেও তুলে নিয়ে ওভারকোটের সামনের দিকে ফিয়োদর তিমোফিচের পাশে ঢুকিয়ে নিল। জায়গাটা অন্ধকার, গুমোট, কিন্তু বেশ গরম। এক মুহূর্তের জন্য অন্ধকারের মধ্যে দুটি আবছা সবুজ আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল—প্রতিবেশীটির ঠাণ্ডা, কড়া থাবার ছোঁয়ায় বিরক্ত হয়ে বিড়ালটা চোখ মেলে তাকিয়েছিল। আন্টি বিড়ালের কানটা চাটল, আরও একটু আরাম করে বসার চেষ্টায় নড়াচড়া করতেই তার ঠাণ্ডা থাবার নীচে বেচারি একেবারে চেপ্টে গেল ; হঠাৎই তার মাথাটা কোটের ভিতর থেকে একটু বেরিয়ে পড়ায় সে বিরক্তিতে একটু গজরে উঠেই আবার সেই গুমোট অন্ধকারের মধ্যে ডুব দিল। সেই মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল সে যেন দেখেছে আলো-আঁধারিতে ঘেরা একটা মস্ত বড় ঘর রাক্ষস-খোক্ষসে বোঝাই ; ঘরের দুই দিককার দেয়াল ও শিকের ফাঁক দিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ভয়ংকর সব মুখ ; সেই সব মুখে আছে ঘোড়ার দাঁত, শিং, লম্বা লম্বা কান, এমন কি একটা প্রকাণ্ড ফোলা মুখে আছে নাকের বদলে একটা লেজ, আর

মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে দুটো লম্বা, চিবিয়ে-খাওয়া হাড়।

আন্টির থাবার নীচে বিড়ালটা কর্কশ গলায় মিয়াও—মিয়াও ডেকে উঠল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কোটটা সপাটে খুলে গেল, আর মনিব বলে উঠল, "হুপ্‌লা!" সঙ্গে সঙ্গে ফিয়োদর তিমোফিচ আন্টি লাফ দিয়ে মেঝেতে নেমে পড়ল। এখন তারা আছে একটা ছোট ঘরে; তাতে ধূসর রংয়ের কাঠের দেয়াল, আয়না বসানো একটা টেবিল, একটা টুল আর বিভিন্ন কোণে ঝোলানো কিছু পোশাকপত্র ছাড়া আর কোন আসবাব ঘরে নেই; কোন বাতি বা মোমবাতির বদলে ঘরের মধ্যে জ্বলছে দেয়ালে আটকানো নল থেকে বিচ্ছুরিত একটা উজ্জ্বল, চোখঝল্‌সানো আলো। ফিয়োদর তিমোফিচ নিজের কোটটাকে চেটে পরিষ্কার করে হামাগুড়ি দিয়ে টুলের নীচে ঢুকে শুয়ে পড়ল। মনিবেব দুশ্চিন্তা তখনও কাটে নি; দুই হাত কচলাতে কচলাতে সে পোশাক ছাড়ল; আর ছাড়ল একেবারে রাতে শোবার মত করে, পরনে একমাত্র তলবাসটি ছাড়া আর কিছুই রইল না। কিন্তু তার পরেই টুলের উপর বসে আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে নিয়ে অদ্ভুত সব কাজ করতে শুরু করল। প্রথমে সে মাথায় পরল মাঝখানে সিঁথি-কাটা একটা পরচুলা, তাতে মাথার দুই দিকে দুটো উদ্ধত চুলের গুচ্ছ ঠিক শিংয়ের মত করে বসানো; তারপর একটা কোন সাদা বস্তু সারা মুখে মেখে নিল এবং তার উপরে আঁকল ভুরু...গোঁফ ও রক্তিম গাল। কিন্তু তার কারসাজির সেখানেই শেষ নয়। মুখ ও গলা আগাগোড়া রং দিয়ে ঢেকে এমন একটা বিচিত্র অদ্ভুত পোশাক পরল যে রকমটা আন্টি আগে কখনও দেখে নি; না ঘরে, না পথে। কল্পনা করা য[illegible], একটা মস্ত বড় ঢিলে-ঢালা ব্যাগি ট্রাউজার বানানো হয়েছে এমন শস্তা দামের বড় বড় ফুল আঁকা সুতীর ছাপা কাপড় দিয়ে যা সচরাচর মফস্বলের বাড়িঘরে পর্দা, চেয়ারের ঢাকনা হিসাবেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে; সেই ট্রাউজার উঠে এসেছে একেবারে বগল পর্যন্ত; আর তার একটা পা বাদামী রংয়ের, অন্য পা হাল্কা হলুদ রংয়ের। এহেন পোশাকের মধ্যে ঢুকে মনিব তার উপর চাপাল একটা সুতীর জ্যাকেট, তার কলারটার আকৃতি মস্ত বড় একটা তারাব মত, তার পিঠের উপর একটা সোনালী তারা, পায়ে পরল বিবিধ রংয়ের মোজা, আর সবুজ জুতো।

আন্টির মাথা ও হৃৎপিণ্ড ঘুরতে শুরু করল। এই মোটাসোটা সাদা-মুখ মূর্তিটার গায়ের গন্ধ তার মনিবের মতই, গলার স্বরটাও পরিচিত, কিন্তু মাঝে মাঝেই সন্দেহ তাকে উত্যক্ত করতে লাগল, তার ইচ্ছা হত এই কুৎসিত, ভূতুড়ে মূর্তিটার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। নতুন জায়গা, চোখ-ঝল্‌সানো আলো, গন্ধ, মনিবের অদ্ভুত রূপ-পরিবর্তন—সব কিছু মিলিয়ে একটা অস্পষ্ট ভয় ও বিপদের আশংকা তার মধ্যে জেগে উঠল, তার মনে হল, নাকের বদলে লেজ বসানো মস্ত বড় চ্যাপ্টা মুখের মত একটা ভয়ংকর মুখের মুখোশমুখী তাকে নির্ঘাৎ হতে হবে। আর এত সব কিছুর পরেও আছে দেয়ালের পাশ থেকে ভেসে আসা একটা জঘন্য বাজনার শব্দ, এবং

যখন-তখন একটা অদ্ভুত গর্জন। তার একমাত্র সান্ত্বনা ফিয়দর তিমোফিচের গম্ভীর অটল প্রশান্তি। টুলের নীচে যে মহাশান্তিতে ঢুলছে; টুলটা যখন সরানো হয় তখনও সে চোখের পাতা খোলে না।

সাদা ওয়েস্টকোট পরা একটি লেজওয়ালা লোক এসে দরজা দিয়ে উঁকি মেরে বলল, "মিস্ আরাবেলার খেলা এইমাত্র শুরু হয়েছে। এর পরেই আপনার খেলা।"

মনিব কোন জবাব দিল না! টেবিলের নীচ থেকে একটা ছোট সুটকেস টেনে বের করে তার উপব বসে অপেক্ষা করতে লাগল। তার ঠোঁট ও হাত দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে বেশ অস্বস্তি বোধ করছে; তাব অস্থির নিঃশ্বাস যেন আন্টিও অনুভব করছে।

বাইরে থেকে একজন চীৎকাব করে বলে উঠল, "মঁসিয়ে জর্জেস, এবার আপনি আসুন!"

মনিব উঠে দাঁড়াল, তিনবার ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল, তারপর বিড়ালটাকে টুলের নীচ থেকে বের করে তাকে সুটকেসে ভরল।

"চলে এস আন্টি," সে শান্ত গলায় ডাকল।

একান্ত অসহায় ভঙ্গীতে আন্টি এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরল; মনিব তার মাথায় চুমো খেয়ে তাকেও সুটকেসের মধ্যে ফিয়দর তিমোফিচের পাশে রাখল। তারপব অন্ধকার...অন্ধকার...আন্টি বিড়ালটাকে মারিয়ে দিল, সুটকেসের গাযে আঁচড় কাটল, ভয়ে একটা শব্দও করতে পারল না; সুটকেসটা সাগরের বুকে জাহাজের মত দুলছে, আর কাঁপছে...

"এই যে আমি এসেছি!" মনিব উচ্চকণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, "এই যে আমি এসেছি!"

তারপরেই আন্টি বুঝতে পারল একটা শক্ত কিছুতে ধাক্কা খেয়ে সুটকেসের দোলানিটা থেমে গেছে। গর্জনের শব্দটা তখনও চলছে, বেশ জোরেই চলছে; কাউকে সজোরে আঘাত করা হচ্ছে, আর সে—সম্ভবত নাকের বদলে লেজওয়ালা মুখটি—জোরে গর্জন করছে আর হাসছে যে সুটকেসের তালাটাও থর্ থর্ করে কাঁপছে। সেই গর্জনের জবাবে মনিব এমন একটা মর্মভেদী উঁচু পর্দায় খ্যাঁক-খ্যাঁক শব্দ করে উঠল যা সে বাড়িতে কখনও করে না।

সেই গর্জনকে ছাপিয়ে তার গলা যাতে শোনা যায় সেই ভাবেই মনিব চেঁচিয়ে বলতে লাগল ঃ "হা-হা-হা! মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রহোদয়গণ! আমি স্টেশন থেকে সোজা এখানে এসে হাজির হয়েছি। আমার ঠাকুরমা শবাধারে শয়ন করেছেন আর আমার জন্য রেখে গেছেন বিপুল সম্পত্তি। এই সুটকেসটাতে বেশ ভারী কিছু আছে। নিশ্চয় সোনাই হবে, হা-হা। ধরুন, এর মূল্য যদি দশ লাখ হয়! আসুন না খুলেই দেখা যাক..."

সুটকেসের তালা খোলার ক্লিক করে শব্দ হল। একটা উজ্জ্বল আলো আন্টির চোখ ধাঁধিয়ে দিল; সে একলাফে সুটকেস থেকে বেরিয়ে এল, আর

প্রচণ্ড গোলমালে কানে তালা লাগায় মনিবকে ঘিরে প্রবল বেগে ছুটতে লাগল আর জোর গলায় ডাকতে লাগল।

''আহা!'' মনিব চেঁচিয়ে বলল, ''খুড়ো ফিয়োদর তিমোফিচ! আদরের আন্টি! আমার অতিপ্রিয় আত্মীয়জন, তোমাদের কি ভূতে পেয়েছে!''

বালুকাময় মেঝেতে বসে পড়ে বিড়াল ও আন্টিকে জড়িয়ে ধরে সে বুকে চেপে ধরল। মনিব যখন তাকে আদর করতে ব্যস্ত সেই ফাঁকে আন্টি সেই জগৎটার দিকে একবার তাকাল যার মধ্যে নিয়তি তাকে ঠেলে দিয়েছে; সেই জগৎটার জাঁকজমক দেখে অভিভূত হয়ে আন্টি বিস্ময়ে অবাক হয়ে এক সেকেণ্ডের জন্য বুঝি বা বরফের মত জমাট বেঁধে গেল, আর তার পরেই মনিবের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে জোর করে মুক্ত করে নিয়ে লাটিমের মত চারদিকে পাক খেতে লাগল। নতুন জগৎটা যেমন বড়, তেমনই উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত; যেদিকে চোখ যায়, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত, সর্বত্রই কেবল মুখ, মুখ, আর মুখ—মুখ ছাড়া আর কিচ্ছু নেই।

''আন্টি, তুমি দয়া করে বসে পড়!'' মনিব চেঁচিয়ে বলল।

এই কথাটার কি অর্থ সেটা মনে পড়ে যাওয়ায় আন্টি এক লাফে একটা চেয়ারে উঠে বসে পড়ল। মনিবের দিকে একবার তাকাল। তার চোখের ভাব যথারীতি গম্ভীর ও নরম, কিন্তু তার মুখমণ্ডল, বিশেষ করে খাবার মুখ ও দাঁতগুলি, যেন বিকৃত হয়ে উঠেছে। সে হো-হো করে হাসছে, দুই কাঁধ ঝাঁকাচ্ছে, আর এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন এ সব হাজার হাজার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে তার বড়ই আনন্দ হচ্ছে। তার এ লোক-দেখানো আড়ম্বরকে আন্টি বিশ্বাসও করল, কিন্তু হঠাৎ স্বীয় সত্তার প্রতিটি স্নায়ু দিয়ে সে অনুভব করল এই হাজার হাজার মুখ তার দিকেই তাকিয়ে আছে; আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের শেয়ালের মত ছোট থুত্‌নিটাকে তুলে ধরে আনন্দে তারস্বরে চীৎকার করে উঠল।

মনিব তাকে বলল, ''এবার তুমি এখানে বসে পড় আন্টি। খুড়ো ও আমি এক সঙ্গে 'কামারিন্‌স্কায়া' নেচে আসি।''

এক সময়ে তো একটা বাজে কাজের জন্য তার ডাক পড়বেই, এ কথা জেনেই ফিয়দর তিমোফিচ সম্পূর্ণ নির্বিকার দৃষ্টিতেই তাকিয়েছিল। সে নাচল খুব অলস ভঙ্গিতে, থেমে থেমে; তার ভাবভঙ্গী, তার গুণ ও শোক দেখে মনে হচ্ছিল এই জনতা, এই উজ্জ্বল আলো, মনিব আর নিজের প্রতিও তার প্রচণ্ড ঘৃণা...নিজের নাচ শেষ করে সে হাই তুলে বসে পড়ল।

মনিব বলল, ''তাহলে আন্টি, এবার তুমি আর আমি প্রথমে একটা গান করব, তারপর আমরা নাচব। তুমি কি বল?''

পকেট থেকে একটা ছোট বাঁশী বের করে মনিব সেটা বাজাতে শুরু করল। আন্টি কোন দিনই বাজনা ভালবাসে না; চেয়ারে নড়েচড়ে বসে সে জোরে জোরে ডাকতে শুরু করল। চারদিক থেকে সকলেই সমস্বরে তার

তারিফ করতে লাগল, হাততালিতে ঘর ভরে গেল। মনিব মাথা নুইয়ে অভিবাদন করল; চারদিক শান্ত হলে আবার বাজাতে শুরু করল। যখন সে বেশ উঁচু পর্দায় একটা সুর বাজাচ্ছিল তখন গ্যালারী থেকে কে যেন বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল।

''বাবা!'' একটা শিশু-কণ্ঠের চীৎকার। ''ঐ তো কাশ্‌তাংকা!''

''সত্যি, কাশ্‌তাংকাই তো!'' একটা ফ্যাঁসফেঁসে মদে-জড়ানো গলা কথাটা বলল। ''কাশ্‌তাংকা! ঠিক। দেখ্‌ ফেদিয়া কাশ্‌তাংকা না হয়েই যায় না! হাই!''

গ্যালারি থেকে কে যেন শিস্‌ দিয়ে উঠল; এদিকে দুটো কণ্ঠস্বর—একটি কোন শিশুর, পরটি একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের—জোরে চেঁচিয়ে ডেকে উঠল ঃ

''কাশ্‌তাংকা! কাশ্‌তাংকা!''

আন্টি চমকে উঠে ডাক লক্ষ্য করে তাকাল। দুটো মুখ—একটা লোমশ, মাতাল ও বিকৃত, অপরটা মোটাসোটা, লাল গাল ও ভীত—আন্টির চোখের সামনে ভেসে উঠল, ঠিক এই উজ্জ্বল আলোগুলির মতই। তার সব কথা মনে পড়ল, চেয়ার থেকে পড়ে গেল, বালির উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে এগিয়ে গেল, তারপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আনন্দে ডাকতে ডাকতে দুটি মুখের দিকে ছুটে গেল। চারদিক থেকে কান-ফাটানো গর্জন উঠল, তার সঙ্গে মিশল শিসের পর শিস্‌, আর একটি শিশু-কণ্ঠের মর্মভেদী ডাক ঃ ''কাশ্‌তাংকা! কাশ্‌তাংকা!''

আন্টি এক লাফে বেড়াটা টপকাল, একজনের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফ দিয়ে একটা আসনে বসে পড়ল; উপরের তলায় উঠতে হলে একটা উঁচু দেয়াল লাফিয়ে পার হতে হবে; সে লাফও দিল, কিন্তু যথেষ্ট উঁচুতে উঠতে না পেরে দেয়াল ঘেঁসে নেমে গেল। তারপর সে হাত থেকে হাতে, এর-ওর-তার হাত ও মুখ চেটে চেটে, ক্রমেই উঁচু থেকে উঁচুতে উঠে যেতে লাগল, এবং শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেল গ্যালারিতে....

আধ ঘন্টা পরে—কাশতাংকা রাস্তায় হেঁটে চলেছে দুটি লোকের সঙ্গে—দু'জনেরই গায়ে আঠা ও বার্নিশের গন্ধ। লুকা আলেক্সান্দ্রিচ টলতে টলতে হাঁটছে, কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতার জোরে রাস্তার খানা-খন্দগুলিকে এড়িয়েই চলেছে।

''মায়ের পেটে থাকতেই পাপের গভীর গহ্বরে আমি পড়ে আছি'', সে বিড় বিড় করে বলছে। ''আর তুমি কাশ্‌তাংকা, তুমি তো একটা ভুলের ফসল। একজন সূত্রধরের তুলনায় একটা ছুতোর যা, একজন মানুষের সঙ্গে তুলনায় তুমি তো তার বেশী কিছু নও।''

বাবার টুপিটা মাথায় দিয়ে ফেদিয়া তার বাবার সঙ্গে তাল রেখেই এগিয়ে চলেছে। তাদের পিছন-পিছন লাফাতে লাফাতে কাশতাংকা তাদের পিঠ

দুটোই কেবল দেখতে পাচ্ছে ; তার মনে হচ্ছে, দীর্ঘকাল ধরেই সে এমন আনন্দের সঙ্গে তাদের পিছনে হাঁটছে, তার জীবনে এক মিনিটের জন্যও কোন বিঘ্ন দেখা দেয় নি।

ময়লা দেয়াল-কাগজে মোড়া ছোট ঘরটা, রাজহাঁস, ফিয়োদর তিমোফিচ, স্বাদু ডিনার, খেলা শেখা, সার্কাস—সে সব কিছুই তার মনে পড়ল, কিন্তু এখন তো সে সব একটা দীর্ঘ, হতবুদ্ধিকর, যন্ত্রণাদায়ক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৮৮৭



আলোকের ঝর্ণাধারায়

The Lights

দরজার বাইরে একটা কুকুর ভয় পেয়ে ডাকতে শুরু করল। কুকুরটা কাকে দেখে ডাকছে সেটা দেখতে বাস্তুকার আনানিয়েভ, তার সহকারী ছাত্র ভন স্টেনবার্গ ও আমি ব্যারাক-বাড়িটার বাইরে বের হলাম। আমি ছিলাম সেখানে অতিথি, আমার বাইরে না গেলেও চলত, কিন্তু স্বীকার করছি মদ খাবার ফলে আমার মাথাটা একটু ঘুরছিল এবং তাজা বাতাসে শ্বাস টানতে বেশ ভালই লাগল।

আনানিয়েভ বলল, ''এখানে তো কেউ নেই। বাজে চেঁচিও না আজর্কা! বোকা কোথাকার!''

একটি প্রাণীও চোখে পড়ল না। পাহারাদার কালো কুকুর বোকা আজর্কা হয়তো অকারণে ডাকার জন্য ক্ষমা চাইতেই ভীরু পায়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে লেজ নাড়তে লাগল। বাস্তুকার নীচু হয়ে তার কানের মাঝখানটায় আদর করে চাপড়ে দিল।

দয়ালু মানুষরা ছোট ছেলেমেয়ে বা কুকুরদের সঙ্গে যে সুরে কথা বলে তেমন ভাবেই সে বলল, ''আরে ব্যাটা, অকারণে এ ভাবে ডাকছিস্ কেন? খারাপ স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছিস না কি?'' তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, ''এই যে ডাক্তার, এর দিকে একটু নজর দাও—একটা বিস্ময়কর স্নায়বিক রোগী! কল্পনা কর, সে নির্জনতা সহ্য করতে পারে না, সব সময় খারাপ স্বপ্ন দেখে, ঘুমের মধ্যে বুক-চাপা রোগে ভোগে, আর তাকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে কথা বললে মৃগীরোগের মত কিছুতে আক্রান্ত হয়।''

ছাত্রটিও তাতে সায় দিল, ''হ্যাঁ, একটা উঁচুপর্দায় বাঁধা কুকুর।''

আজর্কা নিশ্চয় বুঝতে পারল যে তাকে নিয়েই কথা হচ্ছে ; কান খাড়া করে সে করুণ স্বরে কুঁই-কুঁই করতে লাগল, যেন বলতে চাইল, ''হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আমার অসহ্য কষ্ট হয়, কিন্তু দয়া করে সেজন্য আমাকে ক্ষমা করুন!''

ছাত্রটিও তাতে সায় দিল, "হ্যাঁ, একটা উঁচুপর্দায় বাঁধা কুকুর।"

আর্জর্কা নিশ্চয় বুঝতে পারল যে তাকে নিয়েই কথা হচ্ছে, কান খাড়া করে সে করুণ স্বরে কুঁই কুঁই করতে লাগল, যেন বলতে চাইল, 'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আমার অসহ্য কষ্ট হয়, কিন্তু দয়া করে সেজন্য আমাকে ক্ষমা করুন।"

আগস্ট মাসের একটি তারায় ভরা অন্ধকার রাত। জীবনে আগে কখনও এরকম অসাধারণ পরিবেশে থাকি নি, তাই আমার কাছে সে তারায় ভরা রাতটাকে মনে হয়েছিল অনেক দূরে, অনেক অনাগ্রহী, অনেক বেশী অন্ধকার। তখন ছিলাম একটা নির্মীয়মান রেলপথের ধারে। উঁচু আধা তৈরী বাঁধ, বালি, কাঁদা ও পাথরকুঁচির স্তূপ, ব্যারাক বাড়ি, খানাখন্দ, এখানে সেখানে ফেলে রাখা ঠেলাগাড়ি মজুরদের থাকার ছোট ছোট ঘর—অন্ধকারের এক রংএ আঁকা এই সব বিচিত্র বস্তুসমূহ পৃথিবীটাকে এমন একটা অদ্ভুত, বিশৃঙ্খল রূপ দিয়েছে যা দূর অতীতের অন্ধকার যুগকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আমার সম্মুখে প্রসারিত সব কিছুর মধ্যেই এমন একটা শৃংখলাহীনতার আভাষ যা দেখলে অবাক হতে হয়, মানুষজনের ছায়াময় রেখাচিত্র, সরু সরু টেলিগ্রাফের থাম, যে দৃশ্যটাকে মনে হয়েছিল একটা অন্য জগৎ থেকে আসা, এই মানুষ ও থামগুলোই তাকে নষ্ট করে দিল। চারদিক নিস্তব্ধ শুধু শুনতে পাচ্ছি টেলিগ্রাফের তারের গুন গুন শব্দ—অনেক উঁচু কোন জায়গা থেকে ভেসে আসছে তার একঘেয়ে সুর।

আমরা বাঁধের উপরে উঠে গেলাম, সেখান থেকে নীচে পৃথিবীর দিকে তাকালাম। অনেক দূর থেকে একটা আবছা আলো ঝিকমিক করছে, চারদিকের গর্ত, খানাখন্দ, ও স্তূপগুলি রাতের অন্ধকারে সম্পূর্ণ একাকার হয়ে গেছে। তার পরে আর একটা আলো জ্বলছে, তারপর আরও একটা, এবং তারও পরে প্রায় একশ' পা দূরে দুটো লাল চোখ পাশাপাশি জ্বলছে—সম্ভবত কোন ব্যারাক ঘরের জানালা থেকে—আর সেইরকম আলোর একটা দীর্ঘ সারি একটা সরলরেখা ধরে দিগন্ত পর্যন্ত চলে গেছে, তারপর বাঁ দিকে বেঁকে অর্ধবৃত্তাকারে সুদূরে মিলিয়ে গেছে। আলোগুলি স্থির। সেই আলো, রাত্রির নিস্তব্ধতা এবং টেলিগ্রাফের তারের করুণ গান—সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা মিল অনুভব করতে পারছি। মনে হল, কোন গুরুতর গোপন কথা বুঝি ঢাকা পড়ে আছে এই বাঁধের তলায়, আর একমাত্র এই আলো, এই রাত্রি, আর এই তারাগুলিই তার খবর জানে

আনানিয়েভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ঈশ্বর, একী আনন্দ! এত ব্যাপ্তি আর সৌন্দর্য, বুঝিবা বড়ই বেশী! আর কী একখানা বাঁধ! যেন বাঁধ নয়, একটা পুরো মণ্ট ব্লাংক! নির্মাণে ব্যয় হয়েছে লাখ-লাখ টাকা!"

আলোর মালা আর লাখ লাখ টাকার বাঁধ দেখে শিহরিত হয়ে এবং মদে আর আবেগে মাতাল হয়ে বাস্তুকার ছাত্র ভন স্তেনবার্গের কাঁধ চাপড়ে খুশির সুরে বলে উঠল : "এত কি ভাবছ মিখাইলো মিখাইলিচ? নিজের হাতের

সৃষ্টিকে দেখে নিশ্চয় তোমার খুব ভাল লাগছে? গত বছর ঠিক এই জায়গাটাই ছিল শুধু এক বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, মানুষের গন্ধমাত্র ছিল না, আর আজ চেয়ে দেখ। জীবন! সভ্যতা! সাব সব কিছু কত সুন্দর! তুমি আর আমি একটা রেলপথ বসাচ্ছি, এবং আমাদের পরে, একশ' বা দু'শ' বছরের মধ্যেই কত ভাল ভাল মানুষ এসে এখানে কারখানা বানাবে, স্কুল, হাসপাতাল—যন্ত্রপাতির শব্দ উঠবে! অ্যা?''

পকেটে হাত ঢুকিয়ে, আলোর উপর থেকে চোখ না সরিয়ে ছাত্রটি নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। বাস্তুকারের কথাগুলি সে শুনছে না, কি যেন ভাবছে, কথা বলার বা শোনার দিকে তার মন নেই। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সে আমার দিকে ঘুরে শান্ত গলায় বলল : ''আপনি কি জানেন ওই অন্তহীন আলোর মালা কিসের মত দেখতে? তাদের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি এমন কিছুর ছবি যা দীর্ঘকাল আগে মরে গেছে, যা হাজার হাজার বছর আগে বেঁচে ছিল, যা দেখতে আমালেকাইট বা ফিলিস্তিনদের শিবিরের মত। যেন 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট'-এর কালের মানুষরা এইখানে শিবির ফেলে ভোরের অপেক্ষায় আছে সল বা ডেভিড-এর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। এই অলীক ছবিটাকে সম্পূর্ণ করতে হলে আমাদের একমাত্র দরকার শুধু ভেরীর আওয়াজ আর শান্ত্রীদের মুখে ইথিওপিয়ার কোন ভাষায় পরস্পরকে আহ্বান।''

''হতেও তো পারে...'' বাস্তুকার মাথা নাড়ল।

আর তখনই সহসা কি ভেবেই বুঝি বাতাস ধেয়ে এল, সঙ্গে নিয়ে এল অস্ত্রের ঝন্‌ঝনার মত আওয়াজ। এই মুহূর্তে বাস্তুকার ও ছাত্রটি কি ভাবছে আমি জানি না, কিন্তু আমি যেন কল্পনায় আমার সম্মুখে এমন কিছু দেখতে পেলাম যা দীর্ঘকাল আগেই মরে গেছে; এমন কি আমি যেন শুনতে পেলাম শান্ত্রীরা এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছে। আমার কল্পনায় অতি দ্রুত গড়ে উঠল শিবির, দেখা দিল বিচিত্র মানুষজনকে, তাদের পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র...

ছাত্রটি চিন্তার ঘোরেই বলতে লাগল, ''হ্যাঁ। কোন এক সময়ে ফিলিস্তিনরা আর আমালেকাইটরা এই পৃথিবীতে বাস করত; তারা যুদ্ধ করেছে, যার যার ভূমিকা পালন করেছে, আর এখন তাদের চিহ্নমাত্রও চোখে পড়ে নেই। আমাদেরও এই দশাই হবে। এখন আমরা রেলপথ বসাচ্ছি, এখানে দাঁড়িয়ে দার্শনিকসুলভ চিন্তাভাবনা করছি, কিন্তু হাজার দুই হাজার বছর কেটে যাবে, আর এই বাঁধ, এই সব মানুষ যারা কঠোর পরিশ্রমের পরে এখন ঘুমিয়ে আছে, এমন কি এই ধূলিকণা পর্যন্ত কিছু পড়ে থাকবে না। ভাবলে মনে হয়, কী ভয়ংকর কথা!''

গম্ভীর গলায় আদেশের সুরে বাস্তুকার বলল, ''এসব চিন্তা ছাড়।''

''কেন?''

''কারণ...কারণ এ সব চিন্তা দিয়ে তুমি জীবন শেষ করবে, শুরু নয়। এ সব ভাববার বয়স তোমার

"কিন্তু কেন?" ছাত্রটি আবার বলল।

"ক্ষণস্থায়িত্ব ও অর্থহীনতার এই সব ধারণা, জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা, মৃত্যুর অনিবার্যতা, কবরে যাবার পরের অন্ধকারের ধারণা, আমি বলছি বন্ধু, এই সব বড় বড় চিন্তা বৃদ্ধ বয়সের পক্ষে ভাল আর স্বাভাবিক, কারণ সে সবই দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার ফল, অভিজ্ঞতা থেকে যার জন্ম আর যা তখন মনের সত্যিকারের সম্পদ হয়ে ওঠে। কিন্তু যে তরুণ মস্তিষ্কজীবী সবেমাত্র স্বাধীন জীবন শুরু করেছে তার পক্ষে তো এসব এক মহা আপদবিশেষ। মহা আপদ!" শেষের কথাটা দু'বার বলে সে হাতটা দোলাল। "আমার মতে, তোমার বয়সে এই রকমের সব চিন্তাভাবনার চাইতে কাঁধের উপর একটা মাথা না থাকাও বরং ভাল। কথাটা আমি গুরুত্ব দিয়েই বলছি, ব্যারন। অনেক দিন থেকেই ভাবছি এ সব বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব, কারণ আমাদের প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকেই লক্ষ্য করে আসছি এই সব অদ্ভুত ধারণার প্রতি তোমার একটা ঝোঁক আছে!"

"হা ভগবান! অদ্ভুত বলছেন কেন?" ছাত্রটি হেসে প্রশ্ন করল। তার গলার স্বর ও মুখের ভাব থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে নিছক সৌজন্যবশতই সে জবাব দিচ্ছে, বাস্তুকার যে পথে যুক্তিটাকে চালাচ্ছেন তার প্রতি তার তিলমাত্র আগ্রহ নেই।

কিছুতেই আমি চোখ দুটি খোলা রাখতে পারছি না। আমি তখন স্বপ্ন দেখছি কতক্ষণে এই ভ্রমণ সাঙ্গ করে আমরা পরস্পরকে শুভরাত্রি জানিয়ে শুতে যাব, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ আমার সে স্বপ্ন সত্য হল না। ব্যারাক-বাড়িতে ফিরে গিয়ে বাস্তুকার খালি বোতলগুলি বিছানার নীচে সরিয়ে দিল, বেতের ঝুড়ির ভিতর থেকে দুটো ভর্তি বোতল বের করল, আর সেগুলির কর্ক খুলে টেবিলে এসে বসল; তার মনের স্পষ্ট বাসনা—মদ খাবে, গল্প করবে, আর কাজ করতে থাকবে। গ্লাসে ছোট ছোট চুমুক দিতে দিতে সে তার ড্রয়িং-এর উপর পেন্সিল দিয়ে কী যেন লিখতে লাগল আর ছাত্রটিকে বোঝাতে লাগল যে তার চিন্তার ধারাটা যথাযথ পথে চলছে না। ছাত্রটি তার পাশে বসে হিসাব পরীক্ষা করে চলল, মুখে কিছুই বলল না। আমার মতই কথা বলার বা শোনার ইচ্ছা তার ছিল না। তাদের কাজে কোন ব্যাঘাত না ঘটিয়ে এবং যেকোন মুহূর্তে আমাকে শোবার জন্য ডাকা হবে এই আশা করে আমি ডেস্ক থেকে বেশ কিছুটা দূরে বাস্তুকারের পায়া-ভাঙা ক্যাম্প-খাটটায় বসে বিরক্ত হয়ে উঠলাম। তখন মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে।

কোন কাজ না থাকায় আমার নবপরিচিত দু'জনকেই ভাল করে দেখতে লাগলাম। আমি আগে কখনও আনানিয়েভ বা ছাত্রটিকে দেখি নি। যে রাতটার কথা বলছি সেই রাতেই তাদের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছে। সন্ধ্যার বেশ কিছুটা পরে ঘোড়ার পিঠে চেপে একটা মেলা থেকে ফিরে যাচ্ছিলাম জনৈক জমিদারের বাড়ি যার সঙ্গে তখন আমি বাস করছিলাম। অন্ধকারে পথ ভুল করে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। রেলপথের কাছে

কাছে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমেই রাতের অন্ধকার বেড়ে যাচ্ছে দেখে মনে পড়ে গেল সেই সব গুণ্ডা বদমাশদের কথা যারা পদযাত্রী ও ঘোড়সওয়ারদের প্রতীক্ষায় লুকিয়ে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে খুব ভয় পেয়ে গেলাম এবং প্রথম যে ব্যারাক-বাড়িটা চোখে পড়ল তার দরজাতেই আঘাত করলাম। আনানিয়েভ ও ছাত্রটি আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করল। অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে যেমনটি ঘটে, অচিরেই আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম, প্রথমে চায়ের কাপে, পরে মদের গ্লাসে, আর অচিরেই মনে হল আমরা যেন অনেক বছর ধরে পরস্পরের পরিচিত। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরেই আমি জেনে ফেললাম তাদের পরিচয়, কেমন করে ভাগ্য তাদের রাজধানী থেকে টেনে এনেছে এই তৃণভূমিতে, আর তারাও জানল আমি কে, কি করি, আর কি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করি।

বাস্তুকার আনানিয়েভ, নিকোলাই আনাস্তাসিয়েভিচ, স্থূলকায়, বৃষস্কন্ধ, আর এর মধ্যেই ওথেলোর মত "সময়ের প্রান্তরে ঢলে পড়েছে", শরীরে মাংস লেগেছে। সে এখন জীবনের সেই স্তরে পৌঁচেছে যাকে ঘটকরা বলে থাকে, "জীবনের মধ্যাহ্ন", অর্থাৎ যুবকও নয় বৃদ্ধও নয়, ঠিক ভাল খাদ্য, ভাল পানীয় ও ভাল কথার মত, হাঁটতে গেলে একটু হাঁপ ধরে, ঘুমলে বেশ জোরে নাক ডাকে, আর চারপাশের লোকজনের সঙ্গে আচরণে সেই শান্ত, অবিচল সৎ স্বভাবের পরিচয় রাখতে পারে যেটা ভদ্রজনরা উচ্চপদে উঠলে এবং ভারিক্কী হলে অর্জন করে থাকে। তার চুল ও দাড়িতে এখনও পাক ধরে নি, কিন্তু এর মধ্যেই নিজের অজ্ঞাতে জুনিয়রদের "যুবক" বলে সম্বোধন করতে শুরু করে দিয়েছে এবং তাদের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে সরস মন্তব্য করার অধিকারটুকু অর্জন করে ফেলেছে বলে মনে করে। তার চলাফেরা ও কণ্ঠস্বর শান্ত, সাবলীল, নিশ্চিত ; ঠিক সেই মানুষটির মত যে ভালভাবেই জানে যে সঠিক পথে সে এর মধ্যেই অনেক দূর এগিয়ে গেছে, ভাল চাকরি পেয়েছে, নির্ভরযোগ্য রুটির যোগাড় করতে পেরেছে, আর সব ব্যাপারেই একটা স্থির মতামত গড়ে তুলেছে।...তার মুখের মাংসল নাক ও তাম্রাভ বর্ণ আর পেশীবহুল গর্দান যেন বলে. "আমি ভাল খাই, ভাল আছি, আর নিজেকে নিয়ে খুশি, এবং একদিন আসবে যখন তোমরা যুবকরাও ভাল খাবে, ভাল থাকবে এবং নিজেদের নিয়ে খুশি হবে।" তার পরনে ছাপা সুতীর শার্ট, তাতে রাশিয়ান কলার লাগানো, সুতীর ঢোলা ট্রাউজার ভারী বুটের ভিতর ঢোকানো। কিছু ছোটখাট জিনিস, যেমন হাতে-বোনা রঙিন বেল্ট, এমব্রয়ডারি করা কলার আর কনুইয়ের তালি দেখেই অনুমান করতে পারি যে সে বিবাহিত এবং খুবই সম্ভব স্ত্রী তাকে বেশ ভালবাসে।

ব্যারন ভন স্টেনবার্গ, মিখাইল মিখাইলোভিচ, "রেলওয়ে ইন্সটিটিউট"-এর ছাত্র, বয়স তেইশ কি চব্বিশ বছর। হাল্কা সোনালী চুল ও কর্কশ দাড়ি এবং মুখের একটা বিশেষ কর্কশ ও শুকনো ভাবই স্মরণ করিয়ে

দেয় যে বাল্টিক অঞ্চলের ব্যারন-বংশে তার জন্ম। বাকি সব কিছু—তার নাম, ধর্মবিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ ও মুখের ভাবভঙ্গী—সবই পুরোপুরি রুশসুলভ। আনানিয়েভের মতই ট্রাউজারের উপর সুতীর শার্ট ও বড় মাপের বুট, গোল কাঁধ, অনেক দিন মাথার চুল কাটে নি, রোদে পোড়া মুখ—সব মিলিয়ে তাকে দেখায় একজন সাধারণ রুশ শিক্ষানবীশের মত, একটি ছাত্র বা ব্যারণের মত নয়। সে কথা বলে কম, চলাফেরা করে অল্প, মদ খায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও, আর সারাক্ষণ হিসাবপত্র নিয়ে কাটায়। সারাক্ষণ কি যেন ভাবে। তার কণ্ঠস্বর ও চাল-চলনও শান্ত ও সাবলীল, কিন্তু সে শান্ত ভাবটা বাস্তুকারের শান্ত ভাব থেকে আলাদা। তার তামাটে, হাস্যকর, বিষণ্ণ মুখ, ঈষৎ নীচু ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং তার সারা চেহারাতেই ফুটে ওঠে একটা আধ্যাত্মিক শান্তি ও মানসিক অলসতা। তাকে দেখলেই মনে হয় কোন কিছুতেই তার কিছু যায়-আসে না ঃ তার সামনে একটা জ্বলন্ত আগুন থাক আর নাই থাক, মদটা সুস্বাদু হোক আর বিশ্রী হোক, হাতের হিসাবটা ভুল হোক আর শুদ্ধ হোক, তার কাছে সবই সমান। তার বুদ্ধিদীপ্ত শান্ত মুখে আমি যেন পড়তে পারি, ''আপাতত একটা ভাল চাকরি, একটুকরো ভাল রুটি অথবা একটা চলতি মতবাদের মধ্যে আমি তো ভাল কিছুই দেখতে পাই না। এ সবই অর্থহীন। আমি আগে ছিলাম সেণ্ট পিতার্সবার্গে, এখন এখানে বসে আছি একটা ব্যারাক-বাড়িতে, হেমন্তকালে এখান থেকে ফিরে যাব সেণ্ট পিতার্সবার্গে, তারপর শরৎকালে আবার এখানে আসব এ সবের যে কি অর্থ তা আমি বুঝি না, কেউ বোঝে না...কাজেই বলার মত কোন কথাই তো নেই...''

কোন আগ্রহ ছাড়াই সে বাস্তুকারের কথাগুলি শোনে, অনুকম্পা ও উদাসীনতার সঙ্গে যে ভাবে উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কোন ভালমানুষ সেকেলে বোকা বৃদ্ধের মুখে তার অতীত জীবনের নানা অভিযানের স্মৃতিকথা শুনে থাকে। মনে হয় যেন বাস্তুকার যা বলছে সেটা তার কাছে নতুন কিছু নয়, আর সে যদি কথা বলতে আলস্য বোধ না করত তাহলে সে নিজেই এর চাইতে নতুনতর কোন বুদ্ধির কথা বলতে পারত। এদিকে আনানিয়েভ তার কথা বলেই চলেছে। এখন তার কথা বলার ভঙ্গী এমন পাল্টে গেছে যে তার কথার অর্থ বুঝতে আমার বেশ সময় লাগছে।

সে বলছে, ''সে সব চিন্তাকে আমি অন্তর থেকে ঘৃণা করি। যখন যুবক ছিলাম তখনই তাদের কথা শুনলে আমার রাগ হত, আর আজও তারা আমাকে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না। এটা তো খুব সোজা কথা। জীবনের উদ্দেশ্যহীনতার চিন্তা, দৃশ্যমান জগতের তুচ্ছতা ও ক্ষণস্থায়ীত্বের চিন্তা, সলোমনের মত অহংকার—এসবই হচ্ছে মানুষের চিন্তার পরম ও চরম পরাকাষ্ঠা; সে দিনও ছিল, আর আজও আছে। চিন্তাশীল মানুষ সেখানে পৌঁছেই যন্ত্রের সুইচটা টিপে দেয়। আর যাবার মত কোন জায়গা নেই। স্বাভাবিক মানুষের মস্তিষ্কের কাজ এখানেই শেষ, আর এটাই স্বাভাবিক ও

সমীচিন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য হল, তারা যেখানে থেমে যায় আমরা সেখান থেকেই চিন্তা শুরু করি। সাধারণ মানুষ যেখানে শেষ করে, আমরা সেখান থেকেই শুরু করি। প্রথম পদক্ষেপেই আমরা একেবারে মাথায় উঠে যাই, সর্বশেষ শিখরে, তারপরে আর নীচের ধাপগুলিকে জানতেই চাই না।''

''তাতে খারাপটা কি হল?'' ছাত্রটি শুধাল।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আনানিয়েভ চেঁচিয়ে উঠল, ''কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে যে এটা অস্বাভাবিক। নীচের ধাপগুলির সাহায্য ছাড়াই আমরা যদি সর্বোচ্চ শিখরে যাবার পথ খুঁজে পাই তাহলে তো জীবনের দীর্ঘ সিঁড়িটা তার নানা বর্ণ, নানা শব্দ ও নানা চিন্তা সমেত একেবারেই অর্থহীন হয়ে যায়। তোমার বয়সে এ রকম চিন্তা যে ক্ষতিকর ও স্ববিরোধী সেটা তুমি জীবনের প্রতিটি যুক্তিসম্মত, স্বাধীন পদক্ষেপের ভিতর দিয়েই বুঝতে পার। ধরা যাক, ঠিক এই মুহূর্তে তুমি পড়তে বসে গেলে ডারুইন বা শেক্সপীয়ার। তুমি একটা পাতা পড়তে না পড়তেই বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেল : আর তোমার দীর্ঘ জীবনটাকে, শেক্সপীয়ার ও ডারুইনকে তোমার মনে হল সম্পূর্ণ অর্থহীন, নিছক স্ব-বিরোধী মাত্র, কারণ তুমি তখন জেনে ফেলেছ যে তুমি মরবেই, শেক্সপীয়ার এবং ডারুইনও মরেছে,আর তাদের চিন্তা-ভাবনা কাউকেই বাঁচাতে পারে নি—তাদের নয়, পৃথিবীকে নয়, তোমাকেও নয় ; আর তার ফলে জীবনটাই যদি অর্থহীন হয়ে যায় তাহলে তো সব জ্ঞান, কাব্য ও উচ্চ চিন্তাই একটা অপ্রয়োজন খেয়ালেই পরিণত হয়, বয়স্ক শিশুদের একটা অলস খেলনামাত্র হয়ে ওঠে। কাজেই দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই তুমি পড়া বন্ধ করে দেবে। এখন, ধরা যাক, একজন বুদ্ধিমান মানুষ হিসাবে তোমার কাছে এসে লোকে তোমার মতামত জানতে চাইল, ধর, যুদ্ধ সম্পর্কে : যুদ্ধটা বাঞ্ছনীয় এবং নীতিসম্মত কি না? সেই ভয়ংকর প্রশ্নের জবাবে তুমি কেবলমাত্র কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা দায়-সারা গোছের জবাব দিলে, কারণ তোমার তখনকার চিন্তা-ভাবনার পটভূমিকায় হাজার হাজার মানুষ যুদ্ধ করে মরল কি স্বাভাবিকভাবে মরল তোমার কাছে দুইই সমান : উভয় ক্ষেত্রেই পরিণামটা তো একই—ধূলো ও বিস্মৃতি। তুমি আর আমি একটা রেলপথ তৈরী করছি। তখন কেন আমরা মাথা ঘামাব, আবিষ্কার করব, চিরাচরিত ব্যবস্থার উর্দ্ধে উঠব, শ্রমিকদের পরিশ্রম থেকে রেহাই দেব, যদি আমরা জেনে ফেলি যে দুই হাজার বছরের মধ্যেই এই রেলপথ ধূলোয় মিশে যাবে? অন্য সব কিছুর বেলাতেই এই একই কথা। ...তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে এই রকম একটা দুঃখজনক চিন্তা মাথায় ঢুকলে কোন অগ্রগতিই সম্ভব নয়, বিজ্ঞানে নয়, শিল্পকলায় নয়, এমন কি চিন্তার ক্ষেত্রেও নয়। আমরা মনে করি জনতা ও শেক্সপীয়ার অপেক্ষা আমরা বেশী বুদ্ধিমান, কিন্তু চিন্তাশীল মানুষ হিসাবে আমাদের সব কাজই বিকল হয়ে যায়, কারণ নীচে নামবার কোন ইচ্ছা আমাদের নেই এবং আরও উঁচু বলেও কিছু নেই ; ফলে আমাদের মস্তিষ্ক হিমাংককে পৌঁছে থেমে যায়—না পারে উপরে উঠতে, না

পারে নীচে নামতে। ...এই ধরনের চিন্তার ভার আমি বয়ে বেড়িয়েছি প্রায় ছয় বছর, আর ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, এই ছয় বছর আমি একটাও ভাল বই পড়ি নি, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি এতটুকু বাড়ে নি, আমার নৈতিক বিধানের সঙ্গে একটা নতুন অক্ষরও জুড়তে পারি নি। এটা কি একটা দুর্বিপাক নয়? তার উপরে, আমরা যে কেবল নিজেদের বিষাক্ত করছি তাই নয়, বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছি অন্যের জীবনেও। এই দুঃখবাদকে সঙ্গী করলে আমাদের উচিত জীবন থেকে সরে যাওয়া, গুহা-গহ্বরে আশ্রয় নেওয়া, অথবা তাড়াতাড়ি মরে যাওয়া, কিন্তু তার পবিবর্তে সার্বিক নিয়মের কাছে নতি স্বীকার করে আমরা বেঁচে থাকি, সুখ-দুঃখ ভোগ করি, নারীকে ভালবাসি, সন্তানের জন্ম দেই আর রাস্তাঘাট তৈরী করি!''

''আমাদের চিন্তার ফলে কারও জীবনের হের-ফের ঘটে না,'' অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছাত্রটি জবাব দিল।

''না, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত নই। জীবনের সত্যিকারের স্বাদ তুমি এখনও পাও নি, কিন্তু বন্ধু, তা যখন এতটুকুও পাবে তখন তুমিও এই জীবনটাকেই চাইবে। তুমি যত নিরাপদ মনে কব, আমাদের চিন্তা ততটা নিরাপদ নয়। বাস্তব জীবনে মানুষে মানুষে যখন সংঘর্ষ বাধে তখন চিন্তাই মানুষকে ঠেলে দেয় আতংকের পথে, মূর্খতার পথে। জীবনে এমন সব অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে যা আমার চরম শত্রুর জীবনেও ঘটুক এটা আমি চাই না।''

''দৃষ্টান্ত স্বরূপ?'' আমি প্রশ্ন করলাম।

''দৃষ্টান্ত?'' বাস্তুকারের মুখে প্রতিধ্বনি উঠল। এক মুহূর্ত ভেবে সে হেসে বলল, ''দৃষ্টান্ত হিসাবে একটিমাত্র ঘটনা শোন। সঠিক বললে একটি ঘটনা মাত্র নয়, একটা গোটা উপন্যাস, প্লট ও পরিণতি সমেত সুসম্পূর্ণ। একটা বিস্ময়কর পাঠ! আঃ, কী সে পাঠ!''

সে আমাদের জন্য এবং নিজের জন্য আরও মদ ঢালল, সবটা শেষ করল, হাত দিয়ে নিজের প্রশস্ত বুকটাকে চাপড়াতে চাপড়াতে ছাত্রটির চাইতে যেন আমাকে লক্ষ্য করেই বলতে শুরু করল ঃ

''সেটা আঠারো শ' সত্তর-এর গ্রীষ্মকাল...যুদ্ধের ঠিক এক বছর পরে আমি উপাধি পরীক্ষা পাশ করলাম। আমি ককেসাসে গেলাম এবং সমুদ্রতীরবর্তী এন. শহরে দিন পাঁচেক কাটালাম। এখানে বলা দরকার যে আমি সেখানেই জন্মেছি, বড় হয়েছি, সুতরাং রাজধানীর কোন লোকের কাছে এন. শহরটাকে বাসের পক্ষে চুখ্‌লোমা বা কাশিরা শহরের মতই একঘেয়ে আরামবিহীন মনে হলেও আমার কাছে যে সেই শহরটা অসাধারণ রকমের আরামদায়ক, আতপ্ত ও সুন্দর মনে হয়েছিল তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। যে উচ্চ বিদ্যালয়ে আমি পড়তাম বিষণ্ণ মনে তার পাশ দিয়ে হেঁটেছি, শহরের অতি পরিচিত বাগানের ভিতর দিয়ে বেড়িয়েছি, যে সব মানুষকে অনেকদিন দেখি নি অথচ যাদের কথা আমার মনে আছে তাদের

খুঁজে পেতে অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করেছি...সব কিছুই করেছি বিষণ্ণ মনে...

"অন্য অনেক কিছুর মধ্যে, একদিন সন্ধ্যায় একটা গাড়ি নিয়ে 'কোয়ারেন্‌টিন'এ গেলাম। প্লেগের সময় এই ছোট জনবিরল জায়গাটাতেই কোয়ারেন্‌টিন গড়ে উঠেছিল। আর লোকে এখন সেই নামেই জায়গাটাকে ডাকে। কিছু গ্রাম্য বাড়িঘর এখনও সেখানে আছে। কোয়ারেন্‌টিন-এ পৌঁছতে হলে একটা ভাল কাঁচা রাস্তা ধরে শহর থেকে চার ভার্স্ট যেতে হয়। পথে বাঁ দিকে পড়বে হাল্কা নীল সমুদ্র, ডান দিকে সীমাহীন নির্জন তৃণভূমি। তুমি সহজে শ্বাস নিতে পারবে, তোমার চোখ দুটি স্বচ্ছন্দে ঘুরতে পারবে। যে ঝোপটাকে ঘিরে 'কোয়ারেন্‌টিন' গড়ে উঠেছিল সেটাও সাগরের কূলে অবস্থিত। গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে পরিচিত ফটকের ভিতর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম; পথের শেষে প্রথমেই পেলাম একটা ছোট পাথরের গ্রীষ্মাবাস। ছেলেবেলায় বাড়িটাকে আমি ভালবাসতাম। আমার মতে, বেঢপ সব স্তম্ভের উপর গড়া এই গোলাকার ভারী গ্রীষ্মাবাসটিতে পুরানো কবরের স্তম্ভের কাব্য-ধর্মিতার সঙ্গে 'সোবাকেভিচ'-এর (নিকোলাই গোগলের কাব্য-উপন্যাস ডেড সোল্‌স্‌-এর একটি গ্রাম্য জমিদারের চরিত্র) প্রচণ্ড স্থূলতার একটা সমন্বয় ঘটেছে, আর তার ফলে জায়গাটা হয়ে উঠেছে শহরের সব চাইতে কাব্যময় একটি দর্শনীয় স্থান। পাহাড়ের একেবারে প্রান্তে অবস্থিত বলে সেখান থেকে সমুদ্রের দৃশ্যটাও চমৎকার।

"একটা বেঞ্চিতে বসে বারান্দার রেলিংয়ের উপর ঝুঁকে বাইরে দৃষ্টি ফেরালাম। একটা পায়ে-হাঁটা পথ গ্রীষ্মাবাস থেকে নীচে নেমে গেছে উপলখণ্ডের ভিতর দিয়ে। অনেক নীচে বালুকাময় তীরভূমিতে ছোট ছোট সফেন তরঙ্গগুলি আলস্যভরে ভেঙে পড়ছে। সাত বছর আগে আমি যখন উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে আমার দেশের শহর ছেড়ে রাজধানীতে চলে গিয়েছিলাম, সমুদ্র সেদিন যেমন মহিমান্বিত, অনন্ত ও বিপদসংকুল ছিল ঠিক তেমনই আছে। দূরে ধোঁয়ার একটা কালো ফিতে দেখতে পেলাম—একটা স্টিমার। কিন্তু সেই নিশ্চল, প্রায় দৃষ্টির অগোচর ফিতেটি আর জলের উপর দিয়ে উড়ে-যাওয়া সাগর-পাখির ঝাঁক ছাড়া সেখানে এমন আর কিছুই ছিল না যা সমুদ্র ও আকাশের এই একঘেয়ে ছবিটাকে একটু জীবন্ত করে তুলতে পারে। গ্রীষ্মাবাসের ডাইনে ও বাঁয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলব্যাপী উঁচু নীচু পাহাড়ের সারি।

"কি জান, কোন বিষণ্ণ প্রকৃতির মানুষ যখন সমুদ্রে অথবা কোন আকর্ষণীয় প্রাকৃতিক পরিবেশে একেবারে একা থাকে তখন যে কারণেই হোক তার সেই বিষণ্ণতা এমন এক গভীর প্রত্যয়ে রঙিন হয়ে ওঠে যে সকলের অজ্ঞাতেই সে বেঁচে থাকবে ও একদিন শেষ হয়ে যাবে, আর তখনই আপনা থেকেই একটা পেন্সিল খুঁজে নিয়ে হাতের কাছে যা পায় তার উপরেই নিজের নামটা লেখে। হয় তো এই কারণেই আমার এ গ্রীষ্মাবাসের মতই যেখানে যত নির্জন, নিভৃত স্থান আছে সেখানেই ছড়িয়ে আছে

পেন্সিলে লেখা বা হাত-ছুরিতে খোদাই করা কত নাম, কত কথা। এখনও মনে আছে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি সেদিনও পড়েছিলাম 'আইভান করোল্কভ, ১৬ মে, ১৮৭৬'। তার পাশেই ডান দিকে কোন স্বপ্নদর্শী স্বীয় নামটি স্বাক্ষর করে লিখেছে, 'দূরে যেখানে সাগরের ঢেউরা বিষণ্ণ চিন্তায় মগ্ন সেখানে সেও একদিন দাঁড়িয়ে ছিল মহৎ চিন্তায় বুকটা ভরে নিয়ে।' তার হাতের লেখা ছিল ভেজা রেশমের মতই স্বপ্নময় ও পিচ্ছিল। ক্রশ নামক কোন লোক, হয় তো খুবই ছোটখাট একটা তুচ্ছ প্রাণী, নিজের তুচ্ছতায় এতই মর্মাহত হয়েছিল যে হাত-ছুরিটাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে নিজের নামটা লিখেছিল দুই ইঞ্চি গভীর অক্ষরে। কখন জানি না আমিও পকেট থেকে পেন্সিলটা বের করে একটা স্তম্ভের উপর আমার নামটাও লিখে ফেললাম। যাই হোক, আমি যা বলতে যাচ্ছি তার সঙ্গে এ সবের কোন সম্পর্ক নেই...ক্ষমা কর, অল্প কথার গল্প বলতে আমি পারি না।

''আমি বিষণ্ণ ও কিছুটা বিরক্ত হয়ে উঠলাম। বিরক্তি, নির্জনতা ও ঢেউয়ের গর্জন মিলে ধীরে ধীরে আমার মনে সেই সব চিন্তা-ভাবনার সূচনা করল যা নিযে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। সেই সময়ে, সত্তরের দশকের শেষ দিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে এটাই ফ্যাশান হয়ে উঠল এবং তার পরে, আশীর দশকের প্রথম দিকে এই ধারণাটা জনসাধারণ থেকে সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ও রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করল। সেই সময় আমার বয়স ছাব্বিশ বছরের বেশী নয়, কিন্তু তার মধ্যেই আমি ভালভাবেই জেনে ফেলেছি যে জীবন লক্ষ্যহীন, জীবন অর্থহীন, সবকিছুই ফাঁকিবাজী ও অলীক, মূলতঃ এবং ফলতঃ সাখালিন দ্বীপের দণ্ডিত মানুষদের জীবন নাইস-এর মানুষদের জীবন থেকে কোন দিক থেকেই আলাদা নয়, কাণ্টের মস্তিষ্ক ও একটা মাছির মস্তিষ্কের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই, এই জগতের কোন মানুষই ভাল বা মন্দ নয়, সব কিছুই বাজে ও অর্থহীন, আর সব কিছুই নরকের যাত্রী! আমি বেঁচে আছি, আর তার অর্থ এই যে কোন এক অজ্ঞাত শক্তি আমাকে বেঁচে থাকতে বাধ্য করছে; আমি যেন বলছি, 'হে শক্তি, চেয়ে দেখ; জীবনকে আমি এক কানা-কড়িও মূল্য দেই না, কিন্তু আমি বেঁচে আছি!' আমি চিন্তা করি একটাই নির্দিষ্ট পথে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও ভঙ্গীতে, আর সেই অর্থে আমি সেই কুশলী বাবুর্চিরই মত যে সেই একই চিরকালের আলু দিয়ে শতেক রকমের স্বাদু ব্যঞ্জন রান্না করতে পারে। নিঃসন্দেহে আমার চিন্তা ছিল একপেশে ও কিছুটা সংকীর্ণ, কিন্তু সেই সময়ে আমার মনে হত যে আমার চিন্তার দিগন্তের আদি নেই, অন্ত নেই, আর আমার চিন্তা সাগরের মতই দূর বিস্তার। দেখ, আমার নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুসারে আলোচ্য চিন্তার মূলে তাম্রকূট বা মরফিয়ার মত প্রলুব্ধ করার মত, নেশাগ্রস্ত করার মত কিছু অবশ্যই আছে। ক্রমেই এটা অভ্যাসে পরিণত হয়, আবশ্যিক হয়ে ওঠে। নির্জনতার প্রতিটি মুহূর্তকে এবং প্রতিটি সুযোগকে তুমি ব্যবহার করতে থাক জীবনের অর্থশূন্যতার এবং কবরের ওপরের

অন্ধকারের চিন্তা-ভাবনাগুলিকে ঝাড়ে-বংশে বাড়িয়ে তোলার কাজে। আমি যখন গ্রীষ্মাবাসে বসে ছিলাম, তখন দীর্ঘনাসা কয়েকটি গ্রীক ছেলে সেখানকার পথ ধরে সমারোহ করে হেঁটে যাচ্ছিল। এ সুযোগটিকে আমি কাজে লাগালাম ; ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে এই মত ভাবতে শুরু করলাম ঃ

'জিজ্ঞাসা করি, এ ছেলেমেয়েরা জন্মেছে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে আর তারা বেঁচে আছে কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ? তাদের অস্তিত্বের কি কোন অর্থ আছে ? কেন বড় হচ্ছে না জেনেই তারা বড় হয়ে ওঠে, ঐ জঞ্জালের মধ্যে তারা বাস করে বিনা প্রয়োজনে, আর তারা মরবে...'

''তারা হেঁটে চলেছে ভদ্রভাবে, কথা বলছে গম্ভীর হয়ে, যেন নিজেদের এই বর্ণহীন ছোট জীবন দিয়ে তারা একটা বড় কিছু গড়ে তুলতে চায়, যেন তারা জানে কিসের জন্য তারা বেঁচে আছে—এ সব দেখেশুনে আমি বিরক্ত হয়ে উঠি...রাস্তার শেষ প্রান্তে তিনটি নারীকে দেখেছিলাম তাও মনে পড়ল। তিনজনই তরুণী, একজনের গোলাপী পোশাক, বাকি দু'জনের সাদা ; তারা হেসে হেসে একসঙ্গে হাঁটছে হাতে হাত ধরে ; তাদের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম ঃ 'বড়ই একঘেয়ে লাগছে, দু'চার দিনের জন্য এদের একজনের সঙ্গে একটু মেলামেশা করলে মন্দ হয় না !''

''এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, আমার সেন্ট পিতার্সবার্গের প্রেমিকার সঙ্গে আমি সর্বশেষ সময় কাটিয়েছি তিন সপ্তাহ আগে ; তাই ভাবলাম এখন যদি কয়েক দিনের জন্য একটা ব্যাপার-স্যাপার করা যায় তো মন্দ হয় না। মাঝখানের শ্বেতবসনা সুন্দরীর বয়সটাই অল্প বলে মনে হল, দেখতেও সে সঙ্গিনীদের চাইতে ভাল, তার ভাবভঙ্গী ও হাসি দেখে মনে হল সে উচ্চ বিদ্যালয়ের উঁচু ক্লাসের ছাত্রী। কোনরকম পাপ চিন্তা ছাড়াই তার বুকের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম ঃ

'সঙ্গীত ও আচরণবিধি নিয়ে পড়াশুনা করছে. বিয়ে করবে, ঈশ্বর যেন না করেন, কোন গ্রীককে, একটি বিবর্ণ ও অর্থহীন জীবন কাটাবে ; কিছু না জেনেই একপাল ছেলেমেয়ের জন্ম দেবে, আর তাবপবে একদিন মরে যাবে। কী অর্থহীন জীবন !'

''সাধারণভাবে একটা কথা বলতেই হবে যে উচ্চ চিন্তার সঙ্গে নিম্নতম গদ্যকে মেলাতে আমি সিদ্ধহস্ত। কবরের ওপারের ছায়ামূর্তি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি বলে বুক ও পাছার প্রতি সম্মান দেখাতে আমি কসুর করি না। মাথায় বড় বড় চিন্তা নিয়ে আমাদের তরুণ ব্যারণ প্রতি রবিবার ভূপোলভ্‌কা ভ্রমণে বেরিয়ে যায় এবং ডনজুয়নেস্থ-সুলভ মজা লুটতে তার বাধে না। বুকে হাত দিয়েই বলছি, নিজের কথা যতদূর মনে পড়ে তাতে মায়েদের প্রতি আমার মনোবৃত্তিটা খুবই অপমানকর ছিল। আজ সেই উচ্চ বিদ্যালয়ের মেয়েটির কথা স্মরণ করলে আমার তৎকালীন চিন্তার জন্য আমার মুখ লাল হয়ে ওঠে, কিন্তু সেই সময় আমার বিবেক ছিল সম্পূর্ণ শান্ত।

আমি সম্ভ্রান্ত পিতামাতার সন্তান, উচ্চশিক্ষিত একজন খৃস্টান, স্বভাবে পাপী নই, মেয়েদের মূল্য দিতাম সেই টাকায় যাকে জার্মানিরা বলে 'ব্লুট্‌গেল্ড' (রক্তের টাকা), তাতে তিলমাত্র ইতস্তত বোধ করতাম না, অথবা উচ্চ বিদ্যালয়ের মেয়েদের বস্ত্রহরণ করতাম খোলা চোখে...আসলে গোলমালটা ছিল এই যে যৌবনের কিছু দাবী থাকবেই, আর ভাল হোক আর মন্দ হোক এই সব দাবীর বিরোধী কোন কিছু নীতিগতভাবে আমাদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ছিল না। যারা জানে যে জীবনটা লক্ষ্যহীন আর মৃত্যু অনিবার্য তারা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণের এবং পাপের ধারণার প্রতি একান্তভাবেই নির্বিকার : স্বীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর বা না কর তোমাকে সেই মরতে হবে, পচতে হবে।...দ্বিতীয় কথা, আমার ভালমানুষ বন্ধুরা, আমাদের চিন্তা ভাবনা থেকে অল্প বয়সেই আমাদের মনের মধ্যে বুদ্ধিবাদের শিকড় গজিয়ে বসে। মনের উপর বুদ্ধির অতিমাত্রায় প্রভাব আমাদের অভিভূত করে ফেলে। বিশ্লেষণেব ছুরি দিয়ে মনের স্বতস্ফূর্ত অনুভূতি ও অনুপ্রেরণাগুলিকে কেটে-ছেটে মেরে ফেলা হয। যেখানে বুদ্ধিবাদের শাসন সেখানেই দেখতে পাবে শীতল ঔদাসিন্য, আর উদাসীন মানুষ—কে অস্বীকার করতে পাবে? চবিত্রের সততার অর্থই জানে না। এই গুণের খবর একমাত্র তাবাই রাখে যারা উষ্ণ, ঐকান্তিক, আর যারা ভালবাসতে পারে। তৃতীয কথা, আমাদের চিন্তা-ভাবনা জীবনের অর্থকে বাতিল করতে গিয়ে বাতিল করে বসে প্রতিটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে। এটা সহজেই বোঝা যায় যে আমি যদি নাতালিয়া স্তেপানভ্‌নার ব্যক্তিত্বকেই অস্বীকাব করি, তাহলে তাকে অসম্মান করলাম কি করলাম না দুটোই তো আমার কাছে নিশ্চিতরূপেই এক হয়ে দাঁড়াল। আমি আজ তাব মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করলাম, তাকে 'ব্লুটগেল্ড' দিলাম, আব কালই তার কথা বেমালুম ভুলে যাব।

''যাই হোক আমি তো তরুণীদের উপর নজব বেখে গ্রীষ্মাবাসে বসে আছি। এদিকে আর একটি নারী সেই পথে উদয হল। তার সোনালী মাথাটা খোলা, কাঁধের উপর একটা হাতে-বোনা শাল জড়ানো। হাঁটিতে হাঁটিতে সে গ্রীষ্মাবাসেই ঢুকল, বারান্দার বেলিং ধরে শান্ত দৃষ্টিতে নীচেব দিকে এবং দূরে সমুদ্রের দিকে তাকাল। ভিতরে ঢুকে আমার দিকে ফিবেও তাকাল না, যেন আমাকে দেখতেই পায় নি। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত (পুরুষদের যেমন মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে তেমনটি নয়) নজর করে বুঝলাম সেও তরুণী, বয়স পঁচিশের বেশী নয, আকর্ষণীয়া, সুগঠনা, খুব সম্ভব বিবাহিতা একটি মহিলা। সাদাসিদে ঘরোয়া পোশাক পরা, কিন্তু রুচিসম্পন্না ও কেতাদুরুস্ত, এন. শহরের বড় ঘরের মহিলারা যেমন হয়ে থাকে।

''এর সঙ্গে একটু ভাব-সাব করা উচিত,'' মহিলার সুন্দর কটিদেশ ও বাহুযুগল দেখে আমি ভাবলাম। 'মন্দ নয়...নিশ্চয় কোন ইস্কুলাপিয়াস বা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষকের স্ত্রী হবে...'

''কিন্তু তার সঙ্গে একটা 'এফেয়ার' করা, অর্থাৎ ছুটি কাটাতে-আসা

যাত্রীবা যে ধরনের তাৎক্ষণিক রোমান্সের পক্ষপাতী হয়ে ওঠে তার নায়িকারূপে তাকে পাওযাটা বেশ শক্ত এবং প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। তার মুখটা ভাল করে দেখে আমার তো সেই রকমই মনে হল। তার মুখের ভাব ও চোখের চাউনি দেখে আমার মনে হল সমুদ্র, দূরের ধোঁয়া আব আকাশ দেখে দেখে এর মধ্যেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তার চোখের উপর অত্যধিক চাপ পড়েছে। স্পষ্টতই সে ছিল ক্লান্ত, বিরক্ত, আর দুঃখজনক কিছু ভাবছিল।

''সেই স্বর্ণকেশিনী একবাব চকিতে আমার দিকে তাকাল, বেঞ্চিতে বসে কি যেন ভাবল। তার চাউনি দেখেই আমি বলে দিতে পারতাম আমার দিকে নজর দেবার মত সময়ই তার নেই এবং আমার শহুরে চেহারা তার মনে কোনরকম কৌতূহল জাগাতে পারে নি। তথাপি তার সঙ্গে আলাপ জমাতেই হবে এটা স্থির করে নিয়ে প্রশ্ন করলাম ঃ

''ম্যাডাম, শহবে যাবাব গাড়িটা এখান থেকে কখন ছাড়বে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?''

''মনে হয় দশটা কি এগারোটার সময়...''

''তাকে ধন্যবাদ দিলাম। সে দ্বিতীয়বার আমার দিকে তাকাল, আর হঠাৎই তার অবিচলিত মুখে কৌতূহলেব ঝিলিক খেলে গেল, তারপর দেখা দিল বিস্ময়...আমিও তাড়াতাড়ি একটা উদাসীন ভাব ও যথাযথ ভঙ্গী গ্রহণ করলাম ঃ মাছটা ঠোকরাতে শুরু করেছে। যেন কিছুতে হুল ফুটিয়েছে এমনই ভাবে হঠাৎ সে বেঞ্চি থেকে উঠে পড়ল, লাজুক হাসি হাসল, তারপর আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ভয়ে ভয়ে শুধাল ঃ ''শুনুন, আপনি আনানিয়েভ না ?''

''হ্যাঁ, আমি আনানিযেভ'', আমি জবাব দিলাম।

''আর—তুমি আমাকে চিনতে পাবছ না ?''

''আমি কিছুটা দমে গেলাম, তার দিকে ভাল করে তাকালাম, আর—বিশ্বাস কব বা না কর—তাকে চিনতেও পারলাম, মুখ দেখে নয়, চেহারা দেখে নয়, চিনলাম তাব লাজুক, ক্লান্ত হাসিটি দেখে। সে নাতালিয়া অথবা, তখন তাকে যে নামে ডাকা হত, কিটেন ; সাত-আট বছর আগে আমি যখন উচ্চ বিদ্যালয়েব পোশাক গায়ে চাপাতাম তখন যে মেয়েটির প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খেতাম। 'ওঃ, বহুদিন বিস্মৃত কত কথা, দূর অতীতের এক উপকথা যেন...' কিটেন তখন উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি চামড়াসর্বস্ব, ছোটখাট মেয়ে, বয়স পনেবো কি ষোল বছর, রুচি-পছন্দে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাপ, প্রকৃতি তাকে সৃষ্টি করেছে শুধু বিমূর্ত প্রেমের জন্য! কী মনোহারিণী এক কন্যা! ম্লান, ভঙ্গুর, হাল্কা—মনে হত একটা ফুঁ দিলেই সে কাটা ফুলের মতই উড়ে যাবে দূর আকাশে--মুখখানি সদা লজ্জানত ও বিভ্রান্ত, হাত দু'খানি ছোট, নরম চুলেব রাশি পিঠের উপর এলায়িত, আর কটিদেশ আশ্চর্য রকমেব ক্ষীণ—সব মিলিয়ে স্বর্গীয় ও স্বচ্ছ, এক কথায় চাঁদের মত,

আর উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি বালকের দৃষ্টিতে অতুলনীয়া রূপসী...আমি তার প্রেমে পড়েছিলাম, ছোটখাট প্রেম নয়! রাতে আমাব চোখে ঘুম ছিল না, তাকে নিয়ে কবিতা লিখতাম...মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় শহরের পার্কে এসে সে বসত, আর আমরা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাব চারদিকে ঘুরঘুব করতাম, তার কথাই ভাবতাম...আমাদের স্তবস্তুতি, অঙ্গভঙ্গী ও দীর্ঘশ্বাসের জবাবে সে শুধু সন্ধ্যার ভিজে বাতাসে কাঁপত, চোখের পাতা নাচাত আর ভীরু হাসি হাসত। সে সময় সে একটা মনের মত বিড়ালছানার মতই দেখতে ছিল; তার দিকে তাকালে প্রত্যেকেরই ইচ্ছা করত তার পিঠটা একটু চাপড়ে দেবে—তাই তার ডাক নাম হয়েছিল কিটেন অর্থাৎ বিড়ালছানা।

"যে সাত আট বছর তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি তার মধ্যেই কিটেন অনেক বদলে গেছে। সে বড় হয়েছে, ভরন্ত হয়েছে, এবং একটা নরম লোমে ঢাকা ছোট বিড়ালছানার সঙ্গে মিলটা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। তার চোখে-মুখে বয়সের ততটা ছাপ পড়ে নি। কিন্তু উজ্জ্বলতাটুকু হারিয়ে গেছে, কিছুটা রুক্ষ হয়েছে, চুল ছোট হয়েছে, চেহারা লম্বা হয়েছে, কাঁধ দুটো দ্বিগুণ চওড়া হয়েছে, আর সব কিছুর উপরে তার মুখে এর মধ্যেই মাতৃত্বের ও আত্মসমর্পণের ছাপটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে; এরকমটা আমি আগে দেখি নি...এক কথায়, তার মধ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রীসুলভ অমূর্ত প্রেমের যে সব লক্ষণ ছিল তার মধ্যে অবশিষ্ট আছে শুধু মাত্র লজ্জানত হাসিটা, আর কিছুই নেই...

"আমরা কথাবার্তা শুরু করলাম। সে যখন শুনল যে আমি এর মধ্যেই একজন বাস্তুকাব হয়েছি তখন তার আনন্দের সীমা রইল না।

"খুশি হয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, "আঃ, কত ভাল! তোমরা সকলেই কত ভাল হয়েছ! তোমাদের বছরের একজনও খারাপ ফল কবে নি। কেউ বাস্তুকার হয়েছে, কেউ ডাক্তাব হয়েছে, কেউ বা স্কুল-শিক্ষক, আর লোকে তো বলে অন্য একজন এখন সেন্ট পিতার্সবার্গের এক বিশিষ্ট গায়ক...তোমরা সকলেই ভাল করেছ, সকলে! আঃ কী যে ভাল লাগছে!"

"কিটেনের চোখ দুটি আন্তরিক আনন্দে ও শুভেচ্ছায় জ্বলজ্বল্ কবছে। সে আমার প্রশংসা করছে একজন দিদির মত বা প্রাক্তন স্কুল-শিক্ষিকার মত। কিন্তু তার প্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মন বলল, "তার সঙ্গে একটা 'এফেয়ার' হলে ভাল হত!"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার কি মনে আছে নাতালিয়া স্তেপানভ্না, একবার একটা চিঠি সমেত একগোছা ফুল এনে তোমাকে দিয়েছিলাম? চিঠি পড়ে তোমার মুখে এমন একটা হতবুদ্ধিকর ভাব ফুটে উঠেছিল..."

সে হেসে বলল, "না, তা আমার মনে পড়ছে না। কিন্তু এটা মনে আছে, আমার জন্য তুমি অগস্টাসর সঙ্গে দ্বৈত যুদ্ধে নামতে চেয়েছিলে..."

''সেটা আবার আমার মনে পড়ছে না...''

''কিটেন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ''হ্যাঁ, যা গেছে তা গেছে। একদিন তোমাদের মত ছেলেদের কাছে আমি ছিলাম এক দেবী বিশেষ, কিন্তু এখন তো আমার পালা তোমাদের দিকে মুখ উঁচু করে তাকানো...''

কথাবার্তার ভিতর দিয়ে আরও জানলাম, উচ্চ বিদ্যালয় ছাড়ার দু' বছর পরেই কিটেন বিয়ে করে আধা-গ্রীক, আধা-রুশ এক স্থানীয় মধ্যবিত্ত লোককে ; সে একটা ব্যাংকে অথবা একটা জীবনবীমা সমিতির হয়ে কাজ করত আর সেই সঙ্গে গমের ব্যবসা করত। তার পদবীটা ছিল দাঁত-ভাঙা গোছের পপৌলাকি অথবা স্কারান্দোপৌলো...বাপ্‌স্‌, আমি ভুলেই গেছি...নিজের কথা কিটেন সামান্যই বলল, যতটুকু বলল সেটাও অনিচ্ছায়। কথাবার্তা হল শুধু আমাকে নিয়ে। সে আমাকে নানা প্রশ্ন করল— ইন্সটিটিউট, আমার সহকর্মীরা, সেন্ট পিতার্সবার্গ, আমার পরিকল্পনা ; আর আমি যা কিছু বললাম, তাতেই আনন্দে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওঃ, কী ভাল !'

''আমরা নীচে সমুদ্রের তীরে নেমে গেলাম, বালির উপর দিয়ে হাঁটলাম, তারপর সমুদ্র থেকে সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু হলে ফিরে গেলাম। সারাক্ষণ সব কথাই হল আমাকে ও আমার অতীতকে নিয়ে। বাড়িটার জানালায় সন্ধ্যা-সূর্যের অস্ত-আলো যতক্ষণ মিলিয়ে না গেল ততক্ষণ আমরা হাঁটলাম।

''কিটেন বলল, 'আমার বাড়িতে চল একটু চা খেয়ে আসবে। এতক্ষণে হয় তো সামোভারটা টেবিলে এসে গেছে।'...বাবলা গাছের সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে তাদের বাড়িটা চোখে পড়তেই সে বলল, 'এখন আমি বাড়িতে একাই আছি। আমার স্বামী সব সময় শহরেই থাকে, শুধু রাতে এখানে ফিরে আসে, তাও সব রাতে নয়, আর স্বীকার করছি যে একা একা আমার খুব বাজে লাগে, একেবারে প্রাণান্তকর অবস্থা।''

''তার পিঠ ও ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে আমি তাকে অনুসরণ করলাম। সে বিবাহিত জেনে আমি খুশি হয়েছি। ক্ষণিক প্রেমের পক্ষে যুবতী নারী অপেক্ষা বিবাহিত নারীই প্রশস্ত। তার স্বামী বাড়ি নেই জেনে আমি আরও খুশি হলাম।...কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে হল যে এখানে প্রেম-ট্রেম কিছু হবে না...

''আমরা ভিতরে গেলাম। কিটেনের ঘরগুলি ছোট, ছাদ নীচু ; গ্রীষ্মাবাসের মত আসবাবপত্র সবই আছে, তবে যৎসামান্য যা দেখলাম তাতেই বুঝতে পারলাম যে কিটেনের ও তার স্বামীর দিন খারাপ চলছে না, তারা বছরে পাঁচ-ছয় হাজার খরচ করে। মনে পড়ছে, কিটেন যেটাকে খাবার ঘর বলল তার ঠিক মাঝখানে একটা ছয়-পেয়ে গোল টেবিলে সামোভার ও চায়ের কাপ সাজানো। টেবিলের এক কোণে একটা খোলা বই, একটা পেন্সিল ও একখানা এক্সারসাইজ খাতা। এক নজর দেখেই চিনলাম

মালিকিনও বুরেনিন-এর লেখা 'এরিথমেটিক্যাল প্রব্লেম্‌স্'। যতদূর মনে পড়ে, বইটা খোলা ছিল। 'কোম্পানি বিধি'র পৃষ্ঠায়।

''তুমি আবার কাকে পড়াচ্ছ'' আমি শুধালাম।

সে জবাব দিল, ''কাউকে না। অতীতকে ফিরিয়ে আনতে সমস্যাগুলির সমাধান করি, কারণ একা একা বড় খারাপ লাগে, করার মত কোন কাজ নেই।''

''তোমার কোন ছেলেমেয়ে নেই?''

একটি ছোট ছেলে ছিল, কিন্তু এক সপ্তাহ বয়সেই সে মারা গেছে।''

''আমরা চা খেতে লাগলাম। আমার প্রশংসা করতে গিয়ে পুনরায় সেই একই কথা দিয়ে শুরু করে সে বলল, আমি যে বাস্তুকার হয়েছি সেটা খুবই ভাল হয়েছে, আর আমার সাফল্যেও সে খুব খুশি হয়েছে। সে যত বেশী কথা বলছে, যত বেশী আন্তরিকভাবে হাসছে ততই আমার এই ধারণাই দৃঢ়তর হচ্ছে যে সাফল্যের স্বাদ না নিয়েই আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। সাফল্য সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত ভরসা রাখতে পার যখন তুমি কোন বোধের পিছনে ধাওয়া কব, যখন তোমার প্রত্যাশিত নারীটিও তোমার মত এ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ইন্দ্রিয়বিলাসী হয়, অথবা যখন সে হয় এমন কোন বারাঙ্গণা যাব কাছে তুমি অপরিচিত। কিন্তু এমন কোন নারীর সঙ্গে যদি তোমার সাক্ষাৎ ঘটে যে নির্বোধ নয়, যাব মুখে ফুটে ওঠে ক্লান্ত আত্মসমর্পণ ও শুভেচ্ছার ভাব, তোমার সঙ্গকে যে অন্তর দিয়ে উপভোগ করে এবং সর্বোপরি, তোমাকে শ্রদ্ধা করে, সেখানে তোমার বাণ তুমি প্রত্যাহার করে নিতে পার। এখানে সাফল্য পেতে হলে চাই আরও দীর্ঘ অবকাশ, একটি মাত্র দিনে হবে না।

সন্ধ্যার আলোয় কিটেনকে দিনের আলোর চাইতেও দেখতে ভাল লাগল। তাকে আরও বেশী পছন্দ হল, সেও আমাকে মনের মত করেই কাছে পেল। হ্যাঁ, একটা প্রেম-লীলার জন্য পরিবেশটা যথাযথই ছিল: স্বামী বাড়ি নেই, কোন চাকর চোখে পড়ে নি, চারদিক শান্ত, স্তব্ধ...সাফল্যে আমার যতটুকু বিশ্বাস ছিল তা নিয়েই যথাসময়ে আক্রমণে নামব বলে স্থির করলাম। প্রথমে একটা পরিচয়ের আমেজ গড়ে তুলতে হবে এবং কিটেনের পদ্যময় ভাবকে একটা হাল্কা স্তরে নিয়ে যেতে হবে...

''নাতালিয়া স্তেপানভ্‌না, এবার প্রসঙ্গটা বদলানো যাক'', এই বলে আমি শুরু করলাম। ''কিছু মজার কথায় যাওয়া যাক। ...প্রথমে, পুরনো দিনগুলিকে স্মরণ করে তোমাকে কিটেন বলে ডাকার অনুমতি আমাকে দাও।''

সে অনুমতি পেলাম।

''তারপর বলতে শুরু করলাম, 'দয়া করে আমাকে বল কিটেন, স্থানীয় সুন্দরীরা কোন্ মৌমাছিকে তাদের বনেটের মধ্যে বাঁধতে পেরেছে? তাদের এমন কি ঘটল? তারা সকলেই তো নীতিবাগীশ, ধর্মপ্রাণ, কিন্তু এখন তুমি

যার খবরই কর না কেন তোমাকে এমন কিছু শুনতেই হবে যাতে তুমি শিউরে উঠবে...এক কুমারী পালিয়েছে জনৈক অফিসারের সঙ্গে, আর একজন পালিয়েছে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছেলেকে নিয়ে, তৃতীয়জন বিবাহিতা হয়েও স্বামীকে ছেড়ে এক অভিনেতার সঙ্গে সরে পড়েছে, চতুর্থজন গেছে এক অফিসারের সঙ্গিনী হয়ে, এ রকম আরও কত কেচ্ছা-কাহিনী...যেন গোটা দেশেই মড়ক লেগেছে! অচিরেই তো তোমাদের শহরে একটি যুবতীকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না!''

''আমার কথার মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল। জবাবে কিটেন যদি আমার দিকে তাকিয়ে হাসত, তাহলে আমি এই ভাবে কথা বলতাম, 'দেখো কিটেন, কোন অফিসার বা অভিনেতা যেন তোমাকেও ফুসলে না নিয়ে যায়!' সেও চোখ নীচু করে বলত, 'আমার মত মেয়েকে কে আর ফুসলে নিয়ে যেতে চাইবে?' আমার চাইতে যুবতী ও সুন্দরী কত মেয়ে আছে...' তখন আমি তাকে বলতাম, 'সত্যি কিটেন, সকলের আগে আমিই তোমাকে ফুসলাতে যেতাম!' এইভাবে কথার পর কথা চলতে চলতেই কথাটা পাকা হয়ে যেত। কিন্তু আমার কথা শুনে কিটেন হাসল না, বরং গম্ভীর হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

''সে বলল, 'লোকে যা বলে সব সত্যি। আমার বোন সোনিয়া স্বামীকে ছেড়ে এক অভিনেতার সঙ্গে চলে গেছে। কাজটা অবশ্য ভাল নয়...যার যার ভাগ্যকে মেনে চলাই উচিত, কিন্তু আমি নিন্দা করছি না, তাদের দোষও দিচ্ছি না...অনেক সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা ব্যক্তির চাইতেও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।''

''সেটা ঠিক কথা কিটেন, কিন্তু এমন কোন্ পরিবেশ আছে যা একটা মহামারী সৃষ্টি করতে পারে?''

'''দুটি ভুরু তুলে কিটেন বলল, 'সেটা খুব সহজেই বোঝা যায়। শিক্ষিত মেয়েরা ও নারীরা জানে না নিজেদের নিয়ে কি করবে। সকলে তো পড়াশুনা নিয়ে দূরে চলে যেতে পারে না, অথবা স্কুলের শিক্ষিকা হতে পারে না। তাদের তো বিয়ে করতেই হয়...আর কাকে বিয়ে করবে বলতে পার? তোমরা ছেলেরা তো উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাও, আর কোন দিন তোমাদের দেশের শহরে ফেরো না, রাজধানীতেই বিয়ে কর, কিন্তু মেয়েরা তো এখানেই পড়ে থাকে! আচ্ছা, যেহেতু এখানে ভদ্র, পরিণত মানুষের বড় অভাব, তাই তারা বিয়ে করে সেই সব ব্যবসায়ী ও গ্রীকদের যারা জানে কেবল মদ খেতে আর ক্লাবে গিয়ে হুল্লোড় করতে...এরপর তারা কি ধরনের জীবন কাটায়? তুমি নিজেও তো বুঝতে পার, একটি শিক্ষিত, ভালভাবে লালিত-পালিত মেয়েকে যদি একটা নির্বোধ, বদমেজাজী স্বামীর সঙ্গে বাস করতে হয় এবং সেই অবস্থায় তার সঙ্গে যদি কোন ভদ্র প্রকৃতির অফিসার, অভিনেতা বা ডাক্তারের দেখা হয়, যদি সে তার সঙ্গে প্রেমে পড়ে, চলতি জীবনটা তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে, আর

তার পরিণতিতে সে তার স্বামীকে ছেড়ে দূরে চলে যায়, তাহলে তো তাকে দোষ দেওয়া যায় না।''

''আমি বললাম, 'তাই যদি হয় কিটেন, তাহলে বিয়েটাই বা করা হয় কেন?'

''কিটেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কারণ প্রত্যেক মেয়েই কল্পনা করে যে নাই স্বামীর চেয়ে যে কোন স্বামীই ভাল।...নিকোলাই আনাস্তাসিয়েভিচ, সব মিলিয়ে এখানকার জীবনটা তো সুন্দর নয়, মোটেই সুন্দর নয়। মেয়ে হিসাবে তুমি ব্যর্থ, বিয়ের পরেও তুমি ব্যর্থ...সোনিয়া পালিয়ে গেছে, তাও এক অভিনেতার সঙ্গে, তাই তাকে দেখে সকলে হাসাহাসি করে, কিন্তু তারা যদি তাব অন্তরটা দেখতে পেত, তাহলে হাসতে পারত না...''

দরজার বাইরে আজর্কা আবার ডাকতে শুরু করল। কাকে যেন দেখে হিংস্রভাবে গর্জে উঠল, তারপর দুঃখের সুরে ডাকতে ডাকতে ব্যারাক-বাড়ির দেয়ালে সজোরে আছড়ে পড়ল...আনানিয়েভের মুখটা করুণায় কুঁচকে উঠল; গল্পটা মাঝপথে থামিয়ে সে বাইরে গেল। প্রায় দু' মিনিট ধরে আমরা শুনতে পেলাম সে কুকুরটাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, 'সোনা কুকুরছানা! বেচাবা কুকুরের ছানা!'

''ভন ষ্টেনবার্গ মুচকি হেসে বলল, 'আমাদেয় নিকোলাই আনাস্তায়েভিচ নাটক করতে ভালবাসেন।' একটু থেমে বলল, 'তিনি খুব ভালমানুষ!'

ব্যারাক-বাড়িতে ফিরে এসে বাস্তুকার আমাদের গ্লাসে মদ ভর্তি করে হেসে নিজের বুক চাপড়ে বলতে লাগল ঃ

''অতএব আমার আক্রমণ সফল হল না। আমার করার কিছুই ছিল না; মনের পাপ চিন্তাগুলোকে ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখে নিজের পরাজয়কে মেনে নিলাম এবং মন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিলাম। উপরন্তু কিটেনের কণ্ঠস্বর, সন্ধ্যার বাতাস আর শান্ত পরিবেশের প্রভাবে ধীরে ধীরে আমার মেজাজটাও শান্ত ও কাব্যময় হয়ে উঠল। মনে পড়ে, খোলা জানালার ধারে হাতল-চেয়ারে বসে গাছপালা ও অন্ধকার আকাশের দিকেই তাকিয়েছিলাম। বাবলা ও লেবু গাছের রেখা-চিত্রগুলি ঠিক আট বছর আগেকার মতই আছে; সেই সেকালে আমার ছেলেবেলাকার মতই দূরে কোথাও একটা বেসুরো পিয়ানো বাজছে; সাধারণ মানুষরা আগেকার মতই পথের এদিক-ওদিক বেড়াচ্ছে, কিন্তু মানুষগুলি এক নয়। আমি নই, আমার বন্ধুরা নয়, আমার আপন জনরাও নয়, রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছে উচ্চ বিদ্যালয়ের অপরিচিত ছেলেরা আর অপরিচিত মেয়েরা। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিটেনকে আমার পরিচিত লোকজনদের কথা জিজ্ঞাসা করলে পাঁচ পাঁচবার একই জবাব পেলাম 'মারা গেছে', আর তখন আমার মনের দুঃখ কোন ভাল মানুষের শেষকৃত্যে হাজির মানুষের অভিজ্ঞতারই রূপ নিল। জানালার পাশে বসে ভ্রমণরত জনতার দিকে তাকিয়ে এবং একটা পিয়ানোর টিং-টাং শনে আমি যেন নিজের চোখে জীবনে এই প্রথম

দেখলাম—একটা প্রজন্ম কত তাড়াতাড়ি আর এক প্রজন্মের স্থানটা দখল করে এবং একটা মানুষের জীবনে মাত্র সাত-আটটি বছরের অর্থ কত মারাত্মক হতে পারে!

''কিটেন টেবিলের উপর একটা 'সতার্নেস'-এর বোতল এনে রাখল। আমি এক পাত্র পান করে একটু ধাতস্থ হয়ে আবার এটা-ওটা নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা শুরু করলাম। কিটেন মন দিয়ে শুনল আর আগের মতই আমার ও আমার মনের প্রশংসা করতে লাগল। সময় বয়ে যায়। আকাশটা এত অন্ধকার হয়ে গেছে যে বাবলা ও লেবুগাছের রেখা-চিত্রগুলি মিলিয়ে গেছে। মানুষজনরা পথে হাঁটছে না, পিয়ানোটা নীরব হয়ে গেছে, শোনা যাচ্ছে শুধু সাগরের মৃদু গর্জন।

''যুবকরা সেইরকমই আছে। একটি যুবকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর, তাকে নিয়ে হৈচৈ কর, তাকে মদ খাইয়ে তুষ্ট কর, তাকে বুঝতে দাও যে তাকে তোমার ভাল লেগেছে, তাহলেই সে আরো কিছুক্ষণ তোমার সঙ্গে কাটাবে, সে ভুলে যাবে যে তার যাবার সময় হয়ে গেছে, সে কথার পর কথা বলেই যাবে...তার গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রীর চোখ ঢুলু ঢুলু হয়ে আসবে, তাদের শোবার সময় হয়ে যাবে, তথাপি সে বসে বসে কথাই বলে যাবে। আমিও একই আছি। এক ফাঁকে ঘড়িটা দেখলাম ঃ সাড়ে দশটা বাজে। আমি বিদায় নিতে চাইলাম।

''কিটেন বলল, 'পথের নামে আর এক পাত্র খাও।''

''পথের নামে আর এক পাত্র খেলাম, আবার শুরু হল কথার পর কথা, ফেরাব কথা ভুলে আবার বসে গেলাম। কিন্তু তখনই কানে এল পুরুষের কণ্ঠ, পায়ের শব্দ আর ঘোড়ার নালের আওয়াজ। জানালার পাশ দিয়ে কারা যেন হেঁটে গেল, দরজার পাশে থামল।

''কিটেন বলল, 'ঐ বুঝি আমার স্বামী এল...'

দরজা খোলার শব্দ হল, হলঘরের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পেলাম, দুটি লোক খাবার ঘরের দরজার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল ঃ একজনের মাথায় খড়ের টুপি, হৃষ্ট-পুষ্ট শরীর, মাথাভর্তি কালো চুল, বাঁকা নাক ; অপরজন সৈনিকের পোশাকপরা যুবক অফিসার। দরজার পাশ দিয়ে যেতে যেতে তারা এক নজর কিটেনকে ও আমাকে দেখল। বুঝতে পারলাম, দু'জনই নেশা করেছে।

'মেয়েটা তোমাকে একগাদা মিথ্যে কথা বলল আর তুমিও তাই বিশ্বাস করলে!' মুহূর্তকাল পরে জোরালো নাকি সুরের গলা ভেসে এল।

''হাসতে হাসতে আর কাশতে কাশতে অপরজন, স্পষ্টতই অফিসারটি বলল, 'তুমি রেগে গেছ জুপিটার ; তার মানে, তুমিই ভুল করেছ। শোন, আমি কি তোমাদের সঙ্গে রাতটা কাটাতে পারি? ঠিক করে বল, আমি তোমাদের কোন অসুবিধায় ফেলতে চাই না। থাকা যাবে কি?'

'এটা আবার কি রকম প্রশ্ন? থাকা যাবে মানে, তোমাকে থাকতে

হবেই। তোমার কি চাই, বীয়ার না মদ?'

''তারা বসে ছিল দুটো ঘর পরে, কথা বলছিল জোরে জোরে, কিটেন বা তার অতিথিকে নিয়ে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু স্বামী ফিরে আসার পর থেকেই কিটেনের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। প্রথমে সে লাল হয়ে উঠল, তারপর তার মুখে দেখা দিল একটা ভীরু, অপরাধের ভাব; সে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল; মনে হল, তার স্বামী আমাকে দেখে ফেলায় সে লজ্জা পেয়েছে আর তাই চাইছে যে আমি সেখান থেকে চলে যাই।

''আমি বিদায় নিলাম। কিটেন বারান্দা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিল। তার ভীরু, বিষণ্ন হাসি, তার স্নেহসিক্ত দুটি আনত চোখ আমার আজও মনে পড়ে। করমর্দন করে সে বলেছিল :

'আর হয়তো আমাদের দু'জনের দেখা হবে না...ঈশ্বব তোমার সর্ববিধ কল্যাণ করুন। ধন্যবাদ!'

''একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়ল না। বিদায় জানাবার সময় তার হাতে একটা মোমবাতি ছিল; কতকগুলি উজ্জ্বল আলোর ছোপ তার মুখের উপর নাচতে লাগল, বুঝি তার বিষণ্ন হাসিটাকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্যই। মনে পড়ল আগেকার কিটেনকে, যাকে আমি বিড়ালের মতই আদর করতে চাইতাম, তারপর একদৃষ্টিতে তাকালাম বর্তমানের কিটেনের দিকে। যে কারণেই হোক তার কথাগুলি মনে পড়ে গেল, 'মানুষকে তো ভাগ্য মানতেই হবে; আবার মনটা খারাপ হয়ে গেল। সুখী ও নির্বিকার হলেও আমি অনুমান করেছিলাম আর বিবেকও আমার কানে কানে বলে দিয়েছিল, আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে একটি ভদ্র, সদয় ও প্রেমময়, কিন্তু যন্ত্রণাদীর্ণ মানুষ...

''মাথাটা নুইয়ে আমি ফটকের দিকে পা বাড়ালাম। অন্ধকার হয়ে এসেছে। দক্ষিণ দেশে জুলাই মাসে সন্ধ্যা বড় তাড়াতাড়ি আসে, বাতাসে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে অতি দ্রুত। দশটা বাজলেই এত অন্ধকার হয়ে যায় যে কিছুই দেখা যায় না। ফটক পর্যন্ত যেতেই আমাকে প্রায় দুই ডজন দেশলাই পোড়াতে হল।

''ফটক থেকে বেরিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'কোচোয়ান!' কেউ সাড়া দিল না...'কোচোয়ান!' আবার ডাকলাম, 'ওখানে কে আছ—কোচোয়ান!'

''কিন্তু না কোচোয়ান, না গাড়ি, কিছুই দেখা গেল না। কবরের নিস্তব্ধতা। কেবল শুনতে পাচ্ছি সমুদ্র যেন ঘুমের ঘোরে কি বলে চলেছে, আর 'সতারনেস'-এর নেশায় আমার বুকের ভিতরটা টিপ্‌-টিপ্ করছে। আকাশের দিকে তাকালাম, একটা তারাও চোখে পড়ল না। যে কারণেই হোক, বোকার মত হেসে দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার ইতস্তত সুরে হাঁক দিলাম—'কোচোয়ান!'

''প্রতিধ্বনি'' ফিরে এল '—য়ান!'

''এই অন্ধকারে মাঠের ভিতর দিয়ে চার ভার্স্ট পথ হেঁটে যাওয়া মোটেই সুখকর নয়। অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম, কোচোয়ানকে ডাকলাম, তারপর

কোন কিছু না ভেবেচিন্তেই কুঞ্জবনের দিকে ফিরে গেলাম। সেখানে ভীষণ অন্ধকার। বাড়িগুলির জানালা থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে এখানে-ওখানে লাল আলোর ঝিলিক এসে পড়েছে। আমার পায়ের শব্দে এবং গ্রীষ্মাবাসে যাবার পথে আমার হাতের দেশলাইয়ের আলোতে বিরক্ত হয়ে একটা কাক পাতার সড়-সড় শব্দ তুলে এ-গাছ থেকে ও-গাছে উড়ে গেল। আমি রেগে গেলাম, লজ্জা পেলাম ; রাগ হল হাঁটিতে হচ্ছে বলে, আর লজ্জা পেলাম একটা বিদ্যালয়ের ছাত্রের মত কিটেনের সঙ্গে বক্ বক্ করে সময় নষ্ট করেছি বলে।

পথ খুঁজে খুঁজে গ্রীষ্মাবাসে ফিরে গেলাম, বেঞ্চিটা পেয়ে তাতেই বসে পড়লাম। অনেক নীচে, দুর্ভেদ্য অন্ধকারের ওপারে সমুদ্র সক্রোধে গর্জন করছে। মনে পড়ছে, একজন অন্ধ মানুষের মত সমুদ্র, আকাশ, এমন কি যে গ্রীষ্মাবাসে বসে আছি তাকেও চিনতে না পেরে আমি কল্পনা করতে শুরু করে দিলাম, সারা পৃথিবীতে আছে কেবলমাত্র আমার মদে-ডুবুডুবু মাথার মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো চিন্তাভাবনাগুলি আর নীচে কোথাও একটানা গর্জনমুখর এক অদৃশ্য শক্তি। তারপর ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে আমি কল্পনা করতে শুরু করলাম, আমার চিন্তাই সেই শব্দের জনক—সমুদ্র নয়, এবং একমাত্র আমাকে নিয়েই গোটা জগৎ গড়ে উঠেছে। আর এইভাবে গোটা জগৎকে নিজের মধ্যে কেন্দ্রায়িত করে আমি ভুলে গেলাম কোচোয়ানের কথা, শহরের কথা, কিটেনের কথা আর নিজেকে সমর্পণ করে দিলাম আমার একান্ত প্রিয় এক অনুভূতির কাছে। সে অনুভূতি এক ভয়ংকর নির্জনতার, যখন মনে হয় এই অন্ধকার, নিরাকার বিশ্বে বাস করছ একমাত্র তুমি। এমন এক উদ্ধত, দানবিক অনুভূতি যার নাগাল একমাত্র রুশরাই পেয়ে থাকে—যাদের চিন্তা ও অনুভূতি রাশিয়ার প্রান্তর, অরণ্যানি আর তুষারস্তূপের দূরবিস্তার, সীমাহীন ও কঠোর। আমি যদি শিল্পী হতাম তাহলে অবশ্যই আঁকতাম একজন রুশের মুখের ছবি, যখন সে নিশ্চল হয়ে বসে থাকে আর দুই পা মুড়ে মাথাটাকে হাতের উপর রেখে সেই মেজাজের মধ্যে ডুবে যায়...আর সেই সঙ্গে ডুবে যায় জীবনের উদ্দেশ্যহীনতার, মৃত্যুর, কবরের অন্ধকারের চিন্তার মধ্যে। —সে চিন্তার এক কানাকড়িও মূল্য নেই, কিন্তু তার যে প্রকাশ মুখের উপর ফুটে ওঠে তা অবশ্যই সুন্দর...

''আমি যখন বসে বসে ঢুলছিলাম, উঠব কিনা স্থির করতে পারছিলাম না—বেশ আরামে ও শান্তিতেই ছিলাম—হঠাৎ সমুদ্রের একটানা, একঘেয়ে আওয়াজের ভিতর থেকে কিছু শব্দ কানে এসে আমার মনোযোগকে আকর্ষণ করল...কে যেন পথ ধরে দ্রুত হাঁটিছে। গ্রীষ্মাবাসের কাছে এসে থেমে গেল, ছোট মেয়ের মত নাকে কেঁদে ক্রন্দনরত শিশুর গলায় বলল ঃ

''হে ঈশ্বর, কবে এ সবের অবসান হবে ? হে প্রভু !''

''কণ্ঠস্বর ও কান্না শুনে মনে হল মেয়েটির বয়স দশ কি বারো বছর হবে। সসংকোচে পা ফেলে সে গ্রীষ্মাবাসে ঢুকল, বসে পড়ল, তারপর প্রার্থনা বা নালিশ জানাতে শুরু করল..

''কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'প্রভু, এ যে অসহ্য। এ তো ধৈর্য ধরে সহ্য

করা যায় না! আমি সব মেনে নিয়েছি, কিছুই বলি না, কিন্তু দয়া করে বুঝতে চেষ্টা কর যে আমি তো বাঁচতেও চাই...হে ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর!'

''এই ভাবেই চলল বেশ কিছুক্ষণ। মেয়েটিব দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা হল। পাছে সে ভয় পায়, তাই প্রথমে জোরে নিঃশ্বাস ফেললাম, গলা খাঁকারি দিলাম, তারপর সন্তর্পণে একটা দেশলাই জ্বালালাম...অন্ধকারের মধ্যে একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল; ক্রন্দনরত মেয়েটির মুখ আলোকিত হল। সে কিটেন...''

''অবাক! অবাক!'' ভন স্তেনবার্গ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ''অন্ধকার রাত, সমুদ্রের ডাক, মেয়েটির যন্ত্রণা. পুরুষটির মনে বিপুল বিশ্বে স্বীয় নির্জনতার অনুভূতি...ঈশ্বরই জানেন এ সব কি! আমাদের তো দরকার কেবল ছুরি হাতে সার্কাসিয়ানের দল।''

''আমি তোমাদের বলছি একটা সত্য গল্প, রূপকথা নয়।''

''সত্য হলেই বা কি...এর কোন শেষ নেই, আব এ তো পুরনো গল্প...''

''ঠাট্টা করার আগে একটু সবুর কর, আমাকে শেষ করতে দাও!'' রাগের ভঙ্গীতে আনানিয়েভ বলল। ''দয়া করে কথার মাঝখানে বাধা দিও না! আমি ডাক্তারকে বলছি, তোমাকে নয়...যাই হোক, আমাকে দেখে কিটেন অবাক হল না, ভয়ও পেল না, যেন সে ধরেই নিয়েছিল গ্রীষ্মাবাসে আমাকে দেখতে পাবে। সে আক্ষেপের মত শ্বাস টানছিল; তার শরীর জ্বরাক্রান্ত রোগীর মত কাঁপছিল; তার অশ্রুসিক্ত মুখ এখন আর আগের মত বুদ্ধিদীপ্ত, আনত ও ক্লান্ত নয়, এ যেন আরেকটা মুখ—আজও পর্যন্ত সে মুখটাকে আমি বুঝতে পারি নি। সে মুখে ছিল না বেদনা, বা অস্বস্তি, বা কামনার কোন প্রকাশ, এমন কিছুই ছিল না যা প্রকাশ পেয়েছিল তার কথায় বা চোখের জলে...আমি স্বীকার করছি, হয় তো আমি বুঝতে পারি নি বলেই আমার কাছে সেটা অর্থহীন মাতলামি বলেই মনে হয়েছিল।

''একটি ক্রন্দনরত শিশুর গলায় কিটেন বলেছিল, 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না...আমার সে শক্তি নেই নিকোলাই আলাস্তায়েভিচ! আমাকে ক্ষমা কর নিকোলাই আলাস্তায়েভিচ...আমি এ ভাবে বেঁচে থাকতে পারি না...আমি শহরে মার কাছে চলে যাব...আমাকে সেখানে নিয়ে চল...ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে সেখানে নিয়ে চল।''

''মেয়েমানুষের কান্না শুনলে আমি কোন দিনই কথা বলতে পারি না, শান্ত থাকতে পারি না। আমার মেজাজ বিগড়ে গেল, তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায় কিছু বাজে কথা বলে ফেললাম।

''উঠে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড আক্ষেপের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ধরে (তার হাত ও আস্তিন তখন চোখের জলে ভিজে গেছে) কিটেন কঠিন কণ্ঠে বলল, 'না, না, আমি আমার মার কাছেই যাব। ক্ষমা কর নিকোলাই আনাস্তায়েভিচ, আমি যাচ্ছি...আমি আর সহ্য করতে পারছি না...''

আমি বললাম, "কিন্তু কিটেন, এখানে তো একটা গাড়িও নেই। তুমি কিসে চড়ে যাবে?"

"না থাকে না থাকুক, আমি হেঁটে যাব...বেশী দূর তো নয়। কিন্তু আমি আর সহ্য করতে পারছি না..."

আমি বিব্রত বোধ করলাম ঃ কিন্তু অভিভূত হলাম না। কিটেনের চোখের জল, তার কাঁপুনি, তার মুখের অর্থহীন ভাব সবই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল ফরাসী কিংবা উইক্রেনীয় শস্তা উচ্ছ্বাসপূর্ণ নাটকের কথা যেখানে প্রতিটি শস্তা, ফাঁকা দুঃখকে গ্যালন-গ্যালন জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। আমি তাকে বুঝতে পারি নি এবং বুঝতে যে পারি নি সেটা আমি জানতাম; আমার চুপ করে থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু কোন কারণে হয় তো আমার নীরবতাকে বুদ্ধিহীনতা বলে ধরে নেওয়া হতে পারে, তাই আমি ভেবেছিলাম মার কাছে না গিয়ে বাড়িতে থাকাই যে তার উচিত সেটা তাকে বোঝানো দরকার। কেউ তাকে কাঁদতে দেখছে এটা লোকে পছন্দ করে না। দেশলাইয়ের পর দেশলাই জ্বালিয়ে আমি বাক্সটাকেই খালি করে ফেললাম। আজও আমি বুঝতে পারি না কেন সেদিন আমি এই নির্মম আলো জ্বালানোটাকেই এত দরকারী ভেবেছিলাম। ঠাণ্ডা মানুষরা অনেক সময়ই অন্যের প্রতি আচরণে কুৎসিত, এমন কি বোকার মত কাজ করে ফেলে।

"শেষ পর্যন্ত কিটেন আমার হাতে হাত রাখল, আর আমরা পথে নামলাম। ফটক পার হয়ে ডাইনে ঘুরে নরম ধূলোর রাস্তায় দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলাম। ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেলে আমি বুড়ো ওক গাছের রেখা-চিত্র আর লেবু গাছের রেখা-চিত্রের পার্থক্যটাও ধরতে পারলাম। নীচু ঝোপ-ঝাড়গুলোকে মাটিতে বসে-থাকা মানুষের মত দেখাচ্ছে। সব কিছুতেই কেমন যেন একটা গা-ছম্‌ছম্‌-করা ভাব। বাঁকা চোখে একবার উপকূলের দিকে তাকালাম; সমুদ্রের গর্জন আর সমতলের নিস্তব্ধতা আমার কল্পনাকে ভয়াতুর করে তুলল। কিটেন নীরব। সে তখনও কাঁপছে। আধ ভার্স্ট পথ পার হবার আগেই হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তার হাঁপ ধরল। আমিও নীরব।

"কোয়ারেনটিন থেকে এক মাইল দূরে খুব লম্বা চিমনিওয়ালা একটা চারতলা বাড়ি আছে। সেটা একসময় বাষ্পচালিত ময়দার কল ছিল। বাড়িটা পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। দিনের বেলায় সমুদ্র এবং সমতল দু'দিক থেকেই দেখা যায়। যেহেতু সেটা পরিত্যক্ত, সেখানে কেউ থাকে না, তার মধ্যে একটি প্রতিধ্বনি শোনা যায় এবং পথিকদের পায়ের শব্দ ও কণ্ঠস্বর স্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনিত হয়, তাই সেটাকে রহস্যজনক মনে করা হয়। কল্পনা কর, সেই অন্ধকার রাতে স্বামীর বাড়ি থেকে পালিয়ে-আসা একটি নারীর হাত ধরে আমি হাজির হয়েছি একটা উঁচু পুরনো বাড়ির কাছে যার ভিতরে প্রতিধ্বনিত হয় আমার পায়ের প্রতিটি শব্দ, যে এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে শতেক কালো চোখ মেলে। একটি স্বাভাবিক যুবক এই

পরিস্থিতিতে অলৌকিকের ভয়েই মূর্ছা যেত, কিন্তু কালো কালো জানালাগুলির দিকে তাকিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, 'এ সবই খুব আকর্ষণীয়, কিন্তু এমন দিন আসবে যখন এই বাড়ির, শোকমগ্না কিটেনের, কিম্বা আমি ও আমার একটা ধূলিকণাও থাকবে না...সবই অর্থহীন, অসার...

''আমরা যখন কলটার পাশাপাশি পৌঁচেছি তখন কিটেন হঠাৎ থেমে গেল, হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে কথা বলতে শুরু করল, কিন্তু তার নিজের স্বরে, একটি ছোট মেয়ের স্বরে নয়।

'নিকোলাই আনাস্তাসিয়েভিচ, আমি জানি ও সবই তোমার কাছে বিস্ময়কর মনে হবে। কিন্তু আমি ভয়ংকর দুঃখী! আমি যে কত দুঃখী তা তুমি কল্পনাও করতে পার না! কল্পনা করা সম্ভব নয়। সে কথা তোমাকে বলব না, কারণ বলাও অসম্ভব...এ কী জীবন, এ কী জীবন...

''কিটেন দাঁড়িয়ে পড়ল, দাঁতে দাঁত চেপে এমন ভাবে আর্তনাদ করে উঠল যেন যন্ত্রণায় যাতে কেঁদে না ওঠে তার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করছে।

'এ কী জীবন!' আতংকে সেই ঈষৎ ইউক্রেনীয় টানে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল যেটা, বিশেষ করে নারীর ক্ষেত্রে, আবেগপূর্ণ কথায় একটা সুরের মাত্রা যোগ করে। 'একী জীবন! হে আমার ঈশ্বর! এ সবের কী অর্থ হয়! হে আমার ঈশ্বর!'

''বুঝিবা নিজের জীবনের রহস্যকে উন্মোচনের আশায়ই সে হতবুদ্ধি হয়ে দুই কাঁধে ঝাঁকি দিল, মাথা নাড়তে নাড়তে দুই হাত উর্ধ্বে তুলে ধরল। কথা বলছে গানের মত করে, হাত-পা নাড়ছে সুন্দর, সুললিত ছন্দে; সে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল এক বিখ্যাত ইউক্রেনীয় অভিনেত্রীকে।

''দুই হাত মোচড়াতে মোচড়াতে সে বলতে লাগল, 'প্রভু, আমি যেন এক গর্তের জীব! মানুষ যে ভাবে বেচে থাকে সেই রকম আনন্দে যদি একটা মুহূর্তও বাঁচতে পারতাম! হে আমার ঈশ্বর! আমি এতই নীচে নেমে গেছি যে রাতের অন্ধকারে স্বামীকে ছেড়ে একটি অপরিচিত লোকের সঙ্গে চলে যাচ্ছি নোংরা মেয়েমানুষের মত। এর পরেও আমার আর কী ভাল হতে পারে?'

''তার চলন-ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরের প্রশংসা করেও স্বামীর সঙ্গে যে তার সদ্ভাব নেই তাতে যেন আমি হঠাৎই খুশি হয়ে উঠলাম। 'তার সঙ্গে একটা ব্যাপার-স্যাপার ঘটাতে পারলে বেশ ভালই হয়' এই চিন্তাটাই আমার মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল, আর এই অকরুণ চিন্তা আমার মাথার মধ্যে একেবারে চেপে বসল, সারা পথ আমাকে ছাড়ল না, ক্রমেই আমার দিকে তাকিয়ে যেন বেশী করে মুচকি হাসতে লাগল।...

''ময়দার কল থেকে দেড় ভার্স্ট পথ হাঁটার পরে কবরখানার পাশ দিয়ে আমাদের বাঁদিকে মোড় নিতে হবে। মোড়ের মাথায় কবরখানার কোণের

কাছে একটা পাথরের বায়ু-কল ছিল, আর তার পাশে একটা ছোট ঘর যেখানে কলের মালিক বাস করত। কল এবং ঘরটা ছাড়িয়ে বাঁদিকে মোড় নিয়ে আমরা কবরখানার ফটক পর্যন্ত গেছি, ঠিক তখনই কিটেন থেমে গিয়ে বলল ঃ

'আমি ফিরে যাচ্ছি নিকোলাই আনাস্তাসিয়েভিচ। তুমি এগিয়ে যাও, কিন্তু আমি আমার পথে ফিরে যাব। আমি ভয় পাই নি।'

''কিন্তু আমি ভয় পেলাম। সে কি? আমরা একসঙ্গে এসেছি, একসঙ্গেই যাব...''

'অকারণেই আমি এত বিচলিত হয়েছিলাম। এ সব কিছুরই কারণটা তুচ্ছ। তোমার কথা শুনে অতীতের অনেক কথা আমার মনে পড়ে গেল এবং আমার মনে নানান চিন্তার ঢেউ উঠল আমি দুঃখ পেলাম, ইচ্ছা হল কাঁদি, কিন্তু সেই অফিসারকে জড়িয়ে স্বামী আমার নামে কুৎসিত ইঙ্গিত করল, আমি সেটা সহ্য করতে পারলাম না...আমি মার কাছে শহরে কেন যাব? তাতে কি আমি সুখের দেখা পাব? আমাকে ফিরে যেতেই হবে...কিন্তু...কিন্তু...''

''আমার মনে পড়ল, কবরখানার ফটকে একটা বাণী লেখা ছিল ঃ 'সেই দিনটি আগতপ্রায় যখন মৃতরা ঈশ্বরপুত্রের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে।' আমি খুব ভাল করেই জানতাম যে আগে হোক আর পরে হোক সেই সময় একদিন আসবে যখন আমি, কিটেন ও তার স্বামী এবং সাদা পোশাক-পরা অফিসারটি, সকলকেই এই প্রাচীরের ওপারে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়তে হবে; আমি আরও জানতাম, একটি দুঃখী, অপমানিত মানবী আমার পাশে পাশেই হাঁটছে—এ সবই আমি ভাল করেই জানতাম, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা অপ্রিয় ভয়ও আমাকে চেপে ধরল ঃ কিটেন ফিরে যেতে পারে এবং তাকে আমার সব কথা বলা নাও হতে পারে। জীবনে আর কখনও আমার মাথার মধ্যে একটি মহত্তম চিন্তার সঙ্গে একটি নীচতম পাশবিক চিন্তার এমন সংঘাত ঘটে নি যেমনটি ঘটেছিল সেই রাতে —সে বড় ভয়ংকর!

''কবরখানার অদূরেই আমরা একটা গাড়ি পেয়ে গেলাম। কিটেনের মা থাকে বল্‌শয়া স্ট্রীটে; সেখানে পৌঁছেই আমরা গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। কিটেন সারা পথ চুপচাপ; আমি তার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম আর মনে মনে নিজেকেই প্রশ্ন করছিলাম, 'তুমি কেন শুরু করছ না? এই তো সময়!' যে হোটেলে আমি উঠেছিলাম সেখান থেকে বিশ পা দূরে একটা আলোক-স্তম্ভের পাশে থেমে গিয়ে কিটেন কান্নায় ভেঙে পড়ল।

''কাঁদতে কাঁদতে, হাসতে হাসতে, দুটি অশ্রুভেজা চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'নিকোলাই আনাস্তায়েভিচ! তোমার সহানুভূতির কথা আমি কোন দিন ভুলব না। ...তুমি কত ভাল! তোমরা সকলেই কত ভাল। সৎ, দয়ালু হৃদয়, আন্তরিক, বুদ্ধিমান...ওঃ, কত ভাল!''

''সে আমাকে দেখেছে এমন একজন বুদ্ধিজীবী হিসাবে যে সব বিষয়েই অনেক এগিয়ে গেছে ; তার মনে যে স্নেহ ও আনন্দ আমি জাগাতে পেরেছি তা ছাড়াও তার মনে একটা দুঃখও ছিল যে এমন মানুষ কদাচিৎ দেখেছে, আর তাদেরই একজনের স্ত্রী হবার সুখ ভগবান তাকে দেয় নি। সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'ওঃ, কী যে ভাল!' তার মুখের সেই শিশুসুলভ খুশি, তার চোখের জল, ভীরু হাসি, তার মস্তকাবরণী ও তার নীচেকার নরম চুলের রাশি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল সেদিনের সেই কিটেনকে যাকে আমি বিড়ালছানার মতই আদর করতে চাইতাম...

''আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না, তার চুলে, কাঁধে, বাহুতে হাত বুলিয়ে আদর করতে শুরু করলাম...

''অস্পষ্ট স্বরে শুধালাম, 'কিটেন, তুমি কি চাও? তুমি কি চাও তোমাকে নিয়ে আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে চলে যাই? আমি তোমাকে এই অতল গহ্বর থেকে তুলে দূরে নিয়ে যাব ; তোমাকে সুখে রাখব। আমি তোমাকে ভালবাসি।... চল আমরা যাই, যাবে কি প্রিয়ে? হ্যাঁ? ঠিক আছে?'

''কিটেনের মুখ বিস্ময়ে রক্তিম। বাতির কাছ থেকে কয়েক পা সরে গিয়ে বিমূঢ়, বিস্ফারিত চোখে সে আমার দিকে তাকাল। তার হাতটা চেপে ধরে তার মুখে, গলায়, কাঁধে চুমোর পর চুমো খেলাম, আর শপথ ও প্রতিশ্রুতির ঝড় বইয়ে দিলাম মুখে। ভালবাসাবাসির ব্যাপারে শপথ ও প্রতিশ্রুতি বুঝি একটা দৈহিক প্রয়োজন। তাদের না হলে যেন চলেই না। অনেক সময়ই তুমি জান যে মিথ্যে বলছ, প্রতিশ্রুতিগুলো নিষ্প্রয়োজন, তবু তুমি শপথ করবে, প্রতিশ্রুতি দেবে। বিমূঢ় কিটেন ক্রমেই পিছনে সরতে লাগল, আর বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকাল...

''দুই হাতে আমাকে ঠেলে দিয়ে বিড় বিড় করে বলল, 'না! না!'

''আমি তাকে কঠিন আলিঙ্গনে বাঁধলাম। হঠাৎ সে উন্মাদের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, তার মুখে দেখা দিল সেই অর্থহীন, ফাঁকা ভাব যা তার মুখে দেখেছিলাম গ্রীষ্মাবাসে দেশলাই জ্বালাতে জ্বালাতে...তার সম্মতি না নিয়ে তাকে কোন কথা বলতে না দিয়ে আমি তাকে জোর করে টেনে নিয়ে গেলাম হোটেলে আমার ঘরে...সে তখন মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, হাঁটতেও পারছে না, আমি তাকে দুই হাতে তুলে প্রায় বয়ে নিয়ে গেলাম...মনে পড়ছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় মাথায় লাল টুপির পট্টি বাঁধা একটা লোক অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে কিটেনকে দেখে মাথাটা নুইয়েছিল...''

মুখ লাল করে আনানিয়েভ চুপ করল। কোন কথা না বলে টেবিলের কাছেই পায়চারি করতে লাগল বিরক্তিভরে। মাথার পিছনটা চুলকাল, এবং বিব্রতভাবে বারকয়েক কাঁধও কাঁধের হাড় ঘসল। অতীতকে স্মরণ করে সে লজ্জা ও বেদনা বোধ করছে, নিজের সঙ্গেই তার একটা লড়াই চলেছে।

একগ্লাস মদ এক চুমুকে শেষ করে মাথাটা নাড়তে নাড়তে সে বলে

উঠল, "কী লজ্জা! লোকে বলে, মেয়েদের রোগ সম্পর্কে যে কোন প্রাথমিক বক্তৃতায় ডাক্তারী ছাত্রদের পরামর্শ দেওয়া হয়, কোন স্ত্রী-রোগীর পোশাক ছাড়াবার বা তাকে স্পর্শ করার আগে তারা যেন মনে রাখে যে তাদের প্রত্যেকেরই মা আছে, বোন আছে, প্রেমিকা আছে...এই পরামর্শ কেবলমাত্র ডাক্তারদের নয়, জীবনে যারাই কোন না কোন ভাবে নারীদের সম্পর্কে এসেছে তাদের সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এখন, আমার যখন স্ত্রী আছে, কন্যা আছে, আমার কাছে তো এ পরামর্শের অনেক দাম। আমি সেটা ভাল করেই বুঝি। যাই হোক, তার পরে কি হল তা শোন...আমার গৃহকর্ত্রী হবার পর থেকেই কিটেনের দৃষ্টিভঙ্গীটাই পাল্টে গেল। তার উপর, সে গভীরভাবে আমার প্রেমে পড়ে গেল। আমার কাছে যা একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র, তার কাছে সেটাই হয়ে উঠল জীবনের উন্নতির একটা ধাপ। মনে পড়ছে, আমি মনে করতাম সে পাগল হয়ে গেছে। জীবনে এই প্রথম সুখের স্বাদ পেয়ে তার যেন পাঁচ বছর বয়স কমে গেল, মুখে ফুটে উঠল নতুন উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস, আনন্দে অস্থির হয়ে উঠল, এই হাসছে, এই কাঁদছে, আর সব সময় স্বপ্নের ঘোরে বলছে—কালই আমরা ককেসাস যাবার জন্য রওনা হব, সেখান থেকে হেমন্তকালে যাব সেন্ট পিতার্সবার্গ, আর তারপর থেকে আমরা বাস করব...

আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, 'আমার স্বামীর জন্য চিন্তা করো না। সে আমাকে বিবাহ-বিচ্ছেদ দিতে বাধ্য। সারা শহর জানে কস্তোভিচ পরিবারের বড় মেয়ের সঙ্গে তার একটা 'এফেয়ার' আছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আমি পীড়াপীড়ি করব, আর তারপরেই আমরা বিয়ে করতে পারব।'

"মেয়েরা যখন প্রেমে পড়ে তখন তারা বিড়ালের মতই খুব তাড়াতাড়ি নতুন লোকদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। আমার ঘরে দেড় ঘন্টা সময় কাটিয়েই কিটেন বেশ ঘরোয়া হয়ে উঠল, আমার জিনিসপত্র নিয়ে এমনভাবে ব্যবহার করতে লাগল যেন সেগুলি তার নিজের। আমার জিনিসপত্র সুট্‌কেসে ভরল, নতুন দামী কোটটা হুকের সঙ্গে না ঝুলিয়ে চেয়ারের উপর ফেলে রাখার জন্য আমাকে বকুনি দিল, ইত্যাদি।

"তার দিকে তাকিয়ে আমি সব শুনলাম, ক্লান্ত ও বিরক্ত বোধ করলাম, আর এ কথা ভেবে আমার রাগ হল যে একটি ভদ্র, সম্মানিত, যন্ত্রণাক্ষুব্ধ নারী এত সহজে মাত্র তিন চার ঘন্টার মধ্যেই প্রথম আগত মানুষটির রক্ষিতা হয়ে গেল। নিজে ভদ্র মানুষ হিসাবে এটা আমার মোটেই ভাল লাগে নি। আর একটা ব্যাপারও আমাকে বিচলিত করে তুলেছে ঃ কিটেনের মত মেয়েরা বড়ই উপর-ভাসা, কোন কিছুকেই তারা গভীরভাবে নেয় না; জীবনটা তাদের কাছে বড় বেশী প্রিয়; একটি মানুষের প্রতি ভালবাসার মত একটা তুচ্ছ ব্যাপারকে তারা সুখের মত, যন্ত্রণার মত, আত্মউন্নয়নের মত স্তরে তুলে ধরতে পারে...এদিকে কামনা পরিতৃপ্ত হবার পরে যে মেয়েকে একদিন আমাকে অনিবার্যভাবেই প্রতারিত করতে হবে তার সঙ্গে এ ভাবে

জড়িয়ে পড়ার জন্য নিজের উপরেই আমার রাগ হতে লাগল...আরও একটা কথা জেনে রাখ, আমার ব্যবহার যত খারাপই হোক, মিথ্যাকে আমি সহ্য করতে পারি না।

''মনে পড়ছে, কিটেন আমার পায়ের নীচে বসে আছে, আমার দুই হাঁটুর উপর মাথা রেখে উজ্জ্বল দুটি চোখ তুলে আমাব দিকে তাকিয়ে আছে।

''কলিয়া, তুমি কি আমাকে ভালবাস? খুব, খুব?''

''আর সে মহাসুখে হেসে উঠল...এ সবই আমার কাছে অতিরিক্ত আবেগ, অসুস্থ মন ও বোকামির লক্ষণ বলে মনে হল; তখন আমার যা মনের অবস্থা তাতে সব কিছুর মধ্যেই আমি 'চিন্তার গভীরতা' খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।

ওকে বললাম, ''কিটেন, তোমার বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত, না হলে তোমার পরিবারের লোকরা তোমাকে না দেখে শহরময় খুঁজতে শুরু করবে। আবার তুমি যদি সকাল হলে তোমার মার কাছে যাও সেটাও তোমার দিক থেকে একটা বাজে কাজ হবে...''

''কিটেন আমার সঙ্গে একমত হল। পবস্পরের কাছে থেকে বিদায় নেবাব সময় আমাদের মধ্যে স্থির হল দুপুরে আমরা শহরেব পার্কে মিলিত হব এবং পরদিন একসঙ্গে পিয়াতিগর্স্ক বওনা হব। তাকে বিদায় দিতে আমিও তার সঙ্গে বাইরে গেলাম। মনে পড়ছে, পথে তাকে আমি কত আন্তরিকতার সঙ্গে কত আদর করেছিলাম। সেই মুহূর্তে এই ভেবে আমি অ...্য দুঃখ বোধ কবেছিলাম—সে আমাকে বিশ্বাস করেছে এত গভীর অনুরাগে, আর তাকে সঙ্গে নিয়ে পিয়াত্তিগর্স্ক যেতে আমি মাত্র নিমরাজী হয়েছি। কিন্তু যখন মনে পড়ল, আমার সুটকেসে মাত্র ছয় শ' রুব্‌ল্ আছে, আর হেমন্তকালে তাকে বিদেয় করাটা এখনকার চাইতে অনেক বেশী কঠিন হবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাব সদ্যজাগ্রত করুণাকে আমি একেবারে চেপে দিলাম।''

কিটেনেব মা যে বাড়িতে থাকত আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম। ঘন্টার দড়িটা টানলাম। দরজার ওপাশে পায়ের শব্দ কানে আসতেই হঠাৎ কিটেনের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল, আকাশের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বারকয়েক ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল যেন আমি একটি শিশু, তাবপর আমার হাতটা ধরে তার ঠোঁটের উপর চেপে ধরল।

'কাল পর্যন্ত!' এই কথা বলে সে ভিতবে ঢুকল।

''আমি উল্টো দিকের ফুটপাথে গিয়ে বাড়িটার দিকে তাকালাম। জানালাগুলো প্রথমে অন্ধকাব ছিল, তারপর একটা নতুন জ্বালানো মোমবাতির ম্লান নীলাভ আলো একটা জানালায় দেখা গেল; ঘবের ভিতরে কয়েকটা ছায়াকে নড়তে দেখলাম।

''ভাবলাম, 'তাকে তো আশা করা যায় না।'

''হোটেলের ঘরে ফিরে পোশাক ছাড়লাম, খানিকটা সতের্নেস পান

করলাম, বিকেলে বাজার থেকে কিনে আনা তাজা মাছের 'কেভিয়ার' খানিকটা খেলাম, একটু দেরী করে বিছানায় গেলাম এবং শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

''সকালে ঘুম ভাঙল মাথার ব্যথা আর বুকের অসুস্থতা নিয়ে। কেমন খারাপ লাগছিল।''

''নিজের এই অস্বস্তিকে বুঝতে নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, 'ব্যাপার কি ? কিসের এত দুশ্চিন্তা আমার ?'

''ধরে নিলাম আমার এই অস্বস্তির কারণ একটা ভয় সে কিটেন হয় তো আজ আবার আসবে, আমাকে চলে যেতে দেবে না, আর আমাকে মিথ্যে কথা বলতে হবে আর নানা রকম ভনিতা করতে হবে। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে, জিনিসপত্র প্যাক করে হোটেল ছেড়ে চলে গেলাম ; কুলিকে বলে গেলাম, আমার মালপত্র যেন সন্ধে সাতটার সময় রেল-স্টেশনে পৌঁছে দেয়। সারাটা দিন এক পরিচিত ডাক্তারের সঙ্গে কাটালাম, আর সন্ধ্যায় শহর ছেড়ে চলে গেলাম। দেখতেই পাচ্ছ যত বড় বড় চিন্তাই করি তাতে আমার এই জঘন্য ও বিশ্বাসঘাতী পলায়নে কোন বাধা ঘটল না...

''যতক্ষণ বন্ধুর সঙ্গে ছিলাম এবং গাড়িতে চেপে স্টেশনে যেতে যে সময়টা কাটল ততক্ষণে খুবই অস্বস্তিতে কাটল। মনে হল, কিটেনের সঙ্গে দেখা হয়ে যে অবাঞ্ছিত দৃশ্যটা ঘটবে সেটাকেই আমি ভয় পাচ্ছিলাম। স্টেশনে পৌঁছে দ্বিতীয় ঘন্টাটা না পড়া পর্যন্ত ইচ্ছা করেই ক্লোক-রুমে কাটালাম। পরে যখন আমার গাড়ির দিকে এগোচ্ছিলাম তখন আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন আপাদমস্তক চোরাই মালে বোঝাই। কী অধৈর্য আর আতংক নিয়ে তৃতীয় ঘন্টাটার অপেক্ষা করছিলাম!''

''শেষ পর্যন্ত তৃতীয় ঘন্টাটা আমাকে উদ্ধার করল, ট্রেন চলতে আরম্ভ করল। কারাগৃহ ও সেনা-ব্যারাক পার হয়ে আমরা খোলা প্রান্তরে পড়লাম, কিন্তু কী আশ্চর্য, আমাব অস্বস্তি কাটল না ; তখনও মনে হতে লাগল, আমি যেন একটা চোর যে বেপরোয়াভাবে পালাতে চেষ্টা করছে। এই অদ্ভুত অনুভূতিটা কিসের ? এ সব ভুলে নিজেকে শান্ত করার জন্য জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। ট্রেনটা চলেছে উপকূল বরাবর। সমুদ্র শান্ত ; বেগুনি রংয়ের আকাশটা সানন্দে ও শান্তভাবে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে ; সূর্যাস্তের মৃদু সোনালী আভা ছড়িয়ে পড়েছে তার বুকে। এখানে-ওখানে জেলেদের নৌকো ও ভেলাগুলি ভাসছে। খেলনার মত পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর শহরটা উঁচু পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে ; সন্ধ্যার কুয়াসা তাকে ঢেকে দিয়েছে। গির্জার সোনালী গম্বুজ, জানালা, সবুজ গাছপালা সব কিছুর উপর ছড়িয়ে পড়েছে অস্তসূর্যের আলো ; গলানো সোনার মত তার উজ্জ্বল রং...সমুদ্র থেকে ভেসে-আসা ভিজে বাতাসে মিশে আছে মাঠের গন্ধ।

''ট্রেনটা দ্রুত ছুটে চলেছে। যাত্রীদের ও গার্ডদের হাসি শুনতে পাচ্ছি। সকলেই খুশিতে আছে, আরামে আছে, কিন্তু আমার দুর্বোধ্য অশান্তিটা

বেড়েই চলেছে...যে কুয়াসা শহরটাকে ঢেকে ফেলেছে তার দিকে তাকালাম ; মনে হল, সেই কুয়াসার মধ্যেই, গির্জা ও বাড়িগুলোর কোথাও অর্থহীন নির্বোধ মুখের একটি নারী আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর একটি ছোট মেয়ের গলায় অথবা কোন ইউক্রেনীয় অভিনেত্রীর মত গানের সুরে আর্ত কণ্ঠে বলছে, 'হে আমার ঈশ্বর, ঈশ্বর আমার!' মনে পড়ল তার সেই গম্ভীর মুখ আর চিন্তাক্লিষ্ট বড় বড় দুটি চোখ যখন গতকাল সে একান্ত আপন জনের মত আমার জন্য ক্রুশ-চিহ্ন এঁকেছিল আর আমিও সেই হাতটার দিকে তাকালাম যেখানে সে চুম্বন এঁকে দিয়েছিল।''

''মাথাটা চুলকে সবিস্ময়ে ভাবলাম, 'আমিও কি প্রেমে পড়েছি?'

''যখন রাত নেমে এল, যাত্রীরা ঘুমিয়ে পড়ল, জেগে রইলাম শুধু আমি ও আমার বিবেক, তখনই আমি উপলব্ধি করলাম সেই সত্যকে যা আমি আগে কখনও বুঝতে পারি নি। কামরার ম্লান আলোয় কিটেনের মূর্তি আমার সামনে এসে দাঁড়াল ; সে আমাকে ছেড়ে যাবে না ; তখনই আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম হত্যার সমতুল এক অপরাধ আমি করেছি। বিবেক আমাকে যন্ত্রণায় বিদ্ধ করতে লাগল। সেই অসহ্য অনুভূতিকে গলা টিপে মেরে ফেলতে আমি নিজেকে বোঝাতে চাইলাম যে এ সবই অর্থহীন অহমিকামাত্র, কিটেন ও আমি দু'জনই পচে মরব, তার দুঃখটা মৃত্যুর সঙ্গে তুলনায় কিছুই না, ইত্যাদি, ইত্যাদি।...শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু ছিল না ; সুতরাং আমার কোন দোষ ছিল না। কিন্তু এসব যুক্তি আমার বিরক্তিকেই বাড়িয়ে তুলল এবং অচিরেই অন্য সব চিন্তার মধ্যে মিলিয়ে গেল। যে হাতে কিটেন চুমো খেয়েছিল সেখানে একটা যন্ত্রণা বোধ করছিলাম...শুয়ে পড়লাম, আবার উঠে বসলাম, স্টেশনে-স্টেশনে ভদকা খেলাম, জোর করে স্যাণ্ডুইচ মুখে দিলাম, নিজেকে বার বার বোঝালাম জীবন অর্থহীন, কিন্তু কিছু কাজে লাগল না। আমার মাথার মধ্যে একটা অদ্ভুত, বলতে পার, হাস্যকর কিছু ঘটে চলল। পরস্পর-বিরোধী সব চিন্তা-ভাবনা এলোমেলোভাবে একে অপরকে ঠেলে উপরে উঠতে চাইছে, সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে, পরস্পরের মধ্যে ঠোকাঠুকি হচ্ছে ; কিন্তু যে আমি মাটির দিকে চোখ রেখে চিন্তা করছি সে কিছুই বুঝতে পারছি না, কিছুই করতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত অবস্থা দাঁড়াল সেই আমি যেন চিন্তার পদ্ধতিটাই ভুলে গেলাম ; আমি যেমন একটা ঘড়ি মেরামত করতে পারি না ঠিক তেমনই যেন আমার মাথাটাকেও ঠিক রাখতে পারছি না। জীবনে এই প্রথম আমি এত কঠোর ও একাগ্রভাবে চিন্তা করলাম, আর এতই বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম যে মনে হল 'আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি!' কেবলমাত্র সংকট-মুহূর্তেই যার মস্তিষ্ক কাজ করে অনেক সময় মাথায় উন্মাদ হয়ে যাবার ধারণা জাগে।

''একটা রাত ও একটা দিন এই যন্ত্রণা ভোগ করলাম, তারপর আরও একটা রাত, এবং ঠিক বুঝতে পারলাম যে আমার চিন্তা আমাকে এতটুকু

সাহায্য করতে পারে নি ; তখন আমার চৈতন্য ফিরে পেলাম, শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম আমি কি ধরনের জীব। বুঝতে পারলাম যে আমার চিন্তার এক কানাকড়িও দাম নেই এবং কিটেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্যন্ত আমি কখনও চিন্তা করতেই শিখি নি, এমন কি গুরুতর চিন্তা কাকে বলে সে সম্পর্কে কোন ধারণাই আমার ছিল না। এখন, যন্ত্রণার পাত্রটি যখন পূর্ণ হল, তখন বুঝতে পারলাম এতদিন আমার কোন প্রত্যয় ছিল না, কোন নির্দিষ্ট নৈতিক বিধান ছিল না, হৃদয় ছিল না, মন ছিল না, মানসিক ও নৈতিক সম্পদ বলতে ছিল কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞের জ্ঞান, খণ্ড খণ্ড জ্ঞান, প্রয়োজনবিহীন স্মৃতি, অন্য মানুষের কিছু চিন্তা-ভাবনা—বাস্ ওই পর্যন্তই ; সব চিন্তা-ভাবনাই ছিল জটিলতাহীন, সরল ও প্রাথমিক, একজন তুর্কী অধিবাসী ইয়াকুতের মতই...আমি যে মিথ্যা বলা পছন্দ করি নি, চুরি করি নি, খুন করি নি এবং সাধারণভাবে কোন গুরুতর ভুল করি নি, সেটা আমার দৃঢ় প্রত্যয়ের গুণে নয়—সে রকম কোন প্রত্যয় আমার ছিলই না—তার একমাত্র কারণ শিশুকাল থেকে শোনা গল্পকথায় আমি আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা ছিলাম, একটা চিরাচরিত নীতিবোধ আমার রক্তে মাংসে মিশে গিয়েছিল, এবং আমার অজ্ঞাতেই তারা আমার জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে যদিও আমি সেগুলিকে মনে করতাম বোকামি...

"বুঝতে পারলাম যে আমি চিন্তাশীল নই, দার্শনিক নই, পুরাতনের প্রতি অনুরাগী একজন পুরাবস্তু-অনুরাগী মাত্র। ঈশ্বর আমাকে দিয়েছিলেন একটি স্বাস্থ্যবান, শক্তিমান কৃশ মস্তিষ্ক ; তাতে উপ্ত ছিল প্রতিভার বীজ। আর কল্পনা কর, আজ সেই মস্তিষ্ক জীবনের ছাব্বিশ বছরে এসে কোন রকম শিক্ষা না পেয়ে শুধুমাত্র নিজের প্রচেষ্টায় বড় হয়েছে, কোন রকম বোঝা তাকে বইতে হয় নি, তাতে সামান্য আলোকপাত করেছে কিছু বাস্তু-কর্মের জ্ঞান। সে বয়সে তরুণ, শারীরগত প্রেবণাতেই কাজ করতে ইচ্ছুক, আর হঠাৎ একান্ত আকস্মিকভাবেই তার মধ্যে বাইরে থেকে নেমে আসে একটি সুন্দর, রসালো চিন্তা—জীবনটা অর্থহীন, কবরের ওপারে সবই অন্ধকার। মন এই সব চিন্তাকে গো-গ্রাসে গিলে খায়, নিজেকে তার হাতে পুরোপুরি সঁপে দেয়, আর বিড়াল যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলা করে মনও তাকে নিয়ে নানাভাবে খেলা শুরু করে। মস্তিষ্কের কোন নিজস্ব শিক্ষা বা পদ্ধতি ছিল না, কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি নেই। নিজের প্রকৃতিদত্ত শক্তিতেই সে এই সর্বগ্রাসী চিন্তার মোকাবিলা করল, এবং মাসখানেকের মধ্যেই সেই মস্তিষ্কের অধিকারী একই পুরনো আলু দিয়ে শতেক রকম সুস্বাদু ব্যাঞ্জন রান্না করে নিজেকে একজন চিন্তাশীল লোক বলে ভেবে বসল...

"আমাদের প্রজন্ম এ পুরাবস্তু প্রীতিকে, এই গম্ভীর চিন্তার খেলাকে বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করিয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ঢুকিয়েছে নিজের শীতলতা, একঘেয়েমি ও একদেশদর্শিতা, এবং আমার মনে হয়, জনসাধারণের মধ্যে গুরুতর চিন্তার প্রতি একটা অভূতপূর্ব

মনোভাব সৃষ্টির প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যেই সাফল্য অর্জন কবতে পেরেছে।

''একটা দুর্ঘটনাকে ধন্যবাদ, আমার অস্বাভাবিকতা ও সার্বিক অজ্ঞানতাকে আমি বুঝতে পারলাম, ধরতেও পাবলাম। আমার স্বাভাবিক চিন্তার সূচনা হল যখন বিবেকের তাড়নায় আমি এন. শহরে ফিরে গেলাম এবং অসংকোচে কিটেনের কাছে আমার অনুতাপের কথা জানিয়ে ছোট ছেলের মত তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম দু'জনে মিলে অনেক কাঁদলাম...

সংক্ষেপে কিটেনের সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাতের বিবরণ দিয়ে আনানিয়েভ চুপ কবল।

বাস্তুকারের কথা শেষ হলে ছাত্রটি টেনে টেনে বলল, ''আচ্—ছা...পৃথিবীতে এ রকম ঘটনাও ঘটে!'

তার মুখ দেখে মনে হল আনানিয়েভের কাহিনী তার মনকে একটুও নাড়া দেয় নি। একটু বিশ্রাম নিয়ে বাস্তুকার যখন সেই একই কাহিনীর পুনবাবৃত্তি শুরু করল তখন ছাত্রটি বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে টেবিল থেকে উঠে পড়ল এবং বিছানার দিকে এগিয়ে গেল।

পোশাক ছাড়তে ছাড়তে বলল, ''আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে সত্যি আপনি একজনকে বোঝাতে পেরেছিলেন।''

''আমি বোঝাতে পেরেছি?'' বাস্তুকাব প্রশ্ন করল। ''প্রিয় বন্ধু, এ রকম কোন দাবী কি আমি করেছি? ঈশ্বর তোমার সহায় হোন! তোমাকে বোঝানো অসম্ভব! কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রণা থেকেই তুমি একটা প্রত্যয়ে উপনীত হতে পাব!...''

রাতেব শার্টটা পরতে পরতে ছাত্রটি বলল, ''কিন্তু বিস্ময়কর যুক্তিটা তো আপনার স্বপক্ষেই আছে! যে চিন্তা-ভাবনাকে আপনি এত অপছন্দ কবেন সেগুলি যুবকদের পক্ষে মারাত্মক, কিন্তু বৃদ্ধদের পক্ষে, আপনাব কথামত, সেগুলি স্বাভাবিক। যেন আসলে এটা সাদা চুলের ব্যাপার...এই বুড়ো বয়সের সুবিধাটা আপনি কোথায় পেলেন? এটা কিসেব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত? সে সব চিন্তা যদি বিষ হয় তো সকলেব পক্ষেই সমানভাবে বিষ।''

চতুরের মত চোখ টিপে বাস্তুকার বলে উঠল, ''না, না, প্রিয় বন্ধু, এ কথা বলো না! প্রথম, বুড়োরা প্রাচীনতা-বিলাসী নয়। তাদের দুঃখবাদ বাইরে থেকে আমদানি করা নয়, হঠাৎ গজিয়ে ওঠাও নয়; সে দুঃখবাদ আসে তাদের মস্তিষ্কের গভীব থেকে যখন তারা হেগেলদের ও কান্টদেব পড়ে শেষ করে, যখন তাদের দুঃখের পাত্র পূর্ণ হয়, যখন তাবা প্রচুব ভুল করে ফেলে, এক কথায়, একেবারে নীচের ধাপ থেকে উপরের ধাপ পর্যন্ত একটা মইয়ের সবটাই বেয়ে ওঠার পরে। তাদের দুঃখবাদের পিছনে থাকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দীর্ঘদিনের দার্শনিক অগ্রগতি। দ্বিতীয়, বৃদ্ধ বয়সেব দুঃখবাদ তোমার ও আমার মত পুরনো পচা জিনিসের বোঝা নয়, এ বোঝা নয়, এ বোঝা 'ওয়েলজ্‌মার্জ', একটা যন্ত্রণার বোঝা; তাদেব বেলায় একটা খৃষ্টীয় ভিত্তি-ভূমি থাকে, কারণ সে দুঃখবাদ জন্ম নেয় মানুষেব প্রতি ভালবাসা

থেকে, মানুষ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা থেকে, সে দুঃখবাদ প্রাচীনতা-বিলাসীদের মধ্যে যে অহংবোধ লক্ষ্য করা যায় তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তোমরা জীবনকে ঘৃণা কর কারণ জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য তোমাদের কাছে লুকনো থাকে আর একমাত্র নিজের মৃত্যুটাকেই তোমরা ভয় কর। কিন্তু যে সত্যিকারের চিন্তাশীল সে কষ্ট পায় কারণ সত্যকে লুকিয়ে রাখা হয় সকলের কাছ থেকে, আর তার ভয় সকল মানুষের জন্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এখান থেকে অনতি দূরেই একজন সরকারী বনরক্ষক থাকে। তার নাম আইভান আলেক্সান্দ্রোভিচ। বড় ভাল বৃদ্ধ মানুষটি। এক সময় কোথায় যেন শিক্ষক ছিল ; একটু লেখালেখির অভ্যাসও ছিল। লোকটা আগে কি করত তা কেউ জানে না, কিন্তু বেশ চালাক-চতুর, আর দর্শনশাস্ত্রের ব্যাপারে বলা যায় যে ও বিষয়টা সে ভালই জানে। সে অনেক পড়াশুনা করেছে এবং এখনও করে। আচ্ছা, কিছুদিন আগে গ্রুজভ অঞ্চলে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ঠিক সেই সময়েই স্লিপার ও রেল-লাইন পাতা হচ্ছিল। কাজটা শক্ত নয়, কিন্তু আইভান আলেক্সান্দ্রোভিচের মত অনভিজ্ঞ লোকের কাছে ব্যাপারটাকে ঠিক যাদুর খেলা বলেই মনে হয়েছিল। একটা স্লিপার পেতে তার উপর রেললাইন বসাতে একজন অভিজ্ঞ কারিগরের এক মিনিটও লাগে না। লোকজনরা বেশ খোশ মেজাজেই ছিল আর কাজও করছিল বেশ জোরতালে। এক ব্যাটা তো ছিল হাতুড়ি চালাতে ভারী ওস্তাদ। আইভান আলেক্সান্দ্রোভিচ অনেকক্ষণ পর্যন্ত মজুরদের কাজ ভাল করে লক্ষ্য করল। দেখে শুনে তার খুব কষ্ট হল। অশ্রুসজল চোখে সে আমাকে বলল, ''বড়ই দুঃখের কথা যে এই বিশিষ্ট লোকগুলিও একদিন মারা যাবে!' এ ধরনের দুঃখবাদ আমি বুঝতে পারি...''

চাদরটা গায়ে জড়িয়ে ছাত্রটি বলল, ''এতে কিছুরই প্রমাণ বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না; এ সবই গরম হাওয়া মাত্র! কেউ কিচ্ছু জানে না আর কথা দিয়ে কিছু বোঝানোও যায় না।''

এবার চাদরের ভিতব থেকে মুখ বের করে মাথাটা একটু তুলে সে ভুরু কুঁচকে তাড়াতাড়ি বলল, ''মানুষের কথা যুক্তিকে বিশ্বাস করতে হলে এবং তাকে চূড়ান্ত তাৎপর্য দিতে হলে আপনাকে খুব সরল হতে হবে। কথা দিয়ে যে কোন জিনিস প্রমাণ করা যায়, আবার খণ্ডন করাও যায়। মানুষ অচিরেই ভাষার প্রয়োগ কৌশলকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে যেখান থেকে গাণিতিক শুদ্ধতার সঙ্গে প্রমাণ করা যাবে যে দুই দু গুণে সাত হয়। কথা শুনতে ও পড়তে আমি ভালবাসি, কিন্তু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আমি সব কিছু বিশ্বাস করতে পাবি না, বিশ্বাস করতে চাইও না। আমি বিশ্বাস করব কেবল ঈশ্বরকে, কিন্তু আপনি যদি শেষ বিচারের দিনটি পর্যন্ত কথা বলে যান এবং আরও পাঁচ শ' কিটেনকে ফুস্‌লিয়ে নিয়ে যান, তাহলেও আমি আপনাকে বিশ্বাস করব তখন যখন আমাব মাথাটাই বিগড়ে যাবে...শুভ রাত্রি!''

ছাত্রটি চাদরের নীচে মাথা ঢুকিয়ে দেয়ালের দিকে পাশ ফিরল ; বোঝাতে চাইল যে সে আর কথা বলতে বা শুনতে চায় না। আর এখানেই সব তর্কের অবসান হল।

শুতে যাবার আগে বাস্তুকার ও আমি ব্যারাক-বাড়ির বাইরে গিয়ে আলোগুলিকে আবার দেখতে পেলাম।

হাই তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আনানিয়েভ বলল, "আমাদের বক্‌বকানিতে তোমার কান ঝালাপালা করে দিলাম তো! কিন্তু তাতে আর কি হল বন্ধু? এই বিরাট একঘেয়েমির মধ্যে মদ গেলা আর দার্শনিক আলোচনা করাই তো একমাত্র সুখের কাজ...হে ঈশ্বর, কী একখানা বাঁধ!" কাছাকাছি পৌঁছলে সে গলা নামিয়ে বলল, "এটা তো বাঁধ নয়, একটা আরারাত পর্বত।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বলল ঃ

"এই আলোগুলি দেখে ব্যারনের মনে পড়ল 'আমালেকাইট'দের কথা, কিন্তু আমার কাছে এগুলিকে মানুষের চিন্তার মতই মনে হচ্ছে...তুমিও জান, প্রতিটি স্বতন্ত্র মানুষের চিন্তাই এই রকম বিচ্ছৃঙ্খল ও বিচ্ছিন্ন, অন্ধকারের মধ্যে তারা একই পথে একই লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করছে ; এবং কোন কিছুর উপরেই আলোকপাত না করে, অন্ধকার রাতটাকে এতটুকু আলোকিত না করেই একদিন তারা কোথায় হারিয়ে যাবে—বার্দ্ধক্যকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে...সে যাই হোক, দার্শনিক কথাবার্তা অনেক হল। এবার বিদায়ের শুভরাত্রি জানাবার সময় হয়েছে..."

ব্যারাক-বাড়িতে ফিরে গেলে বাস্তুকার বার বার আমাকে অনুরোধ করতে লাগল আমি যেন তার বিছানায় ঘুমই।

দুটি হাত বুকের উপর চেপে ধরে সে মিনতি জানাল, 'এটুকু দয়া কর! আমার জন্য চিন্তা করো না। আমি যেকোন জায়গায় ঘুমতে পারি, আর আরও বেশ কিছু সময় আমি শুতে যাচ্ছি না...এইটুকু অনুগ্রহ আমাকে কর!"

আমি সম্মত হলাম, পোশাক ছেড়ে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু সে ডেস্কে বসে তার নক্সাগুলি নাড়াচাড়া করতে লাগল।

আমি যখন বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলাম তখন সে নীচু গলায় বলতে লাগল, "বন্ধু হে, আমাদের মত লোকদের ঘুমবার মত সময়ই হয় না। যার স্ত্রী আছে, দুটি সন্তান আছে তার ঘুম থাকে না। আমারও দুটি আছে, একটি ছোট ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটা মহাপাজি, মুখটা ভাল...বয়স এখনও ছয় বছর হয় নি, কিন্তু তার অসাধারণ ক্ষমতা আছে...কোথায় যেন তাদের ফটোগুলি রেখেছি...আঃ, আমারই ছেলেমেয়ে তারা!"

সে তার কাগজপত্র ওল্টাতে লাগল, ফটোগুলি পেয়েও গেল। সেগুলিই দেখতে লাগল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

...আজকার ডাকে এবং জোরালো গলার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

তলবাসমাত্র পরে, খালি পায়ে আর এলোমেলো চুলে ভন স্তেনবার্গ দরজায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন জোর গলায় কথা বলছে। বাইরে আলো ফুটেছে...নিরানন্দ গাঢ় নীল ঊষা দরজা, জানালা ও দেয়ালের ফাটলের ভিতর দিয়ে উঁকি মারছে, আমার বিছানা, কাগজপত্রসমেত টেবিলটা আর আনানিয়েভ—সব কিছুই ঈষৎ আলোকিত হয়েছে। মেঝেতে একটা আলখাল্লার উপর হাত-পা ছড়িয়ে বাস্তুকার ঘুমচ্ছে ; তার মাংসল, লোমশ বুকটা উঠছে আর নামছে, মাথার নীচে একটা চামড়ার কুশন। ঘুমের মধ্যে সে এত জোরে নাক ডাকাচ্ছে যে প্রত্যহ রাতে যে ছাত্রটি একই ঘরে তার সঙ্গে ঘুময় তার জন্য সত্যি আমার বড় দুঃখ হতে লাগল।

ভন স্তেনবার্গ চীৎকার করে বলছে, "কেন আমরা ওগুলি নিতে যাব? এটা আমাদের কোন ব্যাপারই নয়! বাস্তুকার চালিসভ-এর কাছে যাও। এই বয়লারগুলো কার কাছ থেকে এনেছ?"

"নিকিতিন", একটা বিষণ্ণ গম্ভীর গলায় জবাব এল।

"বেশ তো চালিসভ-এর কাছে যাও...এটা আমাদের ব্যাপার নয়। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলে যাও!"

সেই কণ্ঠস্বর অধিকতর বিষণ্ণভাবে বলল, "হুজুর, এইমাত্র মিস্টার চেলিসভ-এর কাছ থেকেই এসেছি। সারাদিন রেল-লাইনে তার খোঁজ করেছি, তারা বলছে, তিনি দিম্‌কভ বিভাগে গেছেন। ওগুলো নিয়ে নিন, এইটুকু উপকার করুন। আর কতদিন ওগুলো নিয়ে ঘুরে বেড়াব? কতদিন আর কাঁধে করে বেড়াব ; এর তো কোন শেষ দেখতে পাচ্ছি না..."

ঘুম ভেঙে যাওয়ায় তাড়াতাড়ি মাথাটা তুলে আনানিয়েভ ধমক দিয়ে বলল, "এ সব কি হচ্ছে?"

ছাত্রটি বলল, "ওরা নিকিতিনের কাছ থেকে কয়েকটা বয়লার নিয়ে এসেছে ; বলছে, সেগুলো এখানে নিয়ে নিতে হবে। কিন্তু আমরা তা নিতে যাব কেন?"

"ওগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে দাও!"

"দয়া করুন হুজুর, ব্যাপারটা মিটিয়ে নিন। ঘোড়াগুলো দু'দিন দানা-পানি পায় নি, মালিক নিশ্চয় রেগে টং হয়ে আছে। তাহলে কি ওগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে? রেল কোম্পানিই তো বয়লার পাঠাতে বলেছিল, কাজেই ওগুলো তো নেওয়াই উচিত..."

"আরে বোকার ডিম, তুমি কেন বুঝতে পারছ না যে এটা আমাদের কাজ নয়? চালিসভ-এর কাছে যাও!"

আনানিয়েভ আবার হুংকার দিল। বিছানা থেকে উঠে দরজার কাছে গেল। "কি হয়েছে?"

মিনিট দুই পরে আমিও পোশাক পরে বাইরে গেলাম। আনানিয়েভ ও ছাত্রটি দু'জনই তলবাসমাত্র পরে খালি পায়ে সামনে দাঁড়ানো গাড়োয়ানকে চড়া গলায় কি যেন বোঝাতে চেষ্টা করছে। কোচোয়ানের মাথায় টুপি নেই,

হাতে একটা চাবুক। দু'জনেব কাবও কথাই সে বুঝতে পারছে না। দু'জনের মুখই গম্ভীর।

আনানিয়েভ চীৎকার করে বলল, ''বয়লার দিয়ে আমরা কি করব? মাথায় দেব, না কি? চালিসভকে যদি ধরতে না পার, তার সহকারীর খোঁজ কর। আমাদের শান্তিতে থাকতে দাও!''

আমাকে দেখে ছাত্রটির হয় তো বাতের কথাবার্তাগুলি মনে পড়ে গেল; তার মুখ থেকে আপাত দুশ্চিন্তাটা মিলিয়ে গেলে, তার জায়গায় দেখা দিল একটা মানসিক আলস্যের ভাব। গাড়োয়ানের দিকে হাতটা নেড়ে এক পাশে সরে গিয়ে সে চিন্তায় ডুবে গেল।

সকালেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। যে সব মজুররা সবে ঘুম থেকে উঠেছে তারা রেল-লাইনেব ধারে গা গরম কবে নিচ্ছে। নানা কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে; গাড়ির ক্যাঁচর-ক্যাঁচর শব্দ আসছে; কাজের দিন শুরু হতে চলেছে। জিন-পরা একটা টাট্টু ঘোড়া গলাটা বাড়িয়ে এক গাড়ি বালি নিয়ে বাঁধের উপরে উঠে যাচ্ছে...

আমিও বিদায় নিতে শুরু করলাম...রাতে অনেক কথা বলা হয়েছে, কিন্তু একটা সমস্যারও কোন সমাধান নিয়ে আমি যেতে পারছি না; কাল যত কথা হয়েছিল তার মধ্যে এখন এই সকালে আমার স্মৃতিতে রয়ে গেছে ছাঁকনির উপবকার তলানির মত, কেবলমাত্র সেই আলোর ঝর্ণা আর কিটেনেব মূর্তি। ঘোড়াব পিঠে বসে শেষবারের মত ছাত্রটি ও আনানিয়েভের দিকে তাকালাম; আর তাকালাম পাগলা কুকুবটির দিকে, তার অস্পষ্ট চোখ দুটি মাতালেব মত ঢুলু ঢুলু, সকালের কুয়াসার মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা মজুরদের দিকে, বাঁধটার দিকে, গলা বেব-করা বেচারা ঘোড়াটার দিকে, আর ভাবলাম, ''এ জগতে কোন কিছুরই কোন অর্থ হয় না।''

যখন ঘোড়াটাকে চাবুক মেরে জোর কদমে ছুটিয়ে দিলাম, আর একটু পবেই আমাব সম্মুখে দেখতে পেলাম কেবলমাত্র একটি অন্তহীন, বিষণ্ণ প্রান্তর আর মেঘাচ্ছন্ন ঠাণ্ডা আকাশ, তখনই মনে পড়ল কাল রাতে যে সব সমস্যা সমাধানেব চেষ্টা হয়েছিল তার কথা। ভাবতে ভাবতে চলতে চলতে মনে হল ওই বৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর, বিরাট আকাশ, ওক গাছের অরণ্য, দূরের অন্ধকার, আব কুয়াসাচ্ছন্ন দিগন্ত যেন আমাকে বলছে, 'না, এ জগতে কোন কিছুরই কোন অর্থ হয় না!''

সূর্য সবে উঠছে।

১৮৮৮

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥